ভারত-মুক্তিসাধক

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ও

অর্ধশতাব্দীর বাংলা

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা * * * * * ২০০০

ভূমিকা

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়ার পাঠকপাড়ায় ২৮ মে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৭২ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সনের 'এইট পোর্ট্রেটস্' গ্রন্থে এই জন্মতারিখ দেওয়া আছে। 'আভ্যন্তরীণ তথ্যপ্রমাণ হইতে বোঝা যায়, রামানন্দের নিকট হইতেই এগুলি গৃহীত'। শান্তা দেবী ও যোগেশচন্দ্র বাগল এই জন্ম-দিবসের তারিখ গ্রহণ করেছেন।

রামানন্দর পিতার নাম শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়, মাতা হরসুন্দরী দেবী। ১৮৮৫-তে তাঁর বিবাহ হয়, স্ত্রীর নাম মনোরমা দেবী।

সংস্কৃতজ্ঞ, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান রামানন্দ দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা পেয়েছেন, সেইসঙ্গে পরিশ্রম ও নিষ্ঠাকে আয়ত্ত করেছেন। ছাত্রজীবনে রামানন্দ পরীক্ষায় সুফলের জন্য প্রাপ্ত বৃত্তির উপর নির্ভরশীল ছিলেন ; কলকাতায় পঠনকালে এই মেধাবী তরুণ সেই বৃত্তি থেকে গ্রামে স্বগৃহে আর্থিক সাহায্য পাঠিয়েছেন। এই শহরের তখনকার পরিবেশ থেকে রামানন্দ মুক্তদৃষ্টি, দেশীয় সমাজ-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, সমাজের বঞ্চিত গোষ্ঠীর প্রতি সমব্যথীর অধিকারী হয়ে উঠলেন। এক সংগ্রামী জীবন-যাপনের সুবাদে রামানন্দ অদম্য তেজস্বী স্বাধীনচেতা স্বভাব নিজেই সৃষ্টি করে নিলেন। তার দরুন সেই কালে, ১৮৮৮-তে বি.এ. পরীক্ষায় ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েও কোনো সহজপ্রাপ্য সরকারি পদের উমেদার হতে পারেননি। ১৮৯০ সালে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ স্থান পেলেন। তখন রামানন্দ বিবাহিত। নিজের নাগরিক জীবনের খরচ বাঁচিয়ে মা, স্ত্রী, ভাই-বোনের সংসার প্রতিপালনের দায়িত্ব চল্লিশ টাকার 'রিপন বৃত্তি'তে পালন করেছেন। এই ব্রাহ্মণসন্তানের কাছে তখন উপবীত ছিল অলংকার মাত্র। ১৮৮৯-তে রামানন্দ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন ; সেই কালেই শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুসরণে উপবীত বর্জন করেছেন। তার প্রভাবে রামানন্দ যেন দ্বিগুণ পরিমাণে ব্রাহ্মণত্ব ফিরে পেলেন; তেজ এবং ত্যাগ রামানন্দর স্বভাবে প্রবলভাবেই দেখা দিল।

এই সময় রামানন্দ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'দ্য ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার' পত্রিকায় অবৈতনিক সহকারি সম্পাদকের কাজ করেছেন ; এক বছর আট মাস সিটি কলেজে পূর্ণ সময়ের সহকারি অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেছেন, প্রথমে কোনোরকম বেতন পাননি। একই সঙ্গে 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকাতে সম্পাদকীয় মন্তব্যাদি লিখে চলেছেন, কৃষ্ণকুমার মিত্রর 'সঞ্জীবনী' পত্রিকাতেও নিয়মিত লেখা চলছে। কিছুদিন পরে 'ধর্মবন্ধু' পত্রিকার সম্পাদনা, 'দাসাশ্রম' পরিচালনা, আবার তার মুখপত্র 'দাসী' পত্রিকার সম্পাদক হয়েছেন। এই বিপুল শ্রমে কোনো বৈষয়িক প্রাপ্তি ছিল না ; খ্যাতির সম্ভাবনাও সীমাবদ্ধ। সম্পূর্ণরূপে এক ব্রত পালনের প্রয়াস রামানন্দকে এই কাজে প্ররোচিত করেছিল। তবে তাঁর ভবিষ্যৎ

জীবনপথের নির্দেশক হয়ে উঠেছিল এই অভিজ্ঞতা। সেইসঙ্গে প্রভূত পরিশ্রমসাধ্য জীবনব্যাপী কর্মপ্রবাহের সূচনা হল। ১৮৯৫-তে সিটি কলেজে অধ্যাপনায় মাত্র একশ চল্লিশ টাকা বেতন বৃদ্ধির আবেদন অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ প্রমুখের সমর্থন সত্ত্বেও নামঞ্জুর হল। বাধ্য হয়েই রামানন্দ এলাহাবাদে 'কায়স্থ পাঠশালা' বা কলেজে অধ্যক্ষ পদ নিলেন। বেতন হল আড়াই শ' টাকা।

রামানন্দর জীবনচর্যা ও সাহিত্যসাধনা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল। সেখানে কোনো বিরোধ ছিল না।

একধরনের প্রচ্ছন্ন বিরোধ বরং লক্ষ করা যায় তাঁর সাহিত্য-আদর্শে। রামানন্দ আশৈশব ছিলেন কবিতারসিক। বালকবয়সে কবিতা রচনা করেছেন ; সে সময়ে 'মেঘনাধকাব্য' ও 'সদ্ভাব শতক' যে সম্পূর্ণরূপে মুখস্থ ছিল, বৃদ্ধ বয়সেও সেই স্মরণশক্তি অম্লান ছিল। বাঁকুড়ার বাংলা স্কুলে অধ্যয়নের শেষ বৎসর (? ১৮৭৫) রামানন্দ প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা রচনা করে দশ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। 'তাঁহার এই কবি-কৃতি সম্বন্ধে পরেও তিনি গৌরববোধ করিতেন।' (যোগেশচন্দ্র বাগল) পরিণত বয়সেও রামানন্দর কাব্যচর্চা অব্যাহত ছিল। 'কোনো কোনো পত্রিকার পাতায় পাদপূরণের জন্য তিনি কবিতা লিখিতেন', যোগেশচন্দ্র এই সংবাদ দিয়ে লিখছেন, 'এরূপ কবিতার সন্ধান আমরা পাইয়াছি।'

তথাচ লক্ষণীয়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের গদ্যরচনায় বিশেষত সম্পাদকীয় মন্তব্য রচনাকালে কোনো সুপ্রচলিত অলংকারবহুল কল্পনাবদ্ধ আবেগ বা উচ্ছ্বাস দেখা যায় না। বাংলা গদ্যভাষায় রামানন্দর বক্তব্য পরিচ্ছন্ন, প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট এবং যুক্তি-নির্ভর। তাঁর সেই ভাষা বক্তব্য বিষয়কে প্রচ্ছন্ন রাখে না। এই ক্ষেত্রে রামানন্দ নিশ্চিত বঙ্গদর্শন-সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ উত্তরসাধক। তদুপরি, যে-কোনো নীতিহীন সাময়িক ঘটনার প্রবল অপ্রিয় সত্যবাক সমালোচক রামানন্দ আমৃত্যু নিজ আদর্শে অবিচল ছিলেন।

এলাহাবাদ প্রবাসকালেও রামানন্দ কিছুকাল 'দাসী' পত্রিকা সম্পাদন করেছেন। তার পর প্রায় দেড় বছর কোনো বাংলা পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, তবে সে সময় ইংরেজি 'কাযস্থ সমাচার' পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করেছেন।

'দাসী' পত্রিকাকে সুপ্রচারিত করার জন্য রামানন্দর যথেষ্ট চেষ্টা ছিল। আশ্রমের মুখপত্র হিসেবে তার যে সীমাবদ্ধতা সেই বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলেই রামানন্দ লিখতে পেরেছিলেন : 'জন-হিতৈষণা-বৃত্তি এদেশে এখনও এতদূর সাধারণ ও প্রবল হয় নাই যে কেবলমাত্র তাহারই আলোচনা ও উল্লেখ দ্বারা একখানি মাসিক পত্রিকা পূর্ণ ও সাধারণের প্রীতিকর করিতে পারা যায়।' সুতরাং তাঁর পরিকল্পনা ছিল, '...ইহার প্রধান উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমরা ইহাকে অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার আকারে পরিণত করিব।' ('দাসী', নভেম্বর ১৮৯৩) অর্থাৎ কবিতা গল্প উপন্যাস গ্রন্থ-সমালোচনা--এসবের প্রকাশে রামানন্দর ইচ্ছা ছিল। সেই ইচ্ছা বিবিধ কারণে পূর্ণরূপে ফলবতী হয়নি। অবশ্য রামানন্দর সাংবাদিক ভুবনে পরিক্রমার সূচনা হল।

১৮৯৭র ডিসেম্বরে রামানন্দর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে 'প্রদীপ' পত্রিকা প্রকাশ পেল। পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে সাময়িকপত্র সম্পর্কে রামানন্দর আদর্শের এবং চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। 'শিক্ষা এবং চিত্ত বিনোদন উভয়ের সংমিশ্রণের প্রতি লক্ষ রাখিয়া আমরা 'প্রদীপ' সম্পাদন পরিচালনের চেষ্টা করিব ; সংসারে মানুষের

অনুশীলনীয় যতগুলি বিষয় আছে তৎসমুদয়ের সর্ববিষয়ক প্রবন্ধ 'প্রদীপে' থাকিবে, এরূপ লিখিয়া দিলে শুনায় ভাল এবং আড়ম্বরও বেশ হয়। কিন্তু আমরা আড়ম্বরের বিরোধী ; সুতরাং এ-বিষয়ে প্রচলিত নীতির অনুসরণ করিতে পারিলাম না।' (পৌষ ১৩০৪) এই পত্রিকাব পঞ্চম সংখ্যায় রামানন্দর সম্পাদকীয় তখন এবং এখনও লেখককুলের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য। '....কেবল কবিতা ও গল্প লিখিয়া যশস্বী হইবার চেষ্টা করা শুভ লক্ষণ নহে। চেষ্টা করিলে সকলে সুকবি বা উৎকৃষ্ট গল্প লেখক হইতে পারেন না। কিন্তু চেষ্টা করিলে সকল শিক্ষিত লোকই চলনসই গদ্য প্রবন্ধ লিখিতে পারে।'

দু-বছর, দু-মাস সম্পাদনার পর ১৩০৬ মাঘ সংখ্যার পবে রামানন্দ 'প্রদীপ' পত্রিকা ত্যাগ করেন। 'আমি কলিকাতা হইতে দূরে থাকি। আমার ক্ষমতা এবং অবসরও অল্প.. অন্যান্য কয়েকটি কারণেও এ কার্যে আমার আর উৎসাহ নাই।' (ফাল্গুন ১৩০৬)

১৩০৮-এর বৈশাখ মাসে এলাহাবাদের ২/১ সাউথ রোডের বাসস্থান থেকে রামানন্দ 'প্রবাসী' পত্রিকা প্রকাশ করলেন। এই পত্রিকার সর্বস্বত্ব ছিল তাঁর। এক অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল, 'কাগজের সম্পাদক যদি তার স্বত্বাধিকাবী না হন তাহলে তাঁকে বহু অসুবিধা ভোগ করতে হয়।' ইতিপূর্বে প্রদীপ ছেড়ে চলে আসবার সময়ে 'অন্যান্য কয়েকটি কারণ'-এর উল্লেখ স্বত্বের, স্বাধীনতার অভাব। 'প্রবাসী' রামানন্দর নিজস্ব পত্রিকা।

রামানন্দ যথারীতি তাঁর স্বভাব অনুযায়ী পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় লিখলেন, '...প্রারম্ভের আড়ম্বর অপেক্ষা ফল দ্বারাই কার্যের বিচার হওয়া ভাল। এইজন্য আমরা আপাতত আমাদের আশা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নীরব রহিলাম।' ('প্রবাসী', বৈশাখ ১৩০৮) সাময়িকপত্রেব জগতে 'প্রবাসী' একাধিক কারণে পথিকৃৎ হয়ে উঠেছিল : লেখক এবং শিল্পীদের নিয়মিত দক্ষিণাদান ; ৩১ দিন অন্তর পত্রিকার নিয়মমাফিক প্রকাশ ; মাসিকপত্রে বহুবর্ণ চিত্রের প্রচলন; নির্ভুল মুদ্রণ ও বিন্যাসে সজাগ দৃষ্টি। একদা রামানন্দ 'প্রদীপ' পত্রিকায় নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন, 'লেখার জন্য টাকা দিবার নিয়ম প্রবর্তিত হইলে সম্পাদককে লেখকদের কাছে নিতান্ত ভিক্ষুক ও অনুগ্রহজীবী সাজিতে হয় না।' নিজস্ব পত্রিকার পরিচালন-পর্বে রামানন্দ তাঁর সহযোগীদের কাছে আরও মানবিক যুক্তি নিয়ে এলেন, 'আমরা পত্রিকার জন্য কাগজ, কালি, ব্লক, ছবি, ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতি খরচার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু যাঁহাদের লেখা লইয়া আমরা পত্রিকা প্রকাশ করি তাঁহাদের কথা ভাবি না।'

শিল্পীদের চিত্রকর্ম প্রকাশের জন্যও দক্ষিণার প্রবর্তন করলেন রামানন্দ। অবনীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'নতুন নতুন আর্টিস্ট এল ছবি দিতে "প্রবাসী"তে। এ যে হল তার জন্য দায়ী আমি নয়, রামানন্দবাবু।...আমরা আর্টিস্টরা শুধু যে তাঁর দৌলতে বিনি পয়সায় দেশজোড়া বিজ্ঞাপন পেয়ে গেছি তা নয়, নিয়মিত দক্ষিণা কাঞ্চনমূল্য তাও পাচ্ছি এখনো। কে ছাপত ঘরের কড়ি দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের হাতের ছেলেখেলার ছবি সমস্ত, যদি না প্রবাসী বার করতেন রামানন্দবাবু।' ('প্রবাসী', বৈশাখ ১৩৩৩)

নব্য ভারতীয় চিত্রকলার প্রকাশে শিল্পী এবং শিল্পরসিক মহলে শুধু উৎসাহ দেখা দেয়নি, বিরুদ্ধতাও দেখা দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এক স্মৃতিচারণ রয়েছে, 'একবার প্রবাসীর অথবা মডার্ন রিভিয়ুর এক গ্রাহক ভারতশিল্পের এইসব ছবি তাঁহার কাছে পীড়াদায়ক মনে হওয়ায় এগুলির প্রকাশের বিরুদ্ধে কটু মন্তব্য করিয়া লেখেন এবং ভীতি প্রদর্শন করেন যে, এইরূপ ছবি প্রকাশ করা বন্ধ না করিলে তিনি আর উক্ত পত্র গ্রহণ করিবেন

না। তখনই সম্পাদকের নির্দেশ হইল, ঐ গ্রাহককে জানাইয়া দেওয়া যে, অতঃপর তাঁহার নিকট আর পত্রিকা যাইবে না।' ('প্রবাসী', ষষ্টি-বর্ষপূর্তি সংখ্যা)

১৯০৭ সালে জানুয়ারি মাসে রামানন্দ 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকা প্রকাশ করলেন। তার প্রস্তুতিস্বরূপ ১৯০৬-এর সেপ্টেম্বরে তিনি কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করলেন।

যে জাতীয়তাবাদ এবং স্বায়ত্তশাসনের সমর্থক ছিলেন রামানন্দ, ইংরেজি 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় তাকে ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ এল। তার পরিণামে পত্রিকার উপর সরকারি কোপদৃষ্টি পড়ল। শান্তা দেবী অন্যত্র লিখছেন, 'বাবাকে ইংরেজ সরকার মোটেই ভাল চোখে দেখতেন না। ''মডার্ন রিভিয়ু'' প্রকাশিত হবার পর থেকে তাঁদের রাগ আরও বেড়ে গেল। কোনপ্রকারে তাঁকে তাড়াতে পারলে তাঁরা বাঁচেন।...১৯০৮-এ বাবার লেখায় কী একটা ছিদ্র পেয়ে সরকার পক্ষ হুকুম করলেন, হয় মডার্ন রিভিয়ু বন্ধ করতে হবে, নয় সম্পাদককে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এলাহাবাদ ছেড়ে যেতে হবে।' ('পূর্বস্মৃতি') রামানন্দ ১৯০৮-এর এপ্রিল মাসে 'প্রবাসী' (বৈশাখ ১৩১৫) এবং 'মডার্ন রিভিউ' (মে ১৯০৮) পত্রিকার দফতর সহ কলকাতায় স্থায়ীভাবে চলে এলেন।

এই শহরে, এই দেশে, সেই সঙ্গে সমগ্র বিশ্বে রামানন্দর কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পেল। বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সংযোগ দৃঢ়তর হল। বিচিত্র সংস্কারকার্যে, সেবাধর্মে রামানন্দর প্রত্যক্ষ ভূমিকা দেখা দিল। সেইসব কর্মপ্রয়াসের বিবরণ শান্তা দেবী এই গ্রন্থে সাধ্যমত দিয়েছেন। তার আগে রামানন্দর কর্মজীবন এবং আদর্শের যেভাবে ক্রমবিকাশ দেখা দিয়েছিল, এই গ্রন্থের ভূমিকায় তার কিঞ্চিদধিক অভাব পূরণের জন্য পত্রপত্রিকা থেকে বিবরণী সমাবিষ্ট হল। পরবর্তীকালে নাগরিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কর্মবৈচিত্র্য শান্তা দেবীর গ্রন্থে সযত্নে পরিবেশিত হয়েছে।

উপবীতত্যাগী ব্রহ্মসমাজভুক্ত রামানন্দর কোনো ধর্মীয় সংস্কার ছিল না। সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শান্তা দেবী বিশদভাবে দিয়েছেন। আমাদের আরও জানা আছে, রামানন্দর অসুস্থ অবস্থায় 'মডার্ন রিভিউ'র প্রথমদিকে নিয়মিত 'নোটস' লিখেছেন নিবেদিতা। ভারতীয় চিত্রশিল্পের পরিচিতিও প্রায় সময় নিবেদিতা লিখেছেন। ইংরেজি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রসারে রামানন্দ ও 'মডার্ন রিভিউ'র যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল, সেখানেও যুক্ত হতে পারে সিস্টার নিবেদিতার অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা'। ('মডার্ন রিভিউ', জানুয়ারি ১৯০২।)

'ধর্মবন্ধু' পত্রিকার সম্পাদনকালে রামানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বচনসমূহ পত্রিকায় সংকলন করেছিলেন। যোগেশচন্দ্র বাগলের মতে, শ্রীম লিখিত 'রামকৃষ্ণ কথামৃত'র অংশবিশেষ বাংলাভাষায় 'ধর্মবন্ধু' পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়।

রামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী সারদামণির জন্মস্থান এবং পিত্রালয় ছিল বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটিতে। বাঁকুড়ার সন্ততি সারদামণি সম্বন্ধে রামানন্দ গৌরব অনুভব করতেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, সারদামণির তিরোধানের পরে 'প্রবাসী' বৈশাখ ১৩৩১ সংখ্যায় রামানন্দ তাঁর জীবনকথা প্রকাশ করেন ; সেই রচনা সারদামণির প্রথম জীবনী।

রামানন্দর আদর্শ পুরুষ ছিলেন রামমোহন ; রামানন্দকে অনেকে অভিহিত করেছেন

'রামমোহনের আত্মিক সন্তান'। কিন্তু 'প্রবাসী'র সহকারী সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহন ও রাজারাম রায় সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে লিখেছেন। সেই রচনা রামমোহন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার বিরোধী। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বন্ধুবর্গের প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও এবং রামানন্দর নিজস্ব আদর্শের পরিপন্থী হলেও সম্পাদক তাঁর সহযোগীর সেই রচনা প্রকাশে দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন।

প্রবাসী প্রেস প্রকাশিত জে. টি. সন্ডারল্যান্ডের 'ইন্ডিয়া ইন বন্ডেজ' গ্রন্থের উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি হল, এবং গ্রন্থের মুদ্রক ও প্রকাশক ধৃত হলেন। শান্তা দেবী মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নামোল্লেখ করেননি। সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থে সমসাময়িক কোনো সংবাদপত্র থেকে সেই ঘটনার বিবরণ উদ্ধার করেছেন :

'গত ২৪শে মে তারিখে কলিকাতা পুলিশ প্রবাসী কার্যালয় ও প্রবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি খানাতল্লাশি করিয়া ডা জে. টি. সান্ডারল্যান্ডের প্রণীত "ইন্ডিয়া ইন বন্ডেজ" নামক পুস্তকের চল্লিশখানি কপি লইয়া যায় এবং রাজদ্রোহ অপরাধে উক্ত পুস্তকের মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসকে গ্রেপ্তার করে। গত ৪ঠা জুন এই মামলার শুনানি হইবার কথা ছিল ;... কিন্তু ইতিমধ্যেই পুলিশ আবার ৬ই জুন তারিখে রাজদ্রোহ অপরাধে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে গ্রেপ্তার করিয়াছে।...' প্রসঙ্গ ক্রমে সজনীকান্ত সম্পৃক্ত আর-এক ঘটনার উল্লেখ করেছেন যেখানে রামানন্দর চারিত্রিক সততার স্বাক্ষর রয়েছে : ' "শৃঙ্খলিত ভারত" বা "ইন্ডিয়া ইন বন্ডেজ" প্রসঙ্গে আর-একটি কথা না বলিলে কথা অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে। ইহা চিরকাল রামানন্দ-চরিত্রের সততা ও দৃঢতার একটি দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে। পুলিশ যেদিন প্রথম প্রবাসী আপিস খানাতল্লাশি করে, সেদিন ৪৪ খানি বাঁধা পুস্তক লইয়া যায়। আবাঁধা পুস্তক সমস্তই দফতরির বাড়িতে ছিল। মামলা চলিবার কালে অতিদ্রুত বিক্রিত হইয়াও বাজেয়াপ্তির হুকুমের দিনে মোটামুটি ৪৫০ খানা বাঁধা-আবাঁধা বই থাকিয়া যায়। প্রতিখানির মূল্য পাঁচ টাকা, কিন্তু তখনই প্রায় ডবল দামে বাহিরে বইটি বিক্রয় হইতেছিল। জরিমানার দুই হাজার টাকা তো ডাহা লোকসান, অবশিষ্ট বইগুলি ন্যায্যমূল্যে বেচিলেও সে লোকসান উঠিয়া আসিত। একজন পুস্তক-বিক্রেতা মূল্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কড়া হুকুম দিলেন, এক কপি বইও বাহিরে যাইবে না। অফিসঘরের ঠিক মাঝখানে বইগুলি থাকে থাকে সাজাইয়া রাখা হইল ; পুলিশ আসিয়া ভ্যানে করিয়া সেগুলি লইয়া গেল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চোখের একটু ইঙ্গিত করিলেই নিমেষ মধ্যে বইগুলি নগদ টাকায় রূপান্তরিত হইয়া সিন্দুকে জমা হইতে পারিত।'

আরও এক বিষয় এখানে প্রাসঙ্গিক। অশোক চট্টোপাধ্যায় সজনীকান্ত দাস যোগানন্দ দাস প্রমুখ রামানন্দর আত্মীয়বান্ধবজনের প্রবর্তনায় প্রকাশিত 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে প্রথমদিকে তিনিও জড়িত ছিলেন। 'অন্তরালে থাকিয়া যাঁহারা উহাকে প্রেরণা জোগাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।' ('আত্মস্মৃতি') প্রবাসী প্রেসে শনিবারের চিঠি মুদ্রিত হত, তার প্রকাশস্থান এবং এবং কার্যালয় ছিল প্রবাসী প্রেস। শনিবারের চিঠির সাহিত্যপত্রে রূপান্তরের সময় রামানন্দ সবান্ধবে তার সংশ্রব ত্যাগ করলেন। সজনীকান্ত লিখেছেন, 'নানা কারণে রুচির অভাব ঘটিতে লাগিল...তাঁহার একেবারেই বিদায় লইলেন।'

তারপরেও এই পত্রিকার কারণে রামানন্দকে একাধিকবার গঞ্জনা পেতে হয়েছে।

'ভক্তিভাজন' বন্ধু রবীন্দ্রনাথও কঠোর হয়েছিলেন। সেই কালে 'শনিবারের চিঠি' যখন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তকে ব্যঙ্গ-বিদ্ধ করেছিল, নরেশচন্দ্র রামানন্দকেই দায়ী করেছিলেন। সজনীকান্ত তার বিবরণ দিয়েছেন। '[নরেশচন্দ্র] শনিবারের চিঠি-র মুদ্রাকর প্রকাশক বা সম্পাদককে না ধরিয়া একেবারে প্রবাসী প্রেসের মালিককে ধরিয়া টান দিলেন। অর্থাৎ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে উকিলের চিঠি দিলেন।...দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহার লক্ষ্য একটু বেশি ঊর্ধ্বে হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ফস্‌কাইয়া গিয়াছিল।...'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে জড়াইয়া রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে নরেশচন্দ্র যে হুমকি-পত্র দিয়াছিলেন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রদত্ত তাহার জবাবটিতে তাহার দৃঢ় ও মহৎ চরিত্রের পরিচয় আছে।' 'বাতিল কাগজের বাণ্ডিল' থেকে সজনীকান্ত রামানন্দর সেই চিঠি উদ্ধার করে 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। শান্তা দেবী নামোল্লেখ না করে সংক্ষেপে ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন।

দেশব্রতী রামানন্দ পরাধীন দেশের অবস্থা দেখেই রাজনীতিকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলেননি। বিশেষত বঙ্গবিভাগের সময় রামানন্দর সম্পাদনায় 'প্রবাসী যেন দেশের বেদনা ভাবনা, অপমান-লাঞ্ছনার গ্লানির কথা নিয়ে আকুল হয়ে উঠল...সাহিত্য, সমাজচিন্তা, চিত্র শিল্পকলার সঙ্গে সম্পাদক মহাশয় রাজনীতিকে সমান ক'রে—এক ক'রে নিলেন প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে... ।' (জ্যোতির্ময়ী দেবী, 'প্রবাসী' ষষ্ঠি-বর্ষপূর্তি) অথচ শান্তা দেবী যথার্থভাবে উল্লেখ করেছেন প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৩ সংখ্যায় রামানন্দর 'স্বদেশী প্রসঙ্গ'' আলোচনা ; সেখানে স্বদেশী আন্দোলন বা আলোড়ন অপেক্ষা রামানন্দর কাছে অধিক মর্যাদা পেয়েছে সেই কালে জগদীশচন্দ্র বসুর 'প্ল্যান্ট রেসপন্স' গ্রন্থের প্রকাশ। 'যাহাতে আমাদের কোনো স্বদেশবাসীর মানসিক শক্তির অসাধারণতা প্রমাণ করে, তাহাই গুরুতম স্বদেশী ঘটনা।'

পরে রামানন্দ হিন্দু মহাসভার ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন, কিন্তু তখন সময়ের প্রেক্ষিতে, বিশেষত মহাসভা 'হিন্দু' শব্দের যে সংজ্ঞা দিয়েছিল, সেখানে উগ্র সাম্প্রদায়িক চেহারা ছিল না। নিতান্ত এক মানবিক কারণে রামানন্দ তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। শান্তা দেবী সেই কারণ এবং অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন।

সম্পাদক রামানন্দ নিজস্ব স্বভাব ও রুচি, সর্বোপরি স্বোপার্জিত এক ব্যক্তিত্ব নিয়ে পত্রিকাদি পরিচালন করেছেন। পূর্বাপর তাঁর অভিজ্ঞতা এই বিষয়ে সহায় ছিল। 'হয়ত ভাল করিয়া কাগজ চালাইলে গ্রাহক কমিয়া যায়। হয়ত খরচ পোষায় না। বাস্তবিক গ্রাহকেরা যেমনই চান তেমন লেখা দিতে গেলে, কাগজের আর মর্যাদা থাকে না ; কোথায় সম্পাদকেরা সাধারণের মত গঠন করিবেন না নিজেরাই সাধারণের মতের অনুবর্তী হইয়া উঠেন।' ('প্রদীপ', পৌষ ১৩০৭) সেই কারণে এই কঠোরসংকল্প পুরুষ বলতে পারেন, 'আমি সম্পাদকের কার্যকে শিক্ষক বা অধ্যাপকের কার্য অপেক্ষা কম পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ মনে করি না।' (তদেব)

সেই পবিত্র ও দায়িত্ববান কাজে রামানন্দ চিরবরেণ্য হয়ে রইলেন। নিবেদিত-প্রাণ সম্পাদকের মহৎ কর্মের ফল জ্যোতির্ময়ী দেবীর অভিজ্ঞতায় শোনা যেতে পারে। '...এক কথায় কী সাহিত্যের আদর্শের মান—কী সমাজের সংস্কার বা কল্যাণ-প্রসঙ্গ কিংবা দেশি বা বিদেশি রাজনীতির আলোচনা অথবা শিল্পকলা-প্রসঙ্গ, সমস্ত কিছুতে প্রবাসীর আদর্শ, প্রবাসীর অভিমত, প্রবাসীর সম্পাদকীয় মতামত, সমস্ত দেশের ও প্রবাসের শিক্ষিত মানুষের কাছে সর্বাগ্রগণ্য ছিল।...প্রবাসীর শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় সাহিত্যকার বা সাহিত্যিক যাকে

বলে তা হয়ত ছিলেন না। কিন্তু তিনি কোন্ এক অদ্ভুত ক্ষমতায় প্রবাসীর যেমন মার্জিতরুচি পাঠকমণ্ডলী সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি বিদগ্ধ সাহিত্যিক সঙ্ঘও সৃষ্টি করেছিলেন। ...প্রবাসীতে লেখা বা রচনা প্রকাশ হওয়া তখনকার দিনের লেখকসমাজে বিশেষ শ্লাঘার বিষয় ছিল। আবাব পাঠকসমাজও প্রবাসীর নিয়মিত পাঠক হওয়ার জন্য গর্ব অনুভব করতেন।' ('প্রবাসী' ষষ্টি-বর্ষপূর্তি)।

সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে গভীরতম যোগ ছিল লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। চার বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ রামানন্দর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আমৃত্যু সেই যোগ একইসঙ্গে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকাব এবং কবির খ্যাতি প্রসারে যথেষ্ট কার্যকর হয়েছিল। ইতিপূর্বে 'প্রদীপ' পত্রিকায় (১৩০৫ বৈশাখ) রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রকাশিত হলেও তাঁর সঙ্গে রামানন্দর সাক্ষাৎ পরিচয় ১৯০০ সালে এলাহাবাদে। 'প্রবাসী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা স্থান পেয়েছে। তার পর থেকে রবীন্দ্রনাথের বহুবিধ রচনা, চিঠিপত্র. ভাষণ ও রবীন্দ্রনাথ-বিশ্বভারতী সম্পর্কিত সংবাদ 'প্রবাসী', 'মডার্ন রিভিউ' ও 'বিশাল ভারত' পত্রিকায় অবিরামভাবে মুদ্রিত হযেছে। শান্তা দেবী তাঁব প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ-রামানন্দ সম্পর্ক নিয়ে বহু সংবা দিয়েছেন, প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য থেকে দুজনের ঘনিষ্ঠ সখ্যতার কথাও লিখেছেন।

একদা 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক, রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবী চৌধুরানি তাঁব কাছে লেখা চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হলে প্রবাসী সম্পাদককেই সে-কারণে তিনি দায়ী করেন, প্রবাসী সম্পাদক লেখকদের 'সরস্বতীর বিনা পণের মহল হইতে ছুটাইয়া লক্ষ্মীর পণ্যশালায় বন্দী করিয়াছেন।' রবীন্দ্রনাথ 'অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করে...নিরতিশয় ক্লান্তি ও ব্যস্ততার মধ্যেও' ('চিঠিপত্র' ৫) তার প্রতিবাদ 'সবুজপত্র' পত্রিকায় পাঠিযেছিলেন, '... এমন সময়ে প্রবাসী-সম্পাদক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার প্রবন্ধের মূল্য দিয়েছিলেন। মাসিকপত্র থেকে এই আমার প্রথম আর্থিক পুরস্কার।...কিন্তু অর্থই ত একমাত্র আনুকূল্যের উপায় নয়। প্রবাসী সম্পাদক সর্বদা তাঁর লেখার দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা মমত্বের বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা বিশ্বভারতীর যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। আমি নিশ্চিত জানি সেই আনুকূল্য দ্বারা তিনি আমার অতিভারপীড়িত আয়ুকেই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন।...'('সবুজপত্র', আশ্বিন ১৩৩৩।)

শান্তা দেবীর গ্রন্থ প্রকাশের বহু পরে ১৯৮৬ সালে বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'চিঠিপত্র' দ্বাদশ খণ্ডে রামানন্দ, তাঁর পুত্র কন্যা জামাতা পুত্রবধূর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্র-বিনিময় সংকলিত হয়েছে। এই দুই সমসাময়িক মনস্বীর সম্পর্কে নূতন তথ্যাদিও পাওয়া যায়। এখানে বলা দরকার, রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী শান্তা দেবীর করায়ত্ত ছিল, প্রয়োজনে তার কিছু উল্লেখ করেছেন ; রামানন্দর লিখিত চিঠিপত্র তিনি স্বভাবত দেখতে বা ব্যবহার করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের পত্রাদি প্রধানত 'প্রবাসী' পত্রিকায় বৈশাখ ১৩৪৮ থেকে চৈত্র ১৩৫৪ পর্যন্ত মধ্যেমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ; এতদ্ব্যতীত 'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা' 'দেশ' ইত্যাদি পত্রেও মুদ্রিত হয়েছে। রামানন্দের চিঠিপত্রের মধ্যে ভারতের সেই মুক্তিসাধকের ব্যক্তিগত চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে।

এখানে শান্তা দেবীর গ্রন্থে অনুল্লিখিত দুটি ঘটনা দুজনের বন্ধুত্ব বিষয়ে গুরুত্বের জন্য উদ্ধার করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সদ্যরচিত নাটক 'নটীর পূজা' 'মাসিক বসুমতী' পত্রের বৈশাখ ১৩৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রামানন্দ যৎপরোনাস্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। ১৯২৬, ৯ মে রবীন্দ্রনাথকে তিনি লিখছেন, 'কাল রাত্রে শান্তিনিকেতনে আহাবের পরে শুনিলাম যে, "নটীর পুরস্কার" নাটিকাটি "বসুমতীকে" ছাপিবার জন্য ৬০০ টাকায় দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য যদি প্রবাসী উহা প্রকাশ করিবার অযোগ্য বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার কিছু বলিবার নাই। অন্যথা আমার পক্ষে ক্ষুণ্ণ হওয়া স্বাভাবিক। ছয়শত টাকা দিতে সম্ভবত আমিও পারিতাম। আমি প্রবাসীতে "মুক্তধারা" ছাপিবার অধিকারের জন্য ১২৫০ টাকা নগদ এবং ৩৭৫০ খানি "মুক্তধারা" বিশ্বভারতীকে দিয়াছিলাম। সুতরাং "নটীর পুরস্কার" পাইলে সম্ভবত দরদস্তুর করিতাম না।'

আমাদের কাছে যেন অন্য রামানন্দ। বন্ধুব কাছে বঞ্চনা পেয়ে সেই অভিমানাহত সম্পাদক আরও লিখলেন, '...অতঃপব আমাকে বাংলা বা ইংরেজি কোন লেখা দিবেন না। আমি জানি আপনার লেখা না পাইলে আমার কাগজ দুটির গৌরব হ্রাস পাইবে।...আমার হৃদযমনে দুঃখের কাবণের অভাব নাই। তাহার উপর, বিশ্বভারতীর ক্ষতি করিতেছি, কিম্বা উহার যে সামান্য সেবা আমি করি তাহা স্বার্থপ্রযুক্ত করি, এরূপ কোনো সন্দেহের আঘাত আমার পক্ষে দুঃসহ হইবে।'

প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন, ইতিপূর্বে ববীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত বাংলা রচনার স্বত্ব বিশ্বভারতীকে অর্পণ করেছিলেন। উপবোক্ত পত্রের উত্তবে রবীন্দ্রনাথ সবিনয়ে সে কথা জানিযেছেন।

কিছুকাল পরেই এক অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছিল যার দরুন বন্ধুবিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। শান্তা দেবী শুধু উল্লেখ করেছেন, '১৯২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ও বামানন্দের কোনো কাবণে একটু ভুল বোঝাবুঝি হইয়াছিল।' পারিবারিক বা কূটনৈতিক কারণে শান্তা দেবী বিষয়টিকে সতর্কভাবে এড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এখন সেই ঘটনা সুপরিজ্ঞাত। দুই বন্ধুর সম্পর্কের ইতিবৃত্ত রচনায় তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রয়োজনীয়।

১৯২৬-এর মে মাসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুই কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ সহ তৎকালে ইতালির সর্বাধিনায়ক মুসোলিনির আমন্ত্রণে ইতালি ভ্রমণ কবেন, সেখানে প্রভূত সংবর্ধনার উত্তরে মুগ্ধ কবি সেখানকার শাসনব্যবস্থাকে সাধুবাদ দিয়েছিলেন। তখনকার ইতালির ফ্যাসিস্ট একাধিপত্যের স্বরূপ তাঁব কাছে গোপন রাখা হয়েছিল। তার পরিণামে দেশে-বিদেশে আলোড়ন ওঠে। কিছু পরে জেনেভায় এসে রবীন্দ্রনাথ রোমাঁ বোল্যাঁর কাছে মুসোলিনির মূল উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্বন্ধে জেনেছেন। তখন রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে এক নিন্দাসূচক পত্র পাঠিয়েছিলেন সি. এফ. অ্যান্ড্রুজকে, তার কপি পাঠিযেছেন এলমহার্স্টকে। ইওরোপের কাগজে ('ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান', ৫ আগস্ট ১৯২৬) সেই চিঠি প্রকাশের সুবাদে 'প্রবাসী', আশ্বিন ১৩৩৩ এবং 'মডার্ন রিভিউ', অক্টোবর ১৯২৬ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠি সম্বন্ধে সংশয়জনক এবং বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য প্রকাশিত হয়।

এখানে উল্লেখ থাকা দরকার, লিগ অব্ নেশনসের আমন্ত্রণে রামানন্দ তখন বিদেশে। তাঁর অবর্তমানে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র অশোক চট্টোপাধ্যায় পত্রিকাদুটির সম্পাদনার ভার

পেয়েছিলেন। লোকমুখে প্রচলিত ছিল, অশোক চট্টোপাধ্যায় ফ্যাসিবাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থক ছিলেন।

উপরোক্ত সম্পাদকীয় দুটি বিষয়ে যথাসময়ে রবীন্দ্রনাথ সুতীব্র ভাষায় তাঁর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। রামানন্দকে ২৫ অক্টোবর, ১৯২৬ তারিখে লিখছেন,

'... আমার সম্বন্ধে এরকম তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও অবজ্ঞাসূচক উক্তি দেশি বিদেশি শত্রু মিত্র কারো কাছ থেকে অনেকদিন পাইনি। .আপনার কাগজে এটা মতঘটিত প্রতিবাদ বা আক্রমণ নয়, ব্যক্তিগত অবমাননা।...বিরুদ্ধবাদী কোনো পত্রে এমনভাবে আমার প্রতি গ্লানিপূর্ণ শ্লেষ প্রয়োগ সম্প্রতি কোথাও ঘটেচে বলে জানি নে।...মডার্ন রিভিউতে ও তাব পনেরো দিন পরে প্রবাসীতে সর্বজনগোচর যে অবমাননা আমার বিরুদ্ধে প্রকাশ করা হয়েছে তাবা [? পুত্র-কন্যা-জামাতা] যে তা স্বীকার করে নিতে পারলে এটাই সবচেয়ে আমাকে বেদনা দিয়েছে। অবশ্য কর্তব্যের দাবি আত্মীয়তার দাবির চেয়ে বেশি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেই দাবি কি এত অত্যন্ত বেশি ছিল যে, ভাষায় অপরাধীর প্রতি সামান্য সৌজন্যেরও সংযম রক্ষা করা অসাধ্য হয়েছিল।'

যিনি বলতেন, 'আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব লাভ' সেই বন্ধু-বিচ্ছেদ-শঙ্কিত, অন্যদিকে পুত্রস্নেহকাতর রামানন্দর সংকট এখানে অনুভব করা যায়। এই ঘটনার জের দীর্ঘায়ত হয়েছিল, বিশেষ করে অন্য পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, চিঠিপত্র প্রকাশকে কেন্দ্র করে রামানন্দ আরও সংশয়ী ও অভিমানী হয়ে উঠেছিলেন।

কিছু পরেই রবীন্দ্রনাথ এক দীর্ঘ চিঠিতে জানিয়েছেন, 'যাই হোক্ প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়ুর দরোয়াজা বন্ধ।...সবসুদ্ধ জড়িয়ে আবহাওয়াটা আমার পক্ষে এতই দুঃখজনক হয়েছে যে, আমার সাহিত্যিক জীবনের পরেই আমার ধিক্কার জন্মেছে। লেখার আনন্দ আজ একটা গুরুতর ব্যাঘাত পেয়েচে।'

রামানন্দর আপাতকঠোর স্বভাবের গভীরে যে এক নম্র প্রচ্ছদ রয়েছে, তার যেন উন্মোচন হল সেই চিঠির উত্তরে, 'কি করিলে ভবিষ্যতে আপনি আমার জন্য ও আমার দ্বারা আঘাত না পান, তাহা আমি এখনও ঠিক করিতে পারি নাই ; চিন্তা করিতেছি। "প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়ুর দরোয়াজা বন্ধ", ইহা আমার কানে ও হৃদয়ে বড় কঠোর ও নিষ্ঠুর শুনাইতেছে।...আমি লিখিতে জানি না ; মনের কথা বলিতে পারিব না, ভাষার অভাবে। ভগবানের নিকট আলো চাহিতেছি। আপনার আশীর্বাদ ও স্নেহ চাহিতেছি।'

দুই বন্ধুর মধ্যে সম্পর্কের সেই সাময়িক ওঠাপড়ার আরও বিশদ বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, 'চিঠিপত্র' ১২ ও 'কবির সঙ্গে ইয়োরোপে', নির্মলকুমারী মহলানবীশ।

রামানন্দর রোগশয্যায় বহু সংবর্ধনার মধ্যে বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের পক্ষে তাঁর জন্মদিবস উপলক্ষে যে সমাবেশ হয়েছিল সেখানে 'এই দৃঢ়চিত্ত স্বল্পবাক মানুষটিও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথের "দীনাতিদীন অযোগ্য সেবক" তিনি বিশ্বভারতীর সেবা করতে পারেননি একান্ত সরলতায় উচ্চারণ করেছিলেন।' ('বিশ্বভারতী পত্রিকা', মাঘ-চৈত্র ১৩৫০) রামানন্দর মৃত্যুর পর পত্রিকার সেই শ্রদ্ধাঞ্জলিতে বেনামে পুলিনবিহারী সেন আরও লিখেছেন, 'প্রবাসী মডার্ন রিভিউর এক শ্রদ্ধেয় ও প্রধান লেখক, পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকার্যে অগ্রগণ্য লেখক', রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যথোচিত শ্রদ্ধা পোষণ করেন না, শুধু এই অনুমানে 'রামানন্দবাবু স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে এক সময় তাঁর আনুকূল্য থেকে নিজেকে

বঞ্চিত করেছিলেন।...রামানন্দবাবু উক্ত লেখক সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এ কাজ করেছিলেন, কিন্তু ঘটনাটি তাঁর গভীর রবীন্দ্রানুরাগের নিদর্শনরূপে উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, এই ক্ষতিস্বীকারের কথা রবীন্দ্রনাথকে তিনি কখনো জানতে দেননি।'

শান্তা দেবী এই গ্রন্থে দুটি অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ-রামানন্দ সম্পর্কে প্রধানত স্মৃতিভিত্তিক যেসব তথ্য দিয়েছেন তাকে অবলম্বন করে এই দুই বন্ধুর সুদীর্ঘ আপাতমধুর সম্পর্ক সম্বন্ধে কৌতূহল তৈরি করে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে 'রবীন্দ্র-বিহীন জগৎ দেখিতে হইবে' সেই ভাবনায় যন্ত্রণাহত রামানন্দ কবির মৃত্যুর দু-বছর পরেই প্রয়াণ করেছেন।

রামানন্দ অবশ্য তার বন্ধুস্থানীয় যশস্বীজনদেরও প্রয়োজনে যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন। শান্তা দেবী নিপুণভাবে তার বিবরণ দিয়েছেন।

শান্তা দেবীর এই গ্রন্থে কোথাও প্রকাশকালের ইঙ্গিতমাত্র নেই। শান্তা দেবী-সীতা দেবীর জীবনীলেখক মাধুরী দে-র অনুমান, প্রকাশকাল ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ।

মনে হতেই পারে, শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থ শান্তা দেবীর এই রচনাকর্মে আদর্শ ছিল। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সেই গ্রন্থের ভূমিকায় শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'তাঁহার [রামতনু লাহিড়ী] জীবন-চরিত লিখিতে গেলে, বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ ইতিবৃত্তকে বাদ দিয়া লেখা যায় না। তাই বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ সামাজিক ইতিবৃত্তের বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইতে হইল।'

শান্তা দেবীর প্রয়াস ছিল তদনুরূপ। কারণ, তিনি জেনেছিলেন, তাঁর পিতৃদেবের জীবন ও কর্ম এই দেশের আভ্যন্তরিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। বিশেষত তিন ভাষার তিনটি পত্রিকার পরিচালকরূপে রামানন্দ সর্বদা দেশ ও বিদেশের প্রায় প্রতি ঘটনায় তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রচার করেছেন, বিচিত্রক্ষেত্রের ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর গ্রন্থে রামমোহন ডিরোজিও মধুসূদন দত্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহেন্দ্রলাল সরকার দুর্গামোহন দাশ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ স্মরণীয় ব্যক্তির তৎকালীন ভূমিকা বিস্তৃতভাবে লিখেছেন; বঙ্গদেশের সমকালীন পটভূমি রচনার কারণেই তাঁদের প্রসঙ্গ এসেছে, অথচ তাঁদের অনেকের সঙ্গে রামতনু লাহিড়ির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ ছিল না। শান্তা দেবীর গ্রন্থে যেসব মহাজনদের উপস্থিতি ঘটেছে, তাঁদের ভূমিকা রামানন্দকে কেন্দ্র করেই উল্লিখিত হয়েছে।

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থের ভূমিকায় শিবনাথ শাস্ত্রী আরও লিখেছেন, 'সন্তোষের কারণ এইমাত্র যে, যে সকল মানুষ, যে সকল ঘটনা ও যে সকল অবস্থা চলিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা গেল, ভবিষ্যতে কাহারও কাজে লাগিতে পারে।' শান্তা দেবীও সেই দাবি করতে পারেন। তাঁর এই রচনাকর্ম এক যুগ-পরিবর্তনের দলিল রূপে শিবনাথ শাস্ত্রীর ঐতিহাসিক গ্রন্থের পরবর্তী স্তর রূপে বিবেচিত হতে পারে।

রামানন্দর প্রয়াণের দু-বছর পরেই গ্রন্থটির প্রকাশ ঘটেছে। তার পরে রামানন্দ ও তাঁর উল্লিখিত পত্রিকাদি বিষয়ে আরও তথ্য জানা গেছে। গ্রন্থে অল্পাধিক বা অনুল্লিখিত সেইসব সংবাদ আগে কিছু বলা হয়েছে। আপাতত, শান্তা দেবী সম্বন্ধে কিছু সংবাদ প্রয়োজনবোধে দেওয়া যেতে পারে।

'ভারত-মুক্তিসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা' গ্রন্থে শান্তা দেবী লিখছেন, 'আত্মপ্রচারে অনভিলাষী রামানন্দ নিজের বিষয়ে বিশেষ কিছু কখনো বলিতেন না বা লিখিতেন না।...অন্যের বিষয় বলিতে গিয়া তাঁহার নিজের কথা দুই-চারিটি কখনো জানা যাইত।' পিতৃদেব সম্পর্কে এই মহদ্‌গ্রন্থ রচনাকালে রামানন্দর আত্মীয়-পরিজন, অন্য পুত্রকন্যার কথা কখনও-বা এসেছে, কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণ নেপথ্যচারী করে রেখেছেন এই লেখিকা। এমন রচনা এখনও অভূতপূর্ব। এই বিষয়ে শান্তা দেবী সযত্নে, সতর্কভাবেই পিতৃপদাঙ্কানুসারী।

শান্তা দেবীর জন্ম ২৯ এপ্রিল ১৮৯৩, ইতিহাসদৃষ্টে অনুমান হয়, কলকাতার ঝামাপুকুর লেনের একতলা বাড়িতে। শৈশব কেটেছে এলাহাবাদে, সেখানে বাড়িতে পিতৃবন্ধু ইন্দুভূষণ রায় নেপালচন্দ্র রায়ের কাছে ইংরেজি, সংস্কৃত ভাষা শিখেছেন।

কলকাতায় চলে আসবার পর রামানন্দ তাঁর দুই কন্যা, শান্তা ও সীতাকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। সেই দিনের কথা শান্তা দেবী পরিহাসস্নিগ্ধ ভাষায় শুনিয়েছেন।

বেথুন স্কুল থেকে প্রথম ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থিনী শান্তা চট্টোপাধ্যায় নিজস্ব বুদ্ধিবলে বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হয়েছেন। বেথুন কলেজ থেকে আই.এ. পরীক্ষাতেও বৃত্তি পেয়েছেন। তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল অর্থনীতি ও অঙ্কশাস্ত্রে। তখন বেথুন কলেজে তার ব্যবস্থা হয়নি। বি.এ. পরীক্ষায় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান পেয়ে পদ্মাবতী স্বর্ণপদক পেয়েছেন।

১৯২৫-এ অধ্যাপক কালিদাস নাগের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামীর সঙ্গে বিদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বক্তৃতা-সফর করেছেন।

ইতিপূর্বে শান্তা দেবী নন্দলাল বসু ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছেন ; আঁদ্রে কার্পেলের কাছে চিত্রাঙ্কন শিক্ষার সঙ্গে ফরাসি ভাষা শিখেছেন। সেই কালে প্রথমে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সংগীত শিক্ষা করেছেন। সংগীত-সম্মিলনীতে শ্যামসুন্দর মিশ্রর কাছে এস্রাজ বাজনাও কিছুকাল শিখেছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণকর কর্মে শান্তা দেবী যুক্ত ছিলেন। সেখানে 'বাল্যসমাজ' প্রথম প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনি তার সম্পাদক হয়েছিলেন।

ছাত্রী-জীবন থেকেই শান্তা দেবী 'প্রবাসী'র সম্পাদকীয় বিভাগে দীর্ঘকাল কাজ করেছেন। যোগেশচন্দ্র বাগল জানিয়েছেন, শান্তা দেবী পত্রিকার 'মহিলা-মজলিশ' বিভাগের পরিচালক ছিলেন। সজনীকান্ত দাসের সাক্ষ্য-অনুযায়ী, শান্তা দেবী পত্রিকার কবিতা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রেও জানা যায়, কবির কাছ থেকে লেখা আদায়, তার তদারকি, প্রুফ-সংশোধন ইত্যাদি কাজে প্রবাসী পত্রিকায় শান্তা দেবীর বিশেষ ভূমিকা ছিল। গল্প, উপন্যাস রচনা ছাড়াও তিনি 'জগদ্দুর্লভ ভট্টাচার্য' ছদ্মনামে প্রবাসীতে অনুবাদও করেছেন। 'রামানন্দের জ্যেষ্ঠা কন্যা আট-নয় বৎসর ... সহকারী সম্পাদকের কাজ করিয়াছিলেন।' (শান্তা দেবী)

এই গ্রন্থরচনায় শান্তা দেবীর কিঞ্চিৎ দ্বিধা ছিল। 'পিতার জীবনী কন্যার লেখা সহজ নয় বলিয়াই শোভন কিনা বলা কঠিন।' এমনতর সংশয় মনে হতেই পারে, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা। এর পরেই যখন বলেছেন, '...আমি গৃহকোণে জীবন কাটাইয়াছি, বহির্জগতের কাজের মধ্যে কখনও যাই নাই।' তখন আমরা শুধু বিস্মিত হতে পারি, কারণ তাঁর জীবন এবং কর্ম এই মন্তব্যের বিরুদ্ধতা করে

শান্তা দেবী জানিয়েছেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরই ১৯৪৩এর অক্টোবর থেকে প্রত্যেকদিন ৬।৭ ঘণ্টা পরিশ্রম করে এক বছর ধরে এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ ও সমাবিষ্ট করেছেন। পরের বছরেও দৈনিক ৩।৪ ঘণ্টা শ্রম স্বীকার করে লেখা, প্রুফ-দেখা, তথ্যাদির সংযোজন-সংশোধন ইত্যাদি করেছেন। এবং বলতেই পারেন, '..রচনাকার্যে আমি আত্মীয়-বন্ধু কাহারও সাহায্য বা পরামর্শ লই নাই।'

তাঁর এক কন্যা শ্যামশ্রী লালের স্মৃতিচর্যায় জানা যায়, 'সংসারের নানা দায়িত্বের মধ্যেই সময় করে নিয়ে খাটের উপর কত বই, খাতা জড়ো করে মা একটানা লিখে যেতেন।' তিন কন্যা, দুই পুত্র, স্বামী সহ সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব, সেই সঙ্গে অসুস্থ মায়ের সেবায় অন্যত্র প্রতিদিন যাতায়াত তখন শান্তা দেবীর প্রাত্যহিক কৃত্য ছিল। 'আজকালকার সংসারী আমরা ভাবতেই পারি না কী করে মা এত কাজ নিরলসভাবে একটানা করে যেতেন। অথচ নিজের সংসারটাকে এতটুকু অবহেলা করেননি, আত্মীয়স্বজন বন্ধুদের দরকারে সর্বদা এগিয়ে গেছেন।' (শ্যামশ্রী লাল)

এই গ্রন্থ রচনায় শান্তা দেবীর তথ্য সংযুক্তির সঙ্গে ঘটেছে তাঁর দৃষ্টির স্বচ্ছতা এবং ভাষার সবল বেগ।

রামানন্দ সম্বন্ধে একজায়গায় শান্তা দেবী এক আশ্চর্য বিশেষণ একবার মাত্র প্রয়োগ করেছেন, 'বজ্রলেখনী নিবন্ধকার'। আর কোথাও পিতৃদেবকে অবান্তর বিশেষণে ভূষণ পরাবার প্রয়োজন হয়নি। কিংবা 'রামলোচনের ব্রাহ্মণীর নাম ছিল কমলা দেবী' এমত শব্দপ্রয়োগ বিষয়ের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করে।

উপরোক্ত রামলোচন ছিলেন শান্তা দেবীর প্রপিতামহ। পিতৃহীন রামলোচন বালক বয়সে ধনীগৃহে পোষ্যপুত্র হওয়ার সুযোগ পেয়েও 'দারিদ্র্য বরণ করিলেন, ধনীর ঘরে গেলেন না।' রামলোচন টোলে শিক্ষকতা করেছেন ইত্যাদি বিবরণ শেষে শান্তা দেবীর নিজস্ব মন্তব্য হল, 'তাঁহার বিষয়ে চলিত এই গল্পটি তাঁহার বংশধরেরা বিশ্বাস করেন না।'

ভাষাপ্রয়োগে শান্তা দেবীর সুগম্ভীর ছন্দোরক্ষা গ্রন্থের সর্বত্র সমরূপে পরিকীর্ণ হয়ে রয়েছে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামানন্দর সখ্যতা, 'সাধ্বী পত্নীর নিষ্ঠার মতো তাঁহার শ্রদ্ধা প্রীতি ও স্নেহেরও একটা নিষ্ঠা ছিল। বহু কঠিন পরীক্ষাতেও তিনি সেই নিষ্ঠা হইতে চ্যুত হইতেন না।' বা, 'মানুষ বলে, "আগুন কখনো ছাই-চাপা থাকে না।" রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই রকম আগুন, তবু সেই আগুনের উপর জল ঢালিতে আমাদের দেশের একদল বিখ্যাত ও অখ্যাত লোক প্রচুর চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পবনের মতো অগ্নির তেজ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন রামানন্দ।' নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর কলকাতার নাগরিকদের শান্তিনিকেতনে কবি-সংবর্ধনার বর্ণনাক্রমে শান্তা দেবী লিখছেন, '... রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিলেন, কঠিন কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা।...জয়যাত্রার উল্লাস রৌদ্রতপ্ত বালুকার উপর জলস্রোতের মতো এক মুহূর্তে অদৃশ্য হইয়া গেল।'

এরপরেই এই প্রতিভাময়ী নিজের অধিকার ও দক্ষতা নিয়ে লিখতে পারেন, 'এইজন্য আমি জীবনী রচনা করিতে পারি বা না পারি, পিতৃদেবের জীবনীর মালমশলা যতখানি সম্ভব এক জায়গায় জড়ো করিয়া রাখিয়া যাইব স্থির করিয়াছিলাম।... আমার রচনাকে সেইটুকু মূল্যও মানুষ দিলে কৃতজ্ঞ হইব।' হয়ত-বা 'রামানন্দ-চরিত্র' অধ্যায়ে সেই কারণে শান্তা দেবী পিতৃদেব সম্বন্ধে তাঁর অভিমত রচনার চেয়ে সমসাময়িক পত্র এবং ব্যক্তির সাক্ষ্য উদ্ধার করেছেন।

সমগ্র গ্রন্থে যে-একটি জীবনের ক্রমবিকাশ দেখা গেছে, শেষ অধ্যায় তার সারার্থ। কিন্তু 'শেষ অধ্যায়' উজ্জ্বলতর, কারণ এখানে ব্যক্তিগত স্মৃতির সর্বাধিক স্পর্শ রয়ে গেছে।

আত্মীয়-পরিজন পরিবৃত এক শ্রান্ত অথচ সচেতন সংগ্রামীর সমাপ্তি এখানে দেখা গেল। কনিষ্ঠ কন্যা সীতা দেবীর পার্ক সার্কাসে দরগা রোডের বাড়িতে পিতার প্রয়াণ প্রসঙ্গে শান্তা দেবী রামানন্দর অর্ধশতাব্দীকালব্যাপী ভূমিকা নিয়ে বলেছেন :

'এই মরজীবনে মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টায় সকল কল্যাণকর্মে আলোকবর্তিকা হস্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া বিশেষ একটি নামের টিকা তাঁহাব ললাটে পরাইবার কথা মানুষ ভাবে নাই। তিনি দশজনের একজন হইয়া নিজেকে খ্যাতির আলোক হইতে দূরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন, সেইরূপে ভাবেই শান্ত সন্ধ্যায় নিভৃতে এ জীবনের কাজ তিনি শেষ করিয়া গেলেন। তাঁহার শেষ যাত্রায় কোনো সমারোহ হয় নাই।'

এই বিবৃতিতেও কোনো সমারোহ নেই। শুধু এক গম্ভীর স্বরধ্বনিতে নির্বাণের মন্ত্র শোনা যায়।

১৯৮৪-র ৩০ মে একানব্বই বছর বয়সে শান্তা দেবী প্রয়াণ করলেন।

এই গ্রন্থের সংশোধনকালে কোনো কোনো জায়গায় তথ্যের শোধন করা হয়েছে; সে কারণে বক্তব্য বা ভাষায় পরিবর্তন করা হয়নি।

উদধৃতির ব্যবহারে প্রথম প্রকাশের সময়ে মুদ্রিত অক্ষরের পরিমাপে যে তারতম্য ছিল, সেগুলি সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথমদিকে কিছু পৃষ্ঠা সংশোধনের পরে অনেকদিন মুদ্রণকাজ স্থগিত ছিল; পরে দ্রুততার জন্য প্রধানত বানানে সমতারক্ষা এবং সংশোধনের যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। এই কারণে আমরা ক্ষমার্থী।

গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণে লেখিকার কন্যাদ্বয়, পাবমিতা বিশ্বনাথন, শ্যামশ্রী লাল এবং স্বপন মজুমদার, সুবিমল লাহিড়ি, দিলীপ দে, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের সহায়তা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার্য।

পার্থ বসু

লেখিকার নিবেদন

আমার পিতৃদেবের জীবনী লিখিবার চেষ্টা আমার করা উচিত কিনা তাহা লিখিবার পূর্বে বার বার চিন্তা করিয়াছি। আমার সংকোচের প্রধান তিনটি কারণ আছে।

পিতার জীবনী কন্যার লেখা সহজ নয় বলিয়াই শোভন কিনা বলা কঠিন। আত্মীয়প্রীতি ও পিতৃভক্তির বশবর্তী হইয়া অতিরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছি কিনা ভয় হয়, তাই নিজ মতামত ব্যক্ত করিবার পূর্বে ইতস্তত করি।

একবার মনে হয় বেশি বড়ো করিতেছি, আবার মনে হয় সংকুচিত হইয়া সব মহত্ত্বের কথা বলিতে পারিতেছি না। দুই দিকেই বাধা।

তৃতীয় কারণ, আমার অযোগ্যতা। পিতৃদেব ভারতের এবং জগতের বহু হিত চেষ্টা করিয়াছেন ও নানা সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন ; রাজনীতি, ইতিহাস, অর্থনীতি. শিক্ষানীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বহু বিদ্যা তাঁহার নখদর্পণে ছিল। ভারতের এবং জগতের বহু মানুষের সহিত তাঁহার নানা কল্যাণকর্মে যোগ ছিল। আমি গৃহকোণে জীবন কাটাইয়াছি, বহির্জগতের কাজের মধ্যে কখনও যাই নাই, পিতৃদেবের সহিত যুক্ত বহু মানুষের নামও জানি না। সুতরাং এ রকম অবস্থায় আমার লিখিত জীবনী সর্বাঙ্গসুন্দর তো হইবেই না, হয়ত ইহাতে বহু বড়ো রকম ত্রুটি থাকিয়া যাইবে।

কিন্তু এই সকল কারণ থাকা সত্ত্বেও দুইটি বিশেষ কারণে আমি এই কাজে হাত দিয়াছিলাম।

প্রথম কারণ, আমাদের দেশের প্রকৃত মহাপুরুষদের জীবনীর একান্ত অভাব। জাতির ভবিষ্যকে গঠন করিতে হইলে ভিত্তিমূলে যাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের জীবন সর্বদা স্মৃতিপথে জাগরিত রাখা দরকার। আমাদের দেশে সেই চেষ্টার বিশেষ অভাব আছে বলিয়া জীবনী রচনা তো দূরের কথা, জীবনীর মালমশলা সংগ্রহ এবং রক্ষার দিকে মানুষের দৃষ্টি নাই। সমস্ত জীবন যাঁহারা দেশের সেবায় দিয়া গিয়াছেন, মৃত্যুর দুই-এক বৎসর পরেই তাঁহাদের বিষয়ে বহু তথ্য সমূলে নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য আমি জীবনী রচনা করিতে পারি বা না পারি, পিতৃদেবের

জীবনীর মালমশলা যতখানি সম্ভব এক জায়গায় জড়ো করিয়া রাখিয়া যাইব স্থির করিয়াছিলাম। আমার রচনাকে সেইটুকু মূল্যও মানুষ দিলে কৃতজ্ঞ হইব।

দ্বিতীয় কারণ, রামানন্দ-জয়ন্তী-কমিটি এইরূপ একটি জীবনী রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন শুনিয়া আমি রচয়িতার সন্ধানে দেরি হইতে পারে মনে করিয়া সে কার্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হাত দি। কাজ আরম্ভ করিতে দেরি হইলে অনেক মালমশলা নষ্ট হইয়া যায়, এই জন্য আমার একদিনও সময় নষ্ট করিবার ইচ্ছা ছিল না।

আমি ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতেই দৈনিক ছয়-সাত ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া এক বৎসর ধরিয়া জীবনীর মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছি। দ্বিতীয় বৎসরেও দৈনিক তিন-চার ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া লেখা, প্রুফ দেখা, এবং বইটি বার বার পড়িয়া তাহার দোষক্রটি সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছি। এতখানি পরিশ্রমেও আমার নিজের মনোমত করিয়া কাজ করতে পারিয়াছি মনে হয় না। রচনাপদ্ধতি, সংগ্রহ, জীবনের অখণ্ড স্বরূপ ও বিশেষ রূপ প্রদর্শন সম্বন্ধে আমার যে আদর্শ, সে আদর্শের বহু নিম্নে আমার কাজ পড়িয়া আছে ; অনেক বড়ো বড়ো বিষয়ে হাতই দিই নাই। তবু এইটুকু বলিতে পারি আমার সাধ্যমত জীবনীটির মধ্যে কল্পনা বা অনুমানকে আমি স্থান নাই। যাহার লিখিত দলিল নাই বা যাহার সম্বন্ধে আমার নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই, সেরূপ তথ্যকে আমি জীবনীতে স্থান দিই নাই। যাহা অপরের জবানীতে লিখিয়াছি তাহা তাঁহারা সত্য জানিয়াই লিখিয়াছেন, একথা অবশ্য আমাকে ধরিয়া লইতে হইয়াছে।

এই জীবনী রচনায় আমার পিতৃদেবের একটিমাত্র রক্ষিত ডায়েরি (খ্রিঃ ১৮৯০) কৈশোরের একটি ছোট নোট-বুকের পাঁচ-ছয় পৃষ্ঠা লেখা, কয়েকখণ্ড 'ধর্মবন্ধু', শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগার হইতে আনীত 'ধর্মবন্ধু'র সূচী এবং কয়েকটি রচনার নকল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরি হইতে আনীত কয়েক কপি 'ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার' ও 'তত্ত্ব-কৌমুদী'র কিয়দংশ নকল, 'দাসী' পত্রিকা, সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগার হইতে আনীত 'মুকুলে'র সূচী, পৌষ ১৩০৪ হইতে অগ্রহায়ণ ১৩০৬ পর্যন্ত দুই বৎসরের 'প্রদীপ', তৃতীয় বৎসরের কয়েক খণ্ড 'প্রদীপ', ১৩০৮ হইতে ১৩৫০ পর্যন্ত ৪৩ বৎসরের 'প্রবাসী', ১৯০৬ খ্রিঃ হইতে ১৯৪৩ পর্যন্ত 'মডার্ন রিভিয়ু', পিতৃদেবের ও মাতৃদেবীর কয়েকটি চিঠি, পিতৃদেবের লিখিত মাতৃদেবীর অসমাপ্ত স্মৃতিকথা, History of the Brahmo Samaj, সীতা দেবী রচিত 'পুণ্যস্মৃতি' প্রভৃতির সাহায্য লইযাছি। 'প্রবাসী'তে ১৩৫০ সালে যে সকল ভদ্রমহোদয় পিতৃদেবের স্মৃতিকথা লিখিয়াছেন তাঁহাদের নাম আমি যথাস্থানে করিয়াছি। তাঁহাদের নিকট আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগার ও সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারের কাজে শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার ভদ্র আমায় সাহায্য করিয়াছেন, কারণ আমি বাড়ির বাহিরে যাইতে পারি নাই ; শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনের 'ধর্মবন্ধু'র সূচী পাঠাইয়াছিলেন। ইহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। পিতৃদেবের দু-একজন বাল্যবন্ধু

তাঁহার বাল্যকালের কিছু কথা এবং এলাহাবাদের তাঁহার দুই-একজন সহকর্মী ও ছাত্র আমাকে কিছু তথ্য জানাইয়াছে। তাঁহাদের নাম যথাস্থানে করিয়াছি, এখানে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। শ্রীমতী সুনীতি দেবীর নিকট 'দাসী' ও কয়েকটি পত্র পাইয়াছি। আত্মীয়-বন্ধু আরও দুই-চারি জন কিছু তথ্য জানাইযাছেন, সকলের নাম না করিলেও তাঁহাদের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ।

মোটের উপর আমার ধারণা, তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি যতটা চেষ্টা কবিয়াছি তাহার তুলনায় ফল অত্যন্ত সামান্যই পাইয়াছি। পিতৃদেব নিজে কিছুই রাখিয়া যান নাই। যদি 'দাসী', 'ধর্মবন্ধু', 'মুকুল', 'প্রদীপ' এবং বিশেষ করিয়া ৪৩ বৎসরের 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন বিভিয়্যু' না থাকিত আমি যতটুকু কাজ করিয়াছি, তাহার সিকির সিকিও করিতে পারিতাম না। রচনাকার্যে আমি আত্মীয় বন্ধু কাহারও সাহায্য বা পরামর্শ লই নাই।

পিতৃদেব স্বল্পভাষী মানুষ ছিলেন। তাঁহার পরিচিত ও বন্ধুদের আর একটু সহায়তা পাইলে তাঁর জীবনের যে-সকল কথা আমি জানি না, তাহার কিযদংশ সংগৃহীত হইত। বইটির দোষক্রটির জন্য সমস্ত নিন্দাই আমার প্রাপ্য। জীবনী রচনার কোনো বিশেষ পদ্ধতিও আমি অনুসবণ করি নাই, আমার কলমের মুখে যেমন আসিয়াছে তেমনই লিখিয়া গিয়াছি, তাহাতে অনেক বড়ো জিনিস হারাইয়া গিয়াছে, অনেক ছোটো বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। এখন মনে হয় পত্রিকাগুলি পরিচালনার কার্যে গবর্নমেন্টের নিকট তিনি যে সকল বাধা পাইয়াছিলেন তাহার বিষয় আরও লেখা উচিত ছিল। এই সকলের জন্য নিন্দাও আমারই প্রাপ্য। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী' প্রেসে পুস্তকখানি ছাপাইবাব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং আমার আত্মীয় শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চৌধুরী প্রুফ দেখায় আমায় সাহায্য করিয়াছেন। ইহাদের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। বাঁকুড়াবাসী আমার আত্মীয়েরাও কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে ঋণী করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের নিকট পুস্তকের ভূমিকা পাইয়া আমি কৃতজ্ঞ। এই জীবনী রচনায় তিনি আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছেন।

সর্বশেষে পিতৃদেবের বন্ধু স্বর্গীয় নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়কে স্মরণ করি। তিনি "রামানন্দ-জয়ন্তী"র সময় হইতেই পিতৃদেবের জীবনী প্রকাশে উৎসাহ দেখান, পিতৃদেবের মৃত্যুর পর স্বয়ং তাঁহার বিষয় বহু তথ্যপূর্ণ একটি প্রবন্ধ লেখেন। মুখেও কিছু কিছু খবর দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় একটি বড় প্রবন্ধে পিতৃদেবের শান্তিনিকেতেন বাস, বিশ্বভারতীর সহায়তা এবং কলকাতা বাসের বিষয় লিখিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পিতৃদেবের মৃত্যুর চার-পাঁচ মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সুতরাং বহু মূল্যবান তথ্য তাঁহার সঙ্গেই হারাইয়া গেল।

শ্রীশান্তা দেবী

অর্ধশতাব্দীর কথা

বাংলা ১২৯৯-এর বর্ষাকালে 'দাসী' প্রথম প্রকাশিত হয় এবং বাংলা ১৩৫০-এর বর্ষার শেষে রামানন্দ বাংলা দেশের এবং পার্থিব জগতের বন্ধন কাটিয়া পরপারে চলিয়া যান। এই পঞ্চাশ বৎসরের পূর্বেও বাংলা এবং ভারতবর্ষের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহার স্থান ছিল। কিন্তু বিশেষ করিয়া তাঁহার নিজস্ব পত্রিকাগুলির দ্বারা এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরই তিনি বাংলার ও ভারতের সেবা নানা দিক দিয়া করিয়া গিয়াছেন। বাংলার কিম্বা ভারতের নবযুগের আবির্ভাব ১৩০০ সালের সহিত হয় নাই বটে; তৎপূর্বে রামমোহনের যুগেই ভারতে ও বাংলার ইতিহাসে নূতন জীবনের সাড়া দেখা দেয়। কিন্তু অনেকেই বলেন, বাঙালির আধুনিক ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায় এই সময়ই শুরু হয়, নানা ক্ষেত্রে দেশের নবজাগবণ শক্তিশালী বাঙালিদের ভিতর দিয়া এই অধ্যায়েই দেশকে নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষা, নূতনতর চিন্তা, নূতনতর কল্পনাসৃষ্টি ও বহু নূতন সমস্যার মধ্যে টানিয়া আনে। এই যুগই রবীন্দ্রনাথের, জগদীশচন্দ্রের যুগ। এই যুগেই প্রফুল্লচন্দ্র ও রামানন্দ নানা কর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই যুগেই অবনীন্দ্র শিল্পে ভারতের বাণী বলিয়াছেন, এবং সমগ্র ভারতে গান্ধী অহিংসার চিরন্তন ভারতীয় মন্ত্র পুনর্বার ঘোষণা করিয়াছেন। এই যুগেই ব্রজেন্দ্রনাথের দার্শনিক প্রতিভা ভারতীয় সমস্ত চিন্তা ও প্রতিভার ক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার আদি-অন্ত পর্যবেক্ষণ করিয়াছিল। সমসাময়িকদিগের বহু পূর্বে ধরাধাম ত্যাগ করিলেও এই যুগেই বিবেকানন্দেরও অভ্যুদয় এবং অদ্বৈতবাদ প্রচার। শিক্ষাক্ষেত্রে এই যুগেই আশুতোষ স্বাধীনতার ঘোষণা করেন এবং বাঙালির মাতৃভাষার প্রকৃত মর্যাদা দিবার সৎসাহস দেখান। ইংরাজি ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ পর্যন্ত বাংলা দেশে এই যে সব অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষের জন্ম হয় ইঁহাদের চিন্তা, সৃষ্টি ও কর্মের কাল ছিল প্রধানত বিগত অর্ধ শতাব্দী ; সুতরাং ইহাকে একটা বিশেষ যুগ বা বিশেষ অধ্যায় নাম দেওয়া যাইতে পারে।

এই অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া রামানন্দ জাতির সুপ্ত চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করিতে, তাহাকে গতানুগতিকতা ত্যাগ করিয়া আত্মশক্তি ও স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাসী করাইতে

চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি সাধারণ মানুষের অনন্ত সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিতেন এবং অসাধারণ মানুষকেও মানুষ মাত্র বলিয়া বুঝিতেন বলিয়া জাতির হৃদয়ে এই আশা জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ছোটো বড়ো সকল জাতির সকল মানুষের উচ্চতম স্থানে উঠিবার সম্ভাবনা বিধাতা তাহাদের মধ্যে দিয়াছেন, এবং শ্রেষ্ঠতম কোনো মানুষকেই তিনি অভ্রান্ত ও সকল দুর্বলতামুক্ত করিয়া গড়েন নাই। তিনি তাঁহার নিজের উক্তির ও কার্যের দ্বারা তো দেখাইয়াছেনই, উপরন্তু বাঙালি জাতি যে রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক, আর্থিক, আধ্যাত্মিক সকল দিকে উন্নতি লাভের চেষ্টা করিয়াছেন এবং বহুক্ষেত্রে উন্নতির পরিচয় দিয়াছে তাহাব পরিচয় তিনি তাঁহার পত্রিকাগুলির ভিতর দিয়া দিয়াছেন।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই সামান্য পরিবর্তন করিয়া আজ বলা যায়: 'জীবনের নানা দিকে বাঙালি গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যতটুকু কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে, তার সবচেয়ে পূর্ণ পরিচয় এক 'প্রবাসী' ও 'প্রদীপ' ইত্যাদিই দিতে পারে। আর অনেক বিষয়ে বাঙালি যে যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে নি বা পারছে না, বাঙালির চোখের সামনে 'প্রবাসী'ই তাও ধরে দিয়েছে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে উৎকর্ষকামী বাঙালির মানসিক চেষ্টা, চিন্তাশীল বাঙালির মনন, কল্পনাশীল বাঙালির সত্য-শিব-সুন্দরের দর্শন, কবি আর শিল্পী বাঙালির সৃষ্টি, কর্মী বাঙালির সাধনা আর সিদ্ধি—এক কথায় বাঙালির 'কালচর' বা সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষের পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত হয়ে আছে 'প্রবাসী' ও 'প্রদীপে'র দর্পণে।' এক্ষেত্রে মডার্ন রিভিয়ুর কথাও মনে রাখা দরকার।

রামানন্দ তাঁহার পত্রিকাগুলির সাহায্যে শুধু স্বজাতির চিন্তাশক্তিকে জাগাইতে চেষ্টা করেন নাই, তিনি বিশ্বমানবের দরবারে প্রতি মানুষের মনুষ্যত্বের অধিকারের দাবি জানাইয়াছেন, ভারত-ভাগ্যনিয়ন্তাদের বিবেক ও ন্যায় বুদ্ধিকে কশাঘাতে জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ভারতবর্ষের মুক্তি অর্জনের পথে নূতন ও পুরাতন শত শত বাধাকে দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার নিজেব উক্তি ও নিজের লেখনীর সাহায্যেই এ কাজ তিনি করিযা আসিয়াছেন। কিন্তু যেখানে তাঁহার পত্রিকাগুলি বাংলা এবং ভারতের সংস্কৃতির দর্পণরূপে বাঙালি ভারতীয় চিন্তাশীল, সাহিত্য-রসিক, বৈজ্ঞানিক ও রূপদক্ষ প্রভৃতির কীর্তির পরিচয় দিয়া আসিয়াছে, সেখানেও তাহা বিশ্বমানবের দরবারে ভারতের বাণী বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। অতীত ও বর্তমানে কোথায় ভারতবাসীর প্রকৃত গৌরব এবং কোথায় লজ্জা ও অগৌরব, একথা তাঁহার সাজান "পাঁচফুলের বেসাতি" ও তাঁহার নিজের উক্তির সাহায্যে তিনি বারে বারে বাঙালিকে, ভারতবাসীকে ও জগৎবাসীকে দেখাইয়াছেন। তাঁহার পরবর্তী যুগের বহু মানুষ তাঁহারই চিন্তাধারায় ভাবিতে শিখিয়াছে, তাঁহাবই সাজানো ফুলের ডালিকে আদরণীয় বলিয়া পূজা করিতে শিখিয়াছে।

রামানন্দের নিজের পরিচয় ছাড়িয়া দিলেও এই অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাসে তাঁহার

পত্রিকাগুলি কত মানুষের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে ও স্থান নির্ণয় করিয়াছে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ও দার্শনিক অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় তাঁহার অসংখ্য রচনার ভিতর দিয়া জগৎ জানিয়াছে। তাহার অধিকাংশ রামানন্দের পত্রিকাদিতে প্রকাশিত। তাহা না হইয়া শুধু যদি 'গোরা', 'জীবনস্মৃতি', 'অচলায়তন', 'রক্তকরবী' ও 'শেষের কবিতা' প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান প্রধান লেখা এবং তাহাদের ইংরাজি অনুবাদগুলি রামানন্দের পত্রে প্রকাশিত হইত, তাহা হইলেও জগৎবাসীকে রবীন্দ্রনাথের কিছু কম পরিচয় দেওয়া হইত না। কিন্তু তিনি শুধু প্রতিভাশালী লেখকদের লেখা ছাপাইয়া নিজের কাগজগুলিকে সমৃদ্ধ করিবার সময় ইহাদের প্রচার বাধ্য হইয়া করিয়াছেন এই ধারণা যদি কোনো মানুষের হয় তাহা হইলে তাহা অত্যন্ত ভুল ধারণা হইবে। যাঁহারা এই পত্রিকাগুলির সহিত পরিচিত তাঁহারা জানেন রামানন্দ বারে বারে সম্পাদকীয় মন্তব্যে, নিজ স্বাক্ষরিত প্রবন্ধে এবং অপরের লিখিত প্রবন্ধের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্রের কীর্তিমান কয়েকটি শিষ্য, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল ও তাঁহাদের শিষ্যবর্গ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, যদুনাথ সরকার, মহেশচন্দ্র ঘোষ, বামনদাস বসু, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির প্রতিভা, গবেষণা ও প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির প্রচারের জন্য যে পরিমাণ চেষ্টা করিয়াছেন আর কেহ তাহা করেন নাই। বহু স্থলে তাঁহাকে বিদ্রূপ সহিতেও হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ বাংলা ১৩৩৩-এ বলিয়াছিলেন, "নতুন বাংলার আর্টিস্টদের ছবি প্রবাসীতে এবং তাঁর এলবামে, তাঁর রামায়ণে ছাপিয়ে বারে বারে সমালোচকের হাতে তাঁকে তিরস্কৃত হতে হয়েছে।" পরে আর্থিক দিকে লাভবান তিনি যতটুকু হইয়াছেন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি তাঁহার প্রচারের ফলে কেহ বা কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান হইয়াছেন।

রামানন্দ স্বয়ং ১৩২৯ সালে বলিয়াছিলেন, "বাঙালি বৈজ্ঞানিক গবেষকেব গবেষণা সম্বন্ধে আমাব বাংলা ও ইংরেজি মাসিকে যত কথা যত আগে বাহির হইয়াছে ভারতবর্ষের অন্য কোনো কাগজে তাহা হয় নাই। এই কারণে অনেকে আমাকে বাঙালি বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞাপনদাতা বলিয়া সন্দেহ করেন।"

তাহা অপেক্ষা বড় কথা এই যে, দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর উপর ধরিয়া তিনি কত সাধারণ মানুষ ও সাধারণ প্রতিষ্ঠানের যে প্রচার করিয়াছেন তাহার হিসাব কেহ রাখে না। সাধারণ মানুষের মধ্যেও মহত্ত্ব কী কৃতিত্ব দেখিলে তিনি তাহাকে অভিনন্দন করিয়াছেন, সাধারণ অখ্যাত অজ্ঞাত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান নিজের সাধ্যমত জনসেবা যেখানেই করিয়াছে সেখানে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি আনন্দে উৎসাহ দিতে গিয়াছেন এবং বর্হির্জগতে তাহার সেবার কথা জানাইয়াছেন। তিনিই ১৩২৩ সালে বলিয়াছিলেন:

"মানবজীবনের সকল বিভাগেই সাধারণ মানুষ ও অসাধারণ মানুষে বড় বেশি প্রভেদ কল্পনা করা হইয়াছে ;... মেষ ও মানুষের মধ্যে যেমন প্রভেদ আছে, সাধারণ

ও অসাধারণ মানুষে তেমন কোনো প্রভেদ নাই।...আমার মধ্যে বীজরূপে যাহা নাই তাহা আমাকে কেহ দিতে পারে না।" বীজরূপে মহত্ত্বের সম্ভাবনা যেখানেই তিনি দেখিয়াছিলেন সেইখানেই মহীরুহের পার্শ্বে তাহাকে স্থান দিয়া তিনি উভয়কেই সমশ্রেণীর সমান দিয়াছেন। মহাকবি ও মহারথীকে তিনি ক্ষুদ্র সাধারণ মানুষ হইতে ভিন্ন শ্রেণীর জীব ভাবেন নাই। তিনি বলেন,

"কবি আমাকে তাঁহার কবিতা শুনাইয়া আনন্দ দিতে পারেন এইজন্য যে তাঁহার আত্মা ও আমার আত্মা একই রকমের। তাঁহার চিন্তা, ভাব, স্বপ্ন, আনন্দ এই কারণে আমারও হইতে পারে ; তিনি যে রস আস্বাদন করিয়াছেন তাহা আমিও করিতে পারি। কিন্তু তিনি গরুকে নিজের আনন্দ দিতে পারেন না, সে একটা স্বতন্ত্র রকম জীব। কবিকে খুব ভালবাসি, খুব সম্মান করি, কিন্তু অতিমানুষ কোনো গুণ তাঁহাতে আরোপ করিতে পারি না। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী সকলের সম্বন্ধেই এই সব কথা প্রযোজ্য।"

সাধারণ মানুষকে সম্মান করিতেন বলিয়াই তিনি মানুষ আবিষ্কার করিতে পারিতেন। আজকাল যাঁহারা দেশবিখ্যাত তাঁহারা যখন অজ্ঞাতনামা ছিলেন তখন রামানন্দই তাঁহাদের শক্তির সম্ভাবনা দেখিয়ে দেশের পাঁচজনের সম্মুখে তাঁহাদের দাঁড় করাইয়া দিয়াছিলেন।

তাঁহার গুণগ্রাহিতা মানুষ বুঝিতে শিখিয়াছিল বলিয়াই অল্পকালের মধ্যেই 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু'র লেখক হইতে পারাকে মানুষ সৌভাগ্য মনে করিত। সাহিত্যিক আভিজাত্যের চিহ্ন ছিল প্রবাসীর লেখক হওয়া একথা শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচনাতে আছে।

পুণ্যচরিতকথা

"অংতি সংতং ন জহাতি অংতি সংতং ন পশ্যতি" (অথর্ব বেদ, ১০, ৮, ৩২)

অর্থাৎ "যত দিন কাছে আছে তত দিন তাহার গৌরব বুঝিতে পারা যায় না, হারাইলে তখন দেখা যায় তাহার মহিমা।" বাণীটি যখন প্রথম শুনিয়াছিলাম তখন তাহার গভীরতা বুঝি নাই। তার পর জীবনে আঘাতের পর আঘাতে এই বাণীর গভীরতা মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করিতেছি। দৃষ্টিশক্তি হারাইলে বুঝি দৃষ্টির মহিমা, স্বাস্থ্য হারাইলে বুঝি স্বাস্থ্যের মহত্ত্ব, বয়স বহিয়া গেলে বুঝি তাহার মূল্য। মানুষকেও না হারাইয়া আমরা তাহার মূল্য বুঝিতে পারি না। হারাইবার পরেও যদি মূল্য না বুঝি তবে সেই দুঃখের আর স্থান কোথায়? কাছের মানুষকে আমরা যথার্থ ভাবে দেখিতে পাই না।

রামানন্দবাবু নানা মহদ্‌ব্রত লইয়া আমাদের মধ্যেই ছিলেন। তবু মৃত্যুর পরে তাঁহার সমগ্রতার যে মহিমা উপলব্ধি করিবার অবসর এখন আসিয়াছে তাহা এত দিন আসে নাই। আজ তাঁহার জীবনের ছোটোখাটো সুন্দর সুন্দর সব ঘটনাগুলি বিশেষ বিশেষ ভাবে মনে আসিতেছে না। মনে আসিতেছে তাঁহার জীবনের একটি অখণ্ডিত মহিমা ও সার্থকতা।

যে-দেশ লক্ষ্মীমন্ত সেখানে একটি বৃক্ষ গেলে তার স্থানে অন্য আর একটি বৃক্ষাগমের ব্যবস্থা হয়। যে-দেশ শক্তিমন্ত সেখানে এক নেতা চলিয়া গেলে অন্য নেতা দাঁড়ান। কিন্তু এই লক্ষ্মীছাড়া শক্তিহীন দেশে যে মহাপুরুষ চলিয়া যান তাঁহার স্থানে আর নূতন মহাপুরুষ আসিয়া সেই তপস্যার আসন পূর্ণ করেন না। তাই দুঃখ আরও বেশি। রবীন্দ্রনাথ গিয়াছেন, তাঁহার আসন শূন্যই থাকিবে, রামানন্দ গেলেন, তাঁহার আসনও পূর্ণ হইবে না।

আমরা প্রবাসী বাঙালি। প্রবাসী বাঙালির কী দুর্গতি আমাদের বাল্যকালে ছিল, তাহা এখন কেহ অনুমান করিতে পারিবেন না। তখন কাশীতেও এত বাঙালি ছিলেন না। আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রায়ই তীর্থাশ্রয়ী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—কাশীবাস করিয়া কাশীতে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আছেন। তাঁহারা সাহিত্যের ধার ধারেন না, তাই বাংলা ভাষার চর্চাও কোথাও নাই। বাঙালির ছেলেরা উর্দু বা হিন্দি শিখিয়া পরীক্ষা পাস করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা অচল। এইজন্য কাহারও মনে কোনো খেদও নাই। এই ছিল কাশীর অবস্থা। বাংলার বাহিরে সর্বত্রই ছিল এই দুর্গতি।

এমন অবস্থার মধ্যে ১৮৯৮ সালে বাংলা দেশ হইতে একজন রবীন্দ্রভক্ত কাশীতে বেড়াইতে গেলেন। তাঁহারই মুখে রবীন্দ্রনাথের নাম প্রথম শুনিলাম এবং তাঁহার কাছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ প্রথম দেখিলাম।

বাংলা-সাহিত্যেব সঙ্গে তখন আমার কিছুমাত্র পরিচয় নাই, জানি শুধু কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস এবং কাশীখণ্ড গ্রন্থ। আমার নিজের সম্বলের মধ্যে আর ছিল কিছু সংস্কৃত সাহিত্যের ও মধ্যযুগের, কবীর-রবিদাস প্রভৃতির সন্ত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়। এই সম্বলটুকু লইয়াই ববীন্দ্রকাব্য শুনিলাম এবং মুগ্ধ হইলাম। বাংলা-সাহিত্যের টানে বাংলার সংস্কৃতির খোঁজ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এমন সময় খোঁজ পাইলাম এলাহাবাদে প্রবাসী বাঙালিরা একটা বড়ো রকমের আয়োজন করিতেছেন। কাশীতে থিয়ফিক্যাল সোসাইটিতে আগত স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয় এই খবরটুকু দিলেন।

তখন আমার বযস খুবই কম। তবু বাংলা দেশের সংস্কৃতির ও সাহিত্যের খবর মিলিতে পারে এইজন্যই কয়েক দিন পরেই এলাহাবাদে গেলাম। গিয়া প্রথমেই পরিচয় হইল অভিধান-প্রণেতা স্বর্গী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও সরকারী কেরানি গুরুপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে।

শুনিলাম শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয, তাঁহার ভাই মেজর বামনদাস বসু মহাশয় ও কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষ রামানন্দবাবু প্রভৃতি মিলিয়া বাংলা দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে প্রবাসীদের সম্বন্ধ যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয় তাহার জন্য নানাবিধ চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছেন। সর্বত্র শুনিলাম কায়স্থ পাঠশালার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবংশীয় এই অধ্যক্ষটি প্রাচীনকালের শিক্ষা, সদাচার ও সেবার যে আদর্শ আপন চরিত্রগুণে এলাহাবাদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন তাহাতে সকলেই বিস্মিত।

রামানন্দবাবুর সহিত পরিচয় হইল। স্বল্পভাষী, শান্ত সংযত মানুষ। চালচলন একেবারে সাদাসিদা। শ্বেতাশ্বতব উপনিষদে শুনিয়াছিলাম, ব্রহ্মের মধ্যে জ্ঞান-বল-ক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবে যুক্ত (স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ, শ্বেতাশ্বতর, ৬।৮)। ব্রহ্মনিষ্ঠ এই ভক্তটির মধ্যেও দেখিলাম জ্ঞান, চবিত্রবল ও ক্রিয়া একেবারে সহজভাবে এক হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার অগাধ জ্ঞানকে ধারণ ও চালন করিতেছে তাঁহার মহনীয় চরিত্র।

স্থানীয় দুনীর্তি ও দুর্গতি দূব করিবার কাজে রামানন্দবাবুই অগ্রণী, সেখানে ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহ্‌দেদার ও তাঁহার ভাই দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁহার সহায়। জ্ঞানালোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার সাথি শ্রীশচন্দ্র বসু ও বামনদাস বসু মহাশয়। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁহার নির্ভীক সাধনা। সেখানে মালবীয়জি, মতিলাল নেহরু প্রভৃতির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা। একাধারে তিনি এলাহাবাদের সর্বপ্রকার সাধনাকে অগ্রসর করিয়া চলিয়াছেন।

শ্রীশচন্দ্র বসু ছিলেন মহাপণ্ডিত লোক। পাণিনি ব্যাকরণ সম্পাদন করায় তাঁহার নাম সকলেই জানেন। কাশীতে তাঁহাকে চিনিতাম। তাঁহার ভাই বামনদাসবাবুকেও চিনিলাম। একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে বামনদাসবাবু বলিলেন, "স্পেনের একদল মানুষ

প্রাচীন কালে আমেরিকাতে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরেরা স্পেনের প্রাচীন কালের ভাষার ও সাহিত্যের সাধনা এমন ভাবে রক্ষা করিতেছেন যে খাঁটি স্পেনেও প্রাচীন কালের স্পেনদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অর্থবোধের জন্য অনেক সময় আমেরিকার স্পেন-উপনিবেশেই খোঁজ করিতে হয়। আসল স্পেন-সংস্কৃতি নিজ দেশ অপেক্ষা আজ তাহার উপনিবেশেই ভালভাবে সংরক্ষিত। আমরাও যদি ভারতের নানা প্রদেশে ছড়াইয়া-পড়া প্রবাসী বাঙালিদের মূল বঙ্গীয় সংস্কৃতিতে একটি ঐক্য দান করিতে পারি তবে হয়তো বাংলা দেশ এক সময়ে বঙ্গীয় সংস্কৃতি বিষয়ে এই সব স্থান হইতেও অনেক কিছু নূতন আলোক পাইতে পারে।" শ্রীশবাবু বলিলেন, "বৈদিক আর্যেরা ভারতে নানা শাখায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যখন পড়িলেন তখন তাঁহাদের আচার-বিচার কর্মকাণ্ড ও ভাষা শাখায় শাখায় একটু একটু বিভিন্ন হইয়াও যাইতে লাগিল। নানা শাখায় আর্যগণ পরস্পরে যাহাতে পরস্পরকে বুঝিতে পারেন সেই জন্য তখন প্রতিশাখ্যগুলি রচিত। প্রতিশাখার ভাষাগত বিশিষ্টতা রক্ষা করার চেষ্টা বলিয়াই তাহার নাম 'প্রতিশাখ্য'।"

বামনদাসবাবু বলিলেন, "মিশর, পারস্য, ভারত প্রভৃতি দেশের উপনিবেশে মুসলমান সাহিত্য ও সাধনার এমন অনেক জিনিস জন্মলাভ করিয়াছে যাহা আরব দেশের পক্ষেও যত্নে দেখিবার মতো।"

এইরূপ চমৎকার আলাপের মধ্যেও রামানন্দবাবু চুপ করিয়া কি একটা গভীর চিন্তায় ডুবিয়া রহিলেন। বামনদাসবাবু বলিলেন, "রামানন্দবাবু, আপনি তো কিছু বলিতেছেন না। আপনার কি কিছু বলিবার নাই?" রামানন্দবাবু বলিলেন, "এই সব কথার পর বলিবার আর কি থাকিতে পারে? কিছুই বলিবার প্রয়োজনও নাই। ভাবিতেছি এখন আমাদের কর্তব্য কি? আপনারা উভয়ে পণ্ডিত মানুষ, আমি সেখানে আপনাদের নাগাল যদি না-ও পাই তবু সাধনার দ্বারা আমি আমার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে পারি।"

শ্রীশবাবু ও বামনদাসবাবু উভয়ে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আপনার এই বিনয়ের কোনো অর্থই নাই। এখানকার লাইব্রেরির বইগুলির বিষয় আমাদের চেয়ে আপনি বেশি জানেন। তবে আমরা জানিয়াই তৃপ্ত, আপনি জানিয়াই নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করেন না। তাহা কাজে পরিণত করিতে না পারিলে আপনার অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হয় না। আপনি একাধারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণের ন্যায় আপনার জানিবার স্পৃহা এবং ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সেই জ্ঞানকে অশ্বমেধের অশ্বের মত সর্বক্ষেত্রে জয়ী করিয়া আনিতে চান।"

রামানন্দ বলিলেন, "ব্রাহ্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি আমি করি না। বড়ো জোর আমি শূদ্র। সেবাই আমার কাজ। তাই দাসাশ্রমের কাজ লইয়াছিলাম। 'দাসী' পত্রিকা চালনার যে কাজ সেই কাজই আমাকে মানায়।"

বহুদিন পরে শান্তিনিকেতনে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রামানন্দবাবুকে বলিয়াছিলেন, "বিরাট পুরুষের চারি অঙ্গে চারি বর্ণের মূলাধার। আপনার মধ্যেও তেমনি ব্রাহ্মণের মনীষা, ক্ষত্রিয়ের নির্ভীক সাধনা, বৈশ্যের জ্ঞান-ভাণ্ডার এবং শূদ্রের

ঐকান্তিক সেবা আছে। আপনি সেই হিসাবে পরিপূর্ণ মানুষ। শুধু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হইলে এমন পরিপূর্ণতা হইত না।''

যাহা হউক, বামনদাসবাবুদের বৈঠকখানায় সেই দিনের কথোপকথনে বুঝিয়াছিলাম, এই স্বল্পবাক মানুষটির মধ্যে যেমন জ্ঞানের গভীরতা তেমনি চবিত্রে দৃঢ়তা, তেমনি সেবার আগ্রহ, সমানভাবে বিদ্যমান। আমাদের দেশে জ্ঞান ও মনীষা তবু দেখা যায়। চরিত্রই আমাদের দেশে দুর্লভ। অথচ এখন সবচেয়ে এই দেশে চরিত্রই প্রয়োজন।

এলাহাবাদে শ্রীপঞ্চমীর সময় বাঙালিদের একত্র করিয়া যে সাহিত্য-সংগীত শক্তিচর্চা প্রভৃতির আয়োজন তাঁহারা যেমন সুন্দর ভাবে করিয়াছিলেন আমরা কাশীতে চেষ্টা করিয়াও তেমনটি করিয়া উঠিতে পারি নাই। প্রবাসী বাঙালিদের দুর্দশা দেখিয়াই তাঁহারা সেই সব দেশের জন্য যে-সব চেষ্টা করিতেছিলেন ক্রমে তাহা হইতেই 'প্রবাসী' পত্রের এবং প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের উদ্ভব হয়। এই সব উৎসবে উৎসাহী বলিয়া তখন বুঝিতে পারি নাই যে রামানন্দবাবু ব্রাহ্ম।

১৯০০ সালে এলাহাবাদে অর্ধকুম্ভ হয়। সেবার মাঘ মাসে এলাহাবাদে গিয়াছিলাম। সেই বারও রামানন্দবাবুকে দেখিবার সুযোগ খুঁজিয়াছি এবং দেখিতে পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছি। ১৯০০ সালের মাঘ মাসে একদিন ভীষণ শিলাবৃষ্টি হইল। মাঘ মেলার কুম্ভ-যাত্রীরা কেহ কেহ শীতেই মারা গেল। তাই রামানন্দবাবুকে সেই বারে নানাবিধ মানবসেবার কাজেই ব্রতী দেখিলাম। কথাবার্তা শুনিবার অবসর বড়ো একটা হইল না। আমাদের তখন বয়স অল্প। তাই তাঁহার স্বাধীন ভাব, নির্ভীক সাধনা এবং সেবাপরায়ণতা আমাদের চিত্তকে আরও ভক্তিপ্রণত করিল।

ব্রাহ্ম কী তাহা তখন জানিতাম না। আমাদের ছেলেবেলায় আমরা কাশীর বাহিরেব খোঁজখবর কিছুই রাখিতাম না। আমাদের চারিদিকে দেবমন্দির, শাস্ত্রপাঠ, গঙ্গাস্নান, পূজাসন্ধ্যা-ব্রত প্রভৃতির অনুষ্ঠান। কাজেই ব্রাহ্মসমাজের কথা কিছুই জানি না। ক্রমে বুঝিলাম ব্রাহ্ম ধর্ম হিন্দু ধর্মেরই একটি বিশুদ্ধ ও উদার রূপ।

রামানন্দবাবু সেইরূপ ব্রাহ্মই ছিলেন। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র এবং সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল অথচ তিনি একজন খুবই যুক্তিবাদী (rational) মানুষ ছিলেন। জাতিপংক্তি তিনি মানিতেন না। তিনি মনে করিতেন জাতিপংক্তি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বড়ো কথা নহে, এই জন্য পঞ্চনদ প্রদেশের ''জাতপাত তোড়কের দল'' তাঁহাকে সভাপতি করেন। অথচ হিন্দু মহাসভার সঙ্গে তিনি গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। দুই বার তিনি তাহার সভাপতি হন। এলাহাবাদের ও পশ্চিমের বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁহার গভীর প্রীতি ছিল। মালবীয়জি নিষ্ঠাবান হিন্দু। তিনি চিরদিন রামানন্দবাবুর একজন অনুরাগী বন্ধু। মাঘ মেলাতে ও কুম্ভের মেলাতে যে-সব সাধু-সন্ন্যাসী আসিতেন তাঁহাদের মধ্যে ভালো ভালো সাধুদের প্রতি রামানন্দবাবুর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাই তাঁহার বাড়ি তীর্থযাত্রী আত্মীয়স্বজন এমন কী অপরিচিত প্রয়াগযাত্রী লোকেরও আশ্রয়-স্থান ছিল। তিনি তাঁহাদের সব তীর্থকৃত্যের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

অন্য কয়জন ব্রাহ্ম এবং রামানন্দবাবুকে দেখিয়া ব্রাহ্ম সম্বন্ধে আমার মত পরিবর্তিত হইল।

হিন্দু সমাজের বিভিন্ন ঋতুর পূজা, অর্চনা, উৎসব, যাত্রা, কথকতা, কীর্তন, রামায়ণ গান প্রভৃতির প্রতি রামানন্দবাবুর গভীর অনুরাগ ছিল। ব্রাহ্মসমাজে এই সব উৎসবানন্দ না থাকাতে ছেলেমেয়েদের মন যে নীরস হইয়া যায় তাহা তিনি বুঝিতেন এবং এই জন্য ব্রাহ্মসমাজেও নানা ভাবে উৎসব ও ছেলেমেয়েদের নির্দোষ আমোদ ও উৎসবের প্রবর্তন চেষ্টা তিনি করিয়াছেন।

যাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রামানন্দবাবু তাঁহার যৌবনের সাধনা গ্রহণ করিলেন, সেই রামমোহনও ছিলেন ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির একজন মহাভক্ত। কিন্তু তাঁহার প্রাচীন কালের ভক্তি তাঁহাকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রতি ভক্তিহীন বা দায়িত্বহীন করে নাই। ভূতভব্যবর্তমান জ্ঞানকে যুক্ত না করিলে পূর্ণ যোগী হওয়া যায় না। যোগী হইলেই তাঁহার ত্রিকালদৃষ্টি খুলিয়া যাইবে। সাধকেরও সাধনাতেও ঠিক তাই ত্রিকালের প্রতি কর্তব্য পূর্ণ করা চাই। রামমোহন যেমন সনাতন, তেমনি আধুনিক, তেমনি ভবিষ্যতের। তাঁহাদের এক যুগ অন্য যুগ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী এই ত্রিধারার যুক্তবেণী হওয়াতেই প্রয়াগ হইল মুক্তিতীর্থ। তেমনি ত্রিযুগের যুক্তবেণীর সাধক রামমোহন ও রামানন্দ মুক্তির দীক্ষা দিতে পারিয়াছেন।

একই কালে 'প্রবাসী'-সম্পাদকরূপে ছিলেন তিনি বঙ্গ-সংস্কৃতির উপাসক এবং 'মডার্ন রিভিয়ু'র সম্পাদকরূপে ছিলেন তিনি সারা ভারতের ব্রতসাধক। ভূত ও ভব্যের সাধনার মতো একই সঙ্গে রামানন্দ এই দুই সাধনাও যুক্ত করিয়াছিলেন। সূর্যের আহ্নিক ও বার্ষিক গতিতে যেমন কোনো বিরোধ নাই তেমনি তাঁহার মধ্যে এই বিষয়ে কোনো বিরোধ কখনও দেখি নাই। একই নারী একসঙ্গে মাতা-পত্নী ও কন্যার ব্রত সুচারু রূপে সাধন করিতে পারেন। নানাবিধ তথাকথিত বিরোধ রামানন্দবাবুর মহত্ত্বের মধ্যে একটি অপূর্ব ঐক্য দান করিয়াছিল।

প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল বলিয়াই আমাদের মধ্যে যেখানে যে দোষ-ত্রুটি আছে তাহা দূর করিবার জন্য তাঁহার এত আগ্রহ ছিল। আমাদের সমাজে তিনটি ত্রুটির কথা তাঁহার মনে সর্বদা দুঃখ দিত। শিশুদের দুর্গতি, নারীর দুঃখ ও নিম্নশ্রেণীর দুঃখ।

একবার রামানন্দবাবু বলিয়াছিলেন, "ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি আমার যেরূপ শ্রদ্ধা তাহা আমার পক্ষে বুঝাইয়া বলা কঠিন। প্রাচীন ভালো জিনিস সবই যাহাতে বজায় থাকে তাহাই আমি চাই তবে আমাদের দেশে শিশুদের নিরানন্দ জীবন আনন্দময় করিতে ও শিশুদের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কবিগুরু যাহা করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। সেরূপ কৃতিত্বের দাবি আমার নাই। ভারতীয় নারীর কথা লইয়া কবিগুরুর যে সাহিত্যরচনা তাহাও অপূর্ব। সেরূপ কিছু আমি যদিও করিতে পারি নাই, তবু আমি চিরদিন নারীদের ও শিশুদের দুর্গতি দূর করিবার কথা আমার সব লেখাতেই বলিয়াছি। আমার কাগজ দুইখানিতে দেশের নিম্নশ্রেণীর প্রতি যাহাতে অবিচার না হয় তাহার জন্যও চিরদিন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

"সংগীত ও কলার আনন্দ-রশ্মিপাতে যাহাতে শিশুদের ও দেশের চিত্তকমল বিকশিত হয় তাহার জন্যও আমার একান্ত আগ্রহ ছিল, এই জন্য আমি আমার 'প্রবাসী'র আরম্ভেই অজন্তা চিত্রাবলীর পরিচয় দিয়া শুরু করিয়াছিলাম। ব্রাহ্ম-সমাজেও আমি নানাভাবে আনন্দ-উৎসবের প্রবর্তন চেষ্টা করিয়াছি।"

ইহাতেই বুঝা যায় মহাভারত, রামায়ণ, আরব্য উপন্যাস প্রভৃতি বিশেষ ভাবে শিশুদের উপযোগী করিয়া রামানন্দবাবু কেন সম্পাদন করিয়াছিলেন।

অন্য সকলে একটুকু কাজ করিলেই তৃপ্ত হন, রামানন্দবাবুর সেই স্বভাব নয়। তিনি যাহা করিতেন তাহাতে আপনাকে একেবারে ঢালিয়া না দিয়া পারিতেন না।

প্রবাসী বাঙালির অন্তরের সব কথা প্রকাশিত করিতে, তাহাদের সব দুঃখ-দুর্গতি দূর করিতে, তাহাদের জীবনের অন্ধকারকে আলোকময় করিতে, সকল প্রবাসী বাঙালির মধ্যে একটি মৈত্রী ও সংহতি স্থাপন করিতে ১৯০১ সালে রামানন্দবাবু **'প্রবাসী'** পত্রিকাখানি বাহির করিলেন।

তাহার পর বৎসর এলাহাবাদে ভীষণ প্লেগ। তবু আমাকে একবার বাধ্য হইয়া এলাহাবাদে যাইতে হইল। তখন আমি রামানন্দবাবুর বাড়িতে গিয়া তাঁহার সহিত কিছু আলাপ করি। অল্পভাষী রামানন্দবাবু এত সহৃদয় ছিলেন যে কম কথায় কোনো অসুবিধা হইত না।

সেই সময় দেখিলাম বামনদাসবাবুর ও শ্রীশবাবুর বিরাট গ্রন্থাগারকে তাঁহার কাজের জন্য তিনি তন্ন তন্ন করিয়া ঘাঁটিয়া নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে অপূর্ব সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জ্ঞানভাণ্ডার হয়তো অনেকেরই থাকিতে পারে, কিন্তু নব নব উদ্যোগের জন্য সাহস ও নূতন সব মহাসত্যকে চিনিবার মতো মনীষা তো সকলের থাকে না।

ইহার কিছু দিন পূর্বে শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এলাহাবাদে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে রামানন্দবাবুর পরিচয় হইতেই রামানন্দ বলিলেন, "প্রবাসীকে সচিত্র করিতে চাই, আপনাদের ছবিগুলি যদি পাই তবে তাহা ছাপিবার ব্যবস্থা করিতে পারি।" এই নূতন প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে হয়তো তাঁহার বিপদ হইতে পারে অবনীন্দ্রনাথ তাঁহাকে তাহা জানাইলেন, তবু রামানন্দবাবু ভয় পাইলেন না। তখন নানাবর্ণ চিত্র হয় নাই। বাংলা দেশে তখন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় হাফটোন লইয়া ব্রতী ছিলেন। কাজেই এই সব নানাবর্ণের চিত্র কী ভাবে ছাপা যায় তাহার পরামর্শ করিতে রামানন্দবাবু গেলেন ইন্ডিয়ান প্রেসের মালিক চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ের কাছে।

চিন্তামণিবাবু ও রামানন্দবাবু দুই জনে পরস্পরের সহায় হইলেন। রামানন্দবাবুর অন্তরে দেশীয় শিল্পসাহিত্যের সেবার প্রেরণা। সেই প্রেরণা ও ভগবানের আশীর্বাদ লইয়া বিনা পুঁজিতে রামানন্দবাবু অসীম সাহসিকতার সহিত ইন্ডিয়ান আর্ট নামে প্রসিদ্ধ এই নূতন প্রণালীর ছবিগুলি ছাপিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্ডিয়ান আর্ট তখন দারুণ প্রতিকূলতার পথে অগ্রসর হইতেছে। অবনীন্দ্রবাবুর নিজ বাড়িতেও এই ছবির প্রতি তখন ছিল দারুণ প্রতিকূলতা। শুধু গগনেন্দ্র অবনীন্দ্র-সমরেন্দ্র তিন ভাই

পরস্পরের সহায় এবং রবীন্দ্রনাথ আছেন অভয়দাতা। তবু রামানন্দবাবু ভারতীয় এই শিল্পরীতির ভিতরের সার সত্য উপলব্ধি করিলেন এবং দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিলেন। আজ যে ঘরে ঘরে ইন্ডিয়ান আর্ট ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহার কারণ 'প্রবাসী' আর 'মডার্ন রিভিয়ু'। কলামগুলীর কোনো কাগজের চেষ্টায় হইলে আজ পর্যন্ত এই সব চিত্র দুই-চার জন মাত্র বিশেষজ্ঞের মধ্যে আবদ্ধ থাকিত।

রামানন্দবাবু তো শিল্পী নহেন তবে এই নবশিল্পের মহত্ত্ব তিনি বুঝিলেন কেমন করিয়া? অল্পবাক হইলেও রামানন্দবাবুর মধ্যে চমৎকার রস ও সৌন্দর্যের জ্ঞান ছিল। এবং ঘনিষ্ঠ হইয়া দেখিয়াছি অন্তরঙ্গদের মধ্যে তিনি বেশ মন খুলিয়া মজলিশও জমাইতে পারিতেন। সেই শক্তিটা তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে ক্রমশ পরিণত হইতে দেখিয়াছি। এই সব কথা প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে পরিচয় হওয়া মাত্র তিনি ইহাকে তাঁহার পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা সমর্পণ করিলেন। চারিদিকের নিন্দা গঞ্জনা প্রভৃতি কিছুই তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। যেখানে শ্রদ্ধা করিতেন সেখানে আপনাকে নিঃশেষে দান করিবার মতো মনে বলিষ্ঠতা এই রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণটির ছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার এমন একটি অনুরাগ ছিল যে তাহার জন্য তিনি কোনো বিপদ বাধাতেই ভীত হন নাই ও বিরুদ্ধ কোনো সমালোচনাতেই টলেন নাই।

এই বলিষ্ঠ স্বদেশানুরাগের জন্যই ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁহার গভীর একটি যোগ ঘটিল। ঠিক সাল আমার মনে নাই, বোধ হয় ১৯০৬ সালে ভগিনী নিবেদিতা কিছু দিন কাশী তিলভাণ্ডেশ্বরে একটি বাড়িতে বাস করেন। তিনি এক দিন রামানন্দবাবুর 'প্রবাসী'র প্রচুর প্রশংসা করিলেন। ভগিনী নিবেদিতা কেমন করিয়া 'প্রবাসী'র প্রশংসা করিলেন ইহাই ভাবিতেছিলাম, কারণ 'প্রবাসী' তো বাংলা কাগজ। তবু দেখিলাম 'প্রবাসী'র সব মতামত, সব খোঁজ-খবর তিনি রাখেন এবং রামানন্দবাবুর মহত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বেশ সচেতন।

ভগিনী নিবেদিতা এক দিন কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন, "এই যে ব্যক্তিটি এখন শুধু বাংলা ভাষায় বাংলার সুখ-দুঃখের কথা লইয়াই ব্যস্ত আছেন, এমন এক দিন আসিবে যখন তিনি সারা ভারতের বেদনা প্রকাশের ভার লইবেন। বিধাতা তাঁহাকে সেই যোগ্যতা দিয়াছেন এবং বিধাতার এতখানি দান কখনো ব্যর্থ হইবে না। ইঁহার মনীষা ও ইঁহার চরিত্র একদিন আরও প্রশস্ততর সাধনাক্ষেত্র খুঁজিবেই খুঁজিবে।"

হয়তো এই প্রেরণার তাগিদ অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়াই এই সময়ে রামানন্দবাবু কায়স্থ পাঠশালা কলেজের প্রিন্সিপালের পদ ত্যাগ করেন। ইহাও সত্য যে কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও তাঁহার মতভেদ ঘটিতেছিল। তবুও তখন তিনি পরিবার-ভারগ্রস্ত, আত্মীয়জনদিগকেও অনেক সাহায্য করিতে হয়, 'প্রবাসী'তে তখনও লাভ দাঁড়ায় নাই। কিন্তু এই তেজস্বী ব্রাহ্মণ এই সব কিছু না ভাবিয়া তাঁহার কর্মে ইস্তফা দিলেন। ইহাতে আর একজন রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণের কথা মনে হয়, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। উভয়েরই জন্মভূমি রাঢ়দেশে, কাছাকাছি স্থানে। এই তেজস্বিতার জন্যই তিনি লিগ অফ নেশনস-এ নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াও পাথেয় বাবদ বহুসহস্র

টাকা প্রত্যাখ্যান করিলেন। সরল অনাড়ম্বর ব্রাহ্মণ বলিয়াই তিনি নিজের এই স্বাধীনতাটুকু বলি দিলেন না। এতগুলি টাকা অস্বীকার করা বড়ো সহজ কথা নয়।

এই ঘটনার পরেই ১৯০৭ সালের জানুয়ারি মাসে রামানন্দবাবু সমস্ত ভারতের অন্তরের বেদনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য 'মডার্ন রিভিয়ু' কাগজখানা বাহির করিলেন। তখন তাঁহার হাতে অর্থ নাই, চাকুরি ছাড়িয়াছেন, অথচ 'প্রবাসী'র সঙ্গে 'মডার্ন' রিভিয়ু'রও দায় কাঁধের উপবে। সকল দায় তিনি নির্ভয়ে গ্রহণ করিলেন।

তবে সকলের উপরে ছিল তাঁহার আপনার অন্তরের প্রেরণা, স্বদেশপ্রীতি ও ভগবানের উপর নির্ভর।

পবে 'মডার্ন রিভিয়ু' বাহির হইবার পর ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে দেখা হইলে আমি বলিয়াছিলাম, "আপনার সেই ভবিষ্যদ্বাণী এত দিনে সফল হইয়াছে। কিন্তু আপনি এত আগে হইতে কি করিয়া এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন?" ভগিনী নিবেদিতা বলিলেন, "গৃহলক্ষ্মী যখন ঘরের প্রদীপটি জ্বালেন তখন ঘরের সেবার মতোই তাহাতে আলোকশক্তি দেন। এই যে একটি প্রদীপ জ্বলিল দেখিলাম অপরিসীম তাহার শক্তি। বুঝিলাম ঘরের প্রয়োজন নির্বাহ করিয়াই ইহার সার্থকতা শেষ হইবে না। তখনই বুঝিলাম এই প্রদীপখানি একদিন ঘরের বাহিরে আকাশ-প্রদীপ হইবে। আলোকস্তম্ভের মহাদীপের মত যেই শক্তি, তাহার কাজ কি ঘরের কোণের সামান্য সেবাতেই নিঃশেষিত হয়?"

ভগিনী নিবেদিতা আর এক দিন বলিয়াছিলেন, "ভারতের অন্তর্গূঢ় ব্যথাকে প্রকাশের ভার যাঁহাকে বিধাতা দেন তাঁহার কি আর চাকুরি করা চলে? শুধু বাংলার কথা বলিয়াই তাঁহার নিষ্কৃতি নাই, তাঁহাকে সকল ভারতের কথা বলিতে হইবে এবং সকল জগতের কথাও ভুলিলে তাঁহার চলিবে না। তিনি বাঙ্গালি, তিনি ভারতীয়, তিনি বিশ্ববাসী!"

শুনিয়াছি এক সময় তিনি অন্ধদেব জন্য অক্ষর রচনা করিয়াছিলেন। এখন তিনি ভারতের অন্তর্গূঢ় মূক বেদনাকে প্রকাশ করিয়া দিতে চাহিলেন। আমাদের দেশে চলিত কথায় আছে ভগবানের কৃপায় "অন্ধে দেখে বোবায় গায়।" তাঁহার মধ্যেও অন্ধকে দেখাইবার এবং বোবাকে বলাইবার এই যে সাধনা তাহা ভগবানেরই প্রেরণা বলিয়া তাঁহাকে আজ নমস্কাব করি।

এলাহাবাদ এই মুক্তসাধককে কোনো বাঁধনেই বাঁধিতে পারিল না। ১৯০৮ সালে তিনি কলিকাতায় আসিলেন। ঘটনাক্রমে আমিও ১৯০৮ সালে পঞ্চনদ প্রদেশের হিমালয় ছাড়িয়া শান্তিনিকেতনে আসিলাম। এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামানন্দবাবুর যে ঘনিষ্ঠ যোগ তাহাতে আমাদের সঙ্গে তাঁহার যোগ আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

সূচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

ভারত-মুক্তিসাধক
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
ও
অর্ধশতাব্দীর বাংলা

রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা

'মহাপুরুষ' হইতে হইলে কী কী গুণ থাকা চাই? আকাশের মতো উদার মন, অগ্নিব মতো নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, পর্বতের মতো অচল সত্যনিষ্ঠা, শিশুর মতো সরল বিশ্বাস, মাতা ধরিত্রীর মতো সর্বংসহা ভালোবাসা, বজ্রের মতো কঠোরতা এবং কুসুমের মতো কোমলতা। ইহার উপরে যদি বিধাতার মঙ্গলবিধানে স্থির বিশ্বাস থাকে, নিষ্কম্প দীপশিখার মতো তেজস্বিতা থাকে, শাণিত অস্ত্রের মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচারশক্তি থাকে, নীরব মানবসেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার সাধনা থাকে তাহা হইলে তাহার তুলনা পাওয়া শক্ত। এইরকম মানুষ আমাদের এই বঞ্চিত দুর্ভাগ্য দেশে জন্মিয়াছেন একাধিকবার। এইরকমই একজনের কথা আজ বলিতেছি। তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার প্রাণের স্পর্শ এখনও দেশের মাটির উপর হইতে মিলাইয়া যায় নাই। কিন্তু এই দেশের ক্ষীণস্মৃতি মানুষ হয়তো আর অল্পদিনেই তাঁহাকে ভুলিয়া যাইবে। মনে রাখিবে না যে তাহাদের এই জীবনের বহু আনন্দ-সম্পদ ও চিন্তাধারার পিছনে আছে তাঁহার জীবনব্যাপী প্রচেষ্টা ও সাধনা।

প্র থ ম অ ধ্যা য়

পূর্বকথা

শাল পলাশ-শোভিত বাঁকুড়ার রাঙামাটি, উঁচুনীচু পাহাড়ে দেশ, মাঝে মাঝে উপলবহুল ক্ষীণ জলধারা কিংবা অন্তঃসলিলা বিস্তীর্ণ নদীর বালুর চর আর বনে জঙ্গলে দিঙ্‌নাগদের মতো বিরাট কালো পাথরের স্তূপ ; বাংলা দেশের সাধারণ রূপের মতো নয়। এই রকম দেশ বাঁকুড়া। ইহা ব্রাহ্মণপ্রধান দেশ। বাঁকুড়া শহরের একটি ব্রাহ্মণপ্রধান পাড়া পাঠকপাড়া। এখানকাব অনেক অধিবাসী উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়া কয়েক পুরুষ বাঁকুড়ায় বাস করার পর খাঁটি বাঙালি হইয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহাদের কথাবার্তার মধ্যে হিন্দুস্থানি কথার নমুনা এখনও পাওয়া যায়। দুই-এক পুরুষ আগেও তাঁহাদেব বাড়ির ছেলেমেয়েদের খাঁটি হিন্দুস্থানি ব্রাহ্মণের পরিবারে বিবাহ হইত। বর-কন্যা পরস্পরের ভাষা জানে না অথচ বিবাহ হইয়াছে এবং তার জন্য বহু বেদনা পাইয়াছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না। আজকালও এ-রকম বিবাহ ইহাদের মধ্যে চলে শুনিয়াছি। পাঠকপাড়ার জমিদার প্রয়াত কৃষ্ণপ্রসাদ পাঠক অষ্টাদশ-পর্ব পুরাণাদি পাঠ করিবার জন্য কলিকাতার নিকটস্থ চাণক হইতে সর্বানন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ-সন্তানকে সভাপণ্ডিত করিয়া আনেন। সর্বানন্দের ঊর্ধ্বতন চতুর্থ পুরুষ ছিলেন নবদ্বীপের পদ্মগর্ভ, পদ্মগর্ভের চতুর্থ পুত্র সন্তোষ, সন্তোষের পুত্র রামচন্দ্র, রামচন্দ্রের পুত্র সর্বানন্দ। সর্বানন্দ তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্র রামলোচনকে ৭।৮ বৎসরের রাখিয়া অকালে

পরলোক যাত্রা করেন। বালক রামলোচনকে ধনীর ঘরে পোষ্যপুত্র লইবার চেষ্টা হয় শুনিয়াছি, কিন্তু তেজস্বী বালক আপনার পৈত্রিক ভিটার উপর কুটির বাঁধিয়া কাঁটার বেড়ার দরজা দিয়া দিন কাটানোও পরের কৃপাব চেয়ে ভালো বলিয়া মনে করিলেন। তিনি দারিদ্র্য বরণ করিলেন, ধনীর ঘবে গেলেন না। (তাঁহার বিষয়ে চলিত এই গল্পটি তাঁহাব বংশধরেরা সকলে বিশ্বাস করেন না।) রামলোচন কৃষ্ণপ্রসাদ পাঠক প্রভৃতি পিতৃবন্ধুদের চেষ্টায় বর্ধমান ব্রহ্মচর্য টোলে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ক্রমে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হইয়া উঠিলেন। তিনি টোলের অধ্যাপকের কাজ করিতেন। রামলোচনের ব্রাহ্মণীর নাম ছিল কমলা দেবী। তাঁহাদের চারিটি পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন। পুত্রদেব নাম হবিনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, শম্ভুনাথ ও শ্রীনাথ। গঙ্গানারায়ণ বড়ো অধ্যাপক হইয়া উঠিযা বাঁকুড়ায় টোল করেন। শম্ভুনাথ মস্ত পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার নিজ জমি ও বাড়িতে বাঁকুড়া কামারপাড়ায় টোল স্থাপনা করিয়াছিলেন। ইনি দীর্ঘায়ু পুরুষ ছিলেন। অতি বৃদ্ধ বয়সে যখন তাঁহার স্মৃতিশক্তি ও বিচারবুদ্ধি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল তখন বাড়ির ছেলেমেয়েরা তাঁহাকে তেল মাখাইয়া কোলে করিয়া তুলিয়া আনিয়া রোদে বারান্দায় বসাইয়া দিত আবার কিছু পরে ঘরে তুলিয়া লইয়া যাইত। তখন তাঁহার সমস্ত শরীরে চামড়া শুকাইয়া ভাঁজ ভাঁজ হইয়া গিয়াছে—শবীর এমন হইয়া গিয়াছিল যে বসিয়াও সিধা থাকিতে পাবিতেন না। শম্ভুনাথের পুত্র রামনাথ টোলের খুব মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন, বাঁচিয়া থাকিলে তিনি বড়ো অধ্যাপক হইতেন নিশ্চয় ; কিন্তু তাঁহার অকালেই মৃত্যু হয়। রামলোচনের চারিটি পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীনাথ মায়ের কোলের ছেলে বলিয়াই বোধ হয় টোলে পড়া কি সংস্কৃত শিক্ষাব উৎসাহ দেখান নাই। বাংলা লেখাপড়া হিসাবনিকাশ ইত্যাদি শিখিয়াই তিনি বিদ্যাচর্চা সাঙ্গ করেন। ইংরাজি শিক্ষার পথেও যান নাই। বড়ো ভাইরা পণ্ডিত মানুষ, তাঁহাদের ভবিষ্যতের জন্য তাঁহারা চিন্তিত ছিলেন না। ছোটো বসতবাটিটি ছোটো ভাইকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা পিতার কিংবা স্বক্রীত জমির এক এক অংশে নিজেদের ঘরদোর বাঁধিয়া লইলেন। কিন্তু শুধু ঘরদ্বার ও কিছু ধানচালেই তো মানুষের দিন চলে না। কিছু অর্থ না হইলে সংসার চলে কী প্রকারে? শ্রীনাথ অসাধারণ বলশালী পুরুষ ছিলেন, তাঁর বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহযষ্টি ও অনিন্দ্য মুখশ্রী সহজেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তিনি স্থির করিলেন দৈহিক শক্তির সাহায্যেই জীবনযাত্রা নির্বাহের উপায় কবিবেন।

তিনি জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা কবিতে চেষ্টা কবিলেন যদি কোনো কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু দরজায় পাহারা, দ্বারবানেরা ব্রাহ্মণ যুবককে বিনা সুপারিশে এবং বিনা বকশিশে ভিতরে যাইতে দিবে না। গল্প শুনিয়াছি, শ্রীনাথ তখন অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের গেটের দরজার সামনে একটি বড়ো গাছ ছিল। সেই গাছটিতে উঠিয়া তিনি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন মোটবকারের যুগ নয়। সাহেব ঘোড়ার গাড়ি কবিয়াই বাহিরে যাইতেন। গাড়ি বাহিরে আসিতে দেখিয়া তিনি লাফাইয়া নামিয়া পড়িয়া ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরিয়া ফেলিলেন। গাডি থামিয়া যাইতেই সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?" শ্রীনাথ উত্তর দিলেন, "আমি আপনার সঙ্গে দেখা করবার সুবিধা পাই না বলে এই উপায় অবলম্বন করেছি।" সাহেব যুবকের সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দৈহিক শক্তি, সুগঠিত দেহ ও সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া খুশি হইয়া গেলেন। কাজ হইতে দেবি হইল না। শ্রীনাথকে জেলার কাজ দেওয়া হইল।

পাঠকপাড়ার পুকুরের নাম বড়োপুকুর। পুকুরের পাড়ে শ্রীগোপালের মন্দির। মন্দিরের সম্মুখের পথে দুইটি বৃহৎ অশ্বত্থগাছ পাতায় ঝলমল করে। পথেব ধারে ছোটো একটি পাকা

বাড়িতে শ্রীনাথের বাস। পাকা বাড়ির পিছনে মাটির দোতালা ঘর (মাটকোঠা), উঠানে সজিনা ও পেয়ারাগাছ, তার এক পাশে ঢেঁকিশাল ও গোয়াল ঘর। উঠানের চারি পাশে অন্যান্য আত্মীয়দের মাটির বাড়ি। শ্রীনাথের পত্নী হরসুন্দরী দেবী রূপেগুণে অনুপমা ছিলেন। তাঁর আগুনের মতো উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ও সুন্দর মুখশ্রী বৃদ্ধ বয়সেও শিশুদের মনোহরণ করিত। তিনি কথা বলিতেন কম, মানুষ ছিলেন অতি সাদাসিধা সরল প্রকৃতির ; তাঁর মতো স্নেহশীলা, পরিশ্রমী, কর্তব্যপরায়ণা, চরিত্রবতী, সাধ্বী রমণী কম দেখা যায়। দৈহিক শক্তি, ভালোবাসা ও কর্তব্যবুদ্ধির প্রাচুর্য তাঁর যেমন ছিল, বৈষয়িক বুদ্ধি ছিল সেই পরিমাণেই কম। তিনি বাক্সে তালা লাগাইতে কিংবা টাকাকড়ির হিসাব করিতে পারিতেন না। অব্যবহৃত বাক্স ঘরের কোণে পড়িয়া থাকিত, ভাঁড়ারে যেমন হাঁড়িকুড়ির ভিতর চাল-ডাল রাখিতেন, তেমনই করিয়া তিনি হাঁড়ির মধ্যেই টাকা-পয়সা ফেলিয়া রাখিতেন। কোনো জিনিসপত্র কিনিতে হইলে মূল্যের অতিরিক্ত প্রচুর ধান ঢালিয়া দিতেন। তিনি সেকালের মানুষ ছিলেন, কিন্তু মুক্ত বায়ুতে থাকিতে বড়ো ভালবাসিতেন। রাত্রে মশারি খাটাইয়া দিলে তিনি মাথাটা মশারির বাহিরে রাখিতেন ; এমন কি অনেক সময় জানালার ধারে বিছানা করিয়া জানালার প্রায় বাহিরে মাথা রাখিতেন। পরিচ্ছন্নতার দিকেও তাঁর এত ঝোঁক ছিল যে দিনে তিন-চার বার স্নানই করিতেন। ভোর না হইতেই সবার আগে উঠিয়া ঘর-দ্বার ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া তার পর স্নান করিতে যাইতেন। তীর্থ হইতে আনীত গঙ্গাজল একটি শ্বেত পাথরের ঘটিতে তাঁর ঘরে সর্বদা মজুত থাকিত, স্নানান্তেও শুচিতার ত্রুটি আছে মনে করিলে মাঝে মাঝে সেই জল গায়ে মাথায় ছিটাইতেন। একবার তাঁর একটা বড়ো গালিচায় ভাত পড়িয়া গিয়াছিল, তিনি সেটাকে শুদ্ধ করিবেন বলিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া পুকুরে ফেলিলেন। কিন্তু জলে পড়িয়া গালিচা এত ভারী হইয়া গেল যে তিনি আর সেটিকে জলের কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারিলেন না।

হরসুন্দরী ধর্মশীলা ও কর্মপটু ছিলেন, কিন্তু বাক্‌পটু ছিলেন না। দিবসব্যাপী কর্মজালের মাঝে মাঝে যখন ফাঁক পাইতেন আপন মনে বসিয়া বসিয়া নানা রঙের সুতায় কাঁথা সেলাই করিতেন, তার পর ছুঁচগুলি তেলের ভাঁড়ে ভিজাইয়া রাখিয়া দিতেন। সকাল-সন্ধ্যায় বসিয়া মালা জপ করিতেন, কারণ পাড়া-বেড়ানো, বাজে গল্প করা, হুজুগে মাতা তাঁর অভ্যাস ছিল না। স্বামীর যখন অর্থ ছিল তখনও তিনি চটকদার কাপড়চোপড় কিংবা অনেক সোনার গহনা পরিতেন না। হাতে রূপার বালা এবং গলায় এক ছড়া মোটা সোনার হার এই ছিল তাঁর অলংকার। স্বামী চাকুরি করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে বড়োলোকের স্ত্রী বলিত। শ্রীনাথ নিজে সাদাসিধা মানুষ ছিলেন বলিয়া স্ত্রীকে বলিতেন, "তুমি কখনো মনে কোরো না যে তুমি বড়োলোকের স্ত্রী। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের বৌয়ের মতোই বেশভূষা করবে। কাপড়-চোপড় খাওয়া-দাওয়া কোনো বিষয়েই আড়ম্বর কোরো না। আমাকে পোস্ত পোড়া আর ডালভাত খেতে দেবে, তাই যথেষ্ট। কখনো পরচর্চা গালগল্পে যোগ দিয়ো না। পাড়ায় বেড়াতে যেয়ো না, কারুর ঝগড়া-বিবাদের কারণ প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে জানতে চেষ্টা কোরো না।" হরসুন্দরী এইভাবেই দিন কাটাইতেন। কিন্তু ঝাঁঝাল এবং ঝগড়াটে প্রকৃতির মানুষ না হইলেও তিনি একবিন্দু অন্যায় সহ্য করিতে পারিতেন না। যে অন্যায় করিয়াছে তার সঙ্গে বাক্যালাপও তিঁনি করিতে পারিতেন না। পাছে কথা বলিতে হয় এই ভয়ে পিছন ফিরিয়া বসিতেন। রাত্রে বিছানায় শুইয়া নানারকম স্তোত্র বলিতেন আর ভোর না হইতেই বিছানা হইতে উঠিয়া, "গ্রহণেষু কাশী, মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসী,

সুমেরুসমতুল্যহিরণ্যদানম্, নহে তুল্য নহে তুল্য গোবিন্দনামম্," ইত্যাদি শ্লোক বলিয়া অন্ধকার থাকিতেই ঘরের কাজ শুরু করিয়া দিতেন।

শিশুজীবন

এই নিরহংকার ভক্তিমতী শান্তস্বভাবা সুন্দরী স্নেহশীলা জননীর কোলে তিন কন্যা ও দুই পুত্রের পর শিশু রামানন্দ আবির্ভূত হন। তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন, "কার পুণ্যে কাকা মহাশয় আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন জানি না। তবে বলব কাকামশায় ঠাকুরমার সাধনার ধন। তাঁর মতো নারী পৃথিবীতে বড়ো বিরল মনে হয়।" রামানন্দের জন্মদিন ১৬ কিংবা ১৭ জ্যৈষ্ঠ। কুষ্ঠিতে আছে ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৮১ শকাব্দ (১৮৬৫ খ্রি)। কিন্তু তিনি নিজে আজীবন ১৬ জ্যৈষ্ঠ তাঁর জন্মদিন বলিয়া ধরিতেন। গৃহস্থ ঘরে পাঁচটা ছেলেপিলের জন্মের পর তাঁব জন্ম হইলেও এই সর্বাঙ্গসুন্দর ফুলের মতো শিশুটি তাঁহার পিতামাতাব বড়ো আদরের ছিলেন। পিতা ঘটা করিয়া তাঁর মস্ত কুষ্ঠি করাইলেন, তাঁর রাশিনাম রাখা হইল ডমরুধারী। এই ডমরুধ্বনি দেশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অর্ধশতাব্দী যুদ্ধঘোষণা করিয়াছে, সত্যশিবসুন্দরের জয়ধ্বনি করিযাছে তার অপেক্ষাও দীর্ঘকাল। আজ মহাকালের আহ্বানে সে ধ্বনি কোনো শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে জানি না, অন্তরীক্ষে কোথাও তাহার প্রতিধ্বনি কি বাজিতেছে?

সেকালের বাঁকুড়া ছিল রাম-নামে মুগ্ধ। তাই এই পরিবারের প্রায় অধিকাংশ ছেলের নামই রামযুক্ত। রামশঙ্কর ও রামেশ্ববের তৃতীয় ভ্রাতার নাম রাখা হইল রামানন্দ। শ্রীনাথ ও হরসুন্দরীব প্রথম সন্ততি একটি কন্যা জন্মের অল্পদিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। দ্বিতীয় কন্যা ত্রিপুরাসুন্দরী। তৃতীয়া সারদাসুন্দরী। ত্রিপুরাসুন্দরী নিজ মাতার মতো স্নেহশীলা ও ভালোমানুষ ছিলেন। তাঁর নিজ সন্তান ছিল না, কিন্তু স্বামীর দ্বিতীয় পত্নীর পুত্রকেই তিনি আপন সন্তানের মতো ভালোবাসিতেন। তবে তাঁর সহোদর ভাইদের মধ্যে দুইজন তাঁর সন্তানের বয়সী ছিলেন বলিয়া তাঁর প্রথম বাৎসল্যটা এই দুটি ভাইয়ের উপরই পড়িয়াছিল। অনেক বয়সে তিনি তাঁর মাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রদের পুত্রস্নেহে পালন করিয়াছিলেন। এই কাজে হরসুন্দরী ছিলেন কন্যার প্রধান সহায়। চারিটি মাতৃহীন শিশু ইঁহাদের স্নিগ্ধ ভালোবাসা ও সযত্ন পালনের গুণে মাতৃস্নেহের অভাব ভুলিয়াছিল। এই স্নেহময়ীরা না থাকিলে হয়তো শিশুগুলি অকালেই মায়ের পদচিহ্ন অনুসবণ করিত। আজও প্রৌঢ়বয়সে সেই মাতৃরূপিণীদের তাঁরা গভীর স্নেহ ও ভক্তির সঙ্গে স্মরণ করেন।

সারদাসুন্দরীর সৌন্দর্য, তেজস্বিতা ও স্পষ্টবাদিতার খ্যাতি ছিল। একবার তাঁর কাছে পাড়ার একটি মেয়ে গর্ব করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁর কন্যার বারো বৎসব বয়সে সন্তান হইয়াছে। শুনিযা সারদাসুন্দরী বলিলেন, "আমি হলে অমন লজ্জার কথা লুকিয়ে রাখতাম, তুমি তাই বড়াই করছ।"

দুই বোনই লেখাপড়া জানিতেন না। তবু এমন একটা স্বাভাবিক জ্ঞান আর সংস্কৃতি তাঁদের ছিল যে কেউ বলিতে পারিত না এঁরা আজীবন পল্লীক্রোড়ে পালিতা। তখনকার দিনে তাঁদের মতো মার্জিতরুচি নির্মলস্বভাবা মহিলা প্রায় দেখা যাইত না। হরসুন্দরীর কনিষ্ঠপুত্রের নাম বারাণসী। রামানন্দের জন্মের সময় তাঁব বড়োদিদির বয়স ছিল পনেরো, ছোটোদিদির তখন মাত্র বারো বৎসর বয়স। উঠানের ওপাশে মাটির কোঠায় থাকিতেন তাঁর

এক পিসতুতো ভ্রাতৃবধূ, তিনিও নিঃসন্তান। এই সব-কয়টি মেয়ের অজস্র স্নেহ গিয়া পড়িল ওই নবাগত সুন্দর শিশুটির উপর। শিশুকালে নিঃসন্তান ভ্রাতৃজায়ার ঘরে গিয়া 'গুড়পিঠে' আদায় করা ও খাওয়া তাঁর একটা মহা আনন্দেব ব্যাপার ছিল। ভ্রাতৃজায়া শিশুর মুখে তার স্বরচিত গান শুনিয়া মহাখুশি হইতেন। তাই প্রথম ফরমাশ হইত ছড়া কাটিয়া গান করিতে হইবে। গানের পর শিশু একটি পিঠা পাইতেন। সেই পিঠাটি ফুবাইলেই আবার গান করিতে হইত : "কানাইয়া বিদায় দে রে দে, একটি পিঠা দে রে দে..." শিশুর গানে তৃপ্ত হইয়া ভ্রাতৃজায়া আর-একটি গুড়পিঠা বকশিশ দিতেন।

বাঁকুড়া ব্রাহ্মণপ্রধান দেশ হইলেও তখনকার দিনে মানুষে মানুষে ভেদ প্রচণ্ড ছিল না। হরসুন্দরীর প্রাঙ্গণে বাগদি মেয়েরা বাসন মাজিয়া রাখিয়া যাইত। দেশীয় প্রথামতো তাহাতে আর-একবার জল ঢালিয়া সেগুলি তুলিয়া লওয়া হইত। যে রাখাল বালকেবা সকল সন্ধ্যায বাড়ির গোয়াল হইতে গোরু চরাইতে লইয়া যাইত ব্রাহ্মণসন্তানেরা তাহাদের 'দাদা' বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। উচ্চনীচ সকলের মধ্যে একটা আত্মীয়তার বন্ধন ছিল। সাধারণ মানুষের প্রতি মমতা বোধহয় রামানন্দ শৈশবে নিজ পরিবার হইতেই পাইয়াছিলেন। কিন্তু উচ্চবর্ণের কোনো অহংকার সেইসঙ্গে তিনি পান নাই।

শৈশবেই রামানন্দ স্বভাবত অতি শান্তপ্রকৃতি ছিলেন। পাড়ার ছেলেরা ছিল অতি দুর্দান্ত, তাদের দুষ্টামির খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া গিয়াছিল। তাদের সঙ্গে মেশা তাঁর অভ্যাস ছিল না। হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটি বাল্যবন্ধুর সঙ্গে মাত্র তাঁর ভাব ছিল। এই দুই বন্ধুর মা বোধহয় একত্রে গঙ্গাসাগর সংগমে তীর্থ করিতে গিয়াছিলেন, তাই তাঁরা দুজনে 'সাগর জল' পাতাইয়াছিলেন। ছেলেরা পরস্পরের মায়ের বন্ধুকে 'সাগর-জল মা' বলিয়া ডাকিতেন। সেকালের খেলার মধ্যে হা-ডু-ডু খেলা প্রসিদ্ধ। সেটি ছিল তাঁদের প্রিয় খেলা। গাছের উপর হইতে লাফালাফির নাম ছিল ঝুল-ঝাঁপ খেলা, আর ছিল ছেঁড়া কাপড়ের বল পাকাইয়া নদীর বালির উপর বল খেলা। এ-সব খেলাতেই দৈহিক শক্তির চর্চা আর ব্যায়ামচর্চা হইত। রামানন্দের পিতার দৈহিক শক্তির কথা বলিয়া তিনি আজীবনই গৌরব অনুভব করিতেন এবং সেইজন্য তাঁব নিজেরও দৈহিক শক্তিচর্চার উপর খুব ঝোঁক ছিল। স্বভাবত শান্ত ছিলেন এবং পড়ায় অদ্ভুত অনুরাগ ছিল বলিয়া শক্তিচর্চার দিকে তিনি বেশি মন দিতে পারেন নাই। চিন্তাশীল আপনা-ভোলা বালক অনেক সময় পড়াশুনাও ভুলিয়া চুপ করিয়া ঘরের এক কোণে কী চিন্তায় ডুবিয়া থাকিতেন। পবিবাবের নয়নানন্দকর এই বালকের ডাকনাম ছিল নন্দ। দিদি চিন্তামগ্ন বালককে ডাকিয়া বলিতেন, "ও নন্দ, একটু নড়্-না রে!" নন্দ সেইখানে বসিয়া সত্যই এদিক-ওদিক একটু গা-মোড়া দিয়া আবার তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

শিক্ষারম্ভ

পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সে তাঁর সেজো জ্যাঠামহাশয় শম্ভুনাথের টোলে তাঁর অক্ষর-পরিচয় হয়। তিনি টোলের ছাত্র ছিলেন না, কিন্তু অন্য কারণে টোলেই তাঁর বিদ্যারম্ভ হয়। বাড়িতে তাঁহাদের দুই জ্যাঠার টোল ছিল, সেখানে সংস্কৃত পড়ানো হইত। ছোটো ছেলেরা পাঠশালাতে বাংলা লেখাপড়া শিখিত। এই-সব ছেলেদের সঙ্গে তাঁকেও একদিন দশেরবাঁধ নামক এক পুকুরপাড়ের পাঠশালায় অ, আ, ক, খ, লিখিতে দেওয়া হইল। তিনি নিজেই

সে বিষয়ে লিখিয়াছিলেন, "আমার যতটা মনে পড়ে টোলে আমার অক্ষর-পরিচয় হইয়াছিল; কিন্তু টোলেব ছাত্র রূপে নহে, পাঠশালায় যাইতাম না বলিয়া। দশেরবাঁদের পাড়ে, এক পাঠশালায় আমি একদিন গিয়াছিলাম আমার জ্যেঠ্তুতো ভাই রামরতনের সঙ্গে। আমাকে গুরুমহাশয় রামরতনের নিকট হইতে দূরে একটা খড়ি হাতে মাটিতে অ, আ, ক, খ, লিখিতে বসাইয়া দিয়াছিলেন, আমি বোধহয় সেইজন্য কাঁদিয়াছিলাম। তার পর আর কখনো পাঠশালায় যাই নাই।" সেকালে টোলের ছাত্রেবা ঘরের ছেলের মতোই অধ্যাপকদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কাজেই টোলে পড়িতে গিয়া শিশু রামানন্দের এই আত্মীয়বিরহের দুঃখ ভোগ করিতে হয় নাই।

অল্প বয়সেই তাঁহার উপনযন হইয়াছিল। উপনয়নের সময় বালব্রহ্মচারীদের ভিক্ষাগ্রহণের প্রথা আছে। যে মহিলা ভিক্ষাদান করেন, তিনি বালকেব 'ভিক্ষা মা' হন। রামানন্দের বড়োদিদি ত্রিপুরাসুন্দরী তাঁর এই কনিষ্ঠটিকে ভিক্ষা দিয়া স্বয়ং তাঁর 'ভিক্ষা মা' হন। তাঁর নিজেব সন্তান ছিল না বলিয়া ভাইদের প্রতি তাঁর গভীর বাৎসল্য ছিল। এই দিদির মৃত্যুর পর তাঁব এই কনিষ্ঠ ভাইটি পুত্রের মতো সমস্ত নিয়ম পালন এবং মুণ্ডনাদি কবিয়াছিলেন। তাঁর জীবিতকালে দিদির কথা, দিদির নিঃসন্তান জীবনের বেদনার কথা ভাইটি একদিনও ভোলেন নাই।

সেকালে বাঁকুড়ায় বাংলা স্কুল আর ইংরাজি স্কুল দুই রকম স্কুল ছিল। বাংলা স্কুলের ছেলেবা ছাত্রবৃত্তি পবীক্ষা দিত। তাদেব বীজগণিত, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল, উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি সকল বিষয়ই বাংলায় শেখানো হইত। এক সময় 'প্রবাসী'তে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমরা অনেকে বাল্যকালে দশ-এগাবো বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য বাংলা ভাষায় যাহা শিখিয়াছিলাম, ইংরাজি স্কুলের ছেলেরা এন্ট্রেন্স পরীক্ষা দিবার জন্য পনেরো ষোলো বৎসর বয়সে ইংবেজি ভাষায় তাহা অপেক্ষা বেশি লিখিত না— এখনও বোধ হয় শিখে না।" খুব অল্প বয়সেই রামানন্দ বাঁকুড়ার এক বাংলা স্কুলে ভর্তি হন। তাঁব আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি, পাঠে অনুরাগ আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য স্কুলে তিনি শ্রেষ্ঠ ছাত্র হইয়া ওঠেন। কয়েকবার ডবল প্রোমোশন পাইয়া তিনি মাত্র দশ বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পাস করিলেন এবং ৪ টাকা মাসিক বৃত্তি পাইলেন। পাঠ্য পুস্তক তিনি কেবল পাঠ্য পুস্তক হিসাবে পড়িতেন না ; তাতে বালকদের মনে যে শুভবুদ্ধি দেশপ্রীতি ভগবদ্‌ভক্তি ইত্যাদি জাগাইবাব উপযুক্ত বচনাবলী থাকিত সেগুলি এই বালক বয়স হইতে তাঁর মনে গাঁথা হইয়া যাইত। পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগের

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়?'

ইত্যাদি শৈশবেই তাঁহার রক্তে দোলা দিত। এ-সব কবিতা তিনি বৃদ্ধবয়সেও ভোলেন নাই। শিশুবয়সে এবং বাল্যকালে কবিতা তাঁর এত প্রিয় ছিল যে তিনি যা পড়িতেন তাই মুখস্থ করিয়া রাখিতেন। 'সদ্ভাব শতকে'র সমস্ত কবিতা এবং 'মেঘনাদবধ' আগাগোড়া তিনি ৭৪ বৎসর বয়সেও আবৃত্তি করিতে পারিতেন। অথচ এ-সব তাঁর নিজের দশ বৎসর বয়সে পড়া। আজকালকার দিনে 'একদা ছিল না জুতা চরণযুগলে।' 'চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে' কয় জনের কণ্ঠস্থ আছে? সেকালেব ছাত্রজীবনের ছবি আমি হয়তো ঠিক ফুটাইয়া তুলিতে পারিব না। মানুষকে অনেকখানি কল্পনায় গড়িয়া লইতে হইবে। বাংলা দেশের ছোটো শহর। সেখানে ট্রাম বাস তো নাই। সকালে উঠিয়াই ছেলেরা পড়াশুনা

সারিয়া স্কুলে যাইবার আয়োজনে লাগিত। হরসুন্দরী দেবীব বড়ো সংসার, ছেলেমেয়ে বউ জামাই অনেকগুলি। নদী হইতে খাবার জল আনা কিংবা রান্নাবান্না করার ত তাঁর মাইনে-করা লোক ছিল না। বাড়ির মেয়েদের সাহায্যে নিজেব হাতে সব কাজ সারিয়া তাড়াতাড়ি স্কুলের ভাত দিতে কষ্ট হইত। পাতায় কবিয়া পোস্ত পোড়াইয়া শুধু তাই দিয়াই ছেলেকে ভাত বাড়িয়া দিতেন আর ঘরে অনেক গোরু ছিল বলিয়া বাটি করিয়া একবাটি দুধ ঢালিয়া দিতেন। এই সাদাসিধা খাওয়াতেই খুশি হইয়া রামানন্দ স্কুলে চলিয়া যাইতেন, কখনো অনুযোগ করিতেন না।

১৩২২-এর 'প্রবাসী'তে তিনি সেকালেব স্কুল সম্বন্ধে লিখিযাছিলেন, "চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমরা বাংলা স্কুলে পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বহি পড়িয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়াছিলাম। কখনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের মুখ দেখি নাই। অন্যান্য বহিব মতো বৈজ্ঞানিক বহিও মুখস্থ করিতাম এবং কল্পনার সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা কবিতাম। আমাদের ছোটো শহরে উদ্ভিদ্‌বিচারে উল্লিখিত উদ্ভিদ্ লতাপাতা ফল ফুল মূল সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু তথাপি আমাদের পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে কোনোদিন একটা গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করিতে বা দেখিতে আসিতে বলেন নাই, নিজে যে কখনো আমাদিগকে দেখাইবাব জন্য সংগ্রহ করেন নাই, কিংবা স্কুলের ভৃত্যকে সংগ্রহ করিতে বলেন নাই, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। আমরা বরং শৈশবসুলভ কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া দুই-একটা খুঁজিয়া বাহিব কবিতাম। অন্যান্য বিষয় পড়াইবার সময় যেমন করিতেন, উদ্ভিদ্‌বিচারের ঘণ্টাতেও তেমনি পণ্ডিতমশায় চটিজুতা হইতে পা-দুখানা বাহির করিয়া টেবিলের উপর তুলিয়া দিতেন এবং জিজ্ঞাসা করিতেন, "মূল কাহাকে বলে?" আমবা অমনি মুখস্থ বলিতে আরম্ভ করিতাম। পণ্ডিতমহাশয় হয়তো আবার প্রশ্ন করিতেন, "মূলের এই সংজ্ঞাতে কী কী দোষ আছে?" আমরা আবার গ্রামোফোনেব মতো বলিতাম—..."

রামানন্দ শিক্ষকদের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। কিন্তু তবু তিনি বাল্যে একবাব বাংলা স্কুলে শাস্তি পাইয়াছিলেন। শাস্তির কারণটা বিচিত্র। রামানন্দের সহপাঠী এক ছুতোরের ছেলে তাঁহার পাশেই বসিত। রামানন্দ চণ্ডীদাসের দেশে জন্মিয়াছিলেন। শিশুকাল হইতেই তিনি সহজাত এই বিশ্বাস লইয়া জন্মিয়াছিলেন যে, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" ছুতোরের ছেলেটির পিঠটা হঠাৎ সুড় সুড় করিয়া ওঠাতে সে বন্ধুকে বলিল, "ওহে আমার পিঠটা একটু চুলকিয়ে দাও-না।" নিরীহ ব্রাহ্মণ বালক পিঠ চুলকাইতে শুরু করিতেই সেই বন্ধুবৎসলের পিঠে মাস্টারমশায় দিলেন সজোবে এক চপেটাঘাত! "কী, ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে তুই ছুতোরের ছেলের পিঠ চুলকোবি?"

বন্ধুবৎসল রামানন্দ তাঁর বাল্য শৈশব ও যৌবনের বন্ধুদের কখনো ভোলেন নাই। বাল্যবন্ধু অবিনাশ দাসের বাড়ির সম্মুখ দিয়া নূতন চটির পথে কবে কোথায় তিনি বনভোজনে কী ফুল কুড়াইতে গিয়াছিলেন, বন্ধু সুরেন্দ্রভূষণের মা ও দিদি কৃষ্ণভাবিনী তাঁকে কত যত্ন আদর করিতেন, তাঁদের বাড়িতে তিনি ঘরের ছেলের মতোই রাত্রিযাপন করিতেন, ইস্কুলে পড়িবার সময় তাদের সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাদের বাড়িব সমস্ত বই তিনি লইয়া পড়িতেন—এ-সব গল্প তিনি বৃদ্ধ বয়সে প্রায় করিতেন। সুরেন্দ্রভূষণের পিতা যাদববাবু বাঁকুড়ায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এই পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব সত্তর বৎসরেও অটুট ছিল তাঁর মনে ও ব্যবহারে। আর দুই বাল্যবন্ধু ছিলেন আবদুল সামেদ ও আবদুল জব্বর। জিলা স্কুলে সামেদের সঙ্গে তিনি প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। ক্লাসে রামানন্দ সর্বদাই প্রথম হইতেন

এবং সামেদ হইতেন দ্বিতীয়। আবদুল সামেদ পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। বন্ধু অবিনাশচন্দ্র দাস 'পলাশ বন' প্রভৃতির প্রণেতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপণ্ডিত অধ্যাপক হন।

নৈসর্গিক সৌন্দর্যের দিকে এই পল্লীবালকের শিশুকাল হইতে আশ্চর্য অনুরাগ ছিল। পূজার মধ্যে কেবল মাত্র সরস্বতী ও লক্ষ্মী পূজায় তাঁর শৈশবে উৎসাহ ছিল, কারণ পূজার জন্য বনে বনে ফুল কুড়াইবার আনন্দই ছিল তাতে প্রধান। সরস্বতী পূজার সময় চণ্ডীদাসের স্মৃতিকথাজড়িত দূর ছাতনা গ্রামের শালবনে তাঁরা ভোর না হইতেই ছুটিয়া চলিয়া যাইতেন শুভ্র আরণ্য কুসুম সংগ্রহ করিবেন বলিয়া, আর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজায় যাইতেন দূরে পাঁচবাঘা গ্রামের পুকুর পাড়ের রাশি রাশি রক্তকরবী তুলিয়া আনিতে। ছুটির দিনে বন্ধুদের সঙ্গে যাইতেন শুশুনিয়া পাহাড়ে বনভোজন করিতে। নতজানু বিরাট হস্তীর মতো মূর্তি, হরিৎ বনরাজিশোভিত এই পাহাড়টি দূর হইতে তাঁর মন ভুলাইত। তিনি শুধু যে বারে বারে তার দর্শনে যাইতেন তা নয়। দীর্ঘকাল পরে কলিকাতার বিরাট শহরে নিদ্রার কোলে শুইয়াও এই শুশুনিয়ার অরণ্যলোক আর আরণ্য কুসুমের স্বপ্ন দেখিতেন। অল্প বয়সে ১৩।১৪ মাইল দূরে বলরামপুরে হাঁটিয়া মামার বাড়ি যাওয়াও তাঁহার একটা বিশেষ আনন্দের কাজ ছিল।

রামানন্দের বয়স যখন মাত্র দশ বৎসর তখন বোধহয় এই বাংলা স্কুলে কবিতা-রচনার একটা পরীক্ষা হয়। কবিতার বিষয় "বাঁকুড়ার সৌন্দর্য।" শাল-পলাশ-শোভিত প্রিয় জন্মভূমি এই-সব বনপথ ও গিরি-পৃষ্ঠের বিষয়ে কবিতা লিখিয়া তিনি প্রথম হইলেন এবং দশ টাকা পুরস্কার পাইলেন। দশ বছরের বালকের কাছে এই দশ টাকা বহুগুণ মনে হইল আপনার শৈশব-রচনার গৌরবে। শিশুবয়সের এই কবি-কীর্তির কথা তিনি কতকটা ঠাট্টার ছলে, কতকটা শৈশবস্মৃতির আনন্দে রবীন্দ্রনাথের কাছে গল্প করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ গল্প শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "মশায়, আপনি দশ বছরেই পুরস্কার পেয়ে গেলেন বলেই তো আপনার আর জীবনে কবিতা লেখা হল না। আমি ৫০ বছরের আগে কোনোই পুরস্কার পাই নি বলে আজীবন কবিতাই লিখে গেলাম।"

দশ বছর বয়সে ৪ টাকা বৃত্তি পাইয়া রামানন্দ ইংরাজি স্কুলে ভর্তি হইলেন এবং স্কুলে বিনাবেতনে পড়িবার অধিকার পাইলেন। খাওয়া-দাওয়া ছাড়া আর সব বিষয়ে এই বয়স হইতেই তিনি প্রায় স্বাবলম্বী হইয়া উঠিলেন। আজকালকার ছেলেরা কেহ কি ইহা কল্পনা করিতে পারে? তাঁর বড়ো দাদা তাঁকে মাঝে মাঝে দুই-এক টাকা সাহায্য করিতেন, কিন্তু তিনি নিজে বই কিনিয়া দেওয়া প্রভৃতি কাজে মাঝে মাঝে নিজের চার টাকা বৃত্তি হইতেই তাঁর মেজদাদাকে সাহায্য করিতেন।

তখন বাঁকুড়ায় কেশবচন্দ্র সেনের 'সুলভ সমাচার' সংবাদপত্রের প্রচার ছিল। তার দাম ছিল মাত্র এক পয়সা। জেলা স্কুলের এক মাস্টার সপ্তাহে ১৪০ খানা করিয়া কাগজ আনাইয়া বিক্রি করিতেন। নামের তলায় চারি লাইন কবিতা ছাপা থাকিত,

'সহজে পাইতে যদি চাও জ্ঞান ধন
সুলভ সংবাদপত্র কর অধ্যয়ন।' ইত্যাদি।

পূজার 'সুলভে' নির্মল ব্যঙ্গকৌতুক থাকিত, তদনুরূপ কিছু ছবিও থাকিত। পূজা সংখ্যা রঙিন কাগজে ছাপা হইত! একে এত খবর তাহাতে আবার রঙিন কাগজ! জ্ঞান ও সৌন্দর্যের আশৈশব অনুরাগী রামানন্দের ইহা বড়ো প্রিয় কাগজ ছিল। হয়তো তিনি সেই শৈশবেই স্বপ্ন দেখিতেন, বড়ো বয়সে কত সুন্দর করিয়া তিনি কাগজ সাজাইয়া ঘরে ঘরে জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণ করিবেন।

শ্রীনাথ তাঁর এই শান্তস্বভাব ছেলেটিকে সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসিতেন। অন্য ছেলেরা পিতাকে ভয় করিতেন। স্বামীর কাছে কোনো প্রয়োজনে টাকা পয়সা চাহিতে হইলে হরসুন্দরী দেবী নন্দকে পাঠাইয়া দিতেন। কারণ অন্য ছেলেদের পাঠাইতে তিনি একটু ইতস্তত করিতেন। পিতা তৃতীয় পুত্রকে দেখিয়াই হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "কী চাই?" তার পর দরকারমতো পয়সাকড়ি দিয়া তাকে বিদায় দিতেন।

বাঁকুড়া জেলাস্কুলের গণিত-শিক্ষক ছিলেন স্বর্গীয় কেদারনাথ কুলভী। কুলভী মহাশয় অঙ্কে ভুল দেখিলে অত্যন্ত চটিয়া যাইতেন। রামানন্দের এক সতীর্থ ছিলেন, তিনি অঙ্ক পারিতেন না, কিন্তু পরিপাটি করিয়া সিঁথি কাটিয়া ক্লাসে আসিতেন। গল্প আছে যে, একদিন জ্যামিতির ক্লাসে এই সিঁথিকাটা ছেলেটি পড়া না পারাতে কুলভী মশায় তার মাথায় বই ছুঁড়িয়া মারিয়া বলিতেন, "you can bisect your head and you can't bisect a straight line!" কুলভী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন এবং তাঁর বিশেষ প্রিয় শিষ্য ছিলেন রামানন্দ। কুলভী মহাশয় বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ছিলেন। তাঁর উপদেশ ও উপাসনাদি শুনিবার জন্য রামানন্দ এবং তাঁর বন্ধু হেমচন্দ্র, গোপাল দুবে, কালীচরণ সমাজে যাইতেন। রামানন্দের সহজাত উন্নত চরিত্র এই গুরুর উপদেশে ও সংস্পর্শে আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ছাত্রদের নৈতিক জীবনগঠনে এই গুরু ছিলেন মস্ত সহায়। তিনি নানা সাধুজনের কাহিনী ছাত্রদের শুনাইতেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের একটি সাধনার কথা এই গুরুর মুখে শুনিয়া রামানন্দ কিশোর বয়সেই মুগ্ধ হন। প্রবীণ বয়সে এই গল্পটি তিনি বলিতেন :—"রামকৃষ্ণ এক হাতে টাকা বা সোনা এবং অন্য হাতে মাটি নিয়ে গঙ্গার ধারে বসে জিনিস দুটি দুহাতে অদলবদল করতে করতে বার বার বলতেন:—মাটি সোনা, সোনা মাটি। তার পর দুটি জিনিসের সমত্ব উপলব্ধি হলে দুটিই গঙ্গার জলে ফেলে দিতেন।" রামানন্দ কলিকাতায় আসার পরও রামকৃষ্ণের অনেক গল্প সংগ্রহ করিতেন। কুলভী মহাশয় পরমহংসদেবের বিষয় আরো অনেক গল্পই বলিতেন :—"একবার কোনো দুশ্চরিত্র ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি পরমহংসের কাছে উপদেশ নিতে আসে। রামকৃষ্ণ তাকে তিরস্কার করিলেন না, নিবৃত্তিমূলক কোনো উপদেশও দেন নি। কেবল বলেছিলেন, 'যখনই কোনো সুখ অনুভব করবে, তখনই স্মরণ কোরো যে, সুখ অনুভবের শক্তি ভগবানের দান।' এই কথাতেই মানুষটির হৃদয়ের পরিবর্তন হয়।"

কিশোর-বয়সে রামকৃষ্ণের নানা কাহিনী শুনিয়া তাঁহার প্রতি রামানন্দ অনুরক্ত হন। রামকৃষ্ণের সহধর্মিণী ছিলেন বাঁকুড়ার মেয়ে, ইহা রামানন্দ গৌরব ও আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করিতেন। পুণ্যবতী সারদা দেবীর জীবন-কথা তাই তিনিই প্রথম 'প্রবাসী'তে লেখেন।

অল্প বয়স হইতেই রামানন্দের মন নানাদিকে সংস্কারমুখী ছিল। তিনি তাঁর এই সংস্কারের সাধনায় উন্মাদনা কি হুজুগ কখনো দেখান নাই। কিন্তু কিশোরকাল হইতে শান্ত এবং দৃঢ় চিত্তে নিজের আবিষ্কৃত এবং অনুভূত সত্যের পথে চলিয়াছেন। কুলভী মহাশয়ের প্রভাবে তাঁর সংস্কারমুখী মন ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "আমি যখন ইংরাজি স্কুলের উপর ক্লাসে পড়ি তখন থেকেই আমার ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি ঝোঁক ছিল ও ব্রাহ্মমন্দিরে যাতায়াত ছিল। সেইজন্য আমার উপর বাড়ির লোকদের অসন্তোষ ছিল। তবে আমাকে কেউ কিছু বলতেন না। মা তো বলতেনই না। তিনি সরল প্রকৃতির ভালোমানুষ ছিলেন।"

ছেলেবেলাই ইস্কুল করা, দরিদ্রদের সাহায্য করা এই-সব কাজে তাঁর উৎসাহ ও শখ

ছিল। গৃহস্থের ছেলে অনেক পয়সা তো নাই, অন্য কোথায় আয়োজন করিবেন? নিজেদের বাড়িতেই বন্ধুদের সঙ্গে মিলিয়া ছোটো ছেলেদের জন্য রামানন্দ এক স্কুল খুলিয়া বসিলেন। বাড়িতে একটা কাঠের সিঁড়ি ছিল। সেই সিঁড়ির উপর দিক থেকে প্রতি ধাপে ধাপে 1, 2, 3, 4. লিখিয়া ক্লাস তৈরি হইল। যে-সব ছাত্রেরা একটু বিদ্যার পরিচয় দিতে পারিলেন, তাঁরা বসিলেন 1 লেখা ক্লাসে, তার চেয়ে কম বিদ্বানরা নিজ নিজ বিদ্যা অনুসারে 2, 3 নানা ধাপে স্থান পাইলেন। কোনো ছেলে যদি দুষ্টামি করিত কিংবা পড়া না পারিত, তাহলে তাহাকে শাস্তিস্বরূপ একেবারে শেষ ধাপে নামাইয়া দেওয়া হইত। ছেলেদের জন্য পাঠ্য পুস্তক কিনিবার তো গুরুদের ক্ষমতা ছিল না। কাজেই পাড়ার ছেলেদের পুরানো ছেঁড়া ভাঙা শ্লেটও জুটিল। খড়ি দিয়া সিঁড়িতে নম্বর দিয়া রাখা হইত। শ্লেটেও বোধহয় খড়ি দিয়াই লেখা হইত। এখন বাকি রহিল গুরুদক্ষিণা। স্থির হইল মাসান্তে প্রতি ছাত্র একটি করিয়া সুপারি দক্ষিণা দিবেন। আরো কিছু বড়ো হইবার পর স্কুলের ছাত্র অবস্থাতেই তিনি ব্রাহ্মসমাজে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং Debating Club-এ বক্তৃতা দিতেন।

রামানন্দ নিজে তো স্বাবলম্বী ছিলেনই। কিন্তু পরের কষ্টও তিনি শৈশব হইতেই লাঘব করিবার চেষ্টা করিতেন। স্কুলে পড়িবার সময় তিনি পাড়ার দরিদ্র ভদ্র পরিবারে (যাঁরা বাহিরে যাইতে পারিতেন না) সাহায্য করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে অর্থ সংগ্রহ করিতেন। নিজে তাদের সাহায্য দিয়া আসার যে গৌরব তা তিনি কখনো অর্জন করিতে চান নাই। টাকা সংগ্রহ হইয়া গেলে চন্দ্রভূষণ সেন নামক এক বন্ধুর হাতে দিতেন যেন ঠিক ঠিক জায়গায় তিনি পৌঁছাইয়া দেন। আত্ম-প্রচার পাছে করেন আজীবন এই ভয়ে নিজে তিনি সতর্ক ও সন্ত্রস্ত থাকিতেন। সেইজন্য তাঁর-করা বহু সৎকাজ পরের নামে চলিয়া গিয়াছে, বহু কাজের কোনো চিহ্নই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

রমেশচন্দ্র

তখনকার জেলা স্কুলে ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি সুলেখক ও কৃতী পুরুষেরা পরিদর্শন করিতে আসিতেন। জেলা স্কুলের হেডমাস্টার ভূদেববাবুর সহপাঠী ছিলেন। রামানন্দ যখন স্কুলের উপরের ক্লাসের ছাত্র তখন ব্রজেন্দ্রনাথ দে বাঁকুড়ার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া যান এবং স্কুল ও ক্লাস পরিদর্শন করেন। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বাঁকুড়াতেই ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সেকালে বাঁকুড়া স্কুলে ইংরাজি বলা ও ইংরাজি পড়ার বিশেষ পরীক্ষা আর পুরস্কার হইত। দত্ত-মহাশয় কয়েকবার এই পরীক্ষাতে বালক রামানন্দকে পুরস্কৃত করেন। একবার বাঁকুড়া সম্বন্ধে লিখিবার কথা ছিল। তিনি তাহাতে অন্য কথার মধ্যে লিখিয়াছিলেন, "Chandidas, the foremost poet of Bengal, was the glory of Bankura।" রমেশচন্দ্র আর-একবার দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরাজি সাহিত্যের পরীক্ষা করেন। ক্লাসে পড়া হইত 'ল্যাম্‌স্ টেল্‌স্ ফ্রম শেক্সপিয়র'। দত্ত মহাশয় রামানন্দের উত্তর পড়িয়া এতই খুশি হইলেন যে তাঁকে শতকরা ৯৬ দিয়া বসিলেন। হেডমাস্টার চন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় বিরক্ত হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "মহাশয়, ছেলেটির বয়স অল্প, আপনার মতো ইংরাজি-জানা সুপণ্ডিত ব্যক্তির কাছে এত বেশি নম্বর পেলে তার মাথা বিগড়ে যাবে।" দত্ত মহাশয় বলিলেন, "আমি কী করব? ছেলেটি হয়তো বই মুখস্থ করে লিখেছে, কিংবা ইংরাজি কিছু জানে। আমি ভুল বিশেষ পাই না। কী করে নম্বর কমাব?" কিন্তু হেডমাস্টার মহাশয়

শক্ত লোক। তিনি বলিলেন "এ রকম করলে এদের ভবিষ্যতে আর কোনো উন্নতি হবে না।" হেডমাস্টারের চেষ্টায় বালকটির ৬ নম্বর আরো কাটা গেল। তিনি ৯০ পাইলেন এবং পরীক্ষকের কাছে একটি বিশেষ পুরস্কার পাইলেন। রামানন্দ রমেশচন্দ্রের খুব গুণগ্রাহী ও অনুরাগী ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ বলিষ্ঠ পুরুষোচিত দেহ তখনই এই বালকের মনে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিত। এই বালক ভক্তটি উত্তরকালে রমেশচন্দ্রকে "নানা বিষয়িণী প্রতিভাশালী অসাধারণ মহাপুরুষ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। কখনো দত্ত মহাশয়ের এজলাসে ব্যারিস্টার নামক ক্বচিৎদৃষ্ট জীবদের আমদানি হইলে বালককালে ইঁহারা ব্যারিস্টারের বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন। ব্যারিস্টার মহাশয় গোঁফে তা দিয়ে সাক্ষীদের নানারকম জেরা করিয়া ও ধমক দিয়া নাকাল করিতে চেষ্টা করিতেন, দত্ত মহাশয় ধীরভাবে তাদের রক্ষা করিতেন এবং সাক্ষ্য লিখিতেন। বালকেরা অন্তরাল হইতে দেখিয়া খুশি হইতেন। রমেশচন্দ্রের "রাজপুত জীবনসন্ধ্যা" ও "মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত" প্রভৃতি উপন্যাস এই দেশভক্ত বালককে স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল বলিয়া তিনি স্বয়ং সাক্ষ্য দিয়াছেন। "রমেশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম অন্তঃসলিলা নদীর মতো ছিল। তাতে ভাবুকতার আতিশয্য, আড়ম্বর, লোক-দেখানো উচ্ছ্বাস ছিল না।" তাঁর এই গুণগুলিও তাঁর অনুরাগী বালকটির মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। অতন্দ্র প্রহরীর মতো রামানন্দ দেশের স্বার্থরক্ষায়, ও স্নেহশীলা মাতার মতো দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, কিন্তু কোনোদিন উন্মাদিনী ভাষায় সভা মাতাইতে চেষ্টা করেন নাই কিংবা ভাবুকতার স্রোতে তরুণ মনকে প্লাবিত করিয়া তাদের চিত্ত জয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। বালক বয়সে রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে গল্প সংগ্রহ করা এই বালকদের একটা কাজ ছিল। সব গল্পই সত্য না হইতে পারে ; কিন্তু তবুও তাহাতে আনন্দ ছিল। একটি গল্পে আছে :—"একবার বাঁকুড়ার একজন ইংরাজ এক ভোজে রমেশচন্দ্র দত্ত ও সিভিল সার্জন আর এল দত্তকে আলাদা এক টেবলে খেতে দিয়েছিলেন। শোনা যায় রমেশচন্দ্র দত্ত মশায় তার পর এক ভোজ দিয়ে ঐ ইংরেজ এবং তার বন্ধুদের অপাংক্তেয়র মতো দূরে একটা টেবলে খেতে দিয়েছিলেন।" ইংরাজ-প্রীতি রামানন্দের বিশেষত্ব ছিল না। এই গল্প শুনিয়া তাঁর বালক-হৃদয় উল্লসিত হইয়াছিল।

দত্ত মহাশয় রামানন্দকে যে বিশেষ পুরস্কার *(Manuders' Treasury of History)* দেন, সেটি তিনি বহুদিন সঙ্গে রাখেন। বহু বৎসর পরে ইংরাজির অধ্যাপক হইয়া এই পুস্তকটি তিনি দত্ত মহাশয়কে দেখান। দত্ত মহাশয় বলেন, "দেখুন আমি কেমন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা, আপনাকে ইংরাজির জন্য পুরস্কার দিয়েছিলাম, আপনি এখন ইংরাজির অধ্যাপক হয়েছেন।"

বালক বয়সে এবং যৌবনকালেও দীর্ঘ পথ ভ্রমণে ছিল রামানন্দের বিশেষ উৎসাহ। ১৪।১৫ বৎসর বয়সে সঙ্গে চিঁড়ামুড়ি বাঁধিয়া লইয়া মামার বাড়ি হাঁটিয়া যাওয়া তাঁর মহা আনন্দের জিনিস ছিল। ছাতনা গ্রাম, পাঁচবাঘা গ্রামও ঘরের কাছে ছিল না। কখনো পূজার ফুল সংগ্রহ করিতে, কখনো বনভোজন করিতে তাঁরা এইসব গ্রাম-প্রান্তের শালবনে যাইতেন। সঙ্গে থাকিতেন তাঁর বাল্যবন্ধু অবিনাশচন্দ্র দাস, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং আরো দুই-চারিজন। যৌবনেও এম-এ পাস করার পর পাঁচবাঘা গ্রামের হিতলাল মিশ্রের গৃহিণীর কাছে লবণ ভিক্ষা করিয়া তাঁরা বনে বনে কন্যাকুল খাইয়া বেড়াইতেন। তাঁর মনের ভিতরের এই শিশুটি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত থাকিয়া থাকিয়া শিশুজনোচিত আনন্দের স্বপ্ন দেখিত।

রামানন্দের বয়স যখন তেরো-চৌদ্দ বৎসর তখনকার পাঠকপাড়ার রাজনৈতিক আবহাওয়া সম্বন্ধে তিনি কোনো কারণে ১৩৪৫-এর 'প্রবাসী'তে লিখিয়াছিলেন :

"সেকালে বাঁকুড়ার পাঠকপাড়ায় জওআহরলাল ত্রিবেদী নামক এক কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। পুরুষানুক্রমে বাংলা দেশে থাকায় ইঁহারা ঘরে-বাহিরে বাংলা বলিতেন ও বাঙালিই হইয়া গিয়াছিলেন। এই ত্রিবেদী মহাশয় ইংরেজি জানিতেন না, অল্পস্বল্প বাংলা জানিতেন ও অল্প বেতনের সবকারি চাকরি করিতেন। তিনি বোধহয় শতায়ু হইয়াছিলেন। তিনি চরিত্রবান ও খুব স্বাবলম্বী ছিলেন। স্বহস্তে নিজের বাগানের কাজ করিতেন। এই ত্রিবেদীর নিত্য আলোচনার বিষয় ছিল রুশ আসিতেছে বা আসিতেছে না কি-না। কেমন কবিয়া কোথা হইতে তিনি রুশদেব আসার গুজব শুনিতে পাইতেন জানি না, কিন্তু আমাদিগকে ও হয়তো ইস্কুলের অন্যান্য বালকদিগকেও তিনি অনেক সময় জিজ্ঞাসা করিতেন খববেব কাগজে রুশদেব আসার কোনো খবর বাহিব হইয়াছে কি-না এবং ভারতবর্ষের কতটা কাছে তাহারা আসিয়াছে। তাঁহার হয়তো এই বিশ্বাস ছিল যে, রুশরা ভারতবর্ষে পৌঁছিলেই ইংরেজদিগকে পরাস্ত করিবে, এবং তখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতেও পারে। তাহা হউক বা না হউক, তাঁহার ইংবেজ-প্রীতি এত বেশি ছিল যে, তিনি ইংরেজবা তাড়িত হইলেই বোধকরি খুশি হইতেন। এইরকম মনের ভাব সেকালে মোটেই বিবল ছিল না। আমাদের আশেপাশে ইংবেজের স্তাবক সেকালে কেহ ছিলেন বলিয়া মনে পড়িতেছে না, অবশ্য বে-সরকাবি, উপাধিহীন, উমেদার নহেন এরূপ লোকদেব মধ্যে। আমবা বড়ো হইযা বুঝিয়াছি বটে, যে, ব্রিটিশ রাজত্বকে স্থায়ী ও লাভজনক কবিবার নিমিত্ত এবং ব্রিটিশ বণিকদের সুবিধাব নিমিত্ত গবর্নমেন্ট এমন অনেক কাজ করিয়াছেন যাহাব অনভিপ্রেত পবোক্ষ ফলস্বরূপ ভাবতবর্ষেব কিঞ্চিৎ চেতনা ও অন্য কিছু উপকাব হইয়াছে। কিন্তু আমবা বাল্যে তাহা ভাবিতাম না, এবং ব্রিটিশ জাতির স্তাবক তখন বালকেরাও ছিল না। সেকালে বাঁকুড়ার গবর্নমেন্ট স্কুলে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ অধ্বর্যু নামক একজন শিক্ষক ছিলেন। ইনিও কনৌজিযা ব্রাহ্মণ। তিনি নীচের দিকের ক্লাসের মাস্টার ছিলেন, ইংবেজি বেশ জানিতেন। তাঁহাব নিকট হইতে আমবা শিখ, বাজপুত প্রভৃতির শৌর্যেব ও বলিষ্ঠতার গল্প কত যে শুনিয়াছি বলিতে পাবি না। পূর্বোক্ত ত্রিবেদী মহাশযের মতো তাঁহাবও মনের ভাব ইংরেজেব স্তাবকেব মনোভাবেব বিপবীত ছিল। ইংবেজ-সম্বন্ধীয় তাঁহাব অনেক গল্পও তদনুযায়ী ছিল। পোদ্দার পুকুরের পাড়েব ঘোষ-পবিবাবে তিনি গৃহশিক্ষকতা করিতেন। আমাদের সেখানে খুব যাতাযাত ছিল। তথায় পাঠনা অপেক্ষা ঐরূপ গল্প যে তিনি কম কবিতেন, তাহা বলিতে পাবি না।

"সেখানে আমবা অনেক বাত্রি পর্যন্ত ঘোষদের বাড়িতে 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের রানী ভবানী বা জগৎ শেঠের বক্তৃতা, হেমচন্দ্রের "ভারত সংগীত" প্রভৃতি সোৎসাহে নিজেদেব মধ্যে আবৃত্তি কবিতাম। নিদ্রাভঙ্গ হেতু সে-বাড়িব কর্তার তিবস্কারও কখনো কখনো সহ্য করিতে হইত।

"এইরূপ হাওয়ায় আমাদের বযোবৃদ্ধি হইতে থাকায আমবা কেহই রায় বাহাদুর হইবার যোগ্যতা লাভ কবিতে পারি নাই।

"আমাদের বাল্য ও কৈশোবেব যে সমযের কথা বলিতেছি, তখন 'আর্যদর্শনে' ধারাবাহিক প্রকাশিত ম্যাটসিনি ও নব্য ইতালি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী, টডের রাজস্থানেব অনুবাদ, বজনীকান্ত গুপ্তের মহারাণা প্রতাপ সিংহ বিষয়ক প্রবন্ধেব, রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গ-বিজেতা' প্রভৃতি অনেকের প্রিয় ছিল।

"আমরা যে দুইজন ভদ্রলোকের কথা বলিলাম, কেবল তাঁহাদেরই রাজনৈতিক মতিগতি যে পূর্ববর্ণিত প্রকারের ছিল তাহা নহে, আবো অনেকের রাজনৈতিক মতিগতিও ঐ প্রকার ছিল।"

পিতৃবিয়োগ

গৃহস্থের ঘরে ধনদৌলত প্রচুর না থাকুক, কিছুর অভাব ছিল না। গোয়ালভরা গোরু, মরাইভরা ধান, সিন্দুকভরা বাসন, গালিচা দুলিচা সবই ছিল। কিন্তু চিরদিন তো সমান যায় না। শ্রীনাথ ইংরাজি জানিতেন না বলিয়া ইংরাজির আদর বাড়িলে এক সময় তাঁর চাকরি গেল। তিনি যা টাকাকড়ি জমাইতে পারিয়াছিলেন তাহাই দিয়া চাল ডাল সরিষা প্রভৃতি শস্যের ব্যবসায় ফাঁদিলেন। গোলাবাড়িতে অনেক শস্য জমা করিলেন। একদিন দুর্ভাগ্যক্রমে গোলায় আগুন লাগিয়া সমস্ত শস্য পুড়িয়া গেল। তখন শ্রীনাথের জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এক ব্রাহ্মণকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে তাঁর কন্যাকে পুত্রবধূ করিবেন, সুতরাং প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে দেরি করেন নাই। কাজেই পুত্র কন্যা বধূ দৌহিত্র সকলকে লইয়া তাঁর সংসার বড়োই ছিল। হরসুন্দরী দেবীর কোনো বিলাসিতা ছিল না, তিনি স্বল্পভাষিণী কর্মিষ্ঠা কর্তব্যপরায়ণা ছিলেন। তবু এই ভাগ্যবিপর্যয়ে এত বড়ো সংসারের জন্য স্বামী স্ত্রী দুই জনেই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

তার কিছুদিন পরে শ্রীনাথের প্রথম পৌত্রের অন্নপ্রাশন। বাড়িতে জ্ঞাতিকুটুম্ব এবং ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন হইয়াছে। এমন সময় অকস্মাৎ গৃহকর্তা পার্শ্ববেদনায় আক্রান্ত হইলেন। সে রোগ হইতে তিনি আর রক্ষা পাইলেন না। অসময়ে ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এইবার সংসারে প্রকৃত দুশ্চিন্তা দে'া দিল। দুটি ছোটো ছেলে তখনও স্কুলের ছাত্র। তাদের মানুষ করিয়া সংসারে আবার সচ্ছলতা ফিরাইয়া আনিতে হইবে হরসুন্দরী দেবীকে। ঘরবাড়ি জমিজমা যা ছিল তাতে সংসার চলে, কিন্তু তার উপর আর কিছু না। একটি পয়সাও বাজে খরচ না করিয়া স্বহস্তে রাঁধাবাড়ার সমস্ত কাজ করিয়া তিনি ছেলেদের মানুষ করিয়া তুলিবেন ঠিক করিলেন। শ্রীনাথ একটি দৌহিত্রকেও লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়া দিতে ছেলেদের অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁর ভারও পড়িল এই সংসারে। হরসুন্দরী দেবীর বিশেষ ভরসা ছিল তাঁর তৃতীয় পুত্র রামানন্দের উপর। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ষোলো বৎসর পূর্ণ হইবার মাস দুই আগেই রামানন্দের এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার কথা ছিল। তখন তাঁর পিতা জীবিত ছিলেন। কিন্তু কারবার নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি বোধহয় ছেলেকে কলিকাতার কলেজের পড়ার খরচ দিতে সমর্থ ছিলেন না। নিজের টাকায় কলেজে পড়িতে হইলে প্রথম শ্রেণীর স্কলারশিপ পাওয়া দরকার। রামানন্দের মনে হইল স্কলারশিপ পাওয়ার মতো পড়া তৈরি তাঁর হয় নাই। তিনি সে বৎসর পরীক্ষা দিলেন না। পরের বৎসর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পিতৃবিয়োগ হইল। সম্ভবত সেইজন্য সে বৎসরও তাঁর পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। তিনি ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিবেন স্থির করিলেন। পড়াতে তাঁর অনুরাগের অভাব ছিল না, তবে নিজের চেষ্টায় তাঁকে সমস্ত করিতে হইত। বাড়িতে এমন কেউ ছিলেন না যিনি তাঁকে কিছু বুঝাইয়া দেন এবং মাইনে-করা মাস্টার রাখার তাঁর সংগতি ছিল না; তখন মাস্টার রাখার বেশি চলনও দেশে ছিল না শুনিয়াছি। পরীক্ষার কয়েকদিন আগে তিনি পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিলেন। ঘরের সামনে পাইচারি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় তাঁর দ্বিতীয় ভগ্নীপতি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নন্দ, তোমাদের তো পরীক্ষা, তুমি পড়াশুনা বন্ধ করলে যে?" রামানন্দ বলিলেন, "সমস্ত বৎসরটা তো পড়লাম, এই কয়টা দিন মাথাটা ঠাণ্ডা করে নি।" পুত্র পরীক্ষা দিতে গেলেন, মাতা হরসুন্দরী তাঁর কল্যাণকামনায় দেবতাকে প্রণাম করিয়া ঘরে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া চণ্ডীপাঠ ও দেবার্চনা করাইতে

লাগিলেন। যে কয়দিন পরীক্ষা হইল সব কয়দিনই গৃহে এইরূপে মঙ্গলকামনা চলিতে লাগিলেন। ছেলের যোগ্যতার উপর মার বিশ্বাস ছিল, তবু তিনি দেবতার আশীর্বাদ ভিক্ষা না করিয়া পারিতেন না।

পুত্র এন্ট্রান্স পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি ২০ টাকা বৃত্তি পাইবেন বুঝা গেল। কাজেই কলেজের পড়ার পথে আর কোনো বাধা রহিল না। নূতন উৎসাহে বন্ধু প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, ও তিনি নিজেদের সামান্য জিনিসপত্র লইয়া হাবড়ার ট্রেন ধরিবার জন্য গোরুর গাড়ির পথে রানীগঞ্জ যাত্রা করিলেন। শালবনের ভিতর দিয়া উপলবন্ধুল উঁচুনীচু পথে কখনো ছোটো ঝরনার ভিতর দিয়া, কখনো বিরাট দামোদরের অর্ধশুষ্ক বুকের উপর দিয়া রাঙা ধুলামাখা গাড়ি সুখস্বপ্নবিভোর বালকদের লইয়া চলিল।

কলিকাতায় ছাত্রাবস্থা—কলেজ

কলিকাতার এখনকার School of Tropical Medicine-এর কাছে পুরাকালে ছিল শোভারাম বসাকের লেন। সেইখানেই ছোটো একটি বাড়িতে বাঁকুড়া-নিবাসী কয়েকটি ছেলের মেস। একজন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, একজন প্রথমনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাছাড়া ছিলেন পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীনাথ রায়, নবকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি। প্রমথনাথ পরে 'নবীনা জননী'র লেখক বলিয়া পরিচিত হন, নবকৃষ্ণ রায় জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ হন। শান্তিপুরের শিক্ষক ভক্ত বিশ্বেশ্বর দাসও তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। তবে কোথায় থাকিতেন জানা নাই। ছোট্ট বাড়ি, একটি ঝি, একটি রাঁধুনি সবকটি ছেলের কাজ করে। ঝি-রাঁধুনির বেতনের অংশ, নিজের দুইবেলার খাবার খরচ দিতে প্রত্যেক ছেলের দশ টাকা খরচ হইত। জলখাবারের জন্য বেশি খরচ করিলে পড়ার খরচ কুলায় না। সেইজন্য রামানন্দ জলখাবার খাইতেন মাসে এক টাকার অর্থাৎ দিনে দুইটি পয়সার। কিন্তু ভিতরের ও বাহিরের শুচিতার দিকে তাঁর চিরজীবন এমন তীক্ষ্ণ ছিল যে খাদ্য না জুটিলেও অপরিচ্ছন্নতা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। মাসে আড়াই টাকা তাঁর ধোপার খরচেই চলিয়া যাইত। শুধু ধুতি চাদর কাচাইয়া তিনি তৃপ্ত হইতেন না। প্রতি ধোপে বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, রুমাল সব কাচানো চাই। এখনও ধোপার হিসাব-লেখা পুরানো একটি খাতা পড়িয়া আছে। কিন্তু কাপড়চোপড় তাঁর বেশি ছিল না। সাদা কাপড়চোপড় দেখিয়া বন্ধুরা তাঁকে খুব বাবু মনে করিত। একদিন তাঁর ঐশ্বর্য খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বন্ধুরা লুকাইয়া বাক্সটি খুলিয়া ফেলিলেন। দেখা গেল মাত্র একখানি বাড়তি কাপড় আছে। তাঁর কাপড়চোপড় এতই কম ছিল এবং এমন জীর্ণ অবস্থা পর্যন্ত সেগুলিকে ব্যবহার করা হইত যে ছিঁড়িয়া গেলে কোরা রেলির থান কিনিয়া ধোপার বাড়ি দিবার আগেই তা পরিয়া কলেজ যাইতে হইত। তাঁর ঘরে থাকিত একটি চুনের ভাঁড়। বন্ধুবান্ধবেরা অন্যমনস্ক ভাবে কখনো দেয়ালে পান কি কালি বা অন্য কিছুর দাগ লাগাইয়া ফেলিলে রামানন্দের পরিচ্ছন্নতার রুচিতে আঘাত লাগিত, তিনি তখনই সেটাকে চুন দিয়া সাদা করিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন।

বৃত্তির ২০ টাকা প্রধান অবলম্বন করিয়া তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হইলেন। তখন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পড়িতেন বি. এ. ক্লাসে। আশুতোষ তখনই ছাত্রমহলে সুপ্রসিদ্ধ। রামানন্দের সহপাঠীরূপে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেন আশুতোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমন্তকুমার। প্রথমনাথ চট্টোপাধ্যায়ও সেই কলেজেই ভর্তি

হইলেন। 'প্রদীপ' কাগজে আছে "আশুতোষ তখন কলেজ-সম্মিলনীর সম্পাদক। ভালো বক্তা বলিয়া তাঁর যশ ছিল। তিনি একটি চায়না কোট গায়ে দিয়া কলেজে আসিতেন। চাদর ব্যবহার করিতেন না।"

২০ টাকা তো মাত্র বৃত্তি। তার দ্বারা প্রায় সব খরচ চালাইতে হইবে। অথচ এই সামান্য টাকার ভিতর হইতেও বন্ধুদের ধার দেওয়া কিংবা অর্থ সাহায্য করা তাঁর অভ্যাস ছিল। তাঁর মেসের বন্ধুদের মধ্যে দুই-এক জনের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তাঁরা চাহিলে রামানন্দ কখনো তাঁদের ফিরাইয়া দিতেন না। সেই বন্ধুদের মধ্যেই একজন পঞ্চাশ বৎসর পরেও এই-সব গল্প করিয়াছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের নিয়ম তখন খুব কড়া ছিল। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে জ্বরে একদিন রামানন্দ শয্যাগত হইলেন। জ্বরের জন্য দিন কয়েক কলেজ কামাই হইল। পরের মাসে যখন তিনি বৃত্তির টাকা আনিতে গেলেন, দেখিলে ২০ টাকার মধ্যে ১৩ টাকাই কাটা গিয়েছে। ঐ টাকা কয়টির উপরই তো তাঁর পড়াশুনা সব নির্ভর করে। পিতৃহীন বালক বড়ো বিপদে পড়িলেন। ঠিক করিলেন কলেজ ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু আর কয় মাস পরেই তো পরীক্ষা। অন্য কলেজ যেমন করিয়া হউক ঠিক করা চাই। শুনিয়াছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বেতন কিছু কম। শুনিয়া বৃদ্ধ পাদ্রির সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। এমন কৃতী ছাত্র অর্থাভাবে বিপদে পড়িয়াছেন দেখিয়া পাদ্রি সাহেব তাঁকে মাত্র ৪ টাকা বেতনেই ভর্তি করিয়া লইলেন। কিন্তু এ কলেজে ল্যাটিন না শিখিয়া পরীক্ষা দেওয়া যাইত না। কয়েক মাসের মধ্যেই রামানন্দকে ল্যাটিনের প্রথম পাঠ হইতে শিখিয়া সেই ভাষাই দ্বিতীয় ভাষা রূপে লইয়া এফ. এ. পরীক্ষা দিতে হইল।

কতকটা তাঁর স্মৃতিশক্তির আশ্চর্য প্রখরতার জন্য এবং কতকটা বোধহয় আলোর খরচ বাঁচাইবার জন্য তিনি আজকালকার ছেলেদের মতো আলো জ্বালিয়া রাত্রে পড়ার অভ্যাস করেন নাই। দিনের বেলাই সব পড়া সাঙ্গ করিয়া রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর তিনি ঘুমাইয়া পড়িতেন। এ-কালের ছেলেমেয়েরা পরীক্ষার সময় রাত্রে আলো জ্বালিয়া এত পড়ে দেখিয়া তিনি বলিতেন, "আজকালকার ছাত্ররা বোধহয় ক্লাসের পড়া কিছুই মন দিয়া শোনে না, না হইলে এত কেন খাটিতে হয়?" আধুনিক ছেলেদের অমনোযোগিতা ইহার একটা কারণ বটে ; কিন্তু আর-একটা কারণের কথা তিনি ভাবেন নাই। সব মানুষের বুঝিবার এবং মনে রাখিবার ক্ষমতা কি তাঁর মতন?

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে সেই বৎসর দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতেই পড়িতেন হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। রামানন্দ ও হরিপ্রসন্ন এই দুই বন্ধুই কলেজের ছাত্র রূপে অসত্যের ও অন্যায়ের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। দুই বন্ধুই ছিলেন ক্ষীণকায়। অসত্যের প্রতি ক্রোধপরায়ণ হরিপ্রসন্ন পরে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞানানন্দ নামে গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থার পর বহুকাল তাঁরা পরস্পরকে দেখেন নাই। অকস্মাৎ একদিন এলাহাবাদে সন্ন্যাসী স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সঙ্গে পুরাতন বন্ধুর দেখা। স্বামীজি পরিহাস করিয়া বন্ধুকে বলিলেন, "আপনাকে খাটিয়া খাইতে হয়, তাই আপনি কৃশই আছেন ; আমাকে রোজগার করিতে হয় না তাই আমি মোটা হইয়া গিয়াছি।" স্বামীজির জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই দুই বন্ধুর বন্ধুত্ব অক্ষত ও অক্ষুণ্ন ছিল। বহু বৎসর ধরিয়া এলাহাবাদে প্রতি বৎসর একবার অন্তত স্বামীজির সঙ্গে তাঁর দেখা হইত। সেখানে ইঁহাদের উভয়ের বন্ধু মেজর বামনদাস বসুর বাসভবনই ছিল বন্ধু-সম্মিলনের স্থান। বামনদাসবাবুর মৃত্যুর পরও যতবার স্বামীজির সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব হইয়াছে ততবারই তাঁর

একনিষ্ঠ বন্ধুটি তাঁর দর্শনলাভের চেষ্টা করিয়াছেন। দুজনের মধ্যে স্বামীজির বয়স কম ছিল। তিনিই বন্ধুকে পিছনে রাখিয়া পরপারের পথে আগাইয়া গেলেন, ইহাতে জীবনসন্ধ্যায় রামানন্দ বড়ো বেদনা পাইয়াছিলেন। এলাহাবাদে স্বামীজি একটি মঠ-স্থাপনা ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন।

এফ. এ. পরীক্ষা অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দিতে হইয়াছিল। কিন্তু সাধনায় সিদ্ধি মেলে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ এপ্রিল এফ. এ. পরীক্ষা শেষ করিয়া রামানন্দ বুঝিলেন কলেজ বদল, বিষয় বদল করা সত্ত্বেও পরীক্ষায় তিনি নিতান্ত মন্দ হইবেন না। ডায়েরিতে লিখিয়া রাখিলেন, "The examination is over. Done indifferently well. I have learnt one lesson and may never forget it ! A calm continuous application is the key to success." (পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। মন্দ করি নাই। আমি একটি শিক্ষা পাইয়াছি। হয়তো ইহা কখনো ভুলিব না। স্থির অধ্যবসায়ই সফলতার পথ।)

সেই খাতাতেই আছে :

May 26. "I am fourth in order of merit in the F. A. Examination, '85. God be praised. I lay claim to no part of the merit... ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।" (আমি এফ. এ. পরীক্ষায় গুণানুসারে চতুর্থ হইয়াছি। ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি সফলতায় কোনো গৌরব দাবি করি না.. ।) যদি এত বাধা-বিপত্তি না অতিক্রম করিতে হইত, হয়তো তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। কিন্তু প্রতি পরীক্ষার সময়ই বড়ো বড়ো বাধা আসিয়া তাঁর অধ্যবসায় ধৈর্য ও শক্তি পরীক্ষা করিয়াছে। তবু তিনি চতুর্থ স্থান এবারেও পাইলেন। উচ্চ স্থান পাওয়ায় বালকোচিত আনন্দে এবং গর্বে উচ্ছ্বসিত হইলেন না, অথবা প্রথম না হওয়ায় আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ মনে করিলেন না। সেই বয়সেই বিধাতাকে সিদ্ধিদাতা বলিয়া জানিয়া কেবল তাঁকেই স্মরণ করিলেন। ডায়েরির ঐ কয়টি কথা পড়িয়া মনে হয় কলেজ-বদল ইত্যাদি ছাড়া অন্য বাধাও তিনি পাইয়াছিলেন। এবার চতুর্থ হওয়ায় ২৫ টাকা বৃত্তি পাইলেন। কত সামান্য টাকায় যে তাঁকে কলিকাতায় পড়াশুনা চালাইতে হইত, ডায়েরির একটি সামান্য লাইনে তা বুঝা যায় : "Pecuniary difficulties will soon be overcome." (টাকাকড়ির কষ্ট শীঘ্র দূর হইবে।) ২৫টি মাত্র টাকাতেই তৃপ্ত। আশা করিতেছেন যে ইহাতেই শীঘ্র আর্থিক কষ্টের হাত হইতে মুক্তি পাইবেন। বাড়িতে তখনও ছোটো ভাই এবং বড়ো ভাগিনেয়ের পাঠ্যাবস্থা। সকলে তাঁর মুখ চাহিয়া আছে। বড়োরা দুই ভাই চাকরিতে ঢুকিয়াছেন ; কিন্তু তাঁদের বিবাহ হইয়াছে, সন্তান হইয়াছে, আয়ও কম। মা এই তৃতীয় পুত্রটির ভরসাতেই দিন গুণিতেছেন। এবারেও পরীক্ষাতে তেমনি পণ্ডিত ডাকিয়া চণ্ডীপাঠ দেবার্চনা করিয়াছেন। এই ছেলেকে ভগবান মানুষ করিয়া তুলিলে মা আবার একটু সচ্ছলতার মুখ দেখিতে পাইবেন। মাতার যেমন সন্তানের উপর নির্ভর ও বাৎসল্য ছিল, সন্তানেরও তেমনি মাতৃভক্তি ছিল। কী করিয়া তাঁর দুঃখ দূর করিবেন এই চিন্তা তাঁহার মনে অহর্নিশি ছিল।

পাস করিবার পর বি. এ. পড়িবার জন্য আবার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইলেন। কিন্তু শুধু পাঠ্য পুস্তক পড়িয়া আর পাস করিয়াই কি তিনি ছাত্রাবস্থা কাটাইয়াছিলেন ? তাহা নয়, এই ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার জীবনের গতিপথ তিনি স্থির করিয়া লন।

চরিত্রের বিকাশ

ভগবান তাঁহার দান বিলাইবার সময় মানুষে মানুষে প্রভেদ করেন না এই বিশ্বাস লইয়া যে পৃথিবীতে চলিতে আরম্ভ করে তার সমস্ত কাজেই তার ছাপ থাকে। রামানন্দ কলিকাতা আসিবার পূর্বেই বাঁকুড়ায় বাল্যকাল হইতেই এই সাম্যনীতির অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার বন্ধুত্বে ভালোবাসায় এবং আচারে-ব্যবহারে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমানের ভেদ ছিল না। এক মুসলমান বন্ধুর বাড়িতে তিনি এবং তাঁহার কয়েকজন বালক বন্ধু প্রায়ই ভোজ খাইতে যাইতেন। কিন্তু সেটা ছিল ঘরোয়া ব্যাপার, কেহ জানিত না। এদিকে একবার বাঁকুড়ায় কুলভী মহাশয় মাঘোৎসবে খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করিলেন। এই ছেলেরা সেখানে খুব খাইয়া দাইয়া আসিল। পাড়ার কয়েকটি মাতব্বর লোক তাহা জানিতে পারিয়া মহা আন্দোলন শুরু করিয়া দিলেন :— এই ছেলেরা কুলভীর বাড়িতে অখাদ্য ও নীচ লোকের রন্ধন খাইয়াছে, ইহাদের পতিত করা উচিত। কয়েকটি বালক ভীত হইল। রামানন্দকে তারা বিপদের কথা বলিল। তিনি ভয় পাইবেন কেন? কিন্তু তাঁর রসবোধ ছিল। তিনি বলিলেন, 'চুপ করে থাকো না, কে কী করে দেখছি। আমরা তো শুধু মাঘোৎসবে খাই নি। আবদুলের বাড়িতেও খেয়েছি। মাতব্বর মশায়ের ভাইও খেয়েছেন। আমরা নাম করে বলব যে আমরা এই ক'জন মুসলমানের অন্ন খেয়েছি।' গল্পটি মাতব্বরের কানে গেল। পরের ছেলেদের পতিত করার উৎসাহ আর কোথাও দেখা গেল না।

শ্রীনাথের একটা বৈঠকখানা বাড়ি ছিল। পাড়ার ছেলেরা শুধু দুষ্টামি আর দুর্দান্তপনা করিয়া বেড়ায় এটা রামানন্দের ভালো লাগিত না। তিনি পিতার বৈঠকখানায় কীর্তন ও ব্রহ্মসংগীতের আসর করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যে গান করিতেন এ কথা এখন কেউ জানে না। কিন্তু যাঁহারা তাঁর ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠের নাম-কীর্তন শুনিয়াছেন তাঁহারা চিরজীবনই তাহা মনে রাখিয়াছেন। নাম-কীর্তনের সময়ও পাড়ার অনেকে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতেন। কিন্তু রামানন্দের শান্ত ব্যবহারে অনেক সময় ক্রুদ্ধ প্রতিবেশীরা নিজেরাই লজ্জিত হইয়া ক্ষমা চাহিতেন।

বাঁকুড়ায় রমেশচন্দ্র দত্ত, কেদারনাথ কুলভী প্রভৃতির চরিত্র ও কার্য যেমন ছাত্রদের উপর কাজ করিত, তেমনই সিভিল সার্জন রসিকলাল দত্তের কোনো কোনো কাজও ছাত্রদের চরিত্রগঠনে সাহায্য করিত। ইনি স্কুলের ছেলেদের একটি ফায়ার ব্রিগেডের দল গঠন করিয়াছিলেন। একবার কোনো জায়গায় আগুন লাগিবার পর ছেলেরা যখন আগুন নিভাইবার ও চাল কাটিবার জন্য জ্বলন্ত ঘরের চালে উঠিতেছিল, তখন রামানন্দ চেষ্টা করিয়াও চালে উঠিতে পারেন নাই। রসিকলাল পিঠ নীচু করিয়া রামানন্দকে কাঁধে করিয়া চালে তুলিয়া দেন।

বাঁকুড়ায় কোনো সময় কবি মাইকেলও সম্ভবত গিয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর ও বাক্‌পটুতার খ্যাতি মহিলা-মহলেও প্রচারিত ছিল। হরসুন্দরী দেব কাহারো উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিলে বলিতেন, "চেঁচাচ্ছে যেন ঠিক মাইকেলটা।" মাইকেলের কাব্য স্কুলের ছেলেদের বীররসে উদ্‌বুদ্ধ করিতে বিশেষ সাহায্য করিত। রামানন্দের ইহা বিশেষ প্রিয় ছিল।

সংস্কারমুখী তরুণ উৎসাহী মন লইয়া রামানন্দ যে সময় কলিকাতায় পড়িতে আসেন তখন নানা দিক দিয়া কলিকাতায় অর্থাৎ বাংলা দেশে একটা নূতন যুগের সাড়া পড়িয়াছে। স্বাভাবিক বহুমুখী প্রতিভা আর মননশীলতা শুধু পরীক্ষার পড়ার ভিতর তাঁকে বাঁধিয়া

রাখিতে পারে নাই। দেশের নানা আন্দোলনে তিনি গভীর উৎসাহ ও অনুসন্ধিৎসা লইয়া যোগ দিবার সুযোগ গ্রহণ করিলেন। দেশের নানা আদর্শবাদ ও ব্রাহ্মসমাজের আরো নিকটে এইবার তিনি আসিলেন। রাজা রামমোহনের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার এবং একেশ্বরবাদের আদর্শ, পরমহংসদেবের আধ্যাত্মিকতা, কেশবচন্দ্রের 'সুলভ সমাচারে' জ্ঞানবিতরণ তাঁকে বাংলার নিভৃত কোণেই নানাদিকে সজাগ ও অগ্রসর করিয়াছিল। এখন ছাত্রসমাজের সাহায্যে শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুপম চরিত্রের প্রভাবে তাঁর অন্তরের সমস্ত ঐশ্বর্য উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকুমার বিদ্যারত্ন এবং তাঁদেব আর-কয়েকজন বন্ধু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা বলিলেন, "এখানে সব মানুষের সমান অধিকার এবং নিছক খাঁটি সত্যের সম্মান এখানে সব চেয়ে বেশি।" এখানে তখন গঠনের যুগ, ত্যাগের যুগ, সেবার ভক্তির ও প্রেমের যুগ। শিবনাথ শাস্ত্রীর "প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কাজে তাঁর, এই ভাবে দিন কাটুক আমার" এই বাণী যুবকদের মাতাইয়া তুলিয়াছে। তা ছাড়া স্বাধীনতা ছিল শাস্ত্রীমহাশয়ের জীবনের মূল মন্ত্র। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন ; গবর্নমেন্টের চাকুরি করিবেন না। পুরুষের ২১ এবং কন্যার ১৬ বৎসর পূর্ণ হইবার আগে বিবাহ দিবেন না, জাতিভেদ বক্ষা করিবেন না।" কুচবিহার-সেনকন্যা বিবাহের অল্পদিন মাত্র আগে সবন্ধুবর্গ শাস্ত্রীমহাশয় একদিন বিশেষ উপাসনা করিয়া প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষর করিয়া আগুন জ্বালিয়া ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া ঐ অগ্নিতে নিজ নিজ নাম অর্পণ করিলেন। আবার প্রার্থনা করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্র দ্বিতীয়বার পাঠ করিয়া স্বাক্ষর করিলেন। এই সকল প্রতিজ্ঞা তাঁরা চিরজীবন পালন করিয়াছিলেন ; কিন্তু কুচবিহার-বিবাহের ফলে পুরাতন দল ভাঙিয়া দুইখানা হইয়া গেল এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাজের সূচনায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭০০০ টাকা দিয়া সাহায্য করেন।

রামানন্দের কলিকাতা আসার পাঁচ বৎসর পূর্বের এই-সব ঘটনা। কিন্তু তখনও সেই-সব প্রতিজ্ঞার ছাপ নবাগত যুবকদের মনে নূতন উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিতেছে। তাঁরা তাই নিজেদের জীবনেও এই-সকল প্রতিজ্ঞা হইতে কখনো চ্যুত হন নাই। বিদ্যাসাগর ছিলেন তখনকার আর-এক জন আদর্শ পুরুষ। ইঁহার প্রতিও রামানন্দের গভীর অনুরাগ ছাত্রাবস্থাতেই জন্মায়। সচরাচর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কাহারো সহিত দেখা করিতে যাওয়ার অভ্যাস জীবনে তাঁর কখনো ছিল না, কিন্তু তাঁর এক বাল্যবন্ধু বিদ্যাসাগরের আত্মীয় ছিলেন বলিয়া তাঁর সহিত ইনি বিদ্যাসাগর দর্শনে যান। বিদ্যাসাগর মহাশয় অল্পবয়স্ক ছেলে দেখিয়া প্রথমেই "কী খাবি?" বলিয়া নিজের তক্তাপোষের তলা হইতে রসগোল্লার হাঁড়ি বাহির করিলেন এবং বালকদের খাইতে দিলেন। এই স্নেহপ্রবণ মানুষটির বাৎসল্য তাঁকে মুগ্ধ করিয়াছিল। উওর জীবনে বিধবাদের দুঃখের কথা ও বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-রূপ প্রধান কীর্তির কথা রামানন্দ যত বলিয়াছেন আর কোনো বাঙালি তত বলেন নাই।

আনন্দমোহন বসুও তখন একজন দেশনায়ক। তিনি বিলাত হইতে ফিরিবার পথে বোম্বাইয়ের ছাত্রদের দেশসেবা দেখিয়া বাংলার ছাত্রদেরও সেইভাবে গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছা করেন। সেই ইচ্ছার ফলস্বরূপ আনন্দমোহন এবং সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি 'স্টুডেন্ট্স্ অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপন করেন। রামানন্দ বলিয়াছেন, "আমরা যখন কলিকাতায় পড়তে আসি তখন 'স্টুডেন্টেস্ অ্যাসোসিয়েশন' নামক একটি সভা ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার সভ্যদের নেতা ছিলেন। এই সভার অধিবেশন হিন্দুস্কুলের একটি ঘরে হতে দেখেছি।

সেই কক্ষে গ্যালারি ছিল। কত যুবক সুরেন্দ্রনাথের পরিচালনায় দেশসেবায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন!"

বাঁকুড়ায় রমেশচন্দ্রের দেশপ্রেমজাত উপন্যাস এবং নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের কাব্যাদি যাঁকে দেশসেবায় উদ্‌বুদ্ধ করিত সেই শান্ত নীরব যুবকটি— সুরেন্দ্রনাথের উন্মাদিনী দেশভক্তিতে মনে মনে মাতৃপূজার মন্ত্রে আরো গভীরভাবে দীক্ষিত হন। ১৮৮৩ সালের ৫ মে হইতে ৪ জুলাই পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথের জেল হয়। এই সময় রামানন্দ নূতন ছাত্ররূপে কলিকাতায়। যেদিন সুরেন্দ্রনাথের খালাস পাইবার কথা, সেদিন খুব ভোরে হাজার হাজার লোক তীর্থযাত্রীর মতো প্রেসিডেন্সি জেলের দিকে যাত্রা করিল। তখন সেই জেলের নাম ছিল হরিণবাড়ি জেল। গড়ের মাঠে এখন যেখানে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দির, সেইখানে ছিল এই জেল। সেইদিন শেষ রাত্রি হইতে ভরাবর্ষা শুরু হইয়াছে, মুষলধারে বৃষ্টি! কিন্তু তরুণ ছাত্রদের উৎসাহের কাছে বৃষ্টি সামান্য জিনিস! রামানন্দ আর তাঁর বন্ধুরা শোভারাম বসাকের লেন হইতে হরিণবাড়ি জেল পর্যন্ত ভিজিতে ভিজিতে যাত্রীদলের সঙ্গে চলিলেন। কিন্তু তাঁদের অদৃষ্টে দেশ-সেবকের দর্শন ছিল না। গেটের কাছে পৌঁছিবাব কিছু পরে খবর পাওয়া গেল যে সুরেন্দ্রনাথকে রাত থাকিতেই মুক্তি দিয়া গাড়ি কবিয়া তালতলায় তাঁর পৈত্রিক বাড়িতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিরাট জনবাহিনী আবার চলিল তালতলার দিকে। সেখানে তখন লোকে লোকে লোকারণ্য, বাড়িতে কোনো স্থান নাই। সুরেন্দ্রনাথের বন্ধু আনন্দমোহন জনতাকে উদ্দেশ করিয়া বক্তৃতা করিতেছেন। সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতার সঙ্গে ছাত্র-বয়স হইতে এই-সব তরুণ যুবকের পরিচয় ছিল। শেষজীবনে সুরেন্দ্রনাথ যতখানি রাজনৈতিক অধিকারে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন রামানন্দ-প্রমুখ তাঁর অনেক বয়ঃকনিষ্ঠরা তাতে সন্তুষ্ট হন নাই। কিন্তু তার জন্য যৌবনে যিনি তাঁদেব দেশপ্রেমে এতখানি প্রেরণা দিয়াছিলেন তাঁব প্রতি রামানন্দ শ্রদ্ধা হারান নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "বয়ঃকনিষ্ঠ আমাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের রাজনৈতিক আকাঙক্ষার দাবি ও আশা যে তাঁহার চেয়ে বেশি হইয়াছে তাহারও প্রধান কারণ তিনি জাতীয়তার ভাব উদ্‌বুদ্ধ না করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা সংস্কার ও অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন না করিলে, একজাতীয়তার আদর্শ সমগ্র দেশে, সকলের মনে মুদ্রিত করিবার চেষ্টা না করিলে, আমাদের আকাঙক্ষা দাবি ও আশা আদর্শ বর্তমান আকার ধারণ করিত না।"

সুরেন্দ্রনাথ জেল হইতে বাহির হইবার পরই রাজনৈতিক কাজ চালাইবার জন্য "ন্যাশন্যাল ফন্ড" নামে এক তহবিল খোলা হইল। তারই কয়েক মাস পরে ১৮৮৩র ডিসেম্বরে আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির চেষ্টায় 'ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কনফারেন্স' ডাকা হয়। এই হইল কংগ্রেসের সূচনা। ঠিক সেই বৎসরই কিছু পূর্বে রামানন্দ প্রথম কলিকাতায় আসেন।

ছাত্রসমাজ

এই সকলের আগেই ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে ছাত্রদের জ্ঞানে কর্মে চরিত্রে গড়িয়া তুলিবার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রী ও আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি ছাত্রসমাজ স্থাপন করেন। তারও কিছু দিন পূর্বে কতকগুলি উৎসাহী এবং অনুরাগী ব্রাহ্ম যুবককে শিক্ষকতার কাজ দিয়া নিজেদের কাছে রাখিবার জন্য এবং তরুণ বালকদের মনে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের আদর্শ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করারও সংকল্প শাস্ত্রী মহাশয়েরা করেন। শাস্ত্রী মহাশয়, আনন্দমোহন বসু আর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সেকালের বাঙালি যুবকদের প্রধান নেতা। শাস্ত্রী মহাশয়েরা অনুরোধ করাতে সুরেন্দ্রবাবুও স্কুলের প্রস্তাবনা-পত্রে নাম দিতে স্বীকৃত হইলেন। তিন জনের নামেই পত্রটি বাহির হইল। আনন্দমোহন বসু স্কুলের সরঞ্জামের টাকা ধার দিলেন, শাস্ত্রী মহাশয় হইলেন সেক্রেটারি এবং পড়াইতে শুরু করিলেন সুরেন্দ্রনাথ। এক দিনেই স্কুল বসিয়া গেল। এই সিটি স্কুল, পরে কলেজও হয়। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছিলেন, "সিটি স্কুল স্থাপন যেন রোম রাজ্যের পত্তন।" ছাত্রসমাজের মতো সিটি স্কুলও সেকালের ছাত্র এবং যুবকদের চরিত্র গঠনে আশ্চর্য কাজ করিয়াছিল।

প্রতি রবিবারে সিটি স্কুলের হলে ছাত্রসমাজের অধিবেশন হইত। সংক্ষিপ্ত উপাসনার পর বক্তৃতাদি। বক্তৃতার বিষয় প্রধানত ছিল ধর্ম, সমাজ, নীতি এবং রাষ্ট্রনীতি। শাস্ত্রী মহাশয়েরা ছিলেন প্রধান নেতা। তখনকার দিনে ইঁহারা দুই-এক জন ছাড়া ছাত্রদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয় ভাবিবার আর কেহ ছিল না। কাজেই ছাত্রসমাজ শিক্ষিত ও চিন্তাশীল যুবকদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আনন্দমোহন আর শিবনাথ এক-এক সময় তিন-চারি শত ছাত্র লইয়া শিবপুরের বাগানে কিংবা অন্য কোথাও ভ্রমণে যাইতেন। বাগানে বক্তৃতা আমোদ-আহ্লাদের আয়োজন হইত। কয়লাঘাট হইতে নৌকা চড়িয়া নিশান হাতে ছাত্রের দল যখন গান করিতে করিতে যাত্রা করিতেন, তখন নদীর দুই পাড়ে লোক দাঁড়াইয়া যাইত। বাগানে গাছতলায় সব ছেলেরা একত্রে মহানন্দে খাইতে বসিত। সে যুগের ছাত্ররা সে-সব দিন জীবনে ভুলেন নাই। রামানন্দ ছাত্রসমাজের একজন অনুরাগী সভ্য ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, "ব্যক্তিগত ভাবে আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির নিকট আমাদের যৌবনকালের হৃদয়-মনের জাগৃতির জন্য গভীর ভাবে ঋণী।" এইখানেই সম্ভবত ধীরে ধীরে তিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুরক্ত ভক্ত ও ঘনিষ্ঠ শিষ্য হইয়া উঠেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের এক শিষ্য বলেন, "শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন লোকশিক্ষক। তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিত্তোন্মাদিনী বাগ্মিতা ও গভীর পাণ্ডিত্য তাঁহাকে জনশিক্ষার কার্যে আশ্চর্য সাফল্য দিয়াছিল। তাঁহার কথাতে শ্রোতার মনে একটা ধাক্কা লাগিত, তাহার চিন্তার দ্বার খুলিয়া যাইত, সে নূতন কিছু শিখিয়া গৃহে ফিরিত।" রামানন্দ বলিতেন, "মানুষ হইতে হইলে ও দেশহিত করিতে হইলে তাঁহার মতো পরিশ্রম করিতে হইবে। আজকাল নেতা হইবার অনেক সোজা পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে ; তাহাতে নেতা হওয়া যায়, বিখ্যাতও হওয়া যায়; কিন্তু মানুষ হওয়া যায় না, প্রকৃত দেশহিতও করা যায় না।" গুরু-প্রদর্শিত এই মানুষ হওয়া ও দেশহিত করার পথ রামানন্দ অবলম্বন করেন।

বিবাহ

শ্রীনাথ মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর তৃতীয় পুত্র রামানন্দের বিবাহের জন্য কন্যা নির্বাচন করেন। কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যুর ফলে এই বিবাহ দেখার সাধ তাঁর পূর্ণ হয় নাই। কন্যার পিতা ওঁদাগ্রাম নিবাসী হারাধন মিশ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়) মহাশয় তাঁর সুন্দরী দ্বিতীয়া কন্যার জন্য কোনো ধনী পরিবারে পাত্র পাইয়াছিলেন। কিন্তু হারাধনের পত্নী স্বর্গীয় শ্রীনাথের ইচ্ছা স্মরণ করিয়া এবং মনোরমা দেবীরও মনোভাব কতকটা সেই রকম অনুমান করিয়া অন্যত্র কন্যার বিবাহ দিতে রাজি হন নাই।

শুনিয়াছি অল্পবয়সে বালিকা কন্যা বিবাহ করিবার ইচ্ছা রামানন্দের ছিল না। কিন্তু ভাইদের ও সম্ভবত মাতার অনুরোধে—১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি বিবাহ করিতে রাজি হন। যখন বিবাহ হয় তখন বধূ মনোরমা দেবীর বয়স ১২ বৎসর ৭ মাস। ওঁদাগ্রামে তাঁর পিতার পাকা বসতবাড়ি ছিল। কিন্তু কার্য উপলক্ষে তাঁকে বাঁকুড়া শহরে থাকিতে হইত বলিয়া তিনি তখনকার লালবাজার পাড়ায় একটি মাটির বাড়ি করিয়াছিলেন। সপরিবারে বেশি দিন তিনি এই বাড়িতেই থাকিতেন। তিনি ধলভূম রাজ স্টেটের মোক্তার ছিলেন বলিয়া বাঁকুড়া হইতে আরণ্য পথে বহুবার ঘাটশিলায় যাতায়াত করিতেন। সেই নিবিড় অরণ্যে কতবার বন্য হাতির পালের সম্মুখে তাঁদের পড়িতে হইয়াছিল। তখনকার ঘাটশিলার রাজা অথবা রাজার নিকট-আত্মীয়ের কাহারো নাম ছিল লক্ষণচন্দ্র ধবল দেব।

জামাতাকে মিশ্র মহাশয় ঘড়ি চেনের জন্য ৭০।৭৫ টাকা দিয়াছিলেন। কিন্তু সে টাকা জামাতার বাড়ির লোকেরাই গ্রহণ করিয়াছিলেন, জামাতা করেন নাই। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ-পরিবারে বিবাহে পণের ঘটা ছিল না। সিঁথি-পাটি মাকড়ি নোলক আর দুই-একটি ছোটো সোনার গহনা দিয়া কনে সাজানো হইল। কন্যার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ঘন কালো চুল ঘাড় ও কাঁধের উপর পর্যন্ত পড়ে, খোঁপা বাঁধার মতো লম্বা নয়। তপ্তকাঞ্চনের মতো রঙ, লক্ষ্মীপ্রতিমার মতো গড়ন, ছোটোখাটো—পাতলা মেয়েটি। দ্বিরাগমনের পর যখন শ্বশুরবাড়ি গেলেন তখন পাড়ার মহিলারা মন্তব্য করিলেন, "এমন সুন্দরী বউ পাঠকপাড়ায় কখনো আসে নি।" পুত্রবধূকে নানা অলংকারে সাজাইবার ক্ষমতা হরসুন্দরী দেবীর ছিল না। তিনি শুধু এক জোড়া সোনার বালা দিয়া নববধূর মুখ দেখিলেন। তাহাতে নববধূ ক্ষুণ্ণ হইলেন না। তিনি স্বামীর কাছেও কখনো কোনো গহনা চান নাই। গহনা আর সাজপোশাকের দিকে তাঁর কখনো ঝোঁক ছিল না।

মনোরমা দেবীর মাতা অম্বিকা দেবী বাংলা লেখাপড়া জানিতেন। সেইজন্য তিনি তাঁর সব মেয়েদেরই অল্প বাংলা লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। মনোরমা দেবীর দিদি হেমলতা যখন স্কুলের পড়ার জন্য শুভঙ্করী মুখস্থ করিতেন, তখন মনোরমা সাত বৎসর বয়সেই মনোযোগ দিয়া রামায়ণ পড়িতেন এবং দিদির ও অন্যান্য সঙ্গিনীদের রামায়ণ-জ্ঞানের পরীক্ষা লইতেন। আশু বাঁড়ুয্যে নামক এক বাঙালি খ্রিস্টিয়ান-মিশনরির স্ত্রী কাদম্বিনী বিবাহের পর মনোরমা দেবীকে সামান্য ইংরাজি পড়াইয়াছিলেন এবং কিছু সেলাই শিখাইয়াছিলেন।

হারাধন মিশ্র সেকালের মানুষ, কিন্তু তাঁর কন্যাবাৎসল্য লক্ষ্য করিবার মতো ছিল। তাঁর পাঁচ-ছয়টি কন্যা পরে পরে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি পিতৃস্নেহে কন্যাদের সর্বদা ঘিরিয়া রাখিতেন। অন্য কেহ অনাদর করিলে রাগ করিতেন। তাঁর দুই-তিন কন্যার পর আবার একটি কন্যা জন্মাইলে আত্মীয়-স্বজনে তাহার 'ক্ষান্তমণি' জাতীয় নাম রাখিতে চাহিলেন। হারাধন

বিরক্ত হইয়া তাঁদের তিরস্কার করিয়া কন্যার নাম 'জ্যোতির্ময়ী' রাখিলেন।

শৈশবে মনোরমা চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে ছিলেন। বনেজঙ্গলে ছাতু কুড়াইয়া, ফুল তুলিয়া, ফল পাড়িয়া, কড়াইশুঁটির ক্ষেতে কড়াইশুঁটি ছিঁড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালোবাসিতেন। সারা দুপুর সঙ্গিনীদের সঙ্গে পুকুরের জলে "ঝাঁপাইয়াও" তাঁর তৃপ্তি হইত না। স্বভাবপ্রীতি তাঁর প্রবল ছিল। অল্প বয়স হইতেই তিনি কবিতা লিখিতেন এবং বাঁকুড়ার গ্রাম্য সংগীত ও বৈষ্ণব সংগীত গাহিতেন। তাঁর অশিক্ষিত কণ্ঠমাধুর্যের তুলনা বেশি মিলে না। শুধু যে তাহা সুমিষ্ট ছিল তা নয়, তাঁর কণ্ঠে এতখানি জোর ছিল যে তিনি একলা একটা সভা জমাইতে পারিতেন। নৃত্যেও শৈশবে তিনি নিপুণ ছিলেন।

মনোরমা প্রফুল্লস্বভাব ছিলেন এবং নিত্যনৈমিত্তিক কাজে কখনো পাঁচজনের অনুকরণ করিতেন না। বিবাহের পর অষ্টমঙ্গলার জন্য এবং দ্বিরাগমনের সময় তিনি যখন শ্বশুরবাড়ি আসেন তখন একবারও কান্নাকাটি করেন নাই, লোকদেখানো কোনো কাজ করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল বলিয়া শ্বশুরবাড়ি গেলেই কাঁদিতে হয় এই প্রথা তিনি রক্ষা করেন নাই! তিনি নিজ মাতা ও মাতামহীর মতো সাহসী ছিলেন, ভয় বলিয়া কোনো জিনিসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না বলিলেই চলে। মনোরমা দেবীর মাতামহী বৃদ্ধ বয়সে জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া হিংস্র ব্যাঘ্র তাড়াইয়াছিলেন, মাতাও সাপ, চোর প্রভৃতির সহিত একলাই দরকার মতো লড়িতেন।

রামানন্দ বিবাহের সময় বি. এ. ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। সেইজন্য মনোরমা বিবাহের পর একটানা শ্বশুরবাড়িতে বাস করেন নাই। কিছু কাল আসা-যাওয়া করার পর পনেরো বৎসর বয়স হইতে বোধহয় নিয়মিত থাকেন। শ্বশুবাড়িতে দুই ননদ, দুই জা, শাশুড়ি, দেবর. ভাগিনেয়, ভাসুরপো এবং আরো অনেক আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করিয়া তিনি কাটাইয়াছিলেন। সেকালের বাঙালি গৃহস্থ সংসাবে ঝি-বউরা যেমন ছেলেবেলা হইতেই রান্না, ধানভানা, মুড়িভাজা, যাবতীয় কাজ করিতেন, মনোরমাও সেইভাবেই কাজের হাতে-খড়ি করিয়াছিলেন। তিনি চিরজীবনই কর্মিষ্ঠা ছিলেন।

কলেজের শেষ দুই বৎসর। জগদীশচন্দ্র ও হেরম্বচন্দ্র

১৮৮৭-র গোড়াতেই রামানন্দ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। বালিকা বধূ এই বয়সেই বর্ষীয়সীর মতো স্বামীর সেবাযত্নে সমস্ত মন ঢালিয়া দিলেন। বিধাতা রোগমুক্তি দিলেন বটে, কিন্তু অতি দুর্বল শরীর লইয়া তাঁকে কলিকাতায় ফিরিতে হইল। কয় মাস পরে বি. এ. পরীক্ষা। তখন বি. এ. পরীক্ষাতে বিজ্ঞান লওয়া চলিত। রামানন্দ প্রেসিডেন্সি কলেজে তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে গণিত ও বিজ্ঞান পড়িতেন। প্রথম কয়েকদিন পরীক্ষা দিবার পর রামানন্দের হঠাৎ একদিন মনে হইল যে তিনি ভালো লিখিতে পারেন নাই। বিজ্ঞানের একটা পরীক্ষা তখনও বাকি ছিল। তিনি সে পরীক্ষাটা না দেওয়াই স্থির করিলেন। কাজেই সে বৎসর গেজেটে যে তাঁর নাম উঠিল না তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ছাত্রমহলে সে বৎসর আশ্চর্য একটি গল্পের বিষয় হইলেন তিনি। সকলেই বলাবলি করিত, "এ বৎসর যে ছাত্রটি ইংরাজি অনার্সে প্রথম হইয়াছে সে মোটের উপর পাস হয় নাই।" তিনি ইংরাজির মোট ৩০০ নম্বরের মধ্যে ২৫০-এর অপেক্ষা বেশি পাইয়াছিলেন। বাড়িতে গল্প অন্য হইল। অনেকেই বলিলেন, "বৌয়ের জন্যে ছেলেটা এবার পাস হইল না।" প্রেসিডেন্সি কলেজ

হইতে পরীক্ষা দিয়া রামানন্দের সহপাঠী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সেবার ঈশান-স্কলার হইয়া বাহির হইলেন।

বি. এ. পাস করিতে পারিলেন না, স্কলারশিপ আর পাওয়া যাইবে না, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া আর হইবে না। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি বহু বিখ্যাত পণ্ডিতের কাছে পড়িয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন বি-এ-তে টনি সাহেব ইংরাজি, ইলিয়ট সাহেব ফিজিক্স এবং পেড্‌লার কেমিস্ট্রি পড়াইতেন। বুথ সাহেব গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। আচার্য জগদীশও তখন প্রেসিডেন্সির অধ্যাপক ছিলেন। বিপিনবিহারী গুপ্ত গণিতের সহকারী অধ্যাপক রূপে তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়াইতেন। ইঁহারা সকলেই রামানন্দের গুরু। অধ্যাপক জগদীশ শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির প্রয়োজন অনুভব করিতেন। তাঁর বিষয়ে পবে রামানন্দ লিখিয়াছিলেন, "আমি তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। তিনি যখন অধ্যাপনা আরম্ভ করেন তখন থেকেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের যান্ত্রিক প্রমাণ প্রদর্শনে বিলক্ষণ নিপুণহস্ত ছিলেন।...আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালীর একটি দোষ এই যে, ইহাতে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিবার কোনো সুযোগ নাই। এই দোষ দূর করিবার জন্য বসু মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ আছে। তিনি একদিন আমাদিগকে সন্ধ্যাকালে তাঁহার বাস-ভবনে যাইতে নিমন্ত্রণ করেন। তখন তিনি বৌবাজার স্ট্রিটে থাকিতেন। সেখানে আমাদের জন্য আহার্য দ্রব্যের প্রচুর আয়োজন ছিল। তিনি আমাদের সহিত নানা বিষয়ে বন্ধুভাবে অমায়িকতার সহিত কথোপকথন করেন এবং রাস্কিন প্রভৃতি গ্রন্থকারের লেখা কিছু কিছু পড়িয়া শুনান। জগদীশবাবুর মুখচ্ছবিও কবির মতো। শুষ্ক বৈজ্ঞানিকের মতো নয়। তিনি সৌন্দর্যানুরাগী। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে। অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে তাহার বন্ধন তিনি সর্বদাই স্বীকার করেন।" জগদীশ ও রামানন্দ গুরুশিষ্যের এই সানুরাগ সম্বন্ধ আজীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারগুলির প্রচার করায় রামানন্দ একজন অদ্বিতীয় সহায় ছিলেন। প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ কাগজে জগদীশচন্দ্র বিষয়ে তিনি যত প্রবন্ধ ও তাঁহার যন্ত্রাদির যত চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন আর কেহ কোনো কাগজে তত করেন নাই।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার খরচ অনেক। সুতরাং ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রীষ্মের ছুটির পর রামানন্দ সিটি কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হইলেন। ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া ভাব করা তাঁর কোনো দিনই অভ্যাস ছিল না, কাজেই এখানেও ছেলেদের সঙ্গে তিনি বেশি কথা বলিতেন না, সকলের পিছনে বসিতেন। অধ্যাপকেরা কেহ তাঁকে চিনিতেন না। একদিন ইংরাজির অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় ছাত্রদের কী একটা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে দিলেন। সপ্তাহ-খানিক পরে প্রবন্ধগুলি পরীক্ষা করিয়া ক্লাসের ঘরে আসিয়াই অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করিলেন, "Who is Ramananda Chatterjee?" (কে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়?) রামানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গুরুশিষ্যের এই যে দৃষ্টি-বিনিময় হইল, তার ফলে দুইজনে আমরণ শ্রদ্ধা ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। রামানন্দের এক শিষ্য গল্পটি লিখিয়াছেন।

বহুকাল পরে রামানন্দ লিখিয়াছিলেন, "আমাকে অবস্থাচক্রে প্রেসিডেন্সি কলেজে, সেন্ট জেবিয়ার্স কলেজ ও সিটি কলেজে পড়িতে হইয়াছিল। পূর্বোক্ত দুটি কলেজে বাঙালি, ইংরেজ, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, এবং ইংরেজ নহেন এরূপ ইউরোপিয় কয়েকজন যোগ্য সাহিত্যাধ্যাপকের নিকট পড়িয়াছিলাম। তাঁহারা প্রশংসনীয়। তাঁহাদের সকলের প্রতি

সমুচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আমি মৈত্রেয় মহাশয়ের সম্বন্ধে বলিতে চাই যে, গভীর ভাব ও চিন্তার ব্যাখ্যায় তাঁহার সমকক্ষ কোনো অধ্যাপকের নিকট পড়িবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তিনি সুনীতির কঠোর ও দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। প্রকৃতিতে মানুষে এবং মানুষের রচিত ও সৃষ্ট সমুদয় বস্তুতে, সাহিত্যে, চিত্রে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে সৌন্দর্যের তিনি চির অনুরাগী ও রসগ্রাহী ছিলেন।" শিষ্যও সৌন্দর্যের অনুরাগী এবং রসগ্রাহী ছিলেন বলিয়া গুরুর এই গুণ তাঁহাকে আকর্ষণ করিত।

সিটি কলেজে এই সময় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। রামানন্দ ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন না, তাই তাঁর নিকট পড়িবার সুযোগ পান নাই, কিন্তু তাঁর সুশিক্ষকতার খ্যাতি এই-সব ছাত্রের কাছেও পৌঁছিত। উমেশচন্দ্রের নিরলস কর্মিষ্ঠতা রামানন্দকে মুগ্ধ করিত। তিনি কখনো উমেশচন্দ্রকে বাজে গল্প করিতে কিংবা খাস কামরায় বিশ্রাম করিতে দেখেন নাই। তাঁকে সর্বদাই কর্মনিরত দেখা যাইত।

উমেশচন্দ্রের ভগবদ্ভক্তি ও উচ্ছ্বাসহীন উপাসনা রামানন্দ হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন : "সাধারণত উপাসকেরা বাগ্মী আচার্যদিগের কবিত্বপূর্ণ উপাসনা পছন্দ করিয়া থাকেন। দত্ত মহাশয় বাগ্মী ছিলেন না, কবি প্রতিভাও তাঁহার ছিল না। কিন্তু জ্ঞানযোগে, পুণ্য কর্মযোগে ও সরল ভক্তিযোগে তিনি পরব্রহ্মের সহিত এরূপ যুক্ত ছিলেন যে, তাঁহার উপাসনা ধর্মপিপাসুদের সাতিশয় হৃদয়াগ্রাহী হইত।"

উমেশচন্দ্র তাঁহার প্রবর্তিত 'বামাবোধিনী' পত্রিকার সাহায্যে বাংলা দেশে নারী-চরিত্র গঠনে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি অনেক মহিলাকে লিখিতে উৎসাহ দিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। উমেশচন্দ্রের যত্ন না থাকিলে ইঁহাদের সাহিত্যিক খ্যাতি কখনো হইত না।

কর্মক্ষেত্রের সূচনা

সিটি কলেজে অধ্যাপনা

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে সিটি কলেজ হইতে বি. এ. ইংরাজি অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করেন রামানন্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বি. এ. পরীক্ষার্থীদের মধ্যে মোটের উপরও তিনি প্রথম হন। তাঁহার সহপাঠী সুরেন্দ্রচন্দ্র সবকাব, (ডা) অবিনাশচন্দ্র দাস, (জাস্টিস) বিপিনবিহারী ঘোষ প্রভৃতিও এই বৎসর বি. এ. পাস করেন। এই বৎসর মোহিতচন্দ্র সেন মহাশয় ইংরাজি অনার্সে দ্বিতীয় স্থান এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্রের পরামর্শে সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষ এই সদ্য বি. এ. উপাধি-প্রাপ্ত যুবককে ইংরাজির অধ্যাপকের কাজ করিতে দিলেন। প্রথমেই তাঁহাকে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়াইবার কাজ দেওয়া হইল, যদিও তখনও তাঁকে অধ্যাপক নাম এবং অধ্যাপকের পারিশ্রমিক কোনোটাই দেওয়া হয় নাই। এই সময় সিটি কলেজে উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে বি-এ-তে যিনি প্রথম হইতেন তাঁহাকে "রিপন স্কলারশিপ" নামে একটি বৃত্তি দেওয়া হইত। তাহা মাসিক ৪০ টাকার। সম্ভবত সেই বৃত্তির টাকার সাহায্যেই তাঁহার নিজের খরচ ও দেশে কিছু পাঠানোর কাজ চলিত। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর যে সব ছেলেদের তিনি পড়াইতেন তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ তরুণ অধ্যাপকটির চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। রজনীকান্ত গুহ মহাশয়ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে তখন পড়েন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "তাঁর মুখে শুনিয়াছি,

প্রথম দিন অধ্যাপনা করিবার কালে গায়ের জামা ঘামে ভিজিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই নবীন অধ্যাপককে পাইয়া আমরা শান্ত হইলাম। পূর্বে যাঁহারা ঐ বিষয়ের অধ্যাপনা করিতে আসিতেন, আমরা একটির পর একটি সকলকেই অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিলাম।

"অল্পকাল পরে একদিন প্রাতঃকালে আমি গোলদীঘির পূর্বে দিকের পথে যাইতেছি, এমন সময়ে হেরম্ববাবু অপর দিক হইতে আমাকে দেখিতে পাইয়া নিকটে আসিয়া সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—রামানন্দ কেমন পড়াইতেছে? আমি বলিলাম, তাঁহাকে পাইয়া ছাত্রেরা সন্তুষ্ট হইয়াছে। শুনিয়া তিনি খুব প্রীত হইলেন এবং বলিলেন, 'নব্য গ্রাজুয়েটদিগের মধ্যে (among the young graduates) আমি রামানন্দের ন্যায় খুব অল্পই দেখিয়াছি'।"

বি.এ.তে সগৌরবে প্রথম হওয়াতে রামানন্দ State Scholarship পাইলেন এবং তাঁহার বিলাতে পড়িতে যাইবার কথা উঠিল। বাড়িতে সকলেই এই ভাবিয়া আনন্দিত হইলেন যে, এইবার সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখা দিবে। কিন্তু অর্থ, খ্যাতি ও বিলাসের মোহ সেই স্বদেশভক্ত ও স্বাধীনচিত্ত যুবকের মনের ত্রিসীমানায় ছিল না। তিনি তখন আদর্শবাদিতায় তন্ময়। স্থির করিয়াছিলেন কখনো গবর্নমেন্টের চাকরি করিবেন না, কাজেই গবর্নমেন্টের বৃত্তিও প্রত্যাখ্যান করিলেন। বাড়ির কর্তা তখন তাঁর বড়দাদা। তিনি আলিপুর জেলে জেলার ছিলেন। এত কাছে থাকা সত্ত্বেও তাঁর পরামর্শের অপেক্ষা না করিয়াই রামানন্দ নিজ কর্তব্য স্থির করিয়া লইলেন যে ছাত্রটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন অগত্যা তাঁহাকে এই বৃত্তি দিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু তিনিও প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন আজিজ নামক একটি মুসলমান ছাত্রকে এই স্কলারশিপ দেওয়া হইল।

বহু বৎসর পরে বেহারের কোনো শহরে গিয়া রামানন্দ শুনিলেন যে, সেখানকার বড়ো এক রাজকর্মচারীর নাম আজিজ। তিনি তাঁকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "If you are the good old Aziz, then accept my greetings, if not excuse me." জবাব আসিল, "I am the same old Aziz. Come and see me."

বি. এ. পাস করার পরই অধ্যাপনা আরম্ভ করেন তথাপি রামানন্দ চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতেও পড়াইতে পারেন এরকম কথা হয়। এই সংবাদে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে সে বৎসর যাঁরা পাস করিতে পারেন নাই, তাঁদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। "শেষ কালে তোর কাছে পড়তে হবে!" এই বলিয়া দুই-এক জন সিটি কলেজ ছাড়িয়াই চলিয়া গেলেন। কলেজের বাহিরে বাড়িতে এইরকম সমবয়স্ক দুই-একজন বন্ধুকে তিনি নিয়মিত পড়া বুঝাইয়া দিতেন।

সেকালের সব কলেজে এম. এ. পড়ানো হইত না। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাস তো হয়ই নাই। সুতরাং ছাত্রেরা যে কলেজ হইতে বি. এ. পাস করিতেন, এম. এ. পরীক্ষাও সেই কলেজের নামেই দিতে পারিতেন। সিটি কলেজে অধ্যাপনা করার সময়ই রামানন্দ এম. এ. পাস করেন। এম. এ. পরীক্ষায় তিনি প্রথম হন নাই, চতুর্থ হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি তাঁর প্রিয় ছাত্র রজনীকান্ত গুহ মহাশয়কে তিনি বলিয়াছিলেন, "এম. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় পাঠ্য পুস্তক পড়িতে ভালো লাগিত না।" তিনি প্রথম হইবেন এ আশা সকলেই করিয়াছিলেন। কিন্তু সিটি কলেজে নিয়মিত ছেলে পড়ানোর কাজের উপর তখনই তাঁর অন্যান্য অনেক কাজ জুটিয়াছিল। বি. এ. পাস করিবার আগেই তাঁর মানসিক বিকাশ ও দেশ-সেবার ইচ্ছা এতখানি হইয়াছিল যে তিনি প্রচারক শশীভূষণ বসু-প্রকাশিত 'ধর্মবন্ধু'

কাগজের নিয়মিত লেখক হইয়া উঠিয়াছিলেন ; ব্রাহ্মসমাজের ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার' নামক সাপ্তাহিক পত্রের কাজও তখন হইতেই তিনি কিছু কিছু করিতেন। সে বৎসর এম. এতে ইংরাজিতে প্রথম হইয়াছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়। রামানন্দ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য চেষ্টা করিবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু কাজের ভিড়ে তাহারও সময় পান নাই।

'ধর্মবন্ধু'র লেখক ও সম্পাদক

'ধর্মবন্ধু' নামক মাসিকপত্র ১৮৮০ (বাংলা ১২৮৮) খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ইহা পাক্ষিক ছিল, পরে মাসিক পত্র হয়। ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন ব্রাহ্ম প্রচারক শশীভূষণ বসু মহাশয়। বৈষয়িক দিক দেখিতেন তাঁহার ভ্রাতা অধরচন্দ্র বসু। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দ 'ধর্মবন্ধু'র সম্পাদক হইলেন। অধরবাবুর 'মণিকা' প্রেস নামে নিজেরই একটি প্রেস ছিল। পূর্বে ইহার নাম ভিক্টোরিয়া প্রেস ছিল কি না জানি না। রামানন্দের ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ডায়েরিতে বহুবার ভিক্টোরিয়া প্রেসের নাম আছে।

আমরা রামানন্দের যে-সকল পুরাতন রচনা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহার ভিতর বাংলা ১২৯৬ সালের 'ধর্মবন্ধু'তে লিখিত 'চিঠিপত্র'টি উল্লেখযোগ্য। এই বৎসরের পূর্বের কোনো লেখার সন্ধান পাই নাই। ইহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :—

"প্রেম নিত্য নূতন। তাই স্বর্গ বলিলে প্রেম মনে হয়। ভগবান মানুষকে কী মহৎ জীবই কবিয়াছেন। মানবের হৃদয়ের ভাব কী উচ্চ, আকাঙ্ক্ষা কেমন অনন্ত বলশালিনী! কত যুগে কত দেশের কবি প্রেমেব গুণ গান কবিলেন, শেষ তো হইল না। শেষ যে হইবে না। স্বচ্ছ সুনীল আকাশপটে এক-একটি তারকা যে এক-একটি প্রেম সংগীত। এমন অনন্ত উন্মাদনা আব কিসে আছে? ভালোবাসাব সকলই যেন বিপরীত, হেঁয়ালির মতো। কষ্ট সহিয়া সুখ, আত্মসমর্পণ করিয়া সুখ। যাকে ভালোবাসি তার জন্য কষ্টভোগ প্রেমিকের চক্ষে একটি অমূল্য অধিকার।

"দেখো, সেদিন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে দেখিয়া একটা কথা মনে পড়িল। তুমি জান আমি বুড়ো মানুষকে ভালোবাসি না। . কিন্তু বুড়ো কাহাকে বলি জান? বাজনারায়ণ বাবু, বামতনু লাহিড়ী মহাশয়কে আমি বুড়ো বলি না। কাবণ আমার অভিধানে চুল পাকিলেই বুড়ো হয় না। যে মনে কবে, আমি সব জানি, সংসারের উন্নতি যা হবার হয়ে গেছে, সেই বৃদ্ধ। যাহাদের হৃদয়ে নিত্য নূতন আশা, নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগে না, সেই বৃদ্ধ। যা আছে মন্দ হইলেও তাহাই থাকিবে, ইহাই যাহাব বিশ্বাস সেই বৃদ্ধ। বৃদ্ধ সে, যে যুবকের পবিত্র উৎসাহ অগ্নি নিবাইতে চায়। চুল পাকিয়াছে বলিয়া কি রামতনুবাবু বৃদ্ধ? শুনিলাম তিনি নাকি আবাব 'বোধোদয়' পড়িতেছেন, কারণ তিনি বলেন 'বোধোদয়ে' যাহা লেখা আছে আমরা তাহাই করি না ; বড়ো বই পড়ি কেন? পরলোকের দ্বারদেশে আগতপ্রায় এই সপ্ততিপর বৃদ্ধেব কী অদ্ভুত ধর্মপিপাসা! আর রাজনারায়ণবাবুর যে পরিহাস-রসিকতা, হাসিব ছটা দেখিলাম, তাঁহাকে বৃদ্ধ বলি কেমন করিয়া? বৃদ্ধ আমরা ; পেঁচার মতো মুখভার করিয়া বিজ্ঞতাব ভান কবি, যেন বিধাতার কাছে লেখাপড়া কবিয়া দিয়াছি যে আর হাসিব না। শিশুর হাসি আর সাধুব হাসি একই রকমের। উভয়েই জননীর মুখ দেখিতে পান।"

'চিঠিপত্রে' পরনিন্দা, ধর্মাভিমান, প্রার্থনা, স্বাধীনতা প্রভৃতি নানা বিষয় আলোচিত হইত। এ পত্রগুলি স্ত্রীর নিকট লিখিত স্বামীর পত্রের ভঙ্গিতে লেখা। সম্ভবত এইসব বিষয় তিনি নিজ স্ত্রীকে সত্যই লিখিতেন। ইহাতে নারীজাতির উন্নতির কথাও নানা স্থানে আছে।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক হেবম্বচন্দ্র মৈত্রের বাড়িতে রামানন্দ প্রথম রাজনারায়ণ

বসুকে দেখেন ও তাঁহার সরস ও হাস্যমুখর গল্প শুনিয়া মুগ্ধ হন। রাজনারায়ণ বসুর অনুবাদিত সাদি ও হাফিজের পারসি কবিতাগুলি পড়িয়া রামানন্দ মুগ্ধ হন। তিনি বলেন, "এমন প্রেমোন্মত্ততা আর কোথায় পাইব?" তদুপরি তাঁর উন্নত চরিত্র, স্বদেশভক্তি ও রসবোধ রামানন্দকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। রাজনারায়ণের স্মৃতি তিনি জীবনে কখনো বিস্মৃত হন নাই, ইঁহার প্রভাব তিনি নিজ চরিত্রে চিরদিন অনুভব করিতেন। যে কয়জন সেকালের মানুষ তাঁদের গভীর ধর্মজ্ঞান, মানব-হিতৈষণা, দেশপ্রেম, সংস্কৃতি, শিশুজনোচিত সরলতা ও প্রাণখোলা হাসির জন্য রামানন্দের মনে চিরস্থায়ী গভীর ছাপ রাখিয়া গিয়াছিলেন তাঁদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসু এক জন। রাজনারায়ণ দেওঘরে থাকিতেন। সম্ভবত তাঁরই আকর্ষণে রামানন্দ পরে কয়েকবার দেওঘরে গিয়াছিলেন। সেখানে বৈদ্যনাথ দর্শনের তীর্থযাত্রীরা রাজনারায়ণকেও একবার দেখিয়া যাইত শোনা যায়। বসু মহাশয় তাঁর এই প্রিয় শিষ্যটিকে কোনো কারণে 'স্যর রামানন্দ' বলিয়া ডাকিতেন ও চিঠি লিখিতেন। পুরাতন 'দাসী'তে এক জায়গায় রাজনারায়ণ বসুর নামের পাশে মুদ্রিত অক্ষরে লেখা আছে 'স্যর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।' এটি সম্ভবত বসু মহাশয়ের কৌতুকপ্রিয়তার চিহ্ন। তিনি সুরসিক ব্যক্তি ছিলেন। "হিরো ওয়ারশিপ" বা মহতের পূজা করিবার যে বিশেষ একটা মনোভাব, তাহা লইয়া কম মানুষ জন্মায়। যাঁহারা মহৎ তাঁহারা মক্ষিকার মতো পরের ক্ষত খুঁজিয়া বেড়ান না, তাঁহারা মানুষের মধ্যে দেবত্ব খুঁজিয়া তাহার পূজা করেন। এই মহত্ত্বের সন্ধান করা ও তাহার পূজা করার মনোভাব রামানন্দেব একটি বিশেষত্ব ছিল। তিনি বাল্যকাল হইতে নানা মহত্ত্বের জন্য কখনো রমেশচন্দ্র, কখনো শিবনাথ শাস্ত্রী, কখনো রাজনারায়ণ বসু এবং সর্বোপরি রাজা রামমোহনকে এইভাবে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকে বন্ধু ও ভ্রাতার মতো প্রীতি ও ভক্তি দুই-ই নিবেদন করিয়াছিলেন।

'ধর্মবন্ধু' পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় একটি কবিতা থাকিত। সেই কবিতাগুলি সুরেশচন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিতেন। তিনি ও প্রবাসীর সম্পাদক সতীর্থ, একসঙ্গে এম. এ. পাস করিয়াছিলেন।

'ধর্মবন্ধু'তে 'প্রায়শ্চিত্ত' নামক একটি উপন্যাস এই বাংলা ১২৯৬ সালে প্রকাশিত হইত। টাটানগরের জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ইহার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি নচিকেতার উপাখ্যান, শঙ্করাচার্যের প্রশ্নোত্তর, যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর কথোপকথন, বৌদ্ধ শাস্ত্রের উপদেশ ইত্যাদি বিষয়ে লিখিতেন। রামানন্দ 'ধর্মবন্ধু'তে বিবিধ ও সাময়িক প্রসঙ্গ লিখিতেন, পুস্তক সমালোচনাও করিতেন। জাতীয় মহাসমিতি, সমাজ-সংস্কার সভা, সাধু-জীবনী, কুষ্ঠাশ্রম, সুলভ পুস্তক-প্রচার সভা, ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি লিখিতেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের 'ছায়াময়ী পরিণয়' প্রভৃতি পুস্তকের সমালোচনা রামানন্দের লিখিত। অশ্লীলতার বিরুদ্ধে 'ধর্মবন্ধু'র অভিযানের চিহ্ন অশ্লীলতা দলন সভা, অশ্লীল ভাষা দলন ইত্যাদি বহু প্রসঙ্গ হইতে বুঝা যায়। কুষ্ঠব্যাধি, তাহার আশ্রম, ফাদার ড্যামিয়ন ইত্যাদি বিষয়েও অনেক কথা 'ধর্মবন্ধু'তে দেখি।

ক্ষুদ্র ধর্মবন্ধু পত্রিকায় 'মহাবীর গর্ডন' সম্বন্ধে রামানন্দ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন। গর্ডনকে তিনি কেন বীর বলিয়াছিলেন? 'রণক্ষেত্রে তাঁহার ভীম পরাক্রমের জন্য নয়।' তিনি লিখিয়াছিলেন, 'সকলের চেয়ে ঘোরতর যুদ্ধ কী? রিপুকুলের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ সর্বাপেক্ষা কঠিন। বশী যিনি, তিনিই প্রকৃত বীরপদবাচ্য। তেমনই জনসাধারণের মতের

বিরুদ্ধে নিজের ধর্মবুদ্ধির আদেশ পালন প্রকৃত সাহসের কাজ।' গর্ডন ছিলেন গরিবের ভাই, অনাথের মা বাপ, দুর্বলের সহায়, পাপীর ব্যথার ব্যথী।

'কুলি সমস্যা' বিষয়ে ১৮৯০, এবং হয়তো তৎপূর্বেও 'ধর্মবন্ধু' প্রভৃতি পত্রে রামানন্দ লিখিতেন। অসহায় উৎপীড়িত মানুষের বন্ধু তিনি চিরদিন। পরে ফিজি, ট্রান্সভ্যালের ভারতীয় শ্রমজীবী ও অন্যান্য উৎপীড়িত মানুষের হইয়া তিনি কত বলিয়াছেন আমরা 'প্রবাসী' প্রভৃতিতে দেখিতে পাইব। অনুন্নত শ্রেণীর জন্যও তিনি এইরূপ চিরদিন বলিয়া ও করিয়া আসিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম

বহু পূর্বে 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন' নামক পুরাতন ব্রাহ্ম পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের মতামত দেশ-বিদেশে প্রচার করিত। ইহা ১৮৮৩তে উঠিয়া যায়। তাহার পর 'ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার' প্রথম সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুকাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মেসেঞ্জারের সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দ মেসেঞ্জারের সহকারী সম্পাদক হইলেন। আমরা দেখিতেছি সিটি কলেজে প্রবেশের সময় হইতে রামানন্দের ব্রাহ্মসমাজের কাজের সহিত নানা দিক দিয়া ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে লাগিল। 'ধর্মবন্ধু', 'মেসেঞ্জার' দুই-ই ব্রাহ্মসমাজের কাগজ। এইসব কাজ করিতে করিতেই তিনি এম. এ. পাসও করিলেন। কিন্তু বিলাত যখন যাওয়া হইল না তখন অন্তত নিজ জ্যেষ্ঠতাত পুত্র রামসদন চট্টোপাধ্যায়ের মতো তিনিও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইবার চেষ্টা করেন এটা তাঁর সহোদর ভাইদের ইচ্ছা ছিল। তাঁরা বহুদিন সে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশহিতব্রত ভাইটি বলিলেন, "গভর্নমেন্টের চাকরি করিব না, ধনের আশা করিয়ো না।" ধনের আশা যে করে না এবং জন-সেবায় যে আপনাকে উৎসর্গ করে তেমন মানুষকে ঘন কর্মজালের মধ্যে টানিয়া লইবার লোকের অভাব আমাদের দেশে নাই। সে সময় সে আবেষ্টনীতে তো ছিলই না; কারণ তখন শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ সর্বত্যাগী কর্মী পুরুষেরা অনুরক্ত শিষ্যদের ত্যাগমন্ত্রেই দীক্ষিত করিতেছিলেন। রামানন্দ শিবনাথের শিষ্যই হইলেন। রামানন্দের মতে শিবনাথ ছিলেন 'হিন্দু-ব্রাহ্ম'। এই কথাটি সম্ভবত রামানন্দের রচিত।

রামানন্দও নিজেকে কখনো অহিন্দু মনে করেন নাই। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রতি তাঁর যে-রকম গভীর অনুরাগ ছিল কোনো সনাতনপন্থীর তার চেয়ে বেশি ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না। স্বদেশের মাটিকেও তিনি সোনা মনে করিতেন, স্বজাতির দুঃখ মোচন তাঁর জীবনের ব্রত ছিল এবং স্বধর্মের ঋষিবাক্য "ঈশাবাস্যমিদম্ সর্বম্ যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"কেই তিনি অধ্যাত্ম দীক্ষার মন্ত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া স্বজাতীয়দের ব্রাহ্মণত্বের অহংকার তাঁকে পীড়া দিত। তিনি চাহিতেন "সবার শেষে সবার নীচে সব-হারাদের মাঝে" নিজেকে বিলাইয়া দিতে। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিচারশক্তি ও ঐতিহাসিক জ্ঞান জাতিতে জাতিতে এই উচ্চনীচ ভেদের রেখা সমর্থন করিত না এবং যা তিনি মনে মনে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেন না, বাহিরে তা লৌকিক আচারে পালন করা তাঁর স্বভাব ছিল না। যিনি চিরজীবন মানুষের সাম্যের জন্য লড়িয়াছেন—তিনি জীবনের উষাকাল হইতেই উপবীত রাখিয়া নিজেকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলেন না। প্রতীক পূজাতেও তাঁর বিবেক ও বুদ্ধি সায় দিত না। সেইজন্য তিনি শুধু যে ব্রাহ্মসমাজে

যোগ দিলেন তা নয়, তিনি উপবীতও ত্যাগ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর গুরুস্থানীয় আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো ব্রাহ্মধর্মকে উন্নত হিন্দুধর্ম বলিয়াই মনে করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় *History of the Brahmo Samaj*-এ বলিয়াছেন, **"I hope the Brahmo Samaj will be regarded as the truest and greatest exponent of higher Hinduism."** (অনুবাদ : আমি আশা করি ব্রাহ্মসমাজ উচ্চতর হিন্দুধর্মের খাঁটি ও মহত্তম প্রবর্তক বলিয়া স্বীকৃত হইবে।)

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন ব্রাহ্ম যুবকের চেষ্টায় 'সঞ্জীবনী' নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবত প্রথম হইতেই শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ইহার সম্পাদক ছিলেন। জন্মদিন হইতেই ইহার কার্যাধ্যক্ষের কাজ গগনচন্দ্র হোম মহাশয় গ্রহণ করেন। তিনি ইহার একজন প্রধান লেখকও ছিলেন। প্রায় বাইশ বৎসর কাল তিনি ইহার লেখক ছিলেন।

রামানন্দও কলিকাতায় আসিবার পর সম্ভবত ১৮৮৯/১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ হইতে 'সঞ্জীবনী'র একজন প্রধান লেখক হইয়া উঠেন। সঞ্জীবনীতে সম্পাদকীয় মন্তব্যও তিনি অনেক সময় লিখিতেন। ইহা ছাড়া কংগ্রেসের সভাপতি ওয়েডারবর্নের বক্তৃতার অনুবাদ, 'ভ্যালুপেবল্ পোস্টে বর প্রেরণ' বিষয়ে সরস সামাজিক নক্‌শা, কুলিদের প্রতি অত্যাচার বিষয়ে লেখা এবং অন্যান্য অনেক রচনা যে তিনি 'সঞ্জীবনী'তে দিতেন তাহার প্রমাণ তাঁহার ডায়েরি ও পুরাতন 'প্রবাসী'তে পাওয়া যায়। 'সঞ্জীবনী'র মুলমন্ত্র ছিল 'সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা' ; এবং মানুষের নৈতিক উন্নতি, সামাজিক উন্নতি ও রাজনৈতিক অধিকারের দাবির কথাই প্রধানত এই পত্র বলিতেন। এলাহাবাদ যাইবার পূর্বে রামানন্দের সহিত 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কংগ্রেস, নারীর উন্নতি ও ব্রাহ্মসমাজের কাজেও তাঁহারা পরস্পরের সহযোগী ছিলেন।

রামানন্দ সিটি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করার পর ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই হইতে ১৮৯০-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্রের সহকারী হইয়া বিনা বেতনেই কাজ করিতেন। ক্রমে ক্রমে কর্মজাল তাঁহাকে নানা দিক হইতে ঘিরিয়া ধরিল। তাঁর অধ্যাপনা, বাংলা রচনাশক্তি ও ইংরাজি রচনাশক্তির খ্যাতি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। 'সঞ্জীবনী', 'ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার', 'ধর্মবন্ধু'র কাজ তো ছিলই, তাহার উপর 'তত্ত্বকৌমুদী'তে লেখা দিবার অনুরোধও আসিতে লাগিল ; এমন কী সুপ্রসিদ্ধ 'ইন্ডিয়ান মিরার' পত্রেও তিনি সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিতে লাগিলেন। বন্ধু ও ছাত্রদের অবসরকালে পাঠে সাহায্যের কথা তো জানি, তাহার উপর ব্রাহ্মসমাজে আশ্রিত একটি পতিতা রমণীর কন্যাকে নিয়মিত পড়াইতে লাগিলেন। মেয়েটি ইংরাজি, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয় পড়িত এবং লিখিত। তাহার লেখা দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিতে হইত। এত কাজ তিনি নিঃশব্দে করিয়া যাইতেন। কিন্তু খ্যাতি ও বিদ্যার সাহায্যে অন্য কর্মক্ষেত্রে গিয়া অর্থ লাভের চেষ্টা করেন নাই। ছুটির দিনে রবিবারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শিবনাথ শাস্ত্রী, রামকুমার বিদ্যারত্ন, লছমন প্রসাদ প্রভৃতি আচার্যের উপাসনা-উপদেশাদির রিপোর্ট লইতেন এবং পরে তাহা ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া সমাজের কাগজে ছাপিতেন।

রামানন্দ নিজে ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্ম হইতে উদ্ভূত বলিয়া জানিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন বলিয়া যে-সকল হিন্দু অনুষ্ঠান ও আনন্দে উচ্চনীচ ভেদ কিংবা প্রতীক পূজার বাধা ছিল না, তাহা তিনি কখনো বর্জন করেন নাই। তিনি যে শুধু নিজে পালন করিতেন তা নয়, অপরকে তৎপালনে উৎসাহী করিতেন। নিজ মাতার শ্রাদ্ধে তিনি অপর ভাইদের সঙ্গে সমস্ত

নিয়ম পালন ও মস্তক মুণ্ডন করিয়াছেন, নিঃসন্তান দিদির মৃত্যুর সময়ও এই সকল নিয়ম পালন করিয়াছেন। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় দূর প্রবাস হইতেও প্রতি বৎসর ভগিনীদের তিনিই প্রথম স্মরণ করিয়াছেন, দীপান্বিতা অমাবস্যায় পুত্র কন্যা ও পৌত্রী দৌহিত্রীদের লইয়া আলো দিয়া ঘর সাজাইয়াছেন এবং বিজয়ায় বহু প্রিয় আত্মীয়-স্বজনকে আশীর্বাদ ও প্রণাম জানাইয়াছেন। উপবীত ত্যাগ করার পর একবার নিজ মাতাকে এবং একবার বড়ো দিদিকে প্রয়াগে মাঘ মাসে কল্পবাসে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যহ তিনি বহু দূর হইতে ফলমূল সংগ্রহ করিয়া গঙ্গার গর্ভে বালুচরে মা ও দিদির সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন, কখনো ত্রুটি হইত না। এই সময় একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার মা যদি আপনার বাড়িতে থেকে শিবপূজা করেন আপনি তাঁকে বাধা দেবেন না?" পুত্র বলিলেন, "না, মা নিজের বিশ্বাস মতো যে পূজা করবেন আমি তাতে কিছুতেই বাধা দিতে পারি না।" ভদ্রলোক বিস্মিত হইলেন। আমাদের ভারতীয় হিন্দু উৎসবগুলির যেগুলির মধ্যে প্রতীক পূজার কোনো চিহ্ন নাই, ব্রাহ্মসমাজে সেইগুলি রক্ষা করা বিষয়ে তিনি পরে ১৯২০।২১ সালে ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জারে প্রবন্ধাদি লিখিতেন শুনিয়াছি।

কর্মজাল ও আদর্শবাদ

দারিদ্র্যই বরণ করুন আর সেবা ও ত্যাগের ধর্মই গ্রহণ করুন, রামানন্দ কখনো মাতা পত্নী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্যের কথা ভুলিয়া যান নাই। নিজের দুঃখকষ্টকে তিনি ভয় করিতেন না, কিন্তু মায়ের দুঃখ দূর করিবেন এবং পত্নীকে নিকটে রাখিয়া আদর্শ গৃহ গঠন করিবেন এ ইচ্ছা ও সংকল্প তাঁর বরাবরই ছিল। সেইজন্য ত্যাগ ও কর্মে উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে একটা বেদনা এই সময়ে বদ্ধমূল ছিল যে তিনি স্বজনের জন্য কিছু করিতে পারেন নাই। এম. এ. পাস করার পরও তাঁর নিজস্ব কোনো বাসা ছিল না। তিনি কখনো বন্ধুদের সঙ্গে মেসে থাকিতেন, কখনো বন্ধু সুরেন্দ্রভূষণের পিতা যাদবচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে তাঁর স্ত্রীর যত্নে থাকিতেন। নিজে বাড়ি ভাড়া করিয়া থাকিবার মতো অর্থ তাঁর ছিল না। যাঁদের সঙ্গে থাকিতেন তাঁদের অবশ্য তাতে আর্থিক ক্ষতি কিছু হইত না। বাড়ির ছেলেদের পরীক্ষার পড়া—ইংরাজি, পদার্থবিদ্যা, অঙ্ক, যাই হউক তিনি পড়াইয়া দিতেন; পরীক্ষার আগে বাসা বদল করিলে পাছে সেই সব ছেলেদের ক্ষতি হয় এইজন্য তাদের পরীক্ষা পর্যন্ত সেই বাসাতেই থাকিতেন।

রামানন্দের এই সময়ের জীবনযাত্রার আংশিক ছবি আছে তাঁর একটি মাত্র রক্ষিত ডায়েরিতে। তিনি জ্ঞানী ও বিদ্বান ছিলেন বলিয়া কখনো দায়সারা কাজ করিতেন না। কলেজে কাজ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিয়ম ছিল প্রত্যহ অধ্যাপনার জন্য উপযুক্তভাবে কলেজের পড়া তৈয়ারি করিয়া রাখা। ভোরে উঠিয়া সর্বপ্রথম কাজ উপাসনা আর কলেজের পড়া তৈয়ারি। শরীরকে সম্পূর্ণ অবহেলা তিনি করিতেন না। সেইজন্য ভোরবেলা বেড়ানোও একটা নিয়ম ছিল। দশটা-এগারোটার আগে কতটুকু বা সময়? তাহার মধ্যে 'মেসেঞ্জার', 'ধর্মবন্ধু' এবং 'সঞ্জীবনী'র জন্য লেখা, প্রুফ দেখা সব করিতেন। কলেজে পড়াইয়া ছাত্রদের উপকার হয়, কিন্তু আত্মজীবন গঠনেরও তো কিছু উপাদান প্রয়োজন আছে? তাই তাহাতেও কিছু সময় যাইত। তাঁর প্রিয় গ্রন্থাদির মধ্যে ছিল *Light of Asia*, শেক্সপিয়রের গ্রন্থাবলী, Browning-এর গ্রন্থাবলী, *Hamilton's Lectures on*

Metaphysics. জর্জ মুলার, গর্ডন প্রভৃতির জীবনী, *Fabre's Hymns, Freeman's History, Green's History*, Emerson ও Bacon-এর গ্রন্থাবলী। *Ninteenth Centruy* পত্রিকায় Huxley, Spencer প্রভৃতির প্রবন্ধাদি, *Contemporary Review*-এ Stopforde Brook প্রভৃতির লেখা, *Review of Reviews* পত্রিকার প্রবন্ধাদিও তাঁহার প্রিয় ছিল।

তাঁর মনে ভগবদ্ভক্তি জনসেবা ও উন্নত চরিত্রের যে উজ্জ্বল আদর্শ অঙ্কিত ছিল তার থেকে বিন্দুমাত্র চ্যুতিও তাঁর মনকে পীড়া দিত। এইজন্য নিজেকে তিনি নিয়ত নিজেই কঠোর শাসনে রাখিতেন যেন সত্যাচরণ হইতে এক বিন্দু স্খলন না হয়, যেন কর্তব্যপালনে বিরক্তি না আসে, যেন প্রশংসা পাইবার লালসা মন হইতে সমূলে তুলিয়া ফেলিতে পারেন, যেন জিহ্বাকে সংযত রাখিতে পারেন, যেন জীবনটা পরের জন্যই উৎসর্গীকৃত হয়। যৌবনারম্ভেই তিনি প্রাত্যহিক উপাসনা লোকের অগোচরে করা অভ্যাস করেন, পাছে প্রকাশ্যে করিলে লোকের কাছে ধার্মিক নাম পাইবার লোভ হয়। অথচ গোপনে নিজ ঈশ্বর-স্মরণের ব্রত তাঁর আজীবন ছিল। এইজন্য 'ধর্মবন্ধু'তে লেখেন : "পরনিন্দা ধর্মাভিমানের জননী। ধর্মাভিমানের মতো মানুষের ভয়ানক শত্রু আর নাই। যিনি ভাবিলেন 'আমি কেমন ধার্মিক' তিনি মরিলেন। ধর্মাভিমান এতই ঘন পর্দা যে ভগবানের কৃপা সহজে তাহা ভেদ করিয়া মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না।"

শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারে বাংলা ১২৯৬ সালের 'ধর্মবন্ধু' আছে। তার সূচীপত্র ও রামানন্দের একমাত্র রক্ষিত ডায়েরি মিলাইলে বোঝা যায়, তিনি সেই চব্বিশ বৎসর মাত্র বয়সেও পরিণত বয়সের মতো একই সঙ্গে অনবরত বাংলা আর ইংরাজি প্রবন্ধ নানা পত্রে লিখিতেন। বুঝিতে পারা যায় মাঘের 'ধর্মবন্ধু'তে যে সপ্তাহে তিনি জাতীয় মহাসমিতি, সমাজ সংস্কার সমিতি, 'মহামতি গর্ডন' বিষয়ে প্রবন্ধে লিখিতেছেন, সেই সপ্তাহেই 'সঞ্জীবনী'র জন্য ওয়েডারবার্নের বক্তৃতা অনুবাদ করিতেছেন এবং 'মেসেঞ্জার'এর জন্য Servant and Slave বিষয়ে প্রবন্ধ এবং সোশ্যাল কনফারেন্স বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। পরের সপ্তাহেই আবার 'ধর্মবন্ধু'র জন্য 'চিঠিপত্র' লিখিতেছেন এবং মাঘোৎসবে মেসেঞ্জারের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিবার আয়োজন করিতেছেন, তাহাতে চয়ন ও নানা কাহিনী লিখিতে হইবে। ধর্মবন্ধুতে সম্ভবত এই সময়েই Browning সম্বন্ধে লিখিতেন। মেসেঞ্জার প্রতি সপ্তাহেই প্রকাশিত হইত। সুতরাং তার লেখা প্রতি সপ্তাহেই দিতে হইত। এই-সব লেখার প্রুফ তিনি নিজেই দেখিতেন। অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিতের প্রবন্ধও সম্পাদন করিয়া দিতেন। তখন মেসেঞ্জারের সম্পাদক ছিলেন হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়। তিনি বোধহয় সময়াভাবে লিখিবার বিষয় নির্বাচন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁকে সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিবার জন্য রামানন্দ নানা কাগজ হইতে সংগৃহীত বিষয়ে দাগ দিয়া আনিয়া দিতেন। কুলি-সমস্যা বিষয়ে রামানন্দের অত্যন্ত উৎসাহ ছিল বলিয়া এই সময়ের মধ্যে কুলি পুস্তিকাও বাংলায় অনুবাদ করেন।

কখনো দেখি ধর্মবন্ধুর (ফাল্গুন ১২৯৬) জন্য জীবনী লিখিতেছেন, আবার *Messenger*-এ "Hero and the Player" এবং "Our Mission" প্রবন্ধ লিখিতেছেন। এই সময় হইতেই ধর্মবন্ধুতে ছায়াময়ী, হিমানী প্রভৃতি পুস্তক সমালোচনা করিতেন। এই পত্রেই পার্সিদের ধর্মবৃত্তান্ত লেখেন। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প এবং আলোচনা সেই বয়সেই তিনি যে-সব বিষয়ে করিতেন তাতে বুঝা যায় কোন্ কোন্ দিকে তাঁর মনের গতি ছিল। দেশের স্বাধীনতা তাঁর চিরদিনের স্বপ্ন ছিল, সুতরাং নব প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস তো আলোচনার বিষয় হইবেই।

ওয়েডারবার্ন ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন কংগ্রেস কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং বোম্বাই কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট হন এবং ১৮৯০ হইতে 'ইন্ডিয়া' পত্র প্রকাশ করেন। সেইজন্যই রামানন্দ 'সঞ্জীবনী'তে ওয়েডারবার্নের বক্তৃতা অনুবাদ করেন। চার্লস ব্রাড্‌ল ১৮৮৯-এ বোম্বাই কংগ্রেসে উপস্থিত থাকিয়া 'কুলি সমস্যা' বিষয়ে কংগ্রেকে সাহায্য করেন। এইজন্য ব্রাড্‌লর বিষয়ে রামানন্দ বন্ধুদের সঙ্গে বহু আলোচনা করিতেন। ব্রাড্‌ল ছিলেন National Secularist Society-র প্রতিষ্ঠাতা। কাজেই তাঁর কাজে আস্তিকতা এবং মুখে নাস্তিকতা লইয়া ব্রাহ্ম বন্ধুমহলে আলোচনা হইত। রামানন্দের ১৮৯০, ৬ জানুয়ারির ডায়েরিতে আছে: হেরম্বচন্দ্র মৈত্র "Cooly Question সম্বন্ধে ব্রাড্‌লর সঙ্গে interview করিতে যান। "তাঁহার কাছে Bradlaugh কিরূপ punctual তাহা শুনিলাম। Interviewএর জন্য সময়ের কিছু পূর্বে যাওয়ায় ব্রাড্‌ল বলিলেন, "you are a little before your time." কিরূপ Studious ! সেই ভিড়ের মধ্যে Bradlaugh Cooly pamphlet master করিয়া ফেলিয়াছিলেন। হেরম্ববাবুর impression—Bradlaugh খুব honest, বেশ feel করেন। যে কয়জন ইংরেজ কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা যেন প্রত্যেকেই feel করিয়া বলিতেছেন। আমাদের তত feeling থাকিলে কত কাজ হইত। ব্রাড্‌লর বয়স ৫০-৫২ ; Wedderburn venerable old man।" কথাপ্রসঙ্গে মনে হয় শিবনাথ শাস্ত্রীও এই কংগ্রেসে যোগ দিতে বোম্বাই যান। রামানন্দ কুলিদের দুর্দশার কথা পড়িয়া 'কুলি সংরক্ষিণী সভা' স্থাপন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু নিজ ক্ষমতার উপর তাঁর খুব বিশ্বাস ছিল না। এই সময় পতিতা নারীদের কন্যাদের উদ্ধারের চেষ্টা হইত। ২।১টি মেয়েকে উদ্ধার করা হয়। তাহাদেরই একজনকে রামানন্দ নিয়মিত পড়াইতেন। ইহাদের উদ্ধারের জন্য কারাবরণ করাও উচিত ইঁহারা মনে করিতেন।

এই সময় হইতেই অনেকের পুস্তকের ভূমিকা তিনি লিখিয়া দিতেন। যোগেন্দ্রবাবুর *Moral Lessons* পুস্তকের ভূমিকার কথা ডায়েরিতে আছে।

তিনি বিবাহিত যুবক ; দেশে স্ত্রী, মা, ভাই তাঁর মুখ চাহিয়া আছেন ; অথচ অর্থ উপার্জন করিবার সুযোগ ও অবসর তাঁর ছিল না। সকালে ও সন্ধ্যায় ব্রাহ্মমিশন প্রেসে কিংবা মণিকা বা ভিক্টোরিয়া প্রেসে বসিয়া স্বলিখিত ও অন্যের লিখিত প্রবন্ধের প্রুফ দেখিতেন। বাকি সব সময় তো লেখা, পড়া এবং গৃহে ও কলেজে পড়ানোর জন্য বাঁধা।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আদর্শ সকল দিকেই উচ্চ ছিল। মেসেঞ্জারকে আরো সুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য তিনি রামানন্দকে ইহার আরো একটা বিশেষ বিভাগের (Brahmo Samaj Column) ভার লইতে বলিলেন। এই অদ্ভুত পরিশ্রমের উপর তাঁর পরিশ্রম আরো বাড়িয়া গেল। দুইবেলা হাঁটিয়া ভ্রমণ করা ছাড়া এই চব্বিশ বৎসর বয়সের যুবক আর কোনো আমোদ-অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন না, খেলাধুলা, সাজপোশাক, খাওয়া-দাওয়ার শখ ছিল না। থিয়েটার দেখায় দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হইবে বলিয়া কখনো পেশাদার থিয়েটারে যাইতেন না। গল্প করিতে ভালোবাসিতেন, কিন্তু সেই সময় বাক্‌সংযম অভ্যাসের জন্য বেশি কথা বলিতেন না। মন সতত ঊর্ধ্বমুখী ছিল, ভগবদ্‌ভক্তি, জ্ঞান অর্জন, জনসেবা ও নিষ্কাম মানবপ্রীতির দিকে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত যে কাজে ডুবিয়া থাকিতেন, এই কথাটি যেন বাহিরের লোকে না জানে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের তা বলিয়া রাখিতেন। তিনি এত পরিশ্রমী শুনিয়া যদি লোকে সাধুবাদ দেয় তাহা হইলে নিষ্কাম কর্ম তো করা হইবে না। প্রশংসা লালসার ইন্ধন জোগাইবে। বাস্তবিক তাঁহার আত্মশাসন এত কঠোর ছিল যে আজকালকার মানুষ

শুনিলে মনে করিবে অতিরঞ্জিত করিয়া বলা হইতেছে।

সাহিত্যিক প্রতিভা লইয়া তিনি জন্মিয়াছিলেন ; জ্ঞান অধ্যবসায় ও মেধা তাঁর সহায় ছিল। কিন্তু সাহিত্যিক নাম লইয়া বাহাদুরি দেখাইবার লোভ পাছে মনে জাগে, এইজন্য তিনি সংকল্প করিলেন, "সেবার জন্য প্রবন্ধ লিখিব, বাহাদুরীর জন্য নয়।" তিনি তাই ডায়েরিতে নিজেকেই লিখিয়াছেন "ধনের আশা করিও না। বিশুদ্ধ জ্ঞান সৎসাহস ও আত্মোৎসর্গ চাই।" নিজেকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি কী উন্নতিতে তিনি সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হইতেন না কিছুতেই। সর্বদাই শক্তির অভাব, জ্ঞানের অভাব ও জীবনে শৃঙ্খলার অভাব বোধ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইতেন। অথচ অতিরিক্ত পরিশ্রমে নিদ্রা ও ভ্রমণে বাধা পড়িত। যৌবনেই থাকিয়া থাকিয়া তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইত এবং শরীর অবসন্ন হইত। ইহাতেই বোঝা যায় তাঁর কাজের আদর্শ এবং চরিত্রের আদর্শ কত উন্নত ছিল। যে মানুষ অর্থের অভাবে প্রয়োজন থাকিলেও ট্রামে চড়িতে, চিঠি ডাকে দিতে, ট্রেনে চড়িয়া বর্ধমান পর্যন্ত যাইতে পারিতেন না, সেই মানুষই বিনা পারিশ্রমিকে প্রায় দুই বৎসর কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছেন, বন্ধুদের পরীক্ষায় বিনা পারিশ্রমিকে গৃহ-শিক্ষকতা করিয়াছেন। কাগজে লিখিয়াছেন এবং ব্রাহ্মসমাজের কাজ করিয়াছেন কিছুই না লইয়া তা বলাই বাহুল্য। প্রায় কপর্দকহীন অবস্থায় এই রকম করিয়া তাঁকে আদর্শের সেবা করিতে দেখিয়া একজন পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, "আপনি ব্রাহ্মসমাজের বলি।" কিন্তু এই প্রশংসাতেও তিনি অহংকারে উৎফুল্ল হন নাই। তিনি অতৃপ্তভাবে ডায়েরিতে লিখিয়াছিলেন, "কবে বলি হইতে পারিব?" যিনি সরকারি বৃত্তি লইয়া আই. সি. এস. হইয়া আসিতে পারিতেন, দেশেও অন্তত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারিতেন, এমন কী সরকারি কাজ না করিলেও যে-কোনো ভালো কলেজে তাঁর কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্যের জন্য ভালো চাকরি পাইতে পারিতেন, তিনি যে এমন করিয়া আদর্শের সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন আজকালকার সুখান্বেষী যুবকেরা কি তা ভাবিতে পারেন? অবশ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি আদর্শবাদীদের মনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন আশা করা যায়।

তরুণ বয়স হইতেই রামানন্দ এ কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, মানুষের উন্নতির চেষ্টা সর্বাঙ্গীণ না হইলে প্রকৃত ফল পাওয়া যায় না। শুধু পুরুষের উন্নতিতেই জাতি উন্নত হয় না, নারীর উন্নতি চাই। শুধু সন্ন্যাসীর মতো ত্যাগেই উন্নতি হয় না, গৃহীর গৃহ দেশের ভবিষ্যতের আশা, গৃহকে গড়িয়া তোলা চাই। সেইজন্য ত্যাগী হইলেও সর্বত্যাগী হইয়া দিন কাটাইবেন এ কল্পনা তাঁর ছিল না। তিনি চাহিতেন সুযোগ পাইলেই তাঁর বালিকা পত্নীকে লইয়া আসিয়া আদর্শ গৃহী হইবার সাধনা করিবেন। যেটুকু অবসর তিনি পাইতেন তাতে তাঁর আনন্দের কাজ ছিল বালিকা পত্নীকে নিজের জীবনের সকল উচ্চ আদর্শের কথা লেখা এবং তাঁকেও সেইভাবে গড়িয়া তোলা। হাতে পয়সা নাই কিন্তু তবু পত্নীর শিক্ষার জন্য রামমোহন রায়ের জীবনী, রাজকৃষ্ণ রায়ের মহাভারত, 'সঞ্জীবনী' পত্র ইত্যাদি কোনো প্রকারে কিনিয়া পাঠাইতেন। যখন কিনিতে পারিতেন না, তখন 'বামাবোধিনী' নকল করিয়া, ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের প্রোগ্রাম ও ছাত্রসমাজের কার্ড জোগাড় করিয়া পাঠাইতেন। তিনি পত্নীকে লিখিয়াছিলেন, "নীচের দিকে তাকাইও না। উর্ধ্বমুখে ভগবানের পুণ্যজ্যোতির অভিমুখে সতত ধাবিত হইও।"

প্রথম যৌবনে পত্নীর প্রতি ভালোবাসা অনেক মানুষের থাকে, কিন্তু তাহা থাকে আপনাদের সুখ-স্বপ্ন লইয়া বিভোর, ভোগের আনন্দে মশগুল। কিন্তু যে যুবক আগা গোড়া

আদর্শবাদ, জনসেবা আর ভগবদ্‌ভক্তি দিয়া গঠিত তাঁর এই গভীর পত্নীপ্রেম দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ডায়েরির পাতায় দেখা যায় যে, একদিনও তিনি তাঁর বালিকা বধূকে ভোলেন নাই। তাঁহাকে বলিতেছেন, "খাটিতে খাটিতে সংসারের তাপে যখন প্রাণ কেমন করিতে থাকে, তখন তোমাকে দেখিয়া নব বল পাইব, তজ্জন্যই তো তোমাকে পাইয়াছি।"

আমরা ভাবিতে পারি, যিনি এত কাজে ডুবিয়া থাকিতেন, এত বিচিত্র বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবার অবসর বা সুযোগ তিনি কোথায় পাইতেন? খ্যাতিমানদের সঙ্গ লাভের চেষ্টা তিনি কখনো করেন নাই। কিন্তু কাজ ও জ্ঞান সঞ্চয়ের নেশা তাঁকে নানা জায়গায় টানিয়া লইয়া যাইত এবং তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাইয়া অন্যেও তাঁকে কাছে টানিবার চেষ্টা করিতেন। এই সূত্রে অল্প বয়সেই তখনকার বাংলার প্রায় সব খ্যাতনামা জ্ঞানী ও কর্মীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় এবং কোথায় বা বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

'নেচার ক্লব'

এই সময় কয়েকজন জ্ঞানী পুরুষের চেষ্টায় Nature Club বা Society বলিয়া একটি সভা স্থাপিত হয়। ক্লবের সভ্য ছিলেন ড. প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডা. নীলরতন সরকাব, ডা. প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, প্রাণীতত্ত্ববিৎ রামব্রহ্ম সান্যাল, অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু ও অধ্যাপক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। বোধহয় পবে ডা. বিপিনবিহারী সরকার ক্লবের আর-এক জন সভ্য হন। এখানে নানা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বহু জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হইত। আজকালকার দিনে এ-রকম জ্ঞানালোচনার ক্লবে আহারের নিমন্ত্রণ থাকিলেও লোকে যাইতে চায় না। তখন এই জিজ্ঞাসুর দল কিন্তু প্রতি মাসে চাঁদা দিয়া ক্লবের সভ্য হইতেন এবং নিয়মিত পাঠ ও বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতেন। সকলেরই দিনে নানা কাজ থাকিত, তাই রাত্রে সাড়ে এগারোটা বারোটা পর্যন্ত সভা চলিত। প্রত্যেক সভ্যের বলিবার পালা ছিল এবং বলিবার আগে তাঁদের নিজ নিজ বিষয়ের সাধ্যমতো অধ্যয়নাদি করিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিতে হইত। কোনোদিন প্রস্তুত প্রফুল্লচন্দ্র 'উদ্ভিদ্‌বিদ্যা' বিষযে, কোনোদিন রামানন্দ ও হেরম্বচন্দ্র 'Science of Language' বিষয়ে বা 'General Literature' বিষয়ে, কখনো নীলরতন চিড়িয়াখানায় রামব্রহ্মবাবুব বাসায় বিড়াল বিষযে dissection করিয়া, কখনো বা চক্ষু বিষয়ে নানা ভাবে বুঝাইয়া বক্তৃতা দিতেন। বক্তৃতার উদ্দেশ্যে বিড়াল মারা অন্যায় মনে করিয়া মৃত বিড়াল সংগ্রহ করিতে হইত।

প্রথম অধিবেশনে প্রফুল্লচন্দ্র Preservation and extinction of types of animals বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন। অন্য সভ্যেরাও জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য করিতেন। ইঁহারা মাসে মাসে *Contemporary Review* প্রভৃতি ৭।৮ খানা প্রসিদ্ধ কাগজ লইতেন। তাতে রামানন্দ খুশি হইয়া বলেন, "শিখিবার বড়ো সুবিধা।" 'নেচার ক্লবে'র জন্য রাত ১২টা পর্যন্ত জাগিয়া অনেক সময় ক্লান্ত হইয়া দিনে রামানন্দের প্রাত্যহিক কাজ বাকি পড়িয়া যাইত। আবার অন্য সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া তা পুরাইয়া লইতে হইত। রামানন্দ ছাত্রাবস্থায় বিজ্ঞানের অনুরাগী ছাত্র ছিলেন। পরেও যে তিনি এত জন বৈজ্ঞানিকের ও চিকিৎসকের সঙ্গে এই সভায় যুক্ত ছিলেন, তাহা বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক টান ছিল বলিয়াই। জ্ঞানসঞ্চয় এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর আদর্শের পিছনে ফেরা তাঁর জীবনের একটি লক্ষ্য ছিল। তিনি জানিতেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। জ্ঞান এবং আদর্শবাদই মানুষকে প্রকৃত বল

দেয়। সেই বললাভের জন্য তিনি প্রত্যহ পাঠের সংকল্প চিরদিন রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি চাহিতেন যে, এই পাঠ অধিকাংশই দার্শনিক বিষয়ে হয়, কিন্তু অবস্থাচক্রে সবদিন তা ঘটিয়া উঠিত না।

কাজের অভাব তো ছিলই না, অবসরেরই অভাব ছিল। তবু রামানন্দের মন বিস্তৃততর ক্ষেত্রে জনসেবার জন্য ব্যাকুল হইত। মনে হইত, 'জীবনটা কর্মময় তো হইল না, অনেক ফাঁক থাকিয়া গেল।' কোন্ কাজটা করিলে প্রকৃত সেবা হইবে এই ভাবিয়া মনে নানা সংশয় জাগিত :—বড়ো কাজ ফেলিয়া ছোটো কাজ লইয়া মাতিয়া আছেন কি? কিন্তু নিজেকেই তিনি বুঝাইতেন (ইংরাজির অনুবাদ) "সব চেয়ে হাতের কাছে যে কাজ পাও, সমস্ত শক্তি দিয়া তাই করো।" বলিতেন, "কর্তব্য খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না, কত কর্তব্যই তো অসম্পন্ন রহিয়াছে। কেন মনে করিতেছি প্রভুর সেবায় পথ পাইতেছি না।" সকল কর্মের সূচনাতেই ভাবিতেন, "প্রত্যেক মুহূর্তে ভগবানের ইচ্ছামতো কাজ করিতে চেষ্টা করো।" (ইংরাজির অনুবাদ) ছোটো হউক বড়ো হউক সবই বিধাতার কাজ!

উপবীত ত্যাগ

রামানন্দের উপবীত ত্যাগ ১৮৯০-এর পূর্বেই হওয়া সম্ভব, কারণ এই বৎসরের গোড়াতে তিনি মনে করিয়াছিলেন বাড়ি গিয়া খবরটি সকলকে জানাইবেন। ইতিমধ্যে তিনি শুধু তাঁর পত্নীকে চিঠিতে খবর দিয়াছিলেন এবং আশ্চর্য যে মাত্র ১৫।১৬ বৎসর বয়সেই গ্রামপালিতা মনোরমা দেবী এই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছিলেন। স্বামীর প্রতি তাঁর ভালোবাসাই শুধু গভীর ছিল না, স্বামীর বিবেকবুদ্ধি ও কর্তব্যজ্ঞানের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও ছিল গভীর। স্বামীর নিকট দেশের নানা আদর্শের কথা জানিতে পারিয়া অতি অল্প বয়স হইতেই উপযুক্ত সহধর্মিণীর মতো তিনি স্বামীর পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার সকল সংগ্রামে শক্তি দিয়া আসিয়াছেন। স্বামীর কথাকে তিনি বেদবাক্যের মতো সত্য বলিয়া জানিতেন।

কিন্তু মাতা হরসুন্দরী দেবী ছিলেন নিষ্ঠাবতী প্রাচীন মহিলা। তাঁর মনে বেদনা দিবার ভয়ে রামানন্দ প্রকাশ্যে উপবীত ত্যাগ ঘোষণা করিতে ইতস্তত করিতেন। একদিকে মাতৃবৎসল স্নেহকোমল মন ও অন্য দিকে একেশ্বরবাদ ও সাম্যনীতির উপর গভীর অনুরাগ কিছুদিন তাঁকে নানা মানসিক সংগ্রামে ফেলিয়াছিল। উপবীত ত্যাগের কথা তো বলা কঠিনই ছিল, মাকে বেদনা দিবার ভয়ে বাঁকুড়ায় ব্রহ্মোৎসবে যোগ দিতে যাইতেও তিনি ইতস্তত করিতেন। ডায়েরিতে (১৬।২।১৮৯০) লিখিয়াছেন, "বাঁকুড়ায় উৎসবে যাইবার কথা ভাবিতেছিলাম; মনে মনে আর সব বাধাই অতিক্রম করিয়াছিলাম ; কিন্তু মনে হইল মা'র জ্বর জ্বর হইয়াছে। উৎসবে যোগ দিয়া তাঁহার মনঃপীড়া বাড়াইব না।" মা পীড়িত আছেন শুনিলেই তাঁর ইচ্ছা হইত তাঁকে নিজের কাছে কলিকাতায় আনিয়া রাখেন।

কিন্তু ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের আগেই যে রামানন্দ বাঁকুড়ায় ব্রহ্মোৎসব করিয়াছেন তার প্রমাণ 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকায় আছে। ১৬ চৈত্র ১৮১০ শকের সংখ্যায় (১৮৮৮ খ্রি.) আছে— "আমরা বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের এইরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৪ই ফাল্গুন রবিবার প্রাতে উপাসনা। বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উপাসনার কার্য করেন।... অপরাহ্নে সমাজ মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উপাসনা করেন।"

ইহারই কাছাকাছি সময়ে বাঁকুড়ায় একটি কানন-সম্মিলন, উপাসনা ও প্রীতিভোজন

রামানন্দের উদ্‌যোগে হয়, তাহার কথাও সেই সময়ের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় আছে। পরের বৎসর ১৮১১ শক (১৮৮৯ খ্রি.) ১৬ জ্যৈষ্ঠে রামানন্দের বয়স ২৪ পূর্ণ হয়। সেই দিনের তত্ত্বকৌমুদীতে আছে :—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার ত্রৈমাসিক অধিবেশনের কার্য বিবরণ :—(৭ই বৈশাখ শুক্রবার রাত্রি ৮ ঘটিকায় সিটি কলেজ গৃহে স্থগিত অধিবেশন হয়।) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মনোনীত হইলেন :—

বাবু কেদারনাথ কুলভীর প্রস্তাবে এবং বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়র পোষকতায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রামব্রহ্ম সান্যাল ও অনঙ্গমোহন ঘোষ।

তাঁহার ডায়েরিতে দেখি যে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাঁকুড়া ব্রহ্মমন্দিরে ছাত্রসমাজের উপলক্ষে 'পবিত্রতা' 'গারফিল্ড' প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছেন, কুলভী মহাশয় সেখানে Students' Association-এর শাখা স্থাপন করিতে তাঁহাকে বলিতেছেন।

এইগুলি পড়িয়াও মনে হয় ১৮৮৮ কী ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দেই তিনি উপবীত ত্যাগ করেন এবং সেই সময় বাঁকুড়ায় উৎসবে যোগ দেওয়াতে মাতা হরসুন্দরী ক্ষুণ্ণ হন।

নিজে যেভাবে ও যে আদর্শ অনুসারে জীবন যাপন করিতেন এবং করিতে চাহিতেন পত্নীকেও তিনি সেইভাবে রাখিতে চাহিতেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁকে কাছে আনা সম্ভব হইতেছিল না। যখন দেশে যাইতেন তখন সাধ্যমতো পত্নীকে লেখাপড়া শিখাইবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু যতখানি করা উচিত ছিল সেই জীবনসংগ্রামের দিনে ততখানি করিতে পারেন নাই বলিয়া বৃদ্ধ বয়সেও তিনি দুঃখ করিতেন। তিনি তাঁর কন্যাদের অনেককাল পরে লিখিয়াছিলেন, "আমাদের যে পুরাতন পাকা বাড়ি ছিল, তার ছাতে উঠবার সিঁড়ির শেষ ধাপের উপরে ও ছাতে যাবার দরজার সম্মুখে যে একটি ছোটো চাতাল ছিল, তাতে একটি ছোটো টেবিল ও চেয়ার রেখে সেখানে আমি তোমাদের মাকে কিছু পড়াতাম। ২।১ খানা বাংলা বহির অর্থপুস্তকও (বোধহয় আংশিক) আমি তাঁর জন্যে খাতায় লিখে দিয়েছিলাম। এই রকম অর্থপুস্তক দেখে আমার বন্ধু পরেশ বলেছিলেন, 'এ রকম অর্থপুস্তক নূতন, মুদ্রিত অর্থপুস্তকগুলার থেকে স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট।' এই-সব ব্যাপার বাড়ির লোকের অজ্ঞাত ছিল না। তাতেও বোধকরি তোমাদের মাকে গঞ্জনা সইতে হত। কিন্তু কাহারো নামে কিছু লাগানো তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। কোনো রকম অভিযোগ কোনো দুঃখকষ্টের কথা তাঁর মুখে ঐ সময় কখনো শুনি নাই। তিনি নিজের আনন্দে মগ্ন থাকতেন। তোমাদের মাকে আমি বাংলা ও কিছু ইংরেজি পড়াতাম। এতে মনে কোরো না, যে, আমি তাঁর প্রতি কর্তব্য করতে পেরেছিলাম।... তিনি যে শক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন, তিনি সুযোগ পেলে তার পরিচয় লোকে পেয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ হত এবং দেশের খুব উপকার হত। কিন্তু আমার অমনোযোগ ও অবহেলায় তিনি তা পাননি।"

প্রথম বেতন লাভ

মনোরমা দেবীকে বাড়িতে রাখিয়া যখন তিনি কলিকাতা যাইতেন তখন পূর্বের মতো সেখান হইতে তাঁহার জন্য নিয়মিত পুস্তকাদি তো পাঠাইতেনই, তদুপরি বাংলা লিখিতে শিখিবার জন্য রচনার বিষয়, রচনা-প্রণালী, রচনার খসড়া ইত্যাদি লিখিয়া পাঠাইতেন। সিটি কলেজে রামানন্দের কাজ ক্রমে বাড়িতে লাগিল, কিন্তু তাঁকে বেতন দিবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। একদিন প্রিন্সিপ্যাল উমেশচন্দ্র দত্ত বলিলেন, "তুমি সেকেন্ড ইয়ারে পড়াচ্ছ, ফার্স্ট

ইয়ারের পরীক্ষাটাও তুমিই করো।" রামানন্দ কখনো কিছু বলিতেন না, কিন্তু সেদিন বলিয়াছিলেন, "কাজের কথা সবাই বলে, কিন্তু খাবার খবর নেয় না।" এ কথা বলিয়া তাঁর এমনই অনুশোচনা হইল যে তিনি ডায়েরিতে লিখিলেন, "I am a mean man, for my mind is conversant with gain and not with righteousness" ("আমি নীচ লোক, আমার মন লাভের প্রয়াসী, ধর্মের নয়"।) কিন্তু পরে ভাবিলেন, অর্থ ছাড়া তো পৃথিবীতে চলে না। বাঁচিতে হইলে এবং স্ত্রী ও মাতার প্রতি কর্তব্য করিতে হইলে অর্থ চাই। অর্থের চিন্তায় মনটা বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, ফলে কাজ ভালো হয় না। এদিকে প্রতি দিন ধার বাড়িয়া যাইতেছে। যাঁর একটা চাকরি নাই তাঁর ইতিমধ্যে ১৭০ টাকা ধার জমিয়াছে। সিটি কলেজের কর্তৃপক্ষ চাকরি পাকা করিতে এবং বেতন দিতে ইতস্তত করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র বলিলেন, "তুমি তো আমাকেই একটু সাহায্য করছ, এটা আমারই কাজ, আমি কী করে তোমার জন্য বেতন চাই?" রামানন্দ বলিলেন, "তা হলে আমি কলকাতার বাইরে চলে যাই।" আবার স্থির করিলেন এফ. এ. পরীক্ষার বইয়ের 'নোট্স' লিখিয়া কিছু টাকা করিবেন। তখন কলেজ-কর্তৃপক্ষ বলিলেন, "আচ্ছা তা হলে যতদিন চাকরি না হয় তুমি ৫০ টাকা subsistence allowance (খোরাকি) নাও।" রামানন্দ তাতে রাজি হইলেন না। তিনি শক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি বিনা বেতনে আরো কিছুদিন কাজ করিতে পারি, কিন্তু ১০০ টাকার কমে কাজ করি ঃ না।" এ কথা বলিয়াও তাঁর মনে দুঃখ হইল। লোকে তাঁহাকে অর্থগৃধ্নু মনে করিবে। কিন্তু পরক্ষণে ভাবিয়া দেখিলেন বাঁকুড়ার ও কলিকাতার খরচ মাসে ১২০ টাকার কমে হয় না। সুতরাং ১০০ টাকার কমে রাজি হওয়া যায় না। অগত্যা ফেব্রুয়ারির শেষে কর্তৃপক্ষ স্থির করিলেন যে প্রায় দুই বৎসর যিনি অবৈতনিক শিক্ষক ছিলেন তাঁকে মার্চ হইতে ১০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হউক। কিন্তু তাঁহাদের ভয় ছিল এই মেধাবী যুবককে অধিক বেতন দিয়া অন্যে লইয়া যাইতে পারে। তাই তাঁহারা স্বীকার করাইয়া লইলেন ১০০ টাকায় দুই বৎসর সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। রামানন্দ রাজি হইলেন। বেতন স্থির হওয়ার পর কিছুদিন তাঁকে সিটি স্কুলেও ইতিহাস প্রভৃতি পড়াইতে হইত।

কতকটা অর্থাভাবেই রামানন্দ সস্ত্রীক কলিকাতায় বাস করিতে পারিতেন না। ট্রামের পয়সার অভাবে তাঁকে নিজের এবং ব্রাহ্মসমাজের সব কাজ হাঁটিয়া করিতে হইত এবং বহু দিকে বঞ্চিত হইতে হইত। তিনি সর্বদাই অনুভব করিতেন যে স্ত্রীকে কাছে আনিয়া না রাখিতে পারিলে তাঁকে জ্ঞাতি কুটুম্ব ও পাড়াপড়শীর ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও বাক্যবাণের আঘাত হইতে রক্ষা করা যাইবে না। হয়তো কিছু নির্যাতনও বালিকা বয়সেই সহ্য করিতে হইতে পারে। একত্রে না থাকিলে আধ্যাত্মিক জীবনে পরস্পরের সহায় হওয়া হইবে না এবং দাম্পত্য জীবনে যেমন গভীর যোগসূত্রে যুক্ত হওয়া তাঁর আদর্শ ছিল তার কিছুই হইবে না।

তাই চাকরি হওয়া মাত্র তিনি সস্তার বাসা খোঁজা, অতিরিক্ত আয় করা ইত্যাদির দিকে একটু মন দিলেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দেই পূজার ছুটির পর সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিলেন। তখনকার কথা তিনি কন্যাদের লিখিয়াছিলেন, "তখন বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে হয় নাই। রানীগঞ্জ পর্যন্ত গোরুর গাড়িতে এসেছিলাম। গোরুর গাড়ি দামোদর পার হবার সময় দামোদরে বান এসে পড়ল। রানীগঞ্জে পৌঁছবার ঠিক আগেই দামোদর পার হতে হয়। দামোদরে কখনো কখনো হঠাৎ বন্যা হয়—বিশেষত বর্ষায়। গাড়ি নামাবার পর নদীর জল

অল্প অল্প বাড়তে লাগল। যখন নদীগর্ভে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি তখন উভয়সংকট—অগ্রসর হলেও বিপদ, না হলেও বিপদ হতে পারে। জল গাড়ির চাকার অর্ধেকের উপর ডুবিয়েছে। ক্রমশ গাড়ির উপরে যে খড় ও বিছানা পাতা ছিল, তাও ভিজতে আরম্ভ করল। যা হোক কোনো প্রকারে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে আমরা তীরে পৌঁছলাম। তার আগেই কিন্তু চাকা দুটো প্রায় সমস্তই ডুবে গিয়েছিল ও বিছানা ভিজে গিয়েছিল। আমরা ডাঙায় উঠতেই দেখলাম বন্যা খুব বেশি বেড়ে গেল। নদীগর্ভে আমরা দুজনে এবং গাড়োয়ান ও বলদ দুইটি ছাড়া আর কেউ সাহায্য করবার ছিল না। কিন্তু তোমাদের মা ভীত বিচলিত বা উদ্‌বিগ্ন হন নি।"

এই বন্যায় নদীগর্ভে তাঁদের দুজনেরই মৃত্যু হইতে পারিত, কিন্তু রামানন্দ ঘটনাটির উল্লেখ কবিবার সময় তাঁর স্বাভাবিক সংযত ভাষাকে একটুও অলংকারমণ্ডিত করিতে চেষ্টা কবেন নাই, নিজের স্থিরবুদ্ধির ও উভয়ের জীবনসংকটের কথা উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলিয়া সকলের মনে ভয় ও বিস্ময় জাগাইবারও কোনো চেষ্টা করেন নাই।

কলিকাতায় মনোরমা দেবীর আগমন

চাকরি হওয়া এবং স্ত্রীকে লইয়া ব্রাহ্ম হইয়া কলিকাতায় বাস করাব ফলে দেশে নানা আন্দোলন উপস্থিত হইল। এই বিষয়ে রামানন্দ লিখিয়াছিলেন, "আমি ঠিক কখন পৈতে ফেলে দিয়েছিলাম মনে নাই। এম. এ. পাসের পর যখন সিটি কলেজে চাকরি হয়, এবং তার পর যখন তোমাদের মাকে কলিকাতা নিয়ে যাবার উদ্যোগ করি, তখনই এই কথা নিয়ে বাড়িতে বোধহয় আন্দোলন ভালো করে হয়। আমাব দুই দাদার চেয়ে আমার চাকরির বেতন তখন বেশি ছিল। এরূপ সন্দেহ করবার ও করাবার লোকের অভাব ছিল না, যে, আমি আমার রোজগারের সব টাকাটা নিজেই ভোগ করবার জন্য ব্রাহ্ম হযেছি বা হচ্ছি—যাতে কাউকে কোনো ভাগ দিতে না হয। এবং এ-রকমও বোধহয় কেউ কেউ মনে করে থাকবে, যে, তোমাদের মা-ই ঐ বকম কুবুদ্ধি আমাকে দিয়ে ব্রাহ্মসমাজে যেতে প্ররোচিত কবেছেন; বোধহয় এইজন্য আমাদের প্রতিবেশি একজন—আমার মাকে ও অন্যান্য প্রবীণা গুরুজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, সেজো-বৌ (তোমাদেব মা) কারো হিংসে-টিংসে বা সেই রকম কিছু করেন কি না। তাঁরা সকলেই বলেছিলেন, সেজ-বৌ সেরকম কিছুই করেন না। সুতরাং সাংসারিক-বুদ্ধিসম্পন্ন পাড়ার সম্পর্কে আমাদের দাদা—আমার ব্রাহ্ম হবার এবং তাতে সেজ বৌয়ের সম্মতি দিবার কোনো কারণ অনুমান করতে পারলেন না।"

হরসুন্দরী দেবী পুত্রবধূকেও ভালোবাসিতেন এবং জ্ঞাতিদের মধ্যে কেহ কেহ রামানন্দকে ত্যাজ্যপুত্র করিতে বলায় কিছুতেই রাজি হন নাই। তিনি অসাধারণ মহিলা ছিলেন। সেই ৫৩ বৎসর পূর্বে বাঁকুড়ার মতো অনগ্রসর দেশের মেয়ে উতলা হইলেন না। তাঁর ধীর বুদ্ধি ও শান্ত প্রকৃতি তাঁর সহায় হইল। শিক্ষিত বিদ্বান ছেলে যা করিয়াছেন ভালো বুঝিয়াই করিয়াছেন এই সান্ত্বনা নিজেকে দিলেন। পুত্রের নিকট কিছু দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র। এজন্য তাঁকে নিজেকেও কিছু নির্যাতন সহিতে হইয়াছিল। তবু তিনি প্রতিবাসীদের কুকথার উত্তরে বলিয়াছিলেন : "আমার রাজার সঙ্গে রানী গিয়েছে, তোমরা কোনো কথা বলতে পাবে না।" কিন্তু প্রচলিত ধর্মপ্রথা না মানায় রামানন্দ ও মনোরমা উভয়কেই নানা দুঃখ পাইতে হইয়াছিল। উপবীত ত্যাগ করার পর দেশে গেলে তাঁহারা

কিছু দিন বৈঠকখানা বাড়িতে বাস করিতেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে সামাজিক গোলমাল কমিয়া গেলে বসতবাড়িতেই অন্য ভাইবোনদের সঙ্গে থাকিতেন। মনোরমা দেবী যখন বাঁকুড়ায় শ্বশুরালয়ে থাকিতেন তখন স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁকে কিছু কিছু সামাজিক নির্যাতন সহ্য করিতে হইত। কিন্তু তাঁর দেবর ও ভাগিনেয়রা সর্বদা তাঁর সহায় ছিলেন।

মনোবমা দেবীর চারিত্রিক দৃঢ়তাব বিষয় বামানন্দ লিখিয়াছিলেন, "তাঁর বয়স তখন ১৭ বৎসরের চেয়ে কমই হবে। উচ্চশিক্ষা তো তিনি পানই নাই, শিক্ষিত পরিবাবের মেয়েও তিনি ছিলেন না। ব্রাহ্মসমাজের লোকদের সঙ্গেও তখন তাঁর পরিচয় ও মিলামিশা হয় নাই। অথচ তিনি তখনই ব্রাহ্মধর্মের সাব উপদেশ গ্রহণ করতে এবং ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ অনুসরণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এর থেকেই তাঁর শ্রদ্ধা, তাঁর বুদ্ধি, তাঁর সারগ্রাহিতা ও তাঁর সাহসেব পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পিতৃকুল, মাতৃকুল, ও শ্বশুরকুলের সবাই তাঁকে দুষছে, দুষবে ও ছেড়ে দেবে না তা তিনি জানতেন ; সমাজে তাঁর নিন্দা রটছে ও রটবে তা-ও তিনি জানতেন। অবশ্য আমি তাঁর সহায় ছিলাম। কিন্তু আমি তখন যুবক, আমাব খ্যাতি-প্রতিপত্তি তখন কিছুই হয় নাই। এ-রকম অবস্থায় তোমাদের মা যে আমাব সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে এসেছিলেন তাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে অসাধারণত্ব ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবানের কৃপা তিনি পেয়েছিলেন, প্রেম তাঁর সম্বল ছিল।"

রামানন্দ সস্ত্রীক ব্রাহ্মসমাজে আসতে দেশে অনেক মানুষের মনে সন্দেহ হইয়াছিল বটে যে, তিনি আত্মীয়-স্বজনকে উপার্জনের ভাগ দিতে চান না বলিয়া হয়তো ব্রাহ্ম হইয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাঁর মাতৃভক্তি ও স্বজনপ্রীতি যে কত গভীর ছিল তা পরে তাঁর চিরদিনের সস্নেহ ব্যবহার হইতেই সকল আত্মীয়স্বজন বুঝিয়াছিলেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রথম রামানন্দ সিটি কলেজ হইতে বেতন পান। পরীক্ষার গার্ড দেওয়ার জন্য ৪৷৷০ এবং ফেব্রুয়ারির খুচরা ৫ দিনের বেতন লইয়া তাঁর মোট আয় হইয়াছিল ১১৯৷৷১৫। এই টাকার অর্ধেকেরও বেশি ৬০ টাকা তিনি বাঁকুড়ার বাড়িতে পাঠান। বন্ধুদের ধার দিয়াছিলেন এবং নিজের ধার শোধ করিয়াছিলেন ২২, সম্পাদকীয় এবং অধ্যাপনার কাজের জন্য বই কিনিয়াছিলেন এবং চাঁদা দিয়াছিলেন ১৯৷৷০, ছোটো ভাই ও ভ্রাতৃবধূর হাতখরচ দিয়াছিলেন ২। সুতরাং দেখা যাইতেছে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বাকি ছিল আন্দাজ ১৬ টাকা মাত্র। বিলাস ও শখের কথা না তোলাই ভালো। এই একটা মাসের হিসাব হইতেই তাঁহার স্বভাবের পরিচয় স্পষ্ট পাওয়া যায়।

কলিকাতায় সস্ত্রীক বাস করিতে হইলে বাড়ি ভাড়া করা দরকার। বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল অন্তত ৭০ টাকার কমে আলাদা গৃহস্থালী চলে না। বাড়িতে ৬০ টাকা না হউক, ৫০ টাকা প্রতিমাসে দিতেই হইবে। সুতরাং বাংলার বাহিরের কাগজে Calcutta Correspondent (কলিকাতার সংবাদদাতা) হইয়া কিছু আয় করা যায় কি না তিনি ভাবিতে লাগিলেন। সে বিষয়ে মাদ্রাজের 'হিন্দু'র সম্পাদককে লিখিলেন এবং নিজের কয়েকটি ছাপা প্রবন্ধ পাঠাইলেন। গার্ড দেওয়ার একঘেয়ে কাজ লইলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কাগজ পরীক্ষাও করিবেন ঠিক করিলেন। এত খাটুনির ফলে শরীর ভাঙিয়া পড়িল। মনে ভয় ঢুকিল ডায়বেটিস হইবে। 'মানব-সেবা'র নানা কাজে হাত দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ফলে প্রতিদানস্বরূপ পাওয়া যাইত নূতন নূতন কাজের ভার। সুতরাং বিশ্রাম বলিয়া কোনো জিনিস ছিল না।

সস্ত্রীক কলিকাতায় আসিয়া তিনি প্রথম উঠিলেন বৌবাজারের সনাতন শীলের লেনে বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্রভূষণ ঘোষের পিতা যাদবচন্দ্র ঘোষের বাসাতে। সুরেন্দ্রর মা এই অক্লান্তকর্মা

যুবককে নিজ সন্তানের মতো ভালবাসিতেন। যখন স্ত্রীকে আনেন নাই তখন কাগজের প্রুফ দেখিয়া, লেখা আদায় করিয়া, দুই বেলাই তিনি অসময়ে আহারের জন্য বাড়ি ফিরিতেন। তাহাতে এই মাতৃকল্পা মহিলা কখনো বিরক্ত হইতেন না। বরং তাঁহারই সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গে কত সদালাপ করিতেন। তাঁরাই অনুরোধ করিয়াছিলেন প্রথম তাঁদের বাসায় সস্ত্রীক উঠিয়া পরে দরকার বোধ করিলে বাসা দেখিয়া লইতে। রামানন্দ চিরদিন স্নেহের বশ ছিলেন। তিনি এই সস্নেহ অনুরোধে কোনো দ্বিধা না করিয়া মতো দিলেন। এই বন্ধু পরিবার ব্রাহ্ম ছিলেন না। তবু ইঁহাদের ব্যবহার চিরদিন সস্নেহ ছিল।

এখান হইতে আলাদা বাসা ভাড়া করিয়া তাঁরা গেলেন মিরজাফর লেনের একটি ছোটো বাড়িতে। এখন মিরজাফর লেনের নাম কলেজ রো। খুব ছোট্ট বাড়িটি। ভাড়া মাসে ১৭ ॥৯০ আনা কিংবা ১৭॥৯। উপরে একটি মাত্র থাকিবার ঘর আর একটি ছোটো অন্য ঘর। থাকিবার ঘরটি পার্টিশন দিয়া দুভাগে বিভক্ত করা ছিল। নীচে যে চলন দিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে হইত, তারই পাশে কাঠের পার্টিশন দিয়া একটি সরু কামরা বৈঠকখানা করা হইয়াছিল। এই বাসাতে রাঁধুনি রাখা সম্ভব হয় নাই।

দেশপ্রীতি রাজনীতি ও কংগ্রেস

প্রেম যাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল তিনি কেবল মাতা পত্নী ও আত্মীয়-স্বজনকে ভালোবাসিয়াই তৃপ্ত হন নাই। নিজ জন্মভূমি বাঁকুড়ার মাটিও তাঁর প্রিয় ছিল। এই দেশপ্রীতিই ক্রমে ভারতপ্রীতিতে পরিণত হয়। আমরা জানি বাল্যে রমেশচন্দ্র প্রভৃতির দেশভক্তির আদর্শে রামানন্দ অনুপ্রাণিত হইতেন। পরে যখন কলেজে পড়িতে আসিলেন তখন সুরেন্দ্রনাথ, শিবনাথ ও আনন্দমোহনের দেশভক্তি তাঁকে তাঁদের দিকে আকর্ষণ করিত। 'স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন', 'ছাত্র-সমাজ' প্রভৃতিতে রাজনীতির আলোচনা হইত। সুরেন্দ্রনাথ ও শিবনাথ প্রভৃতির দেশপ্রেম তাঁদের সাহায্যে এই-সব মননশীল যুবকের মনে সঞ্চারিত হইত। তিনি যখন কলেজের ছাত্র তখনই ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। এই কংগ্রেসের খবর তিনি রাখিতেন, তবে তাঁর তখনকার কোনো কাগজপত্র না থাকাতে সে বিষয়ে বেশি কিছু বলা যায় না। ১৮৮৬তে কলিকাতায় কংগ্রেস হয়, ছাত্র হইলেও তিনি কংগ্রেস দেখিতে গিয়াছিলেন এবং তার অস্পষ্ট স্মৃতির কথা 'প্রবাসী'তে লিখিয়াছিলেন: "একজন বাঙালি প্রতিনিধি পঞ্জাব থেকে এসেছিলেন, তিনি তাঁর লম্বা দাড়ি বিনুনি করে কানের উপর দিয়ে নিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। তাঁকে দেখে আমরা যুবকেরা কৌতুক অনুভব করেছিলাম, ভেবেছিলাম তিনি শিখ হয়ে গিয়েছেন।"

সুতরাং বলিতে গেলে দ্বিতীয় বৎসর হইতেই কংগ্রেস সম্বন্ধে তিনি উৎসাহী ছিলেন। ১৮৮৭ এবং ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেসে তিনি উপস্থিত ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি চতুর্থ কংগ্রেসের চেয়ারম্যান অযোধ্যানাথের বিষয়ে ডায়েরিতে যে-সব ছোটখাটো মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় তখন এ-সব খবর তিনি ভালো করিয়া রাখিতেন। ১৮৮৯এ বোম্বাই শহরে কংগ্রেস হয় ওয়েডারবর্নের সভাপতিত্বে। এই সময় রামানন্দ কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। কিন্তু তখন তিনি অবৈতনিক, সেইজন্য কংগ্রেসে যাওয়া তাঁর সম্ভব হয় নাই। শিবনাথ শাস্ত্রী এবং হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন এবং

কলিকাতায় তাঁরা শিষ্যের কাছে কংগ্রেসের অনেক গল্প করেন। জাতীয় মহাসমিতি, Social Conference (সমাজসংস্কার সমিতি), ওয়েডারবার্নের বক্তৃতা, ব্রাড্‌ল এবং 'কুলিপুস্তিকা' বিষয়ে রামানন্দের নানা কাগজে লেখা হইতে বুঝা যায় তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কংগ্রেসের খোঁজখবর তখন রাখিতেন। এই পঞ্চম কংগ্রেসের কয়েক মাস পরে ১৮৯০-এর ২৬ এপ্রিল গ্রীষ্মের ছুটিতে বাঁকুড়ায় রামানন্দ একটি জনসভার বন্দোবস্ত করেন ব্রাড্‌লকে* সমর্থন করিবার জন্য। কয়েক দিন আগেই ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হইতে তাদের 'পিটিশন' এবং 'রেসোলিউশন' আনাইয়া রাখেন। বাঁকুড়ার এই রাজনৈতিক সভায় জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় সকলেই আসিয়াছিলেন। রামানন্দ প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন ও বক্তৃতা করেন। ডায়েরিতে আছে যে, এইদিন হইতে এই তথ্যটি তিনি ভালো করিয়া শিখেন :—"সোজা করে বুঝিয়ে দিলে সাধারণ লোকে খুব আগ্রহের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন।" এ কথা জীবনে তিনি চিরদিন মনে রাখিয়াছিলেন এবং কখনো ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ, ভারাক্রান্ত ভাষায় কোনো বিষয়ে লেখেন নাই। বাঁকুড়ার সেই রজনৈতিক সভা হইতে ৪৩১টি স্বাক্ষরযুক্ত একটি আবেদন পার্লামেন্টে পাঠানো হয়। ডায়েরিতে আছে :—"চাই Election of half the members and right of interpellation" মিটিং-এর খবর টেলিগ্রামে কলিকাতায় পাঠানো হয়। ইহার পর ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে টিভোলি গার্ডেনের কংগ্রেসে রামানন্দ সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন এবং স্বয়ং প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। ফিরোজশাহ মেহতা নিউম্যানের 'Lead kindly light' কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া অভিভাষণ শেষ করেন। এই কংগ্রেসে বাংলা দেশের প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট ডাক্তার শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী একটি প্রস্তাব সমর্থন করেন। তাঁকে ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ বক্তৃতা-মঞ্চে লইয়া যান। সে বৎসর কংগ্রেসে মনোমোহন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

'ধর্মবন্ধু' ধর্ম ও নীতি বিষয়ক কাগজ হইলেও রাজনীতির সমালোচক রামানন্দ ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের (এপ্রিল) বৈশাখ মাসের ধর্মবন্ধুতেই 'অহিফেন ব্যবসা' সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়াছেন।

> "এ সম্বন্ধে যখন (পার্লামেন্টে) বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল তখন সার জেম্‌স ফারগুসন্ ও সার রিচার্ড টেম্পল দুজনেই বলিলেন অহিফেনের ব্যবসা উঠাইয়া দিতে গেলে গবর্নমেন্টেব লাভ একেবারেই কমিয়া যায়। সার আন্ড্রু স্কোবল ও স্বয়ং বড়লাট আমাদের দেশের বালিকা স্ত্রীর দুর্দশা অপনোদন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে (অহিফেন) তাঁহারা কি একেবারেই নীরব রহিবেন? (অহিফেন ব্যবসা গেলে প্রায়) ৪।৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখা কি রাজার কর্তব্য নহে?"

> সেই বৎসর নভেম্বর কি ডিসেম্বরে লর্ড লিটনের মৃত্যুর সময় 'ধর্মবন্ধু'তেই লেখেন, "...তবে ভারতশাসন বিষয়ে তিনি যে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন নাই, 'অস্ত্র আইন', 'মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ' প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্তস্থল। বাস্তবিক লিটন উপরওয়ালা মহাপ্রভুদের মুখ চাহিয়াই ভারত শাসন করিয়াছিলেন। গরিব প্রজাদের মঙ্গলামঙ্গলের উপর তাঁহার আদৌ দৃষ্টি ছিল না। এজন্য তিনি ঈশ্বরের নিকট অপরাধী।"

*** Bradlaugh attended the Fifth Congress at which a skeleton scheme was drafted for introducing representative institutions in India and that as a consequence he promised to move a Bill to that effect and on these lines in Parliament." (Renasacent India).**

ঘরোয়া কথা ও আতিথ্য

কলিকাতায় আসার পর মনোরমা দেবী সেই ছোটো বাড়িটিতে প্রায় সারা দিনই একলা কাটাইতেন। তাঁকে দেখিবার একটি রাতদিনের ঝি ছিল। তিনি কোনো অসুবিধাই গ্রাহ্য করিতেন না। এই বাড়ি হইতেই কলিকাতা আসার মাত্র ২।৪ মাস পরে তিনি, ফিরোজশাহ মেহতার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তা দেখিতে যান।

ডা. নীলরতন সরকার তখন তাদের পারিবারিক বন্ধুর স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মাঝে মাঝে মনোরমা দেবীকে বেড়াইতে লইয়া যাইতেন। ইতিমধ্যে একবার রামানন্দ পীড়িত হইয়া পড়েন। তখন তাঁর বন্ধু নীলরতনবাবু শুধু যে চিকিৎসা করিলেন তা নয়, তিনি মনোরমা দেবীকে সাগুর খিচুড়ি প্রভৃতি পথ্য রাঁধিতে শিখাইলেন। আর এক দিন তিনি রোগী দেখিয়া অনেক বেলায় বন্ধুর বাড়ি আসেন। তাঁর ক্ষুধা পাইয়াছিল কিন্তু তখন ঘরে ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত, একটু ডাল ও শাকের তরকারি ছাড়া কিছু ছিল না। নীলরতন বাবু তাই খাইলেন। রামানন্দ প্রায়ই বাড়ি বদল করিতেন। ইহার পরের বাড়ির কথা লিখিয়াছিলেন, "এর পর আমরা উঠে যাই ঝামাপুকুর লেনের একটি একতলা বাড়িতে। উকিল রাম মিত্রের, বেচু চাটুজ্যের স্ট্রিটের বাড়ির পাশে সে বাড়িটা, তাঁর ভাই কানাই মিত্রের। এখন বাড়িটা দুতলা কি তেতলা হয়েছে। এই বাসাতে কেদারনাথের জন্ম হয়।"

শিবনাথ শাস্ত্রী ও তাঁর শিষ্য এবং বন্ধুগণ পুরাকালে শুধু বাহিরে জনসেবা কবিতেন না, ঘরেও মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করিতেন। তিনি এবং তাঁর সহধর্মিণী কত পিতৃমাতৃহীন শিশু, বিধবা নারী ও সমাজ-পরিত্যক্তা নিরাশ্রয় কন্যাকে ঘরের ছেলেমেয়ের মতো আশ্রয় ও শিক্ষা দিয়াছিলেন। শিষ্যদের মধ্যেও এই ভাব জাগ্রত হইয়াছিল। যাঁদের সঙ্গে সেবাব সূত্রে এই রকম করিয়া যোগ হইত, তাঁরা অনেকে পরে তাঁর আত্মীয়ের মতো হইয়া গিয়াছিলেন।

সস্ত্রীক রামানন্দ যখন ঝামাপুকুরের বাসাতে ছিলেন তখন তাঁদের বাসাতে এক বিধবা ভদ্রমহিলা সপুত্রকন্যা বাস করিতেন। ইঁহাদের বিষয় রামানন্দ তাঁর কন্যাদের লিখিয়াছিলেন,

> "শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁদেব অভিভাবকরূপে তাঁহাদিগকে আমাদের বাসায় রেখে দিয়েছিলেন। তিনি তোমাদের মাকে স্নেহ করতেন এবং তাঁর উপর আস্থাবান ছিলেন। এই বাসায় আর একটি মেয়ে আমাদেব কাছে থেকে স্কুলে পড়তেন। এখানে কুমারডাঙ্গার, পাঠকপাড়ার, লোকপুরের, ছাতনার ও বাঁকুড়ার নানা লোক মধ্যে মধ্যে অতিথি হয়েছিল। বাসাটাতে থাকবাব ঘর মোটে তিনটি ছিল, ২টি মাত্র আমাদের, ১টি উক্ত বিধবা ভদ্রমহিলার। এই বাসায় শাস্ত্রী মহাশযের আর একটি 'ওয়ার্ড' (পোষ্য) মধ্যে মধ্যে থাকতেন।"

বুঝা যাইতেছে যে সামান্য আয় এবং এতটুকু বাড়ি হইলেও এই পরিবারে অতিথির এবং সাগ্রহ আতিথ্যের আভাব ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের আশ্রিতেরা তো থাকিতেনই, উপবীত ত্যাগ করায় যাঁরা রামানন্দকে কটু কথা বলিয়াছিলেন তাঁরাও প্রয়োজন হইলেই আতিথ্য গ্রহণ করিতেন।

রামানন্দ নানা সৎকাজের সঙ্গে জড়িত হওয়ায় অল্প বয়সেই তাঁর খ্যাতি হইয়াছিল। ২।১টি কৌতুককর গল্প হইতে তাহা বুঝা যায়। তিনি নিজেই লিখিয়াছিলেন,

> "এই বাসায় বরিশালেব জমিদার দেবকুমার রায়চৌধুরীর বাবা রাখালবাবু আমার সঙ্গে

দেখা করতে আসেন। কুসুম নাম্নী একটি বালিকা ও আমি তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করার পর তিনি অধ্যাপককে (অর্থাৎ আমাকে) ডাকতে বললেন। কুসুম আমাকে দেখিয়ে বলল ;—ইনিই তো অধ্যাপক! তাতে রাখালবাবু খুব হেসেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, অধ্যাপক খুব প্রবীণ লোক হবেন। আমার বয়স তখন কম (বোধ হয় ২৬) ছিল এবং আরো কম দেখাত।

"এই বাসায় থাকতে একদিন আমি সন্ধ্যায় সকাল সকাল খেয়ে ব্রাহ্মসমাজের একটি কমিটির সভ্যরূপে তার কাজে গিয়েছিলাম। ফিরতে অনেক রাত হয়। সেদিন রাত্রে আমাদের এক বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে (তাঁকে কৃষ্ণদাদা বলতাম) আমাদের বাড়িতে খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলাম, কিন্তু তোমাদের মাকে সেকথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। কৃষ্ণদাদা যথাসময়ে এসে রাত্রি প্রায় নটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে বললেন, 'বৌমা, রামানন্দ তো এখনও এল না। আমাকেই কিছু খেতে দাও।' তোমাদের মা তো গাছ থেকে পড়লেন। কৃষ্ণদাদা অবস্থাটা বুঝতে পেরে বললেন, 'রামানন্দ ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছে, সাংসারিক জ্ঞানশূন্য!' তোমাদের মা বাজার থেকে আহার্য আনিয়ে তাঁকে খাইয়েছিলেন।"

মাতৃভক্তি

মাতৃভক্ত রামানন্দ অল্পবয়সে পিতৃহীন হইয়া কৈশোরে ও যৌবনে সর্বদা অনুভব করিতেন যে তাঁর মাকে অনেক অভাব ও কষ্ট সহ্য করিয়া সংসার চালাইতে হইত। ইহা তাঁহার জীবনে গভীর বেদনার কারণ ছিল। দেখিতে পাই, যেদিন হইতে অর্থ উপার্জন করিতেছেন সেই দিন হইতেই মাকে অর্থসাহায্য সাধ্যের অতিরিক্ত করিয়াছেন এবং তাঁর সংসারের অন্যান্য অভাব ও দুঃখ মোচনের জন্য অতিরিক্ত আয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁদের বসতবাড়ি পাকা হইলেও তখন পুরাতন জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বর্ষাকালে জল পড়িত, বর্ষ আসিলে তাঁর মা কষ্ট পাইতেছেন, দিনে রাত্রে জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করিয়া জলের হাত হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন ভাবিয়া তিনি অস্থির হইতেন। ১৮৯০-এর ডায়েরিতে আছে, "মেজদাদা আসিয়াছিলেন। নসী তাঁহাকে এক পত্রে বাড়ির ভগ্নাবস্থার কথা লিখিয়াছে। এই বর্ষার দিনে মায়ের কষ্টের কথা ভাবিলে আমার প্রাণ যে কেমন করে বলিতে পারি না। বাদল হইলে ঐ কথাই মনে হয়। আমি তো বেশ আছি, কিন্তু বাড়ির সকলের বিশেষত মায়ের কি কষ্ট! আগামী বৎসরে বাড়ি করিতেই হইবে। ধার করিয়াও করিব। Examiner হইবার চেষ্টা করা চাই।"

তিনি পরীক্ষক হইবার চেষ্টা করা মাত্র সফল হইয়াছিলেন। সিটি কলেজে তাঁর প্রথম বেতন হয় ১০০। তার পর ক্রমশ তাহা বাড়িয়া ১৪০ পর্যন্ত হইয়াছিল। তিনি মনোরমা দেবীর স্মৃতি-কথা উপলক্ষে কন্যাদের লিখিয়া ছিলেন, "কলকাতার বাসার খরচ মিতব্যয়িতার সহিত তোমাদের মা চালিয়ে যা বাঁচত, তার প্রায় সবই বাড়িতে পাঠানো হত। তা ছাড়া কলকাতায় চাকরি করতে করতে আমাদের পাঠকপাড়ার পৈতৃক বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি তৈরি করিয়েছিলাম। এখন এটা দু-তলা। একতলার তিনটি কামরা, লম্বা বারান্দা ও রোয়াক—এই সব আমার মাইনের টাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হওয়ার টাকা থেকে করা হয়েছিল। তখন এক-একজন প্রবেশিকার পরীক্ষক পাঁচ-ছয় শত টাকা পেত। কিছু কর্জও করেছিলাম। তা আমিই শোধ করি। মোট খরচ বোধ হয় ২০০০ টাকার কাছাকাছি হয়েছিল। আমরা ভাইরা নামে একান্নবর্তী ছিলাম বলে, যখন আমার মায়ের মৃত্যুর

কিছুকাল পরে বিষয় ভাগ হয়, তখন বাড়ির একতলাটা যে আমি করিয়েছিলাম তার জন্যে বেশি কিছু পাই নাই, চাইও নাই—তোমাদের মা-ও এ-বিষয়ে কিছু বলেন নাই। বাড়ির জন্যে যখন যা খরচ করতে হয়েছে, সমস্তই তাঁর আন্তরিক সম্মতি অনুসারে হয়েছে।"

যাঁরা সঞ্চিত অর্থ কিছুই ছিল না, এবং মাসিক উপার্জন এতই কম যে তাতে কিছুই উদ্বৃত্ত থাকিবার কথা নয়, তিনি এত অল্প বয়সে পৈতৃক জীর্ণ বাড়ি ভাঙিয়া নূতন বাড়ি করিয়াছিলেন নিজের ভোগের জন্য নয়, নিজের মাকে একটু আরাম ও আনন্দ দিবার জন্য। সে বাড়িতে রামানন্দ স্বয়ং সমস্ত জীবনে হয়তো কয়েক মাস মাত্র বাস করিয়া ছিলেন।

তাঁর ছোট একটি মাত্র ভাই ছিলেন। এই ছোট ভাইটিকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিবার জন্য তিনি অনেক অর্থব্যয় ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই কনিষ্ঠ ভ্রাতা যতদিন জীবিত ছিলেন তাঁর ভরণপোষণের খরচ রামানন্দই বহন করিতেন। এই কনিষ্ঠ ভাইটির মৃত্যুতে যেমন করিয়া শোকাশ্রুপাত করিয়াছিলেন তা যারা দেখিয়াছিল তারা ভুলে নাই। তাদের বুকে সে দৃশ্য এখনও ধাক্কা দেয়।

সেবাধর্ম ও দাসাশ্রম

ভাবতবর্ষ সেবার জন্য খ্যাত। বৌদ্ধ সম্রাট অশোক প্রভৃতির মানবসেবা, পশুসেবার কথা জগৎবিখ্যাত। হিন্দু ভারতের অন্নসত্র, জলসত্র, সন্ন্যাসিসেবা, অতিথিসেবা, মন্দিরে তীর্থস্থানে নানা পুণ্যকার্যের কথা লোকে জানে। কিন্তু বিগত শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের অবনতির সঙ্গে দলবদ্ধ সেবার ভাবের অবনতি হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের বিস্তৃতভাবে সেবার যুগ বিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়। তার আগে স্বদেশী অন্য কোনো বড়ো সঙ্ঘ এই জাতীয় কাজে নামিয়াছিলেন বলিয়া জানি না।

ব্রাহ্মসমাজ উনবিংশ শতাব্দীর নানা জনহিতৈষণার মূলে ছিলেন। সেবাধর্মও তাঁদের মনে জাগিয়াছিল। তখন পৃথিবীতে জনসেবার যুগ কিন্তু আমাদের দেশে অন্য কোনো দলের তখন এদিকে এতটা মন ছিল না। ছোটোখাটো দলের মধ্যে এই সময় জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় "গরিব সেবক দল" গঠন করেন। শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের নৈশ বিদ্যালয় ও সাপ্তাহিক বৈঠক বসিত। দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি কোনো কোনো দল স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু আতুর সেবা বোধ হয় আর কোনো দল শুরু করেন নাই।

এই সময় বৈদ্যনাথ দেওঘরের বিদ্যালয়ের তৎকালীন হেডমাস্টার ছিলেন 'মধুসূদনের জীবনী'-প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ বসু। ইনি প্রথম যৌবনে বোধ হয় ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি, রাজনারায়ণ বসু ও গিরিজানন্দ দত্ত ওঝা উদ্যোগ করিয়া বৈদ্যনাথে একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের অর্থসাহায্যেই এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা সহজ হয়। রামানন্দ আর্ত-পীড়িত ও আতুরদের সেবায় তখন অত্যন্ত উৎসাহী। এই কুষ্ঠাশ্রমের ইতিহাস বিষয়ে তাঁর লেখা এবং 'দাসী' পত্রিকার দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম সংখ্যায় রুশিয়ার কুষ্ঠরোগীদের বন্ধু কুমারী কেট মার্সডেনের জীবনী দেখিয়া মনে হয় এই সময় কুষ্ঠরোগীদের মঙ্গল-চেষ্টা রামানন্দ বিশেষ ভাবে করিয়াছিলেন। 'প্রবাসী'তে তাঁর লেখা দেখিয়া জানা যায় খবরের কাগজে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় সর্বসাধারণের নিকট অর্থ ভিক্ষা করা হইত। এই সময় সম্ভবত অর্থ-সংগ্রহসূত্রে যোগীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। অর্থ-সংগ্রহের কাজ কে করিতেন রামানন্দ স্বীয় আত্মবিলোপ ব্রতের জন্য তাহা কোথাও লেখেন নাই। কিন্তু

পুরানো *ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জারের* একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়া বুঝা যায় তিনি অর্থ সংগ্রহকারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। এই বিজ্ঞাপন ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে প্রকাশিত হইত।

"Donations in money and clothes etc. in aid of the Baidyanath Leper Asylum can be sent to the "Sanjibani" Office, 4, College Square, and to me at the City College or at my lodgings, 28/1, Jhamapukur Lane, Calcutta. Ramananda Chatterjee."

যোগীন্দ্রনাথ বসুর পরিবারবর্গের সঙ্গে রামানন্দ ও মনোরমা দেবীর পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। তাঁর দেওঘরের বাড়িতে ইঁহারা অতিথি হইয়াছিলেন। এই বন্ধুত্ব যোগীন্দ্রবাবুর মৃত্যু পর্যন্ত অটুট ছিল। দেওঘরে যোগীন্দ্রবাবুর গৃহে ফাদার ডেমিয়ানের সমাধিপার্শ্বস্থ একটি বৃক্ষের পাতা রামানন্দ দেখিয়াছিলেন।

এই রকম সময়ে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ২৭ জুন জালালপুর গ্রামে (বসিরহাট সব-ডিভিশনে) কয়েকটি যুবকের চেষ্টায় প্রথম "দাসাশ্রম" স্থাপিত হয়। কিছুকাল পরে ইহারাই কলিকাতায় পথের ধার হইতে রুগ্ন মরণাপন্ন লোকদের কুড়াইয়া আনিয়া একটি গৃহে আশ্রয় দিতেন। তাঁদের পত্নীরাও এই কাজে তাঁদের সহায় হইয়াছিলেন। প্রথম কার্য আরম্ভ করেন মৃগাঙ্কধর রায় চৌধুরী, তাঁহার পত্নী কমল দেবী, ক্ষীরোদচন্দ্র দাস, তাঁহার পত্নী প্রভাবতী দেবী ও উকিল শরৎচন্দ্র রায় প্রভৃতি।

রামানন্দের এই কাজে সহানুভূতি থাকাতে তিনি ইঁহাদের এই সময় নানাভাবে সাহায্য করেন। কিছুদিন পরে ইন্দুভূষণ রায় ও তাঁহার পত্নী সরোজবাসিনী দেবী দাসাশ্রমে যোগ দেন। ইন্দুভূষণ শীঘ্রই দাসাশ্রমের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। দাসাশ্রম কমিটি স্থাপিত হইলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তার সভাপতি হন। প্রথম দিকে বোধহয় ইঁহারই বাসায় দু-একটি রোগী আনিয়া রাখা হইত। গোড়ার দিকে ভিক্ষালব্ধ অর্থেই সেবার খরচ চলিত, ক্রমে 'দাসাশ্রম মেডিক্যাল হল' নামে একটি ঔষধালয় খোলা হইল। তার আয় 'দাসাশ্রমে'র সেবায় খরচ হইত। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য ছিলেন দাসাশ্রমের চিকিৎসক এবং ডা নীলরতন সরকার মহাশয়ও কমিটিতে ছিলেন।

"দাসী"

জালালপুরে "দাসাশ্রম" প্রতিষ্ঠার এক বৎসর পরে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস হইতে কলিকাতায় 'দাসী' পত্রিকা প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহারই আট মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' প্রকাশ করেন। 'সাধনা'র উদ্দেশ্য ছিল নিছক সাহিত্য-সাধনা, 'দাসী'র উদ্দেশ্য ছিল জনসেবা। 'দাসাশ্রমে'র সেবক আর সেবিকারা নিজেদের 'দাস' ও দাসী' বলিতেন। জনহিতৈষণা প্রবর্তন, দাসাশ্রমের মাসিক কার্য-বিবরণ প্রচার ও দাসাশ্রমকে আর্থিক সাহায্য করিবার জন্য সভাপতি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই জনহিতৈষণা-বিষয়িণী পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। 'দাসী'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল ছিল মাত্র এক টাকা। কাগজটি ইংরেজি মাসের ২১ প্রকাশিত হইত। গ্রাহকেরা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য বহুকাল ফেলিয়া রাখিতেন, তাগিদ দিয়া আদায় করিতে হইত। 'দাসী'র ব্যয় নির্বাহ করিয়া যাহা থাকিত সমস্তই সম্পাদক দাসাশ্রমে দিতেন।

যে সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ধারণ করে যুদ্ধের কৃতিত্ব ও বীরত্ব যেমন তার একলার নয়,

তেমনি আতুরের সেবা যিনি স্বহস্তে করেন সেবার কৃতিত্ব শুধু তাঁর একলার নয়।

'দাসী'র সূচনার পূর্বেই রামানন্দ মানবসেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজ জীবিকার ব্যবস্থা হইবার আগেই জনহিতের নানা কল্পনা ও কাজ তাঁকে দিবারাত্রি মাতাইয়া রাখিত। একটি কোনো আশ্রম কিংবা 'কুলি সংরক্ষণী সভা' খুলিবার ইচ্ছা ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে নিঃসম্বল অবস্থাতেই তাঁর মনে ঘুরিতেছিল। কাজে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া একটু আনন্দের আশায় মন বালিকা-পত্নীর সান্নিধ্য চাহিত কিন্তু অর্থাভাবে যখন তাঁকে আনা সম্ভব হইত না, তখন ক্লান্ত শরীরে ডায়েরিতে লিখিতেন :

> "মনে হল সেবাব্রতের ক্লান্তি ও কষ্ট সহিতে সমর্থ করিবার জন্য পিতা দাম্পত্য সুখ দিয়াছিলেন। একত্রে থাকার সুখ কল্পনা করিলাম। অমনি একটি অনাথ নিবাস কিংবা দরিদ্র ছাত্রাবাস খুলিবার ইচ্ছা জন্মিল।"

কলিকাতায় দাসাশ্রম প্রথম দিকে পতিতা রমণীদের কন্যা উদ্ধারের ভারও গ্রহণ করেন। তাঁরা স্থির করেন এই রকম কয়েকটি বালিকাকে সেখানে রাখিয়া নানা শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং সেই বাড়িতেই কয়েকটি রোগী রাখিয়া বালিকাগুলিকে সেবাধর্মের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা হইবে। কিছু দিন পরে দেখা গেল আইনের মারপ্যাঁচে এই বালিকাদের উদ্ধার করা সহজ নয়। কাজেই উদ্ধার কমিটি উঠিয়া গেল। কিন্তু বাড়ি-ভাড়াটা পড়িল সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্কন্ধে। কেবল একজন সভ্য তাঁকে কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন। এই মেয়েগুলিকে তখন উদ্ধার করা গেল না বটে, কিন্তু সম্পাদক 'দাসী'তে নিয়মিত 'পতিতা রমণীর দুর্দশা মোচন,' 'স্ত্রীজাতির দুঃখ বিমোচন,' এমন কী পতিত পুরুষগণের উদ্ধার বিষয়েও লিখিতেন এবং আলোচনা করিতেন। পুরুষ পতিত না হইলে নারী পতিতা হয় না, এবং পুরুষ ও নারী উভয়ের চরিত্রহীনতাই সমাজের পক্ষে সমান হানিকর, ইহা তাঁর বিশ্বাস ছিল বলিয়া ইউরোপে পতিত পুরুষদের উদ্ধারকল্পে যে-সব কর্মী কাজ করিয়াছেন তাঁদের দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি 'দাসী'তে লিখিতেন। পতিতা নারীদের উদ্ধার চেষ্টায় রামানন্দ অনেক আইন-পুস্তকাদি পাঠ করেন, এবং আইন উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ লেখেন। বাংলা ১২৯৯-এর 'দাসী'র একটি প্রবন্ধ হইতে আমরা কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাই :

> আদালত সাহায্য করিলে অনায়াসে বেশ্যাগণের ক্রীত বালিকাগণের উদ্ধার সাধন করা যায়। গবর্নমেন্ট হইতে যদি প্রত্যেক বেশ্যাকে এইটি প্রমাণ করিতে বাধ্য করা হয় যে, তাহাদের গৃহরক্ষিতা বালিকা তাহাদের নিজ গর্ভজাতা কন্যা, তাহা হইলে এই শ্রেণীর বালিকাগণের মহদুপকার সংসাধিত হয়। প্রমাণ করিতে না পারিলে তাহাদের দণ্ড হওয়া উচিত। কারণ ইহা সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে যে তাহারা পাপবৃত্তি অবলম্বন করাইবার জন্যই বালিকাগণকে পালন করিতেছে। বাস্তবিক এরূপ একটি আইন হওয়া উচিত যে বেশ্যাগণ নিজ গর্ভজাতা কন্যা ব্যতীত অপর কোনো বালিকাকে গৃহে রাখিতে পারিবে না , এবং নিজ গর্ভজাতা কন্যাগণের সম্বন্ধেও ইহা আদালতে প্রমাণ করিতে হইবে যে তাহাদিগকে পাপ ব্যবসায়ে লিপ্ত করা হইবে না এবং তাহাদিগকে সাধুভাবে জীবন যাপন করিতে সমর্থ করিবার জন্য কোনো সদ্ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সন্তোষজনক প্রমাণ না পাইলে গবর্নমেন্ট তাহাদের সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিবেন। কোনো উপযুক্ত সভা বা ব্যক্তি তাহাদের ভার লইতে চাহিলে গবর্নমেন্ট তাহাদের উপর ভার দিতে পারেন। ঠিক এইরূপ কারণে না হউক, ইংলন্ডে পিতামাতাকে অভিভাবকত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া অপরের হস্তে বালিকাগণের ভার দিবার নিয়ম আছে।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে বিলাতে পেল্‌মেল গেজেটের সম্পাদক মহাত্মা স্টেড লন্ডন

শহরে…কিরূপে অনেক বালিকাকে…বেশ্যাগণের নিকট বিক্রয়ের জন্য চালান দেওয়া হয়, তদ্বিষয়ে অনেক ভীষণ রহস্য উদঘাটন করেন। ঐ আন্দোলনের ফলস্বরূপ Criminal Law Amendment Act আইন পাস হয়। তন্মধ্যে বেশ্যাগৃহ উঠাইয়া দিবাব জন্য ধারা বিধিবদ্ধ হয়। আমাদের দেশে বেশ্যাগৃহ উঠাইয়া দিবার জন্য উল্লিখিতরূপ আইন হওয়া উচিত।

দেশে দুঃখের তো অভাব নাই। নিরক্ষরতা, দুর্ভিক্ষ, রোগশোক, অধর্ম, মাদকতা, পশুপীড়ন কত কি! রামানন্দের মন কৈশোর হইতেই দেশহিতব্রত ও নিষ্কাম মানবপ্রীতিতে অর্পিত ছিল। প্রথম যৌবনে বহু কাজের মধ্যে তিনি ঝাঁপ দিয়াছিলেন ; কিন্তু মানবপ্রীতির যে অন্তহীন উৎস তাঁর অন্তরে সতত উৎসারিত হইত, তা কোনো একটা মাত্র কাজে তৃপ্তি পাইত না। তিনি অনাথনিবাস করিবেন কী দরিদ্র ছাত্রাবাস খুলিবেন, কুলিদের রক্ষা করিবেন কী পতিতা বালিকাদের উদ্ধার করিবেন, আতুরের সেবা করিবেন কী নিরক্ষর দেশে শিক্ষা বিলাইবেন, কংগ্রেসের কর্মী হইয়া দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়িবেন অথবা মাসে মাসে ধর্ম-পুস্তিকা লিখিয়া ও পয়সা-মূল্যে বেচিয়া মানবাত্মাকে ভগবৎ-প্রেমে অভিষিক্ত করিবেন, বুঝিতে পারিতেন না। কোনো কাজই তুচ্ছ মনে হইত না। অথচ যে কাজেই আকণ্ঠ ডুবিয়া যান, মনে হয়, অন্য অনেক কাজ হয় নাই ; বিধাতার সেবা, বিধাতার প্রিয় কার্য তো ঠিক হইতেছে না! অনাথ, আতুর, দুঃখী, দরিদ্র, পরাধীন, পতিত, নাস্তিক সকলকেই বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন, একজনের দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া আর-একদিকে কী করিয়া চোখ বুজিয়া থাকিবেন? অথচ সমস্ত কাজ করার মতো সামর্থ্য, অর্থ, সময়, সহায় ইত্যাদি তো তাঁর ছিল না। আপাতত ব্রাহ্মসমাজের কাজ আর দাসাশ্রমের কাজেই তিনি মন দিলেন। লেখনী-ধারণের অধিকার তাঁর ছিল। তার সাহায্যে যদি দাসাশ্রমে কিছু অর্থ আসে এই উদ্দেশ্যে তিনি লেখনী তুলিয়া লইলেন। আগেই ডায়েরিতে দেখিয়াছি বিধাতা যেন তাঁকে বলিলেন, "Do with all your might whatever your hands find nearest to do." দাসাশ্রমের আতুরেরা তাঁর তখনকার লক্ষ্য হইলেও তিনি জনহিতব্রতের কোনো অঙ্গকে ভুলিতে পারিলেন না, যতটুকু শক্তি, যতখানি জ্ঞান তাঁর ছিল তিনি নির্বিচারে সর্বমানবের সেবায় তা ঢালিয়া দিলেন। ক্রমে পরবর্তী যুগে তিনি যেন তাঁর দেশের অতন্দ্র প্রহরী ও অভিভাবক হইয়া দাঁড়াইলেন, যেন এই দুর্ভাগা দেশকে অসংখ্য আঘাতের হাত হইতে কিছু পরিমাণে অন্তত রক্ষা করিতে পারেন।

একজন 'দাস' লিখিয়াছিলেন :

"দাসী জন্মগ্রহণ করিয়া দেশে দেশে সেবাধর্ম প্রচারের ভার আপন মস্তকে লইল। দাসাশ্রমের কাজ যেন উপন্যাসের মতো চলিয়াছে!"

জনসাধারণের মনে সেবার ইচ্ছা জাগাইবার জন্য কুমারী ডিন, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, ভগিনী ডোরা, গ্রেস ডার্লিং প্রভৃতি পাশ্চাত্যের পরহিতগতপ্রাণা মহিলাদের জীবনী 'দাসী'তে প্রথম বর্ষ হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইত। কেবলমাত্র রোগীর সেবাই মানব-হিতৈষণা নয়, মানবের শারীরিক ও মানসিক অন্যান্য দুর্গতি ও দুর্দশা নিবারণও মানবের ধর্ম। দাসী-সম্পাদক অন্ধ, মূক ও বধিরদের দুঃখমোচনের জন্য লিখিতেন। তিনি যে বাংলাদেশে অন্ধদের জন্য বাংলায় ব্রেইল অক্ষর উদ্ভাবন করেন, একথা পঞ্চাশ বৎসর লোকে ভুলিয়াছিল। এখন ডাঃ সুবোধচন্দ্র রায় নামক অন্ধ-হিতৈষী পুরুষের চেষ্টায় সে-তথ্য পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে উমেশচন্দ্র দত্তের চেষ্টায় সিটি কলেজে মূক-বধির বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়। পর বৎসর তার আলাদা বাড়িও ভাড়া হয়।

মানুষের অবিচারিত দানের ফলে আতুরেরা পথে অনেক পয়সা পায়, এইজন্য দাসাশ্রমের মতো স্থানে রুগ্ন ভিখারিরা আসিতে চাহিত না, তাদের সেখানে আনায় সাহায্য সাধারণে কী ভাবে করিতে পারেন, এবং দেশে Poor Law, অনাথ-আবাস ইত্যাদি থাকার উপকারিতা কী—এই সকল বিষয়ই 'দাসী'তে আলোচিত হইত। ইতর প্রাণীরাও মানুষের দয়ার পাত্র, একথা দাসী-সম্পাদক ভুলিতেন না। গো-মাতাকে রক্ষা করার চেষ্টা দেশে প্রবর্তিত হইবার পূর্বেই আমাদের দেশে গো-মহিষাদি বোবা জীবের দুঃখ তাঁকে বিচলিত করিত। কেবল মাত্র খ্রিস্টিয় রীতির অনুকরণে জনহিতৈষণার চেষ্টা তাঁর মনঃপূত ছিল না। তিনি চাহিতেন আমাদের দেশের পুরাতন ছায়াবৃক্ষ রোপণ, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, জলসত্র দান—এই সব রীতি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। এই জন্য চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি স্থানের ছোটো বড়ো জলাশয়গুলি পুনরুদ্ধার করিয়া মানুষের জল-কষ্ট নিবারণ করিতে তিনি বলিতেন।

দাসাশ্রমের সেবকেরা সবরকম রোগীই কুড়াইয়া আনিতেন। অস্থায়ী রোগীদের দুই-এক দিন পরে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। 'স্থায়ী' রোগীদের আশ্রমেই রাখা হইত। দাসী-সম্পাদক কিছুদিন দাসাশ্রমের সহিত এক বাড়িতেই অন্য অংশে থাকিতেন। এই জাতীয় আতুরদের আশ্রয় দিবার তখন কেবল আর-একটি মাত্র আশ্রয় ছিল। সেটি খ্রিস্টিয় Little Sisters of the Poor ভগিনী সম্প্রদায়ের। হিন্দু আতুরেরা সেখানে যাইতে সম্মত হইত না। তা ছাড়া তাঁরা ৬০ বৎসরের কম বয়স্কদের তাঁদের আশ্রমে স্থান দিতেন না। এইজন্য যে-কোনো বয়সের স্ত্রী ও পুরুষ স্থায়ী রোগীদের আশ্রয় দেওয়াই দাসাশ্রমের প্রধান কাজ ছিল। দাসাশ্রমের সেবক ও সেবিকারা সকলেই ব্রাহ্ম ছিলেন। সেখানে নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনা হইত। কমিটিতে প্রাচীনপন্থী নিষ্ঠাবান হিন্দুও ছিলেন, তবে প্রাচীনপন্থী কোনো সেবক কী সেবিকা ছিলেন না। তখনকার হিন্দু-সমাজের অবস্থায় নিষ্ঠাবান হিন্দুর পক্ষে স্বহস্তে সর্বজাতির মলমূত্রাদি পরিষ্কার করা বা পদসেবা করা সম্ভবপর ছিল না। 'দাসী'তে এইরূপ আলোচনা দেখা যায়। দাসাশ্রমের কাজ কলিকাতাতেই আবদ্ধ ছিল না, ইঁহাদের উদ্যোগে জালালপুর, বাঁকুড়ার সুর্পানগর, নলধা, কোঁড়ামারা, চেরাপুঞ্জি, নওগাঁ প্রভৃতি স্থানে সাতটি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। এক সময় দাসাশ্রমের সেবালয় গিরিডিতে স্থানান্তরিত হয়; পরে আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসে। কলিকাতার দাসাশ্রমকে সাহায্য করিবার জন্য অ্যালোপ্যাথিক এবং হোমিওপ্যাথিক দুটি ডিস্পেন্সারি ছিল।

'দাসী'তে আসামের কুলিদের কথাও বিবিধ-প্রসঙ্গে আলোচিত হইত। সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :

> ছোটনাগপুরের মূর্খ দরিদ্র লোকেরা কুলি-ডিপোর নরপিশাচ বাবু ও আড়কাঠিগণকে সরকারের কর্মচারি মনে করে, এবং তজ্জন্যই অনেক সময় সব জানিয়াও ইহাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে সমর্থ হয় না। যদি কোনো সাহসী, স্বার্থত্যাগী যুবক কুলি-ডিপোর বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে প্রচার করিয়া বেড়ান, তাহা হইলে তাঁহার একটি অতীব সাধুকার্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু তাঁহাকে আবশ্যক হইলে প্রাণের আশা ছাড়িতে হইবে। কারণ কুলি-সংক্রান্ত লোকদিগের অসাধ্য কিছু নাই। সংগীতের ক্ষমতা অদ্ভুত; তজ্জন্য আমরা প্রস্তাব করি, যে, যেমন নীলকরদিগের বিরুদ্ধে 'নীলবাঁদরে সোনার বাঙ্গলা করলে ছারখার" প্রভৃতি গান রচিত হইয়াছিল তদ্রূপ চা-কর ও কুলির আড়কাঠির বিরুদ্ধে প্রচলিত সুরে কতকগুলি বাংলা ও হিন্দি সংগীত রচিত হউক। এরূপ সংগীতের বহুল প্রচলন আবশ্যক। কিন্তু এত লিখিয়া কি হইবে? লিখিতে ইচ্ছা করে না। আমরা যদি কাপুরুষের জাতি না হইতাম, তাহা হইলে একদিন, যাহারা দেশের কত পরিবারের সর্বনাশ করিতেছে, সেই

দুরাত্মা কুলি-সংগ্রাহকগণ ও তাহাদের ডিপোগুলো সমূলে বিনষ্ট হইত। মনে হয়, যেমন বিষধর সর্পকে বধ করিলে পাপ হয় না, তদ্রূপ এই নরপিশাচগণের প্রাণ বধ করিলেও বুঝি কোনো অপরাধ হয় না।

'দাসী'তে দেখি ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর কী ডিসেম্বর মাসে অহিফেন কমিশনের সভ্য, পার্লামেন্টের মেম্বার উইলসন সাহেব কলিকাতায় আসেন। সেই সময় টাউন-হলে সামাজিক পবিত্রতা রক্ষা উদ্দেশ্যে বিরাট সভা হয়। যে-সব সাহেবেরা ইউরোপ হইতে নানা প্রলোভন দেখাইয়া বালিকাদের এদেশে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করিত তাদের বিরুদ্ধে এবং যারা মফস্বল হইতে এদেশের অল্পবয়স্কা মেয়েদের এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ভুলাইয়া আনে তাদের বিরুদ্ধে সভায় বক্তৃতাদি হয়। এই সভা এবং অহিফেন কমিশন বিষয়ে সম্পাদক 'দাসী'তে বিবিধ প্রসঙ্গ লেখেন। তিনি অন্য কথার শেষে বলেন,

যেমন আফিং-এর পক্ষে অনেকে সাক্ষী দিতেছেন, তেমনি আফিং-এর বিপক্ষেও যাঁহারা পারেন তাঁহাদের সাক্ষ্য দেওয়া উচিত।

পুরা প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরের অর্ধেক সময় 'দাসী'র অধিকাংশ লেখা সম্পাদক স্বয়ং লিখিতেন। গল্প এবং কবিতাও তিনি মাঝে মাঝে লিখিয়াছেন। একজন পুরাতন সেবক বলেন, "'দাসী'র তিন-চতুর্থাংশ লিখিতেন রামানন্দবাবু আর এক-চতুর্থাংশ ইন্দুবাবু।" কেবল সেবাধর্ম ও জনহিতৈষণার কথায় সাধারণ মানুষের আনন্দ হয় না এবং গ্রাহকসংখ্যা ইচ্ছামত বৃদ্ধির আশা করা যায় না। এই জন্য দেড় বৎসর পরে স্থির হয় যে 'দাসী'তে উপন্যাস, কবিতা, বৈজ্ঞানিক কথা, পুরাতত্ত্ব, পুস্তক-সমালোচনা প্রভৃতি নানা বিষয়ে লেখা বাহির হইবে।

এই সময় হইতে 'দাসী'তে রাজনারায়ণ বসু, যোগীন্দ্রনাথ বসু, সখারাম গণেশ দেউস্কর, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অবিনাশচন্দ্র দাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে লিখিতে আরম্ভ করেন। সম্পাদকের বিবিধ-প্রসঙ্গে তখন রাজনৈতিক বিষয় দেখা দিয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কোথাও তখন নারীদের পুরুষেরা সমান রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। কেবল নিউজিল্যান্ড উপনিবেশে নারীরা পুরুষের মতো ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য নির্বাচনের অধিকার পাইয়াছিলেন। নারীরা ক্ষমতা পাইয়াই দুশ্চরিত্র লোকদের সভ্য হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁরা মাদক-দ্রব্যেরও বিরোধী হন। এই সংবাদ লইয়া 'দাসী'-সম্পাদক সানন্দে আলোচনা করিয়াছেন। 'অশ্লীল বিজ্ঞাপন' বিষয়ে তখন হইতেই তিনি অনেক বিরুদ্ধতা করিয়াছেন। ইহার পূর্বাভাস 'ধর্মবন্ধু'তে আছে। পৃথিবীর নানা দেশের নানা বিষয়ের নূতন নূতন খবর সংগ্রহ করা ও সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করা বিবিধ প্রসঙ্গে তখন হইতে চলিত। সব খবর এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। নারীহিতৈষণা, মানব জাতির জ্ঞান-বৃদ্ধি ইত্যাদির দিকে বিশেষ নজর থাকিত। 'ভারতবর্ষের দারিদ্র্য' তাঁকে চিরদিন ভাবাইয়াছে। এই জন্য 'দাসী'র দ্বিতীয় বৎসরেই দেখি এই বিষয়ে statistics দেওয়া সুবৃহৎ প্রবন্ধ। দারিদ্র্যের প্রতিকার হিসাবে তখনই তিনি ভারতে অধিক বেতনের সরকারি কাজে দেশিয় লোক নিয়োগ করিতে এবং যুদ্ধ বিভাগ ও সৈনিক বিভাগের ব্যয় হ্রাস করিতে বলিয়াছেন। যৌথ কারবার স্থাপন, বিদেশে ভারতীয়দের উপনিবেশ করা, অর্থকরী শিল্পশিক্ষা ইত্যাদি আরও বহু উপায়ের কথাও আছে।

বহু অধর্ম, নিষ্ঠুরতা ও অন্যায় আইনত দূষণীয় নয়। কিন্তু ধর্মত সেগুলি যে পাপ এ-বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করিয়া মানুষের মনে দয়াধর্ম ও বিবেককে জাগ্রত করার চেষ্টা 'দাসী'র

ছিল। দাসাশ্রমের আয় বৃদ্ধির চেষ্টায় আনন্দমোহন বসু মহাশয় 'দাসী' গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ আবেদন করেন। প্রথম বৎসরে 'দাসী' পত্রিকা হইতে দাসাশ্রম ৪৭৮॥৵ ১০ পান, দ্বিতীয় বৎসরে ৫১১৸৵ ৫। গ্রাহকদের নিকট অনেক টাকা আদায় হয় নাই। না হইলে দ্বিতীয় বৎসরে ২০০০ টাকা সাহায্য করা যাইত। এই জন্য সম্পাদক লিখিয়াছিলেন,

> আমবা স্থির কবিয়াছি যে, বর্তমান বৎসর হইতে অগ্রিম মূল্য না পাইলে বিশেষ পরিচিত গ্রাহককেও 'দাসী' পাঠাইব না.. দাসাশ্রমের কার্য আমাদের দেশে নূতন। আমরা ক্রমে এই কার্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি। আমাদের অভিজ্ঞতা এবং সহৃদয়তার অভাবে এ পর্যন্ত দাসাশ্রমের কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয নাই।

কিন্তু দাসাশ্রমের অর্থের অভাব হইলে একবার রামানন্দ তাঁর সামান্য বেতনের প্রায় সবটাই দান করিয়াছিলেন। এ-সব দানে মনোরমা দেবী আপত্তি করিতেন না।

তখন দাসী ও দাসাশ্রম কলিকাতার সমাজে যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছিল। দাসাশ্রমের দ্বিতীয় বার্ষিক সভার রিপোর্টে দেখি মাননীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সভাপতি। বক্তাগণের মধ্যে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য রাসবিহারী ঘোষ, হাইকোর্টের জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। দাসাশ্রম কমিটির সভ্যগণ ছাড়া উকিল শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দাস, শ্রীযুক্ত রামচরণ মিত্র, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রশ্রী ঘোষ, ডাঃ নীলরতন সরকার, শ্রীদ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি ধনী ও গণ্যমান্য লোকেরাও সভায় উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সহানুভূতিপূর্ণ পত্র লেখেন। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, 'দাসাশ্রমে'র মতো এত বড়ো একটি সেবাশ্রম ৭।৮টি শাখা চিকিৎসালয় লইয়া চলিত— কোনো বড়ো ফণ্ডের সাহায্যে নয়, কোনো ধনীমণ্ডলীর দানে নয়। 'দাসাশ্রমে'র সভাপতি ও 'দাসী'র সম্পাদক 'দাসী' পত্রিকার সাহায্যে প্রতি বৎসর ৫০০ টাকার বেশি সেবাকার্যে দিতেন। প্রথম দিকে অধিকাংশ লেখাই থাকিত তাঁর, তা ছাড়া সম্পাদকের কাজ ও দায়িত্ব তো তাঁর ছিলই। সুতরাং দেখা যাইতেছে তিনি এইরূপে স্বোপার্জিত মোটামুটি ৫০০ টাকা প্রতি বৎসর 'দাসাশ্রমে' দিতেন। কিন্তু এই টাকা 'দাসীর সাহায্য' নামেই চলিত। ইহা ছাড়া নিজের সংসার-নির্বাহের জন্য তিনি যে কলেজে অধ্যাপনার কাজ কিংবা ২।১ খানা ছোট বই লেখার কাজ করিতেন তাহা হইতেও তাঁহাকে কখনো এককালীন ৬০ কখনো ৪০ দিতে দেখা যায়। মানুষটির বেতন ছিল মাত্র ১০০। শেষের দিকে বেতন দাঁড়াইয়াছিল ১৪০ পর্যন্ত। একজন সংসারী গৃহস্থের পক্ষে এই দান কত বড়ো তা যাঁদের মাসে ১০০ আয় তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, ধনীর পক্ষে বুঝা সহজ নয়। জনসাধারণের যে 'দাসাশ্রমে'র কাজে সহানুভূতি ছিল তা প্রতি মাসে সাধারণের দানের হিসাব-বইতেই বুঝা যায়। সাধারণের দান বেশি নয়, মাসে গড়পড়তা ১৭৫ আন্দাজ, ১৮৯৩-এর হিসাবে দেখি। সে দানে ৫ হইতে ২০।২৫ পর্যন্ত আছে। তবে অধিকাংশ দান ॥০ কি ১। শুধু যে ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডীর মধ্যেই এই জনসাধাবণ আবদ্ধ ছিলেন তা নয়, বৃহত্তর হিন্দু সমাজেই অধিকসংখ্যক দাতা ছিলেন। সুপরিচিত নামের মধ্যে গুণাভিরাম বড়ুয়া, মোহিতচন্দ্র সেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মহারাজকুমার বর্ধমান, চন্দ্রশেখর কালী, মহারানী স্বর্ণময়ী কাশিমবাজার, K. N Roy, রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র, দেবেন্দ্র ও মহেন্দ্র ওহ্‌দেদার, কালীনারায়ণ গুপ্ত, স্বর্ণকুমারী ঘোষাল, সুকুমার হালদার, মহারাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ, শ্রীনাথ দাসের বাড়ির মহিলারা, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, J, T. Sunderland প্রভৃতির নাম দেখা যায়। দাসাশ্রমের সর্বাপেক্ষা অনুরাগী দাতা বোধ হয়

ছিলেন মানিকদহের জমিদার বিপিনবিহারী রায়। তিনি নিজে এবং তাঁর প্রজারা মিলিয়া প্রতি মাসেই ১৫।২০।৩০।৪০ দান করিতেন। তাছাড়া তাঁহার পত্নী সুরাজমোহিনী রায়ের মৃত্যুর পর ২৬০০ টাকার স্বর্ণালঙ্কার রায় মহাশয় দাসাশ্রমে দান করেন। সেই অলঙ্কার বিক্রির টাকায় সুরাজমোহিনী স্থায়ী ফণ্ড হয়। আরও অনেক ধনী ব্যক্তি চাঁদা দিতেন। কিন্তু তাঁহাদের নামের পিছনে ৷৷০ কি ১ টাকা মাত্র উল্লেখ আছে বলিয়া তাঁহাদের নাম না বলাই ভাল। বহু মুসলমান ভদ্রলোক ও মহিলা এখানে দান করিতেন। মাড়োয়ারি নামও অনেক দেখি। তবে দান সামান্য।

দাসাশ্রমের মফস্বলের চিকিৎসালয়গুলির মধ্যে চেরাপুঞ্জি ছিল প্রধান। সেখানে মাসে প্রায় ১০০ লোকের চিকিৎসা হইত। কখনো বা তিন সপ্তাহে ১৫৩ পর্যন্ত হইয়াছে।

১৮৯৩-এ 'দাসী'তে 'ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রা' বিষয়ে সম্পাদক যে-প্রবন্ধ লেখেন, তাহার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের দেশের কূপমণ্ডুক ছাত্রদের দেশের শিল্প ও ইতিহাসের গৌরবময় স্থানগুলির-প্রতি আকৃষ্ট করা। সেই প্রবন্ধটি দেখি নাই। কিন্তু তাহার পরের মাসেও এই প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। 'প্রবাসী' প্রকাশের অধ্যায়ে সেই প্রবন্ধের কিয়দংশ পরে উদ্ধৃত হইবে।

'দাসী'র আকার ক্রমে বর্ধিত হয়। ক্রমে ঔপন্যাসিক প্রভাত মুখোপাধ্যায়, বসুমতীর বর্তমান সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি ইহার লেখক-শ্রেণীভুক্ত হন। প্রভাতবাবুর প্রথম গল্প "একটি রৌপ্য মুদ্রার আত্মজীবনী" ১৮৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। তখন তাঁর বয়স ১৯।২০ মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের দীর্ঘ সমালোচনা অনেকে করেন। বঙ্কিমচন্দ্র-বিষয়ক সুদীর্ঘ রচনাগুলি হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের। তিনি কবিতাও লিখিতেন। প্রভাতবাবু তখন রবীন্দ্রনাথের সহিত কাব্য-বিষয়ে পত্রালাপ করিতেন। রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন দুটি পত্র বহু বৎসর পরে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয। সেই চিঠিগুলির ছাপ প্রভাতবাবুর 'দাসী'র প্রবন্ধে পাওয়া যায়।

দাসী-সম্পাদক ও দাসাশ্রমের সভাপতি রামানন্দ এলাহাবাদে চলিয়া যাইবার পরও 'দাসী'র কাজ করিতেন। তবে 'দাসী'তে এই সময় তাঁর নিজের রচনা পূর্বের মতো প্রচুর দিতে পারিতেন না। 'দাসী' এ সময় ক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ ও অর্থনীতি বিষয়ক কাগজ হইয়া দাঁড়ায়। সেবা-বিষয়ক রচনা প্রায় নাই। দীনেন্দ্রকুমার রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, জলধর সেন, প্রভৃতিও ক্রমে 'দাসী'র লেখক হইয়া উঠেন। এই সময় দেবেন্দ্রনাথ বসু, এম-এ লিখিত "আমাদের অবস্থা", "আমাদের উন্নতি", "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা ভাষা", "দেবী দানবী ও মানবী", "দেশীয় বস্ত্র" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশের দারিদ্র্য, সামাজিক দুর্গতি, বিধবা বিবাহ, শিক্ষা, বস্ত্র সমস্যা এবং ভাষা সমস্যা প্রভৃতি সকল রকম প্রয়োজনীয় বিষয়ে লেখক এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধগুলিতে চিন্তাশীলতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে এফ. এ ও বি. এ পরীক্ষার বাংলা ভাষায় যে পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম হইয়াছিল বিশ্ববিদ্যালয়-বিষয়ক প্রবন্ধটি তার পূর্বেই লেখা। অবশ্য কিছু কাল হইতে ডা. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় ভাষার প্রতিষ্ঠা লইয়া আন্দোলন চলিতেছিল। অবিনাশচন্দ্র দাসের 'পলাশবন' উপন্যাস এই সময়ই 'দাসী'তে প্রকাশিত হয়। বোম্বাই হইতে বাংলা দেশে যখন প্লেগ মহামারী সংক্রামিত হয়, তখন কবিরাজ বিজয়রত্ন সেনের সাহায্যে আয়ুর্বেদ ও প্লেগ বিষয়ে একটি সুবৃহৎ প্রবন্ধ 'দাসী'তে প্রকাশিত হয়। 'দাসী'র সুচিতে এই প্রবন্ধটি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিত বলিয়া উল্লেখ আছে।

'দাসী' সম্ভবত ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বন্ধ হয়। শেষ দিকে কিছুদিন গোবিন্দচন্দ্র গুহ, এম. এ 'দাসী'র সম্পাদক ছিলেন। 'দাসী'তে যখন বহু লেখক লিখিতে আবস্ত করিলেন তখনও 'দাসী'র একটি বিশেষত্ব লক্ষ করিবার জিনিস ছিল। দক্ষ সম্পাদকের সম্পাদনার ফলে নানা বিষয়ের প্রবন্ধের মধ্যে মানবের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির আদর্শবাদ সুস্পষ্ট থাকিত। ভাষার সুমার্জিত ও সংযত ভাব দেখিয়া অনেক সময় অন্যের স্বাক্ষরিত লেখাও সম্পাদকের লেখা বলিয়া মনে হইত। তাঁহার আদর্শোচিত না হইলে তিনি কোনো লেখা ছাপিতেন না বুঝা যায়। তাছাড়া তাঁহার সম্পাদকীয় কলমের প্রসাধন-নৈপুণ্যে সমস্ত লেখার মধ্যেই রচনারীতির একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যাইত। তাঁহার নিজের মত ছিল যে একই সম্পাদকের সম্পাদনায় যে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি প্রকাশিত হয় তাহাদের মধ্যে কোনো একটা জায়গায় সাদৃশ্য থাকা প্রয়োজন। তবেই তাহা এক নামের ধ্বজার তলায় প্রকাশ পাইবার অধিকার পায়। সামান্য কিছু তথ্য আছে অথচ লেখার বাঁধুনি নাই এমন অনেক লেখা কাটিয়া-ছাঁটিয়া মাজিয়া-ঘষিয়া তিনি নিজেই দাঁড় করাইয়া দিতেন। তলায় অন্যের নাম থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে সে লেখাগুলি তাঁরই। বার-বার এইরূপে সংশোধিত হইয়া লেখকেরাও ক্রমশ তাঁহার ধারায় লিখিতে অভ্যস্ত হইতেন এবং ক্রমে পাকা হইয়া উঠিতেন।

রামানন্দ 'প্রদীপে' ভাল বইয়ের দীর্ঘ সমালোচনা অনেকগুলি করিয়াছিলেন। 'দাসী'তেই ইহার সূচনা হয়। রবীন্দ্রনাথের 'নদী' ও 'চিত্রা'র বড়ো সমালোচনা 'দাসী'তে প্রকাশিত হয়। তখনই সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যে রবি-ভক্ত ও রবি-বিরোধী দুইটি বড়ো দল হইয়াছিল। সে-কথার উল্লেখ 'দাসী'তে প্রভাতবাবুর এই প্রবন্ধেই আছে। গোঁড়া রবি-ভক্তেরা ছিলেন অধিকাংশই সুশিক্ষিত মার্জিতরুচি নব্যযুবক। প্রভাতবাবুর ভাষায় :

> কেহ যদি রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে একটি কথা বলিল অমনি রণং দেহি রণং দেহি বলিযা তাহারা গর্জন কবিয়া উঠে।

> 'দাসী' যে রবি-ভক্তের দলে ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। সেইজন্যই প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায় ১৫ পৃষ্ঠা জুড়িয়া 'চিত্রা'র সমালোচনা এই পত্রে করিয়াছিলেন। 'নদী'ব সমালোচনা সম্পাদক স্বয়ং লিখিয়াছিলেন।

> শিশুদের সম্বন্ধে রামানন্দ যে কতটা দরদ দিযা ভাবিতেন তা তাঁব লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'নদী'র সমালোচনা পডিয়া বুঝা যায়। এটি 'দাসী'তে মার্চ ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয়।

> অনেকে মনে কবেন, মানব প্রকৃতিটা ভগবানের একটা মস্ত ভুল, বিশেষত শিশু-প্রকৃতি। বাস্তবিক স্বর্গে যদি একটা টেক্সট-বুক কমিটি থাকিত এবং ভগবান যদি তাহার কিংবা তথাকার গুরুমহাশযদের পবামর্শ লইয়া, শিশু-প্রকৃতি গড়িতেন, তাহা হইলে শিশুরা এত খেলা ভালবাসিত না। দুপুর রোদে ঘবময় দাপাদাপি কবিত না, ঠাকুবমার কাছে বসিয়া সন্ধ্যার আধ-আলো আধ-আঁধারে উপকথা শুনিতে চাহিত না এবং এতটা স্বপ্নপ্রিয় ও কল্পনার দাস হইত না। ভগবানকে কষ্ট পাইয়া বেতগাছের সৃষ্টি করিতে হইত না। কিন্তু যা হবার নয় তার জন্য দুঃখ করিয়া কি হইবে? শিশুগুলিকে ভগবান আমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া দেখা গেল যে ঠেঙ্গাইয়া শিশুদিগকে গোপালেব মতো সুশীল ও সুবোধ করা গেল না। তাহারা ক্রমাগত নামতা পড়িতে তো চায়ই না ; এমন কী আশ্চর্যের বিষয় এই যে কবিগণ যে এমন চৌদ্দ অক্ষরের মিলযুক্ত নীতিগর্ভ কবিতানিচয় প্রণয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ও অভিনিবেশপূর্বক অধ্যয়ন করিতে চায় না! টেক্সট-বুক কমিটির চেয়ে তো ছেলেদের বুদ্ধি ও নীতিজ্ঞান অধিক নয়। তাঁহারা এ-সকল কবিতাকে অতি উপকারী বলিয়াছেন। তবু শিশুরা সেগুলি আপনা হইতে পড়ে না। এখন উপায় কি? আমাদের বরাবরই একটা সন্দেহ আছে, ভয়ে বলিতে পারি নাই। সন্দেহটা

এই যে, আমরা অবশ্য খুব বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান জীব ; কিন্তু হয়তো ভগবান্ নিতান্ত কাঁচা কারিগর না হইতেও পারেন। শিশুদিগকে ঠেঙ্গাইয়া-পিটিয়া আমাদের মনের মতো করিয়া গড়িতে তো পারা গেল না। এখন ভগবানের উপর হাতিয়ার না চালাইয়া শিশুদিগকে তাহাদের প্রকৃতির গতি অনুসারে বাড়িতে দিলে মন্দ হয় না। তাহাদের জ্ঞানার্জনের মধ্যে ক্রীড়াশীলতা আসুক তাহাতে ক্ষতি কি? বিড়ালছানাগুলি লেজ নাড়িয়া লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করে, নীতি ও গাম্ভীর্য ভালো বলিয়া ভগবান তো তাহাদের লেজগুলি কাটিয়া সংসারে পাঠাইয়া দেন নাই? ক্রীড়াশীলতা বোধহয় পাপ নয়।..আমবা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে শিশুদের বন্ধুত্বলিপ্সু দেখিয়া অতিশয় প্রীত ও আশান্বিত হইলাম। তাঁহার 'নদী'র সঙ্গে অনেক শিশু কল্পনার রথে চড়িয়া নানাদেশে ভ্রমণ করিবে। শিশুরা পড়িয়া পড়িয়া ইহার সুন্দর কাগজ ও ছাপা শ্রীহীন করিয়া দিলে আমরা সুখী হইব।

জগদীশচন্দ্র বসু বাংলা কাগজে প্রবন্ধ ইতিপূর্বে কখনও বোধ হয় লেখেন নাই। রামানন্দ তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" প্রবন্ধটি 'দাসী'র জন্য লেখান। এই প্রবন্ধটির কবিত্বপূর্ণ ভাষা ও কল্পনা উল্লেখযোগ্য। পরে এটি প্রবেশিকার ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য হয়। জগদীশচন্দ্র 'কলুঙ্গার যুদ্ধ" নামক আর একটি প্রবন্ধও 'দাসী'র জন্য লেখেন।

এই বৎসরের 'দাসী'তেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'চিত্রা'র সমালোচনা করেন। প্রভাতবাবুর বয়স তখন কম, লেখাটি খুব উঁচুদরের সমালোচনা নয়। যাই হোক, সমালোচনার অংশ বাদ দিয়া ভূমিকার অংশের একটু নমুনা দেওয়া যাক :

যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের মধ্যে এখন দুইটি দল। এক দল রবীন্দ্রনাথের সপক্ষে, এক দল বিপক্ষে। প্রথম দলের অধিকাংশই সুশিক্ষিত মার্জিত রুচি নব্যযুবক ;—ইহারা প্রায় সকলেই এক প্রকারের লোক। দ্বিতীয় দলে অনেক প্রকারের লোক—মানুষের চিড়িয়াখানা। (ক) বৃদ্ধ—তাহাদের কানে দাশুরায়ের অনুপ্রাস, ভারতচন্দ্রের শব্দ-পরিপাট্য এমনি লাগিয়া আছে যে অপর কিছু একেবারে তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। তাহা ছাড়া তাহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ এক মহা দোষে দোষী—তিনি অল্পবয়স্ক। (খ) প্রৌঢ়—ইঁহারা এখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে ছেলেমানুষি বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাহার কারণ, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ইঁহাদের হৃদয়বীণার যে তন্ত্রীগুলিতে আঘাত করিয়া টুং টাং করিয়া শব্দ বাহির করিয়াছিলেন, সেই তন্ত্রীগুলিই এখন এমন ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথের আঘাতে ছড় ছড় শব্দ মাত্র করিয়া থামিয়া যায়। (গ) যুবকের মধ্যে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে, তাঁহারা কেহ কেহ ব্যর্থকাম কবি। একটি ইংরাজি প্রবচন আছে, ব্যর্থকাম গ্রন্থকারেরা সমালোচক হইযা দাঁড়ায়। (এখানে সমালোচক অর্থে নিন্দুক।) ইঁহারা যাহা হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে না পারিয়া যে হইয়াছে তাহার প্রচুর নিন্দা করিয়া সান্ত্বনা ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন।

রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী" বিষয়ে 'দাসী'তে সৌদামিনী গুপ্তা একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তার শেষ পাঁচটি লাইন :

প্রকৃতির বিশাল প্রাঙ্গণতলে যারা
ঢালিতেছে স্বাভাবিক সঙ্গীতের ধারা
শতবার শুনেছি সে সকলের সুর ;
কিন্তু মম প্রিয়তম-কণ্ঠস্বর ছাড়া
আর কিছু শুনি নাই অমন মধুর।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত 'দাসী'র গ্রাহক ছিলেন। 'বরিন্দ্র'নাথ ঠাকুরের নামে যে মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার আছে সেটি ছাপার ভুল বলিয়াই মনে হয়। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

'মাধবিকা'র সমালোচনা 'দাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখাটি সম্পাদকের নয়। দাসাশ্রমের ফণ্ডে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এককালীন ২৫ টাকা দানেরও উল্লেখ দেখা যায়।

'দাসী'তে সেবাধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ক ছোট-ছোট নিবন্ধ কিংবা কাহিনী অন্য পত্রিকা হইতে অনেক সময় উদ্‌ধৃত করা হইত। ১৮৯৩-এর 'দাসী'তে আছে,

> সাধনা হইতেও "পবিবারাশ্রম" নামক একটি ইংরাজি প্রবন্ধের বাংলা সারসংগ্রহ উদ্ধৃত হয়।

ইহা বাংলা ১৩০০ সালের জ্যৈষ্ঠের 'সাধনা' হইতে ১৩০০ সালের 'দাসী'তে উদ্ধৃত। 'সাধনা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৮ সালে, 'দাসী' প্রকাশিত হয় ১২৯৯ সালে।

'দাসাশ্রম' ও 'দাসী'র যুগে যে-সকল পবিবারের সঙ্গে রামানন্দ ও তৎপত্নীর ঘনিষ্ঠতা হয়, এবং যাঁদের সঙ্গে তাঁহারা এক বাড়িতে ছিলেন কিংবা বন্ধুভাবে যাঁদের কাছে যাওয়া-আসা করিতেন তাঁদের ইঁহারা চিরদিনই পরমাত্মীয়ের মতো মনে করিতেন। ইঁহারা তখন যেন ছিলেন একই পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন শাখা, জীবনে ইঁহাদের তাঁরা কখনও বিস্মৃত হন নাই। বাহিরের যোগসূত্র অনেক জায়গায় ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু অন্তরের প্রতিষ্ঠা সমানই ছিল। বহু বৎসর পরে ইঁহাদের দেখিয়াও রামানন্দ যেন সেই পূর্ব জগতে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যাইতে পারিতেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন দাসাশ্রমের কর্মী ও সাধক ইন্দুভূষণ রায়।

ইন্দুভূষণ রায়

ইন্দুভূষণ রায় ও তাঁহার পত্নী সরোজবাসিনী দেবীর জন্মভূমি টাকীতে ছিল। কিন্তু এই রাঢ়দেশীয় পরিবারের সঙ্গে এক সময় তাঁরা প্রায় একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন। সরোজবাসিনী ধনী জমিদার বংশের কন্যা ছিলেন। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া তিনি যে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাতে আমরণ তাঁকে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাতে তিনি কখনও দমেন নাই। তাঁর কর্মপটু শরীর, প্রফুল্ল চিত্ত, স্নেহশীল হৃদয় ও স্বভাবজাত সেবাগুণ তাঁকে সকল অনাত্মীয়েব পরম আত্মীয় করিয়া তুলিয়াছিল। মনোরমা দেবীর পুত্রকন্যাদের তিনি নিজ সন্তানের মতো স্নেহে ও যত্নে পালন করিয়াছিলেন। তাঁর মাতৃহৃদয় শুধু রোগীর সেবা করিয়া তৃপ্ত হইত না, নিজের সন্তানেরা বড়ো হইয়াছিল বলিয়া তাঁর মন ছোটো শিশুর সন্ধান করিত। মনোরমা দেবীর সন্তানদের শিশুবয়সে পাইয়া নিজ সন্তানদের প্রাপ্য স্নেহ এই শিশুগুলির উপরেই তিনি নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। বাহিরের লোকদের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁর অন্তরের কোমলতা সহজে ধরা যাইত না, যেখানে অন্যায় দেখিতেন সেখানে বরং কঠোর ব্যবহারই করিতেন। কিন্তু এই শিশুদের সান্নিধ্যে তাঁর স্নেহের নির্ঝর উথলিয়া উঠিত। ইহাদের সুস্থতায় অসুস্থতায় সর্বদাই তিনি মাতার মতো তাদের পরম বন্ধু ছিলেন। বিশেষ করিয়া একটি শিশুর তিনিই যেন মা হইয়া উঠিলেন। শিশুটিকে তিনি এত ভালবাসিতেন যে তাঁর নিজের কনিষ্ঠ পুত্র এই শিশুটিকে মাতৃস্নেহের ভাগিদার মনে করিয়া হিংসা করিত। ইন্দুভূষণ রায় মহাশয় কবি সুলেখক প্রেমিক ভক্ত ও সেবাব্রতী ছিলেন। ইঁহার প্রণীত 'রসলীলা' প্রভৃতি গীতি-কবিতার পুস্তক উচ্চদরের সাহিত্যের মধ্যে গণ্য। হোমিওপ্যাথিক এবং অন্যান্য চিকিৎসা-প্রণালীও তিনি জানিতেন। পীড়িত ও আর্তের সেবায় এমন করিয়া সম্পূর্ণভাবে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিতে আর কাহাকেও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি রোগশয্যায় বৃদ্ধের শিয়রে সান্ত্বনা, যুবকের

শিয়রে ভরসা ও শিশুর শিয়রে আনন্দ-উৎস হইয়া দেখা দিতেন। বর্ণ শ্যাম হইলেও তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। শরীরে তাঁর অসুরের মতো বল ছিল, মনের সাহস তার চেয়ে এক বিন্দুও কম ছিল না। অধিকন্তু ছিল তাঁর সুমধুর কণ্ঠ আর রসবোধ। তাঁকে দেখিলেই কী বৃদ্ধ কী শিশু সকল রোগীর মনে ভরসা জাগিয়া উঠিত। তাঁর মুখে ধর্মসংগীত আর ধর্মোপদেশ শুনিয়া বহু লোক উপকৃত হইয়াছেন। দাসাশ্রমে যোগ দিবার পর তিনি সেখানকার অধ্যক্ষ হন। রোগীদের তিনি সন্তানের মতো দেখিতেন। তাঁর উপাসনা ও স্বরচিত গান দাসাশ্রমের আনন্দ উৎসাহের উৎস ছিল। মফস্বলে অনেক সময় তাঁকে 'দাসী'র গ্রাহক সংগ্রহ করিতে হইত। কখনো কখনো তাঁর আশাতীত সাফল্যে আনন্দিত হইয়া অন্য সেবকেরা তাঁকে ফুলের মালায় সাজাইয়া স্টেশন হইতে লইয়া আসিতেন।

দাসাশ্রমের যুগের পর ইন্দুবাবু পাটনায় ও লাহোরে চলিয়া যান। সেখান হইতে আসেন এলাহাবাদে। ইন্দুভূষণ এবং রামানন্দ এলাহাবাদেও পরস্পরের সৎকার্যের সহায় ছিলেন। বাঁকিপুরে এবং এলাহাবাদে তিনি অসংকোচে বহু প্লেগরোগীর সেবা করিয়াছিলেন। প্লেগেই তাঁর মৃত্যু হয় বলিয়া তাঁর শেষ চিকিৎসক সন্দেহ করিয়াছিলেন। একটি কাঠবিড়ালিকে অসুস্থ দেখিয়া তাহার সেবা করিয়া তিনি প্লেগরোগে আক্রান্ত হন বলিয়া শোনা যায়। তিনি প্লেগ সন্দেহ করিয়াও কাঠবিড়ালিকে ত্যাগ করেন নাই। 'দাসী'তে এঁর 'রসলীলা' পুস্তকের দীর্ঘ সমালোচনা আছে। গয়া নগরীতে ১৩২৪ বাংলা সালের পৌষ মাসে ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

ঝামাপুকুরের ছোটো বাসাটি ছাড়িবার পরও রামানন্দ কয়েক বার বাসা বদল করেন। ১৬৭-২, ১৬৭-৩ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতে যখন দাসাশ্রম ছিল তখন তারই এক অংশে তিনি সপরিবারে বাস করিতেন। হ্যারিসন রোডে কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের একটি বাড়িতে তিনি কিছু দিন ভাড়াটিয়া ছিলেন। ইন্দুভূষণ রায় এবং উমাপদ রায়ও তখন সেই বাড়িতে সপরিবারে থাকিতেন। সম্ভবত কৃষ্ণপ্রসাদ বসাকও থাকিতেন। কৃষ্ণপ্রসাদ বাবু পরে লক্ষ্ণৌ যান এবং গঙ্গাপ্রসাদ বর্মার 'এডভোকেট' কাগজের সম্পাদকের কাজ করেন। এই বাড়িরই ছোটো চিলা-ঘরটিতে রামানন্দ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উত্তরের কাগজ দেখিতেন। রামানন্দের শান্ত প্রকৃতি পশুদেরও বিশ্বাস আকর্ষণ করিত। বাড়িতে একটা বিড়ালের বাচ্চা হইয়াছিল। বাড়িতে যে-সব বালকেরা ছিলেন, তাঁদের কাজ ছিল বিড়ালছানাগুলিকে সর্বত্র টানিয়া লইয়া বেড়ানো। মা-বিড়ালটা বালকদের ভয়ে ভীত হইয়া বাচ্চাগুলিকে লইয়া সেই চিলের ঘরে রামানন্দের চটিজুতা জোড়ার পাশে রাখিয়া আসিল। বড়ো হওয়া পর্যন্ত সেগুলি সেইখানেই থাকিত। ঘাটশিলাতে বহু বৎসর পরে দেখিয়াছি গ্রীষ্মকালে পথের কুকুরগুলা রোদে পুড়িয়া তাঁর ঘরে টেবিলের তলায় পায়ের কাছে বসিয়া থাকিত। আর কাহারও ঘরে বসিতে তাদের সাহস হইত না।

দাসাশ্রমের যুগে রামানন্দের নিজের ঘরেও রোগের অভাব ছিল না। বাঁকুড়া হইতে তাঁর এক অতি-নিকট আত্মীয়া মুমূর্ষু অবস্থায় কলিকাতায় আসেন। সাধ্যমত ভাল ডাক্তার এবং কবিরাজ দেখাইয়াও সস্ত্রীক রামানন্দ তাঁকে বাঁচাইতে পারেন নাই। তাঁর সংক্রামক রোগ হইয়াছিল। মনোরমা দেবী তখন শিশুসন্তানের জননী। তবু তিনি আত্মীয়ার সেবা করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। অন্যান্য আত্মীয় অপেক্ষা বেশি সেবা তিনিই করিয়াছিলেন। অন্য অনেকে তাঁহার ঘরে ঢুকিতে ভয় পাইতেন।

মুকুল

নিজ সন্তানদের জন্মের পর শিশুদের শিক্ষা ও আনন্দের দিকে রামানন্দের বিশেষ দৃষ্টি পড়ে। বাল্যকাল হইতেই রঙিন ছবির দিকে তাঁর বিশেষ টান ছিল আমরা জানি। 'সুলভ সমাচার' তাঁর বাল্যকালে পূজার সময় রঙিন কাগজে ছাপা হইত, এটা সেই বয়সে তাঁর একটা আনন্দের কারণ ছিল। স্কুলে পড়ার সময় ত্রৈলোক্যনাথ দেব খোদিত সুন্দর ছবিযুক্ত ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্ভিদবিদ্যার বইটি তাঁর প্রিয় ছিল। সেকালে শিশুদের বর্ণ-পরিচয় যে-সব বইয়ের সাহায্যে হইত তাহাতে ছবির বালাই ছিল না। শিশুদের এই চিত্রহীন জগতে শিক্ষা হয়ত তাঁকে নিজেকেও শৈশবে পীড়া দিয়াছিল। তাছাড়া শিশুদের সম্পূর্ণ অপরিচিত কথার সাহায্যে তাদের শিক্ষারম্ভ তিনি ঠিক মনে করিতেন না। এই জন্য তিনি নূতন প্রণালীতে নিত্য-ব্যবহৃত সহজ কথার সাহায্যে বহু চিত্রশোভিত করিয়া বর্ণ-পরিচয় রচনা করেন। বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগে প্রতি অক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে একটি ছবি দিবার প্রথা তিনিই প্রবর্তন করেন। দ্বিতীয় ভাগ বর্ণ-পরিচয় তিনি পাতাজোড়া ৮ খানা ছবি এবং বাইশটি অন্য বড়ো ছবি দিয়া অনেক গল্প ও কবিতায় সাজাইয়া প্রকাশ করেন। এই বইগুলি তখনকার শিশুমহলে এমন জনপ্রিয় হইয়া উঠে যে ১৭।১৮ বৎসরে দুই লক্ষেরও বেশি বিক্রি হয়। বাংলা কোনো স্কুলপাঠ্য পুস্তকে বর্ণ-পরিচয় প্রকাশের সময় এত বড়ো বড়ো উৎকৃষ্ট ছবি দেওয়া হইত না। শিশুপাঠ্য পত্রিকারও একান্ত অভাব ছিল। বাংলা ১২৯২ সালে 'বালক' একা এবং পরে 'ভারতী' পত্রিকার ক্রোড়ে দেখা দেয়। স্বর্ণকুমারী ও রবীন্দ্রনাথ সে-কাজে প্রধান উৎসাহী ছিলেন। 'বালকে'র অকালমৃত্যু হয়। এই সময় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন শিশুপাঠ্য পত্রিকা 'সখা'র সম্পাদক প্রমদাচরণ সেনের মৃত্যু হয়। প্রমদাচরণ তাঁর সমস্ত অর্থ ও শক্তি 'সখা'র পিছনে ঢালিয়াছিলেন। কাছাকাছি সময়ে 'সখা ও সাথী' নামে শিশুদের আর-একটি কাগজ দেখা দেয়। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত শিশুদের কোনো ভাল কাগজ ছিল না। কোমলহৃদয় রামানন্দ চিরজীবনই শিশুদের দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেন না। শিশুদের চোখে জল দেখিলে অনেক প্রয়োজনীয় কথা ভুলিয়া তিনি বৃদ্ধবয়সেও আগে সেই দিকে দৃষ্টি দিতেন। শিশুদের আনন্দ দিবার জন্য ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রধানত তাঁর উদ্যোগে এবং আচার্য জগদীশচন্দ্রের উৎসাহে 'মুকুল' নাম দিয়া একটি শিশুপাঠ্য সচিত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সকল উৎসাহী যুবকেরা বলিয়া-কহিয়া শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে মুকুলের সম্পাদক করেন। সহকারী সম্পাদক ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা বসু। আত্মভোলা উদাসীন রামানন্দ অন্তরালে ছিলেন, কিন্তু কী রচনাসংগ্রহে কী স্বয়ং রচনায় তাঁর উৎসাহ ইঁহাদের অপেক্ষা বেশি বই কম ছিল না। 'মুকুল' রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত ছিল। ছেলেদের কাগজে রঙিন ছবি দিতেই হইবে ইহা ছিল রামানন্দের খেয়াল। তিনি স্কুল কলেজ ও পত্রিকাদির ভিতর দিয়া জনশিক্ষার ব্রত জীবনের প্রধান ব্রত হিসাবে না লইলে এবং প্রচুর অবসর পাইলে হয়ত চিত্রশিল্পী হইয়া বসিতেন। যাহা হউক, তখন রং দিয়া ছবি ছাপা যাইত না। এই একটা বড়ো দুঃখ তাঁর ছিল। সব ছবিই কাঠের ব্লকের সাহায্যে ছাপা হইত এবং একরঙা হইত। 'মুকুলে' একটি মাত্র কবিতায় রঙিন ছবি দিবার জন্য ইঁহারা পোটো ডাকিয়া আনিয়া কাঠের ব্লকে ছাপা প্রতি কপি আলাদা আলাদা করিয়া হাতে রং দেওয়াইয়াছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রবন্ধ সংগ্রহে খুব উৎসাহী ছিলেন। ইঁহাদের চারি জনের উৎসাহে কাগজটি খুব উঁচুদরের হইয়া উঠিয়াছিল। 'মুকুলে' যে-সব লেখক তখন লিখিতেন এখন

তেমন লেখক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক-পত্রেও একত্রে এতজন দেখা অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল, যোগেশচন্দ্র রায়, হেমলতা সরকার, অবলা বসু, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, অতুলপ্রসাদ সেন, কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং আরও অনেক প্রসিদ্ধ লেখক-লেখিকা সে যুগে 'মুকুলে' লিখিতেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর হাস্যরসাত্মক সরস কবিতাগুলির মতো হাসির ফোয়ারা আজকাল কোনো কবিতায় দেখা যায় না। এলাহাবাদে প্রবাসী হইবার আগে এবং পরেও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মুকুলের নিয়মিত লেখক ছিলেন। অনেকে জানেন না এবং শুনিলে বিস্মিত হইবেন যে 'মুকুলে' তিনি 'নাসাবতী রাজকন্যা', 'ভোলা চাষা' প্রভৃতি অনেকগুলি উপকথা ও অন্য গল্প লিখিয়াছিলেন। নীতিমূলক গল্প এবং সাধু ও গুণীদের জীবন-কথাও তিনি 'মুকুলে' লিখিতেন।

কলকাতা ত্যাগ ও এলাহাবাদ গমন

'দাসাশ্রম', 'দাসী'র সেবাব্রতে যখন দাসাশ্রমের সভাপতি আকণ্ঠ নিমজ্জিতপ্রায় সে সময়ও তিনি দেশের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য সমান আগ্রহশীল। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দেশহিতৈষী রামানন্দ ডেলিগেটরূপে সঞ্জীবনী সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, সঞ্জীবনীর ম্যানেজার প্রসন্নকুমার বসু, ইন্দুভূষণ রায় ও পাঞ্জাবি সাধক ভাই প্রকাশ দেবজির সঙ্গে এলাহাবাদ কংগ্রেসে যান। তখন রামানন্দের বাল্যবন্ধু হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদে চাকরি করিতেন। তাঁরই সঙ্গে শহর ভ্রমণের সময় রাস্তা হইতে রামানন্দ কায়স্থ পাঠশালা দেখেন। তখন সেটি স্কুলই ছিল, কলেজ হয় নাই। তিনি পরে লিখিয়াছিলেন, "তাঁকে (হেমকে) বলেছিলাম, এটা যদি কলেজ হয় ও তাতে আমি কাজ পাই তো বেশ হয়। ভবিষ্যতে আমার এই অভিলাষ পূরণের সঙ্গে এলাহাবাদ যে আমার জীবনের অনেক আনন্দ ও দুঃখ স্মৃতির সহিত জড়িত হবে, তা তখন ভাবি নাই, জানতাম না।"

১৮৯২-এর কংগ্রেসে সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এক দিন বিষয় নির্বাচন কমিটির অধিবেশনে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মি. ডিগবির বিলাতি কংগ্রেস পত্র "ইন্ডিয়া" প্রভৃতি সম্পর্কীয় "গোলমেলে" হিসাব বুঝাইয়া দেন—অবশ্য ইংরাজিতে। এবং ব্যাখ্যা হইয়া গেলে সমবেত বাঙালি প্রতিনিধিদিগকে বাংলায় এই মর্মের কথা বলেন:— "একটা গোলমেলে হিসেব যদি বুঝিয়ে দিতে না পারব, তাহলে বৃথাই এতদিন ব্যারিস্টারি করেছি।" 'প্রবাসী'তে ১৩৪২ সালে সম্পাদক এই গল্পটি লিখিয়াছিলেন।

পুত্রকন্যার জন্মের পর সংসারবৃদ্ধির জন্য ব্যয়বৃদ্ধি স্বাভাবিক। সিটি কলেজের ১৪০ টাকা বেতনে তখন দেশের সংসার খরচ এবং কলিকাতার সংসার খরচ দু-ই চলা শক্ত। অন্যান্য আয় তাঁর কিছু ছিল, কিন্তু তা বেশি নয়। এই জন্য অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র রামানন্দের আরও বেতন বৃদ্ধির জন্য সিটি কলেজে আবেদন করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল প্রিয় শিষ্যকে নিকটেই রাখেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আর বেতন বৃদ্ধিতে রাজি হন নাই। এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালা ইতিমধ্যে কলেজ হইয়াছে। তাঁরা এই বাঙালি অধ্যাপককে তাঁদের প্রিন্সিপ্যালের পদে নিযুক্ত করিলেন। সিটি কলেজের ছাত্রেরা তাঁদের প্রিয় অধ্যাপককে বিদায় দিবার জন্য একটি বিদায়-সভা করিয়াছিলেন। তাতে তাঁকে একটি রূপা বাঁধানো ছড়ি এবং মানপত্র দেওয়া হইয়াছিল। রামানন্দের ছাত্র নলিনবিহারী মিত্র বলেন, "সিটি কলেজে ফ্রেন্ডস

ইউনিয়ান নামে একটি সাহিত্যিক সমিতি ছিল। ঐ বৎসর রামানন্দবাবু উহার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং আমি সেক্রেটারি হই। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন হইতেও তাঁহাকে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হয়।" এই খবর দুটি ছাড়া রামানন্দের বিষয় আনন্দমোহন বসুর একটি চিঠি হইতেও সামান্য কিছু জানা যায়। বসু মহাশয় প্রিন্সিপ্যাল উমেশচন্দ্র দত্তকে লেখেন,

"My dear Umesh Babu,

I am afraid it will not be possible for me in the present state of my health to attend the meeting to be held to-day to bid farwell, I trust only a temporary farwell to Ramananda Kindly mention to him and the meeting my very great regret that this should be so. It is a melancholy occasion to bid good-bye to one who has been so intimately and dearly connected with us as a student, as a professor, as a friend, and as a co-worker. May God be with him and bless him wherever he may be, grant him and his family the full measure of health which he hopes from the change, keep alive and increase the Divine impulse to do His Will and serve His creatures and endow his youthful life with His choicest gifts I trust he will sometimes think tenderly of us, as we shall always of him.

Yours sincerely,
Ananda Mohan Bose

সিটি কলেজেব ছেলেরা এই অভিনন্দন বিদায়-সভায় পাঠ করেন,

Sir,

It is with a feeling of deep sorrow that we beg to approach you on this occasion

When it was rumoured a short time ago that you were about to leave us soon, we were in hopes that the intelligence would prove to be untrue. Now we find, however, that it was but too true, and we have come here to bid you farewell

We would fain retain you still in our midst, but since you go to a sphere of action perhaps more congenial, we mingle our congratulations with our regrets, and wish you godspeed

When far away, we shall ever cherish in our hearts the examples you leave behind, of an exemplary character, of an ideal professor, who was never but on the most friendly terms with his students We pray to Him on high to shower down upon you His choicest blessings.

We remain,
Dear sir,
Your most obedient pupils,
The Students of the Fourth Year Class

এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালা কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া যাওয়া বিষয়ে রামানন্দ নিজে কন্যাদের লিখিয়াছিলেন, "এই বাসার (হ্যারিস্ন রোডের) থেকেই এলাহাবাদে চাকরি করতে যাই। প্রথমে আমি একা যাই—বোধ হয় ১৮৯৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর। তার কয়েক দিন পরে ফিরে এসে তোমাদের মাকে ও সকলকে নিয়ে যাই।

"প্রথমে গিয়ে দেখি, তখন কায়স্থ পাঠশালার রামলীলার ছুটি হয়ে গ্যাছে, খুলবে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ; তখন আমাকে কাজে যোগ দিতে (join করতে) হবে। নূতন জায়গায় একা গিয়ে এমনিই আমার মনটা খারাপ ছিল ; পৌঁছেই কাজে যোগ দিতে না পেরে আরও অসন্তুষ্ট হলাম। যা হোক আবার ফিরে এসে তোমাদের মাকে ও শিশুদের এলাহাবাদে নিয়ে গেলাম। একা গিয়ে কেদারনাথ মণ্ডলের বাড়িতে উঠেছিলাম, এবারেও সেইখানেই উঠলাম। তিনি একাউন্টেন্ট জেনারেলের অফিসে কেরানিগিরি করতেন, কটরায় একটি দ্বিতল খোলার ঘর ভাড়া নিয়ে সপরিবারে থাকতেন। আমার চেয়ে বয়সে বোধ হয় বছর সাতের বড়ো ছিলেন।...তিনি দ্বিতলের নিজের শয়নকক্ষটি ছেড়ে দিয়েছিলেন ও সস্ত্রীক খুব আদরযত্ন করেছিলেন। তিনিই বাসা খুঁজবার সহায়তা করেন। আমার প্রথম বাসা মেয়ো

রোডের একটি দুতলা পাকা বাড়ি—লালা বাঁকে বেহারীর বাড়ি।"

আত্মপ্রচারে অনভিলাষী রামানন্দ নিজের বিষয়ে বিশেষ কিছু কখনও বলিতেন না বা লিখিতেন না। অন্যের বিষয় বলিতে গিয়া তাঁর নিজের কথা দুই-চারিটা কখনও জানা যাইত। তিনি পত্নীর কথা লিখিবার ইচ্ছায় এই সময়ের কিছু কথা কন্যাদের লিখিয়াছিলেন। তাতে তাঁর পত্নীপ্রেম, বন্ধুপ্রীতি, সন্তানস্নেহ ও ছোটোখাটো জিনিসের প্রতি স্বাভাবিক ভালোবাসার যে-ছবি পাই সেইটুকু হইতে তাঁর আড়ম্বরহীন সরল ও স্বচ্ছ প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়।

"এলাহাবাদে যাবার আগে,...চুনার যাই। শান্তা কোলে। হাবড়া স্টেশনে সবাইকে তুলে দিয়ে এবং লগেজ তুলে দিয়ে আমি গাড়িতে উঠতে পারি নাই। স্টেশন থেকে টেলিগ্রাফ করে ট্রেনে কোনো একটা স্টেশনে তোমাদের মাকে জানাতে তিনি শিশুদুটিকে নিয়ে হুগলি বা চুঁচুড়া স্টেশনে নামেন ও প্লাটফর্মে অপেক্ষা করতে থাকেন। আমি পববর্তী ট্রেনে অনেক পরে সেখানে পৌঁছে সকলকে নিযে চুনার যাই। তোমাদের মা একটুও ঘাবড়ে যান নাই।

"চুনারে আমরা একটা খুব পুরান পাকা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম। নাম বানির কুঠি বা রানির বাংলা। কোনো নেপালি রানির বাড়ি সেটা ছিল। গঙ্গার ধারে। বাড়িটা পোড়ো বাড়ির মতো ছিল। কয়েকটা বড়ো বড়ো ঘব ও ছোট ছোট ঘর তাতে ছিল। আমরা ক'টি প্রাণী এক কোণে পড়ে থাকতাম। বাড়িটা তখন কতকটা নির্জন জায়গায় ছিল। এখন কিরূপ জানি না। একদিন গঙ্গার ধাব দিযে একটা বাঘ দৌড়ে গেল, এইরূপে একটা গোলমাল শুনেছিলাম। বড়ো সাপ একটা বেবিয়েছিল ; এই রকম অস্পষ্ট স্মৃতি রয়েছে। কোনো কিছুতে ভীত হবার স্বভাব তোমাদের মা'র ছিল না। কযেকদিন আমরাই ওখানে ছিলাম। তার পর বামব্রহ্ম সান্যাল মহাশয়ের পত্নী এসে ছিলেন। তাঁর পুত্র হেমন্তও পরে এসেছিল। তিনি (হেমন্তর মা) একটু সেকেলে রকমের সরল মানুষ ছিলেন। একটু খেয়ালী রকমেরও ছিলেন। হেমন্ত বেশ মোটাসোটা হয়, এই তাঁর ইচ্ছা ছিল. এবং এই জন্যে তিনি তাকে ভাতে ঘি খেতে দিতেন। কিন্তু সে কোনো মতেই ঘি খেতে চাইত না। এই জন্য তিনি ভাতের ভিতর লুকিয়ে ঘি দিতেন। হেমন্তও খেতে আরম্ভ করবার আগে ভাতগুলা ওলটপালট করে দেখত ঘি আছে কি না ; থাকলে খেত না।

"তিনি তোমাদের মাকে খুব ভালবাসতেন ও ছোটো বোনের মতো মনে করতেন। সেই জন্যে আমাকে ২।১টা পরিহাসও করতেন। বলতেন,—আপনি তো ভগ্নীপতি, আপনাকে তামাশা করা চলে। তাঁর ধারণা ছিল যে তোমাদের মা খুব সুন্দরী। বলতেন,—মনোরমা কি কম সুন্দরী?

"তোমাদের মা চুনারের দুর্গ, পীরের দরগা, একটা বাঁধান কুয়া বা পুকুর (আচর্য বা আশ্চর্য কূপ, শাক্তরা যেখানে নরবলি দিত বলিয়া প্রবাদ পাহাড়ের সেই মন্দির ও তার ভিতর অষ্টভূজা মূর্তি প্রভৃতি)...দেখেছিলেন। যেদিন কূপটা দেখতে যাই, সেদিন কেদার তখন ঘুমিয়েছিল। উঠে দেখে, মা নেই। জেদ করাতে, আমরা যে-দিকে গিয়েছিলাম, দাই তাকে সেই দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা তখন ফিরে আসছি। কেদার তার হাতে একটা ছোট ঢিল লুকিয়ে রেখেছিল। যাই না মাকে দেখা, অমনি কেঁদে ঢিলটা তাঁর দিকে ছুঁড়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। মা কেন তাকে নিয়ে যান নাই এই রাগ।

"চুনারে আমাদের একটি নাপিত জাতীয়া দাই ছিল, তার নাম কুস্‌মা। বিধবা স্ত্রীলোক। রামব্রহ্মবাবুর স্ত্রী শুনলেন যে, তারা নিজেদের বিবাহাদি অনুষ্ঠানে নাচে গায়। তিনি তাকে নাচতে বলাতে সে এমন লাফিয়ে লাফিয়ে নেচেছিল, যে, তিনি হাসতে হাসতে মাটিতে প্রায় গড়াগড়ি দিয়েছিলেন। এই কুস্‌মার ছোট ভাইয়ের নাম ছিল বিল্লারা, বড়ো ভাইয়ের নাম তুলসী।

"চুনারে তখন চিংড়ি ও চুনো মাছের দাম ছিল তিন পয়সা সের, ও রুই মাছ ছয় পয়সা

সের। দুধ বাড়িতে দুয়ে দিয়ে যেত টাকায় ১৮ সের। চুনারের নিকটেই গ্রামে একজন আশুবাবু (পাল?) বলে বাঙ্গালি খ্রিস্ট্রিয়ান থাকতেন—ভারি মিশুক লোক। নিজেই এসে আলাপ-পরিচয় করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'দুধ কি দরে নিচ্ছেন।' উত্তর শুনে বললেন, 'মাত্র ১৮ সের? আমি টাকায় ৩২ সের নি।' আমি বললাম,—অত দুধ নিয়ে কি করেন? বললেন,—'কেন দুধ খাই, দই খাই, মাখন খাই, ঘি তৈরি করি...।' চুনারে মার্বেলের নানা রকম বাসন হত।...আমরা কিছু কিনেছিলাম। প্রাণকৃষ্ণবাবুর বিয়েতে একটা সেট তাঁকে উপহার দিয়েছিলাম।

"...চুনারের নানা জায়গার অনেক গল্প আছে। দুর্গটার ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধিও আছে; আমরা যে পাড়ায় থাকতাম, সেটার নাম টিকৌর মহল্লা। আমার বোধহয় আমি চুনার থেকে ফিরে এসে জায়গাটির সম্বন্ধে কোনো মাসিকে প্রবন্ধ লিখেছিলাম। খুঁজে দেখতে হবে।..."

দ্বি তী য় অ ধ্যা য়

এলাহাবাদে বসবাস

রামানন্দ ছাত্রাবস্থায় কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং যে কলেজের ছাত্র ছিলেন সেই কলেজেই অধ্যাপক হন, সুতরাং বলিতে গেলে এলাহাবাদেই তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রপাত। এলাহাবাদের কথা তিনি পরে লিখিয়াছেন,

"যদিও আমার বেতন ছিল মোটে ২৫০ টাকা, তবু আমি প্রিন্সিপ্যাল হয়ে এলাহাবাদে গেছি বলে আমাকে কেদারবাবু ও বোধহয় অন্য কোনো কোনো বন্ধু চালটা প্রিন্সিপ্যালের যোগ্য রাখতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। প্রথম প্রথম চাকর-বাকর একটু বেশিই রাখা হয়েছিল। সেকেন্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ির চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো যানে না-চড়ি, সেরূপ পরামর্শও পেয়েছিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই তোমাদের মা সব অবস্থা বুঝে নিয়ে ঠিক দরকার-মতো চাকর-বাকর রেখেছিলেন। আমি কেবল কলেজ যাতায়াতের জন্য সেকেন্ড ক্লাস গাড়ি ব্যবহার করতাম। অন্য সময় হয় এক্কা ব্যবহার করতাম নয় হাঁটতাম। আমাদের সাউথ রোডের বাসা কায়স্থ পাঠশালার খুব নিকটে ছিল। সেখানে থাকতে হেঁটেই কলেজ যেতাম।

"মেয়ো রোডের বাড়িতে থাকবার সময় একবার শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এলাহাবাদ গিয়ে সেখানে ওঠেন। তিনি সেখানে থাকবার মধ্যেই পড়ে কেদারের জন্মদিন। শাস্ত্রী মহাশয় কাউকে না জানিয়ে চৌক থেকে ক্রিকেট ব্যাট বল ও উইকেট এনে কেদারকে উপহার দেন। যখন দিলেন তখন স্নানাহারের সময় হয়েছে। কেদার কিন্তু তখনই বলল, 'দাদামশায়, খেলবে এসো।' শাস্ত্রীমশায়ও তৎক্ষণাৎ খেলা আরম্ভ করলেন। কেদার একটা বলও ব্যাট দিয়ে মারতে পারল না; বোধহয় মনে করল ব্যাটে বলটা লাগিয়ে দেওয়া শাস্ত্রী মশায়েরই কাজ। এইজন্য বলল—'দাদামশায়, তুমি কোনো কর্মের নও।' শাস্ত্রীমশায় হাসতে হাসতে বললেন—'এ রকম সত্যি কথা আমার সম্বন্ধে আর কেউ কখনো বলে নি।"

এলাহাবাদে কায়স্থ পাঠশালা কলেজের কাছে সাউথ রোডে ব্যারিস্টার মুন্সী রোশনলালের বাড়ির পাশে তাঁরই একটি ছোটো বাংলোতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সপরিবারে কিছুদিন ছিলেন। এই বাড়িতে বোধহয় তিনি ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে আসেন। সাউথ রোডের উপর ছোটো একটি গেট ছিল। গেট হইতে একটি ঢালু রাস্তা ভিতর দিকে নামিয়া আসিয়াছে; সেই ঢালু রাস্তা দিয়াই ঘোড়ার গাড়ি ভিতরে যাইত। ভিতরের রাস্তার পাশে তারের বেড়ার ওধারে একটা প্রকাণ্ড পোড়ো জমি। ছোটো একটি কম্পাউন্ড মেহেদির বেড়া দিয়া ঘেরা, তার পর ছোটো একটি বাংলো-বাড়ি। বোধহয় খানপাঁচেক ঘর ও তিন দিকে তিনটি বারান্ডা ছিল। একটি ঘরের মেঝে অন্য ঘরের চাইতে নীচু। ভিতরদিকে আর-একটি উঠান, স্নানের ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি। উঠানের পাঁচিলের পর আবার কম্পাউন্ড ও দ্বিতীয় একটি ছোটো বাংলো। সবশেষে প্রকাণ্ড পেয়ারা-বাগান।

মুনশি রোশনলালের স্ত্রী শ্রীমতী হরদেবী লাহোরের এক ব্রাহ্ম ব্যারিস্টারের ভগ্নী। এই

ব্যারিস্টার অল্প বয়সে মারা যান। তাঁরই কন্যা শ্রীমতী রাধিকাকে পাটনার ব্যারিস্টার সচ্চিদানন্দ সিংহ বিবাহ করেন। শ্রীমতী হরদেবীর পিতা কানাইয়ালালের সব সম্পত্তি রাধিকা ও সুতরাং সচ্চিদানন্দ সিংহ পান। এই সচ্চিদানন্দই পরে 'হিন্দুস্থান রিভিউ' পত্রের সম্পাদক হন। ইনি 'কায়স্থ সমাচার' ও 'হিন্দুস্থান রিভিউ' বিষয়ে কতকগুলি খবর দিয়া এই গ্রন্থকর্ত্রীকে সাহায্য করিয়াছেন। মুনশি রোশনলালের আবাস বাড়িতে বড়ো বাগান ও শিশুদের নয়নানন্দকর অনেক ছবি ও আসবাব ছিল। কিছু দূরে ছিল বাঙালি ছেলেদের জন্য স্থাপিত অ্যাংলো-বেঙ্গলি স্কুল। ইহা প্রবাসী বাঙালি বাবু শীতলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতির দ্বারা স্থাপিত হয়। এই রোশনলালের বাংলোর কথাই তাঁর পুত্রকন্যাদের স্মৃতিতে অস্পষ্ট ভাবে প্রথম দেখা দিতে শুরু করে। শেষের দিকে ক্রমে স্পষ্ট হইয়াছে। মনে পড়ে তাঁহাদের মা মনোরমা দেবীর অত অল্প বয়সেও সাদাসিধা মোটা শাড়ি পরাই অভ্যাস ছিল। তাঁহাকে ভাবিতে গেলেই মনে আসে তাঁর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সুমিষ্ট হাসি আর অবগুণ্ঠনমুক্ত ঘন কালো চুলের প্রকাণ্ড কবরী। গহনার প্রাচুর্য নাই, শুধু দুই হাতে মোটা মোটা এক এক গোছা সোনার অমৃতী পাকের চুড়ি, কানে সোনার ফুল।

রামানন্দ প্রত্যহ সকালে উঠিয়া ডাম্বেল লইয়া ব্যায়াম করিতেন, তার পর বাইরের ঘরে বড়ো একটা টেবিলের ধারে বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেন, টেবিলের উপর একটা ক্যাশ বাক্স। সেটা কলেজের। সকাল সকাল স্নান সারিয়া রান্নাঘরের বারান্ডায় তিনি খাইতে বসিতেন। ছোটো একটি মেয়ে তাঁকে আসনে বসিতে দেখিলেই তাঁর পিঠের দিক হইতে গলা জড়াইয়া পিঠের উপর ঝুলিয়া পড়িত। তিনি যতক্ষণ খাইতেন মেয়েটি পিঠ হইতে নামিত না। খাওয়া শেষ হইলে তিনি বলিতেন, "ছোটুকে নামিয়ে নাও।" তখন তাকে নামাইয়া নেওয়া হইত।

রামানন্দ স্বয়ং এবং তাঁর বাড়ির সকলেই স্বদেশী কাপড়-চোপড় ছাড়া ব্যবহার করিতেন না। দেশী চেকের গলাবন্ধ সুট ও হিন্দুস্থানি টুপি পরিয়া তিনি কলেজে যাইতেন। যখন-তখন ছোটো মেয়েটি "প্রিন্সিপ্যাল সাহেব হয়েছি" বলিয়া টুপিটি দখল করিত। কলেজে যাইবার সময় দরোয়ান ক্যাশ বাক্স ও খাতা বই লইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইত। কখনো বা শিশুরাও পিছন পিছন কলেজ গিয়া হাজির হইত। কলেজের ক্লাস রুমে শিশুদের ঢোকা বারণ ছিল। কাজেই হয় তাদের বাড়ি ফিরিতে হইত, নয় ছাদে গিয়া স্কাই-লাইটের ভিতর দিয়া পিতার ক্লাস পড়ানো দেখার কৌতূহল নিবারণ করিতে হইত। সিঁড়ির মতো গ্যালারিতে ছেলেরা বসিত, অধ্যাপক বসিতেন উঁচু তক্তার উপর চেয়ারে। শিশুরা বিস্ময়ের সহিত দেখিত।

মনোরমা দেবীকে ভালো করিয়া ইংরাজি শিখাইবার জন্য ও বাজনা শিখাইবার জন্য এই বাড়িতে দুই জন মেম সাহেব কিছুদিন আসিতেন। যিনি ইংরাজি পড়াইতেন তাঁর নাম বোধহয় মিস রডরিক, ইনি মিশনরি মেম, অখ্রিস্টান বাঙালি বাড়িতে পড়াইতেন ও ছবি আঁকাইতেন। এলাহাবাদে যে ব্রাহ্মসমাজ ছিল তার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অগ্রহায়ণ মাসে সেখানে উৎসব হইত। মনোরমা দেবী উৎসব উপলক্ষে বালক-বালিকা সম্মিলন করিতেন। তাতে কোনো কোনো নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারের তো ছেলেমেয়েরাও আসিত। একবারের সম্মেলনের দুটি কথা রামানন্দ লিখিয়াছিলেন :—"সাউথ রোডের জেনানা মিশনের এক মেম (নাম বোধহয় মিস্ রডরিক) নিজে থেকে বললেন তিনি ছেলেমেয়েদের কিছু বলবেন। তাতে আমি এই শর্তে রাজি হই যে, তিনি যেন খ্রিস্টিয় ধর্ম প্রচার না করেন। কিন্তু ২।৪ কথা বলবার পরই তিনি যিশুখ্রিস্টের কথা পাড়লেন। আমাকে তৎক্ষণাৎ তাঁকে থামিয়ে দেবার অপ্রীতিকর কাজ করতে হল। (নিষ্ঠাবান্ হিন্দু পরিবারের অভিভাবকেরা খ্রিস্টিয় ধর্মপ্রচার

হয় জানিলে মাঘোৎসবে ছেলেমেয়েদের আসিতে দিবেন না, এই কারণেই এ বিষয়ে বেশি সতর্ক হইতে হইত।) এই সম্মেলনে (অধুনা পরলোকগত) পণ্ডিত ভগবান্ দীন দুবে (তিনি পরে বিলাতে ব্যারিস্টারি করিতেন) নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম ছেলেমেয়েরা ব্রাহ্মধর্ম বোঝে কি না পরীক্ষা করবার জন্যে কিছু প্রশ্ন করেন। 'একটি বালক' ঠিক ঠিক উত্তর দেয়। তাতে পণ্ডিত ভগবান্ দীন মন্তব্য প্রকাশ করেন 'য়্যাদ কর্ লিয়া।' (উত্তরগুলি মুখস্থ করে রেখেছে)।"

সাউথ রোডের বাড়িতে একটি শোকাবহ ঘটনা ঘটে। দেবব্রত নামে একটি শিশুর জন্ম সে বাড়িতে হয়। একদিন দেখা গেল, শিশুর ঘরের সব দরজা জানালা খোলা, খাটের উপর শুভ্র শয্যায় শিশুটি শুইয়া আছে, তার পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন একজন শুভ্র বেশধারিণী বিধবা মহিলা, একজন গৌরবর্ণ শিখ ভদ্রলোক ও আরো দুই-চারজন মানুষ। সকলের মুখ অতি গম্ভীর। দরজার পাশেই অন্য ঘরে শিশুর জননী মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছেন। কয়েকটি শিশু ভীতস্তম্ভিত মুখে দূরে দাঁড়াইয়া।

ইরিসিপ্লাস রোগে শিশুটির মৃত্যু হয়। সে সময় ব্রাহ্মসমাজের কর্মীরা পরস্পরের শোকে দুঃখে এতটা বিচলিত হইতেন এবং পরস্পরকে এমন ভাবে সাহায্য করিতেন যে এই ২।৩ মাসের শিশুটির রোগের কথা শুনিয়া পাটনার নিকটস্থ বাঁকিপুর হইতে শ্রীযুক্তা চঞ্চলা ঘোষ এবং লাহোরের ব্রাহ্মকর্মী ভাই সুন্দর সিংজী সেবা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের অক্লান্ত সেবাতেও তাকে রক্ষা করা গেল না।

আনুমানিক ১৮৯৯ কি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের কথা। সাউথ রোডের বাড়িতে বৈঠকখানা ঘর ও বারান্ডায় অনেকগুলি মোটা মোটা কাঠের হাতল দেওয়া চেয়ার এবং গোটা দুই লাইব্রেরি টেবিলের মতো বড়ো বড়ো গোল টেবিল। ঘরে দেওয়ালেব গায়ে কাঠের র‍্যাক, তাতে থাক থাক অসংখ্য বই। শেক্সপিয়রের সব নাটকের লাল রঙের সুন্দর সটীক সংস্করণ, এগুলি ম্যাকমিলানের ছাপা ; রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদ-সংহিতার বঙ্গানুবাদ, অন্যান্য ইংরেজ কবিদের গ্রন্থাবলি এবং মোটা মোটা Chambers' Encyclopædia, Century Dictionary, Webster Dictionary-গুলি শিশুদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। হঠাৎ একদিন এক সময় আসিল এক গাড়ি Census Report (সেন্সাস রিপোর্ট)। কলিকাতা হইতে নূতন নূতন বই আসা বাড়ির একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। শিশুরা দন্তস্ফুট করিতে পারুক বা না পারুক, নূতন বই দেখিয়া তাদেরও মহা আনন্দ হইত। যখনই কোনো নতুন Encyclopædia-জাতীয় বই বাজারে দেখা দিত, রামানন্দ আনাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। কখনো আসিত মোটা কাগজে ছাপা, কখনো 'ইন্ডিয়া পেপারে' ছাপা নানা রকম বই। অন্তঃপুরে বাংলা বইয়ের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী, ছোটো ছোটো মাপের 'ভারতী', তার চেয়ে কিছু বড়ো মাপের 'বান্ধব' এবং 'বামাবোধিনী' পত্রিকা। পুরাতন 'সখা ও সাথী' বাঁধানো ছিল। নূতন 'মুকুল' তখন পূর্ণ উৎসাহে চলিতেছে। শাস্ত্রী মশায়ের সরস কবিতা ও অন্যান্য লেখকদের নানা বিষয়ক কবিতা, গল্প, ছবি ও প্রবন্ধ শিশুদের মন মাসখানেকের মতো ভরপুর করিয়া রাখিত। ঘ্যাঘাসুরের গল্প, 'দাদখানি চাল মুসুরির ডালে'র ও 'লেপরসাদ' প্রভৃতি কবিতা ছেলেমেয়েদের মনোহরণ করিত। বোধহয় Review of Reviews পত্রিকার অঁফিস হইতে সেই সময় Books for the Bairns নামক কতকগুলি শিশুপাঠ্য সচিত্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। শিশুদের শিক্ষা ও আনন্দ পরিবেশনে শিশুবৎসল রামানন্দ আজীবন উৎসাহী ছিলেন। তিনি খবর পাইয়াই বিলাত হইতে বইগুলি

আনাইলেন। এক বাক্স ভর্তি বই। তাতে চীন, জাপান, আরব, পারস্য, আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ কত দেশের রাজপুত্র, রাজকন্যা, দেবদেবী, জীবজন্তু, দৈত্যদানবের কত গল্প। যার পরিবার ক্ষমতা ছিল সে পড়িত, যে পড়িতে না জানে সেও প্রতি পাতায় কাঠখোদাই ব্লকের ছবির সাহায্যে গল্পগুলি মনে মনে এক্‌রকম করিয়া সাজাইয়া লইতে পারিত। পড়িয়া এবং না পড়িয়া এই সব বইয়ের সাহায্যেই বাড়ির শিশুরা শৈশবে ঈশপের গল্প, গ্রিমের উপকথা, চীন-জাপানের উপকথা, নিগ্রোদের শেয়াল রাজার গল্প প্রভৃতি শিশুলোভন কথা-সাহিত্যের ভাণ্ডার করতলগত করিয়াছিল। বাংলা উপকথা আর ছড়ার ভাণ্ডার ছিল শিশুদের জননীর। তাঁর গল্প বলিবার ক্ষমতা আশ্চর্য ছিল। সে সব গল্প আজকালকার সাহিত্যের দরবারে উঠিয়াছে কি না জানি না।

"সাত বোয়ের সাত আস্‌কে খড়কের আগায় ঘি!
খুঁৎ খুঁৎ খুঁৎ করছ কেন, খেতে লারছ কি?
দাও দাও, ঢেকে রেখে দি।"

ছড়া ও গল্পে সাত বধূর দুঃখকাহিনী শিশুদের কাছে মূর্ত হইয়া উঠিত।

"ভাত কড়কড় ব্যন্নন বাসী দুধ বিড়ালে খায়
তোমার খেলাবার সাথী উপবাসী যায়।"

প্রভৃতি ছড়ায় শিশুজীবনের দুঃখগাথা শোনা যাইত। 'অমূল্যরতন শাড়ি'র গল্প, 'সুখু দুখু'র গল্প কত গল্পই তিনি বলিতেন। গানে তাঁর কণ্ঠ যখন-তখন ঝংকৃত হইয়া উঠিত। ব্রহ্মসংগীত, 'কালমৃগয়া'র গান, ভানুসিংহের গান, আবার সাঁওতালী গান, হিন্দুস্থানি গান, সবই তিনি সমান আনন্দে গাহিতেন। বাঁকুড়ায় 'ভাদুর গান' নামে এক রকম গান প্রচলিত আছে। তার দুই-একটি নিদর্শন

"কাশীপুরের রাজার মেয়ে ছিলে তুমি নন্দিনী—
জয় ভাদুমণি।"

অথবা 'ভীষ্মের শরশয্যা'র

"মরি রে বাপ, কুমার আমার, এ দশা তোর কে করিল?
জানি রে তোর ইচ্ছা-মরণ, শরশয্যা কিসের কারণ,
বিশ্বমাঝে কোন্ পাষণ্ড ভীষ্মজননী নাম ঘুচাল?"

কিংবা সাঁওতাল বালিকাদের

"বাবুদের কলা বাগানে,
ওলো! আমার গোলাপ কাঁটা ফুটেছিল চরণে।"

ইত্যাদি কত গানই তিনি শিশুদের সঙ্গে খেলার ছলে অনেক সময় গাহিতেন।

এলাহাবাদে থাকার সময়ের সম্ভবত ১৮৯৬।৯৭ খ্রিস্টাব্দের যে কয়েকটি গল্প রামানন্দ তাঁর কন্যাদের লিখিয়াছিলেন সেগুলিতে তাঁর রসবোধের পরিচয় মনকে খুশি করে :

"লরেন্সগঞ্জের বাসায় থাকতে প্রতিভারঞ্জন (ইন্দুভূষণ রায়ের পুত্র) আমাদের বাড়িতে থাকত। তাকে উর্দু শেখাবার জন্যে একজন মৌলবি রাখা হয়েছিল। বেতন মাসিক ১ টাকা কি ২ টাকা। তিনি পড়াতে এসে অল্প পড়িয়েই চোখ বুজতেন। কতক্ষণ পরে তন্দ্রা ভাঙবার পর বলতেন, 'বাচ্চা, বহুৎ পঢ় লিয়া।' এই বলিয়া চলিয়া যাইতেন। এই মৌলবি প্রতিভারঞ্জনকে যা বলতেন তাই শুনে শুনে তোমাদের মা উর্দু পড়তে শিখেছিলেন ও কয়েকখানা বই পড়েছিলেন।

"এই বাসাতেই বোধহয় আমাদের চান্‌কা নামে এক চাকর ছিল। ঠিক ক' টাকা বেতন পেত মনে নাই। ৬।৭ টাকার বেশি হবে না। মাইনে পেয়েই সে একদিন পুরী ভেজে ও মাংস রান্না করে খেত ও বলত, 'কা কম্‌তি? পুরী বনায়া কালিয়া বনায়া, এত্‌না রুপেয়া ঘর ভেজা!'

"সাউথ রোডে থাকবার সময় হরদেবীর সহিত তোমাদের মায়ের পরিচয় হয়। হরদেবী মেয়েদের জন্য একটি হিন্দি মাসিক চালাতেন। সেই সম্পর্কে হিন্দি ও বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে তোমাদের মায়ের কখনো কখনো কথাবার্তা চলত। একদিন তিনি বললেন,— 'দেখুন কেমন একটি সুন্দর হিন্দি উপন্যাস বেরিয়েছে!' তোমাদের মা নিজের চেষ্টাতেই হিন্দি পড়তে শিখেছিলেন। তিনি idiomatic হিন্দি বিশুদ্ধ intonation-এর সহিত বলতেও পারতেন। হরদেবীর নিকট থেকে তিনি হিন্দি বইটি নিয়ে দেখলেন, বইটির নাম "শাস্‌ পতোহু" (অর্থাৎ শাশুড়ি ও পুত্রবধূ), লেখকের নাম গোপালরাম। অল্প কয়েক পৃষ্ঠা পড়েই তোমাদের মা বুঝতে পারলেন, যে, বইটি শাস্ত্রী মশায়ের "মেজ বৌ" বহিটির অনুবাদ—যদিও সে কথা কোথাও স্বীকৃত হয় নাই। এই কথা তিনি হরদেবীকে বললেন। হরদেবী কিছু বাংলা জানতেন। তাঁর সম্পাদিত হিন্দি মাসিক কাগজে বাংলা প্রবন্ধ অনুবাদ করে ছাপতেন।

"রোশনলালের বাগানে কলা, সজিনা ও (আহার্য) কচু গাছ অনেক ছিল। আমরা যেমন কলার মোচা ও থোড়, সজিনার ফুল ও শাক এবং কোনো কোনো কচুর শাক খাই, ও দেশের লোকেরা সেরূপ তরকারি খেতে জানে না, অন্তত তখন জানত না।' 'বাঙালিরা গাছের পাতা খায়', হরদেবী বা রোশনলাল তোমাদের মায়ের কাছে এইরূপ শ্লেষ করায় তিনি তাঁদেরই বাগান থেকে ঐ সব জিনিস আনিয়ে রান্না করে তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। খেয়ে হরদেবী বুঝতে পেরেছিলেন, যে, বাঙালিরা অখাদ্য খায় না, ভালো জিনিসই বেছে নিয়ে খেতে জানে।

"সাউথ রোডের ছোটো বাংলোটিতে থাকতে তোমাদের মাকে মিস্‌ ল্যাংলি নাম্নী একটি ইংরেজ বা ফিরিঙ্গি মেয়ে কিছু দিন হার্মোনিয়ম বাজাতে শিখিয়েছিলেন। তোমাদের মা এত শীঘ্র সব শিখে ফেলতেন যে, মেয়েটি কোনো মতেই বিশ্বাস করতে চাইতেন না যে তোমাদের মা আগে কখনো হারমোনিয়ম বাজাতে জানতেন না। তোমাদের মায়ের সুন্দর সুদীর্ঘ চুল দেখে তাঁরও নিজের চুল ঐরূপ হয় এই ইচ্ছা তার হয়েছিল। তোমাদের মা চুলে কী মাখেন জানতে চাওয়ায় তিনি বলেছিলেন, নারকেল তেল। তাতে ঐ মহিলাটি একদিন চুলে চপচপে করে নারকেল তেল মেখে সারারাত জেগে বসে ছিলেন। পরদিন এসে তোমাদের মাকে বলেছিলেন, 'কই আমার চুল তো বাড়ে নি'!"

কায়স্থ পাঠশালা

এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালা কলেজ মুনশি কালীপ্রসাদ কুলভাস্কর নামক হিন্দুস্থানি কায়স্থের কীর্তি। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন শুনিয়াছি। কায়স্থ পাঠশালার জন্য স্বোপার্জিত সমস্ত সম্পত্তি তিনি দান করিয়া যান। সম্পত্তির মূল্য ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। তখনকার দিনে শিক্ষার জন্য এত টাকা দান খুব কম লোকই করিতেন।

সেকালে কায়স্থ কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে একজন ছিলেন বাব ধনেশ প্রসাদ.

একজন বাবু সুরেন্দ্রনাথ দেব ও একজন পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ভট্ট। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন 'হার্ডিং' গণিত অধ্যাপক' ডক্টর গণেশপ্রসাদও সেই সময় কায়স্থ কলেজের অন্যতম গণিত অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি কিছুকাল ঐ কাজ করিয়াছিলেন। প্রিন্সিপ্যাল ছাত্রদের ইংরাজি ও লজিক পড়াইতেন। কলেজের ছাত্রসংখ্যা আশি / নব্বই ছিল।

কায়স্থ পাঠশালা কলেজে রামানন্দ ছাত্রদের শিক্ষার ও চরিত্রের উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ যত্নশীল হন। ছাত্ররা তাঁকে প্রথম হইতেই গভীরভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। এলাহাবাদের অন্যান্য কলেজের প্রিন্সিপ্যাল অপেক্ষা কায়স্থ কলেজের প্রিন্সিপ্যালের যে নানা দিকে শ্রেষ্ঠতা আছে ইহা অন্য কলেজের ছেলেদের নিকট গৌরব করিয়া বলিবার অভ্যাস অনেক ছেলের ছিল। এই বিষয়ে কৌতুককর গল্পও আছে। অন্য কলেজের ছেলেরা তর্কে পরাজিত হইলে কায়স্থ কলেজের ছেলেদের ক্ষ্যাপাইয়া বলিত, "তোমাদের প্রিন্সিপ্যাল এক্কায় চড়েন।" ছেলেরা কাতরভাবে আসিয়া প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে এই অনাচার হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিত।

কায়স্থ কলেজের পূর্বতন ছাত্র যামিনীকান্ত সোম বলেন, "কায়স্থ পাঠশালা তখন ইন্টারমিডিয়েট কলেজ মাত্র। কিন্তু তা হলে কি হয়? এর প্রাধান্য সেখানকার বড়ো দুটি কলেজের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। তিনি আমাদের ইংরাজি সাহিত্য পড়াতেন। সব শেষে তাঁর ক্লাস হত। তাঁর অধ্যাপনা এমন চিত্তাকর্ষক ছিল যে, ক্লাস শুদ্ধ ছেলে তন্ময় হয়ে যেত তাঁর পড়ানো শুনতে শুনতে। এক-একদিন এমন হয়েছে যে, নির্দিষ্ট সময় কখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, সেদিকে কিন্তু কাবো খেয়াল নেই। তাঁব ধীর প্রশান্ত মূর্তি ভক্তির উদ্রেক করত। তিনি ছিলেন অল্পভাষী। তাঁর সামনে কোনো ছাত্রকে কোনো দিন চপলতা করতে দেখা যায় নি।"

কলেজের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দেব পবে লিখিযাছেন, "কায়স্থ কলেজের শিক্ষার ভিত্তি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অধ্যক্ষতায় সুদৃঢ় হয় ও উহা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। স্বদেশ প্রেম, দেশ সেবা ও সুনীতির যে উচ্চ আদর্শ তিনি তাঁহার ছাত্রদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য কেবল উহাবা বা তাঁহার সহকর্মীরাই নহে, অধিকন্তু যুক্তপ্রদেশের অধিবাসীরাও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি অধ্যক্ষ হইবার পর বৎসরই কলেজের পরীক্ষার ফল এত ভালো হয় যে কলেজের প্রেসিডেন্ট মুনশি রামপ্রসাদ রামানন্দবাবুকে এক সেট সেঞ্চুরি ডিকশনারি উপহার দেন।"

কলেজের টাকার অভাব ছিল না। এইজন্য প্রিন্সিপ্যালের ইচ্ছা ছিল কলেজটিকে মনোমতো করিয়া গড়িয়া তোলেন। তিনি চাহিতেন ভালো শিক্ষক, ছোটো ক্লাশ, বড়ো বড়ো ঘর, লাইব্রেরি, ব্যায়ামাগার, ক্রীড়াক্ষেত্র ও ল্যাবরেটারি প্রভৃতি আধুনিক শ্রেষ্ঠ ধরনের করেন। তিনি পাশ্চাত্য বিদ্যালয়ের সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য ব্যবস্থা জানিবার জন্য নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার আনাইতেন। তাদের গবেষণা-গৃহ, ঘরের আসবাব, ছাত্রাবাস, ছেলেদের ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রা প্রভৃতির খবর তন্নতন্ন করিয়া লইতেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল সর্বাঙ্গসুন্দর একটি কলেজ গড়িয়া তোলা। এইজন্য দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্র এবং অন্যান্য কিছু কিছু আসবাব ও যন্ত্রপাতি কেনা আরম্ভ হয়। অনেক সময় রাত্রে তাঁর বাড়িতে দূরবীক্ষণ আনা হইত। তিনি বাড়ির শিশুদেরও মঙ্গল গ্রহ, শনি গ্রহ ইত্যাদি দেখাইতেন।

কলেজের কর্তৃপক্ষ এত আয়োজন পছন্দ করিতেন না। এইজন্য তাঁদের সঙ্গে প্রিন্সিপ্যালের বনিত না। কলেজের কর্তৃপক্ষের মধ্যে মুনশি গোকুলপ্রসাদ নামে একজন অতি

স্থূলকায় ভদ্রলোক ছিলেন, আর একজন ছিলেন (প্রেসিডেন্ট) লালা রামপ্রসাদ। বাবু জঙবিহারী লাল ছিলেন সেক্রেটারি। সে সময় বোধহয় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন পণ্ডিত সুন্দরলাল। পণ্ডিতজি প্রায় ১৫ বৎসর ধরিয়া এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। কলেজ মনের মতো করিয়া গড়িয়া তোলার স্বপ্ন রামানন্দের নানা কারণে সত্য হয় নাই। সে কথা পরে বলিব।

'প্রদীপ'

লেখনী চালনায় ও পত্রিকা সম্পাদনে যাঁর জীবনের প্রায় ৫৫ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল তিনি একটি কাগজ হস্তচ্যুত হইলে কিংবা উঠিয়া গেলে কখনো চুপ করিয়া থাকেন নাই। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রামানন্দ এলাহাবাদ যান। সেখান হইতেই তিনি 'দাসী' সম্পাদনা করিতেন। এখান হইতেও এক বৎসর কাজ করিয়া ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে অর্থাৎ মোট চারি বৎসরের অধিককাল চালাইয়া তিনি 'দাসী'র কাজ ছাড়িয়া দেন মনে হয়। 'দাসী'র এই মাসের টাকাকড়ির হিসাবে আছে, "সম্পাদকের নিকট হইতে গচ্ছিত ফেরত-গ্রহণ—. ফেব্রুয়ারি ৭০ টাকা, এপ্রিল ২০ টাকা।" সেপ্টেম্বরে যে রামানন্দ 'দাসী'র সম্পাদক ছিলেন এবং নভেম্বরে ছিলেন না তাহার অন্য প্রমাণ আছে। সুতরাং যে মাসে টাকা ফেরত দেওয়ার হিসাব দেখি সেই মাসেই তিনি 'দাসী' ছাড়িয়া দেন বোঝা যায়। ইহার পর 'দাসী'র সম্পাদক হন শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র গুহ। বছরখানেকের মধ্যেই রামানন্দ নূতন একটি কাগজ বাহির করিবার আয়োজন করেন। ইতিমধ্যে তিনি অন্যান্য বাংলা ও ইংরাজি কাগজে নিয়মিত লিখিতেন। 'রবীন্দ্রজীবনী'তে আছে :—পূর্ণ চার বৎসর চলিয়া বাংলা ১৩০২ সালের কার্তিক মাস হইতে রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' উঠিয়া যায়। 'দাসী' ১৩০৩-এও রামানন্দের হাতে ছিল।

বাংলা ১৩০৪ সালের পৌষ মাস (১৮৯৭ ডিসেম্বর) হইতে 'প্রদীপ' প্রকাশিত হয়। 'প্রদীপে'র প্রকাশক ছিলেন শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস, হয়তো তিনি স্বত্বাধিকারীও ছিলেন। এ বিষয়ে ঠিক খবর জানিতে পারি নাই। 'প্রদীপ' জ্বলিয়া উঠিয়া বাংলা দেশকে বিস্মিত ও চমকিত করিয়াছিল। তখন 'সাধনা' নির্বাপিত, অন্য কোনো কাগজের এত খ্যাতি নাই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "প্রথম যখন রামানন্দ বাবু 'প্রদীপ' ও পরে 'প্রবাসী' বের করলেন তাঁর কৃতিত্ব ও সাহস দেখে মনে বিস্ময় লাগল। আকারে বড়ো, ছবিতে অলংকৃত, রচনায় বিচিত্র, এমন দামি জিনিস যে বাংলা দেশে চলতে পারে তা বিশ্বাস হয় নি।"

'প্রদীপে'র প্রথম সংখ্যায় সূচনায় সম্পাদক লিখিলেন, "প্রদীপের বিজ্ঞাপন পড়িয়া হয়তো অনেকেই ভাবিয়াছেন—এতগুলি বাংলা মাসিকপত্র থাকিতে আবার একটি কেন? ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, যত প্রকার মাসিকপত্র হইতে পারে, বাঙ্গলায় তৎসমুদয়ই আছে, ইহা বোধহয় কেহই বলিবেন না। 'প্রদীপ'কে আমরা যেরূপ কাগজ করিতে চাই, তদ্রূপ বাঙ্গালা কাগজ একটিও নাই। ইহাই ইহার প্রকাশের কারণ। অবশ্য আমাদের কথার অর্থ এ নয় যে আমরা অশ্রুতপূর্ব একটা কিছু করিব, বা 'প্রদীপ' সর্বোৎকৃষ্ট মাসিকপত্র হইবে, ইহার আলোকে অপরগুলি নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। আমরা কেবল এই বলিতে চাই যে আমরা নিজ ক্ষুদ্র সাধ্যানুসারে সামান্যভাবে নতুন কিছু করিতে চেষ্টা করিব।... সংসারে মানবের অনুশীলনীয় যতগুলি বিষয় আছে, তৎসমুদয়ের তালিকা দিয়া,

সর্ববিষয়ক প্রবন্ধ 'প্রদীপে' থাকিবে লিখিয়া দিলে শুনায় ভালো এবং আড়ম্বরও বেশ হয়। কিন্তু আমরা আড়ম্বরে বিরোধী, সুতরাং এ বিষয়ে প্রচলিত রীতির অনুসরণ করিতে পারিলাম না।..."

নিজের কাজ, নিজের আদর্শ প্রভৃতি সকল বিষয়েই সংযত ও সাবধান হইয়া বলা এবং নিজ যোগ্যতার মূল্য যথাসম্ভব কমাইয়া দেখানোই রামানন্দের বিনয়-নম্র জীবনের একটি বিশেষত্ব ছিল। এ ক্ষেত্রেও তাহা দেখি। 'প্রদীপ'-সম্পাদক রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই নিজ সহজাত বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতেন ও বিশ্বাস করিতেন যে মানবের উন্নতি সর্বাঙ্গীণ হওয়া প্রয়োজন। একটা দিকে ঝোঁক দিয়া আর-একটা বাদ দিলে যাহার উপর ঝোঁক দেওয়া হয় সেটিরও ক্ষতি হয়। কারণ মানুষ জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। একটি কর্মক্ষেত্র অন্য কর্মক্ষেত্রের ফল দ্বারা প্রভাবান্বিত। এইজন্য রামানন্দ ছাত্রাবস্থায় 'ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার' প্রভৃতি কাগজেও শুধু ধর্মকথা লিখিতেন না, পরে 'ধর্মবন্ধুতে'ও 'জাতীয় মহাসমিতি', 'লর্ড লিটন' ইত্যাদি বিষয়ে লিখিতেন। 'দাসী'তেও কাব্য সমালোচনা করিতেন, রমণীদের রাজনৈতিক অধিকারের বিষয় লিখিতেন, 'দানশীলতা ও অর্থনীতি' যে পরস্পরবিরোধী নয় ইহা প্রমাণ করিতেন, ভারতবর্ষের দারিদ্র্য বিষয়ে Statistics-সহ প্রবন্ধ লিখিতেন, ছাত্রদের উন্নতির নানা উপায় বলিতেন, মধুসূদন দত্তের জীবনের ছোটো ছোটো গল্প ছাপিতেন, এবং নারী কর্তৃক যুদ্ধের উচ্ছেদসাধন বিষয়ে টিপ্পনী লিখিতেন। 'দাসী'কে সাধারণের প্রীতিকর করিয়া নানা রকম গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ দিবার প্রস্তাবের পূর্বে যে দেড় বৎসর সম্পাদক প্রায় একলাই ইহার সমস্ত কাজ করিয়াছেন তখনই এই সব তিনি করিয়াছিলেন। পরে ক্রমশ আরো নানা বিষয় এবং নানা লেখক 'দাসী'তে দেখা দিয়াছেন। কিন্তু নিজের যে বহু-বিস্তৃত আদর্শ তাঁর ছিল তার ক্ষেত্র 'দাসী'তে পাওয়া সম্ভব ছিল না। 'প্রদীপে' তিনি সেই পূর্ণাঙ্গ আদর্শের পথে একরকম প্রথম পথিক হইয়াও কতখানি অগ্রসর হইয়াছিলেন ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

'প্রদীপ' পড়িয়া ও তার চেহারা দেখিয়া সেকালের বাংলা কাগজের সহিত 'প্রদীপে'র পার্থক্য কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ করা যায়। 'প্রদীপ' কেবলমাত্র গল্প, কবিতা ও সাহিত্যিক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য বাহির হয় নাই, তাহা ইতিহাস. অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ভূগোল, ভারতীয় সভ্যতা ও তাহার প্রসার, ভাষা-রহস্য, সমালোচনা, ছাত্রসমস্যা, নারী-প্রগতি, মহাজন-জীবনী ইত্যাদি বহু বিষয়ের বিচিত্র রচনায় শোভিত। বহু ক্ষেত্রে রামানন্দের 'প্রদীপ'ই প্রথম নূতন আলোকপাত করিয়াছিল। বাংলা দেশে তখন 'মুকুল' ছাড়া কোনো সচিত্র কাগজ ছিল না মনে হয়। তৎপূর্বে দুই-একখানা ছোটো কাঠখোদাই-এর ছবি দুই-একটা শিশুরঞ্জিনী পত্রিকায় এবং 'তত্ত্ববোধিনী'তে নাম মাত্র দুই-চারিবার প্রকাশিত হইয়াছিল। বহু পূর্বে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' বিলাত হইতে প্রস্তুত ব্লকের সাহায্যে কিছু ছবি ছাপা হয়। কিন্তু 'প্রদীপে'র মতো এরকম নিয়মিত পাতাজোড়া দেশীয় হাফটোন ব্লকের ছবি এবং গল্পে কবিতায় প্রবন্ধে সর্বত্র ছবি কোনো কাগজ তখন কল্পনাও করিতে পারিত না। তখনকার দিনে জীবিত খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবনী সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইত না। পুস্তকরূপে লেখারও বোধহয় চলন ছিল না। 'প্রদীপ'ই এই প্রথা প্রবর্তিত করেন। 'প্রদীপ'-সম্পাদক বাঙালি জাতিকে স্বজাতির গৌরবে গৌরব বোধ করাইতে সংকল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল বাঙালি যাহা পারিয়াছেন, অন্য বাঙালিও তাহার আদর্শ সম্মুখে রাখিলে ক্রমে তাহা কিংবা তদপেক্ষা

মহত্তর কীর্তি করিতে পারিবেন। তা ছাড়া জীবিত মানুষেরও আপনার প্রাপ্য সম্মান এবং সমাদর পাইবার অধিকার আছে, পাইলে আনন্দ ও কর্মোৎসাহ বাড়ে মনে করিয়া তিনি জীবিত কীর্তিমানদেরও জীবনী লিখিতেন। এইজন্য 'প্রদীপে' সম্পাদক স্বয়ং যোদ্ধা প্যারীমোহন, আচার্য জগদীশ, ডা. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, সর্দার দয়াল সিংহ, স্যর সৈয়দ আহম্মদ খাঁ, রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরাঞ্জপে প্রভৃতির চরিত-কথা লেখেন। সম্পাদক স্বয়ং যাঁহাদের কীর্তির কথা লেখেন নাই, এমন জীবিত ও মৃত অনেক খ্যাতিমান পুরুষের বিষয় সুপ্রসিদ্ধ লেখকদের দ্বারা লিখাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে আনন্দমোহন বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেন্দ্রলাল সরকার, দাতা কালীকুমার, দীনবন্ধু মিত্র, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, হাজি মহম্মদ মহসিন, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দীনেশচরণ বসুর জীবনী উল্লেখযোগ্য। বাঙালি এবং অবাঙালির চরিত্র বর্ণনা তো হইতই ; কিন্তু মানুষের চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ প্রয়োজন হইলে তাহার শুধু ঘরের লোকের কথা জানিলেই চলে না, এইজন্য আচার্য ম্যাক্সমূলার, এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, জন স্টুয়ার্ট মিল, টলস্টয় প্রভৃতি বিদেশীয়গণের জীবন-কথাও 'প্রদীপে' আলোচিত হয়। 'দাসী'তে টলস্টয় এবং বহু পাশ্চাত্য গুণীর কথা অবশ্য আগেই প্রকাশিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভার জন্য তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিষয় অনেক রচনা নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইত ; 'দাসী'তেও হইয়াছিল ; কিন্তু সেগুলি বাস্তবিক বঙ্কিমের গ্রন্থ-সমালোচনা। মানুষ বঙ্কিম সম্বন্ধে 'প্রদীপে' চন্দ্রনাথ বসু, কালীনাথ দত্ত প্রভৃতির একাধিক চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। মৃত গুণীদের মধ্যে গরিব-সেবক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কাঙাল হরিনাথ, 'স্বর্ণলতা'-লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির জীবনী রামানন্দ 'দাসী'তে প্রকাশ করেন।

বাঙালির ভীরু 'অপবাদ' 'প্রদীপ'-সম্পাদক সহ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু এই কলঙ্ক দূর করার জন্য বাংলার মাসিকপত্র-জগতে বিশেষ কোনো চেষ্টা সে সময় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সে চেষ্টা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া হওয়া দরকার। এইজন্য 'প্রদীপে'র প্রথম সংখ্যাতেই তিনি বাঙালি বীর "যোদ্ধা প্যারীমোহনে"র জীবনী লেখেন এবং এই সূত্রে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়কে বাঙালির এই অপবাদ দূর করিতে অনুরোধ করেন। 'প্রদীপ'-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন, "বিজয় সিংহ নামক এক বঙ্গদেশীয় রাজকুমার বাহুবলে লঙ্কা অধিকার করেন।... যখন বঙ্গে ইংরেজদিগের প্রভুত্বের সূত্রপাত হইতেছিল তখনও বাঙালিদের ভীরু অপবাদ সর্বত্র ঘোষিত হয় নাই।... ক্লাইভ বাঙালি সৈন্যের সাহায্যে অনেক অদ্ভুত বীরত্বের কাজ করিয়াছিলেন।... ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে বাঙালির ভীরু বলিয়া এত দুর্নাম কেমন করিয়া হইল... তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই।" সম্পাদক বলিতেন, "যুদ্ধই যে বীরত্ব প্রকাশের একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহা নহে।" তবু এই বীরত্বের মূল্য তিনি সামান্য মনে করিতেন না। এইজন্য 'প্রদীপে' কুচবিহারের (সীমান্ত সংগ্রামের) যোদ্ধা মহারাজার ছবি প্রকাশিত হয় এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের 'লাল পল্টন' সম্পাদকের অনুরোধে লিখিত ও ছয় মাস ধরিয়া প্রকাশিত হয়। প্যারীমোহন সম্বন্ধে 'প্রদীপে' আছে :—"তিনি যখন গোরখ্‌পুরে মুন্সেফের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে সিপাহী যুদ্ধের আরম্ভ হয়। তখন তাঁহার বয়স ২২।২৩ বৎসর মাত্র। এই সময়ে তিনি এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত সঞ্জনপুর নামক স্থানে বদলী হন। সেখানে কয়েকজন ইংরেজদ্বেষী জমিদার বিদ্রোহী হইয়া গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সমর-সজ্জা করে। তাহারা কয়েকটি গ্রাম লুট করিয়া জ্বালাইয়া দেয়,

এবং আরো নানাপ্রকার অত্যাচার করে। প্যারীবাবু তাহাদের অসদাচরণ গবর্নমেন্টের গোচর করিয়া শাসনকর্তাদিগের নিকট বিদ্রোহ দমনার্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু এলাহাবাদস্থ রাজকীয় কর্মচারিগণ তাঁহাকে কোনো প্রকার সাহায্য প্রেরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে যে কোনো প্রকারে হউক তাঁহার তহশীলে শান্তি স্থাপন করিতে পরামর্শ দেন।... তিনি বিদ্রোহিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন।... প্যারীমোহন যুদ্ধে জয়লাভ করেন।"

এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালার নিকটে এই যোদ্ধা প্যারীমোহনের বড়ো বাড়ি ছিল। আমরা শৈশবে দেখিয়াছি। ইনি উত্তরপাড়ার লোক। ইঁহার বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার সময় রামানন্দ বাঙালিদেব বিষয়ে হিবরের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বাঙালির বীরত্ব-কথা অক্ষয়কুমারকে লিখিতে অনুরোধ করেন। 'লাল পল্টনের' আরম্ভে অক্ষয়কুমার লিখিতেছেন,

> "বাঙালির ইতিহাস নাই। সেই জন্য বাঙালির বাহুবলের পরিচয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সচরাচর প্রচলিত ইতিহাসে ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া বাঙালির ললাটে যে কলঙ্করেখা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই জনসমাজে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা বাঙালির কলঙ্ক রটনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাবা কোনোরূপ প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। পরনিন্দা স্বভাবতই নিতান্ত মুখরোচক, বোধহয় সেই জন্যই লোকে তাঁহাদের কথা বিনা প্রমাণে গলাধঃকরণ কবিযা আসিতেছে।"

অক্ষয়কুমার ছয় মাস ধরিযা দেখাইয়াছেন যে বাঙালিরা স্থলযুদ্ধে এবং জলযুদ্ধে বাহুবলের পরিচয় দিয়াছিলেন। ইংরাজ রাজশক্তি বিস্তারে 'Clive's Red Coats' অথবা লাল কুর্তিওয়ালারা সহায়তা করিয়াছিল ; মুষ্টিমেয় গোরার চতুর্দিকে ইহাবাই বীববিক্রমে লড়িয়াছিল এবং প্রাণ দিয়াছিল। ইহারা ছিল বাঙালি। অন্তত তখন ঐতিহাসিকেরা তাহাই বলিয়াছিলেন।

'প্রদীপে' আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এই প্রথম জীবনী লিখিবার সময় 'প্রদীপ'-সম্পাদক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি যে নানা বিষয়ে সফলকাম হইয়াছেন, (স্বাভাবিক প্রতিভা বা বুদ্ধির কথা ছাড়িয়া দিয়া) তাহা কোন্ মূলমন্ত্রের অনুসরণ করিয়া হইয়াছেন মনে করেন?"

উত্তরে আশুতোষ বলেন, "এ প্রশ্নেব উত্তর দেওয়া বড়ো কঠিন। যদি আমার ভ্রম না হয় তাহা হইলে, সুপ্রণালী মতে কাজ কবিবার অভ্যাস, অধ্যবসায়, কোনো কঠিন প্রশ্ন বা সমস্যা অসমাহিত বা অমীমাংসিত রাখিব না, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং আন্তরিক সত্য-জিজ্ঞাসাই আমার ইষ্ট সিদ্ধির মূল কারণ বলিয়া বোধ হয়। আমার শৈশব হইতেই আমার পিতা এই সকল গুণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আমার মনে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন।"

ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারেব জীবনী যোগীন্দ্রনাথ বসু-লিখিত। তাঁহার কয়েকটি প্রশ্নোত্তর এখনকার লোকেরও কৌতূহল উদ্রেক করিবে। যোগীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেন,

> "বর্তমান যুগের বাঙালির মধ্যে আপনাব মতে সর্বশ্রেষ্ঠ কে?"
>
> মহেন্দ্র সরকার : "রাজা রামমোহন রায়। তাঁহার নিম্নে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।"
>
> প্রশ্ন : বাংলা গ্রন্থের মধ্যে আপনার সর্বাপেক্ষা প্রিয় কি?"
>
> উত্তর : "বঙ্কিমের উপন্যাস ও মাইকেলেব মেঘনাদবধ পড়িয়াছি, মন্দ নয়। কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের মতো কিছুই ভালো বোধহয় না।"
>
> মহেন্দ্রলাল সরকার বলেন,—"সাকার বা পৌত্তলিক উপাসনার দ্বারা পৃথিবীর, বিশেষত ভারতবর্ষের, যে কি ঘোরতর অনিষ্ট হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিতে পারা যায় না। মহম্মদ পৌত্তলিকতার উচ্ছেদের জন্য তাদৃশ চেষ্টা কবিয়াছিলেন বলিয়াই,... আমি তাঁহাকে এত সম্মান ও শ্রদ্ধা করি।"

'দাসী' উঠিয়া যাইবার দুই বৎসরেরও আগেই 'সাধনা' উঠিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ 'প্রদীপে'র নিয়মিত পাঠক এবং নিয়মিত না হইলেও লেখক ছিলেন। তিনি স্বয়ং তখন এক বৎসর 'ভারতী'র সম্পাদনার ভার লইয়াছিলেন। রামানন্দ জগদীশচন্দ্রের জীবনী লিখিয়া 'প্রদীপে' প্রকাশিত করিবার সময় রবীন্দ্রনাথের 'বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিম মন্দিরে' ইত্যাদি কবিতাটি তাহারই পাশে মুদ্রিত করেন। 'প্রদীপে'র প্রথম বর্ষে (১৩০৪-০৫) রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি বিখ্যাত কবিতা প্রকাশিত হয়। "সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে," "আজি কি তোমার মধুর মুরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে," "তোমার মাঠের মাঝে, তব নদী তীরে," "ভালোবেসে সখি নিভৃত যতনে আমার নামটি লিখিয়ো" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিতা যে প্রথম 'প্রদীপে'র আলোকে বাঙালির চোখে ধরা পড়ে তাহা অনেকেই আজ জানেন না। দ্বিতীয় বর্ষের (১৩০৫-০৬) 'প্রদীপে' রবীন্দ্রনাথ স্মাত্রের 'মন্দিরাভিমুখে' নামক মূর্তির বিষয় একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন এবং বলেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত রচনাবলী সমাপ্ত করিয়া 'প্রদীপে' প্রকাশ করেন। বলেন্দ্রনাথ 'প্রদীপে' লেখাগুলি দিবেন বলিয়া 'প্রদীপ'-সম্পাদকের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর জন্য সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ রচনাগুলি সমাপ্ত করিয়া পাঠাইবার সময় লেখেন "বলেন্দ্রনাথকে 'প্রদীপ'-সম্পাদকের নিকট ঋণমুক্ত করিলাম।"

সম্ভবত তৃতীয় বৎসরের 'প্রদীপ' বিষয়ে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে লিখিয়াছিলেন, "কই? প্রদীপ তো আমার হস্তগত হয়নি। তুমি কি গীতিকার সমালোচনা করেছ? দেখবার জন্য উৎসুক রইলুম— কিন্তু পূজার ছুটি উত্তীর্ণ না হলে পাব বলে আশা করচিনে। প্রদীপে কি তোমার রাস্কিনের উপসংহারটা বেরিয়েছে?" পরে ঐ মাসেই লিখিতেছেন, "আজ এইমাত্র প্রদীপ পাওয়া গেল কিন্তু এখনো পড়িনি।" বোঝা যায় 'প্রদীপে'র সঙ্গে তাঁর তিন-চার বৎসরই যোগ ছিল।

'প্রদীপে'র প্রথম বৎসরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ আছে। তাহাতে রাজা রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে এই-জাতীয় কথা আছে, "ভারতবর্ষে রাজা রামমোহনকে কুলায় নাই। তিনি উপছাইয়া পড়িয়াছিলেন, বাংলা দেশে ঈশ্বরচন্দ্রকে কুলায় নাই। তিনি উপছাইয়া পড়িয়াছিলেন।" হুবহু ভাষা মনে নাই। সম্ভবত এই সংখ্যা 'প্রদীপ' পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে লেখেন,

> "আমি ইতিপূর্বেই প্রদীপের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতা লইয়া অভিনন্দনজ্ঞাপন পূর্বক আপনাকে পত্র লিখিব স্থির করিয়াছিলাম। উহার প্রত্যেক গদ্য প্রবন্ধই সুপাঠ্য হইয়াছে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের [ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর] প্রবন্ধটি সুগম্ভীর চিন্তাপূর্ণ— পাঠ করিয়া যথার্থ উপকার পাইলাম বলিয়া ধারণা হয়। নগেন্দ্র গুপ্ত বাবুর গল্পটি অত্যন্ত মনোরম হইয়াছে। ইহার মধ্যে তাঁহার অসামান্য ভাষা-নৈপুণ্য এবং প্রতিভা স্ফূর্তি পাইয়াছে। সর্বশুদ্ধ বলিতে পারি... প্রদীপের মতো এমন একখণ্ড বাংলা সাময়িক পত্র ইতিপূর্বে আমার হস্তগত হয় নাই।" (চিঠিপত্র ১২)

রবীন্দ্রনাথের ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী এবং ভাগিনেয়ী সরলা দেবীও 'প্রদীপে'র লেখিকা ছিলেন। সম্ভবত এই সময় কিংবা ইহারই কিছু পরে রামানন্দ 'ভারতী'তে সম্পাদিকাদের অনুরোধে মাঝে মাঝে লিখিতেন।

রামানন্দ 'দাসী'র সম্পাদকতা ছাড়িয়া দিবার পর 'দাসী'তে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় 'চৈতালি'র একটি সমালোচনা করেন। ইতিমধ্যে 'দাসী' উঠিয়া যায়। তখন শ্রীযুক্ত

রমণীমোহন ঘোষ এই সমালোচনার সমালোচনা 'প্রদীপে' ছাপেন। 'প্রদীপ'-সম্পাদক বলেন, "এক কাগজের প্রবন্ধের প্রতিবাদ আর এক কাগজে ছাপার কথা নয়।" কিন্তু 'দাসী' উঠিয়া যাওয়াতে এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি 'প্রদীপে'র বিশেষ অনুরাগ থাকাতে তিনি এই প্রতিবাদ 'প্রদীপে' প্রকাশ করেন। সেকালে রবিভক্ত ও রবি-বিরোধী দলে হাতাহাতি হওয়া এবং কাগজে অভদ্র ভাষায় পরস্পরকে আক্রমণ করার চলন ছিল। 'সাহিত্য' প্রভৃতি রবি-বিরোধী কাগজেই ইহার ঘটা বেশি ছিল। একজন রবিভক্ত উৎসাহের আধিক্যে এই রকম একটি লেখা 'প্রদীপে' প্রকাশ করিতে পাঠান। সম্পাদক এলাহাবাদে থাকিতেন, তাঁহাকে না জানাইয়াই কবিতাটি ছাপা শুরু হয়। সম্পাদক পরে খবর পাইলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং রবিভক্ত হইলেও এই অভদ্রতার প্রশ্রয় দিতে পারিলেন না। তিনি ছিলেন সৌজন্য ও ভদ্রতার মূর্তিমান রূপ। টেলিগ্রাম করিয়া কবিতাটি ছাপিতে বারণ করিলেন। কাগজ ছাপা হইয়া গিয়াছিল। কাজেই কবিতার উপর অন্য ছাপা কাগজ মারিয়া তাহা চাপা দেওয়া হইল। কিন্তু অন্য দলের লোকেরা কাগজটা তুলিয়া ঝগড়া জমাইয়া তুলিল। এই ঘটনাতে সম্পাদক এমনই বিরক্ত ও বিচলিত হইলেন যে, প্রধানত এই সব কারণেই তিনি 'প্রদীপ' ছাড়িয়া দিলেন। তৃতীয় বর্ষের (১৩০৬) দ্বিতীয় মাস মাঘ পর্যন্ত তিনি প্রদীপের সম্পাদক ছিলেন। ১৩০৬ সালের ফাল্গুন মাসের 'প্রদীপে' শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদকের নিবেদনে লিখিয়াছেন,

> "শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রদীপের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিদেশে বাসবশত সম্পাদকের যে অসুবিধা তাহা তিনি অনেক দিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন। আনুষঙ্গিক আরো কতকগুলি অসুবিধা ঘটিয়াছিল..."

আবার সম্পাদক পরিবর্তন হইল ১৩০৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। প্রকাশিত হইল,

> "কয়েকজন সাহিত্যানুরাগী লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক লইয়া প্রদীপ-পরিষদ গঠিত হইল। এখন হইতে প্রদীপ সম্পাদনভার এই পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইল।"

সম্ভবত 'প্রদীপে'র প্রথম কার্যাধ্যক্ষ বৈকুণ্ঠনাথ দাসই শেষে সম্পাদক হন। ক্রমে 'প্রদীপ' নিভিয়া গেল।

যে দুই বৎসর কয়েক মাস রামানন্দ 'প্রদীপে'র সম্পাদক ছিলেন তাহার মধ্যেই 'প্রদীপে'র গ্রাহকসংখ্যা ৩০০০ হইয়াছিল। বাংলা দেশের সকল লাইব্রেরি ও শিক্ষিত সমাজে 'প্রদীপে'র সমাদর ছিল। বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক পণ্ডিত সংস্কারক এবং নানাদিকের অগ্রদূতেরাই 'প্রদীপে'র লেখক ছিলেন। ঔপন্যাসিক ও রাজনৈতিক লেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুলেখক প্রভাত মুখোপাধ্যায়, শৈলেশ মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, দীনেশচন্দ্র সেন, পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায়, অধ্যাপক অপূর্ব দত্ত, সুপণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ, সুকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ রায় চৌধুরী, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রজনী গুপ্ত, নিখিলনাথ রায়, সুলেখক ও চিন্তাশীল সংস্কারক শিবনাথ শাস্ত্রী—কত জনের নাম করিব?

এ যুগে অনেক বাঙালি বালী জাভায় গিয়া সেখানে ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, ক্রমে এইসব ভারতীয় উপনিবেশ বিষয়ে লেখা সহজ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু সেকালে বালীদ্বীপের হিন্দু রাজ্যের বিষয় কয়জন খোঁজ রাখিত? কিন্তু তবুও ৪৫।৪৬ বৎসর পূর্বে 'প্রদীপে' 'বালীদ্বীপের হিন্দুরাজ্য' বিষয়ে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সচিত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 'হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা' প্রবন্ধে অক্ষয় মৈত্রেয় বালী, জাভা, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতির প্রমাণ দিয়া এবং বরবুদোর মন্দিরাদির ছবি দিয়া দেখাইয়াছেন যে পুরাকালে সমুদ্রযাত্রা

নিষিদ্ধ ছিল না। যবদ্বীপের শিবমূর্তি, বুদ্ধ, বুদ্ধমূর্তির নীচে খোদিত শিলালিপি প্রভৃতির ছবিও এই সকল প্রবন্ধে আছে। অনেক সময়ই এই-জাতীয় প্রবন্ধ সম্পাদকের বিশেষ অনুরোধে লেখা হইত। তাহার প্রমাণ ২।৩ জন পুরাতন লেখকের কথায় পাওয়া যায়। অক্ষয়বাবুকে বিশপ হিবরের উক্তি তুলিয়া দিয়া 'লাল পল্টন' তিনিই লেখাইয়াছিলেন, 'প্রদীপে'ই প্রমাণ আছে। মৌখিক সাক্ষ্যও কোনো কোনো জীবিত লেখক দিয়াছেন। অনেক খ্যাতনামা লেখকের লেখায় অসম্পূর্ণতা দেখিলেও সম্পাদক লেখককে দিয়া তা সম্পূর্ণ করাইয়া লইতেন। অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন :

> 'প্রথম বর্ষের প্রদীপে আমি 'পরজীবী' নামে এক প্রবন্ধ লিখেছিলাম। প্রদীপের সম্পাদক, এলাহাবাদে থাকতেন। তিনি প্রবন্ধ পেয়ে পড়ে আমায় লিখেছিলেন আমি একটা বিষয় ছেড়ে গেছি। সেটা জুড়ে দিলে প্রবন্ধটা সম্পূর্ণ হয়। বাস্তবিক আমি পরস্পর-জীবীর উল্লেখ করিনি। আমি সাধারণ পাঠকের নিমিত্ত সামান্যভাবে লিখেছিলাম। তিনি এ বিষয়ে জানেন দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম। প্রবন্ধটি ফেরৎ এলে পরস্পর-জীবী সম্বন্ধে কিছু লিখে পাঠিয়েছিলাম, ছাপা হয়েছিল।"

ভারতবর্ষের সমস্যা প্রধানত অন্নহীনের সমস্যা, দরিদ্রের সমস্যা, এই মূল কথাটি অনেকে ভুলিলেও 'প্রদীপ'-সম্পাদক বাল্যকাল হইতে কখনো ভুলেন নাই। দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও রোগ ভারতকে ছারখার করিয়া দিতেছে, জন্মভূমি দরিদ্র বাঁকুড়ায় থাকিতে সে দৃশ্য তিনি শৈশব হইতেই দেখিয়াছেন। তাই 'প্রদীপে'র প্রথম প্রবন্ধ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের 'মরিব কি বাঁচিব ? বা শস্য ও স্বাস্থ্য'। "আমরা মরিতেছি, ক্ষুধায়, রোগে, মামলায়, কুশিক্ষায়, পাপে...", আজ ৪৭ বৎসর পরেও আমাদের দেশে অন্নকষ্ট দূর তো হয়ই নাই, বরং বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'দাসী' ও 'প্রদীপ' সম্পাদক যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'প্রবাসী'-সম্পাদক শেষদিন পর্যন্ত দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধে লড়িয়া গিয়াছেন। বিধাতা কবে তাঁহার জীবনব্যাপী সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিবেন জানি না। তখনকার দিনে বাংলা সাময়িক কিংবা দৈনিক পত্রে এই সব জীবন-মরণ সমস্যার আলোচনা বিশেষ হইত না। তাই জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় লিখিয়াছিলেন,

> "এই বৎসরের নবেম্বর মাসের Indian Medical Gazette-এ ম্যালেরিয়া জ্বর সম্বন্ধে একজন ইংরাজ ডাক্তার একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইংরাজি অন্য সারবান্ সাময়িক পত্রে এবং দৈনিক সংবাদপত্রেও তাহার আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলা সাময়িক পত্রে ও সংবাদপত্রে ঐ বিষয়ের আলোচনা বা উল্লেখ না হওয়াই অধিক সম্ভব। যে সকল বিষয় আলোচনা করিলে দেশের লোকের প্রত্যক্ষ উপকার হইতে পারে, যে সকল বিষয় লিখিলে অনেক লোক বুঝিতে পারে, অনেক লোকের উপকার হয়, তাহা লিখিতে অধিকাংশ বাঙালি লেখকের পক্ষে কোনো নিষেধ আছে। এ কথাটি আমি দুঃখে লিখিলাম। তবে বলা আবশ্যক কোনো কোনো বাঙালি লেখক এই সকল প্রত্যক্ষ হিতকর বিষয় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।"

এই প্রবন্ধে তিনি শস্যের অভাব, বিদেশি বস্ত্র ও স্বাস্থ্যহীনতার বিষয় লিখিয়াছিলেন স্বদেশী যুগের ৮।৯ বৎসর পূর্বে।

জ্ঞানেন্দ্রলাল চিন্তাশীল লেখক ছিলেন। তিনি রাজনীতি অর্থনীতি, সমাজনীতি সকল বিষয়েই আলোচনা করিতেন। 'প্রদীপে' ইনি 'রাজদ্রোহ আইন ও সমাজনীতি' বিষয়ে লিখিয়াছিলেন :

> "লেখকগণ মনে করিতেছেন যে বাক্-লিপি স্বাধীনতার সূর্য অস্ত যাইল, নৈরাশ্যের রজনী

সমাগত হইল। দেখা যাউক 'এই রজনীর অন্ধকার দূর করিবার নিমিত্ত কোনো চন্দ্রমা উদিত হইতে পারে কি না।... দেশিয় নেতৃগণ বিদ্রোহের আইন শাসনে হতাশ্বাস না হইয়া রাজনীতির যে রাজনীতি, হৃদয়ের যে রাজনীতি, বিবেকের যে রাজনীতি, তাহার প্রতি লক্ষ্য করুন।'... সত্য সাহস সাধুতা ও পরোপকার সেই রাজ্যের ভিত্তি এবং ঈশ্বরের আদেশ সেই রাজ্যের একমাত্র শাসন।"

এই-জাতীয় অধিকাংশ লেখাই সম্পাদকের দ্বারা অনুপ্রাণিত বলিয়া মনে হয়।

'প্রদীপে' যে রাজনীতি একেবারেই আলোচিত হইত না তাহা নয়, তবে বিশদভাবে হইত না। লর্ড এলগিন সম্বন্ধে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বোধহয় দ্বিতীয় বৎসরে লিখিয়াছিলেন :

"পাঁচ বৎসর লাটগিরি করিয়া তিনি কোনো শ্রেণীর লোককে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। কোনো কর্মে দূরদর্শিতা বা বিচক্ষণতা প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার দ্বারা যে ক্ষতি অনিষ্ট হইয়াছে তাহা সহজে বিস্মৃত হওয়া যায় না।"

সাময়িক নানা বিষয়ে নগেন্দ্রবাবু ও জ্ঞানেন্দ্রবাবু লিখিতেন। জ্ঞানেন্দ্রলাল ছিলেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি 'নব্যভারত' প্রভৃতি অন্যান্য কাগজেরও লেখক ছিলেন। তাঁহার 'প্রবন্ধ লহরী' পুস্তক বিষয়ে 'নব্যভারতে' লেখা হয় :

'জ্ঞানেন্দ্র বাবুর লেখনী ফাটিয়া যেন রক্ত স্রোত—দুঃখ স্রোত বহিতেছে,—তাঁহার হৃদয় যেন কেবল দেশের জন্য কাঁদিতেছে।... ইহাঁর প্রতি কথায় স্বদেশানুরাগ, প্রতি তরঙ্গে প্রতিভাস্ফুরণ।"

ইনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ছিলেন। বাংলা ১৩০৪ সালের পৌষ মাসে জ্ঞানেন্দ্রলাল 'প্রদীপে' দেখাইতেছেন ভারতের শস্য সম্বন্ধে ইংরাজদের দুইটি সিদ্ধান্ত : ১। শস্য অধিক বলিয়া বেশিটা বিদেশে চালান দেওয়া হয়। ২। ভারতের লোকসংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িতেছে, শস্য সেরূপ বাড়িতে পারে না। দুটি থিওরি পরস্পর-বিরোধী। তিনি বলিতেছেন অন্নাভাব দূব করার জন্য পতিত জমি আবাদ করা, শিল্পের ও গো-জাতির উন্নতি করা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দূর করা প্রয়োজন। হায় আজও সেই এক কথা!

তখনও 'প্রদীপে' জ্ঞানেন্দ্রলাল বলিতেছেন,

"দেশিয় সংবাদপত্রগণ বলিতেছেন যে, রাজদ্রোহের নূতন আইনের শাসনে তাঁহারা নির্ভয়ে রাজনীতির কথা আর লিখিতে পারিবেন না... বস্তুতঃ রাজনীতি ছাড়িয়াও স্বদেশভক্ত নেতাদিগের চিন্তা করিবার অনেক বিষয় রহিয়াছে।"

কার্জনের দমননীতির ছায়া ঘনাইয়া আসার পূর্বে 'প্রদীপে'র এ আলোকপাত স্মরণীয়।

সম্পাদক আজীবন শিল্পানুরাগী ছিলেন এবং ছবি ছাপানোর কাজে তাঁকে অনেক রকমে মাথা খাটাইতে হইত বলিয়া বাংলা দেশে হাফটোন প্রণালীর চলন শুরু হওয়ায় তিনি খুবই খুশি হইয়াছিলেন। তিনি উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের দ্বারা 'প্রদীপে' হাফটোন বিষয়ে প্রবন্ধ লেখান। এ বিষয়ে আগে কোনো বাংলা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই।

আধুনিক যুগে সরকারি মুসলমান-প্রীতির ফলে যিনি হিন্দুর স্বার্থরক্ষার জন্য মুসলমান রাজনৈতিকদের সহিত অনেক লড়িয়াছেন, তিনি যে শৈশবে ও বাল্যে মুসলমান সহপাঠীদের প্রিয় বন্ধু ছিলেন এবং যৌবনে ন্যায়ধর্মের অনুরাগী বলিয়া মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার দিতে বহু ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন তাহা অনেকে জানে না। ১৩০৫-এর কার্তিকের 'প্রদীপে' একটি বাংলা পাঠ্য পুস্তক সমালোচনাকালে তিনি লেখেন, "সমালোচ্য পুস্তকখানির এবং বাঙ্গালা প্রায় সমুদায় বিদ্যালয়-পাঠ্য সাহিত্যে পুস্তকের একটি অসম্পূর্ণতার উল্লেখ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। তাহা এই যে, গ্রন্থকারগণ প্রায়ই ভুলিয়া যান যে বাঙ্গালা দেশে হিন্দু ব্যতীত অপর

ধর্মাবলম্বী লোকও বাস করে। বাঙ্গালা তাহাদেরও মাতৃভাষা। বাঙ্গালা সাহিত্যে পুস্তকে রাখাল কি যাদব যে সুশীল বা দুরন্ত বালক, ইহাই প্রায় দেখিতে পাই। আবদুল বা মামুদ নামক বালকও বাংলা দেশে আছে, এবং সেও যে বাঙ্গালা বহি পড়ে, সেও যে ভালো কি মন্দ হইতে পারে, উহার উল্লেখ কেহ করেন না কেন? কাব্য বা ইতিহাস হইতে মহৎ চরিত বর্ণনা করিবার সময়... আজকাল হিন্দু আদর্শ পুরুষগণেরই উল্লেখ অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।... কিন্তু মুসলমান সাধু-আত্মাদের প্রায়ই বাদ দেওয়া হয় কেন?" মনে রাখিতে হইবে যে এই লেখা বাংলা ১৩০৫ সালে অর্থাৎ ৪৬ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত।

ইহার ১২।১৩ বৎসর পরে কলিকাতা মির্জাপুর স্ট্রিটে মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি বিদ্যালয় গৃহে মুসলমানদের মধ্যে বাংলা ভাষার চর্চা বাড়াইবার জন্য একটি সভা হয়। মফস্সল হইতে অনেক শিক্ষিত মুসলমান আসিয়া সভায় যোগ দিয়াছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি ছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন। একজন মুসলমান বলিয়াছিলেন, হিন্দুদের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ আছে, মুসলমানদের সেইরূপ কোনো পরিষৎ নাই। রামানন্দ অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন, "সাহিত্য-পরিষদকে কেবল হিন্দু সমিতি মনে করা ভুল, বাংলা যাহাদের মাতৃভাষা, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে তাহাদের সকলেরই পরিষদে দাবী আছে।" বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পরিষৎ বোধহয় ইহার পরে গঠিত হইয়া দীর্ঘকাল কাজ করিয়া আসিতেছে।

আরও কয়েক বৎসর পরে 'প্রবাসী'র একজন সহকারী সম্পাদককে তিনি বলেন, "মুসলমানদের যদি ভালো লেখা থাকে, বিশেষত মেয়েদের, তাহলে সেগুলি হিন্দুদের লেখার চেয়ে একটু নিকৃষ্ট হলেও সেগুলিকেই আগে ছাপিও, কারণ বাংলা ভাষার চর্চায় তাদের বেশি উৎসাহ দেওয়া দরকার।"

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি পণ্ডিতের মতে প্রবন্ধ-গৌরবে প্রথম-বর্ষের 'প্রদীপ' বর্তমানে প্রচারিত বার-মাসিক পুস্তকগুলির সমকক্ষ. বরং উপরে উঠিয়াছিল। সম্পাদক স্বয়ং যে শুধু ভারতপ্রসিদ্ধ পুরুষদের জীবনী লিখিতেন এবং লেখার প্রবর্তন করিয়াছিলেন তা নয়, তিনি বাংলা ভাষার বিশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তকের প্রবন্ধাকারে বিস্তৃত সমালোচনা লেখারও অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত সিরাজদ্দৌলার সমালোচনা উল্লেখযোগ্য। ইহা শুধু যে প্রবন্ধ হিসাবে উৎকৃষ্ট তাহা নয়, ইহাই সম্ভবত 'সিরাজদ্দৌলা'র প্রথম বিস্তৃত সমালোচনা। 'প্রদীপে' এই সমালোচনা ১৩০৪ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়। 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ১৩০৫-এ ইহার সমালোচনা করেন। রামানন্দের সমালোচনাতে তাঁহার নদীর স্রোতের মতো সরল সুন্দর ও গতিশীল ভাষা দেখিয়াও মুগ্ধ হইতে হয় :—"বাস্তবিক সিরাজের জীবন একটি বিষাদান্ত নাটক। বৈশাখ মাসে প্রভাত সমীরণ কেমন সুখসেব্য, উষার দৃশ্য কেমন রমণীয়। মধ্যাহ্ন কিন্তু রৌদ্রতাপদগ্ধ অশান্তিপূর্ণ। আবার অনেক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঝড় উঠিয়া নাবিকগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে ; বায়ুভরে অনেক ক্ষুদ্র তরণী জলমগ্ন হয়। যে-দিনের প্রভাত দেখিয়া মনে হইয়াছিল, বুঝি বা ইহা বিলাসীর বিলাস লালসা চরিতার্থ করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার এ কি ভীষণ শোচনীয় পরিণাম! সিরাজের জীবন এমনই একটি বৈশাখী দিন। সত্য বটে প্রভাত বায়ুর পবিত্রতা তাঁহার বাল্যেও ছিল কি না সন্দেহ, কিন্তু তাঁহার মাতামহের স্নেহ প্রাতঃসমীরণের মতই স্নিগ্ধ ছিল।"

বাঙালির বীরত্বের নিদর্শন কোথাও দেখিলে রামানন্দ তাহা উল্লেখ করিতে ভুলিতেন

না। এখানে লিখিতেছেন, "প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, তৎকালে দেশে বাঙ্গালি সৈনিক ও সেনাপতি, শাসনকর্তা রাজনীতি বিশারদের অভাব ছিল না। বাঙ্গালির এখন আর যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। এখন শোণিত-বিহীন যুদ্ধের সময়। কিন্তু বাঙ্গালির ভীরুতাপবাদ দূর হইলে বাঙ্গালি যে অদূরবর্তী অতীতে শৌর্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, এই বিশ্বাস জন্মিলে, আমাদের জাতীয় প্রতিভা নূতন স্ফূর্তির সহিত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।" দেখা যাইতেছে ৪৭ বৎসর পূর্বে রামানন্দ বাঙালির শোণিত-বিহীন যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলিতেছেন।

কাব্যে বর্ণিত অনেক কথা ইতিহাস-বিরুদ্ধ থাকে। সেই বিষয়ে সমালোচক এমন দক্ষতার সহিত ইংরাজি ও বাংলা নানা গ্রন্থকার ও ঐতিহাসিকের সাক্ষ্য দিয়া সত্য নিষ্ঠার সমর্থন করিয়াছেন যে তাহা দেখাইতে হইলে সমস্ত প্রবন্ধটি তুলিয়া দিতে হয়। তিনি 'পলাশীর যুদ্ধে' কিংবা বঙ্কিমের উপন্যাসাদিতে যে ইতিহাস-বিরুদ্ধ কাহিনী আছে তাহার সমর্থন করেন নাই।

দ্বিতীয় বৎসরের 'প্রদীপে' রামানন্দ দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যে'র সমালোচনা করিয়াছিলেন। কতকগুলি শব্দকে দীনেশবাবু অপ্রচলিত বলিয়াছিলেন এবং কতকগুলি পুরাতন শব্দের অর্থও ধরিতে পারেন নাই। 'প্রদীপ'-সম্পাদক দেখাইয়াছিলেন, যে, বাঁকুড়ায় সে সকল শব্দ কোনো কোনো অর্থে প্রচলিত আছে। তিনি হটন সাহেবের বাংলা-ইংরাজি অভিধানেও যে ওই অর্থ আছে তাহা উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছিলেন। এই উপলক্ষেই তিনি বলিয়াছিলেন, "একজন ইংরাজ ৬৬ বৎসর পূর্বে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে যাহা করিয়া গিয়াছেন, আমরা এখনও তাহা করিতে পারি নাই ; ইহাতেই বাঙালি ও ইংরাজের প্রভেদ বুঝা যায়।—দীনেশবাবু যে সকল অপ্রচলিত শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কোনো কোনোটি এখনও বাঁকুড়া অঞ্চলে প্রচলিত আছে। আমরা একবার 'দাসী'তে প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সচরাচর কথিত শব্দের অর্থসংবলিত এক-একটি তালিকা প্রস্তুত হইলে বড়ো ভালো হয়। তাহা হইলে অনেক তথাকথিত অপ্রচলিত শব্দ আর অপ্রচলিত বলিয়া বোধহয় না, এবং বঙ্গসাহিত্যের শব্দ-দারিদ্র্যও দূর হয়। ইহাতে আরো এক লাভ হয় যে অনেক সময় নূতন কথার সৃষ্টি করিতে হয় না। তদ্ভিন্ন চাষাভূষার কথা সাহিত্যে অধিক প্রচলিত হইলে উহা জনসাধারণের প্রেমের দৃঢ় ও প্রশস্ত ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়, এবং উহা বাঙালির প্রাণের কথা মর্মের কথা ভালো করিয়া বলিবার ক্ষমতা লাভ করে।"

আজকাল সাহিত্যে চাষাভূষার ভাষা চালাইবার একটা চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু ৫০ বৎসর পূর্বে 'দাসী'র সম্পাদক যে প্রস্তাবটি করিয়াছিলেন সে কথা অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'অন্ধ লিপিমালা' প্রবর্তন যেমন অন্যের নামে চলে, তেমনই তাঁহার এই প্রস্তাবও হয়তো অন্যের নামেই চলিয়াছে। তিনি আত্মযশ প্রচারের চেষ্টায় উদ্‌যোগী ছিলেন না ; তাই এ সকলে আপত্তি করেন নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় নানা জেলার এইরূপ শব্দের তালিকা বোধহয় আজও তৈয়ারি হয় নাই। 'চলন্তিকা' প্রভৃতিতে কিছু শব্দ আছে, কিন্তু তাহা সব জেলার নয়। নূতন যে-সব অভিধান-জাতীয় পুস্তক বাহির হইতেছে তাহাতে কী আছে অবশ্য জানি না। ১৩৪৯ বাংলা সালে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রকাশ প্রসঙ্গে একটি প্রাদেশিক শব্দের অভিধান রচনার কথা ওঠে। তখন রামানন্দ বলেন, "আমরা অনেক বৎসর আগে প্রাদেশিক অভিধান সংকলনের প্রস্তাব 'দাসী' 'প্রদীপ' বা 'প্রবাসী'তে

করেছিলাম—ঠিক কোন মাসিকে মনে নাই।" বাস্তবিক তিনি ৫০ বৎসর পূর্বে ইংরাজি ১৮৯২ কি ৯৩ খ্রিস্টাব্দে 'দাসী'তে এই প্রস্তাব প্রথম করেন। দীনেশবাবুর এই বইটির প্রশংসাসূত্রে সমালোচক রামানন্দ বলিয়াছেন, "আমরা পঠদ্দশায় যেরূপ আনন্দ ও আগ্রহের সহিত টেন্-প্রণীত ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস পড়িয়াছিলাম, দীনেশবাবুর গ্রন্থও প্রায় আদ্যোপান্ত তদ্রূপ আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি।"

'আলোচনা' বিভাগের কথাপ্রসঙ্গে 'প্রবাসী'-সম্পাদক এক সময় নলিনীকুমার ভদ্রকে বলিয়াছিলেন, "এ জিনিষটাও বাংলা মাসিকে বোধহয় আমিই প্রথম প্রবর্তন করি। কোনো লেখার প্রতিবাদ হ'লে পর মূল প্রবন্ধ লেখকের এ সম্বন্ধে কী বক্তব্য তা-ও জানা দরকার। সেই জন্য সাধারণত তিন সংখ্যা ধরে প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ চলে। কিন্তু তার পরও অনেকে সমালোচনার সমালোচনা লিখে পাঠান ; এবং আমি ছাপি না বলে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে তীব্র আক্রমণ করে পত্র লিখেন।..."

'প্রদীপে'ও এই-জাতীয় বাদ-প্রতিবাদ হইত। সম্পাদক তীব্র প্রতিবাদের তাপে অতিষ্ঠ হইয়াই বোধহয় চন্দ্রসূর্য-বিষয়ক এক বাদ-প্রতিবাদের সময়ে লিখিয়াছিলেন, "সমালোচকদের প্রতি দ্বিতীয় অনুরোধ এই যে তাঁহারা কৃপা করিয়া ভুলিবেন না যে জড়রাজ্যে উত্তাপবিযুক্ত আলোক দুর্লভ হইলেও জ্ঞানরাজ্যে তদ্রূপ আলোক দুর্লভ নয়।"

'প্রদীপে'র যুগে হাফটোন চিত্র সবে হইয়াছিল, কিন্তু তখন ইহাতে খরচ হইত অসম্ভব; তবু 'প্রদীপে' হাফটোন চিত্র এবং কাঠখোদাই চিত্র দুই-ই থাকিত। ইটরঙা চিত্রও তৃতীয় বৎসরে ছাপা হইত। 'প্রদীপে' লেখার সঙ্গে লেখকদেরও ছবি দিবার নিয়ম ছিল। যাঁদের জীবনী প্রকাশিত হইত তাঁদের ছবি তো থাকিতই। দ্বিতীয় বৎসরের 'প্রদীপে'র প্রথম পৃষ্ঠাটি একটি কাঠখোদাই চিত্রে শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইত। সেই চিত্রের চারি কোণে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি দিয়া পত্রপুষ্পে সাজাইয়া প্রিয়গোপাল-কৃত কাঠের ব্লকের সাহায্যে পৃষ্ঠাটি অলংকৃত করা হয়। সাহিত্য-জগতে এই চারিজনের শ্রেষ্ঠ আসন বুঝাইবার জন্যই ব্লকটি হয়। তখন রবীন্দ্রনাথের বিরোধী দল দলে ভারী ছিলেন বলিয়াই 'প্রদীপ'-সম্পাদক নিজ মত এইভাবেও প্রচার করেন। প্রদীপের খরচ এত বেশি হইত যে সম্পাদক লিখিয়াছিলেন, "প্রদীপ' যদি সচিত্র কাগজ না হইত, এবং উৎকৃষ্ট পুরু কাগজে পরিষ্কার রূপে ছাপা না হইত, তাহা হইলে আমরা যত গ্রাহক পাইয়াছি তাহাতেই হয়তো কোনো প্রকারে এক বৎসর কাগজ চালানো যাইত।" কিন্তু এইরূপ ব্যয়ে তাহা সম্ভব হয় নাই।

চিত্র-শিল্পের এরূপ আদর বাংলা দেশে তিনিই প্রথম করেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বলেন, "তিনিই প্রথমে চিত্রকলার আদর করেছিলেন। বিদ্যা ও কান্তকলার সমাবেশ করেছিলেন। তিনিই প্রথমে বার মাসিকের বর্তমান আকার দিয়েছিলেন।"

'প্রদীপে' 'সিদ্ধান্তদর্পণ' নামক জ্যোতিষ-বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচনা তৎকালীন সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী সংস্কৃত শ্লোকাবলীতে লিখিয়াছিলেন।

"রামকৃষ্ণ কথামৃত" পরে উদ্বোধনে প্রকাশিত হইত। কিন্তু বোধহয় 'উদ্বোধন' প্রতিষ্ঠিত হইবার বৎসরেই ১৩০৫-৬-এর 'প্রদীপে' 'শ্রীম'-লিখিত রামকৃষ্ণ-কথামৃত এক সময় প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় দেশপূজ্য হইয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। এ দেশে তাঁহার প্রথম প্রকাশ্য সম্মান রামানন্দের 'প্রদীপ' করিয়াছিল। 'প্রদীপে' প্রকাশিত জীবনীর

সঙ্গে তাঁহার চিত্রই বোধহয় আচার্যের প্রথম মুদ্রিত চিত্র।

পার্থিব দেনা-পাওনার বাজারে সম্পাদকেরা অনেক সময় যাহা দেন, পৃথিবীর নিকট তাহার উপযুক্ত মূল্য পান না। এমন সম্পাদক আছেন, যিনি কেবল অপরের নিকট যে-কোনো লেখা চাহিয়া লইয়া নির্বিচারে ছাপিয়া যান, খ্যাতনামা লেখক পাকড়াইতে পারিলে তাঁহাকে লোকে ভালো সম্পাদক মনে করে। কিন্তু আবার এমন সম্পাদকও আছেন যিনি খ্যাতনামা লেখক তৈয়ারি করেন। কী বিষয়ে লিখিতে হইবে, তাহাতে কী কী তথ্য ও যুক্তি থাকিবে, রচনা-পদ্ধতি কী রকম হইবে অনেক সময় সবই তিনি বলিয়া দেন। উপরন্তু অনেক লেখা আগাগোড়া কাটিয়া, কেবল লেখকের নামটি না সংশোধন করিয়া, নূতন করিয়া তোলেন। রামানন্দ ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্পাদক। 'প্রদীপে'র অনেক লেখক তিনি এমনই করিয়া গড়িয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণ বাজারে দুই শ্রেণীর সম্পাদকেরই মূল্য এক। একজন কিছু না দিয়া নাম পান, আর একজন সব করিয়াও নাম পান না। অনেকে বেতন দিয়া সম্পাদক রাখিয়া নিজের নামটা শুধু কাগজে ছাপিয়া রাখেন।

বন্ধুবান্ধব

কাগজের পাতায় সাহিত্যিক ও সম্পাদকের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ছাড়া আর একটা পরিচয় আছে ঘরের। একটা প্রসঙ্গ অনেক দূর চলিলে অন্যটা চাপা পড়িয়া যায়। ঘরের কথাও বলা দরকার।

এলাহাবাদে বন্ধুবৎসল রামানন্দের গৃহে অতিথি-অভ্যাগতের যাওয়া-আসা বারো মাস চলিত। সকলেই যে তাঁহার গৃহে বাস করিতেন তাহা নয় ; কিন্তু তাঁহার গৃহের দ্বার অবারিত ছিল। তিনি বন্ধুবান্ধব সকলকেই সাদরে আহ্বান করিতেন। কেহ অনাহূত আসিলেও তাঁহার অভ্যর্থনার ত্রুটি হইত না।

যাঁহারা অন্যত্র উঠিতেন তাঁহারাও বন্ধু হিসাবে দেখা করিতে সর্বদাই আসিতেন। সাউথ রোডের বাসায় থাকিতে একদিন বিকাল বেলা পাচক মহারাজ আসিয়া খবর দিল 'রাজা-উজির' জাতীয় দুইটি ব্যক্তি বাবুজির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তখন সবে তিনি কলেজ হইতে বাড়ি ফিরিয়াছেন। এই ঘটনার কথা তিনি লিখিয়াছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাইপো বলেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। বলেন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়ি ছিল এলাহাবাদে। উভয়েই মোগলাই বা ইরানি পোশাক ও পাগড়ি পরে এসেছিলেন। আমার রাঁধুনি বিশ্বেশ্বর মহারাজ উভয়কে একটা দড়ির খাটিয়ায় বসিয়ে এসে খবর দিলেন দুটি 'আমীর আদমি' এসেছেন। আমি বেরিয়ে গিয়েই চিনতে পারলাম। রবিবাবু বলেছিলেন মনে পড়ছে, 'এই পোশাকে চিনতে পারছেন না বোধ হয়।' তাঁর সঙ্গে সে সময় অন্য কী কথা হয়েছিল...মনে পড়ছে না।"

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন বলিয়াছেন, "সেবার শুনিলাম রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাছে আসেন এবং দুই জনের মধ্যে বেশ একটি শ্রদ্ধার সম্বন্ধ আছে। রবীন্দ্রনাথকে আমি তখন দূর হইতে জানি মাত্র। তাই রামানন্দবাবুকে বলিলাম, 'আপনার সঙ্গে কী করিয়া তাঁহার আলাপ হইল?' রামানন্দবাবু বলিলেন, 'তাঁহার মতো প্রতিভা আমার নাই বটে, তবে তিনিও মাসিক পত্র লইয়া কাজ করেন, আমিও মাসিক পত্র লইয়া কাজ করি। কাজেই সেই হিসাবে আমি তাঁর সমব্যবসায়ী, তাই তিনি কৃপা করিয়া আমার এখানে আসেন!' রামানন্দবাবুর বিনয়ও ছিল

অসামান্য।"

অবনীন্দ্রনাথও এলাহাবাদে তাঁহার বাড়িতে যাওয়ার কথা লিখিয়াছিলেন :—"দুজনে মিলে গেলুম তাঁর বাড়িতে। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের কাছে—একটা বড়ো চার্চের পিছনে বাংলো ধরনের একটি সুন্দর বাড়ি। কেদার অশোক সীতা শান্তা ওরা তখন খুব ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে— সামনে খেলা করছে। বড়ো ভালো লাগল। দেখেই মনে হয়—যেন সুখী পরিবার একটি। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ হল। অতি ভালো মানুষ ছিলেন তিনি।" ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের কথা।

এলাহাবাদের বাড়িতে তখনই রবীন্দ্রসংগীত ও কাব্যের আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শিশুদের শোনাইয়া মনোরমা দেবী উচ্চমধুর কণ্ঠে গাহিতেন,

"বেলা যে চলে যায়, ডুবিল রবি,
ছায়ায় ঢেকেছে ঘন অটবী।"

অথবা

"ও ভাই, দেখে যা, কত ফুল ফুটেছে,
তুই আয় রে কাছে আয়, আমি তোরে সাজিয়ে দি।"

ছায়ায় ঢাকা ঘন অটবীর ছবি শিশুদের মনকে কোন কল্পনা রাজ্যে লইয়া যাইত।

কিছু পরে আসিল হাল্কা নীল রঙের কাগজের মলাট দেওয়া ছোটো একখানি বই, নাম 'নদী'। শিশুরা বিছানায় শুইয়া সমস্বরে পড়িত,

"ওরে তোরা কি জানিস কেউ
জলে ওঠে কেন এত ঢেউ..."

মাতা ও আত্মীয়স্বজন

রামানন্দের জননী হরসুন্দরী দেবীর প্রয়াগে কল্পবাস করিবার সাধ ছিল। পুত্র প্রয়াগবাসী হওয়াতে তাঁহার এই সাধ ছিল। পুত্র প্রয়াগবাসী হওয়াতে তাঁহার এই সাধ পূর্ণ হইয়াছিল। মাঘ মাসে গঙ্গার গর্ভে বালুর চরে কুঁড়ে ঘরের ভিতর বহু তীর্থযাত্রী এইভাবে এক মাস যাপন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। হরসুন্দরী তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। কিন্তু কন্যা সেবার কল্পবাস করেন নাই। রামানন্দ নিজ কন্যাকে লিখিয়াছিলেন,

"বোধ হয় আমরা এই বাসায় থাকতেই আমার মা মাঘ মাসে কল্পবাস করতে এসেছিলেন। ত্রিবেণী সংগমে বালির উপর বাঁধা কুঁড়ো ঘরে মা এক মাস ছিলেন। তোমাদের মা তাঁর খাওয়া-দাওয়ার ভালো ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমাদের একজন বিশ্বাসী হিন্দুস্থানী চাকরকে তাঁর সব কাজ করবার জন্যে রেখে দিয়েছিলেন। প্রধান স্নানের দিন বিষম ভিড়ের মধ্যে রাত থাকতে স্নান করা সমর্থ মানুষের পক্ষেই সহজ নয়, বৃদ্ধাদের পক্ষে তো নহেই। এইজন্যে আমার মাকে সেদিন স্নানে সাহায্য করবার জন্যে তোমাদের মা আমাদের হিন্দুস্থানী পাচক ব্রাহ্মণকে আগে থাকতেই বেণী ঘাটে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমার এই রকম মনে পড়ছে আমিও অনেক ভোরে সেদিন গিয়েছিলাম। আমি রোজ মাকে দেখতে যেতাম। তোমাদের মা প্রায়ই যেতেন।

"আমার মা যেমন কল্পবাস করতে এসে বেণী কিনারে কুঁড়ো ঘরে ছিলেন, তেমনি আরো

কোনো কোনো বৃদ্ধা বাঙালি মহিলা এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন মা'র কাছে নিজের বৌয়ের বড়াই করতেন যে বৌটি ইংরেজি একখানা বই পড়ে ফেলেছে, নিজের নাতনীটির তিনটা নাম তাও বলতেন। আমার মার বেশি কথা বলবার বা বড়াই করবার অভ্যাস ছিল না। কিন্তু অনেকবার একই কথা শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'আমার বৌমা বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, ফারসি সব জানে ; আর, আমার সোনার চাঁদ নাতি-নাতনীদের একটা করে নাম। একটা তো নাতনী, তার আবার তিনটা নাম।'

"মা যখন কল্পবাস করে আমাদের বাসায় আসেন তখন মাথা মুড়িয়ে এসেছিলেন। অশোক তাঁর ন্যাড়া মাথায় চাপড়াত। তিনি তোমাদের মাকে বলতেন, 'আমার ন্যাড়া মাথাটা তোমার ছেলের পছন্দ হচ্ছে না।' কেদার আমার মাকে রামায়ণের গল্প বলে তার পর তাঁকে সে বিষয়ে প্রশ্ন করত। তিনি উত্তর দিতে পারতেন না। কেদার চটে গিয়ে বলত, 'তোমার কখ্‌খনো কিচ্ছু হবে না।'

"এই বাসার পিছন দিকের একটি ছোটো বাড়িতে সরযূ প্রসাদ মিশ্র বলে একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ থাকতেন। একদিন তিনি কেদারের সঙ্গে কী একটা প্রসঙ্গে বলেছিলেন তোমাদের মা কিছু জানেন না বা তাঁর এইরূপ অগৌরব-সূচক কিছু কথা। তাতে কেদার তাঁর দিকে একটা ইঁট ছুঁড়ে দিয়ে এসেছিল। ভাগ্যে সেটা তাঁকে লাগে নি। কেদারের সঙ্গে এই পণ্ডিতজীর মতভেদ মধ্যে মধ্যে হত। কেদার চটে গেলে তিনি বলতেন, 'কারণ কী হে কেদার?' তিনি কিছু বাংলা জানতেন।"

কল্পবাসের সময় এই বৎসরই বোধহয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের পিতামহী প্রয়াগে কল্পবাস করিতে যান। হেমেন্দ্রপ্রসাদবাবু বলেন যে তিনি রামানন্দকে নিজ পিতামহীর একটু খোঁজখবর লইতে অনুরোধ করেন। তাহার ফলে রামানন্দ প্রত্যহ হেমেন্দ্রবাবুর পিতামহীর খবর লইতে অত দূরে যাইতেন এবং প্রতিদিন একটি পোস্টকার্ডে বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার খবর তাঁহার পৌত্রকে জানাইতেন। হেমেন্দ্রবাবু তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা ও ভদ্রতায় মুগ্ধ ও বিস্মিত হন।

সুদূর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে চলিয়া আসিবার পর রামানন্দ শুধু যে মাতার সহিতই সম্পর্ক রাখিয়াছিলেন তা নয়, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গেও তাঁর সমান যোগ ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পীড়িত হইয়া চিকিৎসার জন্য তাঁহারই গৃহে আসিয়াছিলেন। এলাহাবাদের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসককে তাঁর চিকিৎসার ভার দেওয়া হইয়াছিল। কঠিন রোগ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী ভীত হন নাই, সন্তানদের ছোঁয়াচ লাগার ভয়ও করেন নাই। তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমার বড়ো দাদা অত্যন্ত পীড়িত ও দুর্বল অবস্থায় সস্ত্রীক এই ছোটো বাংলোটিতে এসেছিলেন। ডাক্তার তাঁকে যথাসম্ভব মুক্ত বাতাসে রাখতে বলেছিলেন এবং সম্পূর্ণ নিরামিষ পথ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। তোমাদের মা রাস্তার দিকের বারান্দাটিতে চটের পর্দা দিয়ে তাঁর থাকবার জায়গা করে দিয়েছিলেন। বারান্দায় রোদ বা বৃষ্টি এলে পর্দা ফেলা হত। অন্য সময় পর্দা থাকত না। তোমাদের মা ডাক্তারের সব ব্যবস্থা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার চেষ্টা করতেন। তাতে দাদা বিরক্ত হতেন—মাংস খাবার লোভ তাঁর প্রবল ছিল। একদিন তোমাদের মায়ের অনুপস্থিতির সুযোগে দাদা রাস্তার এক পাখি ফেরিওয়ালাকে ডাকিয়ে তার কাছ থেকে ভক্ষ্য এক রকম পাখি কিনে বড়ো বৌঠাকরুনকে ধমক দিয়ে রান্না করিয়ে খেয়েছিলেন। তাতে তাঁর ব্যারাম বেড়ে গিয়েছিল। যা হোক, সে যাত্রা চিকিৎসকের সুচিকিৎসায় এবং তোমাদের মায়ের দৃঢ় সুব্যবস্থায় দাদা সুস্থ হয়ে বাড়ি

ফিরে গিয়েছিলেন।"

সেকালে ভার্মিসেলি, ম্যাকারনি, টেপিওকা প্রভৃতি পথ্য সচরাচর দেখা যাইত না। বাড়িতে ডাক্তারের আদেশে এই সব খাদ্য সর্বদাই আসিত। তখন রোগীর চেয়ে বাড়ির শিশুদেরই এই সব খাদ্যের উপর অনুরাগ বেশি ছিল।

বাঁকিপুর

এই সময় ১৮৯৯।১৯০০ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দ সপরিবারে অল্প দিনের জন্য বাঁকিপুরে যান। সেকালের বাঁকিপুরের ধূলিধূসরিত পথ ও ভাঙা ঘোড়ার গাড়ির স্মৃতি এখনও মনে পড়ে। তখন সেখানে অনেকগুলি বাঙালি ব্রাহ্ম পরিবার থাকিতেন। একই বাড়িতে সেবাব্রত ইন্দুভূষণ রায় সপরিবারে, শ্রীযুক্তা চঞ্চলা ঘোষ সপরিবারে এবং স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র রায়ের বিধবা পত্নী দুইটি পুত্রকে লইয়া থাকিতেন। বাঁকিপুরে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধনাশ্রমের একটি শাখা ছিল। সেইজন্যই বোধহয় প্রচারক গুরুদাস চক্রবর্তী, আচার্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ও অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী প্রভৃতিও বাঁকিপুরে থাকিতেন। বাঁকিপুরে রামমোহন রায় সেমিনারি নামে একটি বিদ্যালয় ইঁহাদের উদ্‌যোগে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রতিষ্ঠা করেন এবং সাধনাশ্রমের তরুণতম সভ্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষরূপে কুড়ি বৎসর এখানে যাপন করেন। সতীশচন্দ্র সিটি কলেজে রামানন্দের ছাত্র ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের বেদি হইতে সতীশচন্দ্রের মতো সরস জ্ঞানগর্ভ ও অধ্যাত্মদীপ্তিপূর্ণ উপাসনা ও উপদেশ খুব বেশি জন শুনাইয়াছেন বলিয়া জানি না।

রামানন্দ সপরিবারে বাঁকিপুরে গিয়া সম্ভবত ইন্দুভূষণ রায় মহাশয়ের অতিথি হইয়াছিলেন। প্রথম দুই-এক দিন তাঁহাদের একান্নবর্তী ব্রাহ্ম-গোষ্ঠীতে থাকিয়া তার পর একটি স্বতন্ত্র বাড়ি ভাড়া লইয়া ইঁহারা সেখানে চলিয়া যান। ইন্দুভূষণদের সেই বাড়িটির ঘরে ঘরে কত লোক। কোনো ঘরে চঞ্চলা দেবীর কন্যারা পরীক্ষার পড়া করিতেছেন। কোনো ঘরে এক নবীনা জননী গুটি দুই শিশু লইয়া বিব্রত। কোথাও নবীনচন্দ্র রায়ের বিধবা পত্নী এলাহাবাদ হইতে আগত শিশুদের সাজাইয়া-গুছাইয়া তাহাদের সহিত আলাপ জমাইতেন। কোথাও ইন্দুভূষণ রায়ের পত্নী এত জনের খাওয়া-দাওয়ার তদারকে ব্যস্ত। কোথাও বা কাহারও বিবাহের ব্যবস্থা হইতেছে। সত্যই যেন এক বিরাট একান্নবর্তী পরিবার। অথচ তাঁহারা রক্ত-সম্পর্কে কেহ কাহারও আত্মীয় নহেন।

এখানেই বোধহয় ইন্দুভূষণ রায়ের স্থায়ীভাবে এলাহাবাদে আসার পরামর্শ হয়। সপরিবারে আসার পূর্বেই তিনি বোধহয় একবার একলা আসেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বাঁকিপুরে প্লেগের মহামারী লাগিয়া যায়। তাহারই কিছু আগে ইন্দুভূষণ রায় স্ত্রীপুত্রকন্যা সকলকে লইয়া সাউথ রোডের বাসায় উঠিলেন। বাড়ির বড়ো মেয়েটিকে লিখিতে শেখানোর শখ এক সময় ছিল সরোজবাসিনীর। কিন্তু মেয়েটির ধারণা ছিল "ক" কিছুতেই লেখা যায় না। এখন তাহার আরো একটা ধনুকভাঙা পণ দেখা গেল মেয়েটিকে সোজা করিয়া বই পড়ানো বিষয়ে। মেয়েটি ঠিক করিয়াছিল বইয়ের মাথার দিকটা নীচে করিয়া পড়িতে হয়। ইন্দুবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র নিজ মাতার সহায় হইয়া এই কন্যার শাসনে বদ্ধপরিকর হন।

বন্ধুগোষ্ঠী

সাউথ রোডেই পিছন দিকে পেয়ারা বাগানের নিকট যে বাংলোটি ছিল সেখানে ইন্দুভূষণ বাসা বাঁধিলেন। এলাহাবাদের সেই পাড়াটিকে এখন বোধহয় সিভিল লাইন্‌স্ বলে। তাহা সাহেবপাড়া। ইংরাজ ও ফিরিঙ্গিরাই সে পাড়াতে থাকিতেন, আর থাকিতেন দুই-চারিজন ধনী বাঙালি হিন্দুস্থানি বা পাঞ্জাবি। রামানন্দের নিকটতম প্রতিবেশি ছিলেন মুনশী রৌশনলাল ব্যারিস্টার এবং রাস্তার ওপারে ল্যাংলি নামক এক ফিরিঙ্গি পরিবার। বাড়ির ঠিক কাছে কোনো বাঙালি পরিবারের বাস ছিল না। দেশ হইতে আত্মীয়-বন্ধুরা নিজেদের প্রয়োজনমতো আসিতেন, আবার প্রয়োজন শেষ হইলেই স্বগৃহে ফিরিয়া যাইতেন। এই পরিবারের শিশুদের বন্ধু আত্মীয় সবই ছিলেন তাহাদের মাতা। এই সময় রায় মহাশয়দের সপরিবারে পাইয়া শিশুরা সকলে যেন স্বর্গ হাতে পাইল। ছেলেবেলা মানুষের আনন্দের স্থান হয় মামার বাড়ি, মাসির বাড়ি। বিদেশে ইহাদের মামার বাড়ি মাসির বাড়ি তো ছিল না। কিন্তু এইবার মাসির বাড়ি হইল বাড়ির পিছনেই পেয়ারা বাগানের ধারে। এই পেয়ারা বাগানের কথাও রামানন্দ লিখিয়াছিলেন,—"তার ভিতরে ঢুকে 'হারিয়ে যাওয়া' বোধহয় তোমাদের একটা আমোদ ছিল। বাগানের পেয়ারা ছিঁড়ে এনে (কিংবা আমার ছাত্রদের উপহার দেওয়া পেয়ারা নিয়ে) বাসার জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতর ছুঁড়ে ফেলা তোমাদের একটা খেলা ছিল। তোমাদের মা শিখিয়েছিলেন, কেউ কোনো জিনিস দিলে নিতে নাই, ফিরিয়ে দিতে হয়, ফেরত না নিলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়। রোশনলালের বাগানের পেয়ারা (কিংবা ছেলেদের উপহার দেওয়া পেয়ারা) তোমরা এই রকম ছুঁড়ে ফেলে দিতে।"

ইন্দুভূষণ রায় মহাশয়ের পত্নী সরোজবাসিনী নিঃসম্পর্কীয়া হইলেও আজীবন এই শিশুদের নিকটতমা আত্মীয়া ও মাসিমা ছিলেন। তাহাদের আদর-আবদার দেওয়া এবং শাসন করা সকল বিষয়েই তাঁর জননীর মতো অধিকার ছিল। শিশুদের মা-বাবা কখনও তাহাতে কিছু বলেন নাই। মনোরমা দেবী আত্মনির্ভরশীল ও সাহসী ছিলেন। নিঃসঙ্গতাকে কিংবা কাজকে তিনি ভয় করিতেন না। কিন্তু তবু তাঁহার বয়স তখন খুব কম ছিল, একজন বয়োজ্যেষ্ঠা সঙ্গিনীর প্রয়োজন ছিল। সরোজবাসিনীর বয়স তাঁর অপেক্ষা নয়-দশ বৎসর বেশি ছিল। সুতরাং তিনি একাধারে তাঁহার সখী ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর স্থান গ্রহণ করিলেন।

এখনকার মতো এলাহাবাদে তখনও অনেক বাঙালির বাস ছিল। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা রামানন্দের সহিত বিশেষ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন তাঁহারা সকলেই অনেক দূরে থাকিতেন। তবু সর্বদাই যাওয়া-আসা করিতেন মিওর সেন্ট্রাল কলেজের গণিতের অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ঘোষ, কেদারনাথ মণ্ডল, চাইল্ড কোম্পানির রামচরণ মিত্র, মাইকেলের জীবনী-প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ সোম, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, ইন্ডিয়ান প্রেসের বাবু চিন্তামণি ঘোষ, 'প্রবাসী বাঙালি'র লেখক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, চিন্তামণিবাবুর আত্মীয় রামরূপবাবু প্রভৃতি। ইহার কিছুকাল পরে মেজর শ্রীযুক্ত বামনদাস বসুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং সেই সূত্রেই কিংবা তৎপূর্বেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহিতও পরিচয় হয়। বামনদাসবাবুর সহিত পরিচয় ক্রমে গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হইল, তাঁহারা নানাদিকে পরস্পরের সহকর্মী হইয়া উঠিলেন। ইঁহার কথা পরে বলিব।

উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গণিতের অধ্যাপক হইলেও এই সাহিত্যের অধ্যাপকের ঘনিষ্ঠ

বন্ধু হইয়া উঠেন। উমেশবাবুর বোধ হয় ফোটো তোলার শখ ছিল। রামানন্দও তখন ছবি তুলিতেন। তিনি যখন প্রথম ফোটোগ্রাফি-চর্চা শুরু করেন তখন অশোকই তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি কুরিয়ার ব্যাগ স্কন্ধে শিশু অশোকের ছবি তুলিয়া 'প্রবাসী বাঙালি' নামে প্রবাসীতে ছাপাইয়াছিলেন। বাড়ির আত্মীয়-স্বজন ছাড়া বন্ধুদেরও ছবি তুলিতেন। উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের এবং চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা প্রেমকুসুম সেনেরও ছবি তুলিয়াছিলেন। এই সময় কিছুদিন প্রেমকুসুম সেন তাঁহার বাড়িতে অতিথি ছিলেন, তিনি সে সময় এলাহাবাদ মহাজনীটোলায় ক্রস্থোয়েট গার্লস স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হন। সেকালের এই স্কুলের অনেক শিক্ষয়িত্রীই কলিকাতার ব্রাহ্মপরিবার হইতে যাইতেন এবং রামানন্দের গৃহে আত্মীয়ের মতো হইয়া উঠিতেন। মিস সেন মনোরমা দেবীর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। উমেশবাবুর বাড়িতে বোধ হয় dark room ছিল এবং সেইখানে ছবির প্লেট ধুইতে রামানন্দ যাইতেন। এই সময় মনোরমা দেবীর দুইখানা ছবিও তিনি তুলিয়াছিলেন ; সে ছবির বিষয় সব কথা তাঁর বরাবর মনে ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন—"তোমাদের মায়ের যে দুটি ফোটোগ্রাফ আমি তুলেছিলাম, তা এই সাউথ রোডের বাসাতেই তোলা। চুল-খোলা ছবিটি তিনি একদিন স্নান করে কাজে প্রবৃত্ত হবার আগে তোলা। আমি তখন সবে ফোটোগ্রাফ তুলতে শিখেছি। কতকটা ভালো ফোকস্ (focus) করবার জন্যে, কতকটা বোধ হয় মহিলাদের মোগল পদ্ধতির আইভরি মিনিয়েচ্যার্সের অনুসরণে তাঁর হাতে একটি গোলাপ ফুল দিয়েছিলাম। অন্য ছবিটি তুলেছিলাম তিনি যখন রান্নায় ব্যস্ত ছিলেন—ডালে হলুদ দিবার জন্যে হাতে করে হলুদ নিয়ে যাচ্ছিলেন।"

এই প্রথম ছবিটির নেগেটিভে মনোরমা দেবীর সুদীর্ঘ সুন্দর কেশ দেখিয়া উমেশবাবু বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং বন্ধুমহলে গল্প করেন। সম্ভবত তার পর উমেশবাবুর পত্নীর সহিত মনোরমা দেবীর পরিচয় হয়। উমেশবাবুর পত্নী খুব সুন্দরী ও সদাহাস্যময়ী ছিলেন। তিনি ভালো খাবার করিতে জানিতেন, কিন্তু তাঁর সন্তানাদি ছিল না। প্রায়ই বোধ হয় সেইজন্য তিনি খাবার তৈয়ারি করিয়া থালায় করিয়া মনোরমা দেবীর বাড়ি পাঠাইয়া দিতেন। ভদ্র মহিলার আর-একটা বাতিক ছিল কবিতা পড়া। তিনি কবিতা পড়িতে এতই ভালোবাসিতেন যে 'প্রবাসী'র অমনোনীত কবিতাগুলিও চাহিয়া লইতেন পড়িবার জন্য। সম্পাদকীয় টেবিল হইতে ফেলা এমন কী ছেঁড়া কবিতাগুলিও মনোরমা দেবী কুড়াইয়া রাখিতেন উমেশবাবুর স্ত্রীকে দিবার জন্য।

কেদারনাথ মণ্ডল মহাশয় সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল মুখ এখনও মনে পড়ে। ইনি এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী সভ্য কর্মী ছিলেন, কলিকাতায় মাঘোৎসব উপলক্ষেও বোধ হয় আসিতেন। সম্ভবত এলাহাবাদ যাইবার পূর্বে এই কারণেই তাঁহার সহিত রামানন্দের পরিচয় ছিল। ইনি রামানন্দ অপেক্ষা সাত বৎসরের বড়ো ছিলেন, কিন্তু শিশুদের মুখে 'কাকাবাবু' ডাক শুনিতে ভালোবাসিতেন বলিয়া রামানন্দের পুত্রকন্যাদের 'কাকাবাবু' বলিতে শিখাইয়াছিলেন। বাড়িতে আসিলেই জিজ্ঞাসা করিতেন, "আজ কী রাঁধলেন?" একবার মনোরমা দেবী বলিয়াছিলেন, "আজ বাড়িতে কিছু ছিল না বলে পোলাও করেছিলাম।" ইহাতে কেদারবাবু ঠাট্টা মনে করিয়া চটিয়া গিয়াছিলেন।

এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজ

History of the Brahmo Samaj-এ আছে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দেরও পূর্বে এলাহাবাদে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মাঝে কয়েক বার বোধ হয় কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। রামানন্দ স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া সমাজের কাজ আবার শুরু করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যখন কাটরায় ইঁহার বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন তখন তিনি প্রকাশ্য বক্তৃতা ও উপাসনা উপদেশ দান ইত্যাদি করিতেন। মণ্ডল মহাশয় ইঁহাদের কাজের সহায় ছিলেন। কখনও রামানন্দের বাড়িতে, কখনও সাউথ রোডের পিছনের ছোটো বাংলোটিতে এবং কিছুকাল স্টেশন রোডের কাছে ভাড়া-করা খোলার বাড়িতে সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনাদি হইত। কাটরায় কোনো রামগুলামের বাড়ির দোতলায় প্রতি রবিবার কিছুদিন উপাসনা হইত। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দেব বলেন, ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানাদির সহিত যুক্ত ছিলেন কেদারনাথ মণ্ডল, নগেন্দ্রনাথ সোম, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, নেপালচন্দ্র রায়, গিরীশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি। পরে বামনদাস বসু ও শ্রীশচন্দ্র বসু সপরিবারে এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে যোগ দিতেন। বামনদাস বসুর দ্বিতীয়া ভগিনী ও তাঁহার স্বামী চিরদিন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। শ্রীশবাবুও যৌবনে শিবনাথ শাস্ত্রীর চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্ম হন। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন খুব ভাবুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। উপাসনার গানের সময় তিনি তন্ময় হইয়া গানের তালে তালে দুলিতেন। প্রথম দিকে রামানন্দই প্রায় সর্বদা আচার্যের কাজ করিতেন। তিনি প্রতি সপ্তাহে উপাসনা, পাঠ, সংগত সভা ইত্যাদি করিতেন। সমাজের ব্যয়ভার বহুদিন তাঁহাকে একাকীই বহন করিতে হইত। নেপালচন্দ্র রায়ের পুরাতন ডায়েরিতে এলাহাবাদের ব্রহ্মমন্দিরে রামানন্দের উপাসনায় লোকের ভিড়ের কথা ও তাঁহার মর্মস্পর্শী প্রার্থনাদির কথা আছে।

কোনো এক অগ্রহায়ণ মাসে এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান হয়। সেইজন্য পরে প্রতি বৎসর এখানে দুই বার উৎসব হইত; একবার অগ্রহায়ণে, একবার মাঘে। রামানন্দ কলিকাতার মাঘোৎসবে সপরিবারে উপস্থিত থাকিতে ভালোবাসিতেন বলিয়া মাঝে মাঝে মাঘ মাসে তিনি সকলকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিতেন। কিন্তু অগ্রহায়ণ মাসে সর্বদাই এলাহাবাদে থাকিতেন। অগ্রহায়ণে সেখানে ঘটা করিয়া উৎসব হইত। গাঁদা ফুলের মালায় ঘর সাজাইয়া গানে, উপাসনায় বক্তৃতায় উৎসব জাঁকিয়া উঠিত। ইন্দুভূষণ এলাহাবাদে আসিবার পর তিনি এবং রামানন্দ দুজনেই আচার্যের কাজ করিতেন। বোধ হয় কখনও কখনও নগেন্দ্রনাথ সোম এবং কেদারনাথ মণ্ডলও করিতেন। কিছুকাল বামনদাস বাবুদের একটি বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের কাজ হইত। সেই বাড়ির পিছনে মুসলমানদের ঈদের মাঠ (ঈদগা) ছিল মনে আছে।

ইন্দুভূষণ কবি ও সুগায়ক ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠে আশ্চর্য মধুরতা ও তাঁহার গভীর ধর্মভাব সংগীতে অমৃতস্রোত বহাইয়া দিত। তিনি যখন স্বরচিত গান

"ভিখারী ডাকে দ্বারে হে শোন দয়ার ঠাকুর,
তৃষিত আত্মা জুড়াতে চাহে, থেক না থেক না দূর।"

গাহিতেন তখন শিশুদের মনে হইত দেবতা বুঝি স্বর্গ হইতে ধরাধামে নামিয়া আসিতেছেন। মনোরমা দেবীও তাঁহার স্বাভাবিক কণ্ঠমাধুর্য ও খাঁটি অনুভূতির জন্য এলাহাবাদে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার গলার জোরের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজের ঘর ছোটোই

ছিল, সেখানে তাঁহার গানে ঘর গমগম করিত। শেষের দিকে যখন বামনদাস বাবুর কোঠাপার্চার বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজ ছিল তখন মনোরমা দেবীর কণ্ঠে

"বল দাও, মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি,"
"কর তাঁর নাম গান, যতদিন বহে প্রাণ,"
"শান্ত হ রে মম চিত্ত নিরাকুল, শান্ত হ রে ওরে দীন,"

কিংবা

"মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্ত দ্বারে তোমার বিশ্বের সভাতে,"

প্রভৃতি গান শুনিয়া শ্রোতারা মুগ্ধ হইতেন। ইন্দুভূষণ রায় ও তাঁহার পত্নী সরোজবাসিনী বলিতেন, "মনোরমার মতো সুন্দর ও জোরালো গলা আমরা কখনও শুনি নাই।"

যে উৎসবে শিশুদের স্থান নাই, সে উৎসবকে রামানন্দ উৎসব মনে করিতেন না। এলাহাবাদে তাই বৎসরে দুইবার বালকবালিকা সম্মিলন হইত। সম্মিলনে শিশুদের লুচি তরকারি খাওয়ানো, গান করা, গল্প বলা, কবিতা আবৃত্তি, ঘর সাজানো সবই হইত। সীতা শিশু বয়স হইতেই শোনা গল্প অবিকল বলিয়া যাইতে পারিতেন বলিয়া তাঁহাকে দিয়াও মাঝে মাঝে গল্প বলানো হইত। (সেটা ১৯০৪।০৫ এর কথা) শিশুর মুখে গল্প শুনিয়া শ্রোতারা খুব আমোদ অনুভব করিতেন। মেজর বসু প্রভৃতি অনেকের বাড়ির ছেলেমেয়েরা আসিতেন। একবার শিশু অশোক ভিতরের বারান্ডায় লুচি সাজানো দেখিতে পাইয়া আচার্যকে বলিয়াছিলেন, "বেশি লম্বা উপাসনা করবেন না যেন।"

ব্রাহ্মসমাজে সাপ্তাহিক উপাসনা এবং বাৎসরিক উৎসব ছাড়াও অন্য অনেক কাজ হইত। প্রধান কাজ ছিল সেবার কাজ। সেবার কাজেব প্রাণস্বরূপ ছিলেন ইন্দুবাবু। তিনি প্লেগ, বসন্ত, কলেরা কোনো রোগকেই ভয় করেন নাই! নির্ভয়ে সকলের সেবা করিয়াছেন। মহামারীর সময় দেখা যাইত ভোরবেলা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স লইয়া তিনি রোগী দেখিতে বাহির হইয়া যাইতেন। সঙ্গে তাঁহার দুই-একজন বন্ধুও অনেক সময় থাকিতেন। ছুটির দিনে রামানন্দও মাঝে মাঝে যাইতেন। তাঁহারা জুতা, জামা, চাদর সব বাড়ি ঢুকিবার আগেই পরিবর্তন করিতেন, কাপড়-চোপড় ঔষধের জলে কাচিতেন, পাছে শিশুদের কোনো ক্ষতি হয়। দুরন্ত প্লেগের সময়ও তাঁহারা এলাহাবাদ ছাড়িয়া যাইতেন না।

দাসাশ্রমের যুগের সেবার ভাবেরই একটি ধারা এইরূপে এলাহাবাদে কাজ করিতে থাকে। দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈব বিপর্যয়ের সময়ও রামানন্দের সেবাপ্রবৃত্তি নানারূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের আর-একটি কাজ ছিল সভ্যদের আত্মোন্নতি চেষ্টা। তাঁহাদের একটি স্বতন্ত্র সাপ্তাহিক (?) সভা হইত। তাহাতে তাঁহারা সপ্তাহে সপ্তাহে নিজেদের দোষত্রুটি স্বীকার করিতেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে তাঁহারা আদর্শ মানবতার দিকে আরও অগ্রসর হইতে পারেন তাহার চেষ্টা করিতেন। শুনিয়াছি, এই সকল সভায় সর্বাপেক্ষা অধিক অপরাধ স্বীকার করিতেন রামানন্দ। তিনি চিরদিনই নিজ জীবনের আদর্শ হইতে নিজেকে অনেক নীচে মনে করিতেন।

ব্রাহ্মসমাজের আর্ একটি কাজ ছিল ভারতবর্ষের নানাস্থানে সদ্‌গ্রন্থ বিতরণ করা। এই কার্যে রামানন্দ সর্বাপেক্ষা উৎসাহী ছিলেন। আমেরিকান ইউনিটেরিয়ানদের কিছু ভালো বই Fletcher Williams নামে একজন Unitarian এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজে পাঠাইতেন, তা ছাড়া অন্যান্য সদ্‌গ্রন্থ ও ধর্মপুস্তক প্রভৃতি নানাস্থান হইতে আনা হইত। ইংরাজি বুঝিতে সক্ষম লোকেরা বই চাহিয়া পাঠাইলে তাহাদের এই সকল বই বিনামূল্যে একখানি করিয়া

দেওয়া হইত। প্রতি মাসে 'প্রবাসী'তে এই সকল বইয়ের একটি তালিকা বিজ্ঞাপনে বাহির হইত এবং যাচক তাহা হইতে আপনার পছন্দমতো একটি চাহিয়া পাঠাইতেন। এই সব বই প্যাক করা, ঠিকানা লেখা, ডাকে দেওয়ার কাজ করিতেন ইন্দুভূষণ রায়ের কন্যা শ্রীমতী সোহিনী রায়। তাঁহাকে ইহার জন্য কিছু পারিশ্রমিক দেওয়া হইত।

সম্ভবত ব্রাহ্মসমাজের কাজেই এলাহাবাদে সাউথ রোডের বাড়িতেও সস্ত্রীক শিবনাথ শাস্ত্রী, ভাই প্রকাশ দেবজী, (লাহোরের) সুন্দর সিংজী প্রভৃতি কয়েকবার অতিথি হইয়াছিলেন।

অবাঙালি বন্ধু

এলাহাবাদে শুধু যে বাঙালিদের সঙ্গেই রামানন্দ যোগ রাখিতেন, তাহা নয়। অন্যান্য প্রদেশের যে-সব মানুষ তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন তাঁহারাও তাঁহার চরিত্র-মাধুর্যে, কর্মক্ষমতায়, দেশসেবায়, আদর্শবাদিতায় ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়িতেন। কলেজের কাজে যোগ দিয়া কলেজের পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ভট্টের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্য হয়। বালকৃষ্ণ ইঁহাকে ছোটো ভাইয়ের মতো ভালোবাসিতেন। ইনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ ছিলেন, তাই বন্ধুকে বলিতেন, "তুমি তোমার ছেলের উপবীত কেন দেবে না? সে যদি বড়ো হয়ে উপবীত চায়?" বন্ধু বলিতেন, "তাহা হইলে সে নিজে উপবীত গ্রহণ করবে, আমি দেব না।" বালকৃষ্ণ জ্যোতিষশাস্ত্রে উৎসাহী ছিলেন এবং এই বিষয়ে নানা আলোচনা বন্ধুর সহিত করিতেন। কাগজ বাহির করিয়া বন্ধু যে এত টাকা নষ্ট করিতেন ইহা বালকৃষ্ণের পছন্দ হইত না। যখন রামানন্দ মডার্ন রিভিয়ু প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করেন এবং সেইজন্য কলেজে বিজ্ঞাপন বিলি করেন এবং তদুপরি কাজ ছাড়িয়া দেন তখন পণ্ডিতজী তো চটিয়া আগুন। তিনি রাগী মানুষ, বলিলেন, "রামানন্দ তো বউরা (পাগল) হো গিয়া।" এমন ভালো চাকরি ছাড়িয়া দিয়া কি না কাগজ বাহির করা? কেই বা পড়িবে আর কটাই বা গ্রাহক হইবে? পাগল ছাড়া কে এমন কাজ করে? বালকৃষ্ণের 'হিন্দী প্রদীপ' নামে একটি ভালো মাসিকপত্রিকা ছিল।

সাউথ রোডের ব্যারিস্টার রোশনলাল যখন লাহোর চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহার বাড়িতে ভাড়াটে হইয়া আসিলেন পণ্ডিত তেজবাহাদুর সাপ্রু। সাপ্রুদের বিরাট পরিবার। সাপ্রুর পিতামহ এবং পিতা তখন জীবিত। ছেলে-মেয়ে বোন আত্মীয়স্বজনে বাড়ি ভরপুর। তেজবাহাদুরের পিতা মোটা মানুষ ছিলেন। সকাল হইতে এক জায়গায় বসিতেন, সহজে নড়িতেন না। তাঁর গলা ছিল ভারী ও গুরুগম্ভীর, মেজাজ ছিল চড়া। সজোরে চিৎকার করিয়া যখন ভৃত্যদের বাজারের ফর্দ দিতেন, 'এক সের গাজর, দুই আনাকে পান, আধসের করৈলা' ইত্যাদি ইত্যাদি তখন প্রতিবেশী শিশুদের নিকট তাহাই একটা তামাশা ছিল। তাঁহার একটি দুগ্ধশুভ্র গাভী ছিল, সে নির্বিচারে সকলের ঘরে গিয়া ঢুকিত। তেজবাহাদুরের পিতামহ শান্ত, সুশ্রী, চুপচাপ মানুষ ছিলেন।

এলাহাবাদে এই পাড়ার কাছে গোরাদের একটা ব্যারাক ছিল। গোরারা ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানদের গাড়ি ব্যবহার করিত কিন্তু পয়সা দিতে চাহিত না। এই কারণে গাড়োয়ানের দল তাহাদের উপর চটা ছিল। একদিন রাগারাগি চরমে উঠিল। রাত্রে বাহিরে ভীষণ কোলাহল ক্রুদ্ধ গর্জন দাপাদাপি শোনা গেল। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখা গেল বাহিরের

বারান্দা রক্তের রেখায় চিহ্নিত, রক্তের চিহ্ন রেললাইন পর্যন্ত গিয়াছে। পাশের বাড়িতে রাত্রে তেজবাহাদূর সাপ্রু মহাশয়ের পিতার ঘর খোলা ছিল, গাড়োয়ানদের লাঠির ঘায়ে জর্জরিত দুটি গোরা তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার কোলের উপর শুইয়া পড়ে। অস্পষ্ট মনে পড়ে তিনি নাকি তাহাদের দুই হাত দিয়া আগলাইয়াছিলেন এবং গাড়োয়ানেরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার হাতের উপর আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু তিনি আশ্রিতদের ছাড়িয়া দেন নাই। এই ব্যাপারে দুই-একজনের মৃত্যুও হইয়াছিল এবং বিচারে গাড়োয়ানদের কঠিন শাস্তি (দ্বীপান্তর?) হইয়াছিল।

এলাহাবাদে নেহরুরা তখনও স্বদেশী ভাবাপন্ন হন নাই। তখন তাঁহারা পাশ্চাত্য বিলাসিতায় মুগ্ধ। এলাহাবাদে এই সব গল্প চলিত। কেহ বলিত, 'ইঁহারা প্যারিসের ধোপার দ্বারা কাপড় কাচান,' কেহ বলিত, 'তাঁহারা স্বদেশের জল খান না, ইউরোপ হইতে তাঁহাদের জন্য বিশেষ গুণযুক্ত ঝরনার জল আসে।' বেড়াইতে যাইবার পথে 'আনন্দ ভবন' দেখা যাইত। তাহার প্রকাণ্ড উদ্যান, পুকুর ও বিজলিবাতির গল্প লোকে বলিত। জবাহরলাল নেহরুর এক গৃহশিক্ষক ছিলেন, তাঁহার নাম ব্রুক্‌স্। ইনি থিয়সফিস্ট ছিলেন বলিয়া শ্রীশবাবুদের বন্ধু ছিলেন। শ্রীশবাবুর নিকট গীতা পড়িতেন। বামনদাসবাবু ও তাঁহার বন্ধুরা মাঝে মাঝে গঙ্গার ওপারে সন্ন্যাসীদের আড্ডা ঝুঁসিতে বেড়াইতে ও চড়ুইভাতি করিতে যাইতেন। তাহাতে রামানন্দও পুত্রকন্যাদের লইয়া যাইতেন। সেখানে ইংরেজ ব্রুক্‌স্, বাঙালি কয়েকটি পরিবার এবং 'মাস্টার সাহেব' নামধেয় একজন হিন্দুস্থানি ভদ্রলোক সকলেই এই উৎসবে যোগ দিতেন। যত পুরাতন ভাঙা মন্দির ও সন্ন্যাসীদের আড্ডা দেখিয়া বেড়ানো হইত। ব্রুক্‌স্ নদীর ধার দিয়া সজোরে ছুটিতেন, বালক-বালিকারা তাঁহার সঙ্গে পারিত না। মন্দিরের পথও অধিকাংশ ভাঙাচোরা ও উঁচুনীচু, মনে হইত যেন অজানা দেশ আবিষ্কারের সন্ধানে সকলে চলিয়াছি।

রামানন্দের অবাঙালি বন্ধুদের মধ্যে মদনমোহন মালবীয়ই প্রধান ছিলেন। পণ্ডিত সুন্দরলাল, সচ্চিদানন্দ সিংহ, সি ওয়াই চিন্তামণি, ভগবানদীন দোবে প্রভৃতি আরও অনেক নাম মনে আসে। তাঁহার জীবনের একটা যুগের সঙ্গে এই সব বন্ধুদের প্রাত্যহিক স্মৃতি জড়িত ছিল। কিন্তু পরজীবনে কোথাও দেশের দূরত্ব, কোথাও মতের পার্থক্য, কোথাও স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র আসিয়া পড়ায় সেই যোগ বাহ্যত ছিন্ন হইয়া যায়। পণ্ডিত সুন্দরলাল নিঃসন্তান কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ ছিলেন। শৈশবে রামানন্দের একটি কন্যাকে ঠাট্টা করা হইত যে তাহাকে পণ্ডিত সুন্দরলালের পোষ্যরূপে বিলাইয়া দেওয়া হইবে। শিশুটি চটিয়া যাইত।

সচ্চিদানন্দ সিংহের পত্নী রাধিকা মনোরমা দেবীর বন্ধু ছিলেন। তিনি সুরসিকা ছিলেন, শিশুদের ঠাট্টা করিয়া বাংলা বলিবার চেষ্টা করিতেন। শিশুরা তাঁহাকেও উল্টা কিছু শুনাইত।

ভগবানদীন দোবে ছিলেন ব্যারিস্টার। তিনি এবং তাঁহার পত্নী উভয়েই এই পরিবারের বন্ধু ছিলেন। ভগবানদীনের বিবাহের পূর্বে একবার তাঁহাকে একটি বাঙালি ব্রাহ্ম কন্যার সহিত বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা হয়। ভগবানদীন খুব ইউরোপীয় ভাবাপন্ন মানুষ ছিলেন। তিনি তখনকার Loretto Conventএ পড়া রামদুলারী নাম্নী একটি হিন্দুস্থানি মহিলাকে বিবাহ করিলেন। ইঁহারা স্বামী-স্ত্রী সর্বদাই এ বাড়িতে আসা-যাওয়া করিতেন। পরে তাঁহারা বিলাতের স্থায়ী বাসিন্দা হন। ভগবানদীন বিলাতেই ব্যারিস্টারি করিতেন। কখনও দেশে আসিলে এই পরিবারের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন।

দেশসেবার নানাক্ষেত্রে রামানন্দ পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রভৃতির সহকর্মী হইয়া

উঠেন। নেপালচন্দ্র রায় বলেন,

"যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন দেশসেবক তখন কংগ্রেসকে বলশালী করিবার জন্য ইহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, রামানন্দবাবু তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। এই সূত্রে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় তাঁহার একান্ত অনুরক্ত বন্ধু হইয়া উঠেন। মালবীয়জী বুঝিয়াছিলেন এলাহাবাদে তাঁহার জীবনের আদর্শ যে শুধু তাঁহার ছাত্রগণের পক্ষেই অত্যাবশ্যক ছিল তাহা নহে, দেশের সর্বপ্রকার হিতানুষ্ঠানেও তাঁহার সাহায্য এলাহাবাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল।"

তাঁহার ইচ্ছা ছিল বন্ধুকে এলাহাবাদে বরাবর ধরিয়া রাখেন। মালবীয়জী বাঙালিদের সভা-সমিতিতেও আসিতেন এবং বন্ধু রামানন্দের পরিবারবর্গের খোঁজ রাখিতেন।

পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ, পণ্ডিত অযোধ্যানাথ প্রভৃতি রামানন্দকে বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

সি. ওয়াই. চিন্তামণি

সি ওয়াই চিন্তামণি প্রথম এলাহাবাদে আসিয়া সাউথ রোডে রামানন্দের প্রতিবাসী হন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, বালকপুত্র লক্ষ্মীরাম শাস্ত্রী ও তাঁহার এক ভ্রাতৃবধূ—তাঁহার সঙ্গেই আসিয়াছিলেন। চিন্তামণির প্রথমা পত্নী তখনই পরলোকগত। রোশনলালের পেয়ারা বাগানের ধারের ছোটো বাংলোতে চিন্তামণি সপরিবারে থাকিতেন। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় তিনি বন্ধুর বাড়ি আসিতেন এবং নানা বিষয়ে অনর্গল কথা বলিতেন। পরে একবার তিনি বোধ হয় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে এই বন্ধুর বাড়িতেই অতিথি হন। সেকালে চিন্তামণি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, পূজা না করিয়া আহার করিতেন না এবং আহারের সময় কাহারও সহিত কথা বলিতেন না। রামানন্দের গৃহে অতিথিরূপেও রক্ত পট্টবস্ত্র পরিয়া তিনি পূজা ও আহারাদি করিতেন। কিন্তু কিছুদিন পরে আর তাঁহার এত গোঁড়ামি ছিল না। তিনি পরে এই বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে বাঙালি হিন্দুস্থানি নানারকম বন্ধুর সহিত একত্রে বসিয়া বাড়ির মেয়েদের হাতে রাঁধা বাংলা খাদ্য খাইয়াছেন। রামানন্দের বন্ধুদের মধ্যে চিন্তামণির মতো এত কথা বলিতে কাহাকেও দেখা যাইত না। তিনি যেন ছিলেন অফুরন্ত কথা ও গল্পের ভাণ্ডার। তাঁহার রসবোধও প্রচুর ছিল।

পরে চিন্তামণি 'লিডার' নামক কাগজের সম্পাদক হন। তিনি প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করিতেন এবং এই বিষয়ে বন্ধুর সহিত বহু আলোচনা করিতেন। চিন্তামণিরই একজন ভাগিনেয় তাঁহার মিডিয়ম হইতেন এবং সেই মিডিয়মের সাহায্যে তিনি গোখলে প্রভৃতির আত্মার সহিত কথা বলিতেন। গোখলে নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে এমন অনেক ভারতীয় আছেন যাঁহারা আর দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করিবেন না। চিন্তামণি মিডিয়মের সাহায্যে প্রাপ্ত গোখলের বাণী বলিয়া কোনো কোনো প্রবন্ধ 'লিডারে' প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং তাহা সত্যই গোখলের বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

নেপালচন্দ্র রায় বলিতেন, "সচ্চিদানন্দ সিংহ যখন 'ইন্ডিয়ান পিপল' স্থাপন করেন এবং নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ইহার প্রথম সম্পাদক হন তখন এই পত্রিকারও প্রায় নিয়মিত লেখক রামানন্দবাবুকে হইতে হইয়াছিল। নগেন্দ্রবাবুর পর সি ওয়াই চিন্তামণি 'ইন্ডিয়ান পিপলে'র ভার লইলে উহার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হয়। রামানন্দবাবু ছিলেন শ্রীযুক্ত চিন্তামণির প্রধান সহায় ও উপদেষ্টা। চিন্তামণি তাঁহার পিছনে উদয়াস্ত লাগিয়া থাকিতেন।

বলিতে গেলে তাঁহারই নিকট চিন্তামণির Journalism শিক্ষা। ইঁহার ক্ষমতা দেখিয়া চিন্তামণি মুগ্ধ হন।" শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দেবও বলেন "চিন্তামণির ভারতীয় রাজনীতি এবং সম্পাদনকলার বহু পরিমাণ শিক্ষা যে রামানন্দবাবুর নিকট প্রাপ্ত তাহা অনেকে জানেন না।"

চিন্তামণির সহিত রামানন্দের মতের ক্রমে অনেক প্রভেদ হওয়া সত্ত্বেও তিনি চিন্তামণির আত্মনির্ভরশীলতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রখর স্মৃতিশক্তি, দেশহিতৈষণা, শ্রমশীলতা, জ্ঞান, বাগ্মিতা ও রচনাশক্তি প্রভৃতির শেষদিন পর্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। চিন্তামণির কাগজে রামানন্দ এবং এলাহাবাদের সতীশচন্দ্র প্রভৃতি বিখ্যাত লোকেরা লিখিতেন, তখন চিন্তামণি রামানন্দের লেখা পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন।

'মডার্ন রিভিয়ু'র প্রথম বৎসরে চিন্তামণি তাহাতে কখনো কখনো একই মাসে দুইটি প্রবন্ধ লিখিতেন। ইহা ছাড়া পুস্তক-সমালোচনাদিও করিতেন।

শিক্ষা-সংস্কার

এলাহাবাদে শিক্ষাসংস্কার-কার্যে রামানন্দ যে সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহার সহিত পণ্ডিত সুন্দরলাল ও স্বর্গীয় নেপালচন্দ্র রায়ের নাম জড়িত। রামানন্দেরই চেষ্টায় আন্দাজ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে নেপালচন্দ্র অ্যাংলো-বেঙ্গলি স্কুলের হেডমাস্টার হইবার জন্য এলাহাবাদে আসেন। তিনি প্রথমে এই বন্ধুর গৃহেই অতিথি হন। কয়েক মাস সেইখানেই ছিলেন, পরে পেয়ারা বাগানের ধারের ছোটো বাংলোটিতে উঠিয়া যান। চিন্তামণিরাও এই বাড়ির এক অংশে ছিলেন। তবে একই সময় কী আগে পরে তাহা বলা শক্ত। অ্যাংলো-বেঙ্গলি স্কুল বেশি দূরে ছিল না। একটা মাঠ পার হইলেই যাওয়া যাইত। এই স্কুলের জন্য পরে কলিকাতা হইতে বিজয়কৃষ্ণ বসু ও গিরিশচন্দ্র মজুমদার নামে আর দুই জন শিক্ষক এলাহাবাদে যান। ইঁহারা তিন জনই একসঙ্গে থাকিতেন, বিজয়বাবু কিছু দিন পরেই চলিয়া যান, কিন্তু নেপালবাবু ও গিরীশবাবু রামানন্দ ও ইন্দুভূষণের নানা সৎকার্যের সঙ্গী হইয়া বহুদিন এলাহাবাদে ছিলেন। শিক্ষার সংস্কারক হিসাবে রামানন্দ ও পণ্ডিত সুন্দরলালের মধ্যে হৃদ্যতা ছিল। তাঁহারা উভয়েই প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি এডুকেশন এবং আরও অন্যান্য অনেক পরীক্ষার শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে শিক্ষা-বিস্তারের পথে সে সময় বহু বাধা ছিল। সেই সব বাধা দূর করিবার জন্য এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে শিক্ষার চিরস্থায়ী উন্নতি করিবার জন্য তিনি যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম ও সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহার বিষয়ে নেপালচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,

> "উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শিক্ষা সম্প্রসারণে রামানন্দবাবুর অবদান অতুলনীয়। এই সময়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ঐ প্রদেশে একান্ত বাধাগ্রস্ত ছিল। বোধ হয় বাংলা দেশে শিক্ষা-বিস্তারের ফল দেখিয়া ইংরেজ কর্তৃপক্ষ পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে শিক্ষার যাহাতে বহুল প্রচার না হয় এ বিষয়ে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা বোধ হয় অন্যান্য সমস্ত প্রদেশকেই ছাড়াইয়া গিয়াছিল। শিক্ষার্থীদিগকে প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর একবার কর্তৃপক্ষের কসাইখানার মধ্য দিয়া পার হইবার চেষ্টা করিতে হইত। উচ্চ এবং মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের ৭ম, ৫ম ও ৩য় শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা পরিচালনের ভার স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে ছিল না, উহা গ্রহণ করিতেন সরকারি শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষগণ এবং উচ্চশ্রেণীতে প্রবেশ লাভ এই পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিত। বলা বাহুল্য, তিনবার এই

কসাইখানার চৌকাঠ পার হওয়ার সৌভাগ্য খুব কম ছাত্রের ভাগ্যেই ঘটিত।

"এই ভাবে নিম্ন শ্রেণীতেই অধিকাংশ ছাত্রকে শিক্ষা সমাপ্ত করিতে হইত। রামানন্দবাবু সর্বপ্রথম এই শিশু হত্যার (slaughter of innocents) বিরুদ্ধে 'এডভোকেটে'র স্তম্ভে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার লেখা কতকটা ফলপ্রসূ হয়। তদানীন্তন লেঃ গবর্ণর সর অ্যান্টনি ম্যাকডোনেল এই অন্যায়ের প্রতিকার কল্পে একটি ছোটো কমিটি নিযুক্ত করেন এবং রামানন্দবাবু উহার একজন সভ্য মনোনীত হন। প্রধানত তাঁহারই চেষ্টায় কমিটি সপ্তম ও পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষা দুইটি তুলিয়া দিতে সম্মত হন কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর পরীক্ষা তখনই বন্ধ কবিতে সরকারি সভ্যেরা আপত্তি করিল। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার এবং ইন্সপেক্টর তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তৃতীয় শ্রেণীর পবীক্ষা তুলিয়া দেওয়া সম্বন্ধে গবর্নমেন্ট শীঘ্রই বিবেচনা কবিবেন। তাঁহাদেব এই প্রতিশ্রুতিতে রামানন্দ-বাবু তাঁহাব আপত্তি প্রত্যাহার করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে রিপোর্টটি দাখিল কবা হয। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গবর্নমেন্ট দীর্ঘকাল তাঁহাদের এই প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই। অনেক দিন অপেক্ষা করিবার পরও এই পরীক্ষা গ্রহণ চলিতে লাগিল এবং আরও নানাবিধ বিধিনিষেধ শিক্ষাক্ষেত্র কণ্টকিত করিতে লাগিল। এই সময় আমি এলাহাবাদের অ্যাংলো বেঙ্গলি স্কুলেব প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হই। রামানন্দবাবুর চেষ্টাতেই আমি এই পদ লাভ করি। আমি শিক্ষার নানাবিধ বাধা ও অসুবিধা দেখিয়া এই সব বিষয়ে রামানন্দবাবুব দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি পুনরায় 'এডভোকেটে' আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই সময় সব জেম্‌স ডিজিস লাটুশ লেঃ গবর্নরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি 'এডভোকেটে'র অভিযোগ সম্বন্ধে দেশের প্রধান শিক্ষাব্রতীগণের মতামত চাহিয়া পাঠান। হাইকোর্টের প্রথিতযশা উকিল পণ্ডিত সুন্দরলাল তখন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। তখনকাব গবর্নমেন্ট অনেক বিষয়ে পণ্ডিত সুন্দরলালের মতামতেব যথেষ্ট সম্মান করিতেন। গবর্নমেন্ট পণ্ডিত সুন্দরলালের অভিমত চাহিলে তিনি রামানন্দবাবু, মালবীয়জী, শিউরাখন পাঠশালার পণ্ডিত সুন্দরলালের ভ্রাতা পণ্ডিত বলদেওরাম দাবে প্রভৃতি কয়েকজনকে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য তাঁহাব বাড়িতে আমন্ত্রণ করেন। আমিও এই ক্ষুদ্র দলের মধ্যে আহূত হইবার সম্মানপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এই আলোচনার ফলে পণ্ডিত সুন্দরলাল রামানন্দবাবুর অভিযোগ সমর্থন করিয়া গবর্নমেন্টকে পত্র লেখেন। এইবার সমস্ত ক্ষুদ্র বাধা অপসারিত হইল এবং শিক্ষার্থীদিগের ম্যাট্রিক পরীক্ষা পর্যন্ত পথ সরল ও সুগম হইল। আজ এই প্রদেশে শিক্ষাব বহুল বিস্তার ঘটিয়াছে। ইহার মূলে ছিল রামানন্দবাবুর পরিশ্রম ও চেষ্টা।"

এইসময় শিক্ষাব্রতী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। তাঁহাকে কোনো কমিটিতে লইবার নাম হইলে এক জন ইংরেজ আপত্তি করিয়া বলেন "He is a terrible fighter."

পুত্রকন্যাদের পীড়া বন্ধুদের সেবা

নেপালচন্দ্র রায় শুধু যে স্কুলের ছেলেদের শিক্ষার পথ সুগম করিবার চেষ্টাতেই রামানন্দের সহায় ছিলেন তাহা নয়, তিনি ঘরের শিশুদের মানুষ করিয়া তুলিবার চেষ্টাতেও ইঁহার এক জন প্রধান সহায় ছিলেন। শিশুদের পালনে ভ্রমণ, শাসন, গল্প কবিতার স্থান কী এই সব কথা লইয়া বন্ধুদের মধ্যে নেপালবাবু আলোচনা করিতেন, আবার তিনিই স্বয়ং শিশুদের বন্ধু হইয়া তাহাদের সঙ্গে সমবয়স্কের মতো মিশিতেন।

২।১ সাউথ রোডের বাড়িতে এক সময় (১৯০১ খ্রি.) বাড়ির তিনটি শিশুর একসঙ্গে

কঠিন পীড়া হইল। বিদেশে এই রকম কঠিন সমস্যায় যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারাই জানেন ইহা কত বড়ো বিপদ। কিন্তু বিধাতার কৃপা বন্ধুদের মমতারূপে দেখা দিল। বাঙালি সুচিকিৎসক অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তো ছিলেনই, তাহা ছাড়া এলাহাবাদের তখনকার সিভিল সার্জেন ওকনেল (বা ওডোনেল) সাহেবও চিকিৎসা করেন। এই সাহেবটির অন্তঃকরণ কোমল ছিল। তিনি রোগী দেখিতে আসিয়া প্রথম দিকে ফি লইয়াছিলেন, কিন্তু এক দিন না ডাকিতেই নিজে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তখন কিছুতেই ফি লইলেন না এবং বলিলেন, "আমারও এই রকম তিনটি শিশু আছে, আমি তোমার কাছে টাকা লইব না।" সাহেব ডাক্তার নানারকম নূতন ব্যবস্থা দিলেন। বিশেষ প্রয়োজন মনে করিয়াই আর-একদিন রাত্রে একটা টমটমে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথম ব্যবস্থা মতো রোগীদের তিনটি ভিন্ন ঘরে রাখিয়া সমস্ত দরজা-জানালা খুলিয়া তাহাদের দিন-রাত বাতাস করিতে হইত। আর-একটি ব্যবস্থা ছিল সীতাকে (বোধ হয় জ্বর ছাড়ার পর) দুধের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা ব্র্যান্ডি খাওয়ানো। তিনটি ঘরে তিনটি শিশু থাকিলে তাহাদের শুশ্রূষার জন্য আলাদা আলাদা লোকেরও প্রয়োজন হয়। কাজেই ঠিক হইল ইন্দুভূষণ করিবেন অশোকের শুশ্রূষা, সরোজবাসিনী করিবেন সীতার এবং মনোরমা দেবী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের ভার লইবেন। দিন-রাত তিন ঘরে হাওয়া করিবার জন্য তিনটি টানা পাখা ঝোলানো হইল। সম্ভবত দিনের জন্য তিনটি লোক ভাড়া করা হইয়াছিল, কিন্তু রাত্রের জন্য আবার অত খরচ বন্ধুরা করিতে দিলেন না। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, নেপালচন্দ্র রায়, নগেন্দ্রচন্দ্র সোম প্রভৃতি বন্ধুরা নিজেরাই পালা করিয়া পাখা টানিতেন। আজকালকার দিনে বাড়িতে একজনের কঠিন পীড়া হইলে নিকট আত্মীয়-স্বজনেও হয়তো একবার উঁকি মারিয়া কুশল প্রশ্ন করিয়া চলিয়া যান। কিন্তু তখনকার দিনে ওই সুদূর বিদেশে তিন-তিনটি শিশুর সকল রকম পরিচর্যা শুধু বন্ধুজনের নিঃস্বার্থপরতা ও সহৃদয়তার গুণেই হইয়াছিল। রামানন্দ লিখিয়াছিলেন, "ইঁহারা তাঁহাদের মহানুভবতা ও হিতৈষণার পরিচয় দিয়াছিলেন।" সত্য বটে! কিন্তু বন্ধুর পূত চরিত্র, বন্ধুবৎসলতা ও জনসেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন কি তাঁহাদের এই কাজের দিকে আকর্ষণ করে নাই? ইন্দুভূষণ ছেলে ভুলাইতে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি শিশু রোগীকে ভুলাইয়া ছানা ভালুক সাজাইতেন, স্বয়ং হয়তো ধাড়ি ভালুক হইতেন। এইরূপে ঔষধ পথ্য সবই খেলার সামগ্রী হইয়া উঠিত।

বিধাতার কৃপায় ও বন্ধুজনের সেবায় তিনটি শিশুই রোগমুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্বলতায় তাহারা হাঁটিতে চলিতেও ভুলিয়া গিয়াছিল। তিন জনের রোগমুক্তির পর ডাক্তার বলিলেন— এই বাড়ি ছাড়িয়া আরও ভালো বাড়িতে ইহাদের রাখিতে হইবে। তখন এলাহাবাদের আল্‌ফ্রেড পার্কের ধারে এড্‌মনস্টোন রোডে হ্যামিল্টন নামক এক সাহেবের বাড়ি ভাড়া লওয়া হইল। এই বাড়িটির ভিত খুব উঁচু, ঘরগুলি হলঘরের মতো বড়ো বড়ো, সম্মুখে মস্ত আমবাগান, সুরকি-ঢালা রাস্তা, লাল ইটের গেট এবং পিছনে বড়ো খেলার মাঠ দেখিয়া শিশুদের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। বোধ হয় বিঘা দুই-তিন জমি জুড়িয়া তাহার কম্পাউন্ড। রোগমুক্ত শিশুরা গাড়িতে বসিয়া আসিতে পারিবে না বলিয়া পালকি ভাড়া করিয়া তাহাদের শোয়াইয়া আনা হইল।

মাদকতা নিবারণ, অনাথাশ্রম, সমাজ-সংস্কার ও জনসেবা

সে-যুগে যুক্তপ্রদেশবাসীদের অনেক জনহিতকর কাজের প্রেরণা রামানন্দই দিয়াছিলেন। শুধু শিক্ষকতায় তাঁহার আত্মা পরিতৃপ্ত হইত না।

এলাহাবাদে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি সাধনের যতগুলি প্রতিষ্ঠান ছিল সবগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রামানন্দ এবং এলাহাবাদ অঞ্চলে তখন যে কয়টি ইংরাজি পত্রিকা প্রচলিত ছিল তাহার প্রধান কয়টিরও তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। সাপ্তাহিক 'অ্যাডভোকেট' প্রভৃতি কাগজে দেশের নানা অত্যাচার-অবিচারের তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি নিয়মিত লিখিতেন। এই 'অ্যাডভোকেট' কাগজের স্বত্বাধিকারী ছিলেন লক্ষ্ণৌ-এর গঙ্গাপ্রসাদ বর্মা, এক সময় ইহার সম্পাদক ছিলেন বাংলা দেশের কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক। যখন ইন্ডিয়ান পিপল স্থাপিত হয় তখন তাহারও রামানন্দ একজন পৃষ্ঠপোষক হইলেন।

এলাহাবাদ কংগ্রেস কমিটির তিনি এক জন প্রধান সভ্য ছিলেন। নেপালচন্দ্র বলেন যে 'এ-বিষয়ে তিনি মালবীয়জীর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।' এলাহাবাদ হইতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া তিনি কংগ্রেসের অনেকগুলি অধিবেশনে যোগ দিয়াছেন।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মাদকতার বিরুদ্ধে তখন সংগ্রাম শুরু হইয়াছে। রামানন্দই ছিলেন তাহার কেন্দ্র। ওই প্রদেশের যে Provincial Temperance Council ছিল ইনি ছিলেন তাহার প্রেসিডেন্ট। নেপালচন্দ্র বলেন 'বিলাতে, Temperance Society-র প্রতিনিধি পার্লামেন্টের সদস্য কেন (Caine) সাহেব এবং তাঁহার পরে এই সমিতির সম্পাদক গ্রাব সাহেব যখন ভারতবর্ষে আবগারি নীতির অনুসন্ধানে আগমন করেন তখন তাঁহাদিগকে আবগারি নীতি দেশের যে ঘোর অনিষ্ট করিতেছিল তাহা বুঝাইবার জন্য তাঁহাকে (রামানন্দকে) যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।' London হইতে প্রকাশিত এই সময়ের *Abkari* নামক ইংরাজি কাগজে রামানন্দের ছবি এবং তাঁহার বিষয় কিছু লেখাও প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ংও *Abkari* কাগজে লিখিতেন।

Feb, 1907-এর 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে 'আবকারি' পত্রের সম্পাদক ফ্রেডরিক গ্রাবের লিখিত "Drink Problem in India" প্রবন্ধ বাহির হয়। সুরেন্দ্রনাথ দেব বলেন 'কেন সাহেব এলাহাবাদে Provincial Temperance Council প্রতিষ্ঠা করেন।'

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদ অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস বলিয়াছেন, 'দুর্ভিক্ষের পর কয়েকজন সহৃদয় হিন্দুস্থানি ও বাঙালি অনাথাশ্রমের সূচনা করেন। লালা রামপ্রসাদ ছিলেন ইহার প্রতিষ্ঠাতা।' প্রথমে রামানন্দ এই অনাথাশ্রমের সেক্রেটারি হন, পরে বোধ হয় ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ওহদেদার ইহার সেক্রেটারি হন। সুতরাং এই সহৃদয় বাঙালিরা যে রামানন্দ ও দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাহা বুঝা যাইতেছে। অনাথাশ্রমটি অল্পদিনেই বেশ গড়িয়া উঠে এবং আত্মনির্ভরশীল হয়। আশ্রমের ছেলেরা বেশ ভালো হাতের কাজ করিত। তখনকার দিনে স্কুলে আশ্রমে সর্বত্র আজকালকার মতো কুটিরশিল্পের প্রবর্তন হয় নাই। কিন্তু তবু রামানন্দ এবং দেবেন্দ্রনাথ ছেলেমেয়েদের দিয়া এই সব শিল্পকার্য করাইতেন। স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার এই অনাথাশ্রম দেখিতে আসেন, তাঁহার বিষয় রামানন্দ প্রবাসীতে লিখিয়াছিলেন, "ছোটোলাট হিসাবে তাঁহার সুখ্যাতি হয় নাই। কিন্তু তিনি মানুষটি মন্দ ছিলেন না। আমি তাঁহাকে ও তাঁহার পত্নীকে প্রথম এলাহাবাদে

দেখি। তিনি তখন তথাকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এলাহাবাদের মুঠিগঞ্জে যে অনাথাশ্রম ছিল, তিনি তাহা সস্ত্রীক দেখিতে আসিয়াছিলেন। আমি তখন তাহার সম্পাদক ছিলাম। তাঁহারা অনাথ বালকবালিকাদের সহিত সস্নেহ আলাপ করেন এবং আশ্রমে কিছু দান করিয়া যান।"

এলাহাবাদে হোলির সময় (দোল) নানা অশ্লীল প্রথার প্রচলন ছিল, বহু ভদ্র উচ্চশিক্ষিত মানুষ তাহাতে যোগ দিতেন। ওই প্রদেশে রামলীলার সময় হিন্দু মুসলমানে কলহ হইত, বিবাহ আহারাদি ব্যাপারে সামাজিক অনেক সংকীর্ণতা ছিল, বিবাহে বাইনাচ হইত। এই সকল বিষয় সংস্কারের জন্য এবং বিশেষত একটি জাতির অসংখ্য শাখার মধ্যে বিবাহাদি প্রচলনের জন্য একটি সভা সংস্থাপিত হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে রামানন্দ ছিলেন প্রধান। এলাহাবাদের স্মলকজ কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত জজ ছিলেন ইহার সভাপতি এবং পণ্ডিত মনোহরলাল যোশী ছিলেন সম্পাদক। অর্ধকুম্ভের মেলায় একবার শিলাবৃষ্টিতে বহু মানুষ গোরুবাছুর এবং তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়, তখনও তিনি নানা উপায়ে দুর্গতদের সেবার চেষ্টা করিয়াছেন। মাঘমেলায় এবং বড়ো বড়ো যোগের সময় বহু মানুষের প্রাণ যাইত ভিড়ের ঠেলায় চাপা পড়িয়া, আবার অনেকে মরিত কলেরায় বা শীতে। তাহাদের রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের চেষ্টা হইত, সেই সব কমিটির আলোচনা সভায় রামানন্দের উপস্থিতির কথা শুনিয়াছি। নানা হিতচেষ্টার তিনিই উদ্যোক্তা ছিলেন।

এলাহাবাদে জনহিতৈষী ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত অবিনাশ মজুমদার কর্নেলগঞ্জ লাইব্রেরি এবং তৎসংলগ্ন "বঙ্গসাহিত্য উৎসাহিনী সভা" নামক ডিবেটিং সোসাইটি স্থাপন করেন। রামানন্দ ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ইহার প্রত্যেক অনুষ্ঠানে উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন। চৌকে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের সাহায্যে তিনি একটি পুস্তকালয় খোলেন।

নানা পত্রে দেশপ্রেমের নানা প্রকাশ

প্রেমই রামানন্দের জীবনেব মূলমন্ত্র ছিল। অন্তর্মুখীন জীবনে বাল্যে মাতা ও যৌবনে পত্নীপুত্রকন্যাকে আশ্রয় করিয়া যে প্রেম তাঁহার প্রাণকে সরস সুন্দর ও কুসুম-কোমল করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল, সেই প্রেমই বহির্মুখীন জীবনে প্রথমে জন্মভূমি বাঁকুড়া, পরে বাংলা দেশ এবং ক্রমশ এই বিশাল ভারতকে যেন সহস্র বাহু দিয়া বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল। তিনি দিনে দিনে এই ভারতের সর্ব ক্ষেত্রের মঙ্গল প্রচেষ্টায় এমন করিয়া আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, এমন অতন্দ্র প্রহরীর মতো, এমন চিরকল্যাণময়ী মাতার মতো ইহার সকল স্বার্থরক্ষা করিয়াছেন, সকল জাগরণের প্রদীপ জ্বালাইয়া বেড়াইয়াছেন এবং সর্বক্ষেত্রেই জাতিকে গরীয়ান করিযা তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বহু দেশবাসীর মনে হইত এ দেশকে বিধাতা যেন তাঁহারই হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন, তিনিই ইহার অভিভাবক। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দেই তাঁহার ষাট বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয় বলিয়াছিলেন,

> "একজন ঐতিহাসিক সত্যই বলিয়াছেন যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ২৫ বৎসরে ইংলন্ডের ইতিহাস শুধু *Edinburgh Review* এবং *English Tory Bureaucracy*র মধ্যে দ্বন্দ্বের ইতিহাস। আমার অনেক সময় মনে হয় যে ভারতের গত সাড়ে আঠার বৎসরের ইতিহাস সত্যই মডার্ন রিভিউ এবং ভারতের বিদেশী আমলাতন্ত্রের মধ্যে যুদ্ধের কাহিনী মাত্র। এ যুদ্ধে যদি আমাদের সম্পূর্ণ জয় না হইয়া থাকে, তবে তাহার জন্য লোকাচার, দেশের অতীতের জের, এবং জাতীয়

চরিত্রের দুর্বলতাই দায়ী। মডার্ন রিভিউ সম্পাদক *Edinburgh Review*-এর সম্পাদক হইতে কম করেন নাই।"

সরকার মহাশয় ১৮ বৎসর পূর্বে শুধু 'মডার্ন রিভিয়ু'-এর কথা এবং তৎকালীন রাজনৈতিক যুদ্ধের ইতিহাসের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু 'মডার্ন রিভিয়ু' আবির্ভূত হইবার বহু পূর্বেই দেশপ্রেম রামানন্দকে কার্যক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়াছিল। সে কার্যক্ষেত্রের উদ্‌বোধন যুদ্ধ করিয়া আরম্ভ হয় নাই, সেবার কল্যাণ-স্পর্শ লইয়া শুরু হইয়াছিল : বিধাতা তাঁহাকে বহুমুখী প্রতিভা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি বিত্ত ও সম্মানের আকাঙক্ষা করিলে, শুধু নাম কিনিতে চাহিলে যৌবনেই তাহা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার দিব্যচক্ষু যৌবন-প্রারম্ভেই তাঁহাকে পার্থিব সম্মান ও সম্পদের তুচ্ছতা দেখাইতে শিখাইয়াছিল। তিনি সহজ সফলতার কুসুমাস্তীর্ণ পথ ত্যাগ করিলেন। নীরব সেবার ধর্ম গ্রহণ করিলেন। নামের মোহ পাছে কাজের প্রেরণার চেয়ে বড়ো হয়, পাছে নিষ্কাম কর্ম স্বার্থ দ্বারা কলুষিত হয়, তাই প্রথম যৌবনেই তিনি ব্রত লইয়াছিলেন, "Let not thy left hand know what thy right hand does." তিনি সেবার ক্ষেত্রে নামিলেন, কিন্তু অত বড়ো বিরাট হৃদয়ের করুণা শুধু অন্ধের সেবায়, শুধু মূকের সেবায়, শুধু আতুরের সেবায় তো নিঃশেষিত হইতে পারে না। তাঁহার প্রাণ মূঢ়, আর্ত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, দরিদ্র, বঞ্চিত, ক্ষুধার্ত সকলের জন্য কাঁদিয়া উঠিল। সরস্বতীর কৃপা তাঁহার উপর ছিল, সরস্বতী তাঁহার সহায় হইলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে হালকা রকম সাহিত্যের চর্চা করিয়া অল্প প্রয়াসে শীঘ্র সম্মান ও নাম কিনিতে পারিতেন, কারণ তিনি সাহিত্যেরই বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ডায়েরিতে আছে তিনি নিজেই নিজেকে শাসন করিলেন, "বাহাদুরি লইবার জন্য কলম ধরিবে না, সেবার জন্য ধরিবে।"

জীবিকার জন্য চাকরি তাঁহাকে করিতে হইত, কিন্তু ইহাতে তাঁহার মন খুব বেশি ছিল না। তিনি ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দেই বলিতেন, "যদি নিতান্ত চাকরি করিতেই হয় শিক্ষকতা করিব, না হলে স্বাধীনতা বিসর্জন দিবার ইচ্ছা আমার নাই।" শিক্ষকতা চাকরিও বটে আবার সেবাও হইয়া উঠিতে পারে, যদি শিক্ষকের সে ইচ্ছা থাকে, সেইজন্য সেই কাজই তিনি গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু শুধু মুষ্টিমেয় ছাত্রের সেবায় তাঁহার তৃপ্তি ছিল না। তিনি যে গভীর জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চয় করিয়াছিলেন, যে নানা বিদ্যার সম্মোহনী বংশীধ্বনি তাঁহাকে ডাক দিয়াছিল, দেশব্যাপী যে দুর্গতি, দারিদ্র্য ও শিক্ষাহীনতা তাঁহাকে মর্মে মর্মে পীড়িত করিতেছিল, তাহাতে শুধু কলেজের কক্ষে চারিটি দেওয়ালের মধ্যে বসিয়া ছাত্রদের কেবল ইংরাজি কাব্য ও সাহিত্য পড়াইয়া পূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় না। জন্মভূমির প্রতি আপনার কর্তব্য করিয়াছি এ সান্ত্বনা তিনি নিজেকে দিতে পারিতেছিলেন না। যে সেবাব্রতের জন্য যৌবন-প্রারম্ভে তিনি লেখনী গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সেবার জন্যই তিনি পরেও বার বার লেখনী গ্রহণ করিলেন। পরের কাগজে তিনি সেকালে যে পরিমাণে লিখিয়াছিলেন নিজের কাগজ 'প্রদীপ' ও 'প্রবাসী'র প্রথম দিকে তাহা অপেক্ষা অনেক কমই লিখিয়াছিলেন। কিন্তু নিজের কাগজের আদর্শ, বিষয় নির্বাচন, লেখকগোষ্ঠী চয়ন, সম্পাদন ও লেখক গড়িয়া তোলা সবই নিজের হাতে থাকে। এইজন্য সম্পূর্ণ নিজের কাগজ করিবার কল্পনা তাঁহার মন ভরিয়া তুলিল। সেবার ক্ষেত্র তাঁহার বৃহত্তর হইয়া পড়িল। ধর্মজীবনের পথে সমসাময়িক ছাত্র ও যুবকদের সহায় হইবেন এই ইচ্ছায় প্রায় কিশোর বয়সে তিনি 'ধর্মবন্ধু'র সাহায্য লইয়া সেবায়

নামিয়াছিলেন ; তার পর এবং কতকটা সঙ্গে সঙ্গেই 'ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার' এবং 'সঞ্জীবনী'র ও 'ইন্ডিয়ান মিররে'র সাহায্যেও নিজ জীবনের নানা আদর্শের প্রচার করিয়াছিলেন। তারপর জীবের দৈহিক পীড়া ও দুঃখ মোচনের জন্য হইলেন 'দাসী'র কর্ণধার। কিন্তু মানুষের শরীর, মন, আত্মা কোনোটিই তাঁহার কাছে উপেক্ষার জিনিস ছিল না, কোনো একটিও বাদ দিয়া মানুষের সেবায় নামিলে প্রকৃত সেবা হয় না, পূর্ণ সেবা হয় না, এই বিশ্বাস তাঁহার দৃঢ় ছিল। সকল দিকে মানুষের চোখ খুলিয়া দিতে হইবে, সকল দিকে তাহার মনে জ্ঞানের ক্ষুধা জাগাইয়া তুলিতে হইবে, তাহার বিবেককে সকল দিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। তিনি তাই শিক্ষা, ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, কলা, অর্থনীতি, রাজনীতি কোনোটাকেই নিজ ক্ষেত্রের বাহিরে মনে করিলেন না। মানবের এই সর্বাঙ্গীণ উন্নতির আদর্শ এবং মানবাত্মাকে এইরূপে অখণ্ডভাবে দেখার প্রেরণা রাজা রামমোহনের আশীর্বাদরূপে যেন তাঁহার জীবনে নামিয়া আসিয়াছিল। সেই আদর্শ হইতে তিনি কখনও চ্যুত হন নাই। সেইজন্যই তিনি যখন দেখিলেন পরাধীনতার শৃঙ্খল পায়ে বাঁধা থাকিলে মানুষের উন্নতির পথে যাত্রা পদে পদে ব্যাহত হয়, তখন সেবাধর্মেরই অঙ্গ হিসাবে তিনি পরাধীনতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যে হাতে আর্তের অশ্রু মুছাইতে তিনি কর্মক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন, সেই হস্তেই শিক্ষিত তীরন্দাজের মতো অব্যর্থ বাণ সন্ধানের কঠোর কর্তব্য তুলিয়া লইলেন। 'প্রবাসী'র যুগের পূর্বেও এলাহাবাদ ও অন্যান্য অঞ্চলের নানা ইংরাজি কাগজের সাহায্যে তিনি মসীযুদ্ধ করিয়াছেন। ক্রমে এমনি করিয়া রামানন্দের 'প্রবাসী' জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণের এবং সেবাব্রতের সঙ্গে মানবের মুক্তি-সংগ্রামে অস্ত্রাঘাতের নিষ্ঠুর কর্তব্যও একই ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিল। পরে 'মডার্ন রিভিয়ু' সেই ধর্মযুদ্ধের দোসর হইয়া উঠিল। সম্পাদক চিকিৎসকের মতো যে হস্তে ঔষধ পথ্য বিলাইতেন, সেই হস্তেই অস্ত্রধারণ করিয়া ক্ষত চিকিৎসা শুরু করিলেন। সে ক্ষত শরীরজাত গ্লানি হইতেই উদ্ভূত হউক, কি বাহিরের আক্রমণেই সৃষ্ট হউক তাহাতে কিছু আসিয়া যাইত না।

যে কয়েকটি কাগজের সহিত রামানন্দের নাম জড়িত তাহা ছাড়াও অন্য কয়েকটি কাগজের সহিত যে তিনি যুক্ত ছিলেন এ কথা সেকালের লোকে ভুলিয়া গিয়াছেন এবং একালের লোকে জানেন না। প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মৃত্যুর পর 'প্রবাসী' সম্পাদক তাঁহার বিষয় যে প্রবন্ধ লেখেন তাহাতে আছে :

> 'তিনি ট্রিবিউনের কাজ ছাড়িয়া বাংলা দেশে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এখানে তাঁহার গ্রে ষ্ট্রীটস্থিত পৈতৃক গৃহ হইতে 'সুপ্রভাত' নাম দিয়া একটি বাংলা সাপ্তাহিক বাহির করেন। আমি তখন এলাহাবাদে কাজ করিতাম, নগেন্দ্রবাবুর কাগজটির সেখানকার সংবাদদাতা ছিলাম। তাঁহার কাগজে ছাপা আমার দুই-একটা সংবাদ-চিঠি পড়িয়া তিনি আমাকে ব্যক্তিগত চিঠিতে এই সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন যে, আমার জর্ন্যালিস্টিক ইন্সটিংক্ট (Journalistic instinct) আছে। তাহাতে আমি উৎসাহিত হইয়াছিলাম। কিছুকাল আমি 'হিন্দুস্থান রিভিয়ু'তে নিজের নাম না দিয়া শিক্ষাবিষয়ক কতকগুলি নোট লিখিতাম। সেগুলি পড়িয়া মান্দ্রাজের 'হিন্দু'র প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ সাংবাদিক জি সুব্রমণি আইয়ারও নোটগুলির অজ্ঞাতনামা লেখককে ঐরূপ সার্টিফিকেট কথাপ্রসঙ্গে দিয়াছিলেন। কিন্তু তখন আমি কোথাও দরখাস্ত করিতে না পারায় কোনো দৈনিক কাগজের আপিসে কাজ পাই নাই।...এই অবান্তর কথাগুলি কৃতজ্ঞতার সহিত লিখিতেছি এই জন্য যে, নগেন্দ্রবাবু বন্ধুভাবে এবং মান্দ্রাজী প্রসিদ্ধ সম্পাদক অপরিচিত ও অজ্ঞাত এই যুবককে উৎসাহ দেওয়ায় আমি আমার কয়েকটা মাসিক কাগজে সম্পাদকরূপে রাজনৈতিক ও অন্যান্য

বিষয়ে লিখিবার কাজে সাহস পাইয়াছিলাম।"

এই সময় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও অযোধ্যায় ক্ষুদ্রকায় *Advocate* ছাড়া প্রায় অন্য কোনো কাগজ ছিল না, সচ্চিদানন্দ সিংহ বলেন।

'কায়স্থ সমাচার'

'হিন্দুস্থান রিভিয়ু' কাগজটির পূর্ব নাম ছিল 'কায়স্থ সমাচার' এবং তাহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন রামানন্দ। বাংলা ১৩২২ সালে সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর 'প্রবাসী'-সম্পাদক তাঁহার বিষয় অন্যান্য কথা লিখিবার সময় লেখেন, "বেহারের মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ আমাদের প্রবর্তিত 'কায়স্থ সমাচারে'র (বর্তমান 'হিন্দুস্থান রিভিয়ু') যখন ভার লন, তখন প্রথম অবস্থায় সতীশচন্দ্র সম্পাদন কার্যে এবং লেখা দিয়া তাঁহার অনেক সাহায্য করেন।" 'কায়স্থ সমাচার' বিষয়ে 'হিন্দুস্থান রিভিয়ু'র সম্পাদক সচ্চিদানন্দ সিংহ যাহা লিখিয়াছেন তাহার বাংলা সংক্ষিপ্তসার এই :—"মুনশি কালিপ্রসাদের উইল অনুসারে কায়স্থ পাঠশালার একটি মাসিকপত্র প্রকাশের শর্ত ছিল, তাহার নাম ছিল 'কায়স্থ সমাচার'। কাগজটি উর্দুতে প্রকাশিত হইত। রামানন্দ এই কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া যাইবার পর তখনকার প্রেসিডেন্ট মুনশি রামপ্রসাদের অনুরোধে রামানন্দ ইংরাজি 'কায়স্থ সমাচারে'র প্রবর্তন করেন। ইহা জুলাই ১৮৯৯ হইতে জুন ১৯০০ পর্যন্ত তাঁহার সম্পাদনায় চলিয়াছিল। অধ্যক্ষের কাজে অনেক সময় দিতে হইত বলিয়া রামানন্দ দ্বিতীয় বৎসর কাগজের সম্পাদক হইতে অস্বীকার করেন। তখন দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট মুনশি গোবিন্দপ্রসাদ সচ্চিদানন্দ সিংহকে কাগজের সম্পাদক হইতে বলেন। তিনি তেজবাহাদুর সাপ্রু ও সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে কাগজ প্রকাশ করেন। ১৯০৩-এ ইহারই নাম 'হিন্দুস্থান রিভিয়ু' হয়। যতদিন 'মডার্ন রিভিয়ু' প্রকাশিত হয় নাই ততদিন রামানন্দ 'কায়স্থ সমাচার' ও 'হিন্দুস্থান রিভিয়ু'-এর অন্যতম প্রধান লেখক ছিলেন।"

এই 'কায়স্থ সমাচার' ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদে প্রকাশিত হইত, কারণ এ বিষয়ে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের মডার্ন রিভিয়ুতেও সম্পাদক স্বয়ং লিখিয়াছেন, "সাত বৎসরেরও কিছু পূর্বে শিল্পের এই প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আমরা আমাদের সম্পাদিত 'কায়স্থ সমাচারে' উল্লেখ করিয়াছিলাম।" ম্হাত্রে-নির্মিত 'মন্দিরপথবর্তিনী' মূর্তিটির প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধ লিখিত হয়। শিল্পকে মানুষের জীবনে তিনি কত বড়ো স্থান দিতেন এবং তাহা কী ভাবে জনসাধারণের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা দেখাইবার জন্য ইংরাজি হইলেও প্রবন্ধটির একাংশ তুলিয়া দিলাম :

"It does not require much observation to perceive that jealousies and prejudices exist not only among different nations and countries, but even among the provinces and districts of the same country...What is the remedy? Evidently a deeper and wider knowledge of our neighbours and the charity which that knowledge is sure to breed. One of the most effective means of knowing a nation is to know its literature. In Europe, there are more people knowing languages other than their own mother-tongues than in India. Europeans, or to speak of a particular nation, Englishmen, have translated the best books in other languages into their own. Hence

they are in a better position to understand other people than the people of India. Not to speak of those of other countries, we do not know the literature and people of our neighbouring provinces. How many men are there in India who know the principal vernaculars of the country ? We do not care to read even the translations of some vernacular books which Englishmen have made. No wonder there should be so much provincial jealousy, distrust and prejudice. Happily, things are taking a turn for the better. Many educated Indians have begun to study other Indian vernaculars than their own... another means of knowing a people is to know its art. It requires much culture to say why one admires a work of art. But even a savage may be struck with the beauty of a statue, a building or a picture. In this respect art enjoys an advantage over literature. It appeals even to the illiterate. Hence, as a factor silently making for national unity, we should welcome a revival of artistic activity in India as much as, if not more than, a revival of literary activity. A few facts, perhaps otherwise insignificant, show that probably such an artistic revival is approaching. One the increasing liking among Indians for illustrated newspapers, magazines and books. Another is the popularity and extensive use of the pictures of Raja Ravi Varma. Five years ago they were scarcely known in Northern India. As for as we are aware it was a Bengali magazine named 'সাধনা' which in the north first pointed out the merits of these pictures. It is a pity that Ravi Varma does not yet seem to have had any intelligent imitators or rivals. The third fact that we wish to mention is the production by Mr. G. K. Mhatre of Bombay of the statue which forms the subject of this article... When the statue was placed before the public, it at once came to be talked of and appreciated in different provinces of India. Had Mr. Mhatre written a book in which is his mother tongue, it would have been appreciated only by Marathas, at least for years to come, even if it had possessed great merit. But we who do not know Marathi and others like us can admire and appreciate his statue, and be chastened and elevated by it. This exemplifies the advantage that art has over literature, which we have spoken of above... It requires some education to perceive the distinctive style or the hidden meaning of a work of art. But the language of form and colour appeals to all.—*M. R.*, Jan., 1907.

"বিভিন্ন জাতি ও দেশের মধ্যে এমনকি একই দেশের নানা প্রদেশ ও জেলায় পরস্পরের প্রতি যে ঈর্ষার ভাব ও কুসংস্কার আছে তাহা বুঝিতে প্রচুর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না।... ইহার প্রতিকার কি? আমাদের প্রতিবেশীদেব সম্বন্ধে গভীরতর ও বিস্তৃততর জ্ঞান এবং জ্ঞানজনিত সহৃদয়তা বিস্তার ছাড়া আর কি প্রতিকার হইতে পারে? কোনো জাতির সম্বন্ধে সফল জ্ঞান লাভ করিবার একটি শ্রেষ্ঠ উপায় তাহার সাহিত্যকে জানা। মাতৃভাষা ভিন্ন নানা ভাষা জানে এমন মানুষের সংখ্যা ভারতবর্ষের তুলনায় ইউরোপে বেশি। ইউরোপীয়েরা, অথবা বিশেষ একটা জাতির কথা বলিতে গেলে, ইংবেজরা, অন্যান্য ভাষার শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলি নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছে। সুতরাং ভারতীয়দের অপেক্ষা তাহাদের অন্যান্য জাতিকে বুঝিবার সম্ভাবনা অধিক। অন্যান্য

দেশের কথা জানা তো দূরে থাকুক, আমরা আমাদের ভারতের প্রদেশগুলির সাহিত্য ও জনসমাজ সম্বন্ধেই অজ্ঞ। ভারতে কজন এমন লোক আছেন যাঁহারা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রধান ভাষাগুলি জানেন? ইংরেজেরা যে-সব ভারতীয় পুস্তক অনুবাদ করিয়াছেন আমরা সে সব অনুবাদও পড়িবার কষ্ট স্বীকার করি না। কাজেই এদেশে যে এত প্রাদেশিক ঈর্ষা, অবিশ্বাস ও কুসংস্কার থাকিবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি? সুখের বিষয় দেশের হাওয়া ফিরিতেছে। অনেক শিক্ষিত ভারতীয় আজকাল ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা পড়িতে শুরু করিয়াছেন।...

মানুষকে জানিবার আর একটি উপায় তাহাব শিল্পকলাকে জানা। মানুষ কেন কোনো শিল্প সৃষ্টির গুণগান করে তাহা বুঝিতে উচ্চ শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রয়োজন। কিন্তু বন্য মানুষও কোনো মূর্তি, সৌধ কি চিত্রের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইতে পারে। এ বিষয়ে সাহিত্য অপেক্ষা শিল্পের সুবিধা অনেক। শিল্পসৃষ্টি নিরক্ষরের মনেও ধাক্কা দিতে পারে। সুতরাং আমাদের জাতীয় একতার পথে নীরবে জাতিকে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য আমরা ভারতের সাহিত্যিক পুনর্জাগরণের মত, কিংবা তাহা অপেক্ষা অধিকতর আগ্রহে শিল্পের পুনর্জাগরণকে স্বাগত বলিব।

আপাতদৃষ্টিতে সামান্য অথচ তথ্যপূর্ণ কয়েকটি জিনিস দেখিয়া মনে হয় সেই পুনর্জাগরণ আগতপ্রায়। প্রথম, ভারতীয়দের সংবাদপত্র, মাসিক কাগজ ও পুস্তকের মধ্যে চিত্র যোজনার প্রতি ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ ; দ্বিতীয়, রাজা রবিবর্মার ছবির জনপ্রিয়তা ও বিস্তৃত ব্যবহার। পাঁচ বৎসর পূর্বে এই সব ছবি উত্তর ভারতে প্রায় অজ্ঞাত ছিল। আমরা যতটা জানি তাহাতে মনে হয় 'সাধনা' নামক একটি বাংলা পত্রিকাই উত্তর ভারতে প্রথম এই সকল চিত্রের গুণাগুণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুঃখের বিষয় এখনও রবিবর্মাব কোনো প্রতিভাশালী অনুকারী কী প্রতিদ্বন্দ্বী দেশে দেখা দেন নাই। তৃতীয়ত যে বিষযটির কথা উল্লেখ কবিতে চাই, তাহা বোম্বাই-এব জি কে ম্হাত্রে নির্মিত মূর্তি, এই প্রবন্ধটি সেই বিষয়েই লিখিত। যখন এই মূর্তিটি জনসাধাবণের সম্মুখে ধবা হয়, তখনই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইহার আলোচনা ও গুণগান শোনা যায়। ম্হাত্রে যদি নিজ মাতৃভাষা মবাঠিতে কোনো পুস্তক লিখিতেন, তাহা হইলে তাহাতে উচ্চ প্রতিভাব প্রকাশ থাকিলেও অন্তত বহু বৎসর ধরিয়া শুধু মরাঠিরাই তাহার প্রশংসা কবিত। কিন্তু আমরা, এবং আমাদেব মতো আর যাঁহাবা মরাঠি জানেন না, তাঁহাবা সকলেই এই মূর্তিটি দেখিয়া মুগ্ধ হইতে ও তাহাব গুণগান করিতে পাবেন এবং ইহার সৌন্দর্যে তাঁহাদের চিত্ত পবিত্র ও উন্নত হইতে পারে। ইহাতেই বোঝা যায় প্রচাব ক্ষেত্রে সাহিত্য অপেক্ষা শিল্পের কী সুবিধা!... কোনো শিল্পসৃষ্টির অন্তর্নিহিত গভীর অর্থ কিংবা তাহার বিশেষ রচনারীতি (style) বুঝিতে কিছু শিক্ষার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু রেখা ও বর্ণের ভাষা আপামর সাধারণকে আকর্ষণ করে।"

ইহারই কাছাকাছি সময়ে রামানন্দ রবিবর্মার একটি বহুচিত্রসমন্বিত ইংরাজি জীবনী লিখিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ভারতীয় বিষয়ে একমাত্র তিনিই তখন ছবি আঁকিতেন। তাঁর রবীন্দ্রনাথও তাঁহার ঘর আগাগোড়া রবিবর্মার ছবিতে সাজাইয়াছিলেন।

'প্রবাসী' প্রকাশ

'প্রবাসী' বাংলা ১৩০৮ সালের বৈশাখে (১৯০১, এপ্রিল) এলাহাবাদের ২।১, সাউথ রোডস্থিত বাসাবাড়ি হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'প্রবাসী' প্রকাশে অনেক দিকে মনোরমা দেবী তাঁহার স্বামীর সহায় ছিলেন। রামানন্দ লিখিয়াছিলেন :

"এই বাসায় তোমাদের মায়ের ও আমার একটি পাব্লিক কাজের আরম্ভ হয়। তোমাদের মা ও... নিজের নিজের শক্তি অনুসারে তখন প্রবাসীর কাজ করতেন। কাগজগুলি মোড়কে মুড়ে, আঠা ও দড়ি দিয়ে প্যাক করে, টিকিট লাগিয়ে ডাকে পাঠানো হ'ত। এই কাজ তোমরাও খুব উৎসাহের সঙ্গে করতে। প্রবাসীর প্রথম ম্যানেজার ছিলেন আশুতোষ চক্রবর্তী। ম্যানেজার একজন ছিলেন বটে, কিন্তু গোড়ার থেকেই তোমাদের মা সমুদয় হিসাবপত্র দেখতেন। আমরা কলকাতা আসবার পরও, অসুস্থ হবার পূর্বে পর্যন্ত, অনেক বৎসর তিনি হিসাব দেখতেন। অন্তত দুবার আমাদের সঙ্গে যাদের কারবার ছিল এরূপ দুটি পার্টির একই কাজের জন্য দ্বিতীয় বার বিল করে টাকা নেওয়া বা নেবার চেষ্টা তিনি ধরেছিলেন। সে বড়ো কম টাকা নয়।"

প্রথম যখন 'প্রবাসী' প্রকাশিত হয় সম্পাদক ও তাঁহার সহধর্মিণী মিলিয়াই সমস্ত প্যাক করার কাজ করিয়াছিলেন। কুটিরশিল্পের মতো করিয়া কাজ শুরু হয়। শিশুদেরও উৎসাহের অভাব ছিল না, তবে বাটি করিয়া জল আনা, আঠা-দিয়া কাগজ জোড়া, কাগজে শুধু দড়ি-বাঁধা এবং ডাক-টিকিট লাগানো ছাড়া আর কিছু করিবার মতো নিপুণতা তাহাদের ছিল না।

পুরাতন 'প্রবাসী'তে আছে : যে সময়ের কথা হইতেছে সে সময় এলাহাবাদে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার দ্বিতীয় যুগ। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে 'প্রয়াগ দূত' নামক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক স্বর্গীয় মধুসূদন মৈত্র মহাশয়, 'প্রয়াগ বঙ্গ-সাহিত্যোৎসাহিনী সভা'র প্রবর্তক স্বর্গীয় বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কয়েকজন প্রবাসী বাঙালি প্রথম যুগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। প্রথম যুগের প্রধান প্রধান কর্মীর স্থানান্তরগমনে এই যুগের অবসান হয়, তৎপূর্বেই 'প্রয়াগদূত' উঠিয়া যায় : সভাসমিতি, সাহিত্য-চর্চা প্রভৃতি নিবিয়া যায়।

অধরচন্দ্র মিত্র এবং কায়স্থ কলেজের উপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথ দেবের চেষ্টায় 'বঙ্গ-সাহিত্যোৎসাহিনী সভা'র পুনরুদ্ধার হয়। এই সভা এক সময় স্থানীয় বহু শিক্ষিত ও বিশিষ্ট প্রবাসী বাঙালির মিলনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। ১৩০৩ সালের ১ বৈশাখ জনস্টনগঞ্জে প্রয়াগবঙ্গ-সাহিত্য-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস 'জাতীয় সাহিত্য ও উন্নতি' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভা ভঙ্গে রামানন্দ তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। সেই তাঁহাদের প্রথম আলাপ। তার পর কর্নেলগঞ্জের 'বান্ধব সমিতি'র অধিবেশনে জ্ঞানবাবুরা রামানন্দকে সভাপতিত্বে বরণ করেন।

'প্রবাসী' (১৩০৮) বাহির হইবার সময় জ্ঞানবাবু 'চরিত্রগঠন' নামক একটি পুস্তক লিখিতেছিলেন। রামানন্দ তাহার প্রুফ সংশোধন করিয়া ও ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। একদিন জ্ঞানবাবু ইন্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারীর নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় রামানন্দ কতকগুলি ছবি ও কাগজপত্র লইয়া আসিলেন। সেই দিন জ্ঞানবাবু জানিলেন যে রামানন্দ শীঘ্রই একখানা সচিত্র মাসিক পত্র বাহির করিবেন এবং তাঁহাকেও তাহাতে লিখিতে হইবে। পরে তিনি তাঁহাকে প্রবাসীর প্রথম সংখ্যায় রাণাকুম্ভের জয়স্তম্ভ 'ক্ষীরাৎ কুম্ভ' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বলিলেন এবং Rousselet-এর বই হইতে 'ক্ষীরাৎ কুম্ভের' চিত্রটি দেখাইয়া বলিলেন, এই চিত্রই প্রথম সংখ্যার পুরশ্চিত্র হইবে। ইতিমধ্যে জয়পুর রাজ্যের দেওয়ান কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছবি পাওয়া যাওয়াতে সেইটিই প্রথম সংখ্যায় পুরশ্চিত্র হয়। যে-যন্ত্রে প্রবাসী প্রথম ছাপা হয় তাহার নাম ছিল 'Grand Jesus machine'. Made in Belgium। প্রথম চারি সংখ্যার প্রচ্ছদপট কলিকাতায় ছাপা হয়। পঞ্চম সংখ্যা ভাদ্র হইতে তাহা এলাহাবাদ ইন্ডিয়ান প্রেসেই ছাপা হয়। প্রবাসীর ৮ম ও ৯ম সংখ্যায় সম্পাদক প্রবাসী

বাঙালির ইতিহাস উদ্ধারের ইচ্ছায় এই-জাতীয় প্রবন্ধের জন্য চারিটি পদক পুরস্কার ঘোষণা করেন।

একজন প্রবাসী বাঙালি বলেন :—যুক্তপ্রদেশের রাজধানী এলাহাবাদে বঙ্গ-সাহিত্যোৎসাহিনী সভা প্রভৃতি যে দ্বিতীয় যুগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তথায় রামানন্দবাবুর আবির্ভাব ও 'প্রবাসী'র প্রভাব সে যুগকে গৌরবোজ্জ্বল করিয়াছিল।

প্রবাসীর পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বলেন—"জীবনের নানা দিকে বাঙালি গত পঁচিশ বছরের মধ্যে যতটুকু কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে তার সব চেয়ে পূর্ণ পরিচয় এক 'প্রবাসী'ই দিতে পারে। এক কথায় বাঙালির ক্যলচর বা সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষের পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত হয়ে আছে এক এই 'প্রবাসী'ব দর্পণে।"

রামানন্দ বাল্যকাল হইতেই ভারতভক্ত ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য ও শিল্পকলার উৎকর্ষ তাঁহাকে কিশোর বয়স হইতেই মুগ্ধ করিয়াছিল, তাই এই কথা প্রচারের আগ্রহ ছিল তাঁহার গভীর। 'ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রা'র শখ তাঁহার শুধু যে নিজের ছিল তা নয়, তিনি ছাত্রদের এইরূপ তীর্থযাত্রায় ব্রতী করিতে ৫০ বৎসর পূর্বেও চেষ্টা করিয়াছেন। 'দাসী'তে এই বিষয়ে ১৮৯৩-এর জুলাই মাসে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেন। যাহারা তীর্থে তীর্থে ঘুরিতে পারিবে না তাহাদের শিক্ষার জন্য এই প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া পরের মাসেই 'দাসী'তে আবার লেখেন :

> "ম্যাজিক লণ্ঠন কি তাহা অনেকেই জানেন। আমাদের প্রস্তাব আর কিছুই নয়, ছাত্রগণকে শিক্ষা দিবাব জন্য এবং তাহাদের মনোরঞ্জনার্থ ম্যাজিক লণ্ঠন ব্যবহাব। . আমবা যে-সকল চিত্র প্রদর্শনের পক্ষপাতী, তাহা সাধাবণত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত কবা যাইতে পাবে।
>
> ১। বৈজ্ঞানিক বিষয। ২। প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক দৃশ্য। আমবা ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রা প্রবন্ধে ভারতবর্ষস্থ যে-সকল প্রাকৃতিক ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক দৃশ্য, দুর্গ, প্রাসাদ প্রভৃতিব উল্লেখ কবিযাছি, তৎসমুদয় এবং অপরাপর অনেক দৃশ্যেব ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা ম্যাজিক লণ্ঠনের শ্লাইড প্রস্তুত করান যাইতে পাবে। এই সকল দৃশ্য দেখা সকলেব না ঘটিয়া উঠিতে পারে। কিন্তু ইহাদের চিত্র দেখিলেও অনেক তৃপ্তি হয। শুধু ভারতবর্ষেব কেন পৃথিবীস্থ নানা স্থানেব দৃশ্য এই প্রকারে প্রদর্শিত হইতে পাবে। ভারতবর্ষের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে। বুদ্ধগযার মন্দির, উডিষ্যার মন্দিব এবং গিরিগুহা সকল, বোম্বাই-এব হস্তীগুম্ফা, তাজমহল, কুতব মিনার, বিভিন্ন স্থানের অশোক স্তম্ভ সমূহ, এলাহাবাদ দুর্গ, আগ্রা দুর্গ..."

'প্রবাসী' বাহির করিবার সময় প্রবাসের অর্থাৎ বাংলার বাহিরের ভারতবর্ষের এই সমস্ত ঐতিহাসিক তীর্থস্থানের গৌরবের ও স্থাপত্যের কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। এগুলি এক অর্থে প্রবাস, কিন্তু অন্য অর্থে স্বদেশ বলিয়া গৌরবেরও জিনিস। এই সকল কথা মনে রাখিয়া 'প্রবাসী'র জন্য একটি সুচিত্রিত মলাট তৈয়ারি হয়। তাহাতে 'প্রবাসী'কে ঘিরিয়া আছে, মনে হয়, অমরাবতীর গুপ্ত মন্দির, আগ্রার তাজমহল, বর্মার প্যাগোডা, দিল্লির কুতব মিনার, বুদ্ধগয়ার বুদ্ধ মন্দির, অমৃতসরের সুবর্ণ-মন্দির, উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের মন্দির, ও সাঁচীর তোরণ।

বাংলা কাগজের এ রকম জমকালো মলাট ইতিপূর্বে কখনও হয় নাই, শুধু মলাট দেখিয়াই অনেকে খুশি হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রিয়নাথ সেন লিখিলেন,

"মলাটটিও দিব্য হইয়াছে। সাদা কাগজের উপর বেশ একটি সংযত সৌন্দর্য

রহিয়াছে।"

অধ্যাপক অবিনাশচন্দ্র দাস লিখিলেন,

> "প্রথমেই প্রবাসীর মলাট দেখিযা মুগ্ধ হইয়াছি। এমন সুন্দর মলাট কোনো বাঙ্গালা কাগজের দেখি নাই। যাঁহারা দেখিতেছেন তাঁহারাই প্রশংসা করিতেছেন।"

আরও অনেকের প্রশংসা থাকিলেও কাগজের গৌরব শুধু তাহার মলাট নয় ; সম্পাদকের সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পানুরাগের প্রকৃত পরিচয় তিনি দিয়াছিলেন প্রথম সংখ্যাতেই স্বলিখিত "অজন্টা গুহা চিত্রাবলী" প্রবন্ধে। ভারত-শিল্পের এই অপূর্ব নিদর্শন সম্বন্ধে তখনকার দিনে কোনো ভারতীয় ভাষার পত্রে বোধ হয় কোনো শিল্পী কিংবা শিল্পসমালোচক কোনো প্রবন্ধ লেখেন নাই। ভারতীয় ভাষায় প্রথম প্রবন্ধ চিত্রসৌন্দর্যে অলংকৃত হইয়া প্রকাশিত হইল ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেখনী হইতে। চিত্র নির্বাচনের মধ্যেও কৃতিত্ব ছিল। এ বিষয়ে পুরাতন 'প্রবাসী'তে 'শ্রী' লিখিয়াছেন : 'তখনকার দিনে বাংলা দেশে অজন্টা গুহা ও ভারতীয় চিত্রকলার নামই অল্পলোক জানিত। ভারতীয় চিত্রকলার সমাদর তখন ভারতের লোকেরা করিতে শিখে নাই। অতীতেও তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অচেতন ছিলেন।'

প্রথম সংখ্যাতেই লেখকরূপে দেখা দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রভৃতি। প্রথম সংখ্যা এমনই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে প্রকাশিত হইবামাত্র নিঃশেষিত হইয়া গেল, সেই সংখ্যাটির দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিতে হইল।

সম্পাদক মহাশয় সূচনাতে লিখিলেন, "সর্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নাম লইয়া আমরা প্রবাসী প্রকাশিত করিতেছি। বঙ্গদেশের বাহিরে এরূপ মাসিকপত্র বাহির করিবার ইহাই প্রথম উদ্যম।... প্রারম্ভের আড়ম্বর অপেক্ষা ফল দ্বারাই কার্যের বিচার হওয়া ভালো। এইজন্য আমরা আপাতত আমাদের আশা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নীরব রহিলাম।"

বাংলা দেশ হইতে দূরে থাকিয়া "কি লেখা, কি ছবি, কি ছাপা সকল বিষয়েই তাঁহাকে অনেক বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে" তাহা তিনি জানিতেন এবং মুখে না বলিলেও মনে মনে প্রবাসীর আদর্শ তাঁহার কাছে যতটা উচ্চে ছিল ততটা উচ্চে ওঠা অর্থে ও সামর্থ্যে কাহারও পক্ষেই সহজ ছিল না। তাই বৈশাখের শেষ মন্তব্যে লিখিয়াছেন, "কোনো কাগজের প্রথম সংখ্যা মনের মতো করা বড়ো কঠিন। আশা করি কেহ আমাদের প্রথম সংখ্যা দেখিয়াই আমাদের কাগজের দোষগুণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা করিবেন না।..."

প্রথম মাসের 'প্রবাসী' ছোটো ৪০ পৃষ্ঠার মাসিক পত্র, তাহাতেই ১৬টি ছবি। সম্পাদকের মনের মতো না হইলেও জনসাধারণ সাগ্রহে তাহার অভ্যর্থনা করিল। গুণিজনের আদর হইতেও তাহা বঞ্চিত হইল না। বিস্মিত হইয়া সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখিলেন,

> "বাস্তবিক এলাহাবাদে বসিয়া যে অসাধ্য সাধন মহাশয় করিতেছেন, তাহা আপনার ন্যায় বহুদর্শী বিচক্ষণ সম্পাদকের পক্ষে সম্ভব। কলিকাতার বাহিরে এরূপ সর্বাঙ্গ-সুন্দর মাসিক পত্র বাহির হইতে পারে ইহা না দেখিলে বিশ্বাস হইত না।"

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিলেন :

> "...একালের অতি উচ্চদরের মাসিক পত্রিকারও বার আনা পড়িয়া উঠিতে পারি না, প্রবাসীর ষোল আনাই পড়িয়াছি ও পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। সর্বাপেক্ষা ভালো লাগিল

অজন্টা গুহা চিত্রাবলী।... সংগ্রহ-প্রণালীতে বাহাদুরি আছে। এরূপ প্রবন্ধ আর কোথাও দেখিয়াছি মনে হয় না। এরূপ প্রবন্ধ পড়িলে আমাদের স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞাতব্য কত আছে তাহা বুঝা যায়। দুঃখের বিষয় এই-জাতীয় প্রবন্ধ অধিক লিখিত হয় না, অথবা লিখিত হইলেও ভাষা ও রচনাভঙ্গিতে সুপাঠ্য হয় না।..."

নিখিলনাথ রায় লিখিলেন :

"শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই সুদৃশ্য সচিত্র পত্রের সম্পাদকপদ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা নবীন পত্রটিকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছি। আমাদের প্রবাসী কবি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রেমাশ্রুজলে ইহার অভিষেককার্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রবাসীও ধন্য, প্রবাসী বাঙালি কবিও ধন্য। স্বর্গীয় কমলাকান্ত শর্মা লোকান্তর হইতে ইহলোকে এবং বঙ্গের বঙ্গদর্শন হইতে প্রবাসে গেলেন, এ ইন্দ্রজাল কে ঘটাইল? তাঁহাব নাম গোপন করিয়া ফাঁকি দিতে পাবিবেন না—কবিব লেখনী ছাড়া এ যাদু আর কোথায়? যে কবি অশোক মঞ্জরী হইতে তাহার তরুলতা এবং বধূর ভূষণ-ঝঙ্কার হইতে তাহার রহস্য কথাটি চুরি করিয়া লইতে পাবেন তিনি যে রাতারাতি বঙ্গদর্শন হইতে তাহার কমলাকান্তটিকে হরণ করিযা প্রবাসে পলাইবেন ইহাতে আশ্চর্য হই না। কিন্তু চোরকে যদি আমাদের বঙ্গদর্শনে বাঁধিতে পারি তবেই তাঁহার উপযুক্ত শাস্তি হইবে। অজন্টা গুহা চিত্রাবলী মনোহব সচিত্র প্রবন্ধ।..."

প্রশংসাপত্রাবলীর ফর্দ দিবার স্থান নয়, সব প্রশংসাপত্র এতদিন থাকাও সম্ভব নয়, নিতান্ত যা দৈবাৎ কাগজের পৃষ্ঠাতেই ছাপা থাকিয়া গিয়াছে, তাহারই অল্প কিছু নমুনা দিলাম।

কাগজের সম্পাদক যদি তাহার স্বত্বাধিকারী না হন তাহা হইলে তাঁহাকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং নিজ মতে সর্বক্ষেত্রে চলিবার স্বাধীনতা তাঁহার থাকে না। স্বাধীনচেতা রামানন্দ 'প্রদীপে' সেই অসুবিধা অনুভব করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব পত্রিকা 'প্রবাসী' প্রকাশ করিলেন। 'প্রবাসী'তে যে-রকম খরচ তাঁহার হইত তত টাকা বাহির করিবার উপায় তাঁহার ছিল না। তিনি কলেজে তখন মাত্র ২৫০ টাকা বেতন পাইতেন। অন্যান্য আয় তাঁহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। সচিত্র বর্ণপরিচয় ছাড়া শিশুদের ইংরেজি শিক্ষার জন্য তিনি Century Primer ও A B C Picture Book নামে দুটি বই বাহির করিয়াছিলেন। হয়ত কালেভদ্রে লেখার জন্য কোনো কাগজ হইতে কিছু টাকা পাইতেন। অর্থের আশায় লেখার অভ্যাস তাঁহার ছিল না। তিনি দেশের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের জন্যই লেখনী ধারণ করিতেন। যাই হউক, সব লইয়াও মাসে ৩০০ টাকার বেশি আয় বোধহয় তাঁহার ছিল না। কিন্তু নিজ স্ত্রী পুত্র কন্যা ছাড়াও তাঁহার পোষ্যের অভাব ছিল না। তাঁহার বিধবা মাতা, পীড়িত কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নাবালক শ্যালক, বিধবা শ্যালিকা ইত্যাদি বহু আত্মীয়ের সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক ভার তিনি সানন্দে বহন করিতেন। স্বর্গীয় নেপালবাবু লিখিয়াছেন, "ইহার উপর তাঁহার গৃহ ছিল মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের শিক্ষিত বাঙালি এবং অবাঙালিদের সাধারণ অতিথিশালা।" তাঁহার পরিচিত বাংলা দেশের বাঙালিরাও চাকরি উপলক্ষে এলাহাবাদে প্রথম পদার্পণ কালে, দেশ-ভ্রমণের পথে ও তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে আসিয়া তাঁহারই বাড়িতে অনেকে অতিথি হইতেন। তাঁহার জীবনে কোনো আড়ম্বর কী বিলাসিতার চিহ্ন ছিল না, কিন্তু পুত্রকন্যার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য অর্থব্যয় করিতে তাঁহাকে কেহ কার্পণ্য করিতে দেখে নাই। সুতরাং বলা যায় একরকম শূন্য হাতেই তিনি 'প্রবাসী' প্রকাশ করেন। নিজের শক্তির উপর ও বিধাতার আশীর্বাদের উপর তাঁহার চিরদিন বিশ্বাস ছিল বলিয়াই শূন্য ঝুলিকে তিনি কখনো ভয় করেন নাই। জীবনে

যে কাজের সাধনায় একাগ্রচিত্তে তিনি লাগিতেন তাহা সফল হইবে না এমন সন্দেহের ছায়া তিনি মনে আসিতে দিতেন না।

অনায়াসে এই দুঃসাহসের কাজে তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রথম সহায় হইলেন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কর্মবীর চিন্তামণি ঘোষ। তাঁহারই ইন্ডিয়ান প্রেসে 'প্রবাসী'র প্রথম পাপড়িগুলি বিকশিত হইয়াছিল। এমন সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই বাংলা দেশেও তখন হইত কি না সন্দেহ। কিন্তু চিন্তামণিবাবু অল্পদিন পরে বাংলা কম্পোজিটারের অভাবে কিছুদিন বাংলার কাজ বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন।

'প্রবাসী' প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পব হইতেই ভগিনী নিবেদিতা 'প্রবাসী'র একজন গুণগ্রাহিণী হইয়া উঠিলেন। কবে যে তাঁহার সহিত সম্পাদকের প্রথম পরিচয় হয় তাহা ঠিক জানা যায় নাই। স্বদেশহিতৈষণা ও স্বদেশের সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ ভগিনী নিবেদিতা ধর্মের ন্যায় পবিত্র বলিয়া মনে করিতেন। কাজেই এই দেশভক্ত দেশহিতব্রত খাঁটি কর্মযোগীটিকে তিনি প্রথম হইতেই চিনিয়াছিলেন। এলাহাবাদ হইতে রামানন্দ বাংলা ১৩০৮এ একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সেই সময় জগদীশচন্দ্র কিংবা অবনীন্দ্রের গৃহে নিবেদিতার সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়া সম্ভব। এই সময় অবনীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে শিল্পী ও শিল্পরসিকদের একটি বৈঠক বসিত, তাহাতে ভগিনী নিবেদিতা যোগ দিতেন শুনিয়াছি।

'প্রবাসী' প্রথমে বাংলা ভাষার সাহায্যে দেশে গঠনমূলক কাজের জন্যই দেখা দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী' কবিতায় প্রথম সংখ্যাতে যেন 'প্রবাসী'র কথাই ফুটিয়াছিল,

"পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই,
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়ে সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া!
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।"

বাংলায় এবং প্রবাসের ঘরে ঘরে এই নূতন জাগরণের বাণী লইয়া পরমাত্মীয়ের মতো স্থান করিয়া লইতে তাহার বেশি দিন লাগে নাই। 'প্রবাসী'র আর-একটি কাজ ছিল প্রবাসী বাঙালিদের হিতচেষ্টা, স্বার্থরক্ষা ও তাঁহাদের গৌরবের কথা প্রচার করা। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"র প্রেরণা দিয়াছিলেন রামানন্দ 'প্রবাসী'রই সাহায্যে এবং 'প্রবাসী'কে কেন্দ্র করিয়াই এই বইটি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

'প্রবাসী'র আর-একজন বিশেষ হিতৈষী ছিলেন রামানন্দের বয়োজ্যেষ্ঠ প্রিয় বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ সেন। তিনি প্রথম প্রথম একই সংখ্যায় 'প্রয়াগে কমলাকান্ত', 'আদর্শ কবি', 'বিংশ শতাব্দীর বর' ইত্যাদি তিন-চারিটি রচনা লিখিয়া দিতেন। প্রথম সংখ্যায় তাঁহার 'বিংশ শতাব্দীর কেলুয়া'তে তাঁহার সখ্যের পরিচয় আছে :—

"ছাড়িয়া কটরা-রোড, একেবারে গিয়া
সৌথ-রোডে পড়িলাম হাঁপাইয়া ছুটে।
বারাণ্ডায় সাজাইয়া অদ্ভুত ক্যামেরা
মনানন্দে ছিল তথা গোঁয়ার গোবিন্দ
বাঙ্গাল বাঁকুড়াবাসী দুষ্ট রামানন্দ।

আর ছিল বসি তথা কাঙ্গাল বাঙ্গাল,
ভুট্টাপ্রিয় খোট্টাকবি শঠেন্দ্র দেবেন্দ্র!"

কর্ম্মজগতে 'প্রবাসী' জন্মিবামাত্র সফল হইল বটে, কিন্তু এই সফলতার জন্য যেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় করিতে হইত তাহাতে 'প্রবাসী'র ঋণের বোঝা বাড়িতে লাগিল ; ঋণমুক্ত হইতে 'প্রবাসী'র বহু বৎসর লাগিয়াছিল। এই সময়েই চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ের প্রেস ছাড়িয়া তাঁহাকে কুন্তলীন প্রেসে কাগজ ছাপাইতে হয়।

চিন্তামণি ঘোষ

চিন্তামণিবাবুর মৃত্যুর পর রামানন্দ তাঁহার এই হিতৈষী বন্ধুর বিষয় লেখেন :—

"চিন্তামণিবাবু বারো বৎসর বয়সে পাইয়োনিয়র আফিসে দশ টাকা বেতনের চাকরি লন। সাত বৎসর কাজ করার পর ৬০ বেতনের কাজ ছাড়িয়া রেলওয়ে মেল সার্ভিসে কাজে ঢোকেন। ২০ পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি মিটিঅরলজিক্যাল আফিসে অধ্যাপক মিস্টার (পরে স্যার) জন এলিয়টের অধীনে হেডক্লার্ক হন। তিনি কাজ করিতে করিতেই একটি ছাপাখানা কেনেন। ১৮৮৪ সালে ত্রিশ-একত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি ছাপাখানাটি 'দি ইন্ডিয়ান প্রেস' নামে রেজিস্টারি করান। ৩৫ বৎসর বয়সে মাসিক একশত টাকা বেতন পাইবার সময় সরকারি কাজ ছাড়িয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে নিজের ছাপাখানার উন্নতিতে নিজের সমুদয় সময় ও শক্তি প্রয়োগ করেন।"

চিন্তামণিবাবুর মুদ্রণ-কার্যের উৎকর্ষের এবং যথাসময়ে কাজ দিবার দিকে খুব দৃষ্টি ছিল। সে বিষয়ে রামানন্দ কয়েকটি গল্প বলিয়াছিলেন :—"অধ্যাপক টিবো (Thibaut) ও পণ্ডিত গঙ্গানাথ ঝা-কর্তৃক সম্পাদিত ভারতীয় দর্শন-বিষয়ক একটি ইংরেজি পত্রিকা (*Pandit?*) ইন্ডিয়ান প্রেসে ছাপা হইত। উহার একটি সংখ্যার প্রুফে একটি মাত্র ভুল থাকায় টিবো সাহেব প্রেসের ম্যানেজারকে চিঠি লেখেন, যে, প্রুফে এরূপ ভুল থাকা প্রেসের পক্ষে অত্যন্ত অখ্যাতিকর। চিন্তামণিবাবু আমাকে ইহা বলায় আমি হাসিতেছি দেখিয়া এই মন্তব্য করেন, যে, টিবো সাহেব অন্যায় কথা বলেন নাই ; কারণ কেহ নির্ভুল লেখা প্রেসে ছাপিতে দিলে তাহার প্রুফ সম্পূর্ণ নির্ভুল হওয়াই উচিত।...

"সচিত্র কোনো বহি প্রকাশ করিতে হইলে তিনি বিদেশি কোনো বহি হইতে নকল করা ছবি দেওয়া পছন্দ করিতেন না ; চিত্রকর দ্বারা ছবি আঁকাইয়া দিতেন। যখন ইন্ডিয়ান প্রেস দ্বারা আমার সম্পাদিত 'আরব্য উপন্যাস' প্রকাশিত হয়, তখন উহার সব ছবি স্থানীয় একজন মুসলমান চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল। সে চিত্রকরটির একটু বেশি আফিং খাওয়া অভ্যাস ছিল ; কিন্তু সাবেক দেশি ধরনের ছবি আঁকায় তাহার হাত ছিল ভাল। চিত্রকলাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার আঁকা আরব্য উপন্যাসের ছবিগুলির প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাহার এই একটা আপসোস চিন্তামণিবাবুকে জানাইয়াছিল, যে, সে কেবল কালো কালির ছবিই আঁকিতে পাইল, একটাও রঙ্গিন ছবি আঁকিবার ফরমাশ পাইল না।

"প্রবাসীর জন্য ঐ প্রেসে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। তাহার আগে চিন্তামণিবাবুর সহিত হিন্দিতেও সচিত্র মাসিক পত্র বাহির করা সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিতাম ; হয়তো এই কথাবার্তা হইতে উৎকৃষ্ট হিন্দি পত্রিকা 'সরস্বতী'র উদ্ভব হয়।

"চিন্তামণিবাবু সহজে দমিবার লোক ছিলেন না। (তিনি দরকার হইলে গ্রিক ও হিব্রু

অক্ষর ঢালাই করাইয়া রামমোহনের গ্রন্থাবলী ছাপেন।) পরে নিজের কারখানায় ঢালা টাইপ হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী ও অন্যান্য বহি ছাপাইয়াছিলেন।

"মডার্ন রিভিয়ু প্রথমে ইন্ডিয়ান প্রেসে ছাপা হইত। চিন্তামণিবাবু প্রতিমাসে ঠিক ১লা কাগজ বাহির করিয়া দিতেন এবং কাগজগুলি গাড়ি করিয়া আমার বাসায় পাঠাইয়া তাহার সঙ্গে কাগজ, ছাপাই ও বাঁধাইয়ের একটি বিল পাঠাইয়া দিতেন ; বলিতেন, আমার কাজ আমি করিলাম, আপনার কাজ আপনার সুবিধা ও ইচ্ছামত করিবেন। আমাকে টাকার জন্য কখনও তাগিদ দেন নাই। অনেক মাস কাগজ বাহির হইবার পর তবে আমি টাকা দিতে আরম্ভ করি। তাঁহার এইরূপ অনুকূলতার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। আমার কোনো সঞ্চয় না থাকায়, আমি এরূপ অনুকূল ব্যবস্থা ব্যতিরেকে হয়তো কাগজখানি বাহির করিতে পারিতাম না, কিংবা বাহির করিলেও স্থায়ী করিতে পারিতাম না।"

সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এড্‌মনোস্টোন রোডের যে বাড়িতে সাউথ রোড ছাড়িবার পর রামানন্দ উঠিয়া গেলেন তাহার পাশের বাড়িতে থাকিতেন এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ উকিল সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার নিজের বাড়ি সেটি। তাঁহার বড়ো ভাই সুশীলচন্দ্র সেখানে থাকিতেন না। ছোটো দুই ভাই সতীশচন্দ্র ও সুরেশচন্দ্র তাঁহাদের মাতার সহিত সপরিবারে এই বাড়িতে থাকিতেন। সতীশবাবুর পিতা অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আগ্রার একজন ব্রাহ্ম ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ব্রাহ্মধর্ম ত্যাগ করেন। সতীশবাবুর বাড়িতে ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব হইত। পাশাপাশি বাড়িতে থাকার পর সতীশবাবুর সহিত রামানন্দের বন্ধুত্ব গভীরতর হয়। তিনি 'প্রবাসী'র একজন লেখক হন এবং তাঁহারই সহিত যুক্ত হইয়া পরে রামানন্দ শ্রীপঞ্চমী উৎসবের সময় বাঙালি সম্মিলনীর আয়োজন করেন। ইনি পরে 'হিন্দুস্থান রিভিয়ু', 'মডার্ন রিভিয়ু' ও 'ইন্ডিয়ান রিভিয়ু'র জনপ্রিয় লেখক হন। রামানন্দ যখন এলাহাবাদে কাজ করিতেন তখন হালিশহরের দীননাথ গাঙ্গুলি সেখানে ভারতবর্ষের বিখ্যাত লোকদের স্মরণার্থ বার্ষিক সভা আহ্বান করার প্রথা প্রবর্তন করেন। এইরূপ একটি রামমোহন স্মৃতিসভায় সতীশবাবু তাঁহার প্রবন্ধে বলেন, "রামমোহনের যে হিন্দুধর্ম তাহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম।" সেই প্রবন্ধ 'কায়স্থ সমাচারে'র প্রথম বর্ষে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইনি আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের অন্যতম রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। 'লিডারের' পূর্বে এলাহাবাদে 'ইন্ডিয়ান পিপল' নামে যে কাগজ ছিল, তাহা শেষ তিন বৎসর চালাইবার জন্য সতীশবাবু কয়েক হাজার টাকা ক্ষতি সহ্য করিয়াছিলেন। তিনি কর্তব্য বোধেই ইহা করিয়াছিলেন, লাভ বা নামের আশায় করেন নাই। রামানন্দ বলিয়াছিলেন, "নাম অন্যের হইয়াছে।" তিনি ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বে 'প্রবাসী'তে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-এর ও 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে গ্রিক ট্রাজেডির বিষয়ে লিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সতীশচন্দ্রের মাতা ও পত্নী মনোরমা দেবীকে আত্মীয়ার মতো মনে করিতেন।

আতিথ্য

রামানন্দ ও তাঁহার সহধর্মিণীর আতিথ্যধর্ম সন্তানপালনের মতো স্বাভাবিক ধর্ম ছিল। কত যে অতিথি তাঁহাদের গৃহে আসিত তাহার ঠিক নাই। সপরিবারে বাঙালিরা তো আসিতেনই, উপরন্তু আসিতেন সিন্ধি, মরাঠি, মান্দ্রাজি, পাঞ্জাবি, মালয়ালি কত রকম মানুষ। ধনী নির্ধনের প্রভেদ ছিল না, গৃহী সন্ন্যাসীরও ভেদ ছিল না। নিষ্ঠাবান হিন্দু তীর্থযাত্রীরা আসিতেন; আবার মুসলমান অতিথিও আসিতে দেখিয়াছি। কিন্তু গৃহকর্তা লোকদেখানো আতিথ্য কখনও করেন নাই। যে রকম বাহুল্যবর্জিত ঘরে সাধারণ আসবাবপত্র লইয়া তাঁহারা বাস করিতেন, অতিথিদের জন্যও সেইরূপই ব্যবস্থা ছিল। এলাহাবাদের সিভিল লাইনসের বাড়ির ঘরগুলি মাপে খুব বড়ো এবং বাড়ির কম্পাউন্ড প্রকাণ্ড বলিয়া বাহিরের বহু মানুষ আসিলেও বাড়িতে ভিড় হইত না। দৈবাৎ একসঙ্গে বেশি লোক আসিয়া পড়িলে দড়ির খাটের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে হইত, এবং শীতকালে এক ঘরেই ২।৪ জনকে আশ্রয় দিতে হইত। গ্রীষ্মকালে রাত্রে ঘরে কেহ শয়ন করিত না, সবাই প্রায় খোলা মাঠে। সংসারে সকলের জন্য যা রন্ধন হইত মাননীয় অতিথিরাও তাহাই খাইতেন। তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র পোলাও কালিয়ার ব্যবস্থা মনোরমা দেবী কখনও করিতেন না। হিন্দুস্থানির দেশে ফল রুটি লুচি হালুয়ার চলনই বেশি ছিল, তাহার উপর রামানন্দ ছিলেন নিরামিষাশী, সুতরাং আতিথ্যের ধরনটা সাত্ত্বিকই প্রায় হইত। তখনকার দিনে চাষবাসের সময় পাচক ব্রাহ্মণদের প্রায় ছয় মাস "ক্ষেতিবারি" করিতে দেশে চলিয়া যাওয়ার নিয়ম বাঁধা ছিল। সুতরাং সে সময় আসিলে অতিথিরা মনোরমা দেবীর স্বহস্তের রন্ধনই আহার করিতেন।

রামানন্দ কন্যাদের লিখিয়াছিলেন, "তোমাদের মায়ের গৃহস্থালী সুশৃঙ্খল ও মার্জিত ধরনের ছিল, কিন্তু বিলাতি ভাবাপন্ন ছিল না। অধ্যাপক হীরালাল হালদার (আমাদের) উইলিয়ম জেমসের বাড়িতে একবার অতিথি হন। তাঁর জন্য মুদির দোকান থেকে গুঁড়া চা এনে চা করা হয়েছিল। তাতে তাঁর মতো চা-রসিকের সুবিধা হয় নাই। তিনি ও আমি চৌকে আহারের পর দুপুর বেলা গিয়ে ভালো চা কিনে আনবার পর তাই থেকে ভালো চা তৈরি করে খেয়ে তবে হীরালালবাবু স্বস্তিবোধ করেন। সাউথ রোডের বাসায় আমরা যখন থাকি, তখনও আমাদের বাড়িতে চায়ের চলন হয় নাই, চা-দানি চায়ের পেয়ালা ইত্যাদি ছিল না। একবার কালীনারায়ণ রায় মহাশয় সপরিবারে অতিথি হন। তাঁকে (পাথর) বাটিতে করে খুব চিনি মিশিয়ে চা দেওয়া হয়েছিল। তিনি পরিহাস করে বলেছিলেন, 'এ যে শরবৎ দিয়েছেন, মশায়'!"

আগ্রা হইতে কলিকাতা যাওয়া-আসার পথে আগ্রা-প্রবাসী নীলমণি ধর মহাশয় প্রায়ই এই বাড়িতে ২।১ দিন সপরিবারে থাকিয়া যাইতেন। তাঁহার পুত্র যামিনীকান্ত ধর মহাশয় বোধ হয় এম-এ, এবং ল' পরীক্ষা দিবার সময় দীর্ঘকাল এই বাড়িতেই ছিলেন। তিনি খুব খুশি মেজাজের মানুষ ছিলেন। বাড়ির একটি শিশু (সীতা)কে তিনি 'বন্ধু' বলিয়া ডাকিতেন। শিশুটি 'বন্ধু' কথা উচ্চারণ করিতে পারিত না। অগত্যা তাঁহারা পরস্পরের 'বন্দুক' হইয়া উঠিলেন। বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগত আসিলে এই শিশুটি তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে শৈশবে খুব উৎসাহী ছিল। এই কারণে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, নেপালচন্দ্র রায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি তাহার পিতৃ-বন্ধুরা তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন।

সেকালে 'প্রবাসী'র ওই অঞ্চলের লেখকদের মধ্যে বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও অপূর্বচন্দ্র

দত্তকে এ বাড়িতে প্রায়ই দেখা যাইত। অপূর্ববাবু সাহেবি পোশাক পরিতেন কিন্তু তিনি ইলিশ মাছের খুব ভক্ত ছিলেন। এলাহাবাদ হইতে ফিরিবার সময় সঙ্গে ঝুড়ি ভর্তি গঙ্গার ইলিশ লইতেন। ডিম সুদ্ধ লইলে পচিয়া যাইবার ভয়ে ডিমগুলি বাড়ির শিশুদের দিয়া যাইতেন। বাংলা দেশ হইতেও রামানন্দের অনেক বাল্য ও যৌবন বন্ধুই তাঁহার প্রয়াগের আবাসে অতিথি হইতেন ; লেখকদের মধ্যে কবি দেবকুমার রায় চৌধুরী, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আরও অনেকে আসিতেন। বোম্বাই হইতে মরাঠি মি. ও মিসেস্ কেলকর, ভি আর সিন্ধে প্রভৃতি কর্মীরাও আসিতেন। কেলকর-গৃহিণী খুব কর্মিষ্ঠা ও সাহসী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ দুবেলা স্বহস্তে তাঁহার আঠারো হাত রেশমি শাড়ি কাচিতেন এবং কাপড় শুকাইয়া গেলে তাহাতে ঘটি করিয়া বার বার জল ঢালিতেন। ইহাতে নাকি কাপড় খুব পরিষ্কার হয়। কাশী কংগ্রেসের সময় এই মহিলা ঘোড়ার গাড়ির পা-দানের উপর দাঁড়াইয়া গাড়োয়ানের চাবুক দিয়া একটা কুমতলবি গুণ্ডাকে মারিয়া গাড়ির মেয়েদের গুণ্ডার হাত হইতে রক্ষা করেন। রাস্তার দুই পাশে লোক দাঁড়াইয়া লোকটাকে টিট্‌কারি দেয়, কিন্তু মহিলাটিকে সাহায্য কেউ করে নাই। এ কথা পরে লিখিব। কেলকর দম্পতির সহিত রামানন্দের পরিবারের এবং বামনদাস বসুদেরও বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

খ্যাতনামা মানুষ ছাড়াও আর-এক দলের আশ্রয়স্থল ছিল 'প্রবাসী'-সম্পাদকের এই গৃহটি ; তাহারা ভবঘুরে। হয়তো কাহাকেও বাপ-মা লেখাপড়ায় অমনোযোগিতার জন্য বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন, অথবা কেহ অন্য কারণে আপনি পলাতক, এমন সব ছেলেরা কতবার এক কাপড়ে আসিয়া হাজির হইতেন। কাহাকেও শীতের সময় কম্বল কী কাপড় দিতে হইত, কাহাকেও অন্যত্র আশ্রয় পাইবার সুবিধার জন্য পরিচয়-পত্র দিয়া ছাড়িতে হইত। একবার একটি ছেলে ছেঁড়া কাপড় পরিয়া আসিয়া গৃহকর্তার আলনা হইতে ভালো কাপড়চোপড় লইয়া পরিয়া ছেঁড়া কাপড়টি স্নানের ঘরে রাখিয়া প্রস্থান করেন। আর-একবার এক পাঞ্জাবি ভদ্রলোক স্নানের ঘরে স্নান করিয়া যাইবার পর সমস্ত ঘরটি উকুনে ভরিয়া গিয়াছিল। তিনি কিন্তু বাঙালিরা "বইগন" খায় বলিয়া তাহাদের নিন্দা করিতেন। ইঁহাদের অশোভন আচরণে বাড়ির কর্তা ও গৃহিণী কখনও তাঁহাদের প্রতি বিমুখ হইতেন না। হাসির গল্প বলিয়াই গল্পগুলি মাঝে মাঝে করিতেন। তখনকার দিনে আতিথ্য-ধর্মকে আরও কেহ কেহ অবশ্যকর্তব্য বলিয়া ধরিতেন ; সুতরাং ইঁহারা এই কর্তব্যটিকে নিজেদের কোনো বিশেষত্ব বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহাদের ব্যবহার এমনই সহজ ছিল যে তাঁহাদের ছেলেমেয়েরাও এই সব অতিথিদের পর ভাবিতে পারিত না। অতিথিরা বিদায় লইতে চাহিলে সকলেই তাঁহাদের ধরিয়া রাখিতে চাহিত।

মানবের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা ও স্বদেশী ব্রত

মানুষের একমুখী উন্নতিতে তাহার প্রকৃত উন্নতি হয় না, এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল বলিয়াই জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে রামানন্দ সেই পন্থাই শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র পন্থা বলিয়া বিশ্বাস ও প্রচার করিতেন। এইজন্য ছাত্রাবস্থাতেও কেবলমাত্র কোনো একটা বিশেষ বিদ্যার উপর তিনি ঝোঁক দেন নাই। তিনি সাহিত্যরসপিপাসু ছিলেন বলিয়াই গণিত, রসায়ন ইত্যাদি বিষয় পড়িতেন, এবং কলেজের পড়া শেষ করিয়া প্রত্যহ ১০০ পৃষ্ঠা দর্শন পাঠের সংকল্প করেন। নিজে বিদ্যা লাভ করিয়াই তিনি পরিতৃপ্ত ছিলেন না, বিদ্যাদানও মানুষের কাজ বলিয়া স্কুলে

পড়িবার সময়ই বাঁকুড়া-ব্রহ্মমন্দিরে নৈশ বিদ্যালয়ে দরিদ্র এবং নিম্ন শ্রেণীর ছেলেদের পড়াইতেন। অবসর সময়ে বন্ধুদের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দরিদ্র ভদ্র পরিবারের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেন। ভগবদ্‌ভক্তির বীজ অন্তরে লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সচরাচর দেখা যায় আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নতিতে উৎসাহী মানুষ শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেয় না। কিন্তু তিনি কলেজের কাজ, দেশের কাজ, পত্রিকার কাজ সবের মধ্যেই নিয়মিত ব্যায়াম ও প্রাতর্ভ্রমণ করিতেছেন দেখা সকলেরই অভ্যাস ছিল। চল্লিশ বৎসর বয়সের আগেই তিনি ব্যায়াম ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু দুই বেলা ভ্রমণ, বিশেষত প্রাতর্ভ্রমণ মৃত্যুর দশমাস পূর্বেও পড়িয়া পা না ভাঙিয়া যাওয়া পর্যন্ত লোকে তাঁহাকে করিতে দেখিয়াছে। শেষ বৎসরে Invalid's chair-এ করিয়া বাঁকুড়ায় ভোরবেলা বেড়াইবার বড়ো শখ তাঁহার ছিল। মৃত্যুর একমাস পূর্বেও এ কথা বলিতেন। এই রকম মানুষ ছিলেন বলিয়াই তিনি অল্প বয়স হইতেই স্বদেশীব্রত গ্রহণ করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন দেশের লোকের একান্ত আগ্রহ ও নিষ্ঠাতেই দেশের শিল্পের উন্নতি ও দেশের অর্থাগম হওয়া সম্ভব। তিনি নিজে শিক্ষাব্রতী ও সেবাব্রতী ছিলেন বটে, কিন্তু স্বদেশী শিল্পের দুর্গতির কথা ভুলিয়া যান নাই। এলাহাবাদ অনাথাশ্রমে অতকাল পূর্বেও কুটির-শিল্পের উন্নতির চেষ্টা তাঁহারা করিতেন। কারণ শিক্ষাবিতরণ, অনাথপালন ও শিল্পের উন্নয়ন তাঁহার নিকট একই ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন অংশ মাত্র ছিল।

যে সময় ভারতবর্ষে স্বদেশীর প্রচার আর কোনো প্রদেশে হয় নাই সেই সময়ই এলাহাবাদের স্বদেশপ্রেমিক যুবকেরা গবর্নমেন্টের একটা একসাইজ ডিউটির প্রতিবাদকল্পে স্বদেশী কাপড়ের একটা দোকান খোলেন। মিলের উপর এই ডিউটি বসানো হইয়াছিল ম্যাঞ্চেস্টারের সুবিধার জন্য।

দেশের মানুষকে রামানন্দ যেমন সত্যকার দরদ দিয়া আত্মীয়ের মতো ভালোবাসিতেন, দেশের জিনিসও ঘরের লোকের তৈরি জিনিসের মতো তাঁর তেমনই প্রিয় ছিল। তাই ব্যক্তিগত জীবনেও স্বদেশীব্রত ছিল তাঁহার পঞ্চাশ বৎসরের সাথী। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের এই ডিউটি স্থাপনের পর হইতে তিনি কখনও বিদেশী বস্ত্রাদি ক্রয় করেন নাই। এলাহাবাদের স্বদেশী দোকানের আহমদাবাদ মিলের থান ধুতি ও দেশি টুইলের সাদা জামা ছিল তাঁহার ঘরের পোশাক। যতদিন কলেজে কাজ করিয়াছিলেন আসামের এড়ি ও মুগার গলাবন্ধ সুট এবং হিন্দুস্থানি টুপি পরিয়াই কলেজে যাইতেন। শীতকালে কলেজে লাহোরের পট্টুর পোশাক এবং ঘরে জামার উপর ধুষা কি মলিদাতেই তাঁহার কাজ চলিত। তাঁহার বাড়ির আসবাবও স্বদেশী ধরনের ছিল, রান্নাঘরের বারান্ডায় বড়ো বড়ো পিঁড়ি পাতিয়া সকলে খাইতেন, রাত্রে ভালো দড়িতে বোনা হিন্দুস্থানি চারপাই বিছাইয়া বাড়ির উঠানে নিদ্রার ব্যবস্থা হইত, কেবল পড়াশুনার জন্য বিদেশী ধরনের চেয়ার টেবিল চলিত। কলিকাতায় আসার কয়েক বৎসর পরে যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হইল, তখন হইতেই তিনি ঘরে ও বাহিরে খদ্দর পরা অভ্যাস করেন। দেশি মিলের ধুতি পরা তখন হইতে ছাড়িয়া দেন। মনোরমা দেবী তাঁহার প্রকৃত সহধর্মিণীই ছিলেন। তাঁহাদের দুজনের মতের অমিল সেকালে কেহ দেখে নাই। তাই ১৮৯৫ হইতেই তিনিও স্বদেশী কাপড় পরিতেন। মাত্র একুশ-বাইশ বৎসর বয়স হইতেই ঘরে বাহিরে সর্বত্র মোটা মিলের কাপড় ছিল তাঁর পোশাক। যতটা মনে পড়ে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দেও দেশি মিলের কাপড়ের ফ্যাকাশে কালো পাড় ছাড়া অন্য পাড় হইত না। একবার মাত্র বেগুনি পাড় দেখিয়াছিলাম। দুই-এক ধোপ দিলেই এই সব পাড়

অর্ধেক উঠিয়া যাইত এবং বাকি অর্ধেক কাপড়ময় দাগ হইয়া লাগিয়া থাকিত। কোথাও নিমন্ত্রণে গেলেও মনোরমা দেবী মোটা কাপড়ই প্রায় ব্যবহার করিতেন। একবার এক বিবাহসভায় তাঁহার এক বন্ধু বলিয়াছিলেন, "ফরাসডাঙার শাড়ির দাম তো বেশি নয়, কয়েকখানা কিনে রাখলেই তো পারো।" মনোরমা দেবী ইহাতে খুব রাগ করিয়াছিলেন। ফরাসডাঙার শাড়ির সুতা বিলাতি হইত বলিয়া বোধ হয় তিনি তাহা পরিতেন না। তখনকার দিনে পার্সি শাড়ি নামে একরকম স্বদেশী রেশমের শাড়ি পাওয়া যাইত এবং কাশ্মীরি পশমি শাড়িও পাওয়া যাইত। সেই সব কাপড় তাঁহার কয়েকখানা ছিল, তিনি তাহা ব্যবহার করিতে আপত্তি করিতেন না, কিন্তু তাঁহাকে এগুলি বেশি পরিতে দেখা যাইত না। পরে দেশি তাঁতের শাড়ি, গরদ ও তসরের শাড়ি তাঁর প্রিয় হয়। কিন্তু এলাহাবাদে তসর গরদ জোগাড় করা সহজ ছিল না বোধ হয়।

এই সব কারণে বাড়ির শিশুরাও শৈশবে এবং বাল্যে বিলাতি পোশাক-আশাকে অভ্যস্ত ছিল না। শীতের সময় লাহোরের মোটা মোটা লাল ও সবুজ ফ্লানেলে তাহাদের পোশাক হইত, গ্রীষ্মকালে সাদাসিধা দেশি কাপড়ই যথেষ্ট ছিল। উৎসবে আনন্দে কচিৎ কখনও কোনো বন্ধু কলিকাতা গেলে তাঁহার সাহায্যে দেশি তাঁতের রঙিন কাপড় মেয়েদের জন্য আসিত। বাড়ির ছেলেমেয়েরা শৈশবে অনেকে বেশির ভাগ সময় হিন্দুস্থানি ধরনের পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরিয়া বাড়িতে থাকিত। একটু বড়ো হওয়ার পর বাঙালি পোশাক চলিল।

বঙ্গভঙ্গ

বঙ্গ-ভঙ্গের পর স্বদেশী যুগ যখন আসিয়া পড়িল তখন রামানন্দের স্বাদেশিকতা আরও স্পষ্ট রূপ ধারণ করিল। তখন বাংলার বাহিরেও স্বদেশী আন্দোলনের ধাক্কা আসিয়া লাগিতেছে। কলিকাতা হইতে প্রত্যহ বাংলার সভাসমিতি, মিছিল, পুলিশের সঙ্গে মারামারি এবং বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদে নানা শোক-অনুষ্ঠানের খবর যখন আসিত তখন বাড়িতে চাঞ্চল্য দেখা যাইত। মনে আছে, কলিকাতায় বঙ্গভঙ্গের দিন ১৬ অক্টোবর অখণ্ড বঙ্গভবনের ভিত্তি স্থাপনের সময় আনন্দমোহন বসু মহাশয় কীরূপে রোগশয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া অখণ্ড বঙ্গভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন, কী বিপুল জনতার মধ্যে অগ্নিগর্ভ বাণীতে কী করিয়া স্বদেশের নব জাগরণের কথা বলেন, শিশুরাও এলাহাবাদে বসিয়া তাহা শুনিয়াছিল এবং উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কাহার মুখে এ-সব কথা শোনা তাহা মনে নাই, তবে বাড়ির আবহাওয়া তখন স্বদেশীয়ানার ভরপুর। 'ফেডারেশন' হল নির্মাণের ফন্ডে পিতা-মাতার সঙ্গে শিশুরাও তাহাদের হাত-খরচের সামান্য পুঁজি হইতে যাহার যাহা সাধ্য চাঁদা পাঠাইল।

এলাহাবাদেও নানা রকম সভাসমিতি হইয়াছিল। একটি সভার কথা মনে পড়ে। তাহাতে চিকের অন্তরালে মেয়েরাও যোগ দিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা করেন। দুই-তিন শত বাঙালি সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোম বলেন, "সেদিন কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষ রামানন্দবাবু এবং অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দেব নগ্নপদে কলেজে গিয়াছিলেন। সমস্ত বাঙালি ছেলেদের এবং বহু হিন্দুস্থানি ছেলেরও এই বেশ। কলেজে তাহাতে দারুণ উত্তেজনা দেখা দিল।" অবশ্য উত্তেজনার সৃষ্টি অধ্যক্ষ করেন নাই, কারণ

যে-সকল জিনিস তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে নাড়া দিত, তাহা লইয়াও হৈ চৈ করা, বাড়াবাড়ি করা, কিংবা মানুষকে মাতাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা তাঁহার স্বভাবে ছিল না। দুঃখে ও আনন্দে, কর্মোৎসাহে এবং নিরাশায় সর্বদাই তিনি বাহিরের আচরণে তাঁহার সেই যোগীজনোচিত প্রশান্ত ভাব রাখিয়া চলিতেন। তাঁহার মুখের রেখার ভাষা যাহারা পাঠ করিতে জানিত তাহারাই তাঁহার দুঃখ ও আনন্দ বুঝিতে পারিত, ভাষায় তিনি তাঁহার স্ত্রী ছাড়া আর কাহারও নিকট মনের গভীরতম অনুভূতির কথা প্রকাশ করিতেন না। হয়তো বামনদাস বসু প্রভৃতি দুই-একজন অন্তরতম বন্ধুকে কোনো কোনো বিষয়ে কিছু বলিতেন।

তিনি যত বড়োই স্বদেশপ্রেমিক হউন, সাধারণ বাঙালি নেতাদের মতো তিনি স্বদেশপ্রেমে কখনো পাগল হইয়া যান নাই। মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে চিরবিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া এবং ভাঙার চেয়ে গড়ায় তাঁহার আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল বলিয়া উত্তেজনার মুহূর্তেও উন্মত্ত উৎসাহের চেয়ে চুল-চেরা সূক্ষ্ম যুক্তির শান্ত প্রয়োগের স্থায়ী মূল্য তিনি বুঝিতেন। এইজন্য প্রথম হইতেই স্বদেশী যুগের উত্তেজনায় ভালোমন্দ সকল দিকে তাঁহার দৃষ্টি সজাগ হইয়া উঠিল। সকল দিক ওজন না করিয়া তিনি কোনো মত প্রকাশ করিতেন না।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব হইবামাত্র ১৯০৩-এর শেষে তিনি 'প্রবাসী'তে লিখিয়াছিলেন, "পৌষ মাসে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ লইয়াই বাঙ্গলা দেশে প্রবলতম আন্দোলন হইয়াছে।...

> বাস্তবিক কী কারণে লর্ড কার্জন এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহা ভগবানই জানেন ; কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয়, ইহা ইংরেজের ভেদমন্ত্রমূলক। প্রধানত ভারতবর্ষের তিনটি জাতিকে এখন ইংরেজ সন্দেহের চক্ষে দেখেন,—মরাঠা, বাঙালি ও পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবকে লর্ড কার্জন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন...আসামের ত্রিশ লক্ষ বাঙালি ছাড়া আর সব বাঙালি এক প্রদেশের। অতএব তাহাদিগকে বিভক্ত করা উচিত। এই ভাবিয়া বোধকরি লাটসাহেব এই কীর্তি করিতে চাহিতেছেন।"

কিন্তু তিনি স্বদেশীর উত্তেজনায় লোককে বিচারবুদ্ধি বর্জন করাইতে চেষ্টা করেন নাই। বরং ১৩১২-র আশ্বিনেও বলিয়াছিলেন, "ধর্মই শ্রেষ্ঠ সারবস্তু। যাহা ধর্মসঙ্গত নয় তাহা আমরা চাই না। স্বদেশী প্রচেষ্টা ধর্মসঙ্গত না হইলে, তাহা হাজার লাভের কারণ হইলেও আমরা তাহা সমর্থন করিতাম না। সুখের বিষয়, ধর্ম ও স্বদেশী প্রচেষ্টায় কোনো বিরোধ নাই। সুতরাং ইহাতে কায়মনোবাক্যে যোগ দিতে পারি।" তাঁহার ঐতিহাসিক জ্ঞান, সহজবুদ্ধি ও যুক্তিশাস্ত্রের উপর অধিকার এত অধিক ছিল যে চরম উত্তেজনার মুহূর্তেও তাঁহার স্থিরবুদ্ধি কখনও বিচলিত হইত না। সাময়িক পাগলামিতে জনতাকে তিনি কখনও মাতাইতে তো চাহেনই নাই, বরং তাহাদের বিচারশক্তি জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ১৩১৩ সালে বাঙালিকে বলিয়াছেন, "বিলাতী বর্জন কর। সমুদয় আবশ্যক বিলাতী বিলাসদ্রব্য ত্যাগ কর। দরকারি জিনিষ দেশি ক্রয় কর। মিহি-মোটার বিচার করিও না।" কিন্তু, বিলাতি কাপড় পোড়াও, চুড়ি ভাঙো—এ-সব বলেন নাই। ১৩১৩ সালে 'প্রবাসী'তেই ব্যারিস্টার ও গল্পলেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন 'সর্ববিষয়ে স্বদেশী' প্রবন্ধটি লেখেন, তখন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রধান বক্তব্য ছিল যে,

> "আমাদের ধুতিচাদরের মতো effiminate পোশাক আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এই পোশাক ত্যাগ করিয়া বিলাতি পোশাক পরাই ভাল, এবং আরও যে যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন সেখানেই স্বদেশী নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী প্রথা ধরা ভাল।"

গভীর দেশভক্তি থাকিলেও প্রবাসী-সম্পাদক যুক্তির খাতিরে মন্তব্য করিলেন,

"পাশ্চাত্য পরিচ্ছদের প্রতি বিদ্বেষ মনের একটা সঙ্কীর্ণতা মাত্র।...বিদেশী যাহা ভালো ও আমাদের লওয়া দরকার, তাহা সমস্তই লইতে প্রস্তুত থাকা উচিত। এমন কী, যদি কেহ প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন যে, স্বদেশী সমুদয় ছাড়িয়া বিদেশী যাহা কিছু সব লইলেই দেশের ও জাতির প্রকৃত মঙ্গল হইবে, তাহা হইলে আমাদের তাহাই করা কর্তব্য। কিন্তু প্রমাণ চাহিতে সকলেরই অধিকার আছে।"

কাজেই প্রয়োজনবোধে সমস্ত স্বদেশী ছাড়িতে রাজি হইলেও সম্পাদক জানিতে চাহিলেন,

"নেকটাই, উল্টা কলার, হ্যাট ইত্যাদির গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কি প্রয়োজন? নানা অঙ্গসম্পন্ন সাহেবি পোশাক এই দরিদ্র দেশের উপযোগী কিনা?"

প্রভাতবাবু Sentimental (ভাবপ্রবণ) বাঙালিকে ঠাট্টা করায় স্বভাবত স্বদেশভক্ত সম্পাদকের মনে তাহা লাগিল ; তিনি লিখিলেন,

"Sentiment জিনিষটা অনেক স্থলে বাজে হইলেও উহাকে বাদ দিতে পারা যায় না। আমাদের দেশের সাধারণ লোক ও শিক্ষিত লোকদের মধ্যে অনেকটা দূর দূর ভাব আছে। যাহাতে এই ভাব নষ্ট হইয়া ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, তাহা করা দরকার। সাধারণ লোকে সাহেবি-পোশাক পরা লোককে সহজে নিজের লোক মনে করে না। এ ভাবটা অযৌক্তিক হইতে পারে। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব ও বলবত্তা অস্বীকার করা যায় না। সাহেবি পোশাক পরিলে ঘুসি মারিবার সুবিধা (লেখকের কথা মতো) হইতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, জাতীয় ঘনিষ্ঠতা লাভ বাঞ্ছনীয়তম জিনিষ কিনা, এবং এমন কিছু পরিবর্তন করা উচিত কিনা, যদ্দ্বারা, এই ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির বিঘ্ন জন্মে।"

জাতীয় ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির জন্য দেশের লোকের সঙ্গে যত দিকে এবং যত রকমে সমভাবে চলিলে ভালো তত দিকেই তিনি নিজে আজীবন সমভাবে চলিতেন। অবশ্য কারণটা কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্য সিদ্ধিই নয়। দেশের প্রতি অর্থাৎ দেশের মানুষ, দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি, দেশের জিনিসপত্র এবং দেশিয় চালচলনের প্রতি তাঁহার এমন একটা শিশু-জনোচিত স্বাভাবিক ভালবাসা ছিল যে তিনি ইহাদের সহজে ছাড়িতে পারিতেন না। তবে তিনি প্রকৃত বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন বলিয়া একথাও স্বীকার করিতেন যে স্বদেশী সমুদয় ছাড়িয়া বিদেশী সমুদয় গ্রহণ করিলেও যদি দেশের সত্যকার মঙ্গল হয় তবে তাহাই করা উচিত।

খাঁটি বাঙালি ও প্রকৃত স্বদেশী

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কখনও হ্যাট, গলাখোলা কোট, কী টাই ইত্যাদি পরেন নাই। ইউরোপেও তিনি গলাবন্ধ কোট, জোব্বা ও দেশি টুপি পরিতেন। তাঁহার সাত্ত্বিক আহার সম্পূর্ণ স্বদেশী ভাত ডাল রুটি লুচি দুধ দই ফল ইত্যাদি চিরজীবনই ছিল। তিনি বিশেষ কারণে বাধ্য না হইলে বাঙালিকে কখনও ইংরেজিতে চিঠি লিখিতেন না। যে শিক্ষা দেশেই পাওয়া যায় তাহা না গ্রহণ করিয়া আগেই শিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়া তিনি কোনোদিন পছন্দ করিতেন না এবং তাহাতে উৎসাহ দিতেন না। "কোনও ব্যক্তি ব্যাকরণ বাঁচাইয়া দু'টা কথা ইংরেজিতে লিখিলে তাহার দাম আছে, কিন্তু অতি বিচক্ষণ লোকেরও বাংলা কথার দাম নাই", এই দুঃখ তাঁহার ছিল বলিয়াই তিনি ইংরেজির অধ্যাপক হইলেও বাঙালিকে বাংলা ভাষার পত্রিকা ও বক্তৃতার সাহায্যেই সর্বদা জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। শিশু যেমন নিজের মাকে সকলের চেয়ে সুন্দর দেখে তেমনি গভীর অনুরাগের সহিত তিনি তাঁহার ভাষা,

তাঁহার দেশের শিল্পকে সকল দেশের ভাষা ও শিল্প অপেক্ষা সুন্দর দেখিতেন।

এক সময় মাসিক সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রে বাংলা প্রবন্ধে খুব ইংরেজি কথার ছড়াছড়ি থাকিত। তাহাতে তিনি বলিতেন, "আমাদের মনে হয় বাংলায় কিছু লিখিতে হইলে, তাহা যথাসম্ভব এমন করিয়া লেখা উচিত যে, যে কেবল বাংলা জানে সে-ও বুঝিতে পারে। মাসিকপত্রে পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্কৃত ও ইংরেজি বাক্য দ্বারা লাঞ্ছিত প্রবন্ধ ছাপিলে প্রবন্ধ গৌরবের প্রসিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু লোককে জ্ঞান ও আনন্দ দানের উদ্দেশ্য কতটা সিদ্ধ হয় বিবেচ্য।" তাঁহার দেখাদেখি বাংলা মাসিকপত্রাদিতে ইংরেজির ছড়াছড়ি ক্রমে কমিয়া গিয়াছে।

তিনি স্বদেশী বলিতে কী বুঝিতেন এবং কোন্ স্বদেশী জিনিসকে সর্বাপেক্ষা উচ্চে স্থান দিতেন তাহা ১৩১৩ সালের ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'তে তাঁহার একটি লেখা হইতে বুঝা যায়:—

"কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, এ বৎসব আমাদেব দেশে সর্বপ্রধান স্বদেশী ঘটনা কি ঘটিযাছে, তাহা হইলে আমরা কি উত্তব দিব? চুড়ি-ভাঙা নয়, বিলাতি কাপড় পোড়ানো নয়, জাতীয় দলেব সহিত মোকদ্দমায় পূর্ববঙ্গেব গবর্নমেন্টের পবাজয়ও নয়, এমন কি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালযাদি স্থাপনও নয় ;—সর্বপ্রধান স্বদেশী ঘটনা বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'উদ্ভিদের সাড়া' (*Plant Response*) নামক গ্রন্থ প্রকাশ। আমাদেব পরাধীনতা নানাবিধ, বাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, শৈল্পিক ইত্যাদি ; কিন্তু তন্মধ্যে আমাদের মানসিক পবাধীনতাই সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। আমাদেব সর্বপ্রকার মানসিক শক্তি ইংরেজের চেয়ে কম, এই ধারণা যত বদ্ধমূল হইবে, আমরা ততই রসাতলে যাইব। জ্ঞানে মানসিক শক্তিতে আমরা যত স্বাধীন হইব, সেই পরিমাণে আমাদের সর্বপ্রকার অন্যবিধ পবাধীনতা কমিয়া আসিবে। দেহ তো মনের দাস ; বিশাল বলশালী হস্তী ক্ষীণকায় দুর্বল মাহুতেব অধীন ; কেননা, হাতী জ্ঞানে, মানসিক তেজে মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাই বলি, যাহাতে আমাদের কোনো স্বদেশবাসীব মানসিক শক্তিব অসাধাবণতা প্রমাণ করে, তাহাই গুরুতম স্বদেশী ঘটনা। আচার্য বসুব গ্রন্থকে কোনো কোনো ইংবেজ সমালোচক বিজ্ঞানজগতে বিপ্লব বা যুগান্তব সংঘটক বলিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের বড়ো বড়ো কাগজে ইঁহার অপূর্ব আবিষ্ক্রিয়াগুলির আলোচনা দূবে থাক, সংবাদ পর্যন্ত বাহির হয নাই।

"এবার এক মান্দ্রাজী যুবক প্রথম ব্যাংলাব হইয়াছেন, এ খববটি ছোটো বড়ো সকল কাগজেই বাহিব হইযাছে।... ইংরেজ প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পবাস্ত করায় বাহাদুরি আছে।... যদি ইহাই কঠিনতম পরীক্ষা হইত, তাহা হইলেও ইহাতে, পূর্ব হইতে পবিজ্ঞাত গণিত-বিদ্যায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় কে সকলেব চেয়ে ভালো করিয়া দিতে পারিয়াছে জানা যায়।...কিন্তু প্রতিভাব, নূতন তথ্য বাহিব কবিবার ক্ষমতার পবিচয় পাওয়া যায় না। আশ্চর্যের বিষয এই, বড়ো বড়ো সম্পাদকেরা শ্রীযুক্ত—ব বাহাদুরিতে ভাবতবাসীব মানসিক শক্তির বড়াই করিবার সুযোগ হইয়াছে মনে করিয়া কিছু-না-কিছু লিখিলেন : কিন্তু সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর অজ্ঞাত নূতন তথ্য বাহির করায় জগদীশচন্দ্র অন্তত ভারতে অতুলনীয় যে মানসিক শক্তির পরিচয় দিলেন তৎসম্বন্ধে নির্বাক হইয়া রহিলেন।"

১৩১৩ সালের আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে আচার্য বসুর এই পুস্তকখানির বিস্তৃত পরিচয় জগদানন্দ রায় মহাশয় লিখেন এবং পরে কয়েক মাস ধরিয়া তিনি এই নূতন আবিষ্কারগুলির বিষয়ে বিস্তৃত প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তেই প্রকাশ করেন।

স্বদেশী চিত্র

স্বদেশের সৃজনী-প্রতিভাকে এবং স্বদেশের শক্তিমানদিগকে সম্মানই স্বদেশীর সম্মান মনে করিতেন বলিয়া 'প্রদীপে'র যুগে 'প্রদীপ'-সম্পাদক জগদীশ বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যোদ্ধা প্যারীমোহন প্রভৃতির চরিতকথা লিখিয়াছিলেন এবং প্রবাসীর যুগে প্রথম বৎসরে দেড় হাজার টাকা লোকসান দিবার পরও তিনি দ্বিতীয় বৎসরে অজস্র অর্থব্যয়ে অবনীন্দ্রের এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের ছবি নিয়মিত ছাপাইবার বন্দোবস্ত করেন। স্বদেশী চিত্রশিল্পকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও ক্রমে উন্নত দেখিবার অভিলাষ এবং দেশব্যাপী ইহার প্রচারের ইচ্ছা তাঁহাকে লোকসানের কথাই ভাবিতে দিল না। 'স্টুডিও' পত্রিকায় অবনীন্দ্রের চিত্র প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনাতেই তিনি ১৩০৯ সনের ভাদ্র মাসে 'প্রবাসী'তে লিখিলেন,

> "ঠাকুর পরিবারের শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় চিত্রবিদ্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ কবিতেছেন। তাঁহার কয়েকখানি চিত্র শীঘ্রই বিলাতের *Studio* পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।"

দুই মাস পরে যেই 'স্টুডিও'তে ছবি প্রকাশিত হইল অমনি লিখিলেন,

> "শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত 'স্টুডিও'তে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ ছবি দুখানি আমরা গত শীতকালে (১৩০৮) কলিকাতায় অবনীন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত করিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম। কিন্তু তৎকালে কলিকাতায় নানা বর্ণে রঞ্জিত ছবি মুদ্রিত করিবার উপায় ছিল না বলিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই।"

আবার দুই-তিন মাস না যাইতেই প্রবাসীর মাঘ ও ফাল্গুন (১৩০৯) সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথের 'সুজাতা ও বুদ্ধ' এবং 'বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতী' চিত্রের পরিচয় দেখা দিল এবং এই সংখ্যাটিতেই অবনীন্দ্রনাথের ফোটোগ্রাফ এবং তাঁহার পূর্বোক্ত ছবি দুইটির একরঙা প্রতিলিপি বাহির হইল।

এইজন্যই আজ অবনীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "রামানন্দবাবুর কল্যাণে আমাদের ছবি আজ দেশের ঘরে ঘরে। এই যে ইন্ডিয়ান আর্টের বহুল প্রচার—এ এক তিনি ছাড়া আর কারুর দ্বারা সম্ভব হত না। আর্ট-সোসাইটি পারে নি। চেষ্টা করেছিলুম। হল না। রামানন্দবাবু একনিষ্ঠ ভাবে এই কাজে খেটেছেন—টাকা ঢেলেছেন—চেষ্টা করেছেন—পাবলিকে ছবির ডিমান্ড ক্রিয়েট করেছেন। কত বাধা তিনিও পেয়েছিলেন, আমিও পেয়েছিলুম কত বাধা।...আর্ট সোসাইটির এই উদ্দেশ্যই ছিল বটে—ইন্ডিয়ান আর্টের প্রচার করা। কিন্তু আর কারো দ্বারা তো তা সম্ভব হল না। আমরা ছবি আঁকিয়ে ছেড়ে দিতুম, উনি ঘুরে ঘুরে কোথায় কি করতে হবে—কাকে দিয়ে করাতে হবে—কি করে গরীবেরও ঘরে ঘরে দেশ বিদেশে সর্বত্র ছবির প্রচার করতে হবে, সবই নিজে করতেন। এ আমরা কখনই পারতুম না। তিনিই হাত বাড়িয়ে ভার তুলে নিলেন।

"আমরা আর্টিস্টরা শুধু যে তাঁর দৌলতে বিনি পয়সায় দেশজোড়া বিজ্ঞাপন পেয়ে গেছি তা নয়, নিয়মিত দক্ষিণা কাঞ্চনমূল্য তাও পাচ্ছি এখনো! কে ছাপত ঘরের কড়ি দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের হাতের ছেলেখেলার ছবি সমস্ত যদি না প্রবাসী বার করতেন রামানন্দবাবু!"

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, "যে দিন 'প্রবাসী' সম্পাদক মহাশয় অবনীন্দ্র আর তাঁর শিষ্যদের আঁকা ছবি 'প্রবাসী' আর 'মডার্ন রিভিউ'এ প্রকাশ করে তাঁর সাহিত্য-সাধনা আর সমাজ হিতৈষণার অন্তরালে নিভৃতে অবস্থিত রসোপভোগ শক্তির পরিচয়

দিলেন, আর আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের কৃতী রাজপুত মোগল আর অন্য অন্য রূপকর্মের প্রতিলিপি দিতে লাগলেন, সেদিন আধুনিক যুগে বাঙলার আর ভারতবর্ষের সুকুমার-শিল্পের উজ্জীবন বিষয়ে এক পরম শুভদিন।... বিরোধ আর বিদ্রূপের মধ্যে 'প্রবাসী' অবিচলিত ভাবে ভারতের নব সঞ্জীবিত শিল্পের পক্ষ গ্রহণ করে দাঁড়াল। সত্যশিবসুন্দরের সাধনা 'প্রবাসী' করে এসেছে আর আত্মলাভের জন্য যাতে বলহীন আমরা বল পাই, 'প্রবাসী' সেদিকেও সাধনা করে এসেছে।"

স্বদেশের মাটি, স্বদেশের ধূলিকণাও তাঁর প্রিয় ছিল, কাজেই স্বদেশী ছবির প্রচারের জন্য এবং স্বদেশী ছবির বিশেষত্ব মানুষকে বুঝাইবার জন্য তিনি স্বয়ং বারে বারে 'চিত্র পরিচয় ও চিত্রপ্রসঙ্গ' লিখিয়াছেন, তদুপরি অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী ও ভগিনী নিবেদিতাকে দিয়া সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখাইয়াছেন।

মডার্ন রিভিয়ু প্রকাশিত হইবার পূর্বেই ভগিনী নিবেদিতা 'প্রবাসী'র জন্য চিত্র-পরিচয় লিখিয়া দিতেন। সম্পাদক স্বয়ং তাহার অনুবাদ করিয়া ছাপাইতেন।

পরে ইঁহারা এবং আনন্দকৃষ্ণ কুমারস্বামী 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রেও লিখিতেন। রামানন্দ শিল্পরসিক ছিলেন কি না আমি সে কথা বলিব না। কিন্তু যখন ভারতীয় চিত্রশিল্পের অস্বাভাবিকতা দেখিয়া বড়ো বড়ো শিল্পীরাও কোলাহল করিয়া চারিদিক মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন তখন তিনিই বলিয়াছিলেন, "যাঁহারা এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন তাঁহারা বোধ হয় মনে করেন, চিত্র ও ভাস্কর্যবিদ্যার উদ্দেশ্যই নকল করা। বাস্তবিক তাহা নয়, অন্তত প্রাচীন প্রাচ্য (চীন-ভারতবর্ষ-জাপানদেশীয়) শিল্পীরা তাহা মনে করিতেন না। তাঁহারা কবিদের ন্যায় উপমার রীতি অবলম্বন করিয়া বাহ্য সৌন্দর্যের ভিতরের প্রাণটিকে, নিয়ামক সূত্রটিকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন। যেমন কবি যখন অঙ্গুলিকে চম্পক-কলির মতো বলেন, তখন তিনি অঙ্গুলির গঠনের কারণ যে ক্রমসূক্ষ্মতা ইত্যাদি, তাহাই ব্যক্ত করিতে চান, কিন্তু আঙুল যে ঠিক চাঁপার কলির মতো হইতে পারে না, তাহা যে তিনি জানেন না তা নয়। কবি জানেন মানুষের চক্ষু ঠিক পদ্মপলাশবৎ হইতে পারে না। তিনি কেবল চক্ষুর দীর্ঘায়তত্ব প্রকাশ করিতে চান। আমাদের শিল্পীদের রীতিও তাই। তাঁহারা স্বাভাবিক গঠনের অবিকল নকল করেন না। কবি যে উপমাটিকে কথায় প্রকাশ করেন, তাঁহারা তাহাকেই চক্ষুর গোচর করিয়া দেন।..." (প্র. ১৩১৬, শ্রাবণ)

অবনীন্দ্র এবং তাঁহার শিষ্য নন্দলাল, সুরেন্দ্র গাঙ্গুলি, ঈশ্বরীপ্রসাদ প্রভৃতির চিত্র তখন দেশের কোনো কাগজে প্রকাশিত হইত না। রামানন্দ অগ্রদূত হইয়া বৎসরের পর বৎসর ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাঁহাদের ছবি ছাপাইয়া দেশে স্বদেশী ছবিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিলেন।

সংস্কারক

তিনি দেশভক্ত এবং দেশাচারে নানাদিকে নিষ্ঠাবান ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কখনও কোনো জিনিসের ওজন ভুলিতেন না। এইজন্য এত বড়ো দেশভক্ত হইয়াও তিনি ছিলেন সংস্কারক। যেখানে সংস্কারের প্রয়োজন আছে সেখানে দেশভক্তির দোহাই দিয়া তিনি চোখ বুজিয়া থাকিতে পারিতেন না। এবং তাঁহার এই সংস্কারমুখী মন শুধু ধর্ম কী রাজনীতির সংস্কার করিয়া সন্তুষ্ট হইত না। তিনি একদিনের জন্যও ভুলেন নাই যে, সর্ববিধ সংস্কার পরস্পরের

উপর নির্ভর করে। সেইজন্য ঘোর স্বদেশীর দিনেও ১৩১৩ সনের আশ্বিনের প্রবাসীতে তিনি দীর্ঘ ১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, "সর্ববিধ সংস্কার পরস্পর-সাপেক্ষ।" রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য—কোনো বিষয়ের সংস্কারকেই তিনি অন্য কোনো সংস্কার হইতে ছোটো মনে করিতেন না। "এইটি আগে, এইটি পরে" এমন কথাও বিশ্বাস করিতেন না। স্বদেশীর দিনে দেশের নানাপ্রকার শিল্পোন্নতির জন্য তিনি চাষবাসের কথা হইতে শুরু করিয়া চরকা, কাপড়বোনা, কলকারখানা, জাতীয় শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক নূতন আবিষ্ক্রিয়া, ইন্ডিয়ান আর্ট, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ইত্যাদি সকল বিষয় ভাবিয়াছেন এবং তাহার প্রচারকার্যে সহায় হইয়াছেন। কিন্তু তিনি সাহিত্য, ধর্ম বা সমাজকে ভুলেন নাই বা বাদ দেন নাই। অবশ্য তিনি এ কথা বলিয়াছিলেন, "যিনি সংস্কারক তাঁহার কোনো বিষয়ে উদাসীন হইলে চলিবে না ; তবে, ইহা সত্য যে মানসিক প্রবণতা (tendency) ও শক্তির পার্থক্য বশত কেহ বা এক বিষয়ে, কেহ বা অন্য বিষয়ে হাত দিবেন। কেহ কেহ আবার একাধিক বিষয়েও হাত দিবেন। কিন্তু ইহা সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে সর্ববিধ সংস্কার পরস্পরসাপেক্ষ ও জাতীয় উন্নতি সর্ববিধ সংস্কার-সাপেক্ষ।"

তাঁহার জীবন-কথা লিখিতে গিয়া তাই নিজের শক্তির অল্পতা আরও বেশি করিয়া অনুভব করিতেছি। তাঁহাকে কর্মীরূপে অঙ্কিত করিতে গেলে মনে হয় সেই জ্ঞানী, সেই ভগবদ্ভক্ত তপস্বী মানুষের ছবি তো ফুটিল না। জ্ঞানের কথা বলিতে গেলে মনে হয় সেই জীবনব্যাপী মানবসেবার কথা কই বলিলাম। জ্ঞান ও কর্মের কথাও যদি ফুটিল, মনে হয়, সেই ন্যায়সত্যনিষ্ঠ, তেজস্বী বীরের ছবি কই? সকল রূপ যদি প্রকাশিত হইত, তবু মনে হইত প্রতিদিন মানুষকে তিনি যে নিষ্পাপ শিশুর মতো স্মিতহাস্যের দ্বারা অভিনন্দিত করিতেন তাহার সৌন্দর্য কী করিয়া ভবিষ্যৎ জনের কাছে দেখানো যাইবে?

যাহা হউক, তাঁহার নানামুখী সংস্কারের কথাই বলি। তাঁহার প্রথম যৌবনের লেখা প্রায় কিছুই সংগ্রহ করা হয় নাই। কলিকাতায় (১৮৮৮ হইতে ১৮৯৫) এবং এলাহাবাদে (১৮৯৫ হইতে ১৯০৭ পর্যন্ত) অপরের নানা ইংরেজি ও বাংলা কাগজে তিনি শিক্ষা, ধর্ম, সংস্কার, রাজনীতি, সেবা, মাদকতা নিবারণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে যত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার দুই-একটি ছাড়া এখনও কিছু পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের 'প্রবাসী'র সংস্কার-বিষয়ক লেখা দেখিলেই বুঝা যায়, এই যে সংস্কারক্ষেত্রে 'পরস্পর-সাপেক্ষতা'র কথা, ইহা তাঁহার জীবনে নূতন কথা নয়। তিনি কখনও ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন কুঠরিতে ফেলিয়া বিচার করেন নাই এবং সেইজন্যই তাঁহার জীবনে এত বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করিয়াছেন।

যখন তাঁহার বয়স পূর্ণ পঁচিশ বৎসরও নয় সেই সময় ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি তিনি *Indian Messenger* পত্রে জাতীয় মহাসমিতি সংশ্লিষ্ট 'সমাজ সংস্কার সমিতি'র অধিবেশন উপলক্ষে লিখিতেছেন :

Thus ended the third Social Conference. Whatever may be the ultimate results of the conference, it can not be called in question that it is a movement of the highest importance and full of promise for the future of India. It is no inconsiderable gain that even the necessity for reform should be admitted and that 6,000 persons should be intersted in a meeting convened for the purpose of social reform. Then again the leaders of the movement are not "hot headed

young men whose brains are full of western ideas,"—as if western ideas must necessarily be pernicious in their effects—but old men, some of whom have distinguished themselves in the fields of statesmanship and religious revival... It is home inffuence that ultimately decides the fate of nations ;... How can a nation be great, whose homes are not the centres of enlightenment and pure spiritual influence ?... Woman, must, therefore, be raised from the present degraded condition ; for man and woman must rise and fall together...

We do not believe in half measures. Political advancement without social improvement is impossible. It is like a house built on sand, whereas national freedom based on social regeneration is like the house built on rock. Moreover, freedom, though won without bloodshed, can never be won without being subject to persecution. The leaders of the National Congress movement will not always have fair weather and favourable winds in the smooth sea of political agitation. Dark days are looming in the near future, days of danger and storm. Those alone will be able to persevere in the good fight, cheerfully and undauntedly, who have their guardian angels at home in their mothers, wives and sisters.

ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার, ১২ জানুয়াবি ১৮৯০ খ্রি.

ইহার ভাবার্থ এই :—

"কংগ্রেসের পাশাপাশি সমাজসংস্কাব সম্মেলনে যে প্রায ৬০০০ লোক সমবেত হইয়াছিলেন, ইহা গভীর আশা ও আনন্দেব বিষয়।. জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর কবে তাব পারিবারিক জীবনের উপব ; যে জাতির পরিবাব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রগতিব কেন্দ্র হইয়া উঠে নাই, সে জাতি কেমন কবিয়া বড়ো হইতে পাবে ? তাই নাবীকে তাব বর্তমান দুর্গতির উর্ধে টানিয়া তুলিতে হইবে ; কারণ, নব ও নাবী একসঙ্গে উঠে ও পড়ে। সামাজিক প্রগতিকে এড়াইয়া রাজনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব নয . বালির ভিত্তির উপর সৌধ নির্মাণ অসম্ভব। জাতীয় স্বাধীনতার সৌধ স্থাযী হইবে যদি সামাজিক উন্নতির পাষাণ ভিত্তিব উপব ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। রক্তপাত ব্যতীত স্বাধীনতা লাভ যদি-বা সম্ভব হয়, তবু তাহা কায়েমী রকমে দখল করিতে হইলে বহু নির্যাতনের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। কংগ্রেস নেতাদের ভাগ্যে সর্বদা শান্তির আবহাওয়া থাকিবে এবং প্রশান্ত রাজনৈতিক সাগরে পাড়ি দিবার সৌভাগ্য হইবে, ইহা কল্পনা করা যায না। ঝড় বিপদের অন্ধকার দিন আমাদের সম্মুখে ঘনাইয়া আসিতেছে। (ইহা ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দেব কথা) সেই মহান সংগ্রামে অবিচলিত শৌর্য ও আনন্দ নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁবাই যুদ্ধ করিতে পাবিবেন যাঁদের গৃহে জননী, ভগ্নী ও পত্নীরা তাঁদের অতন্দ্র সেবায় দিব্য প্রেরণা জোগাইতেছেন।"

তিনি বলিয়াছেন সমাজ-সংস্কাব ছাড়া, নারীজাতির উন্নতি ছাড়া জাতির উন্নতির আশা নাই। 'অর্ধং ত্যজতি'র দলে তিনি ছিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন কংগ্রেসের সম্মুখে, দেশের রাজনীতিকদের সম্মুখে দুঃখ-দুর্দশার দিন ঝড়-ঝঞ্ঝার দিন আগাইয়া আসিতেছে। এমন দিনে নারী যদি রক্ষা-কবচের মতো গৃহ হইতে প্রেরণা না জোগান তবে কংগ্রেস-নেতাদেরও সংগ্রামে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে না। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। নিবিড় অন্ধকার ও তুমুল সংগ্রামের ভিতর কংগ্রেস এবং সকল রাজনৈতিক দল ও নেতাকেই পড়িতে হইয়াছে। আজ ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যান্য সংস্কারকদের চেষ্টায় নারী শুধু ঘরে নয়, বাহিরেও

ইঁহাদের প্রেরণা জোগাইতে শুরু করিয়াছেন এবং বহু ক্ষেত্রে পুরুষের কঠোর কর্মেরও সঙ্গিনী হইয়াছেন ; তাই আজ আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ মুক্তির আশা করিতে পারিতেছি।

কংগ্রেস

রামানন্দের ছাত্রাবস্থার সাক্ষ্য হইতে বুঝা যায় যে, কংগ্রেসের প্রথম বৎসর অথবা দ্বিতীয় বৎসর হইতেই তিনি কংগ্রেসের কাজে উৎসাহী ছিলেন। পঞ্চম কংগ্রেসের বিষয় তাঁহার মন্তব্য, বাঁকুড়ায় Bradlaugh সাহেবের কাছে জনমত পাঠাইবার জন্য সভা করা এবং এলাহাবাদে ১৮৯২-র কংগ্রেসে ডেলিগেট হওয়া ইত্যাদি গোড়ার দিকের কথা পূর্বেই লিখিয়াছি।

শেষবয়সে কংগ্রেসের সহিত অনেক অপ্রধান বিষয়ে তাঁহার মতে মিলিত না এবং তিনি free lance ছিলেন বলিয়া কোনো দলভুক্ত থাকা নিজের উচিত মনে করিতেন না। এইজন্য তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু দেশহিতৈষণা যে কংগ্রেসের কাজে বরাবর বিদ্যামান ছিল একথা চিরদিনই তিনি বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার জীবনের দেশহিতচেষ্টার প্রথম দিকের ইতিহাসে কংগ্রেসের স্থান যে অনেকখানিই ছিল একথা আজকালকার মানুষ জানে না। এলাহাবাদে যখন তিনি চাকরি করিতেন তখন কংগ্রেসের কর্মী বলিতে সেখানে প্রধান দুইজন ছিলেন—মদনমোহন মালবীয় ও রামানন্দ। নেহরুরা তখনও এ ক্ষেত্রে দেখা দেন নাই। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে লক্ষ্ণৌয়ের মুনশি গঙ্গাপ্রসাদ বর্মা, কাশীর শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর ক্ষত্রিয়, এলাহাবাদের রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং লক্ষ্ণৌ হইতে একজন কাশ্মীরি ভদ্রলোক—মোট এই চারিজন প্রতিনিধি গিয়াছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় অসুস্থতার জন্য যাইতে পারেন নাই। মাদ্রাজের এই অধিবেশনে আনন্দমোহন বসু মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। বসু মহাশয়ের শেষদিনের বক্তৃতায় সভাস্থ সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তখন ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা খুব উচ্চ ছিল। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া একজন বলেন ইনি নিশ্চয় ব্রাহ্ম। পরবর্তী অধিবেশনের স্থান লক্ষ্ণৌ-এ কংগ্রেসকে নিমন্ত্রণ সেবার রামানন্দই করিয়াছিলেন। কারণ সেই সময় লক্ষ্ণৌয়ের গঙ্গাপ্রসাদ বর্মা পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তিনি মাদ্রাজ কংগ্রেস হইতে বাড়ির শিশুদের জন্য নানা রঙের কাঠের কতকগুলি বড়ো বড়ো খেলনা আনিয়াছিলেন।। সেইজন্য পর বৎসর তিনি যখন লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যান তখন এবং তার পরেও প্রতি বৎসর কংগ্রেসের সময় শিশুরা খেলনা পাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। লক্ষ্ণৌ হইতে খেলনা আসিল ছোটো ছোটো বাঁশের টুক্‌রিতে মাটির পুতুল। ৪২।৪৩ বৎসর পরে এখনও লক্ষ্ণৌ হইতে আধুনিক শিশুদের জন্য সেই রকম খেলনাই আসে দেখি। সেবার রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় এদুলজী দীনশা ওয়াচার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে রামানন্দ এলাহাবাদের প্রতিনিধি হইয়া যোগ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন সেবার নাটোরের মহারাজা ছিলেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি এবং প্রারম্ভিক সংগীতের গায়কদের নেতা ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দিনেন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৯।২০ মাত্র। দীনশা ওয়াচার সহিত রামানন্দের শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। যখন 'মডার্ন রিভিয়ু' প্রথম প্রকাশিত হয় তখন দীনশা ওয়াচা তাহাতে কয়েক বৎসর লিখিয়াছেন এবং

"কৈশরী হিন্দ" পত্রিকায় তিনি স্বয়ং প্রতি মাসে *Modern Review*-এর সমালোচনা করিতেন।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ কংগ্রেসে রামানন্দ উপস্থিত ছিলেন না ; কিন্তু এইবার তিনি প্রথম 'প্রবাসী'তে কংগ্রেস প্রসঙ্গ লেখেন। তিনি লিখিয়াছিলেন : "প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিরই কংগ্রেসের সহায়তা করা উচিত। আমাদের ভারতবাসীদের ভাষা, ধর্ম, জাতি, সামাজিক রীতিনীতি, পোশাক বিভিন্ন ; কেবল রাজনৈতিক স্বার্থ একবিধ। সুতরাং আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের আবশ্যকতা ও গুরুত্ব কিরূপ তাহা সহজেই বুঝা যায়। অনেকে বলেন, এত বৎসর ধরিয়া এত টাকা খরচ করিয়া কংগ্রেস আমাদের কোনো উপকার করিতে পারে নাই। ইহা ভুল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, ব্যবস্থাপক সভার সম্প্রসারণ তো একটা কাজ। বিচার ও শাসন বিভাগ স্বতন্ত্রীকরণ যে গবর্নমেন্টের বিবেচ্য বিষয় হইয়াছে ইহাও তো একটা কাজ। কংগ্রেস যদি আর না কিছু করিতেন, কেবল সমুদয় ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় স্বার্থ এক, সুতরাং লক্ষ্যও এক হওয়া উচিত, আমাদের মনে এবম্বিধ চিন্তার উন্মেষ করিয়া দিতেন, তাহা হইলেও আমরা এত লোকের সমুদয় পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করিতাম।"

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দ বোম্বাই কংগ্রেসে এলাহাবাদের প্রতিনিধিরূপে যান। সেই অধিবেশনে তাঁহার তৎকালীন বন্ধু সি ওয়াই চিন্তামণিও উপস্থিত ছিলেন। চিন্তামণি মাদ্রাজি প্রতিনিধিদের শিবিরে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিয়া কফি ও নুন-লঙ্কা-দেওয়া হালুয়া খাওয়াইয়াছিলেন। এবার সভাপতি ছিলেন সর্ হেনরী কটন।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কাশীর কংগ্রেসে গোপালকৃষ্ণ গোখলে ছিলেন সভাপতি। তখনও রামানন্দ এলাহাবাদে কলেজে কাজ করেন এবং সেই প্রদেশের প্রারম্ভিক শিক্ষার উন্নতির চেষ্টায় ব্যস্ত। শিক্ষা-বিষয়ে তাঁহার মতামত মূল্যবান ছিল বলিয়াই সেইবার কাশী-কংগ্রেসে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিবার ভার তাঁহার উপর ছিল। তিনি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। ইহাই ছিল সে বৎসরের কংগ্রেসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা। (নেপালচন্দ্র রায় এইরূপ লেখেন)। এবার তিনি অভ্যর্থনা সমিতিতেও যোগ দিয়াছিলেন এবং কাশী একেশ্বরবাদ সম্মিলনেব অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। সম্ভবত সমাজ-সংস্কার সমিতির সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন, কারণ সেই সমিতির অধিবেশনগুলিতে তিনি সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন। এতগুলি সমিতির সঙ্গে তাঁহাব যোগ ছিল এবং সহধর্মিণীকেও সেগুলির সঙ্গে পরিচিত করতে চাহেন বলিয়াই বোধ হয় সেবার তিনি সপরিবারে কাশীতে গিয়াছিলেন। বেনারস ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের নিকটে একটি স্কুলের বড়ো বাড়িতে একেশ্বরবাদী অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনিও কয়েকদিন সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন। এই স্টেশন হইতে একটা স্পেশাল ট্রেনে শতাধিক একেশ্বরবাদী প্রতিনিধি কাশী কংগ্রেসে গিয়াছিলেন, বালকবালিকাদেরও তাহা মনে আছে। শিশুরাও দর্শকের টিকিট লইয়া কংগ্রেস মণ্ডপে ঢুকিয়াছিল। তাহাদের জীবনে সে এক অভিনব অভিজ্ঞতা। সেইবার প্রথম বাগ্মীশ্রেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ, দেশপ্রেমিক রমেশচন্দ্র এবং রক্তবর্ণ পাগড়িশোভিত সভাপতি মহামতি গোখলেকে দেখিবার সৌভাগ্য লেখিকার হয়। এই কংগ্রেসে দুইটি নববিবাহিত দম্পতি আসেন—এক রামভুজ দত্তচৌধুরী ও সরলা দেবী, অন্য ব্যারিস্টার প্রশান্তকুমাব সেন ও তৎপত্নী সুষমা সেন। হিরণ্ময়ী দেবী, রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহধর্মিণী, জোয়ালাপ্রসাদের পত্নী সুদক্ষিণা দেবী (রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী) প্রভৃতি আরও অনেক মহিলা মণ্ডপে ছিলেন। মহিলাদের জন্য পর্দার আড়ালেও বসিবার স্থান করা হইয়াছিল। তবে মনে হয় দত্ত মহাশয়ের

পত্নী ছাড়া বাঙালি সব মহিলাই বাহিরে বসিয়াছিলেন। মহিলাদের বেনারসী শাড়ি ও জরিদার ওড়না কংগ্রেস মণ্ডপে শোভা বর্ধন করিয়াছিল।

সেবার সমাজ-সংস্কার সমিতিতে মহিলাদের মধ্যে লেডি বিদ্যাগৌরী রমনভাই, শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী চৌধুরানী ও সুদক্ষিণা দেবী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, মনে হইতেছে। হেমন্তকুমারী একটি শিশুকে কোলে লইয়াই বক্তৃতা দিতে মঞ্চে উঠিলেন, হিন্দিতে বক্তৃতা দিলেন। লেডি বিদ্যাগৌরীর সঙ্গে দুটি সুন্দরী কন্যা আসিয়াছিলেন। সুদক্ষিণা দেবীর বক্তৃতা শুনিয়া একজন হিন্দুস্থানি মহিলার বোধ হয় হিংসা হইয়াছিল। তিনি মত প্রকাশ করিলেন, "উসকো তো খপ্‌সুরৎ দেখ্‌কে ঢকেল দিয়া।" সুদক্ষিণা দেবী আশ্চর্য সুন্দরী ছিলেন।

কাশী-কংগ্রেসের বৎসর বড়ো শিল্প প্রদর্শন হয়। প্রদর্শনী, সমাজ-সংস্কার সমিতি, সারনাথের স্তূপ, খনিত বিহার, দেবমন্দির ইত্যাদি কাশীর এবং আশেপাশের যত দ্রষ্টব্য ছিল সমস্তই একেশ্বরবাদী ক্যাম্পের সভ্যেরা ছোটো বড়ো সকলে দেখিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই সময়ই মিসেস কেলকর নাম্নী এক মহারাষ্ট্রীয় মহিলা একটা গুণ্ডাকে চাবুক মারেন। সেকালে কাশীর মতো জায়গায় পুরুষ অভিভাবক-বর্জিত হইয়া মেয়েদের ভ্রমণ নিরাপদ ছিল না। একদিন বোধ হয় কংগ্রেস-মণ্ডপ হইতে সপুত্রকন্যা মনোরমা দেবী, মিসেস কেলকর এবং আরও চার-পাঁচ জন মহিলা একটি ঘোড়ার গাড়ি বোঝাই করিয়া একেশ্বরবাদীদের ক্যাম্পে ফিরিতেছিলেন। গাড়িতে চালক ছিল একটি ছোটো ছেলে। একজন লোক হঠাৎ পিছন হইতে গাড়িতে উঠিয়া বসিল, চালক ছেলেটা 'মাজি মাজি' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। মনোরমা দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" ছেলেটা বলিল, "একটা গুণ্ডা আমার হাত হইতে লাগাম কাড়িয়া লইয়াছে।" ছেলেটাকে লাগাম কাড়িয়া লইতে বলায় সে বলিল, "নহি সক্‌তা।" গুণ্ডাটা তাহাকে ভেঙাইতে লাগিল এবং অন্য পথে গাড়ি চালাইবার চেষ্টা করিল। তাহা দেখিয়া মিসেস কেলকর গাড়ির পাদানির উপর নামিয়া দাঁড়াইয়া লোকটাকে তাড়াইতে চেষ্টা করিলেন। লোকটা হাসিতে লাগিল এবং নামিল না। তখন মিসেস কেলকর ঘোড়ার চাবুকটা তাহার হাত হইতে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া তাহাকে এমন চাবুকপেটা করিলেন যে সে চলন্ত গাড়ি হইতে লাফাইয়া প্রাণ লইয়া পলাইতে বাধ্য হইল। গাড়িসুদ্ধ মেয়েরা এবং পথের দুধারে সব লোক হাসিতে লাগিল।

কাশী-কংগ্রেস সম্বন্ধে প্রবাসী-সম্পাদক ১৩৪২ সালের পৌষ মাসে কংগ্রেসের কনক-জয়ন্তীর সময় লিখিয়াছিলেন, "সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে লর্ড কার্জনের নীতির সহিত আওরংজেব বাদশাহের নীতির তুলনা করিয়াছিলেন মনে হইতেছে। বঙ্গের মি. গজনবি একটি প্রস্তাব সম্বন্ধে ইংরেজিতে বক্তৃতা আরম্ভ করিলে অনেক শ্রোতা 'উর্দু উর্দু' বলিয়া চিৎকার করিতে থাকেন। তাহাতে তিনি বলেন, "আমি বাঙালি" এবং ইংরেজিতেই বক্তৃতা শেষ করেন।"

পরবর্তী কংগ্রেস সম্বন্ধে বলেন,

"১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে দাদাভাই নওরোজির সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। তাহার কয়েক মাস আগে সেপ্টেম্বর মাসে আমি এলাহাবাদের চাকরিতে ইস্তফা দিয়াছিলাম, কিন্তু তখনও এলাহাবাদ ছাড়িয়া আসি নাই। এলাহাবাদ হইতে প্রতিনিধি হইয়া কলিকাতায় আসি। ১৯০৭ সালের জানুয়ারি মাসে 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। কিন্তু যখন কলিকাতার কংগ্রেসে আসি, তখনই এই প্রথম সংখ্যা ছাপাইয়া কয়েকখানি সঙ্গে আনিয়াছিলাম। কলিকাতার এই কংগ্রেসে দাদাভাই

নওরোজি মহাশয় আধুনিক কংগ্রেস রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রথম "স্বরাজ" শব্দ ব্যবহার করেন।...বস্তুত কংগ্রেসী রাজনৈতিক সাহিত্যে স্বরাজ শব্দের প্রবর্তক দাদাভাই নওরোজি ঐ শব্দটি কেবলমাত্র ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আত্মকর্তৃত্ব অর্থে ব্যবহার করেন নাই।... কংগ্রেস এখন যাহা চান, ত্রিশ বৎসর আগেও সারত তাহাই চাহিয়াছিলেন। গান্ধীজি যে স্বাধীনতার সারবস্তু চান, দাদাভাই নওরোজিও তাহাই চাহিয়াছিলেন।"

নেপালচন্দ্র রায় লিখিয়াছিলেন :

"তিনি (রামানন্দ) নিয়মিতভাবে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতেন এবং কোনো বাধা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিত না। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনের কয়েক দিন পূর্বে তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়ায় তাঁহার বন্ধু সি ওয়াই চিন্তামণি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে চিকিৎসকগণের নিষেধ সত্ত্বেও কি তিনি সুরাট যাত্রার আয়োজন করিতেছেন? উত্তরে রামানন্দবাবু বলেন, "I shall mourn in sackcloth and ashes if I cannot attend the Congress." কথাটা আমি শ্রীযুক্ত চিন্তামণির নিজের মুখ হইতে শুনিয়াছি। চিকিৎসক এবং বন্ধুদের সকল নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়াই তিনি সুরাট কংগ্রেসে যান।"

তিনি যেদিন সুরাটে পৌঁছান, সেইদিনই রাত্রে তাঁহার জ্বর হয় এবং পীড়িত অবস্থায়ই কয়েক দিন তিনি সুরাটে থাকেন। সুরাট-কংগ্রেসের অধিবেশনে যে বিরাট গোলমাল ও কংগ্রেস ভাঙার দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল তাহা তিনি দেখেন নাই। পীড়িত অবস্থাতেই শ্রীযুক্ত বিহারীলাল বাসুদেব নামক একজন পাঞ্জাবি ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনি এলাহাবাদে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার পীড়া এমনই কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল যে কিছুদিন জীবন লইয়া টানাটানি চলে। তাঁহার বন্ধু মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের সযত্ন চিকিৎসায় এবং নেপালচন্দ্র রায়, ইন্দুভূষণ রায়, গিরীশচন্দ্র মজুমদার ও মনোরমা দেবী প্রভৃতির সেবায় তিনি রোগমুক্ত হন। চরমপন্থী ও মধ্যপন্থীদের কলহে এই বৎসরের কংগ্রেসের অধিবেশন সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। দেশের নবজাগ্রত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক জাতীয়তাবাদীগণ এইবার কংগ্রেস হইতে বহুকালের জন্য অপসৃত হন।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে সর উইলিয়ম ওয়েডারবার্নের সভাপতিত্বে এলাহাবাদে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতেও বোধ হয় রামানন্দ প্রতিনিধি হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি আর কোনো কংগ্রেসে প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন নাই। কিন্তু কয়েকটি কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। সে-সব কথা পরে বলিব।

তাঁহার যৌবনকালে কংগ্রেসের প্রতি তাঁহার আশ্চর্য অনুরাগ অনেকেই দেখিয়াছেন। তিনি এলাহাবাদ কংগ্রেস কমিটির একজন প্রধান সভ্য ছিলেন এবং অনেকে বলেন, তিনি এ ক্ষেত্রে মালবীয়জীর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তিনি যৌবনকালে দেশ ভ্রমণে উৎসাহী ছিলেন না। নিজের কর্মক্ষেত্রে একাগ্রচিত্তে কাজ লাগিয়া থাকাই তাঁহার স্বভাব ছিল। তিনি কংগ্রেস ছাড়া আর কোনো বাহিরের কাজে কখনও পরিবারবর্গকে ফেলিয়া বাহিরে যাইতেন না।

স্নেহমমতা ও শোক

মানুষ কর্মক্ষেত্রের জীবনে অর্থাৎ বাহিরের জীবনে তাহার প্রকৃত স্বরূপ অনেকখানি ঢাকা দিতে পারে, কিন্তু ঘরের জীবনে নিকটতম আত্মীয়স্বজন ও আশ্রিতের সহিত ব্যবহারে নিজ রূপকে ঢাকা দিতে পারে না, চায়ও না। যদি সর্বত্রই মানুষ নিজ প্রকৃত স্বরূপটি ঢাকা দিতে চাহিত এবং পারিত তাহা হইলে সে নূতন মানুষ হইয়া যাইত। দেখা যায় এইরূপ সম্পূর্ণ ঢাকা-দেওয়া মানুষ প্রায় নাই, সুতরাং মানুষের জীবন-চরিত রচনার সময় তাহার ঘরের কথাকে তুচ্ছ ভাবা উচিত নয়। ঘর ও বাহির মিলাইয়াই জীবনের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

রামানন্দ অসাধারণ স্নেহশীল মানুষ ছিলেন। যদি ভাবা যাইত যে ভগবান এক-একটি মানুষকে এক-একটি বিশেষ হৃদয়বৃত্তির উপাদান দিয়াই গড়েন, তবে বলিতে পারা যাইত যে তাঁহাকে বিধাতা শুধু স্নেহ-মমতা দিয়াই গড়িয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রের বিপরীত গুণগুলিও অনেকটা এই মমতা হইতেই উদ্ভুত। তিনি জীবনে ঘরে-বাহিরে, ছোটো বড়ো যখন যাহাকে ভালোবাসিয়াছেন কাহাকেও কখনো ভুলিয়া যান নাই। জীবনে নানা সূত্রে নূতন নূতন কত মানুষ আসিয়াছে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হইয়াছে পুরাতন বুঝি বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া গিয়াছে ; কিন্তু কোনো সুযোগ হইলেই দেখা গিয়াছে সেই পুরাতন স্নেহ অন্তঃসলিলা নদীর মতো অন্যের চোখের অন্তরালে তেমনি চাপা ছিল, ছোটোখাটো স্মৃতিকণাগুলি অন্তরের স্নেহভাণ্ডারে তেমনি সযত্নে রক্ষিত আছে। যেখানে পাঁচজন মনে করিয়াছে তিনি অমুক অমুককে ভুলিয়া গিয়াছেন, সেখানেও পরে হঠাৎ দেখা যাইত দীর্ঘদিন ধরিয়া তাহাদের নিয়মিত সংবাদ এত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি লইয়াছেন। স্নেহশীলতার জন্যই তাঁহার মন খুব বেদনাপ্রবণ ও কল্পনাপ্রবণ ছিল, কিন্তু ইহার পরিচয় তিনি বাহিরের লোককে বেশি দিয়া যান নাই। যাহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনিত তাহারা ইহার পরিচয় পাইয়াছিল এবং ইহা বুঝিত। তিনি যাহাদের ভালোবাসিতেন তাহাদের প্রতি তাঁহার কোনো কর্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে অথবা অন্যের দোষেও তাহাদের কিছু ক্ষতি কী দুঃখ হইয়াছে মনে করিলে তাঁহার রাত্রের ঘুম নষ্ট হইয়া যাইত। কাহার কী কী দোষে সেই প্রিয়জনের কী কী ক্ষতি হইতে পারে অথবা হইয়াছে এবং কী কী উপায়ে তাহার প্রতিকার করা যায় সমস্ত ওতপ্রোতভাবে তিনি এত কাজের মধ্যেই ভাবিয়া রাখিতেন। সেই প্রিয়জনের বুঝিবার বয়স থাকিলে সকল কাজ ফেলিয়া তাহাকে নিজ ত্রুটির কথা জানাইতেন। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যাহার জন্য তিনি এত মাথা ঘামাইয়াছেন সে আপনার ক্ষতি কী দুঃখ কিছুই বুঝে নাই। যাহার ক্ষতি তাহার অপেক্ষা বেদনা তিনিই অনেক অধিক পাইতেন। এই স্নেহশীলতা ও বেদনাপ্রবণতার জন্য শোক তাঁহার জীবনকে বারে বারে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। শোকে তিনি কখনও কর্তব্য হইতে চ্যুত হন নাই বটে, কিন্তু প্রতি গভীর শোকই তাঁহার জীবনে গভীর ক্ষত রাখিয়া গিয়াছে এবং তাঁহাকে কিছু-না-কিছুভাবে পরিবর্তিত করিয়া দিয়া গিয়াছে।

তাঁহার পিতার মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স অল্প ছিল। সে সময়কার কোনো কথা চেষ্টা করিয়াও বাহির করিতে পারি নাই।

তাহার পর শোক আসে একটি শিশুপুত্রের মৃত্যুতে। এই শিশু কয়েক মাস মাত্র পৃথিবীতে ছিল, কিন্তু দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসরেও সেই ক্ষুদ্র শিশুটিকে তিনি ভুলিতে পারেন

নাই। রোগশয্যায় শুইয়া মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বেও সেই শিশুটির অসাধারণ সৌন্দর্যের কথা তিনি বলিতেন। লিখিয়াছিলেন, "তার নাম রাখা হয়েছিল দেবব্রত। তার সৌন্দর্য ছিল অসাধারণ। অশোক আমাদের এই শিশুটির পরবর্তী সন্তান। অশোক যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন সীতা [ও শান্তা] এক এক টুকরা ইট হাতে করে সূতিকাগারের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকত এই বলে যে, "এই ভাইকে কাউকে নিয়ে যেতে দেব না ; যদি কেউ নিয়ে যেতে আসে তাকে মারব।" অশোকের জন্মের বছর দুই পরে রামানন্দের মাতার মৃত্যু হয়। মাতার পীড়ার কথা শুনিয়াই তিনি বাঁকুড়া যান, মৃত্যু ও শ্রাদ্ধাদির পর ফিরিয়া আসেন। শ্রাদ্ধের সময় তাঁহার অন্য ভ্রাতাদের সহিত তিনি সমস্ত নিয়ম পালন করিয়াছিলেন এবং যখন এলাহাবাদে ফিরিয়া আসেন তখন কয়েক দিন কাহারও সহিত দেখা করেন নাই। তিনি ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া থাকিতেন। তাঁহার মাতা বৃদ্ধবয়সে পুকুরঘাটে পড়িয়া গিয়া রোগাক্রান্ত হন, সেই রোগেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মাতাকে যে বৃদ্ধ বয়সেও পুকুরঘাটে যাইতে হইত ইহা তিনি নিজের অপরাধ বলিয়া বোধ হয় মনে করিতেন। ইহার পর বহু বৎসর মাতার মৃত্যুদিন আসিবার পূর্বেই দুই-তিন দিন তিনি ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া থাকিতেন।

অশোকের পর বোধ হয় ১৩০৮ সালে অনিলের জন্ম হয়। কী কারণে মনে নাই এডমনোস্টোন রোডের বাংলো ছাড়িয়া বোধ হয় লায়াল রোডের একটি বাড়িতে ১৩১০ সালে যাওয়া হয়। এই বাড়িতে অনিল ডিপথিরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। তৎপূর্বেই তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র মুক্তিদাপ্রসাদের জন্ম হইয়াছিল। এলাহাবাদের চিকিৎসকগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও অনিলকে রাখিতে পারিলেন না। মাত্র কয়েক দিনের রোগে বলিষ্ঠ সুন্দর শিশুটি পৃথিবী ত্যাগ করিয়া গেল। দুই বৎসর বয়সেই সে সব বিষয়ে কথা বলিত, তাহার রসবোধ এবং শারীরিক শক্তিও সুন্দর ছিল। ভাইবোনদের লইয়া ঠাট্টা তামাশা করিতে সে ছাড়িত না। সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "ছিপ্পু দপ্প দিলছে।" (গল্প গিলছে)। বয়সের পক্ষে দেখিতে সে বেশ বড়ো ছিল।

নেপালচন্দ্র রায় বলিতেন, "এই শিশুটির মৃত্যুতে তাহার পিতার জীবনে বিশেষ একটা পরিবর্তন আসে। পূর্বে তিনি সদালাপী ও খানিকটা মজলিশি মানুষ ছিলেন। তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধও তখন বাহিরে প্রকাশ পাইত। কিন্তু মানুষের চেষ্টা এবং পিতামাতার কাতর প্রার্থনাকে ব্যর্থ করিয়া এই যে শিশুটিকে মৃত্যু নিষ্ঠুর কঠোর হস্তে ছিনাইয়া লইল, তাহারই সঙ্গে যেন তাঁহার অন্তরের সরসতা অকস্মাৎ শুকাইয়া গেল। শুকাইয়া গেল না-বলিয়া বলা যায় শামুক যেমন আঘাতে আপনার খোলার মধ্যে লুকাইয়া যায়, তিনিও তেমনি আত্মপর সকলের নিকট হইতে আপনাকে লুকাইয়া ফেলিলেন। তিনি অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া গেলেন, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সেরকম আর মিশিতেন না, রচনারীতিও যেন ইচ্ছা করিয়া অলংকারহীন করিয়া তুলিলেন। যাহাতে আনন্দ আছে সেই সব রচনা ছাড়িয়া কর্তব্যবোধেই মাত্র কলম গ্রহণ করিতেন।" এই শিশুটির মৃত্যুর উনচল্লিশ বৎসর পরে তাঁহার নিজের শেষ রোগের চিকিৎসার্থ তিনি যখন তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার বাড়িতে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহার এক দৌহিত্রীর ডিপথিরিয়া রোগ হইল। সিরাম ইনজেকশনের সাহায্যে এই বালিকা রোগমুক্ত হয়। রোগশয্যায় শুইয়া এ কথা জানিতে পারিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিন দিন ধরিয়া যতবার বাড়ির লোকদের দেখিতেন ততবারই বলিতেন, "ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করো তো ৩৯।৪০ বৎসর পূর্বে এই চিকিৎসাপ্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল কিনা।" কয়েক দিন জবাব না দিয়াও তাঁহাকে নিরস্ত করা গেল না। অগত্যা

তাঁহাকে প্রবোধ দিবার জন্য বলা হইল, "এই চিকিৎসাপ্রণালী ত্রিশবৎসরের পূর্বে আবিষ্কৃত হয় নাই।" কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন, "ডাক্তারবাবু বোধ হয় ভুল করছেন। এই চিকিৎসাপ্রণালী হয়তো তখনই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আমি যদি তাহা করাইতে পারিতাম, তাহা হইলে অনিলকে বাঁচাইতে পারিতাম।"

পুত্রশোকের এই কঠিন আঘাতের পর তিনি আর সে পাড়াতেও থাকিতে পারিলেন না। Civil lines হইতে বহুদূরে এলাহাবাদের আর-একপ্রান্তে কীটগঞ্জ নামক একটা পাড়ায় সম্পূর্ণ নূতন রকম আবেষ্টনের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। নিজের জীবনের একটা দিক বহির্জগতের চক্ষু হইতে লুকাইয়া ফেলিলেই জীবনযাত্রা সহজ হয় না, অন্য কিছু কিছু পরিবর্তনেরও প্রয়োজন হয়। হয়তো সেইজন্যই নূতন পল্লীতে নূতন রকম জীবনযাত্রার ব্যবস্থা হইল।

মেঘরাজের বাড়ি

মেঘরাজ নামক একজন হিন্দুস্থানি সাধারণ লোক বোধ হয় বর্মায় রেল-লাইনের কাজ করিতে যায়। সেখানে মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে তাহার ভাগ্যে এমন জিনিস জুটিল যাহা সচরাচর আরব্য উপন্যাসের গল্পে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। লোকটি একঘড়া টাকা কি মোহর পাইয়াছিল শুনিয়াছিলাম। আর তাহার মাটি খুঁড়িবার কী প্রয়োজন? কাজেই সে দেশে ফিরিল। এখানে এক মুসলমান বেগমের ৩০।৪০ বিঘা জমি-জোড়া বিরাট একটি এলাকা ছিল। তাহার ভিতর ধানক্ষেত, পেয়ারা বাগান, ডালিম সফেদার বাগান, গোলাপ বাগান, বিশ্রাম কুঞ্জ, নবাবি আমলের গাছপালা, বড়ো বড়ো অশ্বত্থ গাছ, পুরাতন কবর কিছুরই অভাব ছিল না। বিরাট অজগরেরা কবরের প্রহরী হইয়াই যেন অশ্বত্থমূলে বাসা বাঁধিয়াছিল। চোর ডাকাত অন্য পাড়ায় দস্যুবৃত্তি করিয়া এখানে গা-ঢাকা দিলে কেহ জানিতে পারিত না, অথবা এই এলাকার কাহাকেও খুন করিয়া পলায়ন করিলে লোকালয়ে খবর পৌঁছিতে অনেক দেরি হইত। এমনই জায়গায় ছিল বেগম সাহেবার তিনটি বাড়ি। একটি বেশ বাদশাহি ধরনের, একটি মাঝারি ও একটি ক্ষুদ্র খোলার বাড়ি। মেঘরাজ তিনটি বাড়িসমেত জমিটি কিনিলেন। মেঘরাজের মাঝারি বাড়িটির ভাড়াটে হইয়া গেলেন রামানন্দ। তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন ইন্দুভূষণ রায় সপরিবারে এবং নেপালচন্দ্র রায় ও গিরীশচন্দ্র মজুমদার। সকলে মিলিয়া একটি একান্নবর্তী পরিবার গড়িয়া সেইখানে বাসা বাঁধিলেন। পুত্রশোকে মনোরমা দেবীর মন তখন উদাসীন ছিল, সংসারের ভার লইলেন সরোজবাসিনী রায়। আর শিশুদের মানসিক খাদ্য জোগাইবার ভার লইলেন ইন্দুভূষণ ও নেপালচন্দ্র।

ভোরবেলা লেখিকা ও তাঁহার সোহিনীদিদি নেপালবাবুর সঙ্গে দীর্ঘ ভ্রমণে বাহির হইতেন, সন্ধ্যায় খোলা চাতালে আকাশের তলায় শিশুদের সভা বসিত। শিশুরা ছিল শ্রোতা, নেপালবাবু তাহাদের জিন ভ্যালজিন, মন্টি ক্রিস্টো, থ্রি মাস্কেটিয়ার্স, মেরি কুইন অব স্কট্স্, অ্যালফ্রেড দি গ্রেট, ইত্যাদির গল্প বলিতেন। একটা অফিস-যান ধরনের পালকিগাড়ি ভাড়া করা হইয়াছিল, দশটার কিছু আগেই তাহাতে চড়িয়া রামানন্দ এবং বোধ হয় নেপালবাবুরাও স্কুল-কলেজে চলিয়া যাইতেন। ইন্দুভূষণ যাইতেন না। তিনি তাঁর বই কাগজ লইয়া সেই বাদশাহি ধরনের বিরাট গোলকধাঁধার মতো বড়ো বাড়িটার কোথাও লুকাইয়া পাঠ ইত্যাদিতে মন দিতেন। মাঝে মাঝে সুমিষ্ট কণ্ঠে সুর করিয়া কাশীরাম দাসের

মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িতেন ; দ্রৌপদীর স্বয়ংবর, বকরাক্ষস বধ, বকরূপী ধর্মরাজের কথা, কিংবা

"তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, হরপ্রিয়া হৈমবতী, সাবিত্রী কি ব্রহ্মার গৃহিণী,
রোহিণী চন্দ্রের রামা, রতি সতী তিলোত্তমা, কিংবা হবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী"

ইত্যাদি কত কবিতাই শুনিয়া শুনিয়া মুখস্থ হইয়া যাইত। মহাভারত-রামায়ণ শুনিবার লোভে শিশুরা তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিত।

সেই নির্জন বিরাট পুরীতে চোর-ডাকাতের ভয়ে সারারাত চৌকিদার রাখা হইত। এ ছাড়া মেঘরাজের ধন-দৌলত আগলাইবার জন্য তাহার নিজের চৌকিদার ও খাজাঞ্চিখানার প্রহরী তো ছিলই। তবু কোনো দিন ভোরে উঠিয়া শোনা যাইত, কাল রাত্রে ক্ষেতের ধারের প্রাচীরের খিলানের তলায় একদল লোক লুকাইয়া বসিয়া ছিল, হাঁক দিতেই পলাইয়া গেল। কোনো দিন-বা গভীর রাত্রে ভীতকণ্ঠে চৌকিদার ডাকিত, "বাবু, বাবু, অজগরা..."। চৌকিদারের পত্নী চৌকিদারিনেরও পালা থাকিত। সেই বীর নারী নিজের পালার দিনে একলাই রাত্রি জাগিত, দরকার হইলে চোরের পিছনে তাড়া করিতেও ভয় পাইত না।

একরাত্রে বাড়ির দরজায় দরজায় খট্ খট্ আওয়াজ হইতে লাগিল। "কে? কে?" বলিতে কেহ সাড়া দিল না, শব্দটা হঠাৎ থামিয়া গেল। ঠিক সেইসময় হঠাৎ ঘুম হইতে উঠিয়া ইন্দুভূষণের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতিভারঞ্জন বাহিরের দিকের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। সেদিকে বলদে ইঁদারা হইতে টানিয়া জল তুলিত, ইঁদারার পাড় খুব উঁচু। মনে হইল একদল লোক পাড়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে। "কোন হ্যায় রে?" বলিতেই বলিল, "মেহমান।" উত্তরে প্রতিভা "দাঁড়াও, আলো এনে দেখি" বলিয়া আলো হাতে বাহিরে আসিতেই বর্শার ফলকের মতো তীক্ষ্ণ দীর্ঘ একটা লাঠি ছুটিয়া আসিয়া তাহার কপালে লাগিল। কপাল ফাটিয়া দুই ফাঁক হইয়া গেল। সাদা ডুমওয়ালা টেবিল-ল্যাম্প রক্তে লাল হইয়া গেল। তখন ছোটো বড়ো শিশু যুবা প্রৌঢ় সবাই উঠিয়া পড়িয়া বাহিরে খোলা আকাশের তলায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পুলিশ ডাকিবার জন্য দুই-তিন জন সজোরে চিৎকার করিতেছেন। হঠাৎ দেখা গেল বিদ্যুৎবেগে দুই-তিনটা খাট টপকাইয়া ডিঙাইয়া রামানন্দ ও ইন্দুভূষণ লাঠি হাতে মালকোঁচা মারিয়া অন্ধকারের মধ্যে কোথায় ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ইন্দুভূষণের বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসরের কম নয়। ওই বয়সে কী সাহস ও কী শক্তি! যাহা হউক চোরেরা নিরাপদে শহর পার হইয়া যাইবার পর পুলিশ দারোগা সবই আসিল, কিন্তু চোর ধরা পড়িল না। প্রতিভারঞ্জন মাস-দুই মাথার ক্ষত লইয়া ভুগিলেন।

প্লেগ

৩০।৪০ বৎসর পূর্বে এলাহাবাদে প্লেগ প্রায়ই হইত। এই বাড়িতে থাকার বৎসরও খুব প্লেগের মড়ক লাগে। বাড়ির সকলে এমন শান্তভাবে দিন কাটাইতেন যে প্লেগকে যে ভয় করিতে হয়, সে-বাড়ির শিশুরাও তাহা কখনও শুনিত না। পথের ধারে যাইলেই দেখা যাইত মৃতদেহ কাঁধে লোক চলিয়াছে। সারাদিনই কানে আসিত, "রাম নাম সত্য হয়, গোপাল নাম সত্য হয়, সত্য বোলো গত্য হয়।" মাঝে মাঝে ঠেলাগাড়ি করিয়া ১০।১২ জনের দেহ একসঙ্গে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে দেখা যাইত। সে বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া শিশুরা ছুটিয়া

পলাইত।

ইন্দুভূষণ রায় মহাশয় শুধু ভক্ত সাধক ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রকৃত বীরপুরুষ এবং মানবপ্রেমিক। তাঁহার বিষয়ে নেপালচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন, "বীরহৃদয় ইন্দুভূষণ যেরূপ অকুতোভয়ে এবং নিষ্ঠার সহিত প্লেগ রোগীর সেবা করিয়া বেড়াইতেন এবং মৃত্যুভয়গ্রস্ত রোগীদের মনে উৎসাহের সঞ্চার করিতেন তাহা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে ভয়গ্রস্ত একান্ত কাপুরুষেরও অন্তরে বল সঞ্চার হইত।"

সুরেন্দ্রনাথ দেব লিখিয়াছেন, "এলাহাবাদে প্লেগ অতি ভীষণ আকারে দেখা দেয়। সে সময় স্কুল কলেজ ও দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়। এই প্লেগের সেবাকার্যেও তাঁহারা (ইন্দুভূষণ ও রামানন্দ) কয়েকজন উৎসাহী যুবক লইয়া আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ তখন একটি পরিত্যক্ত নগরীতে পরিণত হইয়াছিল এবং এইরূপ মহামারীর মুখে ডাক্তারেরা অবধি পলায়ন করিয়াছিলেন। তখন ইঁহারা নির্ভীকভাবে সেবাকার্য করিয়াছিলেন—মৃতদেহও বহন করিয়া দাহ করিয়াছিলেন।"

এই রকম মহামারীর মধ্যে পাঁচটি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে লইয়া বাস করিলেও রামানন্দ ও মনোরমা দেবীর ব্যবহারে কোনো ভয়ের লক্ষণ দেখা যাইত না। সেবকেরা গেটের ধারে একটা ঘরে কাপড় জামা বদলাইতেন এবং স্নানের পরে তাঁহারা সকলেই শিশুদের সঙ্গে একাসনে বসিয়া খাওয়া-দাওয়া পড়াশুনা করিতেন। ঠিক কোন বৎসর মনে নাই, এই দুরন্ত প্লেগ রোগেই রামানন্দের প্রিয় বন্ধু অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। তখন ইন্দুভূষণ এবং রামানন্দই হন বন্ধুর সহায়। চিকিৎসা, দাহ ইত্যাদি সব ব্যাপারেই অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। আর-একবার প্লেগ রোগে এলাহাবাদের অনাথাশ্রম প্রভৃতির কর্মী দেবেন্দ্রনাথ ওহদেদার মহাশয়ের পত্নী অসীমা দেবীর মৃত্যু হয়। ইন্দুভূষণ ও তাঁহার পত্নী সরোজবাসিনী এবং তাঁহাদেরই আর-একজন আত্মীয় সেবার ভার লন।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দেও একবার খুব প্লেগের প্রকোপ হয়। এই পরিবারের তখন শহরের মধ্যে বস্তির খুব নিকটে বাস। যমের দুয়ার খোলা পাইয়া মানুষ যেন দলে দলে ওপারে ছুটিতেছিল। তাহারই মধ্যে ছোটো বড়ো সকলকে লইয়া রামানন্দ সপরিবারে ইন্দুভূষণ রায়ের পরিবারের কাছেই রহিয়াছেন। হঠাৎ একদিন বাড়িতেই ইঁদুর মরিতে শুরু করিল। ইঁদুর কেহ ছুঁইল না, বোধহয় মনোরমা দেবী কাঠ, কেরাসিন ইত্যাদি উপর হইতে ঢালিয়া দিয়া স্তূপে আগুন ধরাইয়া দিলেন। কিন্তু বিপদ তো এত সহজে কাটে না, কাজেই স্থির হইল এই বাড়ি ছাড়িয়া সোবাতিয়া বাগ নামক স্থানে হেল্‌থ-ক্যাম্পে গিয়া বাস করিতে হইবে।

যখন সব আয়োজন ঠিক হইয়াছে তখন একটি ছেলের জ্বর আসিল। পিতামাতা তাহাকে লইয়া ইন্দুভূষণের বাড়িতে রহিলেন, ইন্দুবাবু অন্যান্য বালক-বালিকাদের লইয়া ক্যাম্পে চলিয়া গেলেন। হেল্‌থ-ক্যাম্প প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে অড়র গাছের (শরের মতো সরু) কুঁড়ে ঘর। ঘরের মেঝেতে এক হাঁটু ঘাস, চাল দিয়া রৌদ্র ও চন্দ্রালোক অবাধে ঘরে ঢোকে। মাঝে মাঝে গোরু-বাছুর আসিয়া ঘরের দেয়াল খাইয়া ফাঁক করিয়া দেয়। ইন্দুবাবু চাকরের সঙ্গে কাস্তে তাওয়া ইত্যাদি লইয়া ঘরের মেঝে পরিষ্কার করিলেন। তার পর ছোটোদের লইয়া সেই পাতার ঘরে ঘুমাইলেন। ছেলেটির জ্বর অবশ্য সে যাত্রা ছাড়িয়া গেল, কিন্তু সেই বাড়িতে আবার ইঁদুর মরার পর বাড়িওয়ালার প্লেগে মৃত্যু হইল। বাড়ির সকলে ক্যাম্পেই রহিলেন বটে, কিন্তু তখন *Modern Review* Office সেই ইঁদুর-মরা বাড়িতেই হইত।

রামানন্দ সারাদিন সেই বাড়িতে থাকিতেন। সন্ধ্যার সময় 'প্রবাসী' ও *Modern Review*-এর টাকাপয়সা লইয়া ক্যাম্পে আসিতেন। ইহাতে তাঁহার রোগের এবং চোরের দুই রকম ভয়ই ছিল। কিন্তু তাহা লইয়া একদিনও দুশ্চিন্তা করিতে তাঁহাকে দেখা যাইত না। এই পাতা ও খড়ের হেল্‌থ-ক্যাম্পে একটু জোরে বাতাস বহিলেই ঢেঁড়া পিটাইয়া রান্না বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত, আগুন লাগিবার ভয়ে। এত সাবধানতাতেও সেখানে আগুন লাগিত। তদুপরি রাত্রে চোর ডাকাত এবং অজগর, কেউটে প্রভৃতির উৎপাতও ছিল। প্রায় প্রতিদিনই সকাল হইলে শোনা যাইত, 'অমুকের তাঁবু কাটিয়া চোরে অনেক হাজার টাকা ও জিনিস লইয়া গিয়াছে, অমুকের তাঁবু কাটিয়া অনেক টাকার গহনা লইয়া গিয়াছে' ইত্যাদি। তখন পাড়ার যুবকেরা একটা দল গড়িয়া প্রত্যহ পালা করিয়া রাত্রি জাগিতে আরম্ভ করিল। চোরেদের সহিত সাক্ষাৎও তাহাদের মাঝে মাঝে হইত, সাপ-মারা তো হইতই। এই রকম স্থানে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের লইয়া তাঁহারা মাসের পর মাস থাকিয়াছেন, এলাহাবাদ ছাড়িয়া ভয়ে পলায়ন করেন নাই। ক্যাম্পেও মাঝে মাঝে কোনো কোনো কুটিরে প্লেগ হইত, তখন সে কুটির পুড়াইয়া দেওয়া হইত। সে সময় রামানন্দ চাকরি করিতেন না, সুতরাং ইচ্ছা করিলে সে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু নূতন 'মডার্ন রিভিয়ু' প্রকাশ করিয়া তিনি সেইখানেই থাকিবেন ঠিক করিয়াছিলেন।

মেজর বামনদাস বসু

এলাহাবাদে রামানন্দের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন মেজর শ্রীবামনদাস বসু। বামনদাস বসুর দাদা শ্রীশবাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় বোধহয় আগেই হইয়াছিল। কিন্তু বামনদাসবাবু মিলিটারি সার্ভিসে ছিলেন বলিয়া তাঁহার সহিত বাংলা ১৩০৮ (১৯০১ খ্রি.) সালের আগে ইঁহার আলাপ হয় নাই। পরিচয়ের তারিখ তাঁহার মনে ছিল না। শুনিয়াছি বসু মহাশয়ের জীবনস্মৃতিতে ঠিক তারিখটি লেখা ছিল। মনে আছে এলাহাবাদের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাউথ রোডের বাংলোতে একদিন সোনালি ব্রেড শোভিত কালো মিলিটারি পোশাক (?) ও হেলমেট পরিয়া একজন ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। তাঁহার পোশাক দেখিয়া শিশুদের মনে খুব কৌতূহল হয়। পরে জানা যায় তাঁহার নাম মেজর শ্রীবামনদাস বসু. আই. এম. এস.। বামনদাসবাবুর সে দিনের পরিচয় ক্রমে সৌহার্দ্যে পরিণত হয়। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন এই বন্ধুত্ব কখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তিনি ইঁহার শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না বোধহয়।

এই দুই বন্ধুর মধ্যে কতকগুলি বিষয়ে আশ্চর্য মিল ছিল। ইঁহারা উভয়েই বিদ্বান, চরিত্রবান, কৃতী ও দেশহিতব্রত পুরুষ ছিলেন বলিলে সব বলা হয় না। পড়া ও লেখায় ইঁহাদের দুজনেরই জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়াছে। পার্থিব জীবনের এই কয়েকটা বৎসরে এই দুই বন্ধু যত বই পড়িয়াছিলেন দুই-তিনটা জীবনের সময় দিলেও সহজে অন্য মানুষ তাহা পারে না। এই লেখাপড়া, পুস্তক-প্রকাশ ও মাসিকপত্র পরিচালন কার্যে, পরিচয়ের পর হইতে তাঁহারা পরস্পরের সহায় ছিলেন। উভয়েই ছিলেন স্বল্পবাক, আশ্চর্য বিনয়ী, নিরাড়ম্বর ও নিরামিষাশী। ইংরাজ-শাসনে ভারতের কী দুর্গতি হইয়াছে তাহা ভাবিতে ও বলিতে তাঁহাদের তুল্য লোক কম ছিল। একজনের ছিল শ্রেষ্ঠ অস্ত্র-ইতিহাসের প্রতিটি পরিচিত ও বিস্মৃত পাতা, আর-একজনের ছিল জ্ঞানের উপর যুক্তি ও অতুলনীয়

লিখনভঙ্গি। জ্ঞানে ও স্মৃতিশক্তিতে তাঁহারা কে কাহাকে পরাজিত করিতে পারিতেন আমি জানি না। তবে তাঁহাদের পরস্পরের অস্ত্র তাঁহারা পরস্পরকে ধার দিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাজ অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা ছিল তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন। ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু ও পণ্ডিত লোক ছাড়া অপর কেহ তাঁহার বই পড়ে না বলিয়া বামনদাসের কৃতিত্বের কথা বেশি লোক জানে না।

শৈশবে শ্রীশবাবু ও বামনদাসবাবু লাহোরে মানুষ হইলেও পরে তাঁহারা এলাহাবাদের বাসিন্দা হন। এলাহাবাদে তাঁহারা যে বাড়ি করেন তাহার নাম তাঁহাদের মাতার নামে রাখা হয় 'ভুবনেশ্বরী আশ্রম'। এই বাড়িতেই 'পাণিনি কার্যালয়' হয় এবং এখানে হইতে শ্রীশচন্দ্র পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ ইংরেজি অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ প্রকাশ করেন। শ্রীশচন্দ্র কয়েকটি প্রধান উপনিষদের ওইরূপ সংস্করণ প্রকাশ করেন। 'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী' ইঁহারা দুই ভাই ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন।

'সেক্রেড বুক্‌স্ অব দি হিন্দুজ' নাম দিয়া 'পাণিনি আপিস' হইতে বহুসংখ্যক শাস্ত্রগ্রন্থ ও তাহার ইংরেজি অনুবাদ বামনদাসবাবু সম্পাদন করিয়া বাহির করেন। শ্রীশবাবুর ধর্মশাস্ত্রে ও অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞানে গভীর পাণ্ডিত্য থাকিলেও তিনি রসিক পুরুষ ছিলেন এবং কথা-সাহিত্যে তাঁহার দক্ষতা অসাধারণ ছিল। তিনি প্রথম বৎসর *Modern Review*-এ 'শেখচিল্লী' ছদ্মনাম লইয়া ইংরেজি ভাষায় হিন্দুস্থানি উপকথা লিখিতেন। সেই উপকথাগুলির বাংলা অনুবাদ পরে আমরা দুই ভগিনী করিয়াছিলাম।

'পাণিনি আপিস' হইতে রাজা রামমোহন রায়ের বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থাবলীর যে সংস্করণ বাহির হয়, রামানন্দ তাহার ইংরেজি খণ্ডটির দীর্ঘ ভূমিকা লেখেন এবং বাংলা ও ইংরেজি দুই খণ্ড সম্পাদনেই সাহায্য করেন। এই পুস্তকের কয়েকটি পাদটীকাও রামানন্দ-লিখিত।

'প্রবাসী'র প্রায় প্রথম যুগ হইতে অর্থাৎ (১৩০৯) দ্বিতীয় বৎসরের বৈশাখ হইতেই বামনদাসবাবু ইহার নিয়মিত লেখক হন। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত তাঁহার সচিত্র প্রবন্ধগুলি বেশির ভাগ ছিল ভারতবর্ষের নানা দেশ ও নগর সম্বন্ধে, কারণ তিনি চাকরি উপলক্ষে এই সকল স্থানে গিয়াছিলেন এবং এই সকল স্থান সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৩১০ সালের 'প্রবাসী'তে চাঁদবিবির একটি পূর্বে অপ্রকাশিত চিত্র ইনি নিজ চেষ্টায় প্রকাশ করেন। হিতকর ও অর্থকরী ভারতীয় উদ্ভিদাবলী বিষয়ে তাঁহার সচিত্র প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তে অনেকগুলি বাহির হইয়াছিল। এই সব ছবি পরে তাঁহার *Indian Medicinal Plants* নামক বিখ্যাত পুস্তকে ছাপা হয়।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালার কাজ ছাড়িয়া দিয়া রামানন্দ যখন 'মডার্ন রিভিয়ু' প্রকাশ কার্যেই তাঁহার উদ্বৃত্ত সমস্ত সময় ও শক্তি নিয়োগ করিলেন তখনই বিশেষ করিয়া বামনদাস বসু ইঁহার সহায় হন। তখন হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি নানাপ্রকারে এই প্রিয় বন্ধুকে সাহায্য করিয়াছিলেন, এই কথা বামনদাস বসুর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য রামানন্দ লেখেন। রামানন্দ স্বয়ং বন্ধুদের কী কী সহায়তা করিতেন তাহার হিসাব কোথাও রাখিয়া যান নাই। ঋণ স্বীকার করা তাঁহার বিশেষত্ব ছিল, পরিশোধের কথা তিনি গোপন রাখিতেন। বামনদাস বসু পেনশন লইবার পর এই দুই বন্ধু প্রত্যহ পরস্পরকে না দেখিলে তৃপ্ত হইতেন না। অনেক সময় দেখা যাইত রামানন্দ টেবিলে কাজ লইয়া ব্যস্ত আছেন, বামনদাস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরস্পর পরস্পরকে দেখিয়া স্মিতহাস্য

করিলেন, বামনদাস একখানা বই লইয়া বসিলেন। কখনো কখনো এমনও ঘটিত যে হয়তো দুই-তিন ঘণ্টা কাটিয়া গেল, কিন্তু কেহ কাহারও সহিত কথা বলিলেন না। বামনদাস এক সময় হাসিয়া খুশি মনেই চলিয়া গেলেন। বন্ধু কর্মে ব্যস্ত, তাঁহার সান্নিধ্যই যথেষ্ট। রামানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র মুলুকে বামনদাস অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। তিনি বলিতেন, "এই বালকের দিব্যদৃষ্টি আছে।" মুলুকে তিনিই শৈশবে চিকিৎসা করিতেন। মুলু তাঁহাকে বলিত, 'আমাল ডাকাল বাবু।' তিনি মুলুকে এবং অন্য শিশুদেরও 'আপনি' বলিতেন। ছোটো বড়ো কাহাকেও 'তুমি' বলা অভ্যাস তাঁহার ছিল না।

ইঁহাদের আর-এক বন্ধু ছিলেন বিজ্ঞানানন্দ স্বামী। স্বামীজিব 'জল সরবরাহের কারখানা' নামে একটি বাংলা বই 'পাণিনি কার্যালয়' হইতে প্রকাশিত হয়। এই বইখানির রচনাকালে স্বামীজি সিনিয়ন সাহেবের বাংলোতে তাঁহার সহপাঠী রামানন্দের বাসাতে আসিতেন। দুই সহপাঠী মিলিয়া অনেক সময় লণ্ঠনের আলোতে রাত্রি জাগিয়া বহু বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ আবিষ্কার করিতেন কিংবা তৈয়ারি করিতেন। এলাহাবাদে স্বামীজি এক মঠ স্থাপনা করেন এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। রামানন্দ চা খাইতেন না, স্বামীজি ছিলেন চা-ভক্ত। স্বামীজির সহিত দেখা করিতে গেলেই তিনি বন্ধুকে চা দিতেন, স্বামীজি পাছে ক্ষুণ্ণ হন এই মনে করিয়া রামানন্দ চা-টুকু পান করিয়া লইতেন।

বন্ধুর মতো বামনদাস বসুর স্মৃতিশক্তিও ছিল অসাধারণ। তিনি বহু বিদ্যার বহু গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন এবং আবৃত্তি করিতে পারিতেন। তিনি 'প্রবাসী' এবং 'মডার্ন রিভিয়ু'ও আগাগোড়া পড়িতেন এবং সমস্ত মনে রাখিতেন। রামানন্দ লিখিয়াছিলেন, "মডার্ন রিভিয়ু ও প্রবাসীতে বহু বৎসর পূর্বে কিছু প্রকাশিত হইয়া থাকিলে তাহা দেখিবার প্রয়োজন হইলে আমি যদি তাহা খুঁজিয়া না পাইতাম, তাঁহাকে চিঠি লিখিলে ফেরত ডাকে ঠিক সন্ধান তিনি লিখিয়া পাঠাইতেন।... তিনি যে-সব বিদ্যা জানিতেন, তদ্বিষয়ক অনেক কথা প্রয়োজন হইলেই জানিয়া লইতে পারিতাম।"

বামনদাস বসুর লাইব্রেরিও ছিল বিরাট। এই লাইব্রেরি হইতেও রামানন্দ বহু সাহায্য পাইয়াছিলেন। এই লাইব্রেরি এবং এলাহাবাদ পাবলিক লাইব্রেরিতে কী কী বিষয়ে কী কী বই আছে তাহার অসংখ্য নাম রামানন্দের শেষজীবন পর্যন্ত মনে ছিল। এই দুই লাইব্রেরির কত পুস্তক যে তিনি পড়িয়াছিলেন তাহার হিসাব নাই। মেজর বসুর বহু দুষ্প্রাপ্য পুরাতন বই ও ছবি ছিল। তিনি তাছাড়া পুরাতন সাময়িক পত্র কাটিয়া টুকরা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। এক জায়গায় চাকরি উপলক্ষে থাকিতে থাকিতে অনেক সাময়িক পত্র বোধ হয় ওজনদরে তিনি কেনেন। সেগুলিকে কাটিয়া শুধু যে-টুকরাগুলি তিনি বাড়ি আনিয়াছিলেন তাহারই ওজন আড়াই মণ।

রামানন্দ লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার পুবাতন পত্রিকা ক্রয়ের অভ্যাস দ্বারা প্রবাসী অনেক উপকৃত হইয়াছিল। বহু বৎসর পূর্বে যখন রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য ইংরাজি পত্রিকা হইতে প্রবাসীতে সারসংগ্রহ করিয়া দিতেন, তখন মেজর বসু এলাহাবাদ হইতে বাক্সবন্দী করিয়া ওই সব পত্রিকা কবিকে পাঠাইতেন। সংবাদপত্র হইতে কর্তিত ও রক্ষিত টুকরাগুলির মধ্যে কিছু তাঁহার কোনো কোনো গ্রন্থের জন্য, কতক বা তাঁহার লিখিত প্রবন্ধসমূহের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। আমিও কিছু ব্যবহার করিয়াছি।"

বামনদাসবাবু যখন চাকরি উপলক্ষে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ছিলেন, তখন অনেক দুরধিগম্য স্থানে গিয়া খনন করাইয়া মাটির নীচে হইতে অনেক বৌদ্ধ মূর্তি আবিষ্কার করেন।

তাহা গান্ধার শিল্পের নিদর্শন।... ইহার সচিত্র বৃত্তান্ত পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন।

বামনদাসবাবুর অনেকগুলি ঐতিহাসিক পুস্তক রামানন্দ-কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ভারতের প্রাচীন গৌরব এবং তাহার অধঃপতনের ইতিহাস ও কারণ, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের ফলাফলের নানা কথা বামনদাসবাবুর *Rise of the Christian Power in India, Ruin of Indian Trades and Industries, History of Education in India under the East India Company, Consolidation of the Christian Power in India, India under the British Crown* প্রভৃতি পুস্তক হইতে যেমন জানা যায়, তেমন আর কিছু হইতে জানা সম্ভব নয়। দেশের মঙ্গলের জন্যই এই-জাতীয় অভিনব তথ্যপূর্ণ পুস্তক রামানন্দ স্বয়ং প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন।

শ্রীশবাবুরা দুই ভাই আতিথ্যের জন্য সুবিখ্যাত ছিলেন। সর্বদাই তাঁহাদের বাড়িতে অতিথির ভিড় লাগিয়া থাকিত। বিশেষ সময়ে তো কথাই নাই। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদ কংগ্রেসের বৎসর ডিসেম্বরে রামানন্দ সপরিবারে ইঁহাদের বাড়িতে অতিথি হন। তখন তাঁহাদের বাড়িতে স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা সমেত একশত জন অতিথি হইয়াছিলেন। রামানন্দ দিনের বেলা বামনদাসবাবুর ঘরে থাকিতেন, এবং রাত্রে ছাদে নেয়ারের খাটে বিছানা পাতিয়া ঘুমাইতেন। বামনদাসবাবু কখনো ঘরে শুইতেন না, শীত-গ্রীষ্ম সব কালেই তিনি মুক্ত হাওয়ায় শয়ন করিতেন ; বর্ষায় বোধহয় বারান্দায় তাঁহার শয্যা রচনা করা হইত।

বামনদাসবাবু এক সময় এলাহাবাদ পাবলিক লাইব্রেরির সেক্রেটারি ছিলেন। রামানন্দ বলিয়াছিলেন, "বামনদাসবাবু তখন কোম্পানির আমলের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পার্লামেন্টের সমুদয় রিপোর্ট আনাইয়াছিলেন।" রামানন্দ স্বয়ংও এই লাইব্রেরিটির অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার মুখে এলাহাবাদ পাবলিক লাইব্রেরির যেমন প্রশংসা শুনিয়াছি এমন আর কোনো লাইব্রেরির শুনি নাই। এই লাইব্রেরি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন :

"It is seldom that we are able to notice reports of Public Libraries. We may be excused, however, for a little partiality to the Allahabad Public Library. For, the M. R. was born in Allahabad and owed some of its success to the facilities afforded by that library, not only so long as our offices were situated in Allahabad, but even for years afterwards during the life-time of our esteemed friend and co-worker, the late Major B. D. Basu. I. M. S."

পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন লিখিয়াছেন, "রামানন্দবাবুকে শ্রীশবাবু ও বামনদাসবাবু বলিয়াছিলেন, 'এখানকার লাইব্রেরির বইগুলির বিষয় আমাদের চেয়ে আপনি বেশি জানেন। তবে আমরা জানিয়াই তৃপ্ত, আপনি জানিয়াই নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করেন না। তাহা কাজে পরিণত করিতে না পারিলে আপনার অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হয় না। আপনি একাধারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণের ন্যায় আপনার জানিবার স্পৃহা এবং ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সেই জ্ঞানকে অশ্বমেধের অশ্বের মতো সর্বক্ষেত্রে জয়ী করিয়া আনিতে চান'।"

কলেজের উন্নতিসাধন কার্যে, 'প্রবাসী', 'মডার্ন রিভিয়ু'র কাজে এবং অন্যান্য নানা লেখায় ও কাজে এই লাইব্রেরির নিকট তিনি অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন।

বাসাবদল

রামানন্দ সাউথ রোডের বাংলোতে সম্ভবত ১৮৯৭ খিস্টাব্দের প্রথম হইতে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের কোনো সময় পর্যন্ত ছিলেন। ১৯০২-এর গোড়াতেও (মাঘ) তাঁহার 'প্রবাসী কার্যালয়' সেই বাড়িতে ছিল মনে হয়। কিন্তু তখন স্বয়ং তিনি সপরিবারে ছিলেন এডমনোস্টোন রোডে। এই বাড়ির পর তিনি লায়াল রোড প্রভৃতি আরও দুইটি রাস্তায় সিভিল লাইনসের বাড়িতে ছিলেন। তার পর যান মেঘরাজের সেই বিরাট বাড়িতে। এখন মেঘরাজের বাড়িতে ক্রস্‌থোয়েট গার্লস স্কুল ও কলেজ হয়। মেঘরাজের বাড়ির পর তিনি আবার সিভিল লাইনসে সিটি রোডে আসেন এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ উকিল যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও সত্যচন্দ্র (?) মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবাসী হইয়া। এই বাড়িটা ছিল সিমিয়ন নামক সাহেবের। সত্যবাবু ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতুল।

ব্রাহ্মসমাজের জন্য আন্দাজ ১৯০৪ হইতে বামনদাসবাবুদের একটি বাড়ি ভাড়া লওয়া হয়। তাহারই আর-একটা অংশ ভাড়া লইয়া ইন্দুভূষণ রায় ও নেপালচন্দ্র রায় প্রভৃতি বাস করিতেন। এই পাড়াটার নাম কোঠা পার্চা। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দ সিভিল লাইনস ছাড়িয়া এই পাড়ায় ফুলমণি নাম্নী এক বাঙালি খ্রিস্টান ধাত্রীর বাড়ি ভাড়া লন। পাড়াটা বামনদাসবাবুদের তখনকার বসতবাড়ি বাহাদুরগঞ্জের 'ভুবনেশ্বরী আশ্রমে'র কাছেই ছিল। এই বাড়িতেই ইঁদুর মরার জন্য সকলকে হেলথ ক্যাম্পে যাইতে হয়।

বাঙালি সম্মেলন

বহুকাল ধরিয়াই এলাহাবাদে বহু বাঙালির বাস। অনেক এমন বাঙালি পরিবার এলাহাবাদে আছেন এবং তখনও ছিলেন যাঁহাদের দেশের সহিত সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। তাঁহারা ওই প্রদেশে ঘরবাড়ি করিয়া এবং ছেলে-মেয়ের বিবাহ দিয়া ওইখানেরই স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে আমাদের সকলের মতো একই বঙ্গমাতার সন্তান এই কথাটি তাঁহাদের মনে জাগরূক রাখিবার জন্য, তাঁহাদের মধ্যে যোগ ঘনিষ্ঠতর ও স্থায়ী করিবার জন্য এবং তাঁহাদের বাংলা দেশের সংস্কৃতির সহিত যুক্ত রাখিবার ও নানাদিকে নিজেদের উন্নতি করিবার জন্য এলাহাবাদে বাঙালিদের একটি বাৎসরিক সম্মেলন চলিত হয়। সম্ভবত বাংলা ১৩১১তে এলাহাবাদের কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালি এই সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। রামানন্দ এই সম্মেলনের প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন। তাঁহার ৬০ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে বামনদাসবাবু লিখিয়াছিলেন, "প্রবাসী বাঙালিদের দৃষ্টি নিজ মাতৃভাষার প্রতি ফিরাইতে ও তাহাদিগকে সংঘবদ্ধ করিতে তিনি নিয়ত চেষ্টা করিতেন। তাঁহারই উদ্‌যোগে এলাহাবাদে তিন-চার বৎসর ধরিয়া শ্রীপঞ্চমীর সময়ে বাঙালি সম্মিলন হইয়াছিল ;—শিক্ষা উৎসব ও ব্যায়ামের অপূর্ব সংযোগ সে সময়ে যেরূপ বাঙালিদের মধ্যে কিয়ৎকালের জন্য জীবনী-স্পন্দনের সঞ্চার করিয়াছিল এরূপ তাঁহার এলাহাবাদ হইতে যাইবার পর আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই।"

এলাহাবাদের খ্যাতনামা উকিল শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায় এবং বাঙালি সমাজের গৌরবস্থল স্বর্গগত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাঙালি সম্মেলনের কার্যে সমান উৎসাহী ছিলেন। বৎসরে একবার করিয়া ইঁহাদের মহাসমারোহে উৎসব হইত। সেই উৎসবে বক্তৃতা,

সংগীত, আবৃত্তি, এবং লাঠিখেলা, অসিক্রীড়া, tent pegging, দৌড়ধাপ, ওজন তোলা প্রভৃতি নানা রকম খেলার ব্যবস্থা ছিল। শিল্পসামগ্রীর ছোটোখাটো প্রদর্শনীও হইত। আবৃত্তি ও খেলার জন্য পুরস্কার বিতরণ ছিল উৎসবের একটি অঙ্গ। বাঙালি সম্মিলনীতে শুনাইবার জন্য রামানন্দ কলিকাতার স্বর্গীয় এইচ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে এলাহাবাদে ফোনোগ্রাফ আনাইয়াছিলেন। তখনকার লোকে ফোনোগ্রাফ বাজাইতে জানিত না বলিয়া একজন ভদ্রলোকও বাজাইবার জন্য তাঁহারই বাড়িতে অতিথি হইয়া আসিয়াছিলেন। সেই প্রথম এলাহাবাদে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর কলের ভিতর দিয়া শোনা গেল। "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী", "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে", "আমার সোনার বাংলা" প্রভৃতি গান এলাহাবাদে তৎপূর্বে বেশি কেহ শুনে নাই। হয়তো রামানন্দের এই উদ্‌যোগের পূর্বে কেহই শুনে নাই। "বন্দেমাতরম্" গানও সম্ভবত ছিল রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক গীত। এ-ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গানের রেকর্ডও অনেক আসিয়ছিল। "পার তো জন্মো না কেউ বিষ্যুৎবারের বারবেলায়", "বুড়ো বুড়ী দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকত", "একদা নন্দলাল করিলেন এক ভীষণ পণ" প্রভৃতি বিদ্রূপরসাত্মক গান ছোটো ছেলেমেয়েদের অফুরন্ত হাসির খোরাক জোগাইত। বাঙালি সম্মিলনীর জন্য ফোনোগ্রাফ আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা 'প্রবাসী'-সম্পাদকের বাড়িতেই থাকিত এবং বাদকও ছিলেন তাঁহাদের বাড়িরই অতিথি। কাজেই ইন্দুভূষণ ও রামানন্দের বাড়ির ছেলেমেয়েরা রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের গানের রেকর্ড যখন-তখন বাজাইয়া মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। যাঁহাদের গাহিবার ক্ষমতা ছিল তাঁহারা কেহ কেহ গ্রামোফোনে শেখা গান সভায় ও বৈঠকে গাহিতেন। মনোরমা দেবীও অনেক সময় এই সব স্বদেশী গান গাহিতেন।

সেকালে (এবং হয়তো একালেও) পশ্চিমের বাঙালিরা অনেকে ভালো বাংলা বলিতে জানিতেন না, বাংলা পড়িতেনও কম। কিন্তু বালিকাদের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র বসুর কন্যা সুজাতা, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উকিলের কন্যা প্রতিভা, প্রবাসী-সম্পাদকের কন্যা সীতা এবং নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের কনিষ্ঠা কন্যার আবৃত্তির কথা মনে পড়ে। বালকদের মধ্যে জীবনময় রায় (ইন্দুভূষণ রায়ের পুত্র) একবার 'পঞ্চ নদীর তীরে' আবৃত্তি করিয়াছিলেন। আবৃত্তি ভালোই হইয়াছিল, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের পছন্দ হয় নাই। তিনি উত্তেজিত হইয়া সম্মুখে আসিয়া স্বয়ং একবার ওই কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া শুনান্। এই সম্মিলনীর কার্যে অবাঙালিরাও সাহায্য করিতেন। কায়স্থ পাঠশালার অধ্যাপক বাবু ধনেশপ্রসাদ প্রভৃতি ছেলেদের ক্রীড়ার প্রতিযোগিতার পরিদর্শক হইতেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রভৃতি উপস্থিত থাকিতেন।

সম্ভবত এ-সমিতির নাম ছিল 'প্রয়াগ বাঙালি সমিতি'। ইহার প্রেসিডেন্ট ছিলেন দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট মেজর বি. ডি. বসু।

এলাহাবাদে 'প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য মন্দির' নামে একটি লাইব্রেরি ছিল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দেব বলেন :—

> "ইহার ১৯০০ সালের পঞ্চবার্ষিক রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে (১৮৯৬—১৯০০) এই পাঁচ বৎসর লাইব্রেরির প্রেসিডেন্ট ছিলেন কবি দেবেন্দ্র সেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট রামানন্দবাবু এবং সেক্রেটারি নীলমাধব কবিরাজ।"

বাঙালি ছেলেমেয়েদের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বিদ্যালয়ে বাংলা পড়িবার অধিকার বিষয়ে তিনি যে চেষ্টা করেন তাহার কথা পরে বলিব।

কুম্ভমেলা ও যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতি

১৩১২ সালের মাঘ মাসে প্রয়াগে কুম্ভমেলা হয়। সে কী বিরাট জনারণ্য! সারা ভারতবর্ষে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। মাঘের দুর্দান্ত শীত অগ্রাহ্য করিয়া হিমাচলের কোল হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত তীর্থলোভীদের পথে বাহির হইয়া পড়ার কী আকুল আগ্রহ! রেল-কোম্পানির মালগাড়ি পর্যন্ত যাত্রীগাড়িতে পরিণত করিতে হইয়াছিল, তদুপরি স্পেশাল ট্রেন তো ছিলই। যাহাদের পয়সা নাই কিন্তু পুণ্যের লোভ আছে তাহারা হাঁটিয়াই প্রয়াগতীর্থে পুণ্য সঞ্চয় করিতে ছুটিয়াছিল। পথে পথে স্টেশনে স্টেশনে পাণ্ডার কোলাহল; বহুদূর হইতে নিজ নিজ পূর্বপুরুষের মক্কেলদের পাকড়াও করিতে তাহারা ব্যস্ত। যাত্রীদের চতুর্দশ পুরুষের খোঁজ লইয়া উত্তরাধিকার সূত্রে কোন যাত্রী কাহার সম্পত্তি তাহা স্থির করিয়া লইতে পাণ্ডাদের বেশি দেরি হয় না।

কোঠা পার্চার বাড়ির উল্টাদিকে রাস্তার অপর পারে একদল পাণ্ডার আড্ডা ছিল। তাহারা সমস্ত দিন যাত্রী পাকড়াইবার জন্য পথের ধারে বসিয়া থাকিত। একদল গঙ্গার ঘাটে, একদল স্টেশনে ও একদল বাড়িতে একই কাজে বিভিন্ন ঘাঁটি আগলাইয়া বসিত। পথে নূতন মানুষ দেখিলেই সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিত, 'গঙ্গা বিষ্ণু ছোটেলাল গয়াজীকা পাণ্ডা।' প্রয়াগে থাকিতেই গয়ার ব্যবস্থা করিয়া রাখার আয়োজন! রাত্রে তাহারা বারাণ্ডায় নাক পর্যন্ত বড়ো বড়ো লক্ষ্ণৌ ছিটের লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িত, ভোর না হইতেই শুরু করিত আবার সেই যাত্রী পাকড়ানো।

নূতন পুরাতন যত ধর্মশালা ছিল যাত্রীতে বোঝাই হইয়া উঠিল। সকলকে ঘরে ধরে না। অনেকে খোলা ছাদেই বাসা বাঁধিল। দিনের বেলা গায়ের কাপড় দিয়া খুঁটির উপর চাঁদোয়া তৈয়ারি করিয়া তাহার তলায় মাথা বাঁচানো চলিত। গৃহস্থদের বাড়িও অনেক স্থলে ভরপুর।

রামানন্দের বাড়িতে এলাহাবাদে কখনও অতিথির অভাব হইত না। এবার মেলা উপলক্ষে একসঙ্গেই বহু লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্যান্য লোকের মধ্যে হরিদ্বার হইতে আসিলেন নিরালম্ব স্বামী; তিনি সংসারাশ্রমে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে পরিচিত ছিলেন এবং বোধহয় কায়স্থ পাঠশালা কলেজে রামানন্দের ছাত্র ছিলেন। এক সময় ইনি বরোদার সৈন্য বিভাগে কাজ লইয়াছিলেন এবং অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতির বোমার মামলার সহিত ইঁহার নাম জড়িত ছিল। অল্প বয়সেই ইনি সন্ন্যাসী হইয়া যান। ইঁহার শরীরে অসুরের ন্যায় শক্তি ছিল, চেহারাও ছিল সেই রকম। ইনি কুম্ভমেলার সময় মাসখানিক তাঁহার পূর্বতন অধ্যাপকের বাড়িতে ছিলেন। যতীন্দ্রের ব্যবহৃত কম্বলটি জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া মনোরমা দেবী তাঁহাকে একটি নূতন কম্বল দেন। নিরালম্ব স্বামী বলিলেন, "সন্ন্যাসীর দ্বিতীয় শীতবস্ত্র রাখিতে নাই।" তাই পুরাতনটি রাখিয়া গিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, "সন্ন্যাসীর কম্বল বাড়িতে থাকিলে বাড়িতে চুরি হয় না। ইহা আপনাদের উপকার করিবে।" ইহা শুনিয়া আর-একজন মহিলা তাহার একটা কোণ কাটিয়া নিজের বাড়িতে রাখেন। যতীন্দ্রনাথ যতদিন জীবিত ছিলেন কলিকাতাতে মাঝে মাঝে মনোরমা দেবীকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহাকে তিনি 'মা' বলিয়া ডাকিতেন।

যোগের দিন নিকটবর্তী হইয়া আসিতেই এক তীর্থযাত্রী পরিবার হাতুয়া হইতে সদলবলে আসিয়া পড়িলেন। বাড়িতে কয়েকটা বড়ো বড়ো ঘর ছিল তাই কোনো রকমে

চলিল।

যে মনিঅর্ডারওয়ালা 'প্রবাসী'র মনিঅর্ডার আনিত সে ছিল গৃহস্বামীর একজন ভক্ত। তাহার ধারণা ছিল বাবুজীর নিকট যাহা আব্দার করা যায় তাহাই পূরণ হয়। সে বলিয়া বসিল যে তাহার বেহাইন 'দেহাত' হইতে গঙ্গাস্নান করিতে এলাহাবাদে আসিবে। কিন্তু দেশের নিয়ম অনুসারে বেহাই-বেয়ানের মুখ দেখাদেখি হওয়া নিষিদ্ধ। এদিকে বেহাইনের কন্যা মনিঅর্ডারওয়ালার পুত্রবধূ মাকে দেখিতে চায়। সুতরাং কোনো একটা বাড়িতে তাহাদের দুইজনকে একত্রে থাকিতে দেওয়া দরকার। বাবুজী যদি দয়া করিয়া স্থান দেন তবেই সমস্যা পূরণ হয় ; সে গরিব, বাড়িভাড়া করিতে পারিবে না। এই বাড়িটা দুমহলা ছিল, একটা পাকা কোঠাবাড়ি ও একটা কাঁচা ইটের বাড়ি। কাঁচা ইটের বাড়িতে অমনি একখানা ঘর দেওয়া হইল, মনিঅর্ডারওয়ালার পুত্রবধূ ও বেয়ানের জন্য। তাহাদের প্রার্থনা ও অভিলাষ পূর্ণ হইল।

কত রকমেরই লোক আসিত। একদিন এক বাঙালি বিধবা সন্ন্যাসিনী গৈরিক ও রুদ্রাক্ষ পরিয়া আসিয়া হাজির। তাঁহার আর্জিটা কী ছিল জানা নাই, মনেও নাই। বোধ হয় যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ হইলে দুধ ফল খাইয়া বিশ্রাম করিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পর আসিল একটি উন্মাদ স্ত্রীলোক। সে যে কী চায়, অথবা কাহার কে হয়, তাহাও বুঝা যায় না। কয়েকদিন থাকিয়া একদিন আপনি সে কোথায় যেন চলিয়া গেল।

ক্রমে সমস্ত এলাহাবাদ শহর ও শহরতলি ভৈরবী, নাগা সন্ন্যাসী ও অন্য নানা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীতে ভরিয়া উঠিল। তাহাদের আবার মাঝে মাঝে এক-এক দলের কোথাও নিমন্ত্রণ থাকিত ; নিমন্ত্রণের নাম 'ভাণ্ডারা'। যেদিন নাগা সন্ন্যাসীদের 'ভাণ্ডারা' থাকিত, সেদিন পথ দিয়া মিছিল করিয়া চার-পাঁচশো নাগা ছাই মাখিয়া খাইতে যাইত। ওই নিদারুণ শীতে তাহাদের দেহে এতটুকু বস্ত্র নাই। অনেকের মুখ শিশুর মতো সরল হাস্যপূর্ণ, অনেকে উগ্র ক্রোধপরায়ণ দেখিতে। আহারের লোভ যে প্রচুর আছে তাহা তাহাদের দ্রুত ধাবন ও আগ্রহপূর্ণ মুখভঙ্গি দেখিয়াই বোঝা যাইত।

ধনী সন্ন্যাসীদের এক-একজনেরই অনেকগুলা করিয়া হাতি। যেদিন তাঁহাদের নিমন্ত্রণ বা সভা থাকিত, সেদিন পথ দিয়া চলিত বিরাট হাতির মিছিল। কেশবানন্দ গিরি (?) নামে এইরূপ এক ধনী মোহান্ত সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার জরি দেওয়া মুকুটের মতো টুপি, মখমলের পোশাক ও হাতি চড়িয়া ঘোরাফেরা দেখিয়া তাঁহাকে রাজা মনে হইত। তাঁহার পিছনে চামর ধরিয়া সেবকেরা বসিত। ভৈরবীরা গেরুয়া বস্ত্র, এলায়িত দীর্ঘ কেশ ও ত্রিশূল লইয়া মিছিলে চলিত। তাহাদের সংখ্যাও কিছু কম নয়। মাঝে মাঝে সন্ন্যাসীদের দলে ভীষণ ঝগড়া বিবাদ ও মারামারি লাগিয়া যাইত, কাহার গুরু বড়ো কিংবা কাহার মত নির্ভুল এই সমস্যার সমাধান করিতে।

বড়ো বড়ো সন্ন্যাসীদের আখড়ায় আখড়ায় তাঁবুতে তাঁবুতে পাঠ, শাস্ত্র-বিচার, বক্তৃতা, উপদেশ, দর্শনী-সংগ্রহ, প্রসাদ-বিতরণ, সভাসমিতি নানারকম ব্যাপার চলিত। আবার এমন অনেক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ছিলেন যাঁহারা এইসব কোলাহল হইতে দূরে গঙ্গার পরপারে ঝুঁসিতে [ঝুপড়ি?] বাসা বাঁধিয়াছিলেন। যোগের দিনে রাত্রি থাকিতে এই সব নানা সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ও লক্ষ লক্ষ গৃহী তীর্থযাত্রী স্নানে বাহির হইয়া পড়িল, পথের ধারের প্রতি দরজা হইতে এবং খোলা মাঠের অসংখ্য তাঁবু, গাছতলা, চটের ছাউনি, বেড়ার ঘর, শাল আলোয়ানের চাঁদোয়ার তলা হইতে মানুষের স্রোত বাহির হইয়া সেই মহা জনসমুদ্রকে

ক্রমেই বাড়াইয়া তুলিতেছিল। ইহারই মধ্যে এক্কা গাড়ি, পালকি গাড়ি ও পালকি-চলিয়াছে পর্দানশীনদের স্নান করাইতে। হাতির লাইন করিয়া অনেক জায়গায় জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইয়াছিল। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার ভয়ে আঁচলে আঁচলে বাঁধিয়া একত্রে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তবু বহু মানুষ হারাইয়া গেল, বহুলোক ভিড়ের চাপে পিষ্ট পদদলিত হইল। দুই-একজন ধনীর বধূ ডুলিশুদ্ধ স্নান করিতে গিয়া গঙ্গাগর্ভেই প্রাণ দিলেন। যখন ডুলিওয়ালারা ডুলি তুলিল তখন বধূর কঙ্কালের উপর স্বর্ণালংকার সাজানো দেখা গেল, বধূ বেচারির মোক্ষলাভ হইয়া গিয়াছে। বাড়িতে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন ইত্যাদির গল্প প্রত্যহ শোনা যাইত। কিন্তু কে যে তাঁহাদের নায়ক ছিলেন মনে নাই।

যতীন্দ্র ব্রহ্মচারী অর্থাৎ নিরালম্ব স্বামীকে অবলম্বন করিয়া দুই-একদিন এ বাড়ির দল মেলা কিংবা সন্ন্যাসীদের আখড়া দেখিতে যাইতেন। দলে সস্ত্রীক ইন্দুভূষণ, সস্ত্রীক রামানন্দ, নেপালচন্দ্র, গিরীশচন্দ্র এবং বালকবালিকারা সকলেই থাকিতেন।

শীতে শীর্ণতোয়া গঙ্গার ওপারে যাইবার জন্য বোধহয় নৌকাশ্রেণীর গোটা দুই সেতু বাঁধা হইয়াছিল। সেতুর মুখে দুই পারে এবং সেতুর উপরেও কত বিচিত্ররকম মানুষ ও সন্ন্যাসী। কেহ ঊর্ধ্ববাহু, কেহ কণ্টকশয্যায় শয়ান, কেহ গঙ্গার জলে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্যমুখে চাহিয়া আছেন। ভিক্ষা সংগ্রহেরও কত বিচিত্র উপায়।

যে দিন আখড়া দেখিতে যাওয়া হইল সেদিন ভারত-প্রসিদ্ধ বহু সাধুর দর্শনলাভ হইয়াছিল। একজনের নাম জীবন্মুক্ত স্বামী। তিনি দিগম্বর। আর-একটি পাঞ্জাবি সম্প্রদায় ছিলেন ; দলপতির নাম এখন মনে নাই। আশ্চর্য সুন্দর চেহারা, বয়স প্রায় নব্বই। তিনি দর্শন দেন, কিন্তু প্রায় কথা বলেন না। আশ্চর্য যে আমাদের দলের সকলে প্রণাম করিবার পর এত লোক থাকিতে তিনি কেবলমাত্র রামানন্দকে ডাকিয়া কথা বলিলেন। তাঁহারই শিষ্য আর এক বৃদ্ধ, বয়স প্রায় পঁচাত্তর। তিনি গুরুর বিষয় অনেক কথা বলিলেন এবং জানাইলেন যে, তিনি এখানে কেবল "বৃদ্ধকে সেবাকে ওয়াস্তে" আসিয়াছেন।

এক গরিবদাসী সম্প্রদায়ের বিখ্যাত সন্ন্যাসীর নিকট অনেকে ভবিষ্যৎ জানিতে ভিড় করিয়া বসিয়াছিল। এ দলের একজন, সম্ভবত যতীন্দ্রনাথ, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভারতবর্ষ কবে স্বাধীন হইবে?" সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমাদের একখানি গ্রন্থে বা একটি সন্তবাণীতে আছে, আটাশ বৎসর পরে হইতে পারে।" এই কথায় দলে মহা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল, নানা আলোচনা শুরু হইল। নেপালচন্দ্র ও যতীন্দ্রনাথ অনেক রকম সম্ভাবনা অনুমান করিলেন।

এই কুম্ভমেলার বৎসরেই বোধহয় মেলায় মেলায় রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য প্রথম আরম্ভ হয়। দেখা গেল একটা বেড়ার ঘরে সন্ন্যাসীরা শিশি-বোতল সাজাইয়া চিকিৎসালয় খুলিয়া বসিয়াছেন। তখন মেলায় কলেরা ইত্যাদি শুরু হইয়াছে। সন্ন্যাসীদের অনেক সম্প্রদায়েই দাহ করা বারণ। যাঁহারা দাহ করিতেন না তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত শবদেহে গঙ্গার জলে নৌকা চালানো কষ্টকর হইয়াছিল। নৌকার দাঁড়ে মাঝে মাঝে শবদেহ ঠেকিয়া যাইতেছিল। নিরালম্ব স্বামী একটা দাঁড় ধরিযা বসিয়াছিলেন। সেবাধর্ম ও এই-জাতীয় সৎকার বিষয়ে বয়স্কদের তাঁহার সহিত অনেক কথা হইতেছিল। কথায় মনে হইল সন্ন্যাসীদেব এই সেবাকার্যের বহু পূর্বেই ইন্দুবাবুরা দরিদ্রের সেবার ব্রত লইয়াছিলেন। তাঁহারা দুরন্ত প্লেগ মহামারীর সময়ও কত জনের সেবা করিয়াছেন।

একজন সন্ন্যাসীর নাম ছিল 'খড়েরহা বাবা'। তিনি মৌনী এবং সর্বদা দণ্ডায়মান। তাঁহার

শিষ্যেরা বলিল কোনো একটা পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। সাত বৎসর দাঁড়াইয়া আছেন, আরও পাঁচ বৎসর দাঁড়াইতে হইবে। তিনি গাছের তলায় একটা দোলনা টাঙাইয়া তাহাতে ভর দিয়া নিদ্রা ও বিশ্রামের কাজ করিতেন।

আর-একজন দিগম্বর সন্ন্যাসীর তাঁবুতে বিরাট সভা হইত। তাঁহার উপদেশ এবং শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতে বহু দূর হইতে লোক আসিত। ইনি শ্বেতহস্তীতে বিচরণ করিতেন। বালকরাম নামক এক বড়ো সাধু সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি ভিড় পছন্দ করিতেন না। গঙ্গার গর্ভে গর্তের মধ্যে ছোটো কুটির করিয়া বাস করিতেন। বিশেষ বিশেষ সময়ে দুই-চারি জনের কাছে দেখা দিতেন।

চিদ্‌ঘনানন্দ নামে আর-একজন বিখ্যাত সন্ন্যাসীরও আখড়া ছিল।

নিরালম্ব স্বামীর মৃত্যুর পর 'প্রবাসী'তে রামানন্দ লেখেন, "...তিনি সন্ন্যাসী বলিয়া সন্ন্যাসীদের ব্যবহৃত নানা কথা তাঁহার জানা ছিল। সন্ন্যাসী বলিয়াই তাঁহার সঙ্গে গেলে কুম্ভমেলার সমুদয় আখড়া আদি দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া একদিন আমরা তাঁহার সঙ্গে মেলা দেখিতে গেলাম। নৌ-চালনায় তিনি দক্ষ ছিলেন। মাঝিকে বিশ্রাম দিয়া নিজেই একটা নৌকা চালাইয়া আমাদিগকে কোনো কোনো জায়গায় লইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী হইলেও সাংসারিক বৃহৎ ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি মনটাকে নির্লিপ্ত করেন নাই। তাঁহার দেশভক্তি প্রবল ছিল। যত সাধুসম্প্রদায়ের আখড়ায় তিনি আমাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন, সর্বত্রই মোহান্ত বা অন্য প্রধান সাধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে এবং সাধুসন্তদিগের বাণীতে ভারতবর্ষ কখন স্বাধীন হইবে সে বিষয়ে কিছু উক্ত আছে কি না। প্রায় সকলেই উত্তর দেন, ওরূপ সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁহারা উদাসীন এবং কিছু জানেন না। কেবল..."

মেলা উপলক্ষে এই সব সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় ছাড়া এলাহাবাদের অন্য সমস্ত প্রসিদ্ধ স্থান ও বাড়ি ছেলেমেয়েদের সর্বদা দেখানো সে বাড়ির নিয়ম ছিল। এলাহাবাদের অশোকস্তম্ভ, গভীর সুড়ঙ্গের ভিতর অক্ষয়বট, গঙ্গা-যমুনা সংগম, খসরুবাগ সর্বত্রই যাওয়া হইত। কাশীতেও কংগ্রেস দেখিতে গিয়া অন্নপূর্ণার মন্দির, বিশ্বেশ্বরের মন্দির, যন্তর-মন্তর, মণিকর্ণিকা, দশাশ্বমেধ দেখিতে বাকি রাখা হয় নাই। আনন্দকে রামানন্দ স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলের সহিত মিলিয়া গ্রহণ করিতে ভালোবাসিতেন। আত্মীয়স্বজনকে বাদ দিয়া ভ্রমণে তাঁহার আনন্দ ছিল না।

কলিকাতায় মাঘোৎসব, গ্রীষ্মের ছুটিতে বাঁকুড়া এবং শীতের সময় কয়েক দিনের জন্য কংগ্রেস, এই ছিল রামানন্দের মাঝে মাঝে এলাহাবাদ ছাড়িয়া যাওয়ার কারণ। কলিকাতায় ফিরিয়া আসার পর হাজার কাজ থাকিলেও তিনি কখনও ১১ মাঘের উৎসবে উপস্থিতি বাদ দিতেন না। প্রথম কয়েক বৎসর বালক-বালিকা সম্মিলনের দিনেও তিনি উপস্থিত থাকিতেন। ডা. নীলরতন সরকার মহাশয় বালক-বালিকাদের খাওয়ানোর পর বয়স্ক বন্ধুদের যখন রাত্রে খাওয়াইতেন, দুই-একবার তাহাতেও তিনি যোগ দিতেন। ১৯৪২-এ ১১ মাঘে ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য হইবার পর তিনি তাঁহার কন্যাকে লেখেন, "১১ই প্রাতে উপাসনা করে এ বেলাও একবার গলিটাতে ঘুরে এলাম এবং যে বাড়িটাতে আমরা ১৪ বৎসর ছিলাম, সেটা নীচের থেকে (মন্দিরের মাঠ থেকে) তেতলা পর্যন্ত দেখলাম। ১১ই মাঘ এক সময় আমার পক্ষে আনন্দের দিন ছিল। এখন তা ভাবি। এই দিনে আনন্দ আর না পেলেও মনটা উর্ধ্বমুখী হয়।"

তিনি শেষবয়সেও আপনার জীবনের শোক-দুঃখের কথা বলিতে বলিতে একবার

বলিয়াছিলেন, "বহু বৎসর ১১ই মাঘ আমার জীবনের একটি প্রিয় দিন ছিল।" শিশুর মতো আগ্রহ ও উৎসাহ লইয়া এই উৎসবে তিনি যোগ দিতেন।

তিনি সহজে এলাহাবাদ ছাড়িয়া যাইতেন না বলিয়া এখানকার সমস্ত রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, সাহিত্যিক ও শিক্ষা বিষয়ক আন্দোলনের সহিত যোগ রাখিবার তাঁহার যে স্বাভাবিক প্রেরণা তাহা অনেকখানিই সফল হইয়াছিল। সকল ভাষাভাষী সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সকল ক্ষেত্রের কর্মোৎসাহীদের সহিতই তাঁহার যোগ ও বন্ধুত্ব ছিল। প্রাচীনপন্থী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্যও তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন, আবার খ্রিস্টীয় মিশনারি মি. গ্রেস এবং অন্য দুই-একজন খ্রিস্টান এবং ইংরেজ অধ্যাপকও তাঁহার বন্ধু ছিলেন। হিন্দুস্থানি, বাঙালি কাশ্মীরি বহু বন্ধুর সহিত নানা কর্মসূত্রে যোগের কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

প্রবাসীর ক্রমোন্নতি

বাংলা দেশের বাহির হইতে 'প্রবাসী'কে গড়িয়া তুলিতে এবং শক্তিশালী ও জনপ্রিয় করিতে সম্পাদককে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ সেন, যোগেশচন্দ্র রায়, বামনদাস বসু, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অপূর্বচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি প্রবাসী বাঙালিরা লেখার কার্যে তাঁহার সহায় ছিলেন। বাংলা দেশের লেখকদের নিকট এই সময় তিনি বেশি লেখা পাইতেন না। অনেকের ধারণা নামজাদা লেখকের লেখা পাইলেই তিনি নির্বিচারে ছাপিতেন, এবং গল্প ও কবিতা বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। এই ধারণা যে কতখানি ভুল তাহা যাঁহারা তাঁহার সহিত কাজ করিয়াছেন এবং যাঁহারা নিজেদের লেখা বিষয়ে তাঁহার শুধু মতামত জানিবার জন্য তাঁহাকে লেখা পাঠাইতেন তাঁহারাই জানেন। আর-একদল লোকও জানেন যাঁহাদের রচনা আগাগোড়া ঘষিয়া-মাজিয়া তিনি নূতন করিয়া ছাপাইতেন এবং সেইজন্যই পরে তাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে নাম করেন। বিজয়চন্দ্র মজুমদার তাঁহাকে কখনো কখনো মতামতের জন্যই রচনা পাঠাইতেন। তাঁহার গৃহে রক্ষিত রামানন্দের ৪২।৪৩ বৎসর পূর্বেকার চিঠি উদ্ধৃত করিলে বুঝা যাইবে তিনি কতটা সব দিক দেখিয়া বিচার করিতেন।

প্রবাসী কার্যালয়, এলাহাবাদ।
১৯/১১/১৯০১

সবিনয় নিবেদন,

আপনার প্রেরিত রচনাগুলি আদ্যোপান্ত পড়িয়াছি। সকলগুলিই প্রশংসনীয়। অবশ্য সকলগুলিকে একই কারণে বা একই রকমের প্রশংসা দেওয়া যায় না।

'বনলীলা' ছন্দের মধুর ঝঙ্কারে এবং কবিত্বে মনোজ্ঞ হইয়াছে। ছন্দের এত বাঁধুনির মধ্যে এতটা কবিত্ব রাখা বিশেষ ক্ষমতা ও প্রতিভার পরিচায়ক। 'প্রেমলীলা'ও বেশ হইয়াছে। কিন্তু **Petruchio** ও **Kate**-এর মতো **courtship**টা এত সংক্ষেপে সারিতে গিয়া আপনিও সুহাসিনীকে কতকটা **abruptly** প্রেমে ফেলিয়াছেন। ক্রেতা একটা দর হাঁকিয়া কিংবা লইব না বলিয়া দোকান হইতে দু'পা যাইতে-না-যাইতেই যে দোকানদার দর কমাইয়া দেয়, সে এখনও দোকানদারি শিখে নাই। সুহাসিনীকে প্রেমের ব্যবসায়ে কি এতটা অনভিজ্ঞ করা আপনার উদ্দেশ্য? অথবা হয়তো সে বেচারা মুখরা হইলেও নিতান্ত সরলা!

'মোতিয়া' বেশ হইয়াছে। সাহেব বাঁদরটাকে আর-একটুকু নাচাইলে মন্দ হইত না।

ঋতু-সংহারের অনুবাদ মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিবার সুযোগ পাই নাই, সে ক্ষমতাও নাই। কবিতা হিসাবে বেশ হইয়াছে।

ইহা সত্য যে সমুদয় রচনা delicate রুচির লোকের উপযোগী নয়। ঋতু-সংহার বাংলায় সে মোহ জন্মাইতে পারে না, যাহা সংস্কৃত মূলে আছে। এইজন্য অনেক জায়গায় indelicate মনে হয়। ফ্রেম অনুসাবে ছবি মানানসই বা বেমানান হয়। তেমনি উজ্জয়িনীব নায়কনায়িকার চিত্র উজ্জয়িনীর ফ্রেমে যেমন ঘোরালো হয়, বাংলার ফ্রেমে তেমনটি হয় না। আমার ধারণা দুর্নীতি বা অশ্লীলতা কথায় হয না, উদ্দেশ্যে হয়। দাম্পত্য প্রেমের চরম পরিণতি যাহাই হউক, মূলত এবং প্রধানত উহা শুধু অশরীবী ব্যাপার নয় :—দৈহিক আধ্যাত্মিকের অনির্বচনীয় সংমিশ্রণ। যৌন আকর্ষণ ও অনুরাগের বর্ণনায় কেহ যদি দৈহিকের দিকে বেশি ঝোঁকেন, তাহা হইলেই তাঁহার রচনাকে অশ্লীল বলিতে পারি না; যদিও তাহাকে শ্রেষ্ঠ কবিতার আসন দিতেও পারি না। কিন্তু দৈহিক একেবাবে বাদ দিলেও কেমন অস্বাভাবিক লাগে।

তবে একথা মানি যে, দৈহিক আকর্ষণের বা সম্ভোগের চিত্র অপরিণত-বুদ্ধি পাঠক-পাঠিকার পক্ষে ভালো নয়। এইজন্য আমি পুস্তক-প্রকাশক হইলে আপনার বক্ষ্যমাণ সমুদয় রচনাই ছাপিতে পারিতাম। কিন্তু যাহা promiscuously ছেলেমেয়ে বালক-বৃদ্ধ সকলের হাতে পড়ে এরূপ publication-এ ছাপা কাহাবও পক্ষে সংগত বোধ কবি না। যাহা হউক, আপনি বোধহয় এসব ঝুটা philosophy শুনিতে চান না। এখন কাজের কথা বলি।

...আমার বিবেচনায় গদ্য পদ্য সবগুলি এক কেতাবে ছাপায় দোষ নাই। কারণ সকলগুলিতেই পুষ্পধন্বার কীর্তি বা প্রভাব বিদ্যমান আছে।

...আমি চাকবি করিয়া খাই, সাহিত্যচর্চা করিবার সময় পাই না। নতুবা ইচ্ছা হয় যে আর কোনোরূপে না পারি, আপনার 'বনলীলা' বা 'বংশীগোপাল', এবং অন্যান্য কবিদের কোনো কোনো কবিতার appreciation লিখিয়াও সাহিত্যসেবা করি। কিন্তু তাহার সময় কোথা? মনিহাবী দোকান বা পাঁচ ফুলের সাজি সাজাইতে সাজাইতেই বুঝি বা আয়ু শেষ হয়।

ইতি—

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বিজয়বাবু তাঁহার রচনাগুলির উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করিবার জন্য এবং সেগুলি কোথায় বই করিয়া ছাপানো যায় জানিবার জন্য 'প্রবাসী' সম্পাদককে পাঠাইয়াছিলেন, নির্বিচারে 'প্রবাসী'তে ছাপাইবার জন্য নয়। সাহিত্যিকের জীবন অবসরের জীবন। রামানন্দ ছিলেন কর্মযোগী। সাহিত্যিক প্রতিভা, বিশেষজ্ঞ ও সমালোচকের শক্তি লইয়া তিনি জন্মিয়াছিলেন, সাহিত্যেই ছিল তাঁহার আনন্দ, কিন্তু নিজ চিত্তবিনোদনের অবসর জীবনে তাঁহার হয় নাই। তিনি দেশসেবার সূত্রে যে সাহিত্যিক-শক্তির পরিচয় আপনার অজ্ঞাতেই দিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে বহু স্থায়ী সম্পদ আছে, কিন্তু তাহাও তিনি পুস্তকাকারে গাঁথিয়া যান নাই। তিনি কী রকম খুঁটিনাটি ছোটো বড়ো সমস্ত লক্ষ করিয়া পড়িতেন তাহার একটা নিদর্শন-স্বরূপ বিজয়বাবুকে লিখিত আরও একটি চিঠি হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"যুধিষ্ঠির কয়েকবারই পড়িলাম। কিন্তু সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। উহাতে ভালো কথা আছে। কিন্তু আমার মনে হইতেছে যে যতটুকু emotion দ্বারা উহা touched হওয়া চাই তাহা হয় নাই। কিছু cold হইয়াছে, এবং শেষ অংশটিতে climax reach করে নাই।" [১২-৩-১৯০২। এলাহাবাদ]

রামানন্দ বাংলা দেশের লেখকদের বিশেষ সাহায্য না পাইয়াও এবং প্রথম বৎসরে দুই-রঙা ছবি ছাপিবার পূর্বেই যথেষ্ট লোকসান দিয়াও দ্বিতীয় বৎসরে 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠা বাড়াইতে এবং নানা রঙের ছবি ছাপিতে নূতন উদ্যমে নামিয়াছিলেন। এই দুঃসাহসকে তিনি তাঁহার 'বাতিক' বলিয়াছেন ; কিন্তু ইহা তাঁহার হার না-মানিবার পণ। বিজয়বাবুকে তিনি 'প্রবাসী'র প্রথম বৎসরের শেষে লিখিয়াছিলেন :—

"আপনার কাছে গল্প চাই বলিয়া মনে করিবেন না যে কেবল গল্পই আপনার কাছে চাই। সব রকম লেখাই চাই। কারণ আপনি খুব **versatile**।

আব একটি কথা আপনাকে বলা হয় নাই। আমি কলিকাতাবাসী লেখকদের—'বঙ্গ দেশবাসী লেখকদের' বলিলেও চলে—সাহায্য অল্পই পাইতেছি। এইজন্য প্রবাসী লেখকদের উপর অধিক নির্ভর করি। সুতরাং অনেক কাজ সত্ত্বেও আপনাকে 'প্রবাসী'র জন্য খুব খাটিতে হইবে। টাকাব কথা আপনাকে লিখিলে আমার বাতিকের কিছু পরিচয় পাইবেন ; তাই লিখিতেছি যে এ বৎসর আমার মোটামুটি দেড হাজার টাকা লোকসান হইবে। আমার মতো অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ লোকের পক্ষে এই সামান্য ক্ষতিও অত্যন্ত অধিক। কিন্তু যদি আপনাদের দশজনেব ভালো ভালো লেখা পাই, তাহা হইলে হয়তো আগামী বৎসরে এত ক্ষতি হইবে না, এবং তৃতীয় বৎসর কাগজখানা দাঁড়াইয়া যাইবে।

নাটকাকারে পদ্য ও গদ্য গল্প বাঙলা কাগজে বেশি বাহির হয় না। আপনি ইচ্ছা করিলে ইহাকে 'প্রবাসী'র একটা বিশেষত্ব কবিয়া তুলিতে পারেন। আপনার 'মোতিয়া' ও 'অনুতাপে' বিলাত ফেরতদের অপকৃষ্টতা দেখানো হইয়াছে। আমাদের দেশের ভালো জিনিসগুলি হারান নাই অথচ ইংরেজ সমাজের সদ্‌গুণগুলি পাইযাছেন, এরূপ একটি চরিত্রের সৃষ্টি করিলে ভালো হয়। আশা করি ইহা আপনার অনভিপ্রেত হইবে না।"

বিজয়চন্দ্র এবং অন্যান্য প্রবাসী বাঙালি লেখকেবা বাংলা দেশের কাগজে কম লিখিয়া 'প্রবাসী'তে বেশি লিখিতেন বলিয়া বাংলা দেশের কোনো কোনো সম্পাদক বোধ হয় বিজয়বাবুর নিকট কিছু নালিশ করিয়াছিলেন। সেই সংবাদ পাইয়া 'প্রবাসী' সম্পাদক লিখিতেছেন—"সে সকল সম্পাদক নালিশ কবিযাছেন তাঁহাদের বড়ো অন্যায়। আমরা কোথায় কে হিন্দুস্থানি—, ওড়িয়া—, বা মরাঠা—বা মাদ্রাজি—বাঙালি পড়িয়া আছি আমাদের লেখায় তাঁহাদের দাবি নাই। তাঁহাদের খাস বাঙালিদেব লেখা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। বাস্তবিক আমি কলিকাতার ও বঙ্গের অন্য স্থানবাসী অনেক সুলেখককে পত্র লিখিয়া কোনো উত্তব পাই নাই। সুতরাং যদি 'প্রবাসী' আপনাব সমুদয শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি পায়, তাহাতে কিছুই অবিচাব হয় না।...

আপনার শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়"

[২৩-৪-১৯০২]

যে সময় একরঙা ছবি জোগাড় করা এবং ছাপানোই লোকে অসম্ভব মনে করিত সেই সময় দ্বিতীয় বৎসর হইতেই 'প্রবাসী'তে বহুবর্ণরঞ্জিত ছবি ছাপা শুরু হইয়া গেল। ইতিপূর্বে বাংলা মাসিকপত্রে এরূপ ছবি কখনও ছাপা হয় নাই। এই সময়ের কথা সুরেন্দ্রনাথ দেব বলিয়াছেন, "কত বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়াই না 'প্রবাসী'কে অগ্রসর হইতে হইয়াছে! উপযুক্ত মুদ্রাকর নাই, যথেষ্ট কাগজ নাই, 'প্রথম' সচিত্র মাসিক পত্রিকাকে চিত্রিত করিবার কোনো উপকরণই নাই—আছে কেবল সম্পাদকের অক্লান্ত উৎসাহ ও অধ্যবসায়। অবশেষে অধ্যবসায়ী পুরুষ জয়যুক্ত হইলেন।" প্রথম বহুবর্ণ ছবি দুইটি সপ্তম এডওয়ার্ড ও রানী আলেকজান্দ্রার ফোটো। হাতে-আঁকা ছবির নানা রঙের প্রতিলিপি করা আরও শক্ত ছিল বলিয়া সে বৎসর অবনীন্দ্রনাথের "সুজাতা ও বুদ্ধ" এবং "বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতী" এক রঙেই

ছাপা হয়। এইসঙ্গে ইউরোপ হইতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া র‍্যাফেল প্রভৃতির চিত্রের প্রতিলিপি আনানো শুরু হইল। বাংলা দেশে এ কাজও আগে কেহ করেন নাই। কোনো কোনো ইউরোপিয় ছবি আনাইয়া বিজয়বাবুকে দেওয়া হইত, তিনি ছবিটির বিষয় একটি কবিতা লিখিয়া দিতেন। আমাদের যুগের ছেলেমেয়েদের ইউরোপিয় চিত্রকলা, র‍্যাফেলের ম্যাডোনা, বিসোঁ, হফম্যান, জি এফ ওয়াটস্, গুইডো রেনি, ম্যুরিলো, প্রভৃতির চিত্রের সহিত প্রথম পরিচয়ও যে 'প্রবাসী'র ভিতর দিয়া তাহা আজ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা মনে করি শুধু অবনীন্দ্র কিংবা বড়ো জোর রবিবর্মার ছবির প্রথম প্রচারই 'প্রবাসী'-সম্পাদক করিয়াছিলেন। যখন ইউরোপিয় এই সব ছবি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইত কাহারও নিকট এ সব বিদেশি ছবিও দেখা যাইত না। 'প্রবাসী'-সম্পাদকই বাঙালির ঘরে ঘরে উচ্চাঙ্গের এই শিল্পকলার প্রচার করেন। তিনি একদিকে 'শাজাহানের মৃত্যু', 'বিরহী যক্ষ', 'ভারতমাতা' প্রভৃতি অবনীন্দ্রের বিখ্যাত ছবি ভারতবর্ষে প্রথম ছাপিতেছেন আবার তিনিই বিদেশি বিখ্যাত ছবির প্রচার করিতেছেন। ১৩১০-এর 'প্রবাসী'তে সম্পাদক লিখিয়াছিলেন, "কেহ কেহ বলেন 'প্রবাসী'তে এ সকল ছবি না দিয়া কেবল আমাদের দেশের পৌরাণিক বা প্রাচীন সাহিত্যিক বিষয়ের ছবি দেওয়া উচিত।...'প্রবাসী' ভারতীয় চিত্র প্রকাশিত করিবার জন্য যেরূপ যত্ন ও অর্থব্যয় করিয়াছে অন্য কোনো পত্র তাহার তুলনায় কিছুই করে নাই। কিন্তু আমরা কি সংকীর্ণমনা হইয়া ভালোমন্দ যেরূপ হউক, কেবল ভারতীয় ছবিরই প্রশংসা করিব? ললিতকলা দেশ বা জাতি বা ধর্মসংপ্রদায়ে আবদ্ধ নহে। মনে ভাববিশেষ উদ্রেকের ক্ষমতা ও সৌন্দর্য চিত্রের প্রাণ।... সেইরূপ চিত্র যে ধর্ম বা জাতি সম্বন্ধীয়ই হউক-না-কেন, আমরা যাহাতে তাহার উৎকর্ষ বুঝিতে পারি, তদ্রূপ শিক্ষা লাভ করিবার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।"

১৩০৯ এবং '১০-এর 'প্রবাসী-তে ইউরোপিয় ছবি ছাড়া জাপানি তাইকান, য়ুঙ্গো হিসিডা এবং দেশীয় রবিবর্মা, রামবর্মা, অবনীন্দ্র, ধুরন্ধর, ম্হাত্রে প্রভৃতি অনেকের ছবি ছাপা হয়। বাংলা ১৩০৯-এ বোধ হয় 'প্রবাসী'-সম্পাদক ২১ খানি ছবিসহ রাজা রবিবর্মার জীবনী প্রকাশ করেন।

'প্রদীপে' যেমন কীর্তিমান বাঙালিদের এবং কিছু অবাঙালিরও জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল, 'প্রবাসী'তে তেমনি কীর্তিমান প্রবাসী বাঙালিদের জীবনী প্রকাশ নিয়মিত হইয়া উঠিল ১৩০৮-এর শেষ হইতে। এই সময় বাঙালিদের বিদেশে অনাদর শুরু হয়, এবং 'বেহারির জন্য বিহার', 'মাদ্রাজির জন্য মাদ্রাজ' ইত্যাদি কথার চলন হয় বলিয়াই বোধ হয় এই জীবনী প্রকাশ-কার্যে সম্পাদক আরও উৎসাহ দেখান। ইহার জন্য 'প্রবাসী'তে বিশেষ সুবর্ণপদক ঘোষণা করা হয়। বাংলা ১৩১১ সাল হইতে দীর্ঘকাল প্রবাসী বাঙালিদের বিষয় 'প্রবাসী'তে ধারাবাহিক ভাবে লিখিত হইয়াছে।

১৩০৯-এ ইন্ডিয়ান প্রেসে বাংলা কম্পোজিটারের অভাব হওয়াতে 'প্রবাসী' কুন্তলীন প্রেসে ছাপা হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় বৎসরের 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের 'সুদূর' প্রভৃতি তিনটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৩১৩র 'প্রবাসী'তে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল 'কাব্যের অভিব্যক্তি' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র সমালোচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিপূর্বে 'প্রদীপে'রও লেখক ছিলেন। তাঁহার 'নসীরাম পালের বক্তৃতা' প্রভৃতি 'প্রদীপে'ই প্রথম ছাপা হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল 'কাব্যের অভিব্যক্তি'তে 'সোনার তরী'কে অস্পষ্টতা-দোষদুষ্ট বলেন। দুই মাস পরেই শ্রীযুক্ত যদুনাথ

সরকার 'প্রবাসী'তে 'সোনার তরী'র একটি ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন এবং ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সোনার তরী'র দ্বিজেন্দ্রলালের আরোপিত অস্পষ্টতা দোষ দূর করিবার চেষ্টা করেন। ১৩৫০ সালে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন, "রামানন্দবাবু 'সোনার তরী' অস্পষ্ট মনে করিতেন। অন্যদ্বারা 'তরী'র ব্যাখ্যাও করান নি।" কিন্তু ১৩১৩-র 'প্রবাসী'তে দেখি ব্যাখ্যা যদুনাথ সরকার করিয়াছিলেন। সম্পাদক অস্পষ্ট মনে করিতেন কি না কোথাও লেখা নাই।

এই সময় 'প্রবাসী'র আর-একটি বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় ভারতীয় শিল্প (পণ্যশিল্প) সম্বন্ধে। ভারতীয় নানা প্রদেশের নানা শিল্পের ফোটোগ্রাফ ছাপিয়া, জিনিস তৈয়ারি করিবার প্রণালী ও ফর্মুলা ছাপিয়া, দেশি জিনিস ব্যবহার করিতে উৎসাহিত করিয়া এমন কী কৃষিজাত দ্রব্য সম্বন্ধেও বড়ো প্রবন্ধ ছাপিয়া 'প্রবাসী' স্বদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা করেন।

আমাদের দেশের মাসিকপত্র পুরাকালে কখনও নিয়মিত বাহির হইত না। 'প্রবাসী'ও প্রথম দুই-তিন বৎসর খুব নিয়মিত প্রকাশ করা যায় নাই। ১৩১০ সালের মাঘ হইতে সম্পাদক নিয়ম করেন যে প্রতি ৩১ দিন অন্তর 'প্রবাসী' প্রকাশ করিতেই হইবে। এই নিয়ম তাঁহার জীবিতকালের মধ্যে কখনও লঙ্ঘিত হয় নাই। তিনি রোগ শোক অভাব সকল কিছুর মধ্যেই এই নিয়মরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার দেখাদেখি অন্যান্য কাগজের সম্পাদকেরাও এই নিয়মের মর্যাদা বুঝিয়া ক্রমে তাহা পালন করিতে শেখেন। পূজার সময় আপিসকে ছুটি দিবার জন্য দু' মাসের কাগজ অবশ্য এক মাসেই বাহির হয়।

সেকালে সাহিত্যচর্চাকে অর্থকরী বিদ্যা বলিয়া ভাবিতেও কেহ সাহস করিত না। ইহা ছিল শখের ব্যাপার। ডা. মনোমোহন ঘোষ বলেন, " 'প্রবাসী'র প্রথম বৈশিষ্ট্য, সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীর সম্বন্ধটি ঘনিষ্ঠ করে তোলা। তিনি 'প্রবাসী'র লেখকদের জন্য নিয়মিত যথাযোগ্য দক্ষিণা দানের যে অভিনব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তাও বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ব্যাপার। এতে যুগপৎ তাঁর সাধুতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষা-ব্যবসায়ী হয়েও এবং শিক্ষাদান কার্যে রত থেকেও তিনি যে সাহিত্যচর্চাকে আর্থিক দিক দিয়ে সফল করে তুলতে পেরেছিলেন এটা রামানন্দবাবুর বিশেষ কৃতিত্বের কথা।"

বলাই বাহুল্য যে, যে-জাতীয় জনপ্রিয় রচনা প্রচারে কিছু অর্থাগমের সম্ভাবনা সেকালেও ছিল তেমন হীন আদর্শের কোনো রচনা তাঁহার কাগজে কখনও প্রকাশ করার কল্পনাও তিনি করিতে পারেন নাই। আশ্চর্য এই যে তথাপি তিনিই সাহিত্যচর্চাকে অর্থকরী বিদ্যা করিয়া তুলিয়াছিলেন। লোকশিক্ষা ও জনসেবার আদর্শ প্রচার যে কাগজের আদর্শ তাহাই তাঁহার হাতে লেখক ও সম্পাদক উভয়ের অর্থাগমের উপায় হইয়া উঠিল।

চতুর্থ বৎসরের প্রথম সংখ্যা 'প্রদীপে' রামানন্দের স্বাক্ষরিত একটি প্রবন্ধ আছে, তাহাতে বাংলা সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে কী নাই ও কী থাকা উচিত তাহার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তিনি স্বয়ং 'প্রদীপে'র এবং পরে 'প্রবাসী'র যুগে বাংলা কাগজের এই অভাবগুলি দূর করিতে চেষ্টা করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "সাহিত্যের চর্চাও আমাদের দেশে কিঞ্চিৎ পরিমাণে আছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে কোনো সাপ্তাহিক বা মাসিক কাগজে আমি এ পর্যন্ত নিয়মিতরূপে ভালো সমালোচনা বাহির হইতে দেখি নাই।... আমাদের সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজগুলিতে নানা বিষয়ক প্রবন্ধ ও সর্বপ্রকার বাংলা পুস্তকের সমালোচনা থাকা উচিত। বাজে 'ভীষণ' ও জালজুয়াচুরির গল্পগুলি তুলিয়া দিলে অনেক জায়গাও হইতে পারে।"

সম্পাদকেরা লেখকদের সাহায্য ভিক্ষা করিয়া অনেক সময় চিঠির জবাবও পাইতেন না। সেইজন্য কাগজ ছাপাইয়া সম্পাদকের লাভ হউক বা লোকসান হউক লেখকদের টাকা দেওয়া উচিত 'প্রদীপ'-সম্পাদকের এই ধারণা দৃঢ়তর হয়। তিনি লিখিলেন, "আমার বিবেচনায় লেখকদিগকে টাকা দিবার প্রথা প্রবর্তিত করা উচিত। অনেকে মনে করিবেন, টাকা না দিয়াই কাগজের খরচ কুলায় না। তাহার উপর টাকা দিতে হইলে স্বত্বাধিকারীর কিছু পৈতৃক জমিদারি থাকা চাই। 'ভীষণ' গল্প বাহির করিব না, 'উপহার' দিব না, অশ্লীল বা আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন বাহির করিব না, তাহার উপর লেখকদিগকে টাকা দিতে হইবে, এরূপ করিলে একে তো গ্রাহক কমিয়া যাইবে, বিজ্ঞাপনের আয় কমিয়া যাইবে, তাহার উপর খরচ ভয়ানক বাড়িবে। খরচ বাড়িবে বটে, কিন্তু খুব বাড়িবে না। হয়তো গ্রাহক না কমিতেও পারে।"

বিলাতে তখন কাগজের ভালো ভালো লেখকেরা ৫০০ কথার জন্য ১৫ টাকা পাইতেন, Chambers Encyclopaedia হইতে ইহা দেখাইয়া তিনি বলেন, "বিলাতের ছাত্রদের ব্যয় যেখানে ১৫০, টাকা, কলিকাতায় সেখানে ২০, টাকায় চলিতে পারে। সুতরাং লেখকদের এখানে ৫০০ কথার জন্য ২, দিলে নিতান্ত অন্যায় হয় না।" লেখার জন্য টাকা দিবার নিয়ম প্রবর্তিত হইলে সম্পাদককে লেখকদের কাছে নিতান্ত ভিক্ষুক ও অনুগ্রহজীবী সাজিতে হয় না ; অপেক্ষাকৃত দরিদ্র লেখকদের উপকার হয় ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং কালে সাহিত্যসেবকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। কিছু টাকা দিতে পারিলে সম্পাদক মনে করিতে পাবেন, "আমার যাহা সাধ্য লেখকগণকে দিলাম। যদি তাঁহাদের লেখার উপযুক্ত মূল্য না দিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি যেমন বিনা লাভে বা অল্প লাভে পরিশ্রম করিতেছি, তাঁহারাও না হয় মাতৃভাষার সেবার জন্য তদ্রূপ কিছু স্বার্থত্যাগ করুন। তাহা ছাড়া, অর্থের জন্য যাঁহাদের সাহিত্যসেবক হইবার আবশ্যক নাই, তাঁহারা লেখার জন্য টাকা লইতে স্বীকৃত হইলে তাঁহাদের অপেক্ষা নির্ধন লেখকগণের টাকা লইতে কোনো সংকোচ বোধ হইবে না। ইহাও কম লাভ নয়।" ('প্রদীপ', অগ্রহায়ণ, ১৩০৭।)

'প্রদীপ'-সম্পাদকের আত্মসম্মানজ্ঞান প্রখর ছিল বলিয়া লেখকদের অর্থ দিবার এই প্রথা তিনি ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে চালাইয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং তাহা না লিখিলেও পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। লেখক ধনী বলিয়া সম্পাদক কেন বিনা মূল্যে তাঁহার লেখা গ্রহণ করিবেন?

এই প্রবন্ধ লিখিবার চারি মাস পরে 'প্রবাসী'র উদয় হয় এবং সম্পাদক যে প্রথম হইতেই লেখকদের দক্ষিণা দিবার প্রথা প্রবর্তন করেন তাহার সাক্ষ্য রজনীকান্ত গুহ মহাশয়ের লেখা হইতে পাই। রজনীবাবু লিখিতেছেন, "হিন্দু, গ্রীক ও রোমান' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠাইলাম। দ্বিতীয় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮) সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হইল। অধিকন্তু তিনি আমাকে যথোচিত পারিশ্রমিক পাঠাইয়া দিয়া লিখিলেন, 'আমাকে যে-হারে পারিশ্রমিক দিলেন, তিনি এবং দীনেশ সেন ঠিক সেই হারে 'ভারতী' হইতে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন।' আমার ন্যায় অজ্ঞাতনামা লেখকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর গৌরব কী হইতে পারে?"

তখন বাংলা দেশে কোনো কাগজই লেখকদের নিয়মিত টাকা দিতেন না। শুনিয়াছি 'ভারতী' খ্যাতনামা দুই-এক জনকে কখনও কিছু টাকা, কখনও কলম ইত্যাদি উপহার দিতেন। যাহাই হোক, 'প্রবাসী' লেখকদের টাকা দিয়া নিজের খাতায় প্রথম বৎসর দেড় হাজার লোকসান লিখিয়াছিলেন। লেখকদের নিয়মিত টাকা দেওয়ার প্রথা 'প্রবাসী'রই প্রবর্তিত, পরে অন্যেরাও টাকা দেন।

ডা. রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিয়াছেন,

"রামানন্দ জনগুরু। জগতের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে বিবিধ রত্ন আহরণ করিয়া রামানন্দবাবু আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন। আমরা তাহার সাহায্যে যে শিক্ষালাভ করিতাম তখনকার দিনে স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই প্রকার শিক্ষার কোনো সুযোগ ও সুবিধা ছিল না। সাহিত্য, অর্থনীতি, সমাজনীতি, উন্নতিশীল জাতির আধুনিক বিবরণ, নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রভৃতি যত বিবিধ তথ্য এই পত্রিকার সাহায্যে জানিয়াছি এবং শিখিয়াছি অন্য কোনো উপায়ে তাহা সম্ভবপর হইত না। এই হিসাবে রামানন্দবাবু আমাদের যুগের যুবকদের শিক্ষাগুরু।... তিনি একটি মাত্র বিদ্যায়তনের শিক্ষকতার পরিবর্তে দেশব্যাপী যুবকগণের শিক্ষকতার কার্য করিয়াছেন, ইহা তাঁহার জীবনের প্রধান কীর্তি।"

এই লোকশিক্ষার ইচ্ছা লইয়াই যে তিনি কাজে নামিয়াছিলেন তাহা বুঝা যায় ১৩০৭-এর 'প্রদীপে'র এই প্রবন্ধটি হইতে। রামানন্দ বলিতেছেন, "একখানি আদর্শ কাগজ চালাইতে হইলে যদি আপাতত আয়ের অতিরিক্ত কিছু টাকা ব্যয় হয়, তাহা নির্বাহ করিবার উপায় করা উচিত। বস্তুত লোকশিক্ষার জন্য যেমন বিদ্যালয়ের প্রয়োজন, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদিরও তদ্রূপ প্রয়োজন। যেমন স্কুল কলেজ চালাইবার জন্য বড়লোকেরা টাকা দেন, তেমনি ভালো কাগজ চালাইবার জন্যও দান করা উচিত।...আমি সম্পাদকের কার্যকে শিক্ষক বা অধ্যাপকের কার্য অপেক্ষা কম পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ মনে করি না।... স্কুল কলেজের উন্নতি করিতে হইলে endowment চাই। যেমন পুরাকালে চতুষ্পাঠী এবং দেবমন্দিরের ব্যয় নির্বাহার্থ ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর জমি দান করা হইত, একালে তদ্রূপ বিদ্যামন্দিরের ব্যয় নির্বাহার্থ সম্পত্তি দান প্রয়োজন। আমার মতে সাময়িক সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধান এবং মর্যাদা রক্ষার জন্যও এইরূপ সম্পত্তির প্রয়োজন।" ('প্রদীপ', ১৩০৭)

তিনি নিজ জীবনের সমস্ত শক্তিই প্রায় দেবোত্তর সম্পত্তির মতো এই লোকশিক্ষার কার্যে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ঋণজালজড়িত হইয়াও অন্য পথ খোঁজেন নাই। তবে এই মর জীবনের শক্তিরূপ সম্পত্তি দেবোত্তরের মতো চির বা দীর্ঘ স্থায়ী নয়।

মডার্ন রিভিয়ু

'ধর্মবন্ধু'র যুগ হইতেই রামানন্দ ছিলেন সব্যসাচী। তিনি ইংরাজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই লিখিতেন শুধু নয়, অনেক সময়ই দুইখানি করিয়া কাগজের সম্পাদন-কার্যেও নিযুক্ত থাকিতেন। যখন তিনি 'ধর্মবন্ধু'র সম্পাদক, তখনই তিনি 'ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জারে'র সহকারী সম্পাদক, আবার যখন তিনি 'প্রদীপে'র সম্পাদক, তখন তিনি 'কায়স্থ সমাচারে'র সম্পাদক। বাংলা 'সঞ্জীবনী' এবং ইংরাজি 'ইন্ডিয়ান মিরর' উভয় পত্রেই তিনি সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিতেন। 'ইন্ডিয়ান পিপলে'র এবং 'অ্যাডভোকেটে'র সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন,

"শিক্ষার সহিত তাঁহার প্রথম জীবনে যে যোগ ছিল তাহাতে শিক্ষকের প্রাপ্য মর্যাদা তিনি নিজ পাণ্ডিত্য ও চারিত্র্য-গুণে অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি যখন পত্রিকা-সম্পাদকত্ব বরণ করিয়া লইলেন তখন সেই মর্যাদা তাঁহার আসনকে মহীয়ান করিয়া রাখিল... সমাজচক্ষে একাধারে তাঁহার স্থান হইল শিক্ষা-গুরুর এবং সাহিত্যিকের, চিন্তা-নায়কের

এবং রস-পরিবেশকের। তিনি ছিলেন জীবনের সমালোচক, জনগণেব ও শাসকবর্গের উদ্বোধক।"

'প্রবাসী' ৫।৬ বৎসর প্রকাশিত হইবার পর যখন প্রবাসে ও বাংলা দেশে ইহার আবির্ভাবে একটা বড়ো রকম সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, তখন তাঁহার চিত্তের ঔদার্য বাংলা ভাষার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকিতে চাহিল না। তিনি 'প্রবাসী'তেই তৃতীয় বৎসরে বলিতেছেন, "ঠিক বলিতে গেলে আমরা প্রথমত ভারতসন্তান, দ্বিতীয়ত বাঙালি।" যখন ভারতের প্রদেশে প্রদেশে প্রাদেশিকতার লড়াই শুরু হইয়াছে তখন এই রাঢ়ীয় বাঙালি অনুভব করিলেন, তিনি হিন্দুস্থানবাসী এবং তিনি ভারতসন্তান। সুতরাং বাঙালির, হিন্দুস্থানির এবং সমগ্র ভারতেরও সাংস্কৃতিক জীবনকে নবজীবন দিতে হইলে, তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের শাসনকে উন্নতমার্গে লইয়া যাইতে হইলে, অখণ্ড ভারতের চিন্তাধারাকেও ভগীরথের মতো পথ দেখানো প্রয়োজন, আবার বিশেষ বিশেষ প্রদেশকেও নিজ নিজ প্রাণ-উৎসের মুখ বাধাহীন রাখিতে শেখানো প্রয়োজন। এই পরাধীন অধঃপতিত জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে হইলে প্রাদেশিকতা, দলাদলি, একমুখিতা, প্রাচীন পন্থা কিংবা অতি নব্যতা সমস্ত ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে। দেশে বদ্ধ থাকিয়াও হইতে হইবে দেশাতীত, কালে বদ্ধ হইয়াও দৃষ্টি হইবে কালাতীত। বিধাতা যেন তাঁহাকে এমনই জনগুরু, এমনই চিন্তানায়ক হইবার জন্য ডাক দিলেন। তিনি নবীন ভারতের ঐতিহ্য, আহ্বান ও অভাবের কথা শুনাইবার জন্য, তাহার চিন্তাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য 'মডার্ন রিভিয়ু'-এর স্বপ্ন দেখিলেন। ভারতব্যাপী প্রচার ইংরেজি ভাষা ভিন্ন আর কিছুর ভিতর দিয়া হয় না। তা ছাড়া যাঁহারা ভারতের ভাগ্য নিয়ন্তা তাঁহাদেব কর্ণে আমাদের দাবি অভাব ও অভিযোগের বাণী অন্য ভাষায় তো পৌঁছে না। দাবি করিলেই তখনই আমরা কিছু পাইব ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু বিশ্ববাসীকে ভারতবাসীর দাবি জানাইবার দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তিনি ক্রমশই বেশি করিয়া অনুভব করিতেছিলেন এবং ফলের আশা তখনই না করিলেও জগতে সত্য ও ন্যায়ের জয় যে একদিন হইবেই এ কথা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন এবং তাই সেই সত্যের পথে ও ন্যায়ের পথে আলোক জ্বালাইয়া রাখাই যে তাঁহার জীবনেব ব্রত ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতার সহিত তাঁহার পরিচয় ঠিক কবে হইয়াছিল জানা নাই। কিন্তু নিবেদিতা এই প্রয়াগতীর্থের আলোক-শিখাটির রূপ চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাই যখন 'মডার্ন রিভিয়ু' প্রকাশিত হয় নাই তখনই তিনি পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনকে বলিয়াছিলেন, "এই যে ব্যক্তিটি এখন শুধু বাংলা ভাষায় বাংলার সুখ-দুঃখের কথা লইয়াই ব্যস্ত আছেন, এমন একদিন আসিবে যখন তিনি সারা ভারতের বেদনা প্রকাশের ভার লইবেন। বিধাতা তাঁহাকে সেই যোগ্যতা দিয়াছেন এবং বিধাতার এতখানি দান কখনও ব্যর্থ হইবে না। ইঁহার মনীষা ও ইঁহার চরিত্র একদিন প্রশস্ততর সাধনাক্ষেত্র খুঁজিবেই খুঁজিবে।"

তাঁহার ইংরেজি কাগজ প্রকাশিত না হইলেও বাস্তবিক তখন তিনি শুধু বাংলা ভাষায় বাংলার সুখ-দুঃখ লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন না। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের এবং কংগ্রেসের বেদনার বাণীর ভিতর দিয়া ইঁহার মনীষা ও ইঁহার চরিত্র তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো বারে বারে জ্বলিয়া উঠিতেছিল এবং ভগিনী নিবেদিতা ইঁহার এত বড়ো বন্ধু ছিলেন এবং এতটা ভারতহিতৈষিণী ছিলেন যে সে-সকলের সন্ধান কিছু নিশ্চয়ই পাইয়াছিলেন। সম্ভবত এই সকল নানা ক্ষেত্রের কার্যের পরিচয় পাইয়াই নিবেদিতা ওইরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন। তাই

'মডার্ন রিভিয়ু' প্রকাশিত হইবার পরও পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় যখন প্রশ্ন করেন, 'আপনি কী করিয়া এত আগে হইতে এমন একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেন?' তখন নিবেদিতা বলিয়াছিলেন, "গৃহলক্ষ্মী যখন ঘরের প্রদীপটি জ্বালেন তখন ঘরের সেবার মতোই তাহাতে আলোক-শক্তি দেন। এই যে একটি প্রদীপ জ্বলিল দেখিলাম অপরিসীম তাহার শক্তি। বুঝিলাম ঘরের প্রয়োজন নির্বাহ করিয়াই ইহার সার্থকতা শেষ হইবে না। তখনই বুঝিলাম এই প্রদীপখানি একদিন ঘরের বাহিরে আকাশ-প্রদীপ হইবে। আলোকস্তম্ভের মহাদীপের মতো যেই শক্তি, তাহার কাজ কি ঘরের কোণের সামান্য সেবাতেই নিঃশেষিত হয়।"

ন্যায় ও সত্যের আলোকবর্তিকা হাতে লইয়া এই অধঃপতিত জাতির সেবার জন্য আরাম, বিলাস, আনন্দ সমস্ত ত্যাগ করিয়া নূতন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার প্রেরণা তাঁহার আসিল। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের মতো তিনি সেই আলো শত্রু-মিত্রকে পথ দেখাইবার জন্য চিরজীবন জ্বালিয়া গিয়াছেন। এই আলো সমগ্র ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাহিরে সমস্ত পৃথিবীতে ভারত সম্বন্ধে প্রাচীন ও নবীন সত্য ও তথ্য প্রচার করিয়াছে।

১৯০৭-এ তিনি লিখিয়াছিলেন,

"It is not impossible for a nation to be just... we on our part cannot without hypocrisy say that we have full faith in the sense of justice of the British people ; but at the same time we do not say that they may not in future be juster than they have been in the past. Our hope of India's salvation rests chiefly and primarily on what Mr. Naoroji has called the "supremacy of the moral law." And the appeal to a nation's sense of justice and love of righteousness is ultimately based on the moral order of the universe."

কলেজে কাজ করিতে করিতেই একখানি সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং নিজ আদর্শোচিত ইংরাজি পত্রিকা প্রকাশ করিবেন এই ইচ্ছা রামানন্দের ছিল। এই কারণে কলেজে এবং অন্যান্য জায়গায় কিছুদিন পূর্বেই 'মডার্ন রিভিয়ু'র আগমনবার্তা জানাইয়া হ্যান্ডবিল বিলি করা হইয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে কলেজের কার্য পরিত্যাগ করার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। সুতরাং অতঃপর 'প্রবাসী'র উন্নতি ও 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রের আবির্ভাব কার্যে তিনি অনন্যমনা হইয়া লাগিতে পারিলেন।

অধ্যাপনা ত্যাগ

কায়স্থ কলেজের উন্নতির জন্য রামানন্দ আপনার যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করিয়াছিলেন। উন্নতি কীরূপ হইয়াছিল তাহার সাক্ষ্য অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দেব প্রভৃতি অনেকে দিয়াছেন। কলেজের কর্তৃপক্ষ যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা প্রাচীনপন্থী লালা। কলেজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির যে আদর্শ অধ্যক্ষের কল্পনায় ছিল তাহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহার যতখানি আগ্রহ ছিল কর্তৃপক্ষের সেই পরিমাণই ঔদাস্য ছিল বলা যায়। অধ্যক্ষের ধারণা ছিল যে, কায়স্থ কলেজের কর্তৃপক্ষের অধিকাংশই বর্তমান কালের উপযোগী শিক্ষার আদর্শ কী এবং প্রয়োজনীয়তা কী তাহা বুঝিতেন না। সুতরাং তাঁহারা এই সব কারণে অর্থব্যয় করিতে চাহিতেন না। মুন্‌শি কালীপ্রসাদ কুলভাস্কর স্বজাতির উন্নতির জন্য তাঁহার স্বোপার্জিত বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু আটঘাট তেমন বাঁধিয়া যাইতে পারেন

নাই। কাজেই তাঁহার ট্রাস্টিরা দানের মর্যাদা যে সর্বত্র দাতার ইচ্ছামতো রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। তাঁহাদের এই ব্যয়কুণ্ঠতাতে অধ্যক্ষের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইত। ফলে উভয় পক্ষে সংঘর্ষ বাধিয়া যাইত। শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক ও উপযুক্ত সরঞ্জাম অল্প পয়সায় হয় না ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। ভালো ঘর, অল্পসংখ্যক ছাত্র, উৎকৃষ্ট পুস্তকালয়, গবেষণাগৃহ, যন্ত্রপাতি, মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগৃহ, ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রা, ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান ও ব্যক্তিদের ছবি দেখানো, গ্রহাদির গতিদর্শক যন্ত্র, ভারতীয় কৌতুকাগার, ব্যায়াম ও ক্রীড়াক্ষেত্র ইত্যাদি বহু জিনিস সম্বন্ধে তাঁহার যে আগ্রহ ছিল তাহা বুঝিবার মতো কল্পনাশক্তি তখনকার দিনে সে অঞ্চলে কম লোকেরই ছিল। অধ্যক্ষের সহিত কর্তৃপক্ষের যখন অর্থব্যয় ব্যাপারে গুরুতর মতভেদ হইত তখন তিনি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন। নেপালবাবু বলিয়াছেন, মালবীজির মধ্যবর্তিতায় উভয় পক্ষের মনোমালিন্য কয়েকবার ঘুচিয়া যায়, কারণ এই আদর্শবাদী পুরুষকে নানা কারণেই তিনি এলাহাবাদে ধরিয়া রাখিতে চাহিতেন। "কিন্তু কলেজ পরিচালনা সম্পর্কে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে যে বিরোধ উপস্থিত হয় তাহার মীমাংসার প্রচেষ্টা মালবীজির ধৈর্য এবং বুদ্ধি-কৌশলকেও পরাস্ত করিল। রামানন্দবাবু এবার কিছুতেই তাঁহাব পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিলেন না।" এগারো বৎসরের বন্ধন এই বিরোধে একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল। প্রিয় কর্মভূমির প্রতি মমতা কিংবা সংসারের ভবিষ্যৎ কোনো চিন্তাই তাঁহাকে বাঁধিতে পারিল না।

তিনি সঞ্চয়ী ছিলেন না। বৈতনিকভাবে প্রায় ষোলো বৎসর অধ্যাপনা করিয়া এবং অন্যান্য কার্য করিয়া তাঁহার ঘরে যে কোনো অর্থ আসে নাই তাহা নহে। কিন্তু সংসার পালন, আত্মীয় পোষণ, অতিথি-সৎকার ও পুত্রকন্যাদের শিক্ষার পর, তাঁহার যা-কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকিত তাহা ব্যয় হইত পত্রিকার উন্নতি- চেষ্টায়। ইহাতে বরং কিছু ঋণ জমিত, অর্থ জমিত না। এই ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দেই 'প্রবাসী'তে তিনি লিখিতেছেন,

> "গ্রাহক ও পাঠকগণকে একটি কথা স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি। কাগজ ভালো কবিযা চালান অর্থ-সাপেক্ষ, এখনও প্রবাসী ঋণমুক্ত হয় নাই, সম্পাদকের কিছু পাওয়া তো দূরের কথা।"

দেশের বাড়ির জন্য তিনি যে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন তাঁহারা ভাইরা একান্নবর্তী ছিলেন বলিয়া তাহার উপর তাঁহার একলার কোনো বিশেষ দাবি ছিল না। সুতরাং পাঁচটি পুত্রকন্যা ও সহধর্মিণীর সহিত তিনি অন্ধকার ভবিষ্যৎকেই বরণ করিয়া লইলেন বলা যায়। সত্য কথা বলিতে তাঁহার প্রজ্ঞাচক্ষুর নিকট ভবিষ্যৎ অন্ধকার ছিল না। তিনি বাল্যকাল হইতে বার বার সর্বক্ষেত্রে আপনার ভবিষ্যৎ আপনি গড়িয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার বিশ্বাস ছিল এবারও তিনি আপনার ভবিষ্যৎ গড়িয়া লইবেন। হার-মানা তাঁহার ধর্ম ছিল না। এইজন্য জীবনে অন্যকেও কখনও হার মানিতে পরামর্শ দিতেন না।

তাঁহার স্থাবর অস্থাবর কোনো সম্পত্তি কিংবা সঞ্চিত বিশেষ অর্থ ছিল না। সামান্য আয় ছিল সচিত্র বর্ণপরিচয় প্রভৃতি হইতে। তাহা এতই সামান্য যে বছরে দুই-একমাস বড়ো জোর তাহাতে চলে। কিন্তু তবু তিনি স্থির করিলেন স্বাধীনতা বর্জন করিয়া পরের চাকরি আর করিবেন না ; যে নূতন কার্যের সূচনা করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন তাহাই জীবনের ব্রত ও জীবিকারূপে গ্রহণ করিবেন ; 'মডার্ন রিভিয়ু' প্রকাশ করার সংকল্প ত্যাগ করিবেন না। দেশের এই চরম দুর্দিনে যখন লর্ড কার্জনের নীতি বাংলার সর্বনাশ করিতেছে, অন্য প্রদেশের প্রতিও সরকারি দৃষ্টি পড়িয়াছে তখন দেশকে সত্যের আহ্বান না শুনাইলে চলিবে না।

তাঁহার কর্মত্যাগে কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্ররা সকলেই দুঃখ পাইলেন। পণ্ডিত বালকৃষ্ণ তো চটিয়াই আগুন। কায়স্থ পাঠশালা কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই ছিলেন হিন্দুস্থানি। তবু তাঁহারা এই স্বল্পভাষী নিরাড়ম্বর বাঙালি অধ্যাপককে বিদায় দিতে হইবে জানিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। বিদায়-দিনের অপরাহ্ণে তাঁহাদের কলেজে বিদায়-উৎসব হয়। তাহার পর নূতন ও পুরাতন সমস্ত ছাত্ররা সভা ভাঙিয়া অধ্যাপককে গাড়িতে বসাইয়া সেই গাড়ি নিজেরা টানিতে টানিতে তাঁহার বাড়িতে আনিয়া উপস্থিত হইলেন। বাড়ির সম্মুখের রাস্তা, পথপার্শ্বস্থ বারান্দা ছাত্রের ভিড়ে ঠাসাঠাসি। শেষ প্রণাম জানাইতে এক-এক জন করিয়া ছাত্র তাঁহার পায়ে মাথা পাতিয়া দুই হাতে হাঁটু জড়াইয়া ধরে আর উঠিতে চায় না। সে-দৃশ্য যাহারা দেখিয়াছে তাহারা অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই। এমনি করিয়া কত রাত্রি হইয়া গেল, কিন্তু বিদায়-পর্ব যেন শেষ হইতে চায় না।

চাকরি তিনি কেবল নিজের ভরসায় ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার গুণগ্রাহী ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা নানা কাজে তাঁহাকে পাইবার জন্য এবং তাঁহার মঙ্গলের জন্যও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অনেকেই নিজেদের লাভ এবং তাঁহারও উপকার হইবে ভাবিয়া তাঁহাকে কাজ দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি গ্রহণ করিলেন না। এলাহাবাদ ইন্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বীয় চেষ্টায় প্রায় নিঃসম্বল অবস্থা হইতে এলাহাবাদে একটি বিরাট ব্যবসায় ফাঁদিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় হিন্দি ও বাংলা বহু মূল্যবান পুস্তক প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। এ সকল কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

নেপালবাবু বলিয়াছেন, "রামানন্দবাবু যখন এলাবাবাদের কর্ম পরিত্যাগ করিলেন তখন চিন্তামণি ঘোষ তাঁহাকে ইন্ডিয়ান প্রেসের কর্মাধ্যক্ষরূপে পাইবার জন্য একান্ত আগ্রহশীল ছিলেন। রামানন্দবাবুর কর্মকুশলতার উপর চিন্তামণিবাবুর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন ১০০০ মাসিক পারিশ্রমিক ভিন্ন এলাহাবাদে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ২৫ কমিশন তিনি প্রাপ্ত হইবেন। চিন্তামণিবাবু আমার দ্বারাই তাঁহার প্রস্তাব রামানন্দবাবুর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। সহসা এত অধিক বেতনে কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার আলোচনা হইয়াছিল। তাহার উত্তরে চিন্তামণিবাবু বলিয়াছিলেন, 'মহাশয়, আমরা ব্যবসায়ী লোক, টাকা কী করিয়া উপার্জন করিতে হয় জানি। আমি যে টাকা দিতে চাহিতেছি তাহার চতুর্গুণ উঁহার দ্বারা আদায় করিয়া লইব।' তখনই যে সমুদয় পুস্তক প্রচলিত ছিল ন্যূনকল্পে তাহার বার্ষিক আয় ছিল ৪০,০০০। চিন্তামণিবাবুর ভরসা ছিল রামানন্দবাবুকে পাইলে তিনি উহা লক্ষ টাকায় পরিণত কবিতে পারিবেন।"

চিন্তামণিবাবু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলিয়াছিলেন, "বামানন্দবাবু একটি জীবন্ত এন্‌সাইক্লোপিডিয়া আর mine of informations !" কিন্তু স্বাধীনচিত্ত তেজস্বী পুরুষ অর্থের লোভে স্বাধীনতা বলি দিতে রাজি হইলেন না। তাঁহার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার উপযুক্ত অর্থ তিনি ভগবানেব আশীর্বাদে স্বীয় স্বাধীন চেষ্টায় সংগ্রহ করিতে পারিবেন এবং মন-প্রাণ দিয়া দেশের সেবা করিয়া ধন্য হইবেন এই বিশ্বাস ও ইচ্ছা তাঁহার ছিল।

চিন্তামণিবাবু মাসে মাসে টাকার দাবি না করিয়া 'মডার্ন রিভিয়ু' ছাপিয়া দিতে রাজি হইলেন। বলিলেন, "আমি ব্যাবসাদার লোক, আমি আর আপনার কী সাহায্য করিতে পারি? আমি আপনার কাগজের যখন যাহা প্রয়োজন ছাপিয়া দিব। আপনার যখন হাতে টাকা আসিবে আমার ঋণ শোধ করিবেন। আমি আগে চাহিব না।"

নাগপুর কলেজ হইতে এবং কলিকাতার রিপন কলেজ হইতে অধ্যক্ষ হইবার জন্য অনুরোধ আসিল। কিন্তু তিনি সে-সকল চাকরি গ্রহণ করিলেন না। স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রামানন্দের সহাধ্যায়ী ছিলেন। এইজন্য আশুতোষবাবু তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। চাকরি ছাড়ার খবর পাইয়াই তিনি তাঁহাকে I. A. পরীক্ষায় ইংরাজির পরীক্ষক নিয়োগ করিয়া পত্র লিখিলেন। কিন্তু রামানন্দ তখন 'মডার্ন রিভিয়ু' প্রকাশের কল্পনায় ব্যস্ত, এ প্রস্তাবেও রাজি হইলেন না। সিটি কলেজের তিনি ছাত্র ছিলেন এবং সেখানে কিছুদিন অধ্যাপকের কাজও করিয়াছিলেন। তাই একবার ইচ্ছা হইয়াছিল সিটি কলেজে অধ্যক্ষ হইয়া যান। কথাও অনেকটা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার বিশেষ কোনো গুরু ওই পদটির প্রার্থী হওয়াতে সিটি কলেজে যাইবার ইচ্ছা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয়। এই সময়ই লাহোর হইতে লালা লজপৎ রায় তাঁহাকে সম্ভবত দয়াল সিং কলেজের অধ্যক্ষ হইবার জন্য আহ্বান করেন। লালা লজপৎ রায়েব প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু এ প্রস্তাবেও তিনি রাজি হইতে পারিলেন না। একটি দেশীয় করদ রাজ্যে আরাম ও আয়েসের মধ্যে কোনো যুবরাজকে গড়িয়া তুলিবার ভার এবং সেখানকার একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভার তাঁহাকে দিবার প্রস্তাব হয়। সেখানে বসিয়া 'প্রবাসী' পত্রিকা চালনার অধিকারও তাঁহার থাকিত, কিন্তু 'প্রবাসী'কে রাজনৈতিক গন্ধ-বর্জিত করিলে তবেই এ অধিকার ছিল এবং তাহার ব্যয়ভারও হয়তো তাহা হইলে তাঁহাকে স্বয়ং বহন করিতে হইত না। এই সুখৈশ্বর্যের আবেষ্টনে আপনার ব্রত ভুলিয়া থাকিবার উপায় যে তিনি খুঁজিতেছিলেন না, তাহা বলাই বাহুল্য।

আশ্চর্য যে এই স্বদেশীয় পীড়ন-নির্যাতনের দিনে পাঁচটি ছোটো ছোটো সন্তান লইয়া কলেজের কাজ ছাড়িয়া দিয়া আবার একটা নূতন কাগজ বাহির করিয়া আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যখন তিনি পূর্ণ সমরে নামিলেন তখন মনোবমা দেবী তাঁহাকে বারণ করেন নাই। কোনো চাকরি না লইয়া সকলের অন্ন স্বামী জুটাইতে পারিবেন কি না এ প্রশ্ন তিনি স্বামীকে করেন নাই। ধরপাকড়ের দিনে আজ নির্বাসন, কাল প্রেস বন্ধ যখন চলিতে পারে তখন এই ব্রতের বিপদেব কথাও তিনি স্বামীকে স্মরণ করাইয়া দেন নাই। ভগবানের উপর তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং স্বামীকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। এ কথাও তিনি স্থির জানিতেন যে, তাঁহার স্বামীর এতটা যোগ্যতা আছে যে কাহারও অধীনতা স্বীকার না করিলেও তিনি পরিবার প্রতিপালন করিতে পারিবেন। তদুপরি সত্যবাদিতা, আদর্শানুসারিত্ব, ন্যায়পরায়ণতা ও স্বাধীনচিত্ততা রক্ষা করিবার জন্য স্বামী যে-কোনো অসুবিধা বা বিপদে পড়ুন-না-কেন, মনোরমা দেবী তাহার সম্মুখীন হইতেও সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। রামানন্দ তাঁহার কন্যাদের বলিয়াছিলেন, "তোমাদের মায়ের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও স্বাবলম্বন ছাড়া এই কাগজ দুইটির কোনোটিই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতে পারিত না।"

সেই বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে মনোরমা দেবী তাঁহার এক অতি নিকট-আত্মীয়াকে লিখিয়াছিলেন—

> "এখানে এ মাসে বর্ণপরিচয়ের টাকাতে চলিল। আগামী মাসে কি হইবে তাহা ভগবান জানেন। কাল কলিকাতা রিপন কলেজ হইতে দুইখানি তার আসিয়াছিল, তাঁহাকে প্রফেসার করিয়া লইবার জন্য। কিন্তু...সেইজন্য গেলেন না।
>
> ..যাহাই হউক দেড়শত টাকার এক পয়সা কমেও সংসার চলে না। তুমি আমার জন্য বিন্দুমাত্রও চিন্তা করিও না। আমি পরমেশ্বরের দয়াতে নির্ভর করিয়া আছি, কোনো চিন্তা

কবিতেছি না। যিনি জন্মাইবাব আগে আমার জন্য মাযেব স্তনে দুগ্ধ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনিই আমাব চিন্তা করুন। আমি শুধু যেন আমার কর্তব্য করিতে পারি, এই আমাব ভিক্ষা। তোমাকে...টাকা দিই বলিয়া তুমি কিছু সঙ্কোচ করিও না। যদি আমার ছেলেরা পড়িতে পায তো. .ও পাইবে। সে কি আমাব পর? তাহাতে তাহার বাপ নাই।...এই পৃথিবীতে সবই অনিত্য, কেবল ধর্মই একমাত্র নিত্য। ধন মান শরীব এক মুহূর্তে নষ্ট হইয়া যায।... ইতি মনোরমা।

আর-এক পত্রে লিখিতেছেন :

"আমি রাঁধুনী ব্রাহ্মণ আজ আড়াই মাস হইল ছাড়াইয়া দিয়াছি। একটা কিছু ঠিক না হইলে কেমন কবিয়া বাহুল্য ব্যয কবিব? এখন শুধু একজন চাকর আছে। আমাদেব এ বছর আব বোধ হয বাড়ি যাওযা হইবে না। অত রেলভাড়া, তাছাড়া আর একটি কাগজ বাহিব হইতেছে। তাব জন্য শীঘ্র কোথাও নড়িতে পারা যাইবে না।"

যতদিন না নির্দিষ্ট কিছু একটা আয় হয় মনোরমা দেবী স্থির করিয়াছিলেন মাসে দেড়শত টাকায় সংসার চালাইবেন। বাড়িভাড়ার টাকা 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু' কার্যালয় হইতে দেওয়া হইত। কিন্তু অন্যান্য খরচ এত কম টাকায় হওয়া শক্ত ছিল, কারণ পুত্রকন্যাদের শিক্ষার জন্য মাসে ৬০।৬৫ গৃহশিক্ষকদেরই দিতে হইত। অন্য সকল দিকে ব্যয় কমাইবার চেষ্টা করিলেও শিক্ষার ব্যয় কমাইতে চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই।

দেড়শত টাকায় সংসার চালাইবার চেষ্টা করিলেও অল্পদিনেই দেখা গেল দুই শত কখনো বা আড়াই শতের কমে সংসার চলে না। ছোটো ছেলেটি প্রায় চিররুগ্ন, তাহার চিকিৎসা, পথ্য, পরিচারিকা কিছুই বেশিদিন বাদ দেওয়া যায় না। তার উপর এই অর্থ সংকটের সময়ও আতিথ্যের চিরাচরিত প্রথা তাঁহারা ত্যাগ করেন নাই। অন্যান্য অতিথির মধ্যে এই সময় আসিয়াছিলেন প্রবাসীর লেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায। তখন গৃহকর্তা সবে মাস দুই চাকরি ছাড়িয়াছেন। লেখার সূত্রে চারুচন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। চারুবাবুর গল্প রচনা সংশোধন করিবার সময় রামানন্দ কখনো কখনো দুই-এক লাইন স্বয়ং লিখিয়া দিতেন। চারুবাবুর কাছে শুনিয়াছি সেই লাইনগুলি তাঁহাব বন্ধুরা গল্পের শ্রেষ্ঠ লাইন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, চারুবাবুর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ বাংলা ১৩০৯ সালে মজুমদার লাইব্রেরিতে হইয়াছিল। চারুবাবু বলিয়াছিলেন, "এমন শুভ্রমূর্তি আমি কখনো দেখি নাই। বস্ত্র শুভ্র, বর্ণ শুভ্র, কেশও শুভ্রপ্রায়, সর্বাঙ্গে শুভ্রতার দ্যুতি।" তার পব মধ্যে আর দেখা হয় নাই। চারুবাবু পূর্বের কথা লিখিয়াছিলেন, "রামানন্দবাবু যখন 'দাসী' পত্রিকার সম্পাদক তখন আমি বি. এ. পড়ি। আমার এক সহপাঠী বন্ধুর মুখে তাঁহার বিনীত স্বভাবের খুব প্রশংসা শুনিয়াছিলাম। আমাদের বৈষ্ণব প্রভাবের দেশে বিনয়ের মাহাত্ম্য খুবই বিঘোষিত হইয়া থাকে ; তাই অতি বিনয়ী বলিয়া যাঁহার পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাঁহাকে না দেখিয়াও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা সম্ভ্রম মনের মধ্যে পোষণ করিতে লাগিলাম।"

ইংরাজি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষ মহাশয়ের প্রেসের প্রুফ-রিডার ও তাঁহার ছেলেদের গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন হয়। চিন্তামণিবাবু তাঁহার বন্ধু প্রবাসী-সম্পাদককে লোক নির্বাচনের ভার দেন। স্টেটসম্যানে নিজের নামে বিজ্ঞাপন দিয়া রামানন্দ যে-সব জবাব পান তাহার ভিতর হইতে চারুবাবুকে গৃহশিক্ষকরূপে নির্বাচন করেন। কিন্তু প্রধান প্রুফ-রিডারের কাজের কথা পরে পত্রে শুনিয়া চারুবাবু সেই কাজটি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এই সময় কলিকাতায় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেস

হয় ; রামানন্দ তখন কংগ্রেসের একজন উৎসাহী সভ্য ও কর্মী। তিনি ১৯০৭-এর জানুয়ারির কাগজ কয়েকদিন পূর্বেই ছাপাইয়া কতকগুলি নূতন 'মডার্ন রিভিয়ু' সঙ্গে করিয়াই কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কংগ্রেসের স্টলে তাহা বিক্রয় হইয়াছিল।

কংগ্রেসে তাঁহাকে দেখিয়া চারুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "অপরিচিত এলাহাবাদে যাইয়া কোথায় কাহার আশ্রয়ে থাকিব, কোথায় বাসা পাইব?" চারুবাবুর সহিত সেই সবে তাঁহার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ। তিনি বলিলেন, "এখন আমার বাড়িতে গিয়া থাকিবেন, পরে বাসা খুঁজিয়া লইবেন।" চারুবাবু বলিলেন, "আপনি তো এখানে রহিলেন, আমাকে তো আর কেউ চেনেন না।" তিনি বলিলেন, "আপনার কোনো অসুবিধা হইবে না।" পরে চারুবাবু লিখিয়াছিলেন,—

> "বামানন্দবাবু স্বল্পভাষী ; তিনি বেশি কিছু বলিলেন না, আমিও বেশি কিছু জিজ্ঞাসা কবিতে সংকোচ বোধ করিলাম। এলাহাবাদে গিযা পথ হইতেই তাঁহাব অতিথি বলিযাই যে সমাদব লাভ করিলাম, প্রবাসীর লেখক বলিয়া পবিচয দেওয়াতে তাহা আব বর্ধিত হইবার অবকাশই পাইল না। একদিনেই তাঁহার পরিবারেব সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া গেল।"

চারুবাবু দুই-এক মাস এই বাড়িতে অতিথিরূপে থাকিবার পর 'প্রবাসী'তে পুস্তক সমালোচনার জন্য কিছু পারিশ্রমিক পাইতে থাকেন। তিনি বাসাখরচ হিসাবে এই টাকা গৃহকর্তাকে ফেরত দিতে চাওয়ায় গৃহকর্তা কীরূপ বিরক্ত হইয়াছিলেন চারুবাবু পরে তাহা লিখিয়াছিলেন—

> "এলাহাবাদেব এক ভদ্রলোকেব পবামর্শে আমি মূর্খের মতন বামানন্দবাবুকে বলিলাম, আমি যতদিন অন্যত্র বাসা না পাইতেছি ততদিন আমি পারিশ্রমিক লইব না। এই কথায় তাঁহাব মুখে যে বিরক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা এখনো আমাব চোখেব সম্মুখে ভাসিতেছে, কিন্তু তাহা অবর্ণনীয় : তিনি ব্যস্ত হইযা বলিলেন, না আমি পয়সা লইয়া আপনাকে আশ্রয় দিতে পাবিব না। এই কথায় আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম ; তাঁহার আতিথ্যের আমি যেরূপ অপমান করিয়াছিলাম ইহা আমার উচিত দণ্ড মনে করিলাম।"

কিন্তু ইহার ফলে পাছে চারুবাবু অন্যত্র চলিয়া যান এবং কোনো প্রকার অসুবিধায় পড়েন তাই পরদিন রামানন্দ বলিলেন, "কাল আমি যাহা বলিয়াছি তাহার জন্য আপনি কিছু মনে করিবেন না। আমি বড়ো sensitive, একটুতেই বিচলিত হই, যতদিন আপনি অন্যত্র বাসস্থান না পাইবেন ততদিন আমার বাড়িতে আপনি স্বচ্ছন্দে অসংকোচে থাকুন।" চারুবাবুর ভুলের জন্য তিনিই যেন চারুবাবুর নিকট ক্ষমা চাহিলেন। চারুবাবু বলিয়াছেন, "এক দিনের পরিচিত ও 'প্রবাসী'র একজন সামান্য লেখকের প্রতি তাঁহার এই ঢালাও অনুরোধ।"

চারুবাবু অতিথিরূপে থাকিতে আপত্তি করিলেন না। এই সময়ের আতিথ্য ও ব্যয়সংকোচের কথা চারুবাবু লিখিয়াছেন—

> "রামানন্দবাবু চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছেন। মডার্ন রিভিয়ু...সবে আবম্ভ করিয়াছেন। গৃহিণীর মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে সতর্কতা আমার চোখে পড়িতে বিলম্ব হইল না। ছেলেদেব মাথার চুল কাটা হইয়াছে, কিন্তু খুব সমানভাবে হয় নাই, দেখিয়াই বুঝিলাম ইহা নাপিতের হাতের অভ্যস্ত কর্মের নিপুণতার সাক্ষ্য দিতেছে না। মেয়েদের কাপড়চোপড় মোটা মার্কিন কাটিয়া ও ব্লাউজ দোলার বোনা ছোটো শাড়ি কাটিয়া তৈরি হইয়াছে। তাহাতেও দরজিব দক্ষ হাতের সাক্ষ্য নাই। অভ্যাগত অতিথিকে যে জলখাবার ও আহার্য দেওয়া হইল তাহাও খুব অনাড়ম্বর, অপরিচিতের কাছে মিথ্যা মর্যাদা দেখাইবার জন্য গৃহস্থালীর ব্যবস্থাব

একটুও ব্যতিক্রম করা হয় নাই।

এক দিকে ব্যয়সংকোচের জন্য মিতব্যয়িতা, অপরদিকে ভারতের চিরন্তন দাক্ষিণ্য অতিথি সৎকার, এই পরিবারে সমন্বিত হইয়াছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম।"

চারুবাবু থাকিতে থাকিতেই এই গৃহে অন্যান্য অতিথিও যখন-তখন আসিতেন। অনেক সময় চারুবাবুকে দুই-তিন জনের সহিত এক ঘরে থাকিতে হইত। গৃহকর্তার পুত্রকন্যা ছাড়া অন্য কোনো কোনো আত্মীয় স্থায়ী ভাবে বাড়িতে থাকিতেন। আবার কেহ কেহ বা প্রয়োজন মতো আসিয়া চলিয়া যাইতেন।

এই রকম ভাবে দিন চলিতে লাগিল। রামানন্দ স্বাধীনতা ত্যাগ করিয়া আর কাহারও বেতনভোগী হইবেন না স্থির করিলেন। 'মডার্ন রিভিয়ু' প্রকাশ করার কল্পনা ছাড়া তো হইলই না, বরং আরও জাঁকালো করিয়া প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সম্পাদক তাঁহার সমস্ত শক্তি এই কাগজটিতেই ঢালিয়া দিলেন।

তখন 'প্রবাসী' তিন-চার বৎসরে বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহারও আরো উন্নতির আয়োজন শুরু হইল। এই সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের সহিত 'প্রবাসী'র সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইতে আরম্ভ করে। ১৩০৮ সালের বৈশাখে যখন 'প্রবাসী' প্রথম বাহির হয়, নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'ও সেই সময় রবীন্দ্রনাথকে সারথি করিয়া বাংলা দেশে দেখা দিল। এই সময়টা রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'তে বেশি লেখেন নাই, তখন 'প্রবাসী'র বেশির ভাগ লেখক ছিলেন প্রবাসী বাঙালি।

রবীন্দ্রনাথের সহিত সম্পর্ক

এলাহাবাদে চলিয়া আসার অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথের সহিত রামানন্দের পরিচয় ছিল তাহা পূর্বে বলিয়াছি। এলাহাবাদে রবীন্দ্রনাথের আগমনের কথা বলিবার আগে আরও কিছু কথা বলা দরকার ছিল। রামানন্দ যখন কলিকাতায় কলেজে পড়িতে আসেন তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ২২ বৎসর। তখন তিনি 'প্রভাত-সংগীত' এবং 'ছবি ও গান' রচনা করিয়াছেন। 'কালমৃগয়া'ও রচিত হইয়াছে। তার পূর্বেই ভারতীতে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' প্রকাশিত হইয়াছে। 'রুদ্রচণ্ড' 'ভগ্নহৃদয়' তো বহুপূর্বেই লিখিত ও প্রকাশিত। তার পরের বৎসর ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার' ও 'নবজীবনে' তৎকর্তৃক গৃহীত হিন্দু ধর্ম সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ লিখিতেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজ হলে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহা পরে ভারতীতে প্রকাশিত হয়। রামানন্দ তাঁহার কন্যাকে এক সময় লিখিয়াছিলেন "রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে কখন প্রথম দেখা হয় মনে নাই। আমরা যখন কলেজে পড়ি, তখনই তিনি বিখ্যাত। বোধ হয় তাঁহারই কোনো বক্তৃতা পাঠের সময়ে বা প্রকাশ্যে সভায় তাঁহার গানের সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া থাকিব। Scottish Churches College-এর হলে, Science Association-এর হলে, Emerald Theatre-এ এবং মিনার্ভা থিয়েটারে তাঁহার বক্তৃতা পাঠের কথা অস্পষ্ট মনে হয়। কিন্তু কোথায় তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছি মনে নাই। কবে থেকে তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব হয় তাহাও মনে নাই।"

বাংলা ১২৯৪ সালে (খ্রিঃ ১৮৮৭) সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে

রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু বিবাহ' নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহা চন্দ্রনাথবাবুর প্রাচীনপন্থী বিবাহের সমর্থক প্রবন্ধের সমালোচনা। বিপিনচন্দ্র পাল বোধ হয় রবীন্দ্রনাথকে এই প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার সেই সভায় সভাপতি হন। তখন রামানন্দ বি-এ পড়েন। তিনি আরও যে তিন-চারিটি সভার কথা বলিয়াছেন সেগুলির তারিখ বলা শক্ত।

১৩০৭ হইতে ১৩১০-এর মধ্যে 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' এবং 'বঙ্গদর্শনে' 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' চলিতেছে। তাহার উপর বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধাদি ও সাময়িক প্রসঙ্গ তো ছিলই। ১৩১২তে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকতায় 'ভাণ্ডার' বাহির হইল। ১৩১৩ হইতে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শনের'র সম্পাদকত্ব ত্যাগ করেন, তবে তখনও তাঁহার লেখা সমানেই 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইত। এই যুগে ১৩০৮-এর শেষের দিকে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বোপার্জিত অর্থেই আশ্রমের ব্যয় নির্বাহ করিতেন। তখন আশ্রমের আদর্শের কথা লোকসমাজে তেমন প্রচারিতও হয় নাই এবং আশ্রমকে আর্থিক সাহায্য করিবার মতো হিতৈষীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কেহ ছিলেন না। রবীন্দ্র-জীবনীতে আছে--

"এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে ও মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে থাকিতেন। ইতিপূর্বে রথীন্দ্রনাথ ও সন্তোষচন্দ্রকে কৃষিবিদ্যা অর্জনের জন্য আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন। পরে পাঠাইলেন জামাতাকে। ১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ মাসে কন্যার বিবাহের জন্য বোধহয় ব্যস্ত ছিলেন, বিশেষ লেখা চোখে পড়ে না। ভীষণ আর্থিক টানাটানির মধ্যে তখন তাঁহার দিন কাটিতেছিল।" ('রবীন্দ্র-জীবনী', ৪৫৭ পৃ.)

রামানন্দের চিরদিনই ইচ্ছা ছিল তাঁহার পত্রিকাকে রবীন্দ্রনাথের লেখায় অলংকৃত করেন এবং 'প্রবাসী'র সাহায্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিস্তৃততর প্রচারে সহায়তা করেন, কারণ তখন উচ্চশিক্ষিত সমাজে বাংলা কোনো মাসিকপত্রের 'প্রবাসী'র মতো বহুল প্রচার ছিল না। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও বন্ধুত্বের দাবি ও আব্দারের জোরে রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা আদায় করিতে তিনি কখনো চেষ্টা করেন নাই। এই সময় রবীন্দ্রনাথ (১৩১৪) বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতার দায় হইতে মুক্ত। তাই এই সময়ই রামানন্দ 'প্রবাসী'তে গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশ করা শুরু করিলেন। তখন তিনি সবে এক বৎসর চাকুরিতে ইস্তফা দিয়াছেন এবং উপরন্তু নূতন একটি কাগজের গুরুভার ও দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আশ্চর্য এই যে এমন অভাবের সময়েই তিনি 'প্রবাসী'র সাধারণ হারের অনেক বেশি অর্থ দিয়া রবীন্দ্রনাথের লেখা গ্রহণ করিতে থাকেন। তিনি শুধু যে রবীন্দ্রনাথের অনুরক্ত ছিলেন এবং তাঁহাকে ভক্তি করিতেন তাহা নয়, রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শের প্রতিও তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি জানিতেন যে এত বড়ো একটা বিদ্যালয়ের ভার কবি সম্পূর্ণ নিজের স্কন্ধেই লইয়াছেন। বন্ধুত্বের খাতিরে রবীন্দ্রনাথের অর্থাগমের সাধ্যমতো চেষ্টাই তাই তিনি করিতেন, নিজ অর্থসংকটের দিনেও এই ধারা তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন।

বাংলা ১৩১৪ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণের প্রবাসীতে 'মাস্টার মহাশয়' গল্পটি প্রকাশিত হয়, সেই শ্রাবণেই বাহির হইল 'ব্যাধি ও প্রতিকার' প্রবন্ধ। তখনও 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি'র স্মৃতি পুরাতন হইয়া যায় নাই। সেইজন্য 'প্রবাসী'-সম্পাদকের অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল যে রবীন্দ্রনাথ আবার একটি বড়ো রকম উপন্যাস লেখেন। তিনি আপনার শূন্যপ্রায় ঝুলি হইতেই অগ্রিম তিন শত টাকা রবীন্দ্রনাথকে পাঠাইয়া দিলেন। অনুরোধ যে রবীন্দ্রনাথ

একটি উপন্যাস লেখেন। তবে তিনি সর্বক্ষেত্রেই স্বাধীনতার পূজারি ছিলেন। সুতরাং অনুরোধের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কথাও বলিয়াছিলেন যাহাতে ইচ্ছা করিলে কবি কিছু না লিখিতেও পারিতেন। এই চিঠির বিষয় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিয়াছেন, "সাধনার যুগের পর আমি প্রথম উপন্যাস লিখি চোখের বালি। বইখানি যত্ন করে লিখেছিলুম এবং ভালই হয়েছে বলে আজও আমার বিশ্বাস। নৌকাডুবির মধ্যে অনেক গলদ রয়ে গেছে। এরই কিছুকাল পরে একদিন রামানন্দবাবু আমাকে কোনো অনিশ্চিত গল্পের আগাম মূল্যের স্বরূপ পাঠালেন তিনশ টাকা। বললেন, যখন পারবেন লিখবেন, নাও যদি পারেন আমি কোনো দাবি করব না। এত বড়ো প্রস্তাব নিষ্ক্রিয়ভাবে হজম করা চলে না। লিখতে বসলুম গোরা, আড়াই বছর ধরে মাসে মাসে নিয়মিত লিখেছি, কোনো কারণে একবারো ফাঁকি দিই নি। যেমন লিখতুম তেমনি পাঠাতুম।" ইহার অনেক পরে ১৩২৪ সালে 'সবুজ পত্রে'র যুগে যখন রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'তে প্রায় কিছুই লিখিতেন না সেই সময় প্রবাসী-সম্পাদক শোনেন যে তিনি নাকি নানা কৌশলে রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে লেখা আদায় করার চেষ্টা করেন এরূপ কথা তাঁহার নামে কেহ কেহ রটাইতেছেন। রামানন্দ অত্যন্ত sensitive মানুষ ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ এ কথা রবীন্দ্রনাথকে লেখেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

> .আপনি আমার কাছ থেকে প্রবাসীর প্রবন্ধ আদায় করার জন্যে নানা কৌশলে চেষ্টা করে থাকেন এ রকম জনশ্রুতি আমার কানে পৌঁছয় নি। কিন্তু যদি করতেন তাতে আমার দুঃখিত হবার কারণ থাকত না। আমি যদি প্রবাসীর সম্পাদক হতুম তাহলে রবীন্দ্রনাথকে সহজে ছাড়তুম না— ভয় মৈত্রী প্রলোভন প্রভৃতি নানা উপায়ে লেখা বেশি না পাই তো অল্প, অল্প না পাই তো স্বল্প আদায় করে নিতুম। বিশেষত রবীন্দ্রনাথেব দোষ হচ্চে এই যে, খেজুর গাছের মত উনি বিনা খোঁচায় রস দেন না। আপনি যদি আমাকে সময়মত ঘুষ না দিতেন তাহলে কোনো মতেই 'গোরা' লেখা হত না। নিতান্ত অতিষ্ঠ না হলে আমি অধিকাংশ বড়ো বা ছোটো গল্প লিখতুম না।... [১১ কার্তিক ১৩২৪]

'গোরা' আড়াই বৎসর চলিয়াছিল, অর্থাৎ ১৩১৪ ভাদ্র হইতে ১৩১৬ সালের ফাল্গুন পর্যন্ত। 'গোরা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ১৩১৫তে 'নবযুগের উৎসব' 'পূর্ব ও পশ্চিম' 'সদুপায়' 'সমস্যা' প্রভৃতি কবির কয়েকটি প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। স্বদেশীব যুগের এই সকল প্রবন্ধ ইতিহাসের উপাদান হইয়া আছে।

সেকালের উপন্যাস লেখকেরা অনেকে ক্রমশ-প্রকাশ্য উপন্যাস লিখিতে লিখিতে মাঝে মাঝে থামিয়া যাইতেন। এই-জাতীয় কারণে 'কুমারী' প্রভৃতি কোনো কোনো উপন্যাস 'প্রবাসী'তে শেষ পর্যন্ত বাহির হইতে পারে নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এ ক্ষেত্রেও অসাধারণ ছিলেন। প্রতি মাসে এলাহাবাদে ঠিক সময়ে 'গোরা'র কপি পৌঁছাইত, এমন কী রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরও ঠিক সময়েই 'গোরা'র কপি পৌঁছিয়াছিল।

মডার্ন রিভিয়ুর যুগ

'মডার্ন রিভিয়ু' প্রকাশের কথায় ফিরিয়া যাওয়া প্রয়োজন। ১৯০৬-এর কলিকাতা কংগ্রেসে সম্পাদক মহাশয় যে ১৯০৭-এর প্রথম সংখ্যা অগ্রিম ছাপাইয়া সঙ্গে লইয়া যান সে কথা আগেই বলা হইয়াছে। কাগজের প্রথম সংখ্যা দেখিয়াই অনেক বিস্মিত পুলকিত ও শ্রদ্ধান্বিত হন। যাঁহারা তাঁহার ইংরাজি রচনার ভিতর দিয়া তাঁহার গভীর জ্ঞান, চিন্তাশীলতা প্রভৃতির সহিত পরিচিত ছিলেন তাহাদের মধ্যে *The Indian Economist* প্রথম সংখ্যা দেখিয়াই তাঁহার জ্ঞান ও চিন্তার গভীরতা উল্লেখ করিয়া লিখিলেন–

"His contributions in English to Indian journals have always been marked with such a depth of thought and erudition as could seldom be witnessed in the writings of many so-called writers. We have no doubt, therefore, that under his editorship the M. R. will grow into a great power not only in India, but over the continent too..."

প্রথম সংখ্যা দেখিয়া 'মডার্ন রিভিয়ু'র জগদ্ব্যাপী খ্যাতির যে ভবিষ্যদ্বাণী ইনি করেন তাহা ফলিতে বেশি দেরি হয় নাই।

Indian Social Reform রামানন্দের চিন্তাশীলতা ও মনীষার খ্যাতির সহিত ইতিপূর্বেই সুপরিচিত ছিলেন, প্রথম সংখ্যা পাইয়া লিখিলেন,

"Mr. Ramanand enjoys such a notable reputation as a thinker and a man of letters in Upper India that when it was announced that he was bringing out a magazine the highest expectations were formed of it at once...We can now confidently say that these expectations are in a very fair way of being satisfied...That the prevailing note of a review edited by Mr. Ramanand should be one of idealism, goes without saying."

অ্যাডভোকেট *(Advocate)* লিখিলেন.

"If Mr. Chatterjee succeeds in maintaining the high standard of which the first number gives ample promise, we have no hesitation in saying that the M. R. will easily take the very first place among the English periodicals of our country."

অ্যাডভোকেটের আশামতো সত্যই 'মডার্ন রিভিয়ু' ভারতীয় পত্রিকাসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিল।

Amrita Bazar লিখিয়াছিলেন,

"Sister Nivedita... and the editor...have sought to direct the moral and intellectual energy of our nation in channels hitherto greatly neglected... Altogether the M. R. has made a splendid beginning."

ভারতবর্ষে বহু বিভিন্ন ভাষা ও ধর্ম। এই ভাষা ও ধর্মের বাধা আমাদের পরস্পরকে জানিবার পক্ষে অন্তরায়। মানুষ মানুষকে যথার্থ জানিতে পারে তাহার জাতীয় সাহিত্য ও শিল্পের শ্রেষ্ঠ সম্পদের সাহয্যে। কিন্তু আমাদের দেশে ভাষা-বৈচিত্র্য এই জ্ঞানের পথে বাধা দেয়। আমরা শিক্ষিতজনেরা ইংরাজি ভাষার সাহায্যে আমাদের গভীরতম চিন্তা ও অনুভূতির আদান-প্রদান করিতে পারি বটে ; কিন্তু কয়জনের এই ভাবে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠ চিন্তা পরের ভাষায় প্রকাশের ক্ষমতা আছে এবং কয়জনই বা ইংরাজি পড়িয়া বুঝিতে পারে? এই কথাই সংক্ষেপে 'মডার্ন রিভিয়ু'-সম্পাদক পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই বলিয়াছিলেন এবং

এইজন্যই বলিয়াছিলেন, "It is here that art comes to our aid" (এইখানেই শিল্প আমাদের সহায়)। রবিবর্মার বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া তিনি জাতীয় একতা গঠনের ক্ষেত্রে শিল্পের স্থান কী বুঝাইয়াছিলেন এবং ইহারও সাত বৎসর পূর্বে *Keyastha Samachar* ('কায়স্থ সমাচার') পত্রেও যে এই কথা বলিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। ভারতীয় প্রথায় অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীরা যখন চিত্র রচনা শুরু করেন তখন রামানন্দই সর্বাগ্রে তাহার দেশব্যাপী প্রচারের ভার স্বহস্তে তুলিয়া লন বটে, কিন্তু তৎপূর্বে এবং তখনও রবিবর্মার বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লেখেন এই জন্য যে, রবিবর্মা পাশ্চাত্যপ্রথায় ছবি আঁকিলেও তাঁহার আঁকিবার বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয়। রবিবর্মা মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণাদি হইতে চিত্রের বিষয় নির্বাচন করিতেন এবং চিত্রের সাহায্যে ভারতের উচ্চ আদর্শেরই প্রচার করিতেন এবং জ্ঞানত বা অজ্ঞানত তিনি জাতিগঠনেরই সাহায্য করিতেন। রামানন্দ বলিতেন, 'যদি রবিবর্মা অল্প বয়সে ভারতীয় পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কন করিতে শিখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সৌন্দর্যজ্ঞান ও মৌলিকতার গুণে তাঁহাব প্রতিষ্ঠা আরও উচ্চতর হইতে পারিত এবং ভারতীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিও শিল্পক্ষেত্রে আরও শীঘ্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত।' দেশের তরুণ মনকে নানাদিকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে 'চিত্রকলা'র যে কত বড়ো প্রয়োজনীয়তা আছে, জাতিগঠনে ইহার যে কত উচ্চ স্থান তাহা তিনি 'দাসী'র যুগ হইতে বলিয়াছেন এবং 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু'র প্রথম যুগে তাঁহার এই জাতিগঠন প্রচেষ্টায় তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায়রূপে পাইয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা তখন প্রতি মাসে 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে লিখিতেন, কখনো-বা এক সংখ্যাতেই ২।৩টি প্রবন্ধ দিতেন। ভগিনী নিবেদিতা রামানন্দকে স্বদেশানুরাগের মূর্ত প্রতীকরূপে শ্রদ্ধা করিতেন।

দেখা গেল 'মডার্ন রিভিয়ু' প্রকাশিত হওয়া মাত্র দেশের শিক্ষিত-সমাজ তাহাকে সাদরে বরণ করিলেন, *Statesman, Englishman* হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয়দের সমস্ত কাগজই তাহার প্রবন্ধ-গৌরব, অঙ্গসৌষ্ঠব, চিত্রভার ও সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির উচ্চ প্রশংসা করেন। তখনকার দিনে এতগুলি চিত্রে শোভিত ও প্রবন্ধে গৌরবান্বিত পত্র দেখিয়া *The Hindu* বলেন,

"The Editor has spared neither money nor labour in making the first issue an extremely well got up, and eminently readable number."

প্রত্যেক কাগজে ইহার গুণাবলীর যেরূপ ফর্দ বাহির হইয়াছিল তাহা লিখিতে গেলে একখানি বড়ো পুস্তিকা হইয়া যায়।

সে বৎসর দাদাভাই নওরোজির সভানেতৃত্বে কলিকাতায় কংগ্রেস বসিয়াছিল। সুতরাং *Modern Review* এ সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল সম্পাদকের নওরোজি-বিষয়ক প্রবন্ধ। দাদাভাই নওরোজি ছিলেন দেশপূজ্য, দেশহিতৈষী, পূতচরিত্র, মাতৃভক্ত, সত্যব্রত ও অক্লান্তকর্মা। এই সকল কারণেই তিনি রামানন্দের বিশেষ ভক্তির পাত্র ছিলেন। তাঁহার নিজের জীবনের বহুদিকের আদর্শের সহিত ইঁহার জীবনের আদর্শ মিলিত বলিয়া ইঁহার বিষয় এমন খাঁটি অনুভূতির সহিত তিনি লিখিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি লিখিয়াছিলেন,

"The fact that Mr. D. Naoroji has rendered great service to India by his study of her economical and political problems, is apt to mislead us as to the real motive power of his life. His intellectual powers are

indeed remarkable ; but we presume it is his heart power and strong imagination that must have all along been the source of all his energy. No one can take a prominent part in the work of upbuilding and uplifting a nation who does not bring to his work pure, deep and intense feeling and a strong constructive imagination that may enable him to shape in his mind its ideal future. The future belongs to those statesmen and economists who can spiritualise their politics and economics. Mr. D. N. is such a statesman and economist. He has pure, deep and intense feeling and a strong constructive imagination; though these qualities of his mind are not perceived by those who take only a superficial view of his life and character. Our object in making the foregoing observations is neither to belittle Mr. D.N.'s intellectual eminence nor to minimise the importance of brain power; but only to point out that feeling and imagination have more to do with the making of a man than is generally supposed."

সংক্ষেপে বলা যায়, তিনি বলিয়াছিলেন, "দাদাভাই ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার অনুশীলন করিয়া ভারতের মহৎ উপকার করিয়াছিলেন বলিলে তাঁহার জীবনের কর্মপ্রেরণার প্রকৃত উৎসের সন্ধান মিলে না। তাঁহার মনীষা অসাধারণ বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় এবং তাঁহার কল্পনাশক্তিই তাঁহার কর্মক্ষমতার উৎস। যে মানুষের মনে আদর্শ ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলিবার মতো শক্তিশালী কল্পনা নাই এবং খাঁটি ও গভীর অনুভূতি নাই, সে মানুষ কখনো জাতিগঠনকার্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে না।"

মানুষের জীবন ও কার্যাবলীর মূল উৎস বুঝাইবার কী আশ্চর্য ক্ষমতা! আরও আশ্চর্য লাগে এই মনে করিয়া যে যেন ৩৭ বৎসর পূর্বেই কেহ স্বয়ং 'মডার্ন রিভিয়ু'-সম্পাদকের বিষয়েই এই কথাগুলির ভিতর দিয়া বলিয়াছেন। ইঁহারই মতো অসাধারণ মনীষা ও ধীশক্তি তাঁহার ছিল, যাহার বলে ভারতের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সমস্যা ও তাহাদের মীমাংসা তাঁহার নখদর্পণে ধরা দিত। কিন্তু শুধু ধীশক্তির বলে তো মানুষ অক্লান্ত দেশসেবক, জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, মানবহিতযজ্ঞের পুরোহিত হয় না। এই ধীশক্তির পিছনে, এই কর্মযজ্ঞের অন্তরালে থাকে পূজারীর পূত হৃদয়ের প্রেম। জাতির প্রতি গভীর নিষ্কাম প্রেম না থাকিলে কেহ মন্দির গঠনের একটি একটি ইষ্টক গাঁথার মতো করিয়া ছোটো বড়ো অসংখ্য মঙ্গল প্রচেষ্টার সাহায্যে জাতিগঠনের কার্যে আজীবন শক্তি ও সম্পদ ঢালিতে পারে না। সুস্পষ্ট কল্পনাশক্তি না থাকিলে কেহ আগে হইতে মনে মনে ভবিষ্যৎ রচনা করিয়া লইয়া তাহারই সৃজনে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারে না। এমনই গভীর প্রেম ও কল্পনাশক্তি তাঁহার নিজের ছিল বলিয়া তিনি আজীবন দেশহিতব্রতে অক্লান্তকর্মার মতো খাটিয়া গিয়াছেন এবং সেই প্রেম ও কল্পনাশক্তির উৎস সহজেই অপরের মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

ভগবদ্‌ভক্তি প্রেমেরই উচ্চতর রূপ। এই প্রেম সম্বল করিয়া তিনি প্রথম জীবনে কর্মে নামিয়াছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর "প্রাণ ব্রহ্ম পদে, হস্ত কার্যে তাঁর" মন্ত্রটির অনুসরণ করিয়া তিনি অধ্যাপনার সহিত ব্রাহ্মসমাজের সেবা, আর্তজনের সেবা, সুরাপান নিবারণ, অনাথাশ্রম গঠন, শিক্ষা-সংস্কার ইত্যাদি নানা হিতচেষ্টায় আপনাকে সঁপিয়া দেন। মানুষের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য এবং জগতের নিকট দেশবাসীর শ্রেষ্ঠ পরিচয় দিবার জন্য সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রচারেও তাঁহার মনের অনেকখানি শক্তি তিনি ব্যয় করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতি কাজে বাধার পর বাধা অতিক্রম করিতে করিতে তিনি ভালো করিয়া বুঝিলেন যে এই দরিদ্র নিরন্ন ভারতবাসীর মুখে ক্ষুধার অন্নই প্রথম প্রয়োজন। ক্ষুধিতের মুখে অন্ন দিতে না পারিলে

আর্তের সেবা, শিক্ষার সংস্কার, জনহিত-সাধন, সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টি কে করিবে, কাহাকে লইয়া করিবে? কিন্তু অন্নই বা দিবে কী করিয়া? পরাধীন দেশের ঘরের অন্ন ও জাতির নিজের নয়। পরাধীনতার শৃঙ্খল না কাটিতে পারিলে দেশের কোনো মঙ্গল প্রচেষ্টাই নিরঙ্কুশভাবে চলিতে পারে না। অথচ সকল প্রকার হিতচেষ্টা একত্রে না চলিলে মানুষ পরিপূর্ণতার আদর্শের দিকে চলিতে পারে না। তাই তিনি স্থির করিলেন পূর্ণোদ্যমে স্বাধীনতার সংগ্রামে নামিতে হইবে।

তাঁহার মধ্যে যে সৃজনী-প্রতিভা ছিল তাহা কাব্য কিংবা কথা-সাহিত্য রচনায় অথবা মহাকাব্য রচনায় ব্যয় করিবার প্রেরণা তাঁহার মধ্যে কখনো আসিয়াছিল কি না জানি না, তবে তাঁহার মতো মানবপ্রেমিক মানুষের নিভৃতে সরস্বতীর সাধনা করিবার অবসর ছিল না। তাঁহার প্রাণ যখন নিরন্তর কোটি কোটি নিরন্ন, বস্ত্রহীন, নিরক্ষর, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত নরনারীর জন্য কাঁদিত, তখন কোথায় কাব্য কল্পনার অবসর? তিনি নবযুগের বাল্মীকি কী ব্যাস হইয়া রামায়ণ বা মহাভারত রচনায় নামেন নাই বটে, কিন্তু বাল্মীকি যেমন রাম জন্মিবার পূর্বেই রামায়ণের স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন, তিনিও তেমনি এক মহা ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যেখানে ক্ষুধিতের ক্রন্দন, লাঞ্ছিতের গোপন বেদনা নাই, যেখানে ছোটো বড়ো সকল নরনারীব মস্তক আত্মমর্যাদায় উন্নত। সেই মহা ভারতবর্ষ রচনায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যদিও বিধাতা তাঁহাকে তাহার আগমনীর সম্ভাবনাও জানিয়া যাইতে দিলেন না। কাব্য ও কথাসাহিত্য সৃষ্টিই একমাত্র মহৎ সৃষ্টি নয়, তাহা হইলে বিধাতা সমস্ত মহাপুরুষকেই কবি বা ঔপন্যাসিক করিতেন।

রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রে আছে—

> "সপ্তাহ বের করবার ছল করে জীবন থেকে সপ্তাহগুলো একেবারে লোপ করতে বসেছিলুম। এখন যেমন আমি সপ্তাহে সাতটা দিন করে পাই, তখন সপ্তাহে সাতটা দিন বাদ পড়ত। মাসের পর মাস আসত, কিন্তু সপ্তাহ নেই। দিনগুলো আমাকে লাঠি হাতে তাড়া কবে বেড়াত। আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব ভেবে পেতাম না।"

এই কথা উল্লেখ করিয়া রামানন্দ একবার লিখিয়াছিলেন, "আমি যদিও সপ্তাহ বাহির করি নাই, কিন্তু দুখানা মাসিক চালাই, অথবা সত্য কথা বলিতে গেলে তাহারাই আমাকে চালায়। একখানা আমাকে ১৫ দিন তাড়া করে, বাকি ১৫ দিন আর একখানা আমার পশ্চাদ্ধাবন করে। ফলে মনটা সুস্থির শান্ত হইতে পায় না। যাদের স্কুলে বা আপিসে যাইতে হয় না, তারা খাদ্যের রস গ্রহণ করিবার, তাহা সম্ভোগ করিবার অবসর পায়। কিন্তু যাহাদিগকে তাড়াতাড়ি ইস্কুলে আপিসে যাইতে হয়, তাহারা নাকে-মুখে কিছু গুঁজিয়া কোনো প্রকারে আহার সারিয়া লয়। অতি-ব্যস্ত মানুষও তেমনি সাহিত্যের রস গ্রহণ করিতে, তাহা সম্ভোগ করিতে এবং অপরকে তাহার অংশ দিতে পারে না। তাহার পড়া, কোনো প্রকারে কাজ চালাইবার মতো কিছু তথ্য তত্ত্ব ও খবর সংগ্রহ করিবার জন্য।" শুধু পড়া কেন, জীবনের অন্য রস গ্রহণ ও তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া পরিবেশন করার বেলাও এই কথা খাটে।

সমগ্র ভারতবর্ষকে এক মহা ভারতবর্ষে পরিণত করিতে হইলে এক ভাষাগ্রন্থিতে তাহাকে বাঁধা প্রয়োজন। অন্তত শিক্ষিতজনের চিন্তার বিনিময় সকলের বোধগম্য একটি ভাষার সাহায্যে হওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশে তখন (এবং এখনও) ইংরাজি ছাড়া আর

এমন কোনো ভাষার চলন ছিল না যাহার সাহায্যে এই কাজ হইতে পারিত। এইজন্যই দেখা যায় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দ যখন নিজ-পরিচালিত এই বাংলা ও ইংরাজি পত্রিকা দুইটির ভিতর দিয়া জাতিগঠন ও স্বাধীনতা-সংগ্রাম কার্যে পূর্ণোদ্যমে নামিলেন, তখন তিনি ইংরাজি ভাষাকেই প্রধান সহায় বলিয়া গ্রহণ করেন। এই সময় ১৩১৩, ১৩১৪, ১৩১৫, ১৩১৬ ইত্যাদিতে রাজনৈতিক বিষয়ে 'প্রবাসী'তে সম্পাদকীয় মন্তব্য খুব বেশি থাকিত না। ১৩১৭তে মাঘ ছাড়া অন্য মাসে 'বিবিধ প্রসঙ্গ'ই নাই। কিন্তু *Modern Review* প্রতি সংখ্যা রাজনৈতিক নোট্‌সে গরম হইয়া থাকিত। বাংলা ১৩১২ সালে বঙ্গবিচ্ছেদ হয়। এই বৎসর কিংবা তাহারই কাছাকাছি সময়ে তিনি সম্ভবত ইংরাজিতে অন্য কাগজে রাজনৈতিক বিষয়ে লিখিতেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম সংখ্যা 'মডার্ন রিভিয়ু'তে তার প্রমাণ পাই।

> "When Curzon the Truthful indicted all Asia of mendacity, the *present writer*, like many other journalists tried to show from various sources that whatever the pretensions of that pompous Viceroy might be, the man Curzon was not exactly infallible."

রাজনৈতিক আন্দোলন সফল করিতে হইলে একই কথা বার বার বলার প্রয়োজন হয় এ কথা তিনি জানিতেন ও বিশ্বাস করিতেন বলিয়া দাদাভাই নওরোজি বিষয়ে লিখিয়াছিলেন—

> "He has, in fact been accused of constantly repeating himself, by those who do not know the secret of successful agitation."

এ ক্ষেত্রেও নওরোজির সহিত তাঁহার সাদৃশ্য ছিল। তিনি নওরোজির মতো জীবনে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অনেক সময় এক কথা বার বার বলিয়াছেন এবং তাঁহার নিজের কাগজ করার ইহাও একটা ছোটো কারণ ছিল। এই পুনরুক্তি করা বিষয়ে মর্লি (Morley) এবং Autocrat of the Breakfast table-এর নজির তিনি দেখাইতেন।

পরিপূর্ণ যৌবনের শক্তি উৎসাহ ও আশা লইয়া যখন তিনি নিঃস্ব অবস্থায় 'মডার্ন রিভিয়ু' বাহির করিলেন তখন তিনি ঋণকে ভয় করেন নাই, আশা ভগ্নের কথা ভাবেন নাই; হিসাবের কথা কিংবা ব্যবসায়ের কথা ভাবেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন আদর্শের কথা, পরিপূর্ণ মানবজীবনের লক্ষ্যের কথা, স্বাধীনতার কথা ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা। নিঃসম্বল হইয়াও তিনি যে জয়যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন, তাহাতে বিধাতার ন্যায়-বিধানে বিশ্বাস তাঁহার ভরসা ছিল। ছাত্রদের তিনি বলিতেন, "Whoever struggles manfully in any field of human activity is a hero." এইরূপ বীর তিনি স্বয়ং ছিলেন। তাই নিজ জীবনের সংগ্রামক্ষেত্রে কোনো বাধাকেই তিনি ভয় করেন নাই। তিনি আপনার সমস্ত শক্তি যেখানে ঢালিয়া দিতেছেন, সেখানে জয় হইবে এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল। এবং থাকা স্বাভাবিক ছিল। পূর্ণোদ্যমে নিজে তো তিনি লিখিতেনই, তদুপরি তখনকার দিনে ভারতবর্ষে সর্বক্ষেত্রে যাঁহারা বিখ্যাত লেখক ও জ্ঞানী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠজনদের প্রায় সকলেরই লেখা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আবার ফোটো-চিত্র, জলচিত্র, তৈলচিত্রের প্রতিলিপি প্রতি সংখ্যায় এত ছাপিতে লাগিলেন যে ভারতবর্ষে কেহ তা কল্পনাও করিতে পারিত না। ছাপা, বাঁধাই, মলাট, পৃষ্ঠাসংখ্যা সকল বিষয়ে এবং তদুপরি সময়-জ্ঞান বিষয়ে তিনি একটি নবযুগ আনয়ন করিলেন।

ষষ্ঠ সংখ্যা *M. R.* বাহির হইবার পর অরবিন্দ ঘোষ-সম্পাদিত *Bande Mataram* লেখেন—

"It is no exaggeration to say that the M. R. has introduced a new feature in our magazine literature. Its wealth of illustration is really wonderful and it spends it for the benefit of its readers with a lavish profusion which is really oriental. ...But its wealth of illustrations pales before its wealth of articles. And no wonder even European writers are coming forward to contribute to this magazine."

এই-জাতীয় প্রশংসা মান্দ্রাজের 'হিন্দু', বোম্বাই-এর *Subodh Patrika* প্রভৃতি করেন। *The World & the New Dispensation*এ সম্ভবত বিনয়েন্দ্রনাথ লেখেন—

"The 'Prabasi', by its cheapness, the profuseness of its illustrations and its interesting articles, has found a ready welcome in thousands of Bengali home, where it is now a household necessity. ...The 'Prabasi' was a delightful surprise to us, but a greater surprise is this 'Modern Review' ".

এই Surprise বা বিস্ময়ের কারণের একটা লম্বা ফর্দ আছে তাহা দিয়া জায়গা জুড়িতে চাই না।

দুই সংখ্যা *Modern Review* দেখিবার পর একটি খাঁটি বিলাতী কাগজ অর্থাৎ *Light* লেখেন—

"We are certainly surprised to see them. We have nothing in England more important-looking, more enterprising and more serious."

এক কথায় ইংলন্ডেও ইহার চেয়ে ভালো কাগজ তাঁহারা দেখেন নাই স্বীকার করিতেছেন।

প্রথম যুগের *M. R.* পরিচালনায় তিনি তাঁহার যে-সকল বন্ধুর বিশেষ সহায়তা পাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মেজর শ্রীবামনদাস বসুর নাম সকলের আগে মনে পড়ে। তাঁহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাহার পর ভগিনী নিবেদিতা, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ প্রভৃতির কথা মনে পড়ে। সকলেই লেখক নহেন। যাঁহার যে সম্পদ বড়ো ছিল তিনি সেই সম্পদের সাহায্যেই বন্ধুহিতচেষ্টা করিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা নিয়মিত লেখার ভার তো লইয়াই ছিলেন, তাহার উপর ছিল তাঁহার চিত্র নির্বাচন ও চিত্র-পরিচয় লেখা। এগুলি প্রথমে 'প্রবাসী'র জন্য শুরু হয়, পরে *M. R.*-এও ছাপা হইতে লাগিল। ১৩১৩ সালের ফাল্গুনের 'প্রবাসী'তে আছে, 'ভগিনী নিবেদিতা নিজ অন্তর্দৃষ্টিপ্রসূত মন্তব্য সহ যে-সকল ইউরোপিয় ছবি আমাদিগকে প্রকাশার্থ বাছিয়া দিতেছেন, তৎসমুদয়ও ছাপা হইবে।' ১৩০৯ এবং ১৩১০-এ বহু বিখ্যাত ইউরোপিয় চিত্র প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। সেকালে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় ছিলেন এইরূপ আর-একজন বন্ধু। তিনি প্রবন্ধাদি দিয়া এবং অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ দিয়া 'মডার্ন রিভিয়ু'র অনেক সাহায্য করিতেন। তখনকার লেখকদের মধ্যে সি ওয়াই চিন্তামণি, লজপৎ রায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, সুব্রহ্মণ্য আয়ার, মহেশচন্দ্র ঘোষ, স্বর্গীয় Andrews, সন্ত নিহাল সিং, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, তেজবাহাদুর সপ্রু, অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, অবিনাশচন্দ্র দাস, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কতজনের নাম করা যায়?

মানুষ আপনার আদর্শে পৌঁছিতে পারে না। সুতরাং কাহারও সে অক্ষমতার বিচার করা চলে না। কাহার আদর্শ কত বড়ো, তাহার কার্যধারা ও প্রণালী দেখিলে অনেকখানিই বুঝা যায় এবং তাহা দেখিয়াই মানুষের মূল্য নিরূপণ করা চলে। দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য মানুষের জীবনের যত ক্ষেত্রে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন, প্রথম হইতেই 'মডার্ন রিভিয়ু'তে তাহা

করা হইয়াছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল কাটাইবার পক্ষে যত যুক্তি থাকিতে পারে তাহার কোনোটিকেই সম্পাদক পত্রের আসরে হাজির করিতে ত্রুটি করেন নাই। দমননীতি ও দলননীতির বিষয়ে যাহা বলিবার তাহা বারবার বলিয়াছেন, কিন্তু বলা বাহুল্য যে, বলিতে গিয়া জাতির আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া তবে বলিয়াছেন। মর্লি, মিন্টো, কার্জন কাহাকেও তিনি ছাড়িয়া কথা বলেন নাই এবং কখনো তাঁহাদের নিকট মাথা নীচু করিয়া প্রার্থীর মতো কিছু চাহেন নাই।

পঞ্জাবকেশরী লালা লজপৎ রায়ের নির্বাসনের সময় মর্লির যুক্তির উত্তরে এই রাঢ়ীয় বীর বলিয়াছিলেন :

"If we have any life, repression would be our salvation. If we have not, repression or its opposite would be all the same to us."

একতা জাতীয় মুক্তির ভিত্তি বলিয়া তিনি স্বয়ং একতার বাণী বলিয়াছেন এবং ভারতবাসী যে একতার মন্ত্রের সহিত অপরিচিত নহে ইহা বার বার দেখাইয়াছেন। ১৯০৬-এর ডিসেম্বরের কংগ্রেসের বিষয় লিখিবার সময় বলিয়াছেন—

> "Amongst friends and foes alike, the note of surprise is audible at the 'united front' presented by the Congress to the world. We do not think this surprise is justified The great distinction of Indian politics appears, to one within the racial ranks, to be their unanimity. We are not inclined to think that either Ireland or Russia can show a similar unanimity amongst their patriotic factions. ... The outstanding characteristic of Congress leaders in the past moreover, has been an overwhelming respect for the integrity and continuity of the Congress. Time and again the more outspoken and enthusiastic—shall we say, the extreme—amongst us have capitulated to the seniors rather than jeopardise that unity which was still dearer to the most hot-headed of us than their own opinions."

তখন তিনি মনে করিতেন স্বরাজলাভ প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে স্পষ্ট বিভিন্ন দুটি Party (দল) নাই। এই ভেদ সৃষ্টি করার তিনি বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি বলিতেন গোখলে exponent of the moderate party হইলেও passive resistance পর্যন্ত প্রয়োজন ও সময় হইলে করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। রাজনৈতিক ভিন্ন ভিন্ন party সৃষ্টির সম্ভাবনার পূর্বেই গোখলের এই মত ছিল। তাই *M.R.* বলিতেন,

> "We for our part do not see the need or feel the wisdom of being in a hurry to create or recognise a split is our camp. We prefer to stick to the rule, 'In essentials unity, in non-essentials liberty, in all things charity."

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে যখন ভয়ের দ্বারা শাসন আরম্ভ হয় তখন তিনি সরকার বাহাদুরকে এই শাসন-প্রণালী প্রত্যাহার করিতে বলেন নাই। ছোটো ও বড়ো সকল বিষয়ে তাঁহার আত্মসম্মানবোধ এত উচ্চদরের ছিল যে, তিনি কখনো পরের নিকট কোনো সাহায্য বা কৃপা ভিক্ষা করেন নাই, পরকে কোনো কাজ করিতে বা কোনও অ-কাজ স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করেন নাই। কিন্তু এই মানুষই যাহাকে যখন আপন মনে করিয়াছেন তাহাকে কঠিন কার্যে আহ্বান করিয়াছেন, ছোটো ছেলের মতো যে-কোনো সাধ্য বা অসাধ্যসাধনে অনুরোধ করিয়াছেন।

'মডার্ন রিভিয়ু' বাহির হওয়ার বছরখানিক পরে 'প্রবাসী'তে ভারতশাসন বিষয়ে তিনি লিখিতেছেন, "ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে এখন ভয়ের দ্বারা শাসন করিবার চেষ্টা চলিতেছে,

রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত লোকদিগকে অত্যন্ত কঠিন শাস্তি দেওয়া হইতেছে। ইহাতে গবর্নমেন্টের কী ক্ষতি তাহা বলিবার আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই। সরকার নিজের ভালো মন্দের বিচার নিজেই করেন, আমাদিগকে পরামর্শ দিবার জন্য ডাকেনও না, আমাদের পরামর্শের অপেক্ষাও রাখেন না। বরং আমরা গায়ে পড়িয়া পরামর্শ দিলে ভাবেন, লোকগুলা ভয় পাইয়াছে, তাই আমাদিগকে লৌহদণ্ড তুলিয়া রাখিতে বলিতেছে। অতএব কঠিন শাস্তিতে আমাদের ক্ষতি লাভ কী, কেবল তাহাই আমাদের বিচার্য।

"মানুষ যখন অসাড় হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে আঘাত করিলে হয় সে সংজ্ঞা লাভ করে, সচেতন হয়, জাগে, নয় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই দুইয়ের এক বা অন্য ফল জীবনীশক্তির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যাহার জীবনীশক্তি প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে সে আঘাতে মরে, যাহার কিছু জীবনীশক্তি আছে, সে জাগিয়া উঠে। আমরা কঠিন শাস্তিব আঘাতে মরিব না জাগিব, তাহাই বিচার্য। যদি না জাগি, তাহা হইলে তিলক, চিদাম্বরম প্রভৃতির উপর অবিচার আমাদের কোনো উপকার করিবে না।... কিন্তু আমাদের আশা হইতেছে, ক্ষণিক ভয় যাহার যত হউক, আমরা জাগিব।"

তাঁহার সে ভবিষ্যদবাণী কিছুই সফল হয় নাই আজ বলা যায় না। কিন্তু আঘাতের বলে সংজ্ঞা লাভ করিয়া আমরা ফিরিয়া আঘাত করিব এ ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করে নাই। গান্ধীর অহিংসানীতি যখন দেশে অজ্ঞাত তখনই ১৯০৮-এ তিনি বলিয়াছিলেন, "সভ্য জগতে স্বাধীনতা রক্ষা বা লাভের জন্য যুদ্ধে নরহত্যা বৈধ বলিয়া পরিগণিত। ইহা অপেক্ষাও উচ্চতর আদর্শ সম্পূর্ণ অহিংসমূলক আদর্শ, ভবিষ্যতে মানব-সমাজে গৃহীত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।"—'প্রবাসী' অগ্রহায়ণ ১৩১৫।

ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবের কেহ অমর্যাদা করিলে কিংবা ভারতবর্ষকে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কোনো কিছু অধিকার লাভের অযোগ্য বলিলে তাহাকে রামানন্দ সহজে মুক্তি দিতেন না। ভারত-হিতৈষীদের মুখেও তিনি এমন কথা কোনো দিন সহ্য করেন নাই। ১৯০৭-এ *Madras Mail*-এর একজন interviewer মিসেস বেসান্টের জবানীতে ছাপাইয়াছিলেন "English democracy cannot be planted in India. India is not fitted for it." *M. R.*-সম্পাদক রামায়ণ-মহাভারতের যুগ হইতে শুরু করিয়া নানা যুক্তি দেখাইয়া যখন এই মতের বিরুদ্ধে লিখিলেন তখন ভারতীয় সংবাদপত্র মহলে সাড়া পড়িয়া গেল। তৎকালীন কোনো প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র এই প্রবন্ধের উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই।

তাঁহার সুযুক্তি, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, ঐতিহাসিক নজির, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, ধীশক্তি, পাণ্ডিত্য ও বহুমুখী প্রতিভার বলে তিনি ভারতীয় কোন্ কোন্ সমস্যার কী কী সমাধান করিয়াছিলেন বা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার বিচার করিবার স্থান ইহা নয় ; আমার সে অধিকার ও ইচ্ছা নাই। এখানে তাঁহার জীবনচিত্র আঁকিবাব সূত্রে যতটুকু কথা না তুলিলে চলে না ততটুকুই বলা ভালো।

স্বদেশী যুগের পর দেশ নিত্য নূতন সমস্যায় কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। আজ জামালপুরে অত্যাচাব, পূর্ববঙ্গে অরাজকতা, কাল কলিকাতায় পুলিশেব জুলুম কী পঞ্জাবে দলননীতি যখন যাহা দেখা দিত কোনোটাই তিনি ভুলিতেন না। তদুপরি দেশের প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর তাণ্ডবও তাঁহার মন জুড়িয়া ছিল। তাঁহার মনের ছবি ফুটিয়া উঠিত তাঁহার কাগজের পাতায় পাতায়। ক্ষুধিত ও পীড়িতের ক্রন্দনে লাট-বেলাটেরা যে সকল ভুয়ো কথার হরির লুট দিতেন সেগুলি পিষ্ট করিয়া ধুলায় লুটাইয়া দেওয়া ছিল তাঁহার কাজ।

'মডার্ন রিভিয়ু'র প্রথম দিন হইতে ভারতের আর্থিক, পারমার্থিক কোন স্বার্থ না তিনি আগলাইয়া আসিয়াছিলেন? ভারতকে পৌরুষে হেয় প্রমাণ করিবার জন্য এবং ক্রমশ দেশরক্ষার অযোগ্য ভীরু পরনির্ভরশীল জাতিতে পরিণত করিবার জন্য বহির্ভারতের সৈন্যদের উপর ভারতরক্ষার ভার দিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা সরকারের বহুদিন হইতেই ছিল। আফগানিস্থানের আমীর ১৯০৭এ ভারত দর্শনে আসিতেই এই আশঙ্কা *M. R.*-সম্পাদকের মনে আবার জাগিয়া উঠিল। তবে বুঝি ভারতের সামরিক জাতির মুখের অন্ন কাড়িবার ব্যবস্থা হইতেছে, ভারত-সন্তানকে কাপুরুষতার দিকে আরও দ্রুত ঠেলিয়া দিয়া ভারতরক্ষার অধিকার ও গৌরব হইতে পুরাপুরি বঞ্চিত করার আয়োজন চলিতেছে?

পাঠ্যপুস্তকে বীরত্বের কাহিনী দেশসেবার কথা ক্রমেই লুপ্তপ্রায় হইয়া চলিতেছে, ফরমায়েশি জোলো বই ছেলেদের জন্য স্কুলে সরবরাহ চলিতেছে, অমনি *M. R.*-এর প্রথম দৃষ্টি পড়িল শিক্ষাসচিবের দপ্তরের দিকে। তিনি বলিলেন, "ইতিহাসও বিদেশিআমলাতন্ত্রের স্বার্থ রক্ষার উপযোগী করিয়া বিকৃত করা হইতেছে, ভবিষ্যতে আরও হইবে।"

দেশে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হইল। তিনি আনন্দিত হইয়া তাহাকে বরণ করিলেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাও যে জাতীয় হওয়ার প্রয়োজন আছে এ কথা মনে করাইয়া দিতে ভুলিলেন না। কারণ তাহাতেই দেশব্যাপী শিক্ষার বিস্তার হয় এবং শিশুকাল হইতে বালকবালিকারা স্বদেশপ্রেম শৌর্য ও বীর্যের মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারে।

নূতন ম্যাট্রিকুলেশনের খসড়া যখন তৈয়ারি হয় তখন এন্ট্রান্স পরীক্ষার ইতিহাস, ভূগোল সবই optional হইয়া গেল। অমনি দেশহিতব্রত *M. R.* সম্পাদকের মনে খট্‌কা লাগিল, তবে তো অতঃপর ছাত্ররা আপনার দেশের ইতিহাসের কথা এক অক্ষরও না জানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম সোপানে উঠিতে পারিবে? দেশপ্রীতি কি এমনি করিয়া বিনষ্ট করা হইবে? ইংলন্ডের ইতিহাস স্বাধীনতা লাভেরই ইতিহাস! দেশের তরুণ মনে স্বাধীনতার বাসনা যাহাতে জাগিতেও না পায় তাই বুঝি ইংলন্ডের ইতিহাসের সঙ্গে আজন্মই তাহাদের পরিচয় থাকিবে না? তিনি বলিলেন,

> "It is a puerile remedy for dangerous discontent that would deprive us of knowledge. The thing to be dreaded in us is not information but the mind that loves information."

হায় স্বার্থান্ধ মানব! পরাধীন জাতির জ্ঞানলাভের একটা পথ তুমি বন্ধ করিয়া দিতে পার, কিন্তু তাহার মনকে কি নিষ্ক্রিয় করিয়া দিতে পারিবে? জ্ঞান-সঞ্চয়ের সংগ্রাম অন্য পথে শুরু হইবে।

> "It is a sad and ominous moment when a man will admit that he has a quarrel against truth."

তিনি বলিলেন, "সত্যের সহিত যখন মানবের দ্বন্দ্ব বাধে জগতে তখনই দুর্দিন ঘনাইয়াছে জানিতে হইবে।"

যৌবনকে যখন জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলিতেছে তখন তিনি যৌবনকে বীরত্বে শ্রদ্ধায় উন্নত করিতে জাগরিত করিতে ব্যস্ত। তিনি তরুণ মনকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "আত্মতৃপ্ত হইয়া ঘুমাইয়ো না, অনন্ত জ্ঞান সঞ্চয়ের পথে উন্নতির পথে শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে অগ্রসর হও।"

> "What we want as a people is divine discontent with self—never to feel that we know enough never to feel that we can do enough, or be perfect enough. Thirst after perfection for the sake of other,—this

is *tapasya,—vairagya—nationality.*"

যে-মানুষ শিক্ষার ত্রুটি দূর করিতে সংগ্রামে নামিয়াছেন, সেই মানুষই ক্ষুধায় ক্লিষ্ট অন্নহীন চাষী, মেষপালকের দুর্দশা দেখিয়া সপ্রেমে তাহাদের অন্ন আগলাইতে আসিয়াছেন। আজ দেশব্যাপী এই দুর্ভিক্ষের হাহাকারের মধ্যে ৩৭ বৎসর পূর্বের তাঁহার কথা মনে পড়িতেছে, যিনি বলিয়াছিলেন, "চাষী ও মেষপালকদের রক্ষা করো।"

"In India the civilisation is built upon the peasant. ...And 'God save the People' say we Indians, with all our hearts." "Food for the people. ... To have a granary containing rice sufficient for three years ahead is Dharma. To barter this for coin is *A–Dharma.* This is the truth that must be taught and enforced in all possible ways."

"In the awakening of India which we see about us, then, 'Food for the People' is the cry which is beginning to take precedence of political and educational rights, as the immediate object of our energies "

তিনি বলিতেন, "আমাদের ভারতবাসীদের সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় আদর্শ (?) জনগণের অন্ন, প্রধানত ইহারই জন্য আমরা রাষ্ট্রীয় যোগ্যতা চাই।" অন্ন চাই, অন্নকে রক্ষা করা চাই, অন্ন বিক্রয় করিয়া টাকা লইলে অভাবের দিনে অন্ন মিলে না, এ কথা ভগিনী নিবেদিতাও বলিয়াছিলেন কারণ তিনিও ছিলেন নিরন্নের বন্ধু।

দরিদ্রের জন্য অন্ন চাই। কিন্তু যাহারা সেই অন্নভাণ্ডার আগলাইবে, যাহারা দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করিবে তাহাদের নিজ নিজ জীবনে দারিদ্র্যকে ভয় করিলে চলিবে না। তিনি বলিলেন, 'আমরা দারিদ্র্য, সংগ্রাম ও শ্রমকে ভয় করি না। আমরা ভয় করি বিলাস, অদক্ষতা, অজ্ঞানতা, শক্তিহীনতা ও চরিত্রহীনতাকে। আমাদের লড়িতে হইবে দেশের অন্ন দেশে রাখিবার জন্য।'

"Never did Nadir Shah, Timur the Lame, and other plunderers take away so much wealth from India, as, year after year, quietly, bloodlessly and legally, is drained away to foreign shores to enrich the foreigners and indirectly to bring about the death of India's children by famine and plague."

"তোমরা বলিবে ভারতকে আমরা শান্তি দিয়াছি কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শান্তিতে ৩২$\frac{১}{২}$ মিলিয়ন ভারতবাসী শুধু দুর্ভিক্ষেই প্রাণ দিয়াছে।" ইতিমধ্যে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করিতে গিয়া লজপৎ রায় anarchist (অ্যানার্কিস্ট) প্রমাণিত হইলেন এবং বিনা বিচারেই তাঁহার নির্বাসন লাভ হইল। আর-এক দিকে পূর্ববাংলায় অরাজকতার তাণ্ডবলীলায় জামালপুর প্রভৃতিতে হিন্দু নারীর অকথ্য দুর্গতি হইল। বীরের দলন ও নারীর অপমানে *M. R.*-সম্পাদক গর্জিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "এই অরাজকতার পরেও যদি হিন্দুরা বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তবে ব্রিটিশ জাতি তাহাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও হিন্দুরা বাঁচিবে নিশ্চয়।"

মর্লিদের ভারত-হিতৈষণা দেখিয়া তিনি হাসিলেন। ভারতবর্ষের যা-কিছু সুখ শান্তি ইংরাজই করিয়াছেন বটে। মর্লি ব্রিটিশ রাজনৈতিকদেরই তো জাতভাই।

"Mr. Morley resembles most English politicians and historians in comparing British rule with only the worst periods of pre-British rule in India. But India has a pretty long history. Have we all along been doing nothing but indulging in the pleasant pastime of cutting one another's throats till the English came on the scene?"

'মডার্ন রিভিয়ু'-এর প্রথম যুগেই স্টেড প্রভৃতি বিখ্যাত সম্পাদক ইহার মতামতের সর্বদা আলোচনা করিতেন।

১৯০৭-এর ডিসেম্বরের *M. R.*-এ স্টেড (R. of R.) সাহেবের নামে একটি খোলা চিঠি ছাপা হয়। Stead নিজ পত্রে তাহার সমালোচনা করিবার সময় লেখেন,

"Mr. Chatterjee is obsessed by the memory of the partition of Bengal, and he is alarmed lest the British people will divide India herself into two viceroyalties and arrange for the ultimate annexation of independent Siam...surely this is midsummer madness."

২২ ফেব্রুয়ারির একটি Reuter-এর টেলিগ্রাম তুলিয়া *M. R.* দেখান যে শ্যাম ও গ্রেট ব্রিটেনে সত্যই ট্রিটির কথা হইতেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে ১১ বৎসর ধরিয়া প্লেগের মারণলীলা চলিতেছিল। কর্তাদের দরবারে ২।১টা কথা উঠিতেছে। এদিকে অন্যত্র শোনা যাইতেছে "ভারতে খাদ্যের তুলনায় মানুষ বড়ো বেশি। তাই প্রকৃতি মহামারীর সাহায্যে জনসংখ্যাকে সামলাইয়া রাখিয়াছেন, নহিলে ইহারা যে অনাহারে মরিত।" কিন্তু কোথায় অগণিত জনসংখ্যা? ভারতে তখন বর্গমাইল প্রতি ১৭০টি মাত্র মানুষ। *M. R.*-সম্পাদক বলিলেন—

> "Many a stranger who comes to India and crosses it by rail by any of the routes, asks in bewilderment, "Where are the teeming millions?" The thinness of population across wide stretches of country in India is only equalled by that of the United States of America There the railway betrays the same vast, almost manless, solitudes If only people would go to life, instead of to books, for their facts! .. Last year there was an outbreak of plague in Rajputana, and whole fields stood in certain parts with ripe grain unreaped, because the villages had none to do the reaping."

৩৭ বৎসর পরে আবার অগণিত জনসম্ভারে পীড়িত ভারতে সেদিন গ্রামে গ্রামে সেই একই দৃশ্য দেখা দিয়াছিল : শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র পড়িয়া আছে, মানুষ নাই যে কাটিয়া ঘরে লইয়া যায়!!

দারিদ্র্য রাক্ষসীর সহচরী প্লেগ মহামারীর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইলে চাই অন্ন, চাই বস্ত্র, চাই সচ্ছলতা, এ কথা মনে করাইয়া দিতে তিনি ভুলিলেন না।

সেই প্রথম যুগ হইতে শাসক জাতির স্বার্থের হাত হইতে শাসিতের স্বার্থকে বাঁচাইবার ব্রতে তিনি আপনাকে যেমন ঢালিয়া দিয়াছিলেন তেমনি জ্ঞানে, কর্মে, বীর্যে, সংস্কৃতিতে, শিক্ষায়, আনন্দে এই জাতিকে প্রাণবান করিয়া তুলিতেও অনন্যমনা হইয়া লাগিলেন।

দেশের এই সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কার্যে দেশবাসী সকলে একত্রে মিলিয়া যোগ দিক ইহা তাঁহার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কামনা ছিল। তিনি জানিতেন এবং নিজ দেশসেবাব্রতের প্রথম দিন হইতে বার বার বলিয়াছেন, আমাদের হিত যাঁহারা চান না, তাঁহারা আমাদের ভেদনীতির উপাসক করিতে চেষ্টা করিবেন, অতএব আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। ১৯০৭।৮ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস যখন দুইদলে বিভক্ত হয়, তখন তিনি বলেন "ইংলন্ড আমাদের স্বাধীনতা দিবেন না, দিতে পারেন না। আমাদের তাহা স্বচেষ্টায় লইতে হইবে। ইহার জন্য আমাদের একতাবদ্ধ হওয়া দরকার।"

> "The bureaucrat is the friend of neither the Moderates nor the Extremists. He wishes only to divide and destroy."

১৯০৭-এর কংগ্রেসের পর

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসে যোগ দিতে গিয়া রামানন্দ সুরাট হইতে কঠিন পীড়া লইয়া আসেন এ কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তখন তাঁহার চাকরি ছিল না, 'প্রবাসী'ও ঋণমুক্ত হয় নাই এবং 'মডার্ন রিভিয়ু' আরম্ভ করার জন্য নূতন ঋণ হইয়াছিল। সন্তানসন্ততিরা ছোটো, বহু আত্মীয়স্বজন তাঁহারই মুখাপেক্ষী। এ রকম অবস্থায় তাঁহার কঠিন পীড়াতে মনোরমা দেবী যদিও ভীত হইয়াছিলেন তবু মুখে তাহা প্রকাশ করেন নাই। ব্যক্তিগত শুশ্রূষার কাজ বেশির ভাগ তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া একলাই করিয়া যাইতেন। অবশ্য বন্ধুরা সহায় ছিলেন। ভৃত্যদের হাতের তৈয়ারি পথ্য খাওয়া ডাক্তারের বারণ ছিল বলিয়া বন্ধুরাই স্বহস্তে রোগীর সব পথ্য প্রস্তুত করিতেন।

১৯০৭-এর পর জাতীয়তাবাদিগণ যখন কংগ্রেস হইতে বহুকালের জন্য অপসৃত হন, তখন হইতেই প্রবাসী-সম্পাদকের সহিত কংগ্রেসের সম্বন্ধ শিথিল হইতে শুরু করে। উপরন্তু 'মডার্ন রিভিয়ু' প্রকাশের কিছুদিন পর হইতে দেশের সকল প্রচেষ্টা ও সমস্যা সম্বন্ধে সকল দলের বাহিরে থাকিয়া নিজের খাঁটি অভিমত প্রকাশ করিবেন এই সংকল্প গ্রহণ করাতে সম্ভবত তিনি সকল দল হইতে দূরে চলিয়া যান। এই নির্ভীক মত প্রকাশের পূর্ণব্রত গ্রহণের পর হইতে তাঁহার বহু পুরাতন বন্ধু একে একে বিভিন্ন সময়ে তাঁহার সহিত পূর্বকালীন প্রীতির সম্বন্ধ ত্যাগ করেন। তাঁহার স্নেহপ্রবণ মন আঘাত করিতে ও আঘাত পাইতে ব্যথিত হইত। কিন্তু নিজ বেদনাকে তুচ্ছ করিয়াও তিনি যাহা কর্তব্য বুঝিয়াছেন তাহা চিরদিনই করিয়া গিয়াছেন।

লজপৎ রায়

এই সময় বোধহয় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে লালা লজপৎ রায় মুক্তি পান। সামান্য কথা হইলেও ইহার কুড়ি বৎসর পরে প্রবাসী-সম্পাদক তাঁহাব কথা যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম : "১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই-এর কংগ্রেসে আমি লালাজীকে প্রথম দেখি ও তাঁহার বক্তৃতা শুনি।... বোম্বাই-এ লালাজীর সহিত আমার পরিচয় হয় নাই। ১৯০৭ সালে তিনি নির্বাসিত হন। খালাস পাইবার পর ১৯০৮ সালে যখন তিনি দেশে আসেন, তখন একবার এলাহাবাদে আসিয়াছিলেন। তখন এলাহাবাদবাসীরা তাঁহার যথোচিত সংবর্ধনা করিয়াছিলেন। আমি তখন তাঁহাকে একদিন আমার বাড়িতে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি সৌজন্য সহকারে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। তখন আমার বাসা ছিল কোঠা পার্চার একটি বাড়িতে। যে বারান্দায় যেখানে তাঁহাকে বসাইয়াছিলাম, তাহা আমার এখনও মনে আছে। আমার কন্যা দুটি তখন ছোটো ছিল। অথচ তাহারা যখন তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিল, তখন তিনি নিজেই আগে নমস্কার করিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহারা যখন আমাদের বাঙালি হিন্দুরীতিতে তাঁহাকে প্রণাম করিবার উপক্রম করিল, তিনি প্রণাম করিতে দিলেন না। তাঁহার আগমনে আমি যে খুব সম্মানিত হইয়াছি, একথা তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। কয়েক মিনিট মাত্র তিনি আমার বাসায় ছিলেন, কিন্তু সেই বিশ বৎসর আগের কথা তাঁহার মনে ছিল। দু-তিন বৎসর আগে তিনি হিন্দুসভা কর্তৃক আহূত হইয়া রেঙ্গুনে যান। সেখানে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে আমার কন্যা কল্যাণীয়া সীতাকে চিনিতে পারিয়া স্বয়ং তাহার

সহিত কথা বলেন। লালাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে সামান্য কথাও সংগ্রহের যোগ্য মনে করিয়া আমি সীতাকে বিশেষ বৃত্তান্তের জন্য লিখিয়াছিলাম। উত্তরে সীতা লিখিয়াছিলেন :

'লালা লজপৎ রায় এখানে হিন্দু মহাসভার নিমন্ত্রণে এসেছিলেন। কোথায় ছিলেন ঠিক বলতে পারি না। আমি তখন যে বাড়িতে ছিলাম তার ল্যান্ডলর্ড একজন মহারাষ্ট্রীয়, নাম মি. হালকর। তাঁরা একদিন লালাজীকে নিমন্ত্রণ করেন। তাতে আমিও গিয়েছিলাম। আমি ভাবি নি, তিনি আমাকে চিনতে পারবেন। কিন্তু তিনি নিজেই এসে বললেন, "I congratulate you on your excellent writing" আমেরিকায় থাকতে আমার লেখা পড়েছিলেন বললেন। এলাহাবাদে ছেলেবেলায় আমাদের দেখেছিলেন বললেন। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তুমি এক জায়গা থেকে কোথাও নড়ো না তাও বললেন। "Your father is never so happy as when left alone."

লালাজী যে আমার স্থাণুতার কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার ইউরোপ যাত্রার আগে। তাহার পর আমাকে কতকটা সচল হইতে হইয়াছে। লালা লজপৎ রায় 'মডার্ন রিভিয়ু'-এ নিজের নামে এবং 'ইজ্জৎ" ছদ্মনামে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি "The Evolution of Japan and other papers" নামক পুস্তকের আকারে বাহির হইয়াছিল। কয়েকটি প্রবন্ধ তাঁহার "United States of America : A Hindu's Impressions and a Study" নামক পুস্তকেরও অঙ্গীভূত হইয়াছিল। এই পুস্তকগুলির প্রকাশকও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় হইয়াছিলেন।

লালা লজপৎ রায় বিশেষ করিয়া আমেরিকা বাসকালে 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখিতেন। এই উপলক্ষে এবং অন্য উপলক্ষে তাঁহার সহিত *M. R.*-সম্পাদকের অনেক চিঠি লেখালেখি হইত। সে সমস্ত চিঠিতে কী ছিল এখন জানা যায় না। একটি চিঠির কথা জানি। ইংরাজদের ব্যবহৃত 'বেঙ্গলিবাবু' কথাটির প্রয়োগ লালাজীর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পুস্তকে দেখিয়া ইংরাজেরা এই শব্দের অপব্যবহার করিবার সুযোগ পাইবে ভাবিয়া *M. R.*-সম্পাদক তাঁহাকে এই বিষয়ে চিঠি লেখেন। চিঠিটির উত্তর দিবার সময় অন্যান্য কথার মধ্যে লালাজী লেখেন, "My own personal feeling towards the Bengalis is one of sincere gratitude and admiration" (সংক্ষেপে—তিনি স্বয়ং বাঙালিদের প্রতি কৃতজ্ঞ ও তাহাদের অনুরক্ত।) লালা লজপৎ রায়ের 'ইয়ং ইন্ডিয়া' নামক যে পুস্তক ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় মুদ্রিত হয় এবং বহু বৎসর ভারতে যাহার প্রচার নিষিদ্ধ থাকে তাহার ভূমিকার শেষে লালাজী ১৯১৬-র ১ মার্চ লিখিয়াছিলেন,

"Nor do I propose to discuss the fitness of Indians for immediate self-government, as that would largely add to the bulk of the book ; but for a brief and able discussion of the matter I may refer the reader to an article by the Editor in the *Modern Review* of Calcutta for February, 1916."

(সংক্ষেপে— ভারতবাসীদের এখনই স্বরাজ পাইবার যোগ্যতা বিষয়ে তিনি নিজে কিছু না লিখিয়া M. R.-সম্পাদকের ১৯১৬-র ফেব্রুয়ারির প্রবন্ধটি পাঠ করিতে বলেন।) 'মডার্ন রিভিয়ু'-সম্পাদকের সেই প্রবন্ধের শেষ কথাগুলির স্বীকৃত অনুবাদ দিলাম :—

"আমরা স্বশাসনের সম্পূর্ণ যোগ্য নহি, কোনো জাতিই নহে। আমরা স্বশাসনের একেবারে অযোগ্যও নহি, কোনো জাতিই নহে। অভ্যাস ও অনুশীলন দ্বারা যোগ্যতা বৃদ্ধি

পায়। আমরা ওই উপায়েই অধিক হইতে অধিকতর যোগ্য হইতে চাই ;—উহাই একমাত্র উপায়।"

আধুনিক ভারতবর্ষে সর্ববিধ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা রামমোহন রায় সর্বাগ্রে বুঝিয়াছিলেন। এইজন্য রামমোহন ছিলেন রামানন্দের আদর্শ। তাঁহার ধারণা ছিল রামমোহনের মতো প্রতিভা ও শক্তি না থাকিলেও লালাজীও এই প্রকারের সংস্কারক ছিলেন। লালাজীর জীবনে এই বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় যে, কেবল কোনো একদিকে সংস্কার জাতীয় উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নহে। এই কারণে এবং তাঁহার বহুমুখী শক্তি ও আদর্শ চরিত্রের জন্য লালাজীকে রামানন্দ বিশেষ সম্মান ও ভক্তি করিতেন।

মডার্ন রিভিয়ুকে এলাহাবাদ হইতে দূর করার চেষ্টা

'মডার্ন রিভিয়ু' প্রতিষ্ঠার নানা উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের চেষ্টা। এই উদ্দেশ্যে শাসক জাতির কোনো যুক্তিতর্কের বিরুদ্ধে লড়িতে যে সম্পাদক পিছপা হইবেন না তাহা প্রথম বৎসরের 'মডার্ন রিভিয়ু'র তেজোদৃপ্ত আবির্ভাব দেখিয়াই বুঝা যায়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতেই এলাহাবাদে বাঙালিরা এবং বাঙালিদের হিতাকাঙ্ক্ষীরা নানা সভাসমিতি ও বক্তৃতাদির উপদ্রবে আমলাতন্ত্রকে উত্ত্যক্ত করিতে শুরু করেন। প্রবাসী ও *M. R.*-সম্পাদকই এই আন্দোলনকারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। তিনি সভাসমিতি করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, আবার ইংরাজি কাগজে লড়িতে শুরু করিলেন। নেপালচন্দ্র রায় প্রবাসীতে লিখিয়াছেন, "সার জন হিউয়েট এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অভিসন্ধি ছিল কয়েকজন বাঙালিকে আদর্শ দণ্ড দিয়া তিনি সমগ্র বাঙালি সমাজের ভীতি উৎপাদন করিয়া আন্দোলন দমন করিবেন।" এই উদ্দেশ্যে কড়া শাসন শুরু হইল।

এই সময় হিউয়েট দণ্ডনীতির ফলে আগ্রা সেন্টজন কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক বেণীবাবুর উপর রোষ পড়িল। এক সময় আসিল এলাহাবাদ অ্যাংলো-বেঙ্গলি স্কুলের প্রধান শিক্ষক নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়ের পালা। তাঁহাকে স্কুল হইতে বিদায় করা হইল। নেপালচন্দ্র রায় বলিয়াছিলেন, "বলা বাহুল্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ই ছিলেন হিউয়েট দণ্ডনীতির প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু তিনি এমন দক্ষ রাজনৈতিকের মতো মন্তব্য লিখিতেন যে, তাঁহাকে ফাঁদে ফেলিতে সময় লাগিয়াছিল। অথচ তাঁহাকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে দূর করিতে না পারিলে সে দেশে স্বদেশী আন্দোলনের গোড়া কাটা যায় না।"

১৯০৮-এর 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে প্রথম কয়েক সংখ্যায় ব্রিটিশ রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়, কংগ্রেসের "Extreme Party"র পরাজয় বিষয়ে জানুয়ারি সংখ্যাতেই লেখা হয়—

> "Some people are jubilant at the supposed breakdown of nationalism. If by nationalism is meant the "Extreme Party", this is absurd. Nationalism is not a political party, engaged in playing one side of a game, in carrying out a definite limited programme, whether by tricks or otherwise. Nationalism, on the contrary, is a great idea,

to which a nation, amidst victory and defeat alike, is striving more and more to surrender itself. ... A political party may be outflanked for a moment The only answer will be the rolling up to the same point, of countless thousands more to-morrow, and their march onward, resistless and unfaltering to the goal. Differences of political party are merely so many mannerisms to people like those of India, determined to become a nation. .Have we not one interest? Are we not engaged in one struggle? Are we not children of a single immense civilisation, cradled in one sacred land? Nor is there any possible negation that could be offered to us. .. Like the rising of the Ocean in flood, to overwhelm a continent, is such an impulse felt by millions of men. As well try to shut out the tidal wave by rampart built of its own seashells as oppose to such an impulse any force that is known to man. Partition and sub-partition will but spread the area of the idea. Never in the history of the world has there been committed any aggression that did not end in raising up a greater force of resistance, to overwhelm it"

দলাদলির মোহে পড়িয়া দেশের মানুষ পাছে আপনাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্বাধীনতাকে ভোলে এবং শত্রুরা মনে করেন যে কার্য সিদ্ধ হইয়াছে, এইজন্য তিনি সর্বদা সজাগ থাকিতেন ও দেশবাসীকে সজাগ করিয়া দিতেন।

চরম ও নরমপন্থীদের মধ্যে সেকালের কংগ্রেসে যে উগ্র বিবাদ দেখা দিয়াছিল এবং যাহার ফলে ১৯০৭-এর সুরাট কংগ্রেসে মহা বিভ্রাট হয়, সেই বিবাদের তিনি চিরবিরোধী ছিলেন। পূর্ণ স্বাধীনতা এবং আপাতত ঔপনিবেশিক স্বরাজ্যের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতাই যে প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিকের কাম্য হওয়া উচিত, সে বিষয়ে তাঁহার মনে সন্দেহ মাত্র ছিল না। কিন্তু তিনি মনে করিতেন ভারতের প্রকৃত হিতকামনা মনে থাকিলে উভয় পক্ষের নেতারাই উভয় পক্ষের কার্যে সহায়তা করিতে পারেন। পূর্ণ স্বাধীনতা তিনি স্বয়ং চাহিতেন কিন্তু তিনি ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে যাঁহারা ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা চান, তাঁহারাও পরাধীনতা চান না, কিছু স্বাধীনতাই চান।

টিলক চরমপন্থী বলিয়া কংগ্রেসের সভাপতি হইতে পাইবেন না নরমপন্থীদের এই ইচ্ছার তিনি বিরোধী ছিলেন, আবার ডা. রাসবিহারী ঘোষ নরমপন্থী বলিয়া চরমপন্থীদের তাঁহাকে বাদ দিবার ইচ্ছাও তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি চাহিতেন প্রতি মানুষ এবং প্রতি দল যেন প্রতিপক্ষের মানুষ ও দলকে গালি না দিয়া নিজ নিজ সাধ্যমতো গঠনমূলক কিছু কাজ করেন।

১৯০৭-এর কংগ্রেসে দক্ষযজ্ঞের পরও তিনি বলেন, কংগ্রেসের কাজ সংযম ও গাম্ভীর্যের সহিত হওয়া উচিত, কিন্তু তাই বলিয়া একটা বড়ো গোলমাল হইলেই আমাদের আশা-ভরসা সব চিরকালের মতো নষ্ট হইল এমন মনে করিবার কারণ নাই। জগতে সব পার্লামেন্টেই মাঝে মাঝে বড়ো রকম গোলমাল হইয়াছে। তাই বলিয়া তাহারা স্বরাজের অযোগ্য প্রমাণিত হয় নাই। মানুষ সর্বত্রই মানুষ, তাহার তরুণ রক্ত গরম হইলে সে চিরকালের মতো অযোগ্য প্রমাণিত হয় না।

কংগ্রেস দুই দলে বিভক্ত হওয়াতে তিনি তাহার মধ্যেও ভালোটুকু দেখিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, ভারতের জাতীয়তার কার্যক্ষেত্র দ্বিগুণ হইতে পারিবে, যদি দুই দলই ঝগড়া ছাড়িয়া দেশের নানা কাজে শহর ও গ্রামের উন্নতিতে শরীর ও মনের পুষ্টি বিতরণে মন দেন।

> "We know that personal ambition and self-interest give rise to quarrels. But sterling patriotism, whose fire it ought to be the aim of every one of us to kindle in our hearts, leads to self-effacement and devoted service."

এইরূপ নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও সেবাই তিনি দেশনায়কদের নিকট চাহিয়াছিলেন, সেইরূপ ত্যাগী সেবককেই তিনি দেশনায়কের অর্ঘ্যদান করিতেন এবং স্বয়ং সেই পথেই আজীবন চলিয়াছেন।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাংলা দেশে বিশেষ করিয়া হিন্দুদের অনেক স্থলে পিউনিটিভ ট্যাক্স দিতে হইয়াছিল। ইহাতে তিনি এই ট্যাক্সকে "The British Jazia" বলিয়া আওরংজেবের জিজিয়া করের সহিত তুলনা করেন। আওরংজেব ছিলেন ধর্মান্ধ, ব্রিটিশগণ ব্যবসায়-অন্ধ (commercial bigots)।

বহু সংবাদপত্রের সম্পাদক ও মুদ্রাকরদিগকে সে সময় জেলে পাঠানো হইয়াছিল, কারণ তাঁহারা কড়া কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু জেলের ফলে কাহারও সুর নরম হইল না। *M. R.* -সম্পাদক বলিলেন, "The more you repress the people, the higher will their spirits rise."

সংবাদপত্রের আর-এক অপরাধ তাঁহারা পূর্ণ স্বাধীনতা চান। *M. R.* বলিলেন,

> "But who in his heart of hearts does not? Why not prosecute God Almighty for planting such an irrepressible desire for freedom in the human heart? Even the gallows, the cross, the stake and all the tortures that human ingenuity could devise have not in any age or country been able to crush it out of the human soul. Will a few years imprisonment succeed?"

ভারতীয়েরা মি. মর্লির শাসন-সংস্কারে খুশি না হওয়ায় মর্লি তাহাদের 'Impotent Idealists' বলিয়াছিলেন। মর্লির মতে তাঁহারা নির্বোধ শিশুর মতো চাঁদ ধরিতে চাহিতেছেন। ইহাতে M. R. মর্লির রাজনৈতিক মতামত ও দর্শন বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে দার্শনিক মর্লি Secretary of States হইবামাত্র জাদুবলে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেলেন।

> "The transformation of Dr. Jakyll of R. L. Stevenson's famous story was not more complete than that of Morley, the political philosopher ; and his entire change of front when called upon to practise what he has so eloquently preached, furnishes a most remarkable, though infinitely sad, illustration of the limitations of human nature."

১৯০৮-এর এই সময়ই কী একটু ছিদ্র পাইয়া কর্তৃপক্ষ হুকুম করিলেন, "হয় 'মডার্ন রিভিয়ু' বন্ধ করিতে হইবে, না হয় সম্পাদককে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এলাহাবাদ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে।" এক মুহূর্তে পট পরিবর্তন হইল। সম্পাদক স্বদেশে নির্বাসনদণ্ডই বরণ করিযা লইলেন। তাঁহার পুত্রদের কলিকাতায় শিক্ষা দিবার ইচ্ছা ছিল এবং স্বদেশে আবার বসবাস করিবার কল্পনাও মনে ছিল। সুতরাং সেই কারণগুলিই লোকে জানিল।

তৃ তী য় অ ধ্যা য়

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন

কাগজের পাতা হইতে আবার তাঁহার জীবনের ঘরোয়া কথায় ফিরিতে চাই। সে-বৎসর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার কথা। কলিকাতায় প্রেস আপিস ঘরবাড়ি কিছুই ঠিক নাই। হঠাৎ শিক্ষার ব্যবস্থাও সমস্ত বদল করা যায় না। কাজেই স্ত্রীপুত্রকন্যাদের ইন্দুভূষণ রায় ও নেপালচন্দ্র রায়দের ভরসায় এলাহাবাদে রাখিয়া রামানন্দ একলা কলিকাতায় ফিরিতে বাধ্য হইলেন। বারো-তেরো বৎসর এলাহাবাদ বাসের পর এলাহাবাদ তাঁহার দ্বিতীয় জন্মভূমির মতো প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার পূর্ণ যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি এই কর্মভূমির ও এ দেশের প্রিয় বন্ধুদের স্মৃতির সহিত জড়িত। তাঁহার দুইটি প্রিয় পুত্রকে এই দেশের মাটিতেই বিসর্জন দিতে হইয়াছিল। এখনই এ দেশ ছাড়িবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অঙ্গুলি-হেলনেই এই প্রিয় কর্মভূমিকে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। তবু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এলাহাবাদকে ভুলেন নাই। তাঁহার বন্ধু বামনদাস বসু যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি প্রতি বৎসরই এলাহাবাদ গিয়াছেন, পরেও বহুবার বসু-মহাশয়ের পুত্রের গৃহে অতিথি হইয়াছেন। জীবনের শেষ বৎসরও তিনি একবার এলাহাবাদ যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন।

পরিবারের সকলেরই যেন একটা দুঃখের দিন ঘনাইয়া আসিল। বাড়ির আসবাব ও জিনিসপত্র কিছু কিছু এ-বাড়ি ও-বাড়ি ভাগ করিয়া দেওয়া হইল, যাহা না লইলে চলে না তাহা রেলওয়ে ওয়াগনে আসিবে স্থির হইল। বালক-বালিকাদের শৈশবের প্রথম স্মৃতি যে দেশের জল-হাওয়া, মাটি-আলোর সহিত জড়িত তাহাকে চিরকালের মতো ছাড়িয়া যাইতে হইবে। শিকড়-ছেঁড়ার টান যেন বুকের ভিতর লাগিতেছিল। কলিকাতায় অজানা নূতন রাজ্যে কী করিয়া দিন কাটাইবে ভাবিয়া ভয়ে ও বেদনায় সকলেরই মন ভাঙিয়া পড়িতেছিল। আসন্ন বিদায়ব্যথায় পুরাতন ভৃত্যেরা মুখ মলিন করিয়া রহিল, কবে আবার তাহারা 'বাবুজি, মাজি' প্রভৃতিকে দেখিবে। গোয়ালিনী বলিল, "মাজি যদি নইনি পর্যন্ত যাইতেন তো দুধ দিয়া আসিতাম, কলিকাতা তো যাইতে পারিব না।"

ইন্দুভূষণ, নেপালচন্দ্র প্রভৃতিকে লইয়া দশ-বারো বৎসর ধরিয়া যে বৃহত্তর পরিবার গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ভাঙিয়া গেল।

যে কলিকাতায় বাল্যবন্ধুদের লইয়া পড়িতে আসিয়াছিলেন, যে কলিকাতায় শিবনাথ শাস্ত্রীর আদর্শ জীবনের প্রভাব যৌবনে সর্বাপেক্ষা অধিক অনুভব করিয়াছিলেন, যেখানে মানবসেবায় ও দেবতার পূজায় এক দিন আপনাকে সঁপিয়া দিয়াছিলেন, যেখানে 'ধর্মবন্ধু', 'Indian Messenger', 'সঞ্জীবনী', 'দাসাশ্রম', 'দাসী', 'মুকুল', সিটি কলেজ ও ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার সেবার প্রতীক ছিল সেই কলিকাতায় রামানন্দ ফিরিয়া আসিলেন। তবে

সে কলিকাতা তখন আর তেমন নাই। জীবনসংগ্রাম, বয়স ও শোক তাঁহার জীবনেও অনেক পরিবর্তন আনিয়াছিল।

রামানন্দের পুরাতন ছাত্র ও বন্ধু ভবসিন্ধু দত্ত মহাশয় কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গলির পাশে আর-একটি দ্বিতীয় গলির বাঁকে স্বর্গীয় বিপিনবিহারী রায়ের তিনতলা একটি ছোট্ট বাড়ি মাসিক ৪৫ টাকা ভাড়ায় ঠিক করিয়া দিলেন। প্রতি তলায় দুইখানি করিয়া মাত্র ঘর আর দুইটি করিয়া দেড় হাত দুই হাত চওড়া বারান্দা। ইহার পর পনেরো-ষোলো বৎসর এই ছোটো বাড়িটিই কলিকাতায় প্রবাসী অফিস বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এইখানে রামানন্দের সন্ধানে আসিতে কত জগদ্‌বিখ্যাত মানুষের পদধূলি, কত সাহিত্যসেবকের পদচিহ্ন এই গলিটির পথে বারে বারে পড়িয়াছে, এই নিরাড়ম্বর ক্ষুদ্র ঘরের কাঠের বেঞ্চিতে কত মহাপুরুষ আবার কত সাধারণ মানুষও জগদ্‌ব্যাপী মহাসমস্যার কথা এবং ক্ষুদ্র গৃহকোণের ক্ষুদ্র অভাবের কথা প্রবাসীর সম্পাদকের তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও মমতাপূর্ণ হৃদয়ের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়াছেন। ইউরোপেও এই "শীর্ণ গলিটি"র কথা রবীন্দ্রনাথের মনে পড়িত বলিয়া তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন।

বাংলা ১৩১৫ সালের ১৫ বৈশাখ মনোরমা দেবী এলাহাবাদ হইতে ছেলেমেয়েদের লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরীক্ষা ইত্যাদির জন্য তাঁহাকে আরও কিছুদিনের মতো এলাহাবাদে রাখিয়া আসিতে হইল।

এলাহাবাদের সিভিল লাইনসের তিন-চার বিঘা জোড়া বাগান ও বড়ো বড়ো ঘর দ্বার বারান্ডার সহিত এই ক্ষুদ্র বাড়িটির তুলনাই করা চলে না। কোঠা পার্চার বাড়িও নিতান্ত ছোটো ছিল না। কলিকাতায় উঠান নাই, বাগান নাই, চাকরবাকরের জন্য আলাদা ঘর নাই, তিন দিকে প্রতিবাসীদের বাড়ি ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়া আছে, সকাল বিকাল সাত-আট গৃহস্থের উনানের ধোঁয়ায় বাড়ি অন্ধকার হইয়া যায়। সেইটুকু স্থানেই বাস ও অফিস করা স্থির হইল। গলির উপর একতলার দুইখানি ঘরকে দেড়খানি বলা যায়। তাহার বড়ো ঘরটিতে হইল 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু' কার্যালয় এবং ছোটটি রহিল জিনিসপত্র রখিবার জন্য। তখন বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগত রাখিবার স্থান ছিল না। তবু অনেক সময় এই ছোটো ঘরটিতে পাড়ার কোনো ছেলে নিজ বাড়িতে স্থানাভাবের জন্য শুইতে আসিতেন। মাঘোৎসবের সময় ১০ মাঘ রাত্রে এই ঘর ও উপরের সরু বারান্ডাগুলি লোকে ভরিয়া যাইত, কেহ কেহ বা ছেলেমেয়েদের ঘরেই আশ্রয় লইতেন, ভোরবেলা রাত থাকিতে ব্রহ্মমন্দিরে ঢুকিবার আশায়। দূর হইতে আসিয়া ১১ মাঘ সকালে মন্দিরে স্থান পাওয়া যাইত না। ১০ মাঘ রাত্রে বাড়ির ছেলেরা সারারাত সুকুমার রায়, প্রফুল্ল গাঙ্গুলি প্রভৃতি বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধুদের সহিত কোলাহল করিয়া মন্দির সাজাইত, মেয়েরাও প্রায় অর্ধরাত্র তাহাই দেখিত, রামানন্দের নিজেরও ইহা বড়ো আনন্দের রাত্রি ছিল। সুতরাং বাড়ির লোকের ঘুমের ভাবনা ছিল না। কোনো কোনো বার প্রবাসী অফিসের ছোটো ঘরেও তিনি লোক শোয়াইবার ব্যবস্থা করিতেন। বাড়ির চারতলায় ছিল ছোট্ট একটি টিনের চাল দেওয়া ঘর। দেশ কিংবা বিদেশ হইতে আগত আত্মীয়দের যখন ক্ষুদ্র চারখানি ঘরের মধ্যে স্থান হইয়া উঠিত না, তখন এই ঘরেও অনেকে বাস করিতেন।

দোতলায় যে ঘরটি একটু বড়ো ছিল সেইটিই হইল গৃহকর্তার শয়ন, বিশ্রাম ও লিখনপঠনের স্থান। যে-সকল অভ্যাগতকে প্রয়োজন হইলে বাড়ির ভিতরে আনা চলিত, তাঁহারা এইখানেই দেখাসাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, অপর সকলের সঙ্গে নীচে অফিস ঘরেই

দেখা-সাক্ষাৎ হইত।

এলাহাবাদে সচরাচর তিন-চারি জন চাকর দাসী রাখিয়াই মনোরমা দেবীর চলা অভ্যাস ছিল। স্বামী চাকরি ছাড়িয়া দিবার পর কিছুদিন ইহার ব্যতিক্রম হইলেও ক্রমে আবার পূর্বের সব ব্যবস্থা ফিরিয়া আসিতেছিল। কিন্তু একে এই ওলটপালট তার উপর কলিকাতায় তখন সমস্ত খরচই এলাহাবাদের তুলনায় অনেক বেশি। সুতরাং এইবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া নিশ্চিত দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িতে হইবে মনোরমা দেবী ধরিয়া লইলেন। ইতিপূর্বে ঐশ্বর্যের মধ্যে না থাকিলেও দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি কখনো থাকেন নাই। নিজের জন্য কোনো শখের খরচ তিনি করিতেন না, ছেলেমেয়েদেরও মোটামুটি সাদাসিধা ভাবে রাখিতেন। স্বামীকে যাহাতে ঋণে না জড়িত হইতে হয় তাই তিনি এত সাবধানে চলিতেন। কিন্তু এই ব্যয়সংক্ষেপের কষ্ট তাঁহার জীবনে তাঁহাকে কোনো দুঃখই দিতে পারে নাই। তিনি আপনার প্রিয়জনদের শান্তি সম্মান ও শিক্ষাকে আর্থিক সুখের চেয়ে এবং বিলাস ঐশ্বর্যের চেয়ে অনেক বড়ো মনে করিতেন।

এলাহাবাদে থাকিতেই মনোরমা দেবী প্রবাসীর হিসাব প্রভৃতি মোটামুটি দেখিতেন ; এখন সংসারের সমস্ত কর্তব্যের উপর তিনি নিত্য অফিসের সমস্ত হিসাব দেখিতে এবং অন্যান্য যাবতীয় কাজ তদারক করিতে আরম্ভ করিলেন। হিসাব দেখা বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি খুব সতর্ক ছিল। প্রতিদিন পাঁচটার পর সুদক্ষ ম্যানেজারের মতো তিনি খাতাপত্র সমস্ত বুঝিয়া লইতেন, এতটুকু এদিক-ওদিক হইবার উপায় ছিল না। তখন অফিসে *M. R.*-এর কর্মচারী বলিতে বিশেষ কেহ ছিলেন না, একজন আত্মীয়কে রামানন্দ কাজ শিখাইয়া তৈরি করিতেছিলেন। প্রবাসীর খাতা লেখার মোটামুটি কাজ তিনি করিতেন, কিন্তু দেখাশুনার আসল কাজ নিজেদেরই করিতে হইত। ১৯০৮-এর আগস্ট মাসের 'মডার্ন রিভিয়ু'-এ আমেরিকায় মাসিকপত্রের লাভ বিষয়ে লিখিতে গিয়া সম্পাদক লিখিয়াছেন,

"We lost heavily during the first year, and the prospects are only a little better this year. And such is the financial condition of the most widely circulated illustrated English review in India, even though its proprietor-editor-manager is honorary, most of the contributors are honorary, all the Indian artists allow their paintings to be reproduced without any payment, and the editor has not engaged a single literary assistant to help him. ... All this does not mean that we are beaten. We are determined to succeed, and, God willing, shall succeed."

তখন 'প্রবাসী' কিংবা 'মডার্ন রিভিয়ু'-এর কোনো সহকারী সম্পাদক ছিলেন না। দুইটি কাগজের সম্পাদকীয় সমস্ত কাজই সম্পাদক একলা করিতেন অর্থাৎ প্রতি মাসে তিনি প্রবন্ধাবলী লিখিতেন, প্রুফ দেখিতেন, দেশি-বিদেশি কাগজ হইতে সংকলন করিতেন, পুস্তক সমালোচনা করিতেন এবং বাংলা ইংরাজি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ সমস্ত একাই নির্বাচন করিতেন। ছবি নির্বাচনও কিছু তিনি করিতেন। তবু 'মডার্ন রিভিয়ু' ঋণমুক্ত হয় নাই, লেখকেরাও সকলে টাকা পাইতেন না। এমনই এদেশে তখন কাগজ চালানোর অবস্থা। অথচ তখন ভারতে *Modern Review*-এর প্রচার ভারতীয় সমস্ত ইংরাজি কাগজ হইতে অধিক।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মনোরমা দেবী অফিসের হিসাব চেক করার কাজ করিয়া আসিয়াছেন। কলিকাতায় আসার কয়েক বৎসর পরে যখন অফিসে অনেক কর্মচারী নিযুক্ত হন তখন অনেকে তাঁহার এতটা কড়া তদারকে বিরক্ত পর্যন্ত হইতেন। একই কাজের জন্য

দুইবার বিল করিয়া টাকা লইবার চেষ্টা তিনি যে বার-দুই ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন ইহা জানি। রামানন্দ তাঁহার কন্যাদের বলিয়াছিলেন, "সে বড়ো কম টাকা নয়।" তিনি আরও বলিতেন, "তোমাদের মায়ের ঈশ্বরের উপর নির্ভর, সত্য ও ন্যায়ে অনুরাগ, দেশভক্তি ও স্বামীর উপর বিশ্বাস না থাকিলে পত্রিকা-পরিচালনরূপ ব্যয়সাধ্য ও সংকটবহুল কাজে আমি হাত দিতে পারিতাম না।"

১৩১৫ সালের বৈশাখের 'প্রবাসী' ও ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের 'মডার্ন রিভিয়ু' কলিকাতায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 'প্রবাসী' কিছুদিন পূর্ব হইতেই কলিকাতায় মুদ্রিত হইত, তবে তাহারও কার্যালয় ছিল এলাহাবাদে। 'মডার্ন রিভিয়ু' প্রথম ১৬ মাস এলাহাবাদের 'ইন্ডিয়ান প্রেস' হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল। চিন্তামণিবাবুর কার্য-নৈপুণ্য অসাধারণ ছিল বলিয়া সম্পাদকের পক্ষে কলিকাতার বাহিরেও কাজ নিখুঁত করার যথেষ্ট সাহায্য হইত। অবশ্য রঙিন ছবির হাফটোন ব্লক এলাহাবাদে তৈয়ারি হইত না, তাহা প্রসিদ্ধ শিল্পী উপেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয়ের কলিকাতার কারখানাতেই তৈয়ারি হইত। তখনকার দিনে ভারতবর্ষে হাফটোন ব্লক তৈয়ারি কার্যে উপেন্দ্রবাবুর চেয়ে নিপুণ শিল্পী কেহ ছিলেন না বোধ হয়। তাঁহারই কারখানায় কাজ শিখিয়া এখন অনেকে প্রসিদ্ধ ব্লক ব্যবসায়ী হইয়া উঠিয়াছেন। প্রবাসীর প্রথম বৎসরে (বাংলা ১৩০৮) G. N. Mookherjee নামক কোনো কোম্পানি কিছু কিছু ব্লক করিতেন। তার পর হইতেই ভালো হাফটোন ব্লক ইউ. রায় কোম্পানির দ্বারা তৈয়ারি হইত।

রামানন্দ স্বয়ং শিল্পী না হইলেও শিল্পীজনোচিত নিখুঁত সৌন্দর্যবোধ তাঁহার ছিল। ছবির রঙ বেশি ফিকা, বেশি গাঢ়, লাইনের অস্পষ্টতা, কোনো প্যাটার্নে (নকশায়) রঙ, রেখা, কিংবা মাপের ওজনের কমবেশি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কোনো পাতায় লেখার সহিত ছবি থাকিলে ব্লক আসল ছবির চেয়ে বড়ো হইবে কী ছোটো হইবে, কাগজের কতখানি স্থান জুড়িলে তাহা সুদৃশ্য হইবে, কোনো নকশার ভিতর লেখা থাকিলে কিসে চক্ষুপীড়াদায়ক হইবে, কিসে হইবে না, কোন্ মাপের পুস্তকে কী রকম অক্ষর মানাইবে এ-সব বিষয়ে তাঁহার আশ্চর্য সহজ জ্ঞান ছিল। এইজন্যই যখন তিনি পত্রিকাগুলি বহু চিত্রে অলংকৃত করেন, তখন শুধু ভালো ছবি, ভালো চিত্রকরই খোঁজেন নাই, ভালো ব্লকও যেন হয় সেদিকে প্রথম হইতেই লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত বাংলা ও ইংরাজি বইয়ের মলাটগুলি তিনি যেমন ঝরঝরে হাল্কা ও ঘন রঙের করিয়া প্রকাশ করিতেন আগে দেশি প্রকাশকরা কেহ তা করিতেন না। ভালো মলাট মানে তখন ছিল ফিকা রঙের রেশমি তোশকের ফোলা মলাট। তিনি লেখনী চালনার সময় যেমন স্পষ্টবাদিতা পছন্দ করিতেন, অনাবশ্যক বাহুল্য দেখিতে পারিতেন না, তেমনি বইয়ের মলাটে নাম স্পষ্ট করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং চেহারা পেটমোটা হয় নাই, ইহার দিকে নজর রাখিতেন। তাঁর দৃষ্টি এ-সব দিকে এত সূক্ষ্ম ছিল যে একজন নূতন বাড়ি তৈয়ারি করিবার পর তিনি বলেন, "বাড়িটা সুন্দর হয়েছে কিন্তু মাপের পক্ষে মোটা দেখাচ্ছে।" বাস্তবিক মাসিক পত্রিকা ও পুস্তকাদিকে বাহির ও ভিতর সকল দিক দিয়া নয়নানন্দকর করার কার্যে তিনিই এদেশে অগ্রদূত ছিলেন।

পত্রিকা দুইটিকে আদর্শ পত্রিকা করিবেন এবং সেইসঙ্গে তাহাদেরই সংসারযাত্রা নির্বাহের পথ করিবেন এই সংকল্প হইতে তিনি কলিকাতা আসিয়াও চ্যুত হইলেন না। তিনি যোগীর মতো এই সাধনায় আপনাকে ডুবাইয়া দিলেন। এলাহাবাদের মতো স্বাস্থ্যকর স্থান ছাড়িয়া কলিকাতার একটি শীর্ণ গলির ভিতর আশ্রয় লইয়া এবং দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রম

করিয়া তাঁহার সময় কাটিতে লাগিল। ভোরবেলা সূর্য উঠিবার আগেই তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন, কখন যে তিনি মুখহাত ধুইতেন তাহা বাড়িতে সেকালে কেহ কোনো দিন দেখিয়াছিল কি না জানি না ; তার পর সকালের প্রথম কর্তব্য ও আনন্দ ছিল গোলদীঘির ধারে কৃষ্ণকুমার মিত্র, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, ললিতমোহন দাস প্রভৃতি বন্ধুজনের সহিত দ্রুত ভ্রমণ। অমলচন্দ্র হোমের মতো বালকেরাও কখনো কখনো তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে যাইতেন। তিনি বালকদের সঙ্গে নিজ শৈশবের লীলাভূমি বাঁকুড়ার কথা, নিজ পিতার দৈহিক শক্তির কথা কিংবা অধ্যাপক টনি কী জগদীশচন্দ্রের কথা বলিতেন ; বয়স্কদের সঙ্গে কথা হইত বাড়ি খানাতল্লাস, জেলে যাওয়া প্রভৃতি সে যুগের নানা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের বিষয়। বাড়ি ফিরিয়াই আপনার একমাত্র কক্ষে বই কাগজ খাতার মধ্যে যেন ডুবিয়া যাইতেন। সমাজ পাড়ার প্রাঙ্গণে শিশুরা ও বালকেরা কোলাহল করিত, তাঁহার নিজের ঘরেই বাড়ির ছেলেরা হয়তো ফুটবল লইয়া দরজা, জানালা, টেবিল, চেয়ারে ফেলিত, কালি কাগজ ছড়াইয়া পড়িত, পাশের ঘরে ঝি রাঁধুনি উনানে ধোঁয়া দিয়া ঘরদ্বার মেঘাচ্ছন্ন করিয়া তুলিত, মনে হইত রামানন্দের কোনো ইন্দ্রিয় এইসব বাধা অনুভব করিতেছে না। তিনি তাঁহার বোঝাখানেক Year Book, Census Reoprt, Encyclopædia, ইংরাজি বাংলা দৈনিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজের স্তূপ, নবপ্রকাশিত নানা বিষয়ের অসংখ্য বই, লাল পেন্সিল, কাঁচি, কলম কাগজ ও সুতা লইয়া তন্ময় হইয়া আছেন। পঁচিশ-ত্রিশ খানা কিংবা তাহার চেয়েও বেশি সংখ্যক কাগজে চোখ বুলাইতে, ঠিক প্রয়োজনীয় জিনিসটুকু দেখিয়া লইতে এবং তাহাতে লাল ক্রস চিহ্ন দিতে তাঁহার কতক্ষণই বা লাগিত? কিন্তু ওই অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের কী জগতের কোনো উল্লেখযোগ্য সমস্যা কী ঘটনা কখনো তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না। রাজনৈতিক সমস্যাব কথা তো ছিলই, তাহার উপর শিল্পীর সৃষ্টি, বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার, প্লেগ, ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস, জাতীয় কিংবা পাশ্চাত্য শিক্ষা, শিল্প বাণিজ্যেব বাধা কি প্রসার, চাষীদের স্বার্থ, নারীর উন্নতি কি দুর্গতি, সংবাদপত্রসেবীদের দলাদলি, জাতিগত ও ব্যক্তিগত মহত্ত্ব, বীরত্ব কি হীনতা সমস্তই তিনি চক্ষের নিমেষে খবরের কাগজের পাতায় লক্ষ করিতেন এবং তাহার ভিতর কোন কোন বিষয়ে কী কী কথা কাগজে লিখিতে হইবে তাহাও তখনই স্থির করিয়া লইতেন। কী যুক্তি এবং কী নজির দেখাইয়া তর্কযুদ্ধে নামিবেন ইহা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে তাঁহাকে একবারও দেখি নাই। লিখিতে বসিয়াই সর্বাগ্রে চওড়া মার্জিন রাখিয়া সাদা কাগজের উপর নম্বর দিয়া যেন বিদ্যুৎগতিতে তিনি লিখিয়া যাইতেন। চিন্তার জাল টুটিয়া লেখনীর মুখে কথার স্বচ্ছ সহজ স্রোত সুযুক্তির খাত ধরিয়া নামিয়া আসিতে একবারও বাধা পাইত না, হোঁচট খাইত না। স্মৃতির ভাণ্ডারে অধীত বিদ্যা কী পূর্বতন লেখার খবরের জন্য তাঁহাকে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইত না, যাহা তিনি জানিতেন তাহা ঠিকই জানিতেন, যাহার সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিত তাহাও কোথায় পাওয়া যাইবে ভাবিতে দেরি হইত না। সকালের মতো লেখা হইয়া গেলে পরের পাতায় পৃষ্ঠাঙ্কটুকু লিখিয়া লইয়া তিনি নীচে চলিয়া যাইতেন। একবারের বেশি দুইবার কোনো লেখার পিছনে তাঁহার খাটিবার সময় ছিল না, অথচ নিজের অসাবধানতার জন্য কখনো তাঁহাকে অনুশোচনা করিতে হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। এমনই ছিল তাঁহার স্বভাবজাত ভ্রান্তিহীনতা। নীচে অফিস ঘরে একপালা চিঠিপত্র দেখা, মনিঅর্ডার সই করিয়া লওয়া, হিসাব-রক্ষককে উপদেশ দেওয়া এবং লেখকদের লেখার বান্ডিল বাছিয়া লওয়ার কাজও হইয়া যাইত। অফিস ঘরেই কত প্রবীণ ও নবীন লেখক, কত দেশ-বিদেশের খ্যাত

ও অজ্ঞাতনামা মানুষ তাঁহার সহিত দেখা করিতে অথবা শুধু তাঁহাকে দেখিতে, কাজের কথা বলিতে কিংবা কোনো সাহায্যের প্রত্যাশী হইয়া আসিতেন।

ইহার উপর স্নানের সময় নিজের কাপড়-চোপড় নিজে না কাচিলে তাঁহার পছন্দ হইত না। স্নানাহারের সামান্য সময়টুকুর পর তিনি একটু বিশ্রাম করিতেন বটে, কিন্তু আবার সেই সন্ধ্যা পর্যন্ত লেখাপড়ার কাজ। এই কাজের পর কোনো দিন থাকিত ব্রাহ্মসমাজে কার্যনির্বাহক সভা, কোনো দিন কোথাও স্বদেশি সভা কী অন্য সভা। না হইলে তিনি আবার সান্ধ্য ভ্রমণে যাইতেন এবং সেইসঙ্গে যে-সকল বন্ধুবান্ধবের খবর লওয়া কী কোনো সাহায্য করার প্রয়োজন থাকিত তাঁহাদের বাড়ি যাইতেন। রবিবারেও তাঁহার ছুটি ছিল না। যাহারা ভালো করিয়া ডায়েরি লেখে তাহারা যেমন দিনের প্রতিটি ঘটনা ও প্রতিটি চিন্তা ডায়েরির পাতায় লিখিয়া রাখে, তেমনই করিয়া তাঁহার দিনের সমস্ত কাজ, চিন্তা ও বন্ধুবান্ধবের সহিত আলোচিত কথা তিনি রাত্রে মনোরমা দেবীর নিকট গল্প করিতেন। এই গল্প করা তাঁহার জীবন-উপভোগের একটি অংশ ছিল। ইহা তিনি কর্তব্যবোধে করিতেন না।

ছাত্রসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ

সেকালে তাঁহার বাহিরের কাজের মধ্যে ছাত্রসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের কাজ দুটি উল্লেখযোগ্য। তিনি ছাত্রদের চিরসুহৃদ ছিলেন। শেষবয়সেও তাঁহার মধ্যে যে যুবজনোচিত অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞানস্পৃহা, সাহস ও শক্তির অফুরন্ত উৎস ছিল, তাহাতে তিনি যে চিরজীবন যৌবনের বন্ধু হইবেন তাহা বলাই বাহুল্য। প্রথম যৌবনে নিজে ছাত্রসমাজের ভিতর দিয়া জীবনের অনেক উচ্চ আদর্শের প্রেরণা পাইয়াছিলেন,* সুতরাং ছাত্রসমাজের কল্যাণ কামনা তাঁহার পক্ষে নূতন কিছু নয়। কলিকাতায় আসিবার এক বৎসরের মধ্যেই তিনি ছাত্রসমাজের সভাপতি হন। ১৯০৯, ১৯১২ এবং ১৯১৩—তিন বৎসর তিনি সভাপতি ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য ১৯১০-১১তে বোধ হয় বাদ দিয়াছিলেন। সে সময়ে দেশের ও বিদেশের কত সুবিখ্যাত মানুষ প্রতি শনিবারে ছাত্রসমাজে নানা বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিতেন, এখনও অনেকের মনে আছে। তাঁহাদের আদর্শবাদ বহু নবজীবন গঠন করিয়া তুলিয়াছিল। আজ যাঁহারা দেশের ছাত্রদের গুরুস্থানীয় তাঁহাদের জীবনের বহু উচ্চ আদর্শ ও জ্ঞানানুরাগ তাঁহারা অনেকেই এই ছাত্রসমাজ এবং বিশেষত ছাত্রসমাজের সভাপতির পরিচালিত পত্রিকাগুলি হইতেই পাইয়াছিলেন। তখনকার ছাত্রসমাজে শিবনাথ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রেভারেন্ড অ্যান্ডার্সন, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ, রজনীকান্ত গুহ প্রভৃতি প্রবীণ ও মধ্যবয়স্ক এবং সুকুমার রায় প্রভৃতি কত নবীন সুবক্তা এবং ব্রাহ্মসমাজের অন্য আচার্যেরা নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে বক্তৃতা করিতেন। ইহা ছাড়া ব্রাহ্মসমাজের কোনো উৎসবের উপলক্ষে কিংবা স্মৃতিসভা ইত্যাদিতে রামানন্দই কয়েকবার রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার আয়োজন করাইয়াছিলেন। ছাত্রসমাজের কাজও সেই একই হলে হইত, সুতরাং এইসব বক্তৃতাও ছাত্রদেরই জন্য হইত

* তিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যুর পর লেখেন :

"The Students Weekly Service, started and organised by him, helped to draw many young men (including the present writer) to the Brahmo Samaj."

বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের এক-একটি বক্তৃতায় ছাত্রদের এমন ভিড় হইত যে সুকিয়া স্ট্রিটের মোড় হইতে কালীতলা পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইত। ব্রাহ্মসমাজের হলের প্রত্যেক দরজা এবং জানালা দিয়া টপকাইয়া লোক ঘরে ঢুকিতে চেষ্টা করিত। ছেলেদের উৎসাহে অনেক সময় বক্তা স্বয়ং ঢুকিবার পথ পাইতেন না এবং স্বেচ্ছাসেবকেরা ধাক্কা খাইয়া হাত-পা ভাঙিতেন। সরোজিনী নাইডু, নারায়ণ চন্দ্রভারকর প্রভৃতির বক্তৃতাও মাঝে মাঝে হইয়াছে। বিদেশ হইতে 'বাহা' ধর্মের প্রচারকরাও দুই-একবার বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন মনে পড়ে। জগদ্‌বিখ্যাত লোকদের বক্তৃতায় ভিড় তো হইবে। কিন্তু সে সময় ছাত্রদের মধ্যে জ্ঞানের প্রতি ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল বলিয়া প্রতি সপ্তাহেই ছাত্রসমাজের সাধারণ বক্তৃতা শুনিতেও ছেলেরা হল ভর্তি করিয়া ফেলিত। এখন যেমন বড়ো বড়ো দেশসেবকদের স্মৃতিসভাতেও ডাকিয়া লোক পাওয়া যায় না, সেকালে সে-রকম ছিল না। সেকালের ছাত্ররা রাজনৈতিক সভাকেই একমাত্র সভা মনে করিত না এবং সিনেমার হলেই জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ খুঁজিত না। ধর্ম, সমাজহিতৈষণা, শিক্ষা, সাহিত্য সকল বিষয়েই তাহাদের উৎসাহ ছিল।

১৯০৯ হইতে ১৯২১ পর্যন্ত কয়েক বৎসরের মধ্যে মাঝে মাঝে কয়েক বৎসর বাদ দিয়া রামানন্দ ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহক সভায় কাজ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১৯১০-এ তিনি সমাজের সেক্রেটারি হন, কিন্তু অন্যান্য ক র্মীদের সহিত মতভেদ হওয়ায় তিন-চার মাস পরেই সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন।

১৯২২-এ তিনি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি হন। তিনি যে কয় বৎসর ব্রাহ্মসমাজের নানা কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ কাজে তাঁহার উৎসাহ অন্যান্য কর্মীদের অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। প্রেসের উন্নতিসাধন, শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনাবলী ও History of the Brahmo Samaj প্রকাশ, অনুন্নত জাতিদের উন্নতি বিধান, দুর্ভিক্ষ নিবারণ, শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি কাজেই তাঁহার উৎসাহ বেশি ছিল। কারণ আদর্শের প্রচার পুস্তকপুস্তিকা ও পত্রিকার সাহায্যেই স্থায়ী হয়।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মনে করেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাঙ্গণে যে ছোটো প্রেসটি ছিল সেই ব্রাহ্মমিশন প্রেসে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু' মুদ্রিত করিবেন। ইহা ব্রাহ্মসমাজের প্রেস ও সম্পত্তি। কিছুকাল পূর্বে এই প্রেসটি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে দান করেন। প্রেসটি রামানন্দের ঘরের দরজার কাছে ছিল ; তাহাতে কাগজ ছাপাইলে সারাদিন তদারক করা যাইবে এবং ব্রাহ্মসমাজের বেশ-কিছু আয় বাড়িবে এই মনে করিয়াই বোধ হয় তিনি নিজের কাগজ ব্রাহ্মমিশন প্রেসে ছাপাইতে চান। ইতিপূর্বে ওই প্রেসে অতবড়ো দুইখানি কাগজ ছাপাইবার স্বপ্নও কেহ দেখে নাই। তখন সে প্রেসে 'ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জার' ও 'তত্ত্বকৌমুদী' ছাপা হইত, আর হইত ব্রাহ্মসমাজের চিঠিপত্র, প্রোগ্রাম রিপোর্ট ইত্যাদির ছোটোখাটো কাজ। শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম ছিলেন মেসেঞ্জারের সম্পাদক এবং প্রচারক হেমচন্দ্র সরকারের ভ্রাতা শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার ছিলেন প্রেসের ম্যানেজার। রামানন্দের হাতে পড়িয়া এই প্রেস হইতে চৌদ্দ-পনেরো বৎসর শুধু যে নিয়মিত 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু' প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নয় ; এই প্রেস হইতেই তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীর History of the Brahmo Samaj-এর দ্বিতীয় খণ্ড ও আত্মচরিত, নিজ কন্যাদের বহু পুস্তক, Towards Home Rule এবং প্রবাসী-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত অন্যান্য অনেক বই ছাপাইয়াছিলেন। এই প্রেসের উন্নতি সম্বন্ধে রজনীকান্ত গুহ বলেন, "আমি জানি না,

কোন্ দৈবশক্তিবলে এই পত্রিকা-পরিচালক (রামানন্দ) চিরদিনের নিয়মবিরোধীকে (B. M. Press) নিয়মের নাগপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন।"

প্রেসের কাজ ভালো করিয়া চালাইবার জন্য রামানন্দ নূতন মুদ্রাযন্ত্র কিনিবেন ঠিক করিলেন। কিন্তু তাঁহার টাকা ছিল না, ব্রাহ্মমিশন প্রেসেরও টাকা ছিল না। তিনি তাঁহার দুই-এক জন বিশিষ্ট বন্ধুর নিকট ঋণ চাহিয়াছিলেন। বন্ধুরা বলিলেন, "আপনাকে যে টাকা দিব, বন্ধক দিবার মতো আপনার কী আছে?" কলিকাতায় অস্থাবর যাহা ছিল তাহার মূল্য ছয়-সাত হাজার টাকা হইতে পারিত না, এবং তাহা বন্ধক দেওয়া শোভনও ছিল না। কিন্তু রামানন্দ যে কার্যের ভার একবার লইতেন তাহার জন্য সকল চেষ্টার শেষ পর্যন্ত না গিয়া থামিতেন না। তিনি সমাজের কার্যনির্বাহক সভার নিকট ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মমিশন প্রেসের নাম করিয়া ৬০০০ টাকা ধার দিলেন। রামানন্দ বলিয়াছিলেন, "আমি ব্রাহ্মমিশন প্রেসকে ঋণমুক্ত করিয়া দিবার ভার লইতেছি।" ইহার পর ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে জুলাই হইতে 'মডার্ন রিভিয়ু' ব্রাহ্মমিশন প্রেসে ছাপা শুরু হইল। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে নিজ পত্রিকা দুইটির প্রদত্ত অর্থ দ্বারাই তিনি ব্রাহ্মমিশন প্রেসকে ঋণমুক্ত করিয়া দেন। তিনি ইচ্ছা করিলে নিজের নামে নূতন মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া ও তাহা বন্ধক রাখিয়া ঋণমুক্ত হইবার পর এইরূপে নিজের একটি মূল্যবান সম্পত্তি গড়িয়া তুলিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজেরই একটি সম্পত্তি গড়িয়া দিলেন। ঋণশোধের পর তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া তাঁহার নামে পত্র আসে :

"Dear Sir,
The Executive Committee having learnt with great pleasure that the amount of Rs. 6000/- which was advanced by the Samaj for the purchase of a new printing machine for the Brahmo Mission Press, has now been fully liquidated, I am directed to convey their best thanks to you for the responsibility you took in the matter.

I am yours truly,
Hara Kanta Bose,
Assistant Secretary."

সমাজের বাৎসরিক রিপোর্টে আছে,

"The Press promises to become a source of income to the Samaj. The best thanks of the Samaj are due to Mr. Ramananda Chatterjee to whose disinterested efforts and devotion the repayment of the loan within so short a time is entirely due."

কেবলমাত্র রামানন্দের নিঃস্বার্থ কর্মস্পৃহা এবং চেষ্টাতেই যে প্রেস ঋণমুক্ত হইয়া সমাজের আয় বৃদ্ধির উপায় হইয়াছিল রিপোর্টে তাহা স্বীকৃত হয়।

তাঁহার আর-একটি স্মরণীয় কাজ, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস প্রকাশ। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যখন ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ডে ছিলেন মিস কলেট তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস লিখিতে অনুরোধ করেন এবং সেই সংক্রান্ত অনেক কাগজপত্র দেন। শাস্ত্রী মহাশয় ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি কিছুদূর লিখিয়া ফেলিয়া রাখেন। যে রঙ্গভূমিতে তিনি স্বয়ং একজন বীর যোদ্ধারূপে দেখা দিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস স্বয়ং লিখিতে তিনি একটু সংকোচ বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু আনন্দমোহন বসু মহাশয় মৃত্যুকালে তাঁহাকে এই ইতিহাস লিখিবার জন্য আবার অনুরোধ করিয়া যান, সে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া শাস্ত্রী মহাশয়কে এই কার্যে বিশেষ উৎসাহ দেন। তিনি স্বয়ং ইহার প্রকাশক হইতে স্বীকার করেন এবং অন্যান্য প্রকারেও শাস্ত্রী মহাশয়কে সাহায্য করেন।

শাস্ত্রী মহাশয় বহুমূত্র রোগে তখন ভগ্নস্বাস্থ্য, সুতরাং অত বড়ো দুই খণ্ড পুস্তককে মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে উদ্ধার করা তাঁহার সাধ্য ছিল না। দুই খণ্ডের পাণ্ডুলিপি এবং প্রুফ ইত্যাদি সমস্তই রামানন্দ স্বয়ং দেখিয়া দিয়াছিলেন ; এই কার্যে এক খণ্ডে পৃথ্বীশচন্দ্র রায় ও অপর খণ্ডে সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে History of the Brahmo Samaj প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

রামানন্দ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। এলাহাবাদে থাকিতেই তিনি 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু'-এর জন্য তাঁহাকে দিয়া লিখাইতেন, কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাকে দিয়া Men I Have Seen লেখান। পরে তিনিই এই রচনাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া দেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেও তিনি কখনো কুণ্ঠিত হইতেন না। শাস্ত্রী মহাশয়ের বিখ্যাত আত্মচরিতও তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন।

ব্রাহ্মসমাজের উৎসব প্রভৃতিতে বালকবালিকাদের আনন্দের বিশেষ বেশি স্থান নাই। এইজন্য রামানন্দ সর্বদা দুঃখ করিতেন। পূর্বে মাঘোৎসবে বালকবালিকা সম্মিলন হইত, কিন্তু ভাদ্রোৎসবে হইত না। তাঁহারই চেষ্টায় ১৯২০ হইতে ভাদ্রোৎসবে বালকবালিকা সম্মিলন করার প্রথা প্রবর্তিত হয়। এই সকল বিষয়ে ১৯২০ ও তাহার কাছাকাছি সময়ে তিনি 'ইন্ডিয়ান মেসেঞ্জারে' লিখিতেন।

ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাংলা দেশের নানাস্থানের দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে যে কার্য হইত, তাহার একজন প্রধান সহায় ছিলেন রামানন্দ। তিনি ভারতের নানা প্রদেশের লোকদের বিশ্বাসভাজন ছিলেন বলিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসী, এমন কী কোনো কোনো ইংরাজও তাঁহাকে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য টাকা দিতেন। তাঁহাদের সাহায্যে রামানন্দ বহু সহস্র টাকা দুর্ভিক্ষ নিবারণের কার্যে তুলিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহার হাতে একাই দুই-তিন এমন কী পাঁচ-ছয় হাজার টাকাও দিয়াছিলেন।

কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের জীবনযাত্রা ও অফিস

কলিকাতায় আসিয়া ছেলেমেয়েদের পড়ার নূতন বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন হইল। জ্যেষ্ঠপুত্রকে কলেজে ভর্তি করার পর দুই কন্যাকে রামানন্দ বেথুন স্কুলে ভর্তি করিতে গেলেন। বেথুনে তখন হেডমাস্টার ছিলেন শ্যামাচরণ গুপ্ত মহাশয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কাজ ও আয় কী লিখিব?" রামানন্দ বলিলেন, "কাজ লিখুন Journalist, আর আয় তো আমার এখন কিছু নেই, তবে আমি মাসে যা খরচ করি, সেইটাকেই আয় বলে লিখতে পারেন।" তাহাই লেখা হইল।

মেয়েরা ইতিপূর্বে স্কুলে কখনো পড়ে নাই। পিতা যখন কন্যাদের হেডমাস্টার মহাশয়ের জিম্মায় রাখিয়া চলিয়া গেলেন, তখন তাহারা কিছু বলিল না বটে, কিন্তু এই সম্পূর্ণ অপরিচিত আবেষ্টনে পড়িয়া তাহাদের মুখের চেহারা বোধ হয় কিছু বদলাইয়াছিল। দিনান্তে কন্যারা যখন ফিরিয়া আসিল রামানন্দ মনোরমা দেবীকে বলিলেন, "আজ সারা দিন কোনো কাজে আমার মন লাগে নাই। আমি যখন ওদের ইস্কুলে রেখে চলে এলাম ওরা এমন করে তাকাল যে আমার মনটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল।" যাহারা কাতর দৃষ্টিতে তাকাইয়াছিল, তাহারা কিন্তু বেশিক্ষণ সে দুঃখের কথা মনে রাখিতে পারে নাই।

অশোক ভর্তি হইলেন ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুলে। ছোটো ছেলে মুলু তখন শিশু। তাহার বয়স

কম শুধু নয়, তাহার স্বাস্থ্যও ছিল অত্যন্ত খারাপ। সেইজন্য প্রথম দুই-এক বৎসর তাহাকে পড়াশুনা করাইবার কোনো চেষ্টা হয় নাই। ক্রমে মা ও দিদির নিকট সে বাংলা ও ইংরাজি প্রথম পাঠ শুরু করে। ছেলেমেয়েদের আনন্দবর্ধনের জন্য এলাহাবাদে রামানন্দ যে Royal Natural History-র মোটা মোটা কয়েক খণ্ড কিনিয়া দিয়াছিলেন তাহার পাতায় পাতায় সিংহ, হাতি, টেপির, ময়ূর, ফেজান্ট প্রভৃতির উজ্জ্বল রঙিন ছবি দেখিয়া তাহার অনেক সময় কাটিত।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগ তখনও চলিতেছে। প্রতি বৎসর রাখীবন্ধনের দিন রামানন্দ ও মনোরমা পুত্রকন্যাদের সকলকে লইয়া উপবাস করিতেন, বাজার হইতে রেশম কিনিয়া আনিয়া বাড়িতে রাখী তৈয়ারি করা হইত, মনোরমা দেবী ও তাঁহার পুত্রকন্যারা সেই রাখী লইয়া পাড়ায় স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে সকলকে বাঁধিয়া বেড়াইতেন। রামানন্দ পূর্বের মতো ডাকে অনেক জায়গায় রাখী পাঠাইতেন।

স্বদেশী প্রচার করিবার জন্য একবার বোধ হয় অমৃতলাল গুপ্ত, ভবসিন্ধু দত্ত ও একজন মুসলমান ভদ্রলোক বাঁকুড়ায় রামানন্দের এক বাসা-বাটিতে অতিথি হইয়াছিলেন। ভদ্রলোকদের আহারাদির পর চাকরেরা বলিল, "আমরা মুসলমানের এঁটো মাজব না।" মনোরমা দেবী বলিলেন, "তোমরা না মাজ মেজো না, আমি মাজছি।" এই বলিয়া তিনি নিজেই বাসনগুলি তুলিয়া লইলেন। ইহার বিষয় অমৃতলাল গুপ্ত লিখিয়াছিলেন, "আমরা স্বদেশী আন্দোলনের জন্য যখন বাঁকুড়ায় প্রবাসী-সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ রামানন্দবাবুর গৃহে উপস্থিত হইলাম, সেখানে তিনি উক্ত বন্ধুকে ঠিক আপনার আত্মীয়ের ন্যায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সোলেমান পত্রিকার লেখক মোহাম্মদ হোসেন।"

স্বদেশীর সময় ১৯০৮-এ 'মডার্ন রিভিয়ু'তে রামানন্দ এক জায়গায় লেখেন, "এখন বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা হইলেই তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন আপনি কবে জেলে যাইতেছেন? কিংবা, কবে আপনার বাড়ি খানাতল্লাস হইতেছে?" তাঁহার মতো দেশভক্ত ও স্পষ্ট বক্তার জেল যে হয় নাই ইহাই আশ্চর্য। বাস্তবিক তখন স্বদেশভক্তদের বাড়ি খানাতল্লাস ও তাঁহাদের জেলে পাঠানো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। একদিন সঞ্জীবনী অফিস খানাতল্লাসি হইল, খবর শুনিবার পর প্রবাসী-সম্পাদক তাহা দেখিতে গেলেন। যে পরিমাণ ধূলি ছেঁড়া কাগজ ও মাকড়সার জাল প্রভৃতি পুলিসেরা স্তূপ করিয়াছিল তাহাতে বাড়ি পরিষ্কারের কাজ ভালোই হইয়াছিল বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন এবং বলেন, যদি মানুষের সময় এবং কাজ নষ্টের জন্য কিছু ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাইত এবং পুলিস এইসঙ্গে চুনকামটাও করিয়া দিত তাহা হইলে সব স্বদেশীরাই নিজ নিজ গৃহ খানাতল্লাসি করিবার জন্য পুলিসসাহেবকে বলিয়া পাঠাইত।

এমনই সময় সম্ভবত ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে একদিন বাড়িতে একটা উৎসবের আয়োজন হইতেছে, হঠাৎ খবর আসিল কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি বারোজন দেশভক্তকে নির্বাসিত করা হইয়াছে। উৎসবের সমস্ত আয়োজন পণ্ড হইয়া গেল, কলিকাতার সকল দেশভক্তের গৃহের মতো কিংবা তাহার চেয়ে বহু অধিক পরিমাণ বেদনার ছায়া যেন এই গৃহে নামিয়া আসিল।

সেইদিন হইতে কৃষ্ণকুমার মিত্রের পরিবারের প্রতিদিন খবর লওয়া, তাঁহাদের আয়বৃদ্ধির জন্য পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি সমস্ত কাজ রামানন্দ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিলেন। তিনি রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আত্মচরিতটি এই সময় নিজে প্রকাশক হইয়া ছাপাইয়া দেন।

ইহার পাণ্ডুলিপি বোধ হয় কৃষ্ণকুমারবাবুর জ্যেষ্ঠাকন্যা কুমুদিনী মিত্রের সম্পত্তি ছিল। ইহার আয় সম্ভবত তখন পরিবারের কাজে লাগিয়াছিল, কারণ যাহারা তাঁহার স্বামীকে বন্দী করিয়াছে সেই সরকারের নিকট কৃষ্ণকুমারের সহধর্মিণী আর্থিক সাহায্য লইতে রাজি হন নাই! ইঁহাদের আত্মীয় অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের Hero and the Nymph-এরও তিনি বোধ হয় এই সময় প্রকাশক হন। লেখকের যাহাতে কিছু উপকারও তিনি করিতে পারেন এই ইচ্ছাতেই বইটি ছাপাইয়াছিলেন।

রামানন্দের এই সময় গ্রেপ্তার ও বিচারাধীন হইবার সম্ভাবনাও বহুবার হইয়াছিল। হঠাৎ যখন-তখন হুমকি আসিত, এক-একদিন শোনা যাইত, আজই খানাতল্লাসি হইবে, কালই গ্রেপ্তারের পরওয়ানা আসিবে। অমনি বাড়িতে দুই-একটা গহনা ইত্যাদি যা ছিল সব মেয়েদের পরাইয়া রাখা হইত, অন্য মূল্যবান জিনিস পাশের বাড়ি সরাইয়া রাখা হইত। কিন্তু মনোরমা দেবী স্বামীরই মতো অটল ছিলেন, ভয়ে বিচলিত হইতেন না। সত্য কথা বলিয়া বা লিখিয়া তাহার ফলের সম্মুখীন হইতে না চাওয়াকে তিনি ভীরুতা বলিয়া ঘৃণা করিতেন। বন্ধুবান্ধব সাজিয়া পুলিস প্রায় দিবারাত্রি রামানন্দের উপর কড়া পাহারা রাখিত, শোনা যায় প্রতিবেশী হিসাবেও মাঝে মাঝে দীর্ঘদিন গোয়েন্দার আবির্ভাব হইত, কেহ কেহ বলিতেন রাত্রে বাড়ির সম্মুখে একজন সারারাত বসিয়া থাকিত। অন্যভাবে পুলিসের নজরেরও পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার ডাকের সব চিঠিপত্র খুলিয়া আবার জোড়ার চিহ্ন দেখা যাইত, প্রায় কোনো চিঠিই ঠিক সময়ে পৌঁছাইত না, জবাবও সেইমত দেরি করিয়া যাইত। কোনো কোনো চিঠি চিরদিনের মতোই অন্ধকারে তলাইয়া গিয়াছে।

১৯০৭-এর শেষে সুরাট কংগ্রেস হইতে রামানন্দ পীড়িত হইয়া আসেন। তাঁহার রোগ সারিলেও শরীরের দুর্বলতা সারে নাই। তাহার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিল ভীষণ পরিশ্রম ও নানা দুশ্চিন্তা।

১৯১০-এ এই সব কারণেই বোধ হয় তিনি আবার পীড়িত হইয়া পড়েন। ডা. নীলরতন সরকার মহাশয়ের পরামর্শে তাই তিনি গরমের পূর্বেই দার্জিলিং গেলেন। তিনি তথায় গিয়া শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা ও ডা. বিপিনবিহারী সরকারের পত্নী হেমলতা দেবীর বাড়িতে উঠিলেন। গ্রীষ্মের ছুটির পর বাড়ির অন্য সকলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিব্বত-পর্যটক শরৎচন্দ্র দাসের 'লাসা ভিলা' নামক বাড়ির পিছনে 'ডেজি ব্যাঙ্ক' নামে একটি ছোটো বাড়ি ছিল। তখন এই বাড়িটি হইল তাঁহাদের আশ্রয়। এখান হইতে ভোরে ক্যান্টনমেন্টের বিউগল শোনা যাইত। তখনই সকলে বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িতেন। কখনো নীচের দিকে ব্লুমফিল্ডের চা বাগানের নিম্নগামী রাস্তায় যাওয়া হইত। সে পথে ফার্নের গাছ অসংখ্য। তাহাদের ছবির মতো চেহারা, মন্দিরের মতো আকৃতি, সোনালি রুপালি সবুজ নানা রঙ সকলকে মুগ্ধ করিত। মাথার উপর দিয়া মেঘ চুলে বিন্দু বিন্দু মুক্তার মতো বারিবর্ষণ করিয়া চলিয়া যাইত। রামানন্দ বালক-বালিকাদের সঙ্গে সমানে সেই সব অভিনব আনন্দ উপভোগ করিতেন। কখনো উপর দিকে ক্যান্টনমেন্টের পথে যাওয়া হইত। পথ ভুলিয়া একবার ক্যান্টনমেন্টের বেশি কাছে যাইয়া পড়াতে কয়েকটি শ্বেতাঙ্গ সৈনিক ঢিল কুড়াইয়া ছুড়িয়া মেয়েদের মারিতে যায়। তাহা দেখিয়া মনোরমা দেবী হাসিয়া বলিলেন, "ওই দেখো, ওরা আমাদের ঢিল মারবে।" মেয়েরা ভয় না পাইয়া হাসাতে গোরাগুলি অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া গেল।

একদিন সন্ধ্যায় বেড়াইয়া ফিরিবার পথে শোনা গেল স্টেশনে অশোক ও মুলুকে পুলিসে

ধরিয়াছে। তাহা শুনিয়া রামানন্দ স্ত্রীকন্যাদের বাড়ি ফিরিতে বলিয়া নিজে স্টেশনে গেলেন। স্টেশন মাস্টার বলিলেন, "এই বালক দুইটি সাইডিঙে একটা গাড়িতে চড়িয়া তাহার ব্রেক খুলিয়া দেওয়াতে গাড়িটা ধাক্কা খাইয়া ভাঙিয়া গিয়াছে।" তখন অশোকের বয়স ১০।১১ এবং মুলুর বয়স ৫।৬। কথা শুনিয়া রামানন্দের বিশ্বাস হইল না। তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা বলিল, "আমরা গাড়ি চড়িয়াছিলাম বটে, কিন্তু ব্রেক যে কী করিয়া খুলিল জানি না।" যাহাই হউক নিতান্ত ছোটো ছেলে বলিয়া স্টেশন মাস্টার তাহাদের ছাড়িয়া দিলেন। রামানন্দ বাড়ি আসিয়া বলিলেন, "উহারা ছেলেদের কানে ঘুসি মারিতে বলিয়া ছাড়িয়া দিল।" পরে জানা গেল অন্য আর-একটি বালক ইহাদের গাড়িতে চড়াইয়া ব্রেকটা খুলিয়া দিয়া পলাইয়াছিল।

প্রত্যহ বেড়াইয়া ফিরিবার পথে বাজার হইতে মাছ ও মিষ্টি কিনিয়া ফেরা হইত। ছেলেমেয়েদের প্রচণ্ড ক্ষুধার গল্প রামানন্দ বৃদ্ধবয়সেও করিতেন : "ওদের মা মাছ এনে ভাজতে দেবার আগেই ওরা খেতে চাইত, ভাত খাবার অনেক আগেই মাছ মিষ্টি খাওয়া হয়ে যেত।"

'লাসা ভিলা'র দোতলায় অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার তখন তাঁহার দুইটি ছাত্রকে লইয়া থাকিতেন। রামানন্দ গল্প করিতেন, "অধ্যাপক মহাশয় তাঁর ছাত্রদের রামায়ণ ও মহাভারতের যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু পড়তে দেন না শুনেছি। তিনি নাকি সেন্টিমেন্টাল জিনিস পড়া ভালোবাসেন না।" অবশ্য ইহা লাসা ভিলার অন্যান্য অধিবাসীদের নিকট শোনা গল্প।

স্বর্গীয় ডা. বিপিনবিহারী সরকার ও তাঁহার পত্নী হেমলতা দেবী তখন দার্জিলিঙে আতিথ্যের জন্য বিখ্যাত। তাঁহারা এই পরিবারের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিযাছিলেন। হেমলতা দেবীর ছোটো মেয়ে দুটির একটা কাজ ছিল লোক দেখিবার জন্য পথের ধবে দাঁড়াইয়া থাকা। রামানন্দকে সেই পথে যাইতে দেখিলেই তাহারা তাঁহার দুই হাত ধরিয়া টানিয়া চেঁচামেচি করিয়া বাড়ির ভিতর লইয়া গিয়া তবে ছাড়িত। সর্বকনিষ্ঠাটি ছিলেন ইঁহার বিশেষ বন্ধু। বহু বৎসর এই বালিকাকে নিয়মিত চিঠি লেখা রামানন্দের একটি কাজ ছিল। সে যখন ৬।৭ বৎসরে মেয়ে তখন হইতে তাঁহাদের এই বন্ধুত্বের সূত্রপাত।

এই সময় তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য এবং পরেও তাঁহার কাজের সাহায্যের জন্য 'প্রবাসী'র একজন সহকারী সম্পাদক রাখার কথা হয়। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কলিকাতায় ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসে কাজ করিতেন। রামানন্দের আহ্বানে তিনি প্রবাসী কার্যালয়ে আসিলেন। চারুচন্দ্র লিখিয়াছেন, তিনি ১৯১১তে 'প্রবাসী'র কাজে যোগদান করেন। ইহা ১৯১০ হওয়াই সম্ভব। তিনি যতদিন প্রবাসী অফিসে কাজ করিয়াছিলেন ততদিন এই পরিবারের সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তেরো-চৌদ্দ বৎসর কাজ করিবার পর তিনি ঢাকা চলিয়া যান। প্রবাসী অফিসে সহকারী সম্পাদক নিয়োগের পর হইতে সমাজপাড়ার একতলার ছোটো ঘরটি হইল সহকারীদের অফিস, বড়ো ঘরটিতে কাগজ বিক্রি, হিসাবরক্ষা, বই বিক্রি ইত্যাদি কাজ চলিত।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'প্রবাসী'র একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন, তিনি চারুবাবুর খুব বন্ধুও ছিলেন। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন তাঁহার আর-একজন বিশেষ বন্ধু। সত্যেন্দ্রনাথ ও মণিলাল প্রায় প্রত্যহ 'প্রবাসী' অফিসে আসিতেন। ওই ছোটো ঘরটি শুধু যে অফিস ছিল তাহা নয়, ঘবটি তাঁহাদের কয় বন্ধুর বৈঠকও ছিল। কিছুকাল পরে 'জাপান'-লেখক সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধায়ও কিছুদিন 'প্রবাসী' এবং 'মডার্ন রিভিয়ু'র কাজ করিয়াছিলেন।

তিনিও এই লেখক বন্ধুগোষ্ঠীর একজন ছিলেন।

যখন হইতে (১৯১৩) ব্রাহ্মমিশন প্রেসে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু' ছাপা হইতে শুরু হইল, তখন হইতে বাংলা ও ইংরাজি মাসের শেষে সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক সন্ধ্যাবেলা আলো জ্বালিয়া প্রুফ দেখিতেন এবং ক্রমাগত প্রেসে ও অফিসে ঘোরাঘুরি করিতেন। মাসের এই দুটি সপ্তাহে মহা ব্যস্ততা লাগিয়া যাইত। অনেক সময় সহকারীদের আহারের সময়ও গোলমাল হইয়া যাইত, কিন্তু কাগজ ঠিক সময় বাহির হইত। মনে করিলে আশ্চর্য লাগে যে যখন কোনো সহকারী ছিলেন না এবং বাড়ির দরজায় প্রেসও ছিল না তখন রামানন্দ একলার চেষ্টাতেই এই দুইটি কাগজ এই রকম নিয়মিতই প্রকাশ করিতেন। ক্রমে অফিসের ওই ক্ষুদ্র কক্ষে চারিজন সহকারীর স্থান হইল।

অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জেল হইতে ফিরিবার পর কলিকাতায় সিটি-কলেজের অধ্যাপক হইয়া আসেন। তিনি কলেজের ছেলেমেয়েদের অনেককে বাড়িতে গৃহশিক্ষকরূপেও পড়াইতেন। কিছুদিন তিনি এই বাড়ির ছেলেমেয়েদের অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষক ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁহার সহিত এই পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। সতীশচন্দ্র সুরসিক ছিলেন, অসংখ্য গল্পের পুঁজি তাঁহার ছিল। তিনি অনেক সময় ছুটির দিনে আসিয়া মেয়েদের ইকমিক কুকারে খিচুড়ি রাঁধিতে শিখাইতেন, তার পর সকলে সঙ্গে নিজেও খাইতেন এবং সারাদিন নানা গল্পে দিন কাটাইতেন। তাঁহার ছাত্রপ্রীতি, বলিষ্ঠ দেহমন ও স্বদেশভক্তি তাঁহাকে বহু ছাত্রছাত্রীর প্রিয় করিয়াছিল। অল্পদিনেই তিনি রামানন্দের অনুরক্ত ও গুণমুগ্ধ হইয়া উঠেন।

সমাজপাড়া

রামানন্দ স্বল্পবাক ছিলেন। কিন্তু তবু সমাজপাড়ার শিশুরা তাঁহাকে আপনার জনের মতো ভালোবাসিত। তিনি যখন কর্মে ব্যস্ত থাকিতেন তখন অকস্মাৎ হয়তো মাঝে মাঝে অফিস ঘরে কোনো শিশুর আবির্ভাব হইত। জিজ্ঞাসা করিতেন, "কী চাই তোমার?" হয়তো দেখা যাইত সে কোনো নালিশ লইয়া আসিয়াছে, বলিত, "দেখুন অমুক কেন আমার গানটি করবে? আপনি ওকে বারণ করে দিন।" তাঁহাকে একটা কিছু বিচার করিয়া দিতে হইত। এক দলের প্রত্যহ স্ট্যাম্প চাই। কাহাকেও বেশি না দেওয়া হয়, কাহাকেও অন্যের চেয়ে ভালো না দেওযা হয় এদিকে নজর রাখিয়া বিতরণ করিতে হইত। বিদেশ হইতে স্ট্যাম্প চাহিয়া পাঠাইবার লোকেরও অভাব ছিল না। স্ট্যাম্প ছবি বই চাহিবার লোক যেমন অনেক ছিল, উপহার দিবার লোকও সেই রকম কিছু ছিল। শিশুরা কেহ একটি ছোলা-ভাজা কেহ মশলা কি আর কিছু দিয়াই খুশি।

তিনি ৪৩ বৎসর বয়সে সমাজপাড়ায় আসেন। কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধ বন্ধুরও অভাব ছিল না। বৃদ্ধ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সহিত প্রেততত্ত্বের আলোচনা করিতেন, বলিতেন, তিনি রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির আত্মার সহিত কথা বলেন, তাঁহার মৃতা পত্নীও নাকি তাঁহার নিকট প্রতিদিন আসিতেন। একবার নগেন্দ্রবাবু রামমোহনের জবানীতে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া আনেন, তিনি সেগুলি 'প্রবাসী'তে ছাপিতে বলেন। ছাপিবার ইচ্ছা থাকিলেও রামানন্দ কয়েকটি বিশেষ কারণে সেগুলি রামমোহনের নাম দিয়া ছাপিতে রাজি হন নাই। বোধ হয় পরে সেগুলি দেবীপ্রসন্ন রায়ের "নব্য ভারত" পত্রে

প্রকাশিত হয়। নগেন্দ্রনাথের বজ্রগম্ভীর সুন্দর কণ্ঠস্বর যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাকে ভুলিবেন না।

গুরুচরণ মহলানবিশও রামানন্দের এইরূপ আর-একজন বৃদ্ধ বন্ধু ছিলেন। তিনি বয়সে ইঁহার পিতার বয়সী হইলেও এই পুত্রস্থানীয়ের সহিত সাংসারিক সামাজিক পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বহু বিষয়ে আলোচনা করিতেন। পুরাকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধনাশ্রমের একটি দোতলা রঙিন কাঠের বাড়ি ছিল। তাহারই সম্মুখে ছিল একটি বাঁধানো রোয়াক। সেই রোয়াকে সন্ধ্যার অন্ধকারে অনেক সময় ইঁহাদের দুইজনকে বসিয়া গল্প করিতে দেখা যাইত। সেই কাঠের বাড়িটির স্থান অধিকার করিয়া এখন 'শিবনাথ মেমোরিয়াল হল' উঠিয়াছে।

প্রবাসী অফিসের পাশের বাড়িতে তখন তিনতলায় থাকিতেন পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সপরিবারে। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী কাদম্বিনী দেবী সুগায়িকা ছিলেন। সেকালে কলিকাতায় এত সংগীত-বিদ্যালয় ছিল না। ইঁহাদের মতো গায়িকারা অনেক ছাত্রীদের বাড়িতে গিয়া গান শিখাইতেন। তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নীচের তলায় 'দোতলায়' থাকিতেন সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়িটা তাঁহারই ছিল, কিন্তু তিনি দেবালয় নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন উদ্দেশ্যে বাড়িটি দান করিয়াছিলেন। একতলায় দেবালয় গৃহ ছিল। সেই গৃহের একদিকে ছিল লাইব্রেরি এবং আর একদিকে উপাসনা ও বক্তৃতাদির স্থান। দেবালয়ে বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা, সুন্দরীমোহন দাসের 'নৌকাবিলাস' প্রভৃতি কথকতা, New Thought-প্রচারক আমেরিকান মহিলাদের বক্তৃতা ও পুস্তিকা বিতরণ, মহারানী সুনীতি দেবীর কথকতা, হীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তৃতা, এবং বৈষ্ণব ভক্তদের পাঠ ও মালপোয়া বিতরণ মাঝে মাঝে হইত। অন্যান্য অনেক বক্তা, গায়ক ও কথকদের কথাও নিয়মিত হইত। দুইবার ইঁহারা রবীন্দ্রনাথকেও আনিয়াছিলেন। বিখ্যাত লোকদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পালকেই বেশি দেখা যাইত।

'দেবালয়'-এর পাশের বাড়ি ছিল 'নব্য ভারত'-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর। তাঁহার বাড়িতে আশ্রিত পালিত আত্মীয়স্বজন অনেকে থাকিতেন, তদুপরি প্রেস এবং কাগজের অফিসও এইখানে ছিল। দেবীবাবু খুব হিসাবী ও মিতব্যয়ী ছিলেন। এই পাড়ার ছোটো ছেলেমেয়েদের সব বাড়িতেই অবাধ গতিবিধি ছিল, সকাল-সন্ধ্যায় মন্দিরের সিঁড়িতে, প্রাঙ্গণে, দেবালয়ের গলিতে ও দরজায় তাহাদের খেলার ও গল্পের স্থান ছিল, ক্লাবের জন্য ঘরভাড়া কী চাঁদা তোলার প্রয়োজন হইত না। তবে গল্প করা ছাড়া অন্য কাজেও মানুষের উৎসাহ থাকে। নামের মোহ, খাতায় নাম লেখার মোহও মানুষের আছে, কাজেই এখানেও কয়েকটি ছোটো বড়ো কাজের এবং নাম লেখানো সমিতি ছিল। একটি শিশু সমিতি ; সে সমিতির কাজ অনেক সময় দেবালয়ের ঘরে হইত। সমিতির সভ্যেরা ছোটো ছোটো নাটিকা দক্ষতার সহিত অভিনয় করিত। আর একটি ছিল 'বাল্য সমাজ'। রবিবার রাত্রে মন্দিরে উপাসনার সময় ছোটো ছেলেমেয়েদের জন্য এই বাল্য সমাজের অধিবেশন হইত। বাল্য সমাজের প্রধান কাজ ছিল ছেলেমেয়েদের গল্প বলা ও গান করানো। ছোটো প্রার্থনাও হইত। পাড়ার বড়ো মেয়েরা গল্প বলিতেন ; এক-একজনের গল্প বলায় ছেলেরা এত মুগ্ধ হইত যে তাঁহাদের পালার দিন ঘর ভরিয়া যাইত। বাল্য সমাজের প্রাইজও বৎসরে একবার হইত। তাহাতে বড়ো বড়ো লোককে প্রেসিডেন্ট করা হইত, অভিনয়, খাওয়া-দাওয়া, পুরস্কার বিতরণ কিছুর ত্রুটি ছিল না। মুলু ও অশোক অভিনয়ে যোগ দিতেন। মুলুর ভালো অভিনেতা বলিয়া নাম ছিল। কখনো উপেন্দ্রকিশোর রায়ের, কখনো সুকুমার রায়ের

লেখা, কখনো অন্য কোনো ছোটো পালার অভিনয় এবং আবৃত্তি হইত। লেখিকা যখন বাল্য সমাজের সম্পাদিকা ছিলেন তখন একবার স্যার নারায়ণ চন্দ্রভারকরকে প্রেসিডেন্ট করা হয়। তিনি ধন্যবাদ দিবার সময় সম্পাদিকা অপেক্ষা তাঁহার পিতাকেই বেশি ধন্যবাদ দিলেন। সেই সভাতে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সম্পাদিকাকে ধন্যবাদ দিয়া সভাপতির ত্রুটিটুকু সারিয়া লইলেন। শিশু সমিতিতে যে মেয়েরা যোগ দিতে অপমান বোধ করিতেন সেই বয়োজ্যেষ্ঠাদের একটা সমিতি ছিল। ইঁহারা নাইট স্কুল, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, আত্মোন্নতির চেষ্টা ইত্যাদি কিছুদিন করিয়াছিলেন। এই সকল ছেলেমেয়েই পাড়ার গৃহস্থদের নিকট উৎসাহ ও সাহায্য পাইত।

সাধারণ সমাজমন্দিরে রবিবার দুই বেলা উপাসনা ও শনিবার ছাত্রসমাজের বক্তৃতা ছাড়া সংগত সভা, যুবক সমিতি, কার্যনির্বাহক সভা ইত্যাদি কিছু-না-কিছুর একটা সভা প্রায় প্রত্যহই হইত। তাহার উপর আর-একটা সভা ছিল, তার নাম বোধহয় ব্রাহ্মবন্ধু সভা। এই সভার একজন সভ্য ছিলেন রামানন্দ। মাসে একবার করিয়া তাঁহারা এক-এক বন্ধুর বাড়িতে মিলিত হইতেন, সেখানেই রাত্রের আহার হইত। মনে আছে প্রাণকৃষ্ণবাবু, রজনীবাবু, কৃষ্ণকুমারবাবু, হেরম্ববাবু এবং বোধহয় প্রতুলচন্দ্র সোম প্রভৃতিও এই ভোজে আসিতেন। মনে পড়িতেছে মনোরমা দেবী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ইঁহাদের খাওয়াইয়াছিলেন।

বাঁকুড়ায় মহেশচন্দ্র ঘোষ

আর্থিক সচ্ছলতা না থাকিলেও ইহারই মধ্যে যখনই প্রয়োজন হইয়াছে কিংবা শখও হইয়াছে তখন এদিক ওদিক সপরিবারে যাইতে রামানন্দ ইতস্তত করিতেন না।

কলিকাতায় আসার কাছাকাছি সময়ে সম্ভবত ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে মনোরমা দেবী স্বীয় সঞ্চিত অর্থে বাঁকুড়ায় একটি বাড়ি করিতে চান। তখনকার দিনে অল্প টাকাতেই বাড়ি হইত। তাঁহাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব কোনো বাড়ি ছিল না বলিয়া এত টানাটানির মধ্যেও তিনি বাড়ি কেনার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেই টাকাতে বাঁকুড়া স্কুলডাঙ্গায় ব্রহ্মমন্দিরের পাশে কেদারনাথ কুলভী মহাশয়েব পত্নী ডা. হেমাঙ্গিনী কুলভীর একটি দোতলা পাকা বাড়ি ও তৎসংলগ্ন জমি মনোরমা দেবী ক্রয় করেন। তাহার কিছুকাল পূর্বে কুলভী মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছিল। বাড়ির গায়েই ব্রহ্মমন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি ছোটো মাটির বাড়ি ছিল। বহুকাল সেই মাটির বাড়িতে মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এবং তাঁহার দিদি বাস করিয়াছিলেন। ঘোষ মহাশয়ের সহিত তাঁহার ভাগিনেয়রাও থাকিতেন। বাঁকুড়ায় বাড়ি কেনার পর সেখানে গেলে রামানন্দ মহেশচন্দ্রের প্রতিবেশী হইলেন। মহেশবাবু ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, পালি, ও গ্রিক ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। মহেশবাবুর লাইব্রেরি নানাবিষয়ক আধুনিক ও প্রাচীন পুস্তকে পূর্ণ ছিল। দুই বন্ধুরই সেই লাইব্রেরি নানা কাজে লাগিত। জ্ঞানতপস্বী দুই বন্ধুই আলস্যকে সমান ঘৃণা করিতেন। মন্দিরে উপাসনা সে সময় ইঁহারা দুইজনেই করিতেন। কখনো ছুটিতে আসিলে মহেশবাবুর ভাগিনেয়ী সুগায়িকা বিনোদিনী চৌধুরী গান করিতেন, কখনো মনোরমা দেবী করিতেন। মহেশবাবুর অধিকাংশ কিংবা প্রায় সব রচনাই ‘প্রবাসী’ ও ‘মডার্ন রিভিয়ু’ পত্রে প্রকাশিত হইত। মহেশবাবুর আর একটি কাজ ছিল হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ। প্রত্যহ তাঁহার দরজায় বড়ো একটা ভিড় জমিয়া যাইত ঔষধ লইবার জন্য। সুচিকিৎসক বলিয়া মহেশবাবুর নাম ছিল। তিনি স্বয়ং চিররুগ্‌ণ ছিলেন, কিন্তু নিজ চেষ্টায়

ঔষধ পথ্য নিক্তির ওজনে মাপিয়া ব্যবহার করিয়া এবং সুনিয়মে থাকিয়া স্বাস্থ্যের তুলনায় বেশি দিন জীবিত ছিলেন। চুম্বক যেমন লৌহ টানে, সেই রকম পাণ্ডিত্য ও মহৎ চরিত্র রামানন্দকে আকর্ষণ করিত। এই কারণে বামনদাস বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহেশচন্দ্র ঘোষ তাঁহার অতি প্রিয় ছিলেন। মহেশচন্দ্রের মতো পণ্ডিত লোক শিক্ষা বিভাগে অতি অল্পই দেখা গিয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা বলিতেন। তাঁহার মতো উন্নত চরিত্র এবং শিশুজনোচিত সরল হাসিও কম দেখা যাইত। মহেশচন্দ্র দার্শনিক ছিলেন বটে, কিন্তু কোনো হাসির কথা হইলে ঘর ফাটাইয়া হাসিতেন। রামানন্দ ও মহেশচন্দ্র দুই জনেরই অর্থ সম্বন্ধে কোনো মোহ ছিল না। মহেশচন্দ্র আয়ের অধিকাংশ টাকা পুস্তক ক্রয়েই ব্যয় করিতেন, এমন বিদ্যা ছিল না যাহার বিষয়ে তাঁহার বেশ খানিকটা জ্ঞান না ছিল। কোনো কোনো বিষয়ে তো বিশেষজ্ঞই ছিলেন। পাশের বাড়ির ছেলেমেয়েরা তাঁহার লাইব্রেরিতে উপন্যাসও অনেক জোগাড় করিতে পাইত। তিনি মৃত্যুকালে চারি সহস্রাধিক গ্রন্থপূর্ণ বিশ হাজার টাকা মূল্যের লাইব্রেরি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান করিয়া যান। শুনিয়াছি, তিনি বলিতেন এত দার্শনিক গ্রন্থ ভারতবর্ষের আর কোনো লাইব্রেরিতে আছে কি না সন্দেহ। এক লাইব্রেরি ছাড়া তাঁহার যে-সকল উপন্যাসের বই ছিল সেগুলি তিনি ভাগিনেয়ীদের এবং হাজারিবাগের এক লাইব্রেরিতে দান করিয়া যান। এত বই কেনার উপর এই আজন্ম ব্রহ্মচারীর সংসার পালনের খরচও যথেষ্ট ছিল। তিনি তাঁহার পিতৃহীন ভাগিনেয়দের পালন এবং শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট ব্যয় করিতেন। যখন এক ভাগিনেয়কে এম. এ. পরীক্ষার ফি পাঠান তখন তাঁহার ব্যাঙ্কের খাতায় কয়েকটা পয়সা মাত্র রহিল। মহেশচন্দ্র বাঁকুড়া হইতে হাজারিবাগ চলিয়া যাইবার পর নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের এক আত্মীয় কুমুদনাথ বিদ্যাবিনোদকে রামানন্দ বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের ভার দিয়া কিছুদিন রাখেন। মহেশবাবুর মৃত্যুর পর রামানন্দ লেখেন :— "দেশের কল্যাণে তিনি আধ্যাত্মিক রাজ্যে যাহা করিয়াছেন তাহা লোকের উপলব্ধি করিতে সময় লাগিবে।" রামানন্দ বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একজন ট্রাস্টি ছিলেন। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বেও বাঁকুড়া ব্রহ্মমন্দিরের সমস্ত প্রাঙ্গণ পাকা পাঁচিল দিয়া ঘিরিয়া এবং অতিথিদের জন্য তৎসংলগ্ন একটি ঘর তৈয়ারি করিয়া আসিয়াছিলেন।

এলাহাবাদে কংগ্রেস ও প্রদর্শনী

অসুস্থতার জন্য দার্জিলিং এবং দেশে যাইবার জন্য বাঁকুড়া যাওয়া ছাড়া ১৯১০-এর মধ্যেই পুত্রের অসুস্থতার জন্য রামানন্দকে একবার গিরিডি যাইতে হয়। গিরিডিতে তখন তাঁহাব বন্ধু শক্তিকণ্ঠবাবু, শশিভূষণ বসু, ছাত্র যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতির বাস ছিল। তিনি বারগণ্ডায় অনন্ত মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে ছিলেন। এই বৎসরেরই শেষে এলাহাবাদে কংগ্রেস ও এক্‌জিবিশন হয়। একে এলাহাবাদ তাঁহার প্রিয় কর্মভূমি, তাহার উপর এই রকম বিরাট প্রদর্শনী ছেলেমেয়েদের দেখানো শিক্ষার একটা অঙ্গ মনে করিয়া তিনি এলাহাবাদে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বামনদাসবাবু খুব উৎসাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। আরও অনেকে যাইবেন শোনা গেল। সেই সময়ের কথা মনোরমা দেবীর একটা পুরাতন খাতায় কিছু লেখা আছে। তাহা হইতে কিছু তুলিয়া দিতেছি :

"১৯১০-এর ডিসেম্বর মাস, কনকনে শীত ; বড়দিনের ছুটি। শোনা গেল বড়দিনের ছুটির সময় এলাহাবাদে এবার খুব ধুমধাম হবে, কংগ্রেস হবে, এক্‌জিবিশন হবে। আমার

জীবনে শখের বন্যায় তখনও ভাঁটা পড়ে নাই ; শখ হল সপরিবারে এলাহাবাদে এক্‌জিবিশন দেখতে যাব। খাঁক্‌তি শুধু পয়সার, আর কিছুর নয়। খুঁজে পেতে সঙ্গী পেলাম সপরিবার কৃষ্ণকুমার মিত্রকে। একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ, তাঁহাদেরও আমাদেরই মতো পকেট খালি। কথা হল যে একটা থার্ড ক্লাস গাড়ি রিজার্ভ করলে বেশ আরামে যাওয়া যায়, পয়সাও খুব কম খরচ হয়।

"আঠারোটা সিটের দাম লাগবে, যাত্রী জোগাড় হল পনের জন। তিনটা সিট লোকসান দিয়েও শস্তা হল, সুবিধাও হল প্রচুর। একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি দিল, সেটা চলল মন্থর গতিতে সমস্ত স্টেশনে মুলাকাৎ করতে করতে। গাড়িটা ছিল রিজার্ভ করা, যেই বাংলা মুল্লুক ছাড়া অমনি গেঁয়ো খোট্টার দল এসে ধাক্কাধাক্কি। 'গাড়ি রিজার্ভ আবার কি রকম ইয়ার্কি?' কেউ বলে, 'হাঁ, হাঁ, খোল তো ইয়ার।' কেহ বা আর-কিছু অর্থাৎ গালাগালি। কেষ্টবাবুর পুত্র এবং আমার তিন নন্দন গাড়ির দরজা চেপে কুস্তি করতে করতে চলল। বেলা চারটায় এলাহাবাদে গাড়ি পৌঁছাল। দিনটা ছিল কনকনে শীত। অনেক অদৃষ্টপূর্ব স্টেশন পর্যবেক্ষণ করেও চক্ষু ক্লান্ত হয় নি। উঠলাম গিয়ে মেজর বামনদাসের বাড়িতে।...জলসা উপলক্ষে তখনই সত্তর-আশি জনের সমাগম হয়েছে। উঁহাদের প্রকাণ্ড বাসভবনটি পরিপূর্ণ। এত লোকের চার বারের আহার্য চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, যথাসাধ্য করে, পরিচর্যার নিমিত্ত দাসদাসীর জোগাড় করে দুই ভাই আতিথ্যের পরাকাষ্ঠা করছেন।"

এলাহাবাদের বিরাট মাঠে শিল্প-প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রকাণ্ড বাড়ি, গেট, ক্লক টাওয়ারের মতো স্তম্ভ কত তৈয়ারি হইয়াছে। ভারতের বাহিরের নানা দেশের সওদাগরেরাও ভারে ভারে জিনিসপত্র আনিয়াছে! প্রতি দেশেব, প্রতি প্রদেশের আলাদা বাড়ি, কলকব্জা, এরোপ্লেন হইতে আরম্ভ করিয়া গাছগাছড়া, ধান, চাল, ছুঁচসুতা কিছুর অভাব নাই। বহু শিল্পের কাবখানার নমুনা পর্যন্ত ছিল। বড়ো বড়ো বিশেষজ্ঞেরা এক-একটা বিভাগের ভার লইয়াছিলেন। মেজর বসু বোধ হয় গাছগাছড়ার বিভাগে ছিলেন। অনেক ঐতিহাসিক দ্রব্যের প্রদর্শনী ছিল। **Oudh Court** নামক একটা বাড়িতে অযোধ্যার বহু প্রাচীন জিনিস, নবাব ও রাজরাজড়ার জিনিস প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই বৎসর এলাহাবাদে একেশ্বরবাদীদের সম্মিলনও হইয়াছিল। এই সম্মিলনে রামানন্দ, ইন্দুভূষণ রায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি কর্মী ছিলেন। সরলা দেবী গানের ভার লইয়াছিলেন মনে হইতেছে। দেশবন্ধু দাসের আত্মীয় একজন মান্দ্রাজি ব্রাহ্মও ইহাতে যুক্ত ছিলেন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দেবের নিকট শুনিয়াছি।

কংগ্রেস এবং শিল্প-প্রদর্শনী দেখার পর মনোরমা দেবী তাঁহার পুত্রকন্যা ও পুত্রস্থানীয় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লইয়া কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়দের সহিত আগ্রা, মথুরা ও বৃন্দাবন দেখিতে যান। আগ্রাতে অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ নাগের বাড়িতে এতগুলি অতিথির সকলেই উঠিয়াছিলেন। আগ্রার তাজ ও সেকেন্দ্রায় আকবরের নিরাড়ম্বর নিস্তব্ধ সমাধি দেখিয়া তৃপ্তিতে যখন সকলের মন ভরপুর তখন কথা হইল মথুরা, বৃন্দাবন দেখার। মথুরা, বৃন্দাবনে পাণ্ডা, ভিখারি ও মর্কটবাহিনীর উৎপাতে অতিষ্ঠ হইয়া এবং ধূলি-চন্দনে চর্চিত হইয়া সকলে ফিরিলেন। কৃষ্ণবাবুর সহধর্মিণী লীলাবতী মিত্র এতই চটিলেন যে বলিলেন, "আমি বাড়ি গিয়েই সুপ্রভাতে সব লিখে দেব।" সুপ্রভাত ছিল কুমুদিনী মিত্রের সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা। রামানন্দ সেবার আগ্রা যান নাই। প্রবাসী প্রভৃতির কাজের জন্য তাঁহাকে আগেই কলিকাতা ফিরিয়া যাইতে হয়।

দার্জিলিং

এলাহাবাদে ১৯০৭-এ 'মডার্ন রিভিয়ু' আরম্ভ করার কিছুদিন পরে কাগজের কাট্‌তি সে সময়ের তুলনায় খুব ভালোই হয়। কিন্তু দেড় বৎসর না যাইতে কতকটা সাংসারিক কারণে এবং কতকটা রাজনৈতিক কারণে কলিকাতায় ফিরিয়া আসাতে সম্পাদককে যে অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। ক্রমে কলিকাতায় এই কাগজের প্রতিষ্ঠা এলাহাবাদের অপেক্ষাও সুদৃঢ় হইয়া উঠিল এবং ভারতব্যাপী প্রচার আরও বিস্তৃত হইল। ফলে আর্থিক সমস্যার এইবার সমাধান হইবে এমন আশা করা সম্ভব হইল। সুতরাং ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার পর ১৯১২তেও তিনি দার্জিলিঙে মাস দুই থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই সময় স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয়ও দার্জিলিঙে থাকিতেন। প্রায়ই তিনি 'মডার্ন রিভিয়ু'র জন্য লেখা স্বহস্তে রামানন্দের Trio Cottage-এর বাসাতে দিয়া যাইতেন। যদি কখনো কিছু পরিবর্তন কী যোগ করা দরকার মনে করিতেন তৎক্ষণাৎ ছোটো ছোটো কাগজে তাহা লিখিয়া আবার নিজের হাতেই তাহা সম্পাদকের বাসায় পৌঁছাইয়া দিতেন। তখন মহারানী বালিকা স্কুল নূতন হইয়াছে, তাঁহাদের পুরস্কার-বিতরণ উপলক্ষে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল একদিন টাউন হলে বক্তৃতা দিলেন।

১৯১০।১১।১২তে রামানন্দের দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় দার্জিলিং জেলের জেলার ছিলেন। তাঁহারা বোটানিক্যাল গার্ডেনসের অনেক নীচে জেলখানার নিকটেই থাকিতেন। ইহার পর ১৯১৪তে রামানন্দ সম্ভবত শেষবার দার্জিলিং গিয়াছিলেন। সেবার Abbey Holm নামক যে ছোটো বাড়িতে ছিলেন সে বাড়িটি জলাপাহাড়ের খুব কাছে। পাশের বাড়িতে সপরিবারে হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় থাকিতেন। পরে এই এলাকার বাড়িগুলি স্যর জগদীশচন্দ্র বসু বোস ইনস্টিটিউটের জন্য কিনিয়া লন এবং নাম বদল করিয়া মায়াপুরী নাম রাখেন। তখন প্রত্যেক বৎসরই দার্জিলিঙে ডা. নীলরতন সরকার নিজের Glen Eden-এর বাড়িতে যাইতেন। তাঁহার বাড়িতে প্রত্যহ বন্ধুবান্ধবের ভিড় লাগিয়া থাকিত। তাঁহার একটা আনন্দ ছিল অনেক ছেলেমেয়েকে লইয়া দীর্ঘ ভ্রমণে যাওয়া। ভোরবেলা উঠিয়া কিছু খাবার লইয়া কখনো ঘুম রক, কখনো সিঞ্চল, কখনো সোনাদার জঙ্গল নানা স্থানে তিনি সদলে যাইতেন। ১২।১৪ মাইল হাঁটিতে এবং হাঁটাইতে তাঁহার কোনোই ক্লান্তি ছিল না। ট্রেনে থার্ড ক্লাস গাড়ি চড়িতেও আপত্তি ছিল না। দিবারাত্রি যেন তাঁহার উৎসব লাগিয়া থাকিত। দেখিলে মনে হইত না যে কলিকাতায় ইনি একজন কর্মব্যস্ত সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক। কোনো কোনো সময় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও ইঁহার গঠিত দলের সহিত ভ্রমণে বাহির হইতেন। ভূপেন্দ্রবাবু বেশি হাঁটিতে পারিতেন না। তিনি ডাণ্ডিতে অনেকটা পথ যাইতেন। সিঞ্চল প্রভৃতি বেড়াইবার সময় ইউরোপের শীতপ্রধান দেশের ব্যবহৃত গরম কাপড় পরিয়াও তিনি আগুন পোহাইতেন। হাত ক্রমাগতই ঠাণ্ডা হইয়া যাইত। তিনিও অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খুব বন্ধুর মতো মিশিতেন। অল্পদিনের পরিচয় বহুদিন মনে রাখিতেন।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতার সহিত রামানন্দের বন্ধুত্ব ও কর্মক্ষেত্রে যোগ কলিকাতায় আসার পর আরও ঘনিষ্ঠ হয়। প্রায়ই দেখা যাইত প্রবাসী অফিস হইতে ছবি কিংবা প্রবন্ধের প্রুফ লইয়া কেহ তাঁহার সেই বোসপাড়া লেনের ক্ষুদ্র বাড়িতে চলিয়াছে। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার প্রবন্ধ কাহাকেও সংশোধন করিতে দিতেন না শুনিয়াছি। কিন্তু রামানন্দের প্রতি তাঁহার এত গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যেও তাঁহার একটা বিশ্বাস ছিল যে তিনি সংশোধন করিলে নিবেদিতা কখনো কিছু বলিতেন না। ভগিনী নিবেদিতার নিকট যাঁহারা কাজ লইয়া যাইতেন তাঁহাদেরও তিনি শুধু পত্রবাহক হিসাবে দেখিতেন না। রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের কতটা জ্ঞান, দেশের বিষয় তাঁহারা কিছু জানেন কি না সব খোঁজ লইতেন। যদি দেখিতেন হিন্দুর ছেলে হইয়াও হিন্দুর মহাকাব্য সম্বন্ধে ইঁহারা তেমন কিছু জানেন না, তাহা হইলে নিবেদিতা চটিয়া যাইতেন। এই ভয়ে অফিসের কেহ কেহ তাঁহার কাছে যাইতে চাহিতেন না। গণেন মহারাজ অনেক সময় নিবেদিতার কাজ লইয়া প্রবাসী অফিসে আসিতেন। রামানন্দ প্রায় নিবেদিতার বোসপাড়া লেনের বাড়িতে এবং কখনো বা জোড়াসাঁকোর অবনীন্দ্রনাথের বৈঠকে নিবেদিতার সহিত নানা বিষয় আলোচনা করিতেন। ডা. বসুর গৃহেও ইঁহাদের নানা প্রসঙ্গ হইত। বাঙালিদের পোশাক-আশাক ও জীবনযাত্রা—সবের মধ্যেই নিবেদিতা যে সৌন্দর্য সন্ধান করিতেন এই কথা তাঁহাদের কথোপকথন হইতে বুঝা যাইত।

ডা. জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁহার পত্নী অবলা বসু নিবেদিতার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ডা. বসুর গৃহ এবং বোস ইনস্টিটিউটের সুচিত্রিত প্রাচীর ও ছাদ স্বদেশী চিত্রকলার সুন্দর নিদর্শন। নন্দলাল বসুই প্রধানত এই সব ছবি আঁকিয়াছিলেন। স্বদেশী শিল্প ও চিত্রকলার প্রতি ডা. বসুর অনুরাগের ইতিহাসের সহিত ভগিনী নিবেদিতার বন্ধুত্বের ইতিহাস নানাভাবে জড়িত। বসু মহাশয়ের গৃহে দেওয়ালে ভারতমাতার চিত্র বোধ হয় নিবেদিতার ইচ্ছাতেই অঙ্কিত হয়। তাঁহাদের সঙ্গে যুক্ত হইলেন রামানন্দ। তিনি প্রবাসীর প্রথম বৎসরেই অজন্টা গুহা বিষয়ে স্বয়ং সচিত্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং ক্রমে অবনীন্দ্র প্রভৃতি নবপর্যায়ের অগ্রগামী শিল্পীদের চিত্রে কাগজ অলংকৃত করিতে থাকেন। তখন হইতেই নিবেদিতা যে তাঁহার কাজে সহায় হইলেন এ কথা আগে লিখিয়াছি। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি অজন্টা গুহার চৈত্য ও বিহারগুলির সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। তখন তিনি সর্বদাই লোক মারফত *M. R.* সম্পাদককে চিঠিপত্র লিখিতেন। প্রায়ই দেখাও হইত। ইহার কিছু পরে একদিন রামানন্দ পীড়িত হইয়া পড়েন। দুই-তিন দিন না যাইতেই ভগিনী নিবেদিতা খবর পাইলেন। অমনি একদিন শোনা গেল 'ভগিনী নিবেদিতা রামানন্দবাবুকে দেখতে এসেছেন।' তাড়াতাড়ি তাঁহাকে উপরে আনা হইল। সুদীর্ঘ শুভ্র পরিচ্ছদ ও বিলাতী জুতা পরিয়া তিনি আসিয়াছিলেন। কিন্তু রোগীর ঘরের সামনে আসিয়াই জুতা জোড়া খুলিয়া রাখিলেন। ইউরোপীয় মহিলাকে জুতা খুলিতে দেখিয়া সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিতেই নিবেদিতা ইংরাজিতে বলিলেন, "আমি জানি, জুতা খুলিতে হয়।" কিছুক্ষণ ঘরে বসিয়া কথা বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

তাহার ঠিক কতদিন পরে মনে নাই ভগিনী নিবেদিতা স্বয়ং দার্জিলিঙে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তিনি বাঁচিবেন না বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এদেশে যাঁহাদের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাঁহাদের বোধ হয় শেষ দেখা দেখিবার ইচ্ছা ছিল। হয়তো এই দুর্ভাগ্য দেশের

প্রতি তাঁহার মমতার কোনো কথা বলিয়া যাইবার ইচ্ছা কিংবা কোনো কাজের ভার দিবার ইচ্ছা ছিল। দার্জিলিং হইতে খবর আসিল, "ভগিনী নিবেদিতা রামানন্দবাবুকে দেখিতে চান।" কিন্তু যখন খবর আসিল, তখনই যাওয়া সম্ভব ছিল না, এবং যখন সম্ভব হইল তখন আর যাইবার সময় ছিল না। ১৩ অক্টোবর (১৯১১) নিবেদিতার মৃত্যু হয়। নিবেদিতার লিখিত পত্রাবলী একখানিও নাই, থাকিলে তাহা হইতে কিছু তথ্য উদ্ধার করা যাইত।

নিবেদিতার গভীর আধ্যাত্মিকতা, আশ্চর্য চারিত্রিক শক্তি, ভারতপ্রীতি, ভারতসেবায় উৎসর্গীকৃত জীবন, মনীষা, পাণ্ডিত্য, শিল্পজ্ঞান, নানা বিষয়ে আশ্চর্য লিখিবার ক্ষমতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি রামানন্দের নিকট শ্রদ্ধার জিনিস ছিল। তিনি 'মডার্ন রিভিয়ু'-এর জন্মকাল হইতে লেখা দিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে সম্পাদককে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন তেমন সাহায্য সচরাচর কাহারও নিকট মিলে না। সম্পাদক বলিতেন যে নিবেদিতা সাধারণ কথাবার্তার সময় সম্পাদকের কাজের দোষত্রুটি যাহা দেখিতেন তাহার কঠোর সমালোচনা করিতেন। সেই সমালোচনাও কম মূল্যবান ছিল না। এই যে নানা ভাবের সাহায্য ইহার মূল্য নিবেদিতার মৃত্যুর পরও সম্পাদক স্মরণ করিতেন। ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে তিনি চেষ্টা করেন নাই। তিনি কেবল বলিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রতি যাঁহারা সদয় তাঁহারা যেন সকলেই নিবেদিতার মতো কঠোর সমালোচক হইতে পারেন, এবং যাঁহারা এখন কেবলমাত্র কঠিন সমালোচনা করেন তাঁহারা যেন নিবেদিতার মতোই সদয় ও সহায় হইতে পারেন। নিবেদিতা প্রকৃতই তাঁহার ভগিনী ছিলেন. এবং নিবেদিতার জীবনপথে যাঁহারা তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের সকলের কাজে নিবেদিতা সত্যই আপনাকে সম্পূর্ণ ভাবে নিবেদন করিয়াছিলেন ; এমন প্রাণ দিয়া 'মডার্ন রিভিয়ু'র উন্নতিচেষ্টা আর কেহ করিয়াছিলেন কি না জানি না। নিবেদিতার সম্বন্ধে রামানন্দ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা সমস্ত তোলা সম্ভব নয়। নিবেদিতার বহু শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি যে ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্মের সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন ইহা বাস্তবিক বিস্ময়কর।

> "A person of her intense spirituality, force of character, strength of mind, intellectual power and wide range of studies could easily have chalked out for herself a career of distinction at home."

রামানন্দের এই মত উল্লেখযোগ্য। ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যুর পরও তাঁহার বহু রচনা বহুদিন ধরিয়া *Modern Review* পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। নিবেদিতার বিষয় নানা জনের লেখা কতকগুলি রচনাও কয়েক মাস ধরিয়া প্রকাশিত হয়। সাময়িক পত্রের প্রয়োজনমতো তাঁহার নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়া রামানন্দ অন্যান্য কথার মধ্যে বলিয়াছিলেন,

> "She was, if one may be pardoned a trite epithet, a born journalist. She wrote with brilliancy, vigour and originality, and, even on commonplace themes, with something like inspired fervour."

জগদীশচন্দ্র এই সময় কতকগুলি নূতন আবিষ্কার লইয়া খুব ব্যস্ত ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁহার বক্তৃতার ঘরে নূতন আবিষ্ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে সচিত্র বক্তৃতা হইত। সেই সব বক্তৃতায় তাঁহার প্রিয় শিষ্য রামানন্দকে সর্বদা উপস্থিত থাকিতে হইত, জরুরি নিমন্ত্রণ আসিত, শুধু শিষ্যের নয়, শিষ্যের কন্যাদেরও। তিনি এত পরিষ্কার করিয়া সহজ ভাষায় বৈজ্ঞানিক কথা বুঝাইতেন যে বালিকারাও তাঁহার আবিষ্ক্রিয়ার কথা ভালো করিয়াই বুঝিতে পারিত। তখন ভগিনী নিবেদিতা জীবিত ছিলেন না, Sister Christine-কে বক্তৃতায় মাঝে মাঝে দেখা যাইত। রামানন্দ জগদীশচন্দ্রের প্রত্যেক আবিষ্কার ও বক্তৃতাদির বিষয়

তাঁহার পত্রিকার সাহায্যে জগদ্ব্যাপী প্রচার করিতেন।

শ্রীযুক্তা অবলা বসুকে এই সময় রামানন্দই দক্ষিণ ভারতের নারীদের অপমানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার সভাতে সভানেত্রী হইতে উৎসাহিত করেন। সভানেত্রী প্রভৃতির বক্তৃতার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন সমস্তই তিনি জোগাড় করিয়াছিলেন। একে বহির্ভারতে ভারতীয়ের অপমান তাহাতে নারীর অপমান, ইহাতে রামানন্দ এতই বিচলিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার সাধ্যে যতটা সম্ভব কাগজে কলমে ও কাজে কোনোটা করিতেই তিনি বাকি রাখেন নাই।

জ্যেষ্ঠপুত্রকে বিদেশে প্রেরণ

সংসার ক্রমে যখন সচ্ছল হইয়া আসিতেছিল এই সময় ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিলাতে পড়িতে পাঠাইবেন স্থির করিলেন। এতখানি ব্যয়ভার বহন করিবার মতন অবস্থা তখন তাঁহার হয় নাই ; কিন্তু তিনি একবার যাহা স্থির করিতেন তাহা ছাড়িতেন না। তাঁহার পুত্রস্নেহ এত গভীর ছিল যে তাহাদের উপকারের জন্য তিনি নিজে সমস্ত দুঃখ বরণ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিলাত রওনা করাইয়া দিলেন। তাঁহার ইউবোপ হইতে ফিরিতে প্রায় সাত বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যে বিশ্বব্যাপী মহাসমরের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অল্প বয়সের সন্তানকে বিদেশে পাঠাইয়া উৎকণ্ঠায় পিতামাতার প্রাণ শুকাইয়া আসিত। কিন্তু সেই সাত-সমুদ্র তেরো নদীর পারের দেশের খবর তো ইচ্ছা করিলেই পাওয়া যায় না। কাজেই সংসারে সচ্ছলতা আসিবার সম্ভাবনায় যেটুকু আনন্দ তাঁহাদের হইবার উপক্রম হইয়াছিল তাহা যেন নানা ঝড়ঝঞ্ঝায় উড়িয়া যাইতে লাগিল। ইউরোপে সমর-প্রাঙ্গণের নিকটে পুত্র পড়িয়া আছেন বলিয়া মনোরমা দেবী প্রত্যহই অস্থির হইতেন। খবরের কাগজে যেদিন যেখানে যুদ্ধের কী বোমার খবর বাহির হইত সেই দিনই ম্যাপ দেখাইয়া লন্ডন হইতে সেই স্থান কত দূরে তাহা মনোরমা দেবীকে বুঝাইয়া দেওয়া রামানন্দের এক কাজ ছিল। তাহার উপর বাড়ির অর্থের ভাবনা, ফিরিবার দিন যতই পিছাইতে লাগিল ততই অর্থসংকট দেখা দিতে লাগিল। মনোরমা দেবী গহনা বিক্রি করিয়া, জীবনবীমার কাগজ বাঁধা দিয়া যেখানে যাহা পাইতেন জোগাড় করিয়া পাঠাইতেন এবং নিজেদের ব্যয় ক্রমেই সংক্ষিপ্ত হইতে সংক্ষিপ্ততর করিতে লাগিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিয়াছিলেন, তাঁহার বন্ধুসংখ্যা স্বল্প। সেই স্বল্পের মধ্যেই অন্যতম ছিলেন রামানন্দ। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন লিখিয়াছেন, "রামানন্দবাবুর উপর রবীন্দ্রনাথের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল।"

রামানন্দ বলিয়াছিলেন, "আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব লাভ।" এই কারণে তাঁহার জীবন আলোচনা করিতে বসিলে রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সম্পর্কের কথা স্বতই মনে হয়। 'প্রদীপে'র প্রথম পৃষ্ঠা বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথের চিত্রে শোভিত হইয়া প্রকাশ করার কথা পূর্বেই বলিয়াছি। 'প্রদীপে'র যুগ হইতে 'প্রবাসী'র যুগ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সহিত রামানন্দের আলাপ-আলোচনা চলিত, দুইটি কাগজেই কবিতা প্রভৃতিও প্রকাশিত হইত। তাহারও আগে 'দাসী'তে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সমালোচনা ইত্যাদির

কথাও বলিয়াছি। প্রথম হইতেই রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য প্রতিভা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সেই গুণমুগ্ধতা দিনে দিনে গভীর ভালোবাসায় পরিণত হয়। রামানন্দ তাঁহার অন্তরের প্রীতি যাহাকে একবার ঢালিয়া দিতেন তাহাকে চিরজীবনই সেইরূপ গভীর ভাবে ভালোবাসিতেন। সাধ্বী পত্নীর নিষ্ঠার মতো তাঁহার শ্রদ্ধা প্রীতি ও স্নেহেরও একটা নিষ্ঠা ছিল। বহু কঠিন পরীক্ষাতেও তিনি সেই নিষ্ঠা হইতে চ্যুত হইতেন না। তাঁহার জীবনে আত্মীয়-অনাত্মীয় অনেক প্রিয়জনের প্রতি ভালোবাসারই পরীক্ষা তাঁহাকে দিতে হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের সহিত সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও দিতে হইয়াছিল এবং সর্বত্রই তিনি সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মানুষকে বিস্মিত করিয়াছেন।

রামানন্দ কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গলিতে বাসা বাঁধিবার পর 'গোরা'র জন্য শান্তিনিকেতনে 'প্রবাসী'র লোক অনেক সময় যাওয়া-আসা করিত, তখন হইতে দুই জনের চিঠিপত্র পূর্বাপেক্ষা বেশি চলিতে লাগিল। অনেক সময় লোক দাঁড়াইয়া কপি শেষ করাইয়া কলিকাতায় লইয়া আসিত। রবীন্দ্রনাথ যে কখনো লেখা দিতে এক দিনও দেরি করিতেন না ইহাতে নিয়মনিষ্ঠ রামানন্দ বাস্তবিকই মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতেন। তিনি কবি মানুষ কিন্তু সেইসঙ্গে কঠোর পরিশ্রমী, উচ্চ আদর্শবাদী এবং শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের জন্য সর্বত্যাগী ইহা দেখিয়া আদর্শবাদী, ত্যাগী ও নিরলস রামানন্দ তাঁহার প্রতি আরও আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উচ্চ আদর্শকে সার্থকতা দান করিবার জন্য যদি তিনি কিছু করিতে পারেন তবে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করিবেন। তখন হইতেই রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও সাহিত্য প্রচারে তিনি ব্রতী হইলেন। এই প্রচার শুধু রবীন্দ্রনাথের রচনা 'প্রবাসী'তে ছাপানো নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্য বিষয়ে নিজ পত্রিকাগুলিতে দীর্ঘ ইংরাজি ও বাংলা প্রবন্ধ প্রকাশ, তাঁহার জীবনের সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র সাহায্যে প্রচার, স্বয়ং তাঁহার বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও শিক্ষা বিভাগে তাঁহাব পুস্তক পাঠ্য করিবার চেষ্টা করা, আশ্রমের আদর্শ প্রচার করা—এই সমস্ত কাজই তিনি সেইদিন হইতে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত করিয়া আসিয়াছেন। যখন রবীন্দ্রনাথ অধিকাংশ লেখা 'প্রবাসী'তে দিতেন তখনও করিয়াছেন, যখন 'সবুজপত্রে'র যুগে রবীন্দ্রনাথ কয়েক বৎসর বিশেষ উল্লেখযোগ্য লেখা 'প্রবাসী'তে দেন নাই তখনও করিয়াছেন, যখন কোনো কারণে অভিমান-বশত রামানন্দ স্বয়ং কিছুদিন রবীন্দ্রনাথের লেখা ছাপেন নাই তখনও করিয়াছেন, তাহার পর ভুল বোঝাবুঝির পালা যখন শেষ হইয়া বন্ধুত্বেরই জয় হইল তখনও কবিয়াছেন। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী বলেন, "গুরুদেবের চিন্তার নানারূপে প্রচার তিনি [রামানন্দ] যত করিয়াছেন আর কেহ তত করিয়াছেন বলিয়া আমি জানি না।"

পরস্পরের প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক হইতে যে দান উদ্ভূত তৌল দাঁড়িতে তাহা মাপা যায় না, তাহার মাপ দাতা ও গ্রহীতাদের হৃদয়ে লেখা থাকে। এই রকম একটি দান ছিল অধ্যাপক মোহিতচন্দ্রের শান্তিনিকেতন আশ্রমে কয়েক শত টাকা দান। তিনি অধ্যাপক মানুষ, ধনী ছিলেন না বলাই বাহুল্য। তাঁহার দানে সাধারণের-অপরিচিত সে যুগের আশ্রম যে উপকার লাভ করিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে তাহা অমর হইয়া আছে। রামানন্দ নিঃসম্বল সাহিত্যিক ও ঋণগ্রস্ত সাহিত্যপরিবেশক, কিন্তু তাঁহারও ইচ্ছা হইত এই কাজে কিছু অর্থ সাহায্য করিতে। একবার সম্ভবত ১৩১৬ সালের শেষে তিনি বিদ্যালয়ে এক শত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথ জানিতেন যে বন্ধুর ঝুলি শূন্য। তিনি টাকাটা দান বলিয়া গ্রহণ

করিলেন না, ঋণ বলিয়া ধরিলেন। 'প্রবাসী'তে নানা দেশের নানা কাগজ হইতে নানা জাতীয় রচনা সংকলন করিয়া ছাপাইবার প্রস্তাব সেই সময় হইতেছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার ভার লইলেন। সেই সূত্রে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিলেন, (বাংলা ১৩১৬ কি ১৩১৭ সালে) "রামানন্দ বাবু ১০০্ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন, অতএব আমরা ঋণে আবদ্ধ। তুমি সেই যে দুই একটা কাগজ নিয়ে গেছ তার থেকে কিছু করে দিয়ো। আজ দুই একটা কি এসেছে, এখনো মোড়ক খুলিনি, যদি কিছু থাকে তোমাকে পাঠাব।"

১৩১৭ হইতেই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকেরা এবং কোনো কোনো ছাত্র-ছাত্রী 'প্রবাসী'র জন্য সংকলন লিখিতে শুরু করিলেন। এই সমস্ত লেখা রবীন্দ্রনাথ দেখিয়া এবং সংশোধন করিয়া দিতেন। রবীন্দ্রনাথের মতো জগদ্‌বিখ্যাত লেখক সংকলনের ভার লওয়া মানহানিকর মনে করেন নাই, ইহা তাঁহারই উপযুক্ত। ১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে সম্পাদক লিখিয়াছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রবাসীর জন্য বিলাতি ও আমেরিকান বহু মাসিক পত্রের ভালো ভালো প্রবন্ধ বাছিয়া তাহার কোনো কোনো অংশ শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ও ছাত্রদের কাহাকে কাহাকেও অনুবাদ করিতে দিতেন, সমুদয় অনুবাদ সংশোধন করিয়া দিতেন এবং কোনো কোনো অনুবাদ সন্তোষজনক না হইলে স্বয়ং সমস্তটি লিখিয়া দিতেন, তখন তিনি অজ্ঞাত অখ্যাত ছিলেন না।" রবীন্দ্রনাথ সংকলন করিতেছেন শুনিয়া এলাহাবাবাদ হইতে বামনদাসবাবু তাঁহাকে বাক্সবন্দী করিয়া পাশ্চাত্য ইংরাজি কাগজের কাটা টুকরা পাঠাইতে লাগিলেন।

রামানন্দ কর্মব্যস্ততার মধ্যে শান্তিনিকেতন দেখিবার সময় তখনও করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে দোলের আগেই খবর পাওয়া গেল শান্তিনিকেতনে 'রাজা' অভিনয় হইবে। সমাজপাড়ায় একদল অল্পবয়স্কা বালিকার খেয়াল হইল তাহারা 'রাজা' দেখিতে যাইবে। 'গোরা'র যুগের পর রবীন্দ্রনাথের নামে তখন ছেলেমেয়েরা পাগল। তিনি স্বয়ং অভিনয়ে নামিবেন এ কথাও কানে আসিল। কে যে প্রথম কথাটা পাড়িয়াছিলেন মনে নাই। বোধ হয় একটি বিবাহ-সভায় ডা. নীলরতন সরকারের কন্যা নলিনী ও রামানন্দের জ্যেষ্ঠা কন্যা রাত্রেই পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন শান্তিনিকেতন যাইতেই হইবে। শুধু অভিনয় দেখার উৎসাহেই যে পরামর্শটা হইয়াছিল তাহা নয়. অল্পবয়সে সেই সময় আশ্রমের আদর্শটা তাহাদের মনকে অত্যন্ত আকর্ষণ করিত তাই আদর্শের অনুসন্ধানেও উৎসাহ অনেকখানি বাড়িয়াছিল। কিন্তু ছোটো ছোটো মেয়েদের একলা তো যাইতে দেওয়া হইবে না। রামানন্দ ছিলেন এইসব অর্বাচীনদের বন্ধু। তাহারা গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া পড়িল, "আপনাকে আমাদের নিয়ে যেতে হবে।" আশ্রমে যাইবার ইচ্ছা তাঁহার নিজের তো ছিলই, তদুপরি তিনি জানিতেন যে তিনি ছাড়া ইহাদের আর কোনো গতি নাই। সুতরাং ছয়-সাতটি বালিকার অভিভাবক হইয়া তিনি আশ্রমে চলিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নীচু বাংলায় অতিথিদের অর্থাৎ মেয়েদের স্থান হইল। তখনকার আশ্রমের আতিথ্য, সেবাপরায়ণতা, শাল ও আমলকি বাগানের ভিতর খড়ো ঘরে ছোটো বড়ো ধনী দরিদ্র সকলের অনাড়ম্বর জীবন এবং সর্বোপরি আশ্রমপতির ব্যক্তিত্বের সহস্রমুখী প্রভা কিশোর মনগুলিকে মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। রামানন্দ সেইদিন হইতেই আশ্রমের আপনার জন, আশ্রমও সেইদিন হইতে তাঁহার অন্তরে স্থান পাইল।

সেবার প্রথম 'রাজা' অভিনয় হয়। মাটির 'নাট্যঘরে' খড়ের চালার তলায় নবীন কিশলয়ে ও সদ্যতোলা পুষ্পদলে সজ্জিত রঙ্গমঞ্চে গান ও অভিনয় যেন আতশবাজির

ফুলের মতো ঝলমল করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সেবার (এখন জস্টিস) সুধীরঞ্জন দাস হইয়াছিলেন 'সুদর্শনা' এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'কাঞ্চীরাজ'। অভিনয়ের আগে-পরেও রবীন্দ্রনাথের আনন্দ বিতরণের কী সমারোহ! অতিথিশালার উপরের ঘরে বসিয়া একসঙ্গে পঞ্চাশটা পর্যন্ত গান তিনি অনায়াসে গাহিয়া গেলেন। অতিথিদের সঙ্গে করিয়া সমস্ত আশ্রম নিজে দেখাইলেন। তাঁর আতিথ্য, তাঁর সৌজন্য, তাঁর বাৎসল্য, তাঁর কণ্ঠমাধুর্য, তাঁর সৌন্দর্য, তাঁর দৈহিক ক্ষমতা, তাঁর প্রসন্নতা কিছুরই যেন সীমা ছিল না। তিনি যেন ছিলেন কল্পতরু। তাঁহার কাছে যাহা চাওয়া যাইত তাহাই পাওয়া যাইত, যাহা না চাওয়া যাইত তাহাও যে কত তিনি দিয়াছেন বলা যায় না। গভীর জ্যোৎস্না রাত্রে পারুল বনে তিনি হাঁটিয়া যাইতেন সংগীত-উৎসব করিতে, বিদায়ের সময় অন্ধকার রাত্রে আলো হাতে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিতেন এই অতিথিদের গাড়িতে তুলিয়া দিতে। এই ছোটো মেয়েগুলিকে তিনি স্নেহবন্ধনে বাঁধিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের পিছনে যে সৌম্য প্রসন্নমূর্তি বন্ধুটিকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলেন, তিনি তাঁহাকে নানাভাবে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিলেন।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে মে মাসের 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে আছে যে ১৯০৮-এর অক্টোবরে এলাহাবাদের কোনো একটা অ্যান্টি-পার্টিশন সভাতে যোগ দেওয়ার জন্য কায়স্থ পাঠশালার সংস্কৃতের অধ্যাপক বালকৃষ্ণ ভট এবং অ্যাংলো-বেঙ্গলি স্কুলের প্রধান শিক্ষক নেপালচন্দ্র রায়ের চাকরি যায়। নেপালচন্দ্রকে সুযোগ্য শিক্ষক ও ছাত্রবন্ধু বলিয়া রামানন্দ শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি সে বাড়ির বালকবৃদ্ধ সকলেরই বন্ধু ছিলেন। এই বন্ধুর যখন অসময় সেই সময় রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়েও একজন এইরূপ নিঃস্বার্থ ছাত্রবন্ধুর প্রয়োজন ছিল। রামানন্দ আশ্রমের যোগ্য শিক্ষক মনে করিয়া নেপালচন্দ্রকে এই কাজ লইতে অনুরোধ করেন। নেপালচন্দ্রের বন্ধু শ্রীচরণ চক্রবর্তীর পুত্র অজিতকুমার চক্রবর্তীর নিকটও রবীন্দ্রনাথ নেপালবাবুর প্রশংসা শুনিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে কবি কোনো কারণে কালকা যাইতেছিলেন। পথে দিল্লিতে কিংবা এলাহাবাদে নেপালবাবুর সহিত কবির পরিচয় হয়। পরিচয়ে খুশি হইয়া কবি অজিতকুমারকে লেখেন "নেপালবাবুর সঙ্গে পরিচয়ে তৃপ্তি লাভ করেছি।" নেপালবাবু তখন ওকালতি করিবার জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন কিন্তু রামানন্দের সঙ্গে আশ্রম বিষয়ে কথা হওয়ার পর তিনি আশ্রমে যাইতে রাজি হইলেন। ১৩১৭-র বৈশাখে যখন শান্তিনিকেতনে জন্মোৎসব হয় তখন নেপালবাবু আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। ইহারই কাছাকাছি কোনো সময়ে তিনি আশ্রমে শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। উৎসবের কিছুদিন পরে (৯ শ্রাবণ, ১৩১৭) রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে লিখিতেছেন, "নেপালবাবু কিছুদিনের জন্য এখানকার অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। সেই কিছু কালের মেয়াদ যদি ক্রমে বাড়িয়া চলিতে থাকে, তবে আরো আনন্দের কারণ হইবে।" সে মেয়াদ নেপালবাবুর যতদিন পর্যন্ত কর্মক্ষমতা ছিল ততদিনেও উত্তীর্ণ হয় নাই। তিনি যদিও ২০।২৫ বৎসর কাজ করার পর অবসর লইয়াছিলেন, তবু শেষশয্যা গ্রহণ করিবার পূর্ব পর্যন্ত নানা ভাবে সেকালের ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও একালের বিশ্বভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন।

শান্তিনিকেতনে (ইংরাজি ১৯১১ খ্রি.) দ্বিতীয় বার 'রাজা' অভিনয় হইল জন্মোৎসবের সময়। প্রথমবার আশ্রম, আশ্রমপতি ও অভিনয় দেখিয়া সকলে এখনই মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছিলেন যে এবারে দল আরও বড়ো হইয়া উঠিল। তাহার উপর এবার জন্মোৎসবের ভিড়ও ছিল। সেই প্রচণ্ড রৌদ্রে বোলপুরের ভুবনডাঙার মতো জলহীন প্রান্তরে জন্মোৎসবের নামে দলে দলে ছেলে বুড়ো গিয়া হাজির। এবারে নীচু বাংলায় গৃহকর্ত্রী

হেমলতা দেবী ছিলেন না। কাজেই মেয়েদের অভিভাবক হইয়া রামানন্দ শুধু গেলেন না, তিনি নীচু বাংলাতেই রহিলেন। রবীন্দ্রনাথও দিনের মধ্যে যখনই ফাঁক পাইতেন এইখানে আসিয়া সভা জমাইতেন। মহিলা অতিথিদের সম্মানের জন্যই যে কেবল তিনি নীচু বাংলায় সভা করিতেন তাহা নয়, আরও একটা বিশেষ কারণ ছিল। ২৩ বৈশাখ রাত্রিতে বর্তমান লেখিকা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। তাহাকে লইয়া তাহার পিতা অত্যন্ত ব্যস্ত, তাহাকে ফেলিয়া কোথাও যাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের ধারণা হইল হয়তো তাঁহাদের আতিথ্যের ত্রুটিতেই পীড়া হইয়াছে। তিনি রাত্রিতে তিন-চার বার ডাক্তার লইয়া আসিলেন, ছেলেদের বলিলেন ভালো বিছানা করিয়া দিতে, ছেলেরা নিজেদের সমস্ত বালিশ বিছানা আনিয়া নীচু বাংলোয় জড়ো করিল। কিন্তু দিনের বেলা পাঠের সভা গানের সভা অন্যত্র করিলে পীড়িতা বালিকা ও তাহার পিতা সভার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হন এইজন্য নীচু বাংলার বারান্দাতেই সভা হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ তখন 'জীবনস্মৃতি' সবে লিখিয়াছেন। তিনি সেটি মেয়েদের পড়িয়া শুনাইতেন। পুরুষ অতিথিদের মধ্যে কেহ কেহ সভায় আসিয়া জুটিতেন, কেহ বা বলিতেন, "শান্তিনিকেতনটা এবার শান্তি নিকেতন হয়ে উঠল।" অবশ্য এই প্রকার অনুযোগের পর রবীন্দ্রনাথকে উঠিয়া যাইতে হইত, অসন্তুষ্ট অতিথিদের তুষ্টি বিধান করিতে।

এমনি করিয়া ক্রমে এই পরিবারের পরম আত্মীয় হইয়া উঠিলেন রবীন্দ্রনাথ। রামানন্দ অসুস্থ কন্যাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিবার পরও তিনি বার বার খবর লইতে লাগিলেন, লিখিলেন, "মাতা শান্তার শরীর এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই শুনিয়া দুঃখ বোধ করিতেছি—তাঁহার এই অস্বাস্থ্যের জন্য আমাদের আতিথ্য যদি কোনো অংশে দায়ী হয় তবে সে আমার পক্ষে অত্যন্ত পরিতাপের কথা।"

ফিরিবার সময় রামানন্দ 'প্রবাসী'তে 'জীবনস্মৃতি' প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে ৯ জ্যৈষ্ঠ লিখিলেন, "আমার জীবনস্মৃতি প্রবাসীতে বাহির করিবার পক্ষে আপনার অনুরোধ ছাড়া আর একটি কারণ ঘটিয়াছে।" কারণটি আর কিছু নয়, আশ্রমের এক অত্যুৎসাহী শিক্ষক রবীন্দ্রনাথকে বোধহয় না বলিয়াই মফঃস্বলের কোনো এক সভায় জন্মোৎসব উপলক্ষে জীবনস্মৃতির একটি নকল পড়িতে পাঠান। পাছে তারা বিকৃতভাবে কিছুতে উহা প্রকাশিত করিয়া ফেলে এই ভয়ে রবীন্দ্রনাথ উহা তাড়াতাড়ি 'প্রবাসী'তে ছাপিতে চান।

ইহার পর হইতে রবীন্দ্রনাথ যখনই কলিকাতায় আসিতেন কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের সমাজপাড়ার গলিতে একবার দেখা না দিয়া যাইতেন না। সেই গলির ওই বিশেষ ছোটো বাড়িটি তখন তাঁহার অনুরাগিবৃন্দে পরিপূর্ণ। সপুত্রকন্যা রামানন্দ তো ছিলেনই, তাহার উপর চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও তখন প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক হইয়াছেন। এই যুগে চারুবাবুর প্রিয়তম ও পূজ্যতম ব্যক্তি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথও কলিকাতায় আসিবার পূর্বে তাঁহাকে "অয়মহং ভোঃ" বলিয়া স্বাক্ষরহীন একটি করিয়া কার্ড পাঠাইতেন। মনোরমা দেবীর সঙ্গে তখনও রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয় নাই। তাই একদিন কবি তাঁহার জ্যেষ্ঠাকন্যা বেলা দেবীকে লইয়া আসিয়া হাজির। কবি আসিয়াই বলিলেন, "রামানন্দবাবু, আপনি মনে করবেন না যে আপনিই কেবল কন্যাদের নিয়ে বেড়াতে পারেন, আমিও পারি।"

সেইদিন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের আয়োজনে সুবোধচন্দ্র মহলানবিশের তিনতলার ঘরে 'অচলায়তন' পড়া হয়। গান এবং পড়া সমস্তই কবি একলা চালাইলেন।

সময়ে-অসময়ে শান্তিনিকেতন হইতে রামানন্দের পরিবারে নিমন্ত্রণ আসিত। 'উৎসবের সময় যাইব' বলিলে রবীন্দ্রনাথ বলিতেন, "উৎসব হলে তাঁরা আসবেন এ কোনো কাজের কথা নয়, তাঁরা যখনই আসবেন তখনই উৎসব।"

বাংলা ১৩১৮ সালেই মুলুকে শান্তিনিকেতনে পড়িতে পাঠাইবার কথা হয়। কিন্তু তখন সে নিতান্ত শিশু, তাহার উপর অসুস্থ, কাজেই সে স্বয়ং আশ্রমে গিয়া সমস্ত পছন্দ করিয়া খুশি হইয়া আসিবার পরও তাহাকে পাঠানো গেল না। আরও একটু বড়ো হইলে কয়েক বৎসর পরে সে আশ্রমের ছাত্র হইয়াছিল।

আশ্রমে রামানন্দ সপরিবারে যাইতেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথও তাঁহার পুত্র কন্যা পুত্রবধূ সকলকে এক এক করিয়া কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের ছোটো বাড়িটিতে লইয়া আসিতে লাগিলেন। তাঁহার খুব ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার পরিবারের সকলের সঙ্গেই এ বাড়ির সকলের আত্মীয়ের ন্যায় সম্পর্ক হয়। তাই যখনই তিনি কলিকাতা আসিতেন তখনই কারণে-অকারণে দুই বাড়িতে আসা-যাওয়া লাগিয়া থাকিত। মাঝে মাঝে জোড়াসাঁকোতে ভোজের নিমন্ত্রণও হইত। মনোরমা দেবী নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কিংবা বাড়ির মেয়েরা বাড়িতে আসিলেই স্বহস্তে খাবার করিয়া তাঁহাদের মিষ্টিমুখ করাইবার আয়োজনে লাগিয়া যাইতেন। তাঁহার এই সাদর অভ্যর্থনাকে রবীন্দ্রনাথ কখনো অবহেলা করিতেন না, সন্দেশের একটা টুকরাও তিনি ফেলিয়া যাইতেন না, কী জানি যদি মনোরমা দেবী ক্ষুণ্ণ হন। এমনি ঘরোয়া ধরনের সম্পর্ক দিনে দিনে গড়িয়া উঠিতে লাগিল।

কাজের সম্পর্কও ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হইতে লাগিল। 'প্রবাসী'র সহিত সম্পর্ক তো বাড়িলই, উপরন্তু কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজে কি অন্যত্র যেখানে যখন রবীন্দ্রনাথকে আনিবার ইচ্ছা কোনো দলের হইত, তাঁহারা আসিয়া ধরিত রামানন্দকে। তাঁহাকেই অনুরোধ উপরোধের ভার লইতে হইত, তাঁহাকেই দিনক্ষণ ঠিক করিতে হইত। প্রথম বোধ হয় বাংলা ১৩১৮র ভাদ্রোৎসবে (১৯১১ খ্রি.) 'ধর্মের অর্থ' প্রবন্ধ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পঠিত হয়। লোকে লোকে মন্দিরের জানালা দরজা ভাঙিয়া ফেলিবার উপক্রম। রবীন্দ্রনাথ বাহিরে জুতা রাখিয়া মন্দিরে ঢুকিলেন। যখন ফিরিলেন তখন জুতা জোড়াটি কে লইয়া পলাইয়াছে। সে ব্যক্তি তাঁহার পদধূলির সন্ধানেই জুতা জোড়া লইয়াছিল ধরিয়া লওয়া ভালো। যাহাই হউক, তাহার পর তিনি সাধারণ সমাজ-মন্দিরে আসিলে অনেক সময় প্রবাসী অফিসের নীচের ঘরে তাঁহার জুতা লুকাইয়া রাখা হইত। ব্রাহ্মসমাজের কোনো উৎসবে রবীন্দ্রনাথকে রামানন্দ আহ্বান করিলে একবার তিনি লিখিলেন, "আপনার অনুরোধ পালন না করা আমার পক্ষে কঠিন, সেইজন্যই আপনার প্রস্তাবে রাজী হইলাম, নহিলে ভিড় করিবার ইচ্ছা আমার একেবারেই ছিল না।" তাঁহার অনুরোধে একবার নয়, বহুবার রবীন্দ্রনাথকে ধরা দিতে হইয়াছিল।

এক-একদিন রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকো হইতে হাঁটিয়াই 'প্রবাসী' অফিসে চলিয়া আসিতেন। ফিরিবার সময় কখনো গাড়ি জুটিত কখনো বা জুটিত না। মাঝে মাঝে চারুবাবু নিচু চাল-দেওয়া থার্ড ক্লাস ঘোড়ার গাড়ি আনিয়া হাজির করিতেন। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে সমস্ত পথ মাথা নিচু করিয়া যাইতে হইত। ইহাকে তিনি বিনয় শিক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া পরিহাস করিতেন। এবং ভবিষ্যতে আবার এইরূপ যানে চড়িবার আশঙ্কা থাকিলেও সুবিধা পাইলেই আবার একদিন হাঁটিয়া আসিয়া হাজির হইতেন।

রবীন্দ্রনাথ এই সময় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। 'তত্ত্ববোধিনী'তেও কোনো কোনো বিষয়ে সংকলন প্রকাশিত হইত। তাহার জন্য তিনি প্রবাসী অফিস হইতে

নানা দেশের সাময়িক পত্র লইতেন। একবার লিখিলেন, "সাময়িকপত্র যাহা পান তাহার ব্যবহার শেষ হইয়া গেলে আমাকে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিবার জন্য আজই আপনাকে চিঠি লিখিতে যাইতেছিলাম।" অনেক সময় এই কারণে কিংবা অন্য কারণেও কাগজপত্র চিঠি লিখিবার পূর্বেই শান্তিনিকেতনে পৌঁছিত।

রবীন্দ্রনাথের রচনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হয় এই ইচ্ছা রামানন্দের চিরদিন ছিল। কিন্তু কবির পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও তাঁহার কোনো বই কি রচনাসমস্টি টেকস্ট-বুক কমিটিতেও পাঠ্য হয় নাই। 'প্রবাসী'তে এ বিষয়ে রামানন্দ দীর্ঘকাল ধরিয়া আন্দোলন করেন। পরে তিনি একটি স্কুলপাঠ্য পুস্তক করিবার প্রস্তাব করেন। এই কারণেই 'পাঠসঞ্চয়' পুস্তকটি ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে গ্রথিত হয়। কপি তৈয়ারি হইবার পর রবীন্দ্রনাথ লেখেন, "বলা বাহুল্য যদি এই কপির মধ্যে কোনো কারণে কোথাও কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্জন আবশ্যক বোধ করেন তবে কুণ্ঠিত হইবেন না। বইয়ের নাম কী হইবে যদি ভাবিয়া ঠিক করেন তবে আমি বাঁচি।" পরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংই 'পাঠসঞ্চয়' নাম দেন। এই বইটি সম্ভবত প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন রামানন্দ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বই পাঠ্য করা গেল না। রবীন্দ্রনাথ ক্ষুণ্ণ হইয়া লিখিলেন, "'পাঠসঞ্চয়' তো চলিল না। অতএব লাভের হিসাবটা এখন আলোচনা করিবার বিশেষ কোনো তাড়া নাই, আপাতত, ওটা ছাপার খরচ সম্বন্ধে বোধ হয় বিবেচনা করিয়া দেখার সময় আসিয়াছে।...কত খরচ হইয়াছে সে খ রটা জানাইবেন।" বইটি তখনকার দিনে বিক্রয় করাও কষ্টকর ছিল। রবীন্দ্রনাথ উদ্‌বিগ্ন হইয়া সেজন্য চিঠি লিখিতেন। শেষে বোধহয় বিদ্যালয়ে নিজেদের ছাত্রদের পাঠ্য করেন। সম্ভবত ছাপার খরচ রামানন্দই বহন করিয়াছিলেন। এই সময় শান্তিনিকেতনে আর যাঁহারা উৎসবাদিতে সর্বদা যাইতেন এবং রবীন্দ্রনাথের অনুরক্ত বন্ধু ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয়, সুকুমার রায় ও কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। রামানন্দ ও যদুনাথ অনেক সময় নীচু বাংলায় আহারাদি করিতেন। মেয়েদেরও সেখানেই আহারের ব্যবস্থা হইত।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎপূর্তি উপলক্ষে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ২৮ জানুয়ারি টাউন হলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে এক বিরাট সভার আয়োজন হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে রামানন্দও (অন্তরালে) একজন ছিলেন ; তবে যাঁহাদের নামে চিঠি বাহির হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে তিনি ছিলেন না। টাউন হল লোকে লোকারণ্য, তখনকার দিনে টাউন হলের সভায় মেয়েদের ভিড় বেশি হইত না, বিশেষ বিশেষ পরিবারের এবং ঠাকুরবাড়ির কয়েকটি মহিলা মাত্র গিয়াছিলেন। আর ছিলেন জন্মোৎসব-উপলক্ষে বোলপুরযাত্রী সেই বালিকাদের দল। তাঁহারা যোলোজন সভায় রবীন্দ্রনাথকে পুষ্প-অর্ঘ্য দিলেন। ইতিপূর্বে আর কোনো প্রকাশ্য সভায় মেয়েরা তাঁহাকে এরূপভাবে পুষ্প-অর্ঘ্য দেন নাই। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অপূর্ব অভিভাষণ এখনও মনে পড়ে। মেঘমন্দ্রস্বরে "কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন," বলিয়া তিনি শেষ করিলেন। রামানন্দ সভায় সস্ত্রীক পুত্রকন্যা লইয়া উপস্থিত ছিলেন। "প্রবাসী'তে তিনি লিখিলেন, "যাঁহারা তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) গ্রন্থাবলী নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের এবং বহুভাষাভিজ্ঞ কোনো কোনো সুপণ্ডিত ব্যক্তির মত এই যে তিনি বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং জগতের শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের মধ্যে আসন পাইবার যোগ্য।... তিনি বিশ্বসঙ্গীত শুনিয়াছেন। তাঁহার গদ্য রচনায় এবং কবিতায় তাহারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাই। নয়নগোচর রূপের জগৎ সৌন্দর্যের জগৎ অনেক কবি, অনেক বাঙালি কবি দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, তিনি এ বিষয়ে কাহারও অপেক্ষা কম শক্তিশালী নহেন;

কিন্তু ধ্বনির জগতের রূপ তাঁহার মতো করিয়া অনুভব করিতে ও নিপুণতার সহিত অন্যকে অনুভব করাইতে অল্প লোকই পারিয়াছে। শিক্ষা, সাধনা, শোক তাঁহাকে বিশ্বনাথের বাণী শুনিতে সমর্থ করিয়াছেন।...মানবপ্রাণের নিগূঢ় মর্মস্থলে পৌঁছিতে তাঁহার মতো আর কোন্ বঙ্গীয় লেখক পারিয়াছেন? মানবের বাহ্য আচরণের আন্তরিক কারণ কে এমন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন? তাঁহার হস্তে বঙ্গসাহিত্য জাতীয় সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিশ্বসাহিত্যের সমশ্রেণীস্থ হইয়াছে।—বাংলা ভাষায় যদি কেবল তাঁহার রচনাই থাকিত, তাহা হইলেও উহা বিদেশিদের শিখিবার যোগ্য হইত।" ('প্রবাসী' ১৩১৮ মাঘ)

১৯১১ খ্রিস্টাব্দ হইতেই রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাইবার কথা হয়। সেই সময় কাহার উপর যে বিদ্যালয়ের ভার দিয়া যাইবেন ইহা ভাবিয়া কবি উদ্বিগ্ন হইতেন। রামানন্দ কর্মভারপীড়িত মানুষ হইলেও তাঁহার কথাই রবীন্দ্রনাথের সকলের আগে মনে পড়িত। এতখানি নির্ভর ও বিশ্বাস সে সময় তাঁহার আর কাহারও উপর ছিল কি না সন্দেহ। তাই তিনি লিখিলেন (২৬ মাঘ ১৩১৮) :—

"বিদ্যালয়ের জন্য একটি অধ্যক্ষসভা স্থাপনের প্রস্তাব আপনাকে পূর্বেই জানাইয়াছি। আপনি ছাড়া আর কাহাবও নাম মনে পড়িতেছে না। আপনার সঙ্গে রথীন্দ্র ও সুবেন্দ্রকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।...আমি এখানে থাকিতে আপনি কি দুই-একদিনেব জন্য এখানে আসিবাব অবসর করিতে পারিবেন? একবার যদি আসা সম্ভব হয় তো আর্থিক ও অন্যান্য অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন।"

অধ্যক্ষসভা ঠিক কী ভাবে গঠিত হইয়াছিল জানি না। তবে ইউরোপ ও আমেরিকা হইতেও রবীন্দ্রনাথ যে রামানন্দের সঙ্গে বিদ্যালয়ের অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে অনেক চিঠিতে পরামর্শ করিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে নানা সংবাদ পাইতেন তাহার প্রমাণ কবির চিঠিতেই আছে। সে সকল পত্র পড়িয়া মনে হয় ইউরোপ যাইবার সময় তাহার বন্ধুটিকে বিশেষ কোনো একটা ভারে দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি কবির অনেক সমস্যার সমাধানও করিয়াছিলেন। ইলিনয় যাইবার পথে (২১ আশ্বিন, ১৩১৯) কবি লিখিতেছেন,

"বিদ্যালয়ের বর্তমান আর্থিক অবস্থা আপনার পত্রে বিস্তারিতরূপে জানিতে পারিলাম। ..জোর করিয়া বলিতে পারি না তবে আন্দাজে বলিতে পারি হাজারখানেক টাকা নূতন বাড়ি তৈরি করিবার জন্য পাঠাইতেও পারি. কিন্তু তাহাতেই কি সমস্যা পূরণ হইবে?"

পুনর্বার ১৭ অগ্রহায়ণ লিখিতেছেন,

"নূতন ছাত্রদের বেতন কুড়ি টাকা করা সম্বন্ধে একবার আলোচনা করিয়া দেখিবেন এবং পুরাতন ছাত্রদের অভিভাবকদেব কাছেও একবার দরবার করিবার কথা ভাবিয়া দেখিবেন।...ইতিমধ্যে ওই বাড়িটা (সুরুলের সিংহদের বাড়ি) বিদ্যালয়ের ব্যবহারে লাগাইবার কথা ভাবিবেন।"

বিদ্যালয়ের বাহিরে কলিকাতার সভাসমিতিতে যখন রবীন্দ্রনাথকে টানিয়া আনা হইত তখন মনোমত সভাপতি না পাইলে পাছে শেষরক্ষা না হয় এই ভয়ে কবি শঙ্কিত হইতেন। "ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা" প্রবন্ধ পড়িবার সময় বন্ধুকে সভাপতি নির্বাচনের ভার দিয়া কবি লিখিলেন,

"সভাপতির হাতে যেরূপ ক্ষমতা আছে তাহাতে সমস্ত বক্তৃতার মাথায় ঘোল ঢালিয়া দিয়া তিনি অক্ষত শরীরে বাড়ি চলিয়া যাইতে পারেন—এইটেই ভাবনার কথা।'

আশুতোষ চৌধুরী সভাপতি হইলে কবি খুশি হইতেন, না হয় তো আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথা ভাবিতে রামানন্দকে বলিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছামতো আশুতোষ

চৌধুরীকেই জোগাড় করা হয়। ১৯১২তে রামানন্দ ছিলেন ছাত্র সমাজের সভাপতি। তাই ১৯১২তে (১৫ মার্চ) তিনি সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথকে ছাত্রদের এক আলোচনা-সভায় লইয়া আসেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। পরে প্রবীণ ও নবীন অনেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত মহা উৎসাহে আলোচনা চালাইতে লাগিলেন। শেষে সভাপতি বাধ্য হইয়া তাঁহাদের থামাইয়া দিলেন।

১৯১২র মে মাসে রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করিবার কয়েক মাস পরে রামানন্দ সেপ্টেম্বর মাসে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিলাত পাঠাইয়া দেন। সেই সেপ্টেম্বরেই কবি চারুচন্দ্রকে লেখেন,

"রামানন্দবাবুকে আমার নমস্কার দিও এবং শান্তা সীতাকে বোলো যে এই দৈত্যপুরীর সদর রাস্তার সামনে বসে তাদের শীর্ণ নিভৃত গলিটির কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে।"

পুত্রের জন্য রামানন্দ যখন উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইতেন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সান্ত্বনা ও ভরসা দিয়া চিঠি লিখিতেন, তাহার স্বাস্থ্য পড়াশুনা সকল বিষয়ের খবর জানাইতেন।

১৯১৩র ১৩ কী ১৪ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল প্রাইজ' পাওয়ার খবর পাওয়া গেল। সে কী চাঞ্চল্য সারা শহরময়! রবিভক্ত, রবিনিন্দুক সকলেই ইউরোপ-প্রদত্ত এই সম্মানে মহা উল্লসিত। যাঁহারা চিরদিন রবীন্দ্রনাথের নিন্দা করিয়াছেন তাঁহারাও আজ অনুরাগীর দলে ভিড়িলেন।

২৩ নবেম্বর একটি স্পেশাল ট্রেনে কলিকাতার ভক্তেরা কবিকে শান্তিনিকেতনে অভিনন্দন জানাইতে চলিলেন। স্যর জগদীশচন্দ্র হইবেন সভার সভাপতি। রামানন্দের জীবনে এটি একটি অখণ্ড আনন্দের দিন হইবে মনে করিয়া তিনি সপরিবারে চলিলেন। তিনি আজিকার পুরস্কারের দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে নূতন আবিষ্কার করেন নাই। তিনি বহু বৎসর ধরিয়াই জানিতেন যে জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে আমাদের কবির আসন নির্দিষ্ট হইয়া আছে, এবং একথা তিনি স্বয়ং অনেকের আগে বলিয়াছিলেন। জগৎ আজ সেই দাবি স্বীকার করিল এইটুকুতেই তাঁহার আনন্দ। তাই তিনি লিখিয়াছিলেন, "রবীন্দ্রনাথের গৌরবে ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত হইল। মানবজাতির লাভ হইল এই যে সাহিত্যের মনোময় রাজ্যে কার্যত জাতি বর্ণ দেশ নির্বিশেষে মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইল। মানবাত্মা স্বরূপে আশায় আকাঙ্ক্ষায় যে সর্বদেশে এক, তাহা আবার একবার নূতন করিয়া বুঝা গেল।" শিশুর মতো আগ্রহ ও আনন্দ লইয়া তিনি কবিকে অভিনন্দন জানাইতে গিয়াছিলেন। মালাচন্দনাদি দান, অভিভাষণ, বক্তৃতাদির পর রবীন্দ্রনাথ শুধু একটি গান গাহিবেন এমন কথা শোনা গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মত পরিবর্তিত হইল। রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিলেন, কঠিন কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা। যাহারা ভক্ত অনুরাগী তাহারাও মনে করিল রবীন্দ্রনাথ তাহাদের ভক্তি ও প্রীতির অর্ঘ্যকে অসত্যের দান বলিয়া ফিরাইয়া দিতেছেন। যাহারা সত্যই ভান করিয়া গিয়াছিল তাহারা তো যোগ্য প্রতিদানই পাইল। জয়যাত্রার উল্লাস রৌদ্রতপ্ত বালুকার উপর জলপ্রবাহের মতো এক মুহূর্তে অদৃশ্য হইয়া গেল। রামানন্দ এমন কঠিন আঘাত বহুদিন পান নাই। কাগজে কাগজে রবীন্দ্রনাথের নামে কত কথাই প্রচারিত হইল। অনুরাগীরা অভিমান করিয়া রহিলেন—তাঁহাদের সংখ্যা কম হউক, বেশি হউক, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অনুরাগটুকু দেখিলেন না, ভ্রান্ত নীচ মানুষের বিদ্বেষটাই দেখিলেন!

মিত্ররা অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের ভালোবাসা ও সম্মানের অঞ্জলিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এই সব মানুষ তাঁহার কথায় আঘাত তো পাইয়াই ছিলেন, উপরন্তু অতিথিদের প্রতি কবির রূঢ় কথার জবাবদিহি করিতে না পারিয়া লজ্জায় সাধারণের

কাছে এবং বিশেষ করিয়া শত্রুপক্ষের কাছে তাঁহাদের অনেক দিন মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

অনুরাগের মর্যাদা যে দেন নাই ইহা রবীন্দ্রনাথ কিন্তু পরে অনেকখানি বুঝিয়াছিলেন। তিনি ২৫-শেই রামানন্দের ক্ষুদ্র বাসায় আসিয়া হাজির। ছোটো বড়ো সকলকে ডাকিয়া খবর লইলেন। সেদিন যে উত্তেজনার বশে তাহাদের দেখেন নাই, স্বীকার করেন নাই—ইহার জন্য দুঃখ প্রকারান্তরে জানাইয়া দিলেন। রামানন্দ তাঁহাকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "আমাদের চেয়ে আপনাকে বাহিরের কোনো লোক বা জাতি বেশি ভালোবাসিতে পারে ইহা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিব না।" রবীন্দ্রনাথ পরাজিত হইয়া বলিলেন, "আপনার কিংবা জগদীশ প্রভৃতির কথা আমি বলিনি।" তিনি চারুচন্দ্রের ক্ষুদ্র অফিস ঘরেও একবার ঢুকিলেন। চারুচন্দ্র অভিমানে ও বেদনায় দুইদিন আহার করেন নাই। কবি তাহার পর রামেন্দ্রসুন্দরের বাড়ির দিকে যাত্রা করিলেন। বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি গিয়া বোধহয় তাঁহাকে অভিমান ভাঙাইতে হইয়াছিল। পরে মাঘ মাসে রামমোহন লাইব্রেরির এক সভাতেও তিনি ওই বিষয়ে কিছু বলিয়াছিলেন।

বহু পরে বাংলা ১৩৩২-এর ফাল্গুনে রামানন্দ লিখিয়াছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়া, বাঙালি যে তাঁহাকে ভালোবাসে, ইহা বিশ্বাস করিয়াছেন দেখিয়া সাতিশয় সুখী হইলাম। এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহে আমরা বরাবর যেমন দুঃখ অনুভব করিতাম, তেমনি তাঁহার ভ্রমে হাসিও পাইত স্বীকার করিতেছি।"

বাঙালিরা অর্থাৎ কোনো কোনো বাঙালি যে নোবেল প্রাইজ পাইবার পূর্বেও রবীন্দ্রনাথকে চিনিয়াছিল একথা ১৩২০ সালেই রামানন্দ প্রকাশ্যে বলিলেন। তিনি ১৩২০র অগ্রহায়ণ মাসে 'প্রবাসী'তে বলিয়াছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ বিলাত গিয়া তাঁহার 'গীতাঞ্জলি'র ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিবার অনেক পূর্ব হইতেই তাঁহাকে জগতের জীবিত সাহিত্যিকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে সমর্থ সমঝদার লোকের, বা এরূপ রসজ্ঞের মতো বুঝিয়া সুঝিয়া জ্ঞানপূর্বক গ্রহণ করিবার লোকের একান্ত অভাব বাঙ্গালা দেশে ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে আমরাও শেষোক্ত ব্যক্তিদের মতো রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যগৌরব কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।"

ইহার পর আসিল 'সবুজপত্রে'র যুগ। ১৩২১-এর বৈশাখ হইতে 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হইল। প্রমথনাথ চৌধুরী সম্পাদক, তবে লেখা অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের। 'সবুজপত্র' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের লেখা একরকম বন্ধ হইয়া গেল। প্রথম বৎসর (১৩২১) তিনি 'প্রবাসী'তে কোনো লেখাই দেন নাই। তবে 'প্রবাসী'র 'কষ্টিপাথরে' তাঁহার বিখ্যাত গল্প 'স্ত্রীর পত্র' এবং কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা তোলা হইয়াছিল। মনে হইতেছে গল্প তোলাতে 'সবুজপত্রে'র দল আপত্তি করেন। সুতরাং ইহার পর হইতে আর কোনো গল্প 'সবুজপত্র' কিংবা 'ভাণ্ডার', 'ভারতী' প্রভৃতি হইতে 'প্রবাসী'তে তোলা হয় নাই। কোনো এক সময় রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও প্রবন্ধাদি কষ্টিপাথরে উদ্ধৃত করিবার অধিকার প্রবাসী-সম্পাদককে স্বয়ং দেন। এইজন্য প্রবন্ধ ও কবিতা 'কষ্টিপাথরে' অনেক সময় উদ্ধৃত হইত। কিছুদিন কেবলমাত্র কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, প্রবন্ধও বাদ গিয়াছে। 'প্রবাসী'তে কিছু লেখা তোলাতে শুধু যে 'প্রবাসী'র লাভ হইল তাহা নয় ; ইহাতে একমাত্র 'প্রবাসী'র ফাইলেই রবীন্দ্রনাথের লিখিত বহু জিনিসের একত্রে সন্ধান পাওয়ার সুবিধা বর্তমান ও ভবিষ্যতের অনুসন্ধিৎসুদিগের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। এ বিষয়ে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' (মাঘ-চৈত্র ১৩৫০)

লিখিয়াছেন,

"(প্রবাসী-সম্পাদক) সুপরিচিত ও অপরিচিত বহু সাময়িক পত্র থেকে রবীন্দ্র-রচনা এই দুটি কাগজে সঙ্কলন করে এসেছেন ; তার মূল্য এখন উপলব্ধি করা যাচ্ছে। এই সব সাময়িকের অনেকগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য, অনেকগুলি অল্পদিন মাত্র স্থায়ী হয়েছিল এবং এখন কোথায় তার চিহ্ন নেই—ফলে সম্পূর্ণ রবীন্দ্র-রচনা সংকলনের কাজে এই পত্রিকা দুটি এখন অমূল্য সহায়। বস্তুত রবীন্দ্রচর্চা ও রবীন্দ্র-জীবনের আলোচনা প্রবাসী, মডার্ন রিভিউর সহায়তা ছাড়া সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভবই নয়। দেশে ও বিদেশে ববীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত সামান্যতম ঘটনার উল্লেখও এই পত্রিকা দুটিতে সসম্মানে স্থান পেয়েছে—রবীন্দ্র-জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিবরণ অন্য কোথাও আজ আব পাবাব উপায় নাই।"

হয়তো কেহ কেহ মনে করিতে পারেন 'প্রবাসী'র পরিপুষ্টি সাধনের জন্যই কেবল রামানন্দ এই কাজ করিতেন। কিন্তু তাহা যে সত্য নয়, একথার সাক্ষ্য অনেকে দিতে পারিবেন। রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে এমন সামান্যতম ঘটনার কথাও তিনি 'প্রবাসী'তে লিখিতেন, এমন ক্ষুদ্রতম চিঠিও 'প্রবাসী'তে ছাপিতেন, এমন দেশপ্রিয় জননায়কদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের হইয়া বহু পৃষ্ঠাব্যাপী সংগ্রাম করিতেন, রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্য বিষয়ে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এমন অনেক প্রবন্ধ নিজের পত্রিকাগুলিতে লেখাইতেন যে তাহার কারণ নিঃস্বার্থ গভীর অনুরাগ ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। যখন রবীন্দ্রনাথের প্রতিবেশি হইয়া তিনি শান্তিনিকেতনে বাস করিতেন অথচ রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত রচনা 'সবুজপত্র' প্রভৃতিতেই প্রকাশিত হইত, তখনও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অপরের লিখিত দীর্ঘ আলোচনা 'প্রবাসী'তেই প্রকাশিত হইয়া দেশবাসীকে তাঁহার গৌরব সম্বন্ধে সচেতন করিত। মানুষ বলে 'আগুন কখনো ছাই চাপা থাকে না।' রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই রকম আগুন, তবু সেই আগুনের উপর জল ঢালিতে আমাদের দেশেব একদল বিখ্যাত ও অখ্যাত লোক প্রচুর চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পবনের মতো অগ্নির তেজ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন রামানন্দ। একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে রামানন্দের নিঃস্বার্থ অনুরাগ ও চেষ্টা না থাকিলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের জগৎব্যাপী প্রচার হইতে এবং তাঁহার আদর্শের প্রতি পৃথিবীর সম্মান জাগিতে আরও বহু বৎসর দেরি হইত।

ভারতের বাহিরে কবিকে চিনিবার সুযোগ মানুষ প্রথম পায় *M.R.*-এর সাহায্যে, ভারতেও আজ যাঁহারা তাঁহার জয়গান করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তখন কবির কুৎসা রটনায় ব্যস্ত ছিলেন। তখন কবির প্রকৃত সহায় হাতে গোনা যাইত, তাঁহাদেরই অন্যতম ছিলেন রামানন্দ।

বিশ্বভারতী পত্রিকা পূর্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছেন :

"শান্তিনিকেতন বা তার প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ববিশ্রুত হবার বহু পূর্ব থেকেই এই উভয়ের সঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিবিড় সম্বন্ধ। শান্তিনিকেতনের আর্থিক অবস্থা সে সময় অতি দীন, রবীন্দ্রনাথের সীমাবদ্ধ সংগতি ও অসীম ভরসাই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্ভর ; বামানন্দবাবুর সম্পাদিত পত্রিকা দুখানি তখনো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি ; এই সময় তিনি রবীন্দ্রনাথকে রচনার দক্ষিণাদানের ব্যপদেশে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অনেক সহাযতা করেছেন। এই সময়ের কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :—

"পরম দুঃখের দিনে তিনি আমার প্রবন্ধকে অর্থমূল্য দিয়েছেন—এমন সময়ে দিয়েছেন, যখন দাবি করলে বিনামূল্যেই পেতেন। সে কথা আজ মনে আছে। তখন আমার বিদ্যানিকেতনের ক্ষুধা মেটাবার জন্য হিতবাদীর তৎকালীন ধনশালী কর্তৃপক্ষের কাছে

আমার চার-পাঁচটি বইয়ের স্বত্ব বন্ধক রেখে সামান্য কিছু টাকা সংগ্রহ করেছিলেম। প্রায় পনেরো বৎসরেও তা শোধ হয় নি। আমার অন্য বইয়ের আয়ও তখন বাধাগ্রস্ত ছিল। অর্থাৎ সেদিন দান পাওয়ার পথে দয়া ছিল না, উপার্জনের পথে বুদ্ধির অভাব, সম্পত্তির উপর শনির দৃষ্টি। অথচ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নামে সরস্বতীর দাবি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। এমন সময় প্রবাসী-সম্পাদক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার প্রবন্ধের মূল্য দিয়েছিলেন। মাসিক পত্র থেকে এই আমার প্রথম আর্থিক পুরস্কার।"

রামানন্দের নিজেরই যখন অর্থের একান্ত অভাব তখন অর্থ তো তিনি দিয়াই ছিলেন, পুস্তক প্রকাশ, পুস্তক দান ইত্যাদিও করিয়াছেন। বিশ্বভারতী পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের কথাই উদ্ধৃত করিতেছেন,

"...অর্থই তো একমাত্র আনুকূল্যেব উপায় নয়। প্রবাসী-সম্পাদক সর্বদা তাঁর লেখার দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা মমত্বের বহুবিধ পরিচয়ের দ্বাবা বিশ্বভারতীর যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। আমি নিশ্চিত জানি, সেই আনুকূল্য দ্বারা তিনি আমার এই অতিভারপীড়িত আয়ুকেই রক্ষা করবার চেষ্টা কবেছেন। দুঃসাধ্য কর্তব্যভারে অর্থদানের চেয়েও সঙ্গদান প্রীতিদান অনেক সময়ে বেশি মূল্যবান। সুদীর্ঘকাল আমার ব্রতযাপনে আমি কেবল যে অর্থহীন ছিলেম তা নয়, সঙ্গহীন ছিলেম ; ভিতরে বাহিরে বিরুদ্ধতা ও অভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একা সংগ্রাম করে এসেছি। এমন অবস্থায় যাঁরা আমার এই দুর্গম পথে ক্ষণে ক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা আমার রক্ত-সম্পর্কগত আত্মীযের চেয়ে কম আত্মীয় নন, বরঞ্চ বেশি। বস্তুত আমার জীবনের লক্ষ্যকে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দৈহিক জীবনকেও সেই পরিমাণে আশ্রয় দান করেছেন। সেই আমার স্বল্পসংখ্যক কর্মসুহৃদের মধ্যে প্রবাসী-সম্পাদক অন্যতম। আজ আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকাব করি।"

'সবুজপত্রে'র যুগে 'প্রবাসী'কে বঞ্চিত করিলেও 'প্রবাসী'র প্রতি মমতা রবীন্দ্রনাথের কমে নাই। সে কথা তিনি স্বয়ং চিঠিতেই লিখিয়াছিলেন,

"প্রবাসীর প্রতি আমার মমতা কিছুই কমে নাই। আমাব মুস্কিল এই যে সবুজপত্রে ঢাকা পড়িয়াছি।...আজকাল আমার ক্ষমতাব মধ্যে প্রাচুর্য জিনিসটা নাই, তাই যেটুকু রচনা করি তাহাতে একটি কাগজের পেট কোনোমতে ভবে উদ্বৃত্ত থাকে না। নহিলে প্রবাসীকে কদাচ বঞ্চিত করিতাম না—প্রবাসীর জন্য আমার মন উদ্বিগ্ন থাকে ইহা নিশ্চয় জানিবেন।" (৫ আষাঢ় ১৩২১)

১৩২৪-এ (১১ কার্তিক) লিখিয়াছিলেন,

"প্রবাসীর লেখার জন্যে আমাকে মাঝে মাঝে তাড়া দেবেন, তাতে বুঝব এখনো আপনি বিশ্বাস করেন আমি লিখতে পারি।"

কিন্তু এ সময় রামানন্দ তাড়া দিতেন না : নিজেই এই যুগে তিনি অধিক পরিমাণে নানারকম চিন্তাপূর্ণ 'বিবিধ প্রসঙ্গ' লিখিয়া 'প্রবাসী'র উন্নতির চেষ্টা করিতেন। এই যুগের "পূজা ও সেবা" "কাব্য রচনা ও কাব্য সমালোচনা", "আনন্দ ও কাজ", "অগ্নিপরীক্ষা" প্রভৃতি বহু লেখার গভীর চিন্তাশীলতা ও স্থায়ী সাহিত্যিক মূল্য উল্লেখযোগ্য। সত্য কথা বলিতে কী 'তাড়া দেওয়া' কোনো কালেই তাঁহার নিয়ম ছিল না। তিনি জোরজবরদস্তি করিয়া লেখা আদায় করিবার মতো লোক ছিলেন না, তাহার প্রধান কারণ তাঁহার আত্মসম্মানজ্ঞান অসাধারণ ছিল।

এই সময় "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" প্রভৃতি রাজনৈতিক প্রবন্ধ "প্রবাসী' ছাড়া অন্য কোনো কাগজে প্রকাশ করা সহজ ছিল না। সেই কারণে এই প্রবন্ধগুলি 'প্রবাসী'তেই প্রথম প্রকাশিত

হয়। রাজনৈতিক বিষয়ে মন খুলিয়া আলোচনাও তখন রবীন্দ্রনাথ একমাত্র রামানন্দের সহিত করিতেন।

বাংলা ১৩২২ সালে রামানন্দের জন্মভূমি বাঁকুড়া শ্মশানে পরিণত হইবার উপক্রম হয়। তখন তিনি সারা বৎসর 'প্রবাসী'তে স্বয়ং বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ বিষয়ে লেখেন, তাছাড়া স্বতন্ত্র বহু চিত্র-সংবলিত প্রবন্ধও প্রকাশ করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী, বাঁকুড়া সম্মিলনী সকলেই অর্থ ও কর্মী পাঠাইয়া বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবা করিতেন। ইঁহাদের সংগৃহীত দুর্গতদের ইতিহাস এবং ইঁহাদের সৎকার্যের বিবরণ 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইত। বাঁকুড়া সম্মিলনীর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন রামানন্দ। তিনি অর্থ সংগ্রহ করিয়া 'প্রবাসী'তে প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া যথাস্থানে টাকা পাঠাইতেন। ব্রাহ্মসমাজেরও তিনি তখন একজন কর্মী।

এই সব নানারকম কাজে রামানন্দের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ শঙ্কিত হইতেন। তাই লিখিয়াছিলেন, "অবকাশই আপনার একমাত্র পথ্য, কিন্তু জানি তাহা আপনার পক্ষে দুর্লভ। তবু একথাটা মনে রাখা উচিত যে অর্থ সম্বন্ধে দেনা করাটা যেমন অনুচিত প্রাণ সম্বন্ধেও তাই। আপনি কিছুকাল হইতে প্রাণের তহবিলে ঋণের দিকে ঝুঁকিয়া কাজ চালাইতেছেন—এ সম্বন্ধে একেবারে কি কোনো জবাবদিহি নাই?" (২০ আশ্বিন ১৩২২)

এই বৎসর রবীন্দ্রনাথ মাঘোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দকে লইয়া আসেন। কথা হইল যে বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষে অর্থ সাহায্যের জন্য 'ফাল্গুনী' অভিনীত হইবে। 'ফাল্গুনী'র সহিত রবীন্দ্রনাথ একটি নূতন নাটক 'বৈরাগ্যসাধন' জুড়িয়া দিলেন। তিনি স্বয়ং সাজিলেন কবিশেখর। চুয়ান্ন বৎসর বয়সের কবি অবনীন্দ্র প্রভৃতির মোহন তুলিকা-স্পর্শে ত্রিশ বৎসরের রূপ ধারণ করিলেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ির ঠাকুরদালানে ও প্রাঙ্গণেই অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। সে যুগের ছেলেমেয়েরা গগনেন্দ্র ও অবনীন্দ্রের অভিনয় ইতিপূর্বে দেখে নাই। অবনীন্দ্রের শ্রুতিভূষণের অভিনয় চিরস্মরণীয়। 'প্রবাসী' অফিসের চারুচন্দ্র, সুরেশচন্দ্রও প্রহরীর ভূমিকা লইয়া অভিনয়ে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন।

১৩২২-এর 'প্রবাসী'তেই আছে "অভিনয়ে টিকিট বিক্রয় করিয়া ৭৯৪৯ এবং নাট্য দুটির চুম্বক বিক্রয় করিয়া ২২২ মোট ৮১৭১ আয় হইয়াছে। এই সমস্ত টাকাই বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য দেওয়া হইবে। অভিনয় উপলক্ষে যে নগদ ১০৩০ ব্যয় হইয়াছিল তাহার সমস্তই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়াছেন।" টিকিট বিক্রয়ের টাকা হইতে কিছু তাঁহারা স্পর্শ করেন নাই। দুই দিন অভিনয় করিয়া যাহা উঠিয়াছিল, সবই নিরন্নের সাহায্যার্থ দান করা হইয়াছিল। (ফাল্গুন ১৩২২)

১৯১৭-তে গ্রীষ্মের ছুটির সময় রামানন্দ শান্তিনিকেতনে অল্পকাল সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন। কিছুদিন ধরিয়াই কথা হইয়াছিল মুলুকে পড়াইবার জন্য আশ্রমে স্থায়ী ভাবে একটি বাড়ি করিয়া বাস করিলে হয়। যে মাটির বাড়িটি কিনিয়া থাকিবার কথা ছিল সেটি তখনও মেরামত শেষ হয় নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তৎসত্ত্বেও শান্তিনিকেতনে ছুটিতে বাস করিবার জন্য মনোরমা দেবীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় প্রত্যহ গোয়েন্দা ও পুলিশের কথা শুনিয়া শুনিয়া মনোরমা দেবী তখন কলিকাতার বাহিরে যাইবার জন্য ব্যগ্র। নিমন্ত্রণ পাইবামাত্র তিনি রাজি হইয়া গেলেন। 'দেহলি'তে তখন রবীন্দ্রনাথ থাকিতেন।

তাহারই পাশের বাড়িতে নেপালবাবুর গৃহে মনোরমা দেবী বাসস্থান বাছিয়া লইলেন। তখন নেপালবাবুর স্ত্রী দেশে গিয়াছিলেন। মনোরমা দেবীর সংসার নামে পাতা হইল, কিন্তু কার্যত প্রত্যহই তিন-চার বাড়ি হইতে নানা রকম খাদ্য আসিতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথের সমাদর তো ছিলই, তাহার উপর দ্বিপেন্দ্রনাথ, হেমলতা দেবী, দিনেন্দ্রনাথ, কমলা দেবী ইঁহারা সকলেই এই পরিবারটিকে শ্রদ্ধা, স্নেহ ও প্রীতির বন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন। এই সময় বোধহয় রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্রকে লেখেন, "রামানন্দবাবুকে আমাদের এই আশ্রমে আবদ্ধ করে ফেলবার জন্যে অনেকদিন থেকে সাধনা করচি।"

এই বৎসরই জুলাই মাস হইতে শান্তিনিকেতনের মাটির বাড়িটিতে রামানন্দের বাস আরম্ভ হইল। ছোটো একটি বাড়ি, তিনখানি মাত্র ঘর, তাহার চারিদিক ঘিরিয়া বারান্দা। বারান্দারই দুইকোণ ঘিরিয়া রান্নাঘর ও স্নানের ঘর। বারান্দাতে প্রথমে কাঠের খুঁটি, পরে মোটা মোটা ইটের থাম হইল। দেওয়ালে চুনবালি ধরাইয়া পাকা বাড়ির মতো পালিশ করা হইল, বারান্দার কোলে লাল কাঁকর ঢালিয়া সুদৃশ্য করা হইল, বেশ ছবির মতো দেখাইত কুটিরটিকে। ইহার কোণে একটি শিশু পেয়ারা গাছ ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়। বাড়ির প্রত্যেক ঘর হইতেই দেহলির উপর তলায় রবীন্দ্রনাথের ঘরটি দেখা যাইত। ভোরে উঠিলেই চোখে পড়িত, রবীন্দ্রনাথ পূর্বের বারান্দায় সূর্যের দিকে মুখ করিয়া উপাসনায় বসিয়াছেন। এই বাড়িটির কথা ১৩৪৮-এর ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে রামানন্দ লিখিয়াছিলেন, "প্রায় ২৩ বৎসর পূর্বে আমি শান্তিনিকেতনে অনেক সময় থাকতাম। তাঁর বাড়ির সামনেই একটা বাড়িতে থাকতাম—মধ্যেখানে ছিল একটা মাঠ। তিনি তখন এমন পরিশ্রমী ছিলেন যে একদিনও রাত্রে তাঁর লিখবার-পড়বার ঘরের আলো আমার শুতে যাবার আগে নিবতে দেখি নি। প্রত্যূষে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি হয় তিনি বারান্দায় উপাসনায় বসেছেন, নতুবা উপাসনা সেরে লেখা বা পড়ার কাজে গেছেন। সেকালে দুপুরে খাবার পরও তাঁকে কখনো শুতে বা হেলান দিতে দেখি নি; গ্রীষ্মে কাউকে তাঁকে পাখার বাতাস দিতে বা তাঁকে নিজে হাত-পাখা চালাতে দেখিনি। তখন শান্তিনিকেতনে বৈদ্যুতিক আলো বা পাখা ছিল না।" আশ্রমের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে পাখার বাতাস খাওয়া কিংবা হাত-পাখা চালানোর অভ্যাস রামানন্দেরও কখনো ছিল না।

সারাদিনই ইঁহারা দুইজন যেন পরস্পরের চোখের সামনে থাকিতেন। একটি মাঠের প্রান্তে দুটি ছোটো বাড়িতে দুই মনীষী প্রায় সারাদিনই কাগজ কলম ও বই লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। কে যে কাহার চেয়ে বেশি পরিশ্রম করিতেন জানি না। কবি ধনীর সন্তান ছিলেন, তাঁহার কোনো কোনো কাজে সাহায্য করিবার লোক ছিল। রামানন্দ সব কাজই নিজ হস্তে করিতেন। আশ্রমে তাঁহাকে সাহায্য করিবার কেহ ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ তখন কিছুদিন স্কুলের ছেলেদের ক্লাস নিতেন। তিনি অনেক কঠিন কবিতা বারো-তেরো বৎসরের ছেলেমেয়েদের পড়াইতেন। বালকদের বোধশক্তি ও গ্রহণশক্তির উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল। রামানন্দ শান্তিনিকেতনে থাকিলে এই সকল ক্লাসে যোগ দিতেন। অবশ্য কলিকাতার কোনো কোনো অধ্যাপক প্রভৃতি বয়স্ক আরও অনেকেই থাকিতেন। কিন্তু রামানন্দকে দেখিয়া কবি একটু সংকুচিত হইতেন। রবীন্দ্রনাথ বলিতেন, "মহাশয়, আমি ছোটো ছেলেদের পড়াই। তাদের বিষয়ে অভিজ্ঞতা আমার আছে। কিন্তু বড়োদের পড়াইবার অভিজ্ঞতা আমার নাই। সেখানে আপনি আমাদের চালাইতে পাবেন। আপনার ক্ষেত্রে তো আমি দেখিতে যাই না। আপনি কেন এই ছোটোদের আসরে আসেন?" (ক্ষিতিমোহন বাবুর প্রবন্ধ—মাঘ ১৩৫০, 'প্রবাসী')

শান্তিনিকেতনে রামানন্দ, এণ্ড্রুজ ও রবীন্দ্রনাথ।

রামানন্দের শেষ রোগশয্যায় তাঁহার ৭৮ বৎসরের জন্মদিন উপলক্ষে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সংঘের সভ্যেরা তাঁকে "একাধারে গুরু এবং গুরুভ্রাতা" বলিয়া উল্লেখ করাতে তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং সেই পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর পূর্বেকার আশ্রমের ইংরাজি ক্লাসের কথা সকৌতুকে উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন এই কারণে তিনি আশ্রমের একজন প্রাক্তন ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইবার অধিকারী এবং আশ্রমের দুই-তিনটি তৎকালীন ছাত্রছাত্রীকেও এইজন্যই তিনি কৌতুকভরে 'সহাধ্যায়ী' বলিতেন।

সেকালের দেহলী-র ছাদে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যহ সন্ধ্যায় একটি ডেক-চেয়ার লইয়া বসিতেন। অন্ধকারে একটা Mosquitol তেলের শিশি লইয়া তিনি বসিয়া থাকিতেন, হাতে পায়ে মাঝে মাঝে সেই তেল মাখিতেন। লেবুফুলের মতো একটা মৃদু গন্ধ দূর হইতে পাওয়া যাইত। এক এক করিয়া দুই-চারি জন মানুষ সেই অন্ধকারেই ছাদে আসিয়া জুটিতেন। রামানন্দ ও তাঁহার কন্যারা প্রায়ই সর্বপ্রথমে আসিতেন। অন্য লোক থাকিলে মেয়েরা চট করিয়া তাঁহার সামনে গিয়া বসিতেন না। রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিতেন, "আচ্ছা, মেয়েদের এই পিছনে বসার সাইকলজিটা কি তোমরা কেউ বলতে পার?"

তারপর সেখানে কত আলোচনা হইত। কখনো শেলি পড়া হইত, কখনো রাজনৈতিক বিষয়ে, কখনো ছোটো গল্প বিষয়ে কথা হইত। কবি নূতন লেখিকাদের নানা বিষয়ে লিখিতে উৎসাহ দিতেন। বিশ্বভারতী তখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কিন্তু সেই সব চিন্তা কবির মাথায় আসিত। তিনি শান্তা ও সীতাকে বলিতেন, "আমার ইচ্ছা করে তোমরা শাস্ত্রী মশায়ের কাছে ভালো করে সংস্কৃত সাহিত্য পড়।"

এই সময়ই বোধ হয় রামানন্দ প্রাদেশিক ছোটো বড়ো শহরগুলিতে স্ত্রীলোক ও বালিকাদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথের নিকট করেন। রামানন্দ বলেন, যে-সকল স্ত্রীলোক ও বালিকা নানা কারণে স্কুল কলেজের শিক্ষা পায় নাই এবং পাইবে না, তাহারা ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করিয়া যাহাতে পরীক্ষা দিতে পারে তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। রামানন্দ এই কার্যে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্মতি ও অনুমোদন পাইয়াছিলেন। তাহার পর কার্যত কোনো কিছুই হয় নাই। কি কারণে হয় নাই তাহার নিজের দিকের কারণ রামানন্দ জানিতেন। কবির পক্ষের কারণ রামানন্দ জানিতেন না এবং জানিবার চেষ্টা করেন নাই। এই ঘটনার কথা ১৩৪৩-এর বৈশাখের 'বিবিধ প্রসঙ্গে' আছে। কারণ বহু বৎসর পরে ১৩৪৩ সালে 'শিক্ষা সপ্তাহে' রবীন্দ্রনাথ এইরূপ একটি প্রস্তাব তাঁহার প্রবন্ধে করেন।

বিলাতের Home University Library-র পুস্তকাবলীর মতো বাংলা নানা-বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ ছোটো ছোটো পুস্তক প্রকাশের একটা পরিকল্পনা রামানন্দের মনে ছিল। তিনি এই কথা রবীন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এই কার্যটি বাঙালি মনীষীদের সাহায্যে করা সম্ভব কিনা জানিতে চাহিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ অনুমোদন করেন এবং পরে ইহার জন্য একটি কমিটি হয়।

'প্রবাসী'তে (আষাঢ়, ১৩৪৮) সম্পাদক লিখিয়াছিলেন, "আমরা অনেক বৎসর পূর্বে সর্বসাধারণের বাড়িতে বসিয়া জ্ঞান লাভের সুবিধার নিমিত্ত বিলাতি Home University-র অনুরূপ কতকগুলি বাংলা বহি লিখাইবার ও প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। সেই প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগিয়াছিল, একখানি চিঠিতে জানাইয়াছিলেন। যে-রকম বহি মনে রাখিয়া ওই প্রস্তাব করিয়াছিলাম (বিশ্বভারতী)

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালাতে সেইরূপ বহি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।" ১০ অক্টোবর ১৯২৮-এ লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে আছে "হোম য়ুনিভার্সিটির কথাটা আমার মনে লেগেছে। এই রকম অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কতকগুলি পাঠ্যগ্রন্থ রচনার আশু প্রয়োজন হবে। সে কথাটাও ভেবে দেখবেন।"

বিদ্যালয়ের ছেলেদের নানা সভাসমিতিতে রামানন্দ উপস্থিত থাকিতেন, অনেক সময় সভাপতির কাজও করিতেন। সেই সব সভায় অনেক আন্তরিক উপদেশ তিনি দিতেন। ছেলেদের রিপোর্টের পুরাতন খাতায় তাহা আছে কী না কে জানে? দেহলী-র ছাদে "কাবুলীওয়ালা", "সমাপ্তি", "পোস্টমাস্টার", "দুরাশা" প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের নানা ছোটো গল্পের জন্মকথা আলোচিত হইত। অল্প কথা বলিলেও রামানন্দ নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে অনেক প্রসঙ্গ আদায় করিতেন। নিজেও তাঁহাকে নিজের নানা কল্পনার কথা বলিয়া ও অন্য নানা প্রসঙ্গ শুনাইয়া নূতন নূতন কর্মচিন্তায় অনুপ্রেরণা দিতেন। ১৩৪৩-এর 'প্রবাসী'তে সম্পাদক স্বয়ং লিখিয়াছিলেন,—"আমরা অনেক সময় শান্তিনিকেতনে কাহারও কাহারও কাছে বলিয়াছি যে, যেমন ভিন্ন দেশ হইতে জার্মানিতে, ফ্রান্সে, ইটালিতে শিক্ষার জন্য গেলে ছাত্রেরা সেই সেই দেশের ভাষা শিখিতে বাধ্য হন, সেইরূপ বঙ্গের বাহির হইতে ভিন্ন ভাষাভাষী যাঁহারা শিক্ষার জন্য বিশ্বভারতীতে আসেন, তাঁহাদের বাংলা শিক্ষা দেওয়া উচিত। নতুবা বিশ্বভারতীতে শিক্ষা লাভের প্রধান যে উপকার ও আনন্দ রবীন্দ্রনাথকে জানা, তাহা হইতে তাঁহারা বহু পরিমাণে বঞ্চিত হন। আমরা যখন এইরূপ কথা বলিতাম, তখন শান্তিনিকেতনে কলেজের অবাঙালি ছাত্রদের বাংলা শিখিবার আয়োজন ছিল না।" অনেক সময় আমাদের দেশের সামাজিক দোষত্রুটির আলোচনা হইত। জমিদারেরা বিবাহাদিতে একশত ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া কীরকম খাদ্যের অপচয় করেন এবং দরিদ্র চাষীদের উপর জুলুম করেন এই সব বিষয় বলিতে ও শুনিতে শুনিতে তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন।

শান্তিনিকেতনে ছোটো বড়ো অনেকেই ছিলেন রামানন্দের প্রিয়বন্ধু। বৃদ্ধতম দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, আবার শিশুর মতো ইঁহার নিকট নানা আবদারও করিতেন। সর্বদা নিজের কাজ ও খেয়াল লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন বলিয়া এবং বয়সও যথেষ্ট হইয়াছিল বলিয়া যখন অনেক নিকট-আত্মীয়কেও চিনিতে পারিতেন না তখনও তিনি রামানন্দকে চিনিতে এবং তাঁহার সহিত নানা প্রসঙ্গ করিতে কখনো ভোলেন নাই। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিতেন, "প্রবাসী মঠের রামানন্দ স্বামী।" দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহাকে কী দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং কত বড়ো মনে করিতেন তাহা ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের ভূমিকা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। মাঝে মাঝে দেখা যাইত, দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার লেখা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে রামানন্দের কুটিরে হাঁটিয়া আসিতেন। সারাদিনই তাঁহার ভৃত্য নানাভাবে ভাঁজ করা কাগজে তাঁহার চিঠি লইয়া যাওয়া-আসা করিত। তিনি নিজের সব লেখাই 'প্রবাসী'তে ছাপাইতে পারিলে খুসি হইতেন। চারুবাবুর সহিতও দ্বিজেন্দ্রনাথের এই কারণে অনেক চিঠি চলিত। দ্বিজেন্দ্রনাথকে রামানন্দ এত ভালোবাসিতেন এবং ভক্তি করিতেন যে দ্বিজেন্দ্রনাথ একবার নিজের লেখায় (রেখাক্ষর বিষয়ে) সামান্য একটু পরিবর্তন প্রয়োজন বোধ করাতে দ্বিজেন্দ্রবাবুকে খুশি করিবার জন্য তিনি 'প্রবাসী'র একটি ছাপা ফর্মা নষ্ট করিয়া একটি নূতন ফর্মা ছাপিয়া দেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে, "পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো/সবার আমি একবয়সী জেনো।" রামানন্দ সেই রকম সকলের একবয়সী ছিলেন। তাঁহার বন্ধু ছিলেন একদিকে

দ্বিজেন্দ্রনাথ অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ, আবার দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের সহিতও তাঁহার বয়স্যের মতোই প্রীতির সম্পর্ক ছিল। দ্বিপেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী ছিলেন। শান্তিনিকেতনের আধুনিক অতিথিশালার একতলায় তখন ছিল দ্বিপেন্দ্রনাথের বাসস্থান। প্রত্যহ বৈকালে সেখানে তাঁহার বন্ধুদের এক বৈঠক বসিত। সেই বৈঠকে নেপালচন্দ্র রায়, ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতি রামানন্দের সহিত উপস্থিত থাকিতেন। নেপালচন্দ্র বলিতেন, 'এই বৈঠকে দেখা যাইত রামানন্দ তাঁহার প্রথম যৌবনের সেই সরসতা, সেই মজলিশ জমাইবার ক্ষমতা যেন ফিরিয়া পাইয়াছেন। এই সরসতা তাঁহার পুত্র অনিলের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল যেন তাঁহার অন্তরের মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো লুকাইয়া গিয়াছিল।' অনেক ছোটো ছোটো হাস্যরসাত্মক গল্পের পুঁজি তাঁহার ছিল। তাহা শুনিলে বুঝা যাইত, ছোটো বড়ো সব মানুষকেই তিনি মানুষের একটা সাধারণ পর্যায়ে ফেলিয়া দেখিতেন। এই সব গল্পে চাকরবাকর, বালকবৃদ্ধ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলের সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিশক্তি ও পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা কিরূপ সজাগ ছিল বুঝা যাইত। নেপালবাবু বলিতেন, 'অনিলের মৃত্যুর পর তিনি ভিতরে কী রকম hardened হয়ে গিয়েছিলেন। পরে চাকরি ছেড়ে কলকাতায় আসার পর পুলিস তাঁর পিছনে এমন ভীষণ ভাবে লেগেছিল যে তিনি বলেই তার মধ্যে প্রফুল্ল থাকতে পেরেছিলেন। এর উপর ছিল যুদ্ধের সময় কেদারের জন্য দুশ্চিন্তা, টাকাকড়ির টানাটানি। শান্তিনিকেতনে এসে বহু বৎসর পরে সেই শুষ্কতাটা কেটে গিয়েছিল। তাঁর sense of humour-ও (রসবোধ) দ্বিপুবাবুর মজলি" স আশ্চর্য খুলত। সে বিষয়ে ক্ষিতিবাবু অনেক জানেন। এখানে বামানন্দবাবু অনেকটা পুরাকালের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন।'

দ্বিপুবাবু মানুষকে খাওয়াইতে খুব ভালোবাসিতেন। যখন-তখন রামানন্দের কুটিরে বড়ো বড়ো টিন ভর্তি মাগুর মাছ আসিয়া উপস্থিত হইত। হঠাৎ একদিন দ্বিপুবাবু শুনিলেন যে বন্ধুটি নিরামিষাশী। তাঁহার বড়োই দুঃখ হইল। কিন্তু তিনি ছিলেন নাছোড়বান্দা। এবার টিন ভর্তি পান্তুয়া, কখনো বা রেকাবিতে গোলাপ ফুলের পাপড়ির আচার ইত্যাদি আসিতে লাগিল। নীচু বাংলা হইতে হেমলতা দেবী নানারকম রান্না থাকিয়া থাকিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। এমন একটাও সপ্তাহ যাইত না যখন দ্বিপুবাবু বন্ধুকে খাদ্যের ভেট না পাঠাইতেন। বাড়ির ছেলেদের ইহা একটা মহা আনন্দের বিষয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ মানসিক খাদ্যই বেশি দিতেন, কিন্তু তিনিও অকস্মাৎ কোনো কোনো দিন একটা মস্ত বড়ো পাঁউরুটি কী আর কিছু নিজেই হাতে করিয়া হাজির হইতেন।

মুলুও তাহার পিতার মতো আশ্রমভক্ত এবং আশ্রমের প্রিয় ছিল। সে খুব অল্পদিনেই বালকদের নেতা হইয়াছিল। তাহার শাসনকে ছেলেরা ভয় করিত এবং শ্রদ্ধা করিত। দুঃখী ও বঞ্চিতদের জন্য মুলুর প্রাণ সর্বদাই কাতর হইত। সে তাহার পিতার পুরানো খবরের কাগজ প্রভৃতি ঘাড়ে করিয়া বোলপুরের বাজারে গিয়া বিক্রয় করিয়া যা-কিছু পয়সা পাইত তাই দিয়া বই শ্লেট পেনসিল প্রভৃতি কিনিয়া ভুবনডাঙ্গার দরিদ্র ছেলেদের দিত এবং তাহাদের পড়াইবার ব্যবস্থা করিত। এই কাজে বিজয়বাসু প্রভৃতি কয়েকটি ছেলে তাহার সহায় ছিল। রবীন্দ্রনাথ মুলুর আগ্রহ দেখিয়া নিজের খবরের কাগজগুলিও মুলুকে বিক্রয় করিতে দিতেন। মুলুদের বাড়ির সামনের মাঠে এই ছেলেদের সে দুই-একবার ভোজ খাওয়াইয়াছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর মুলু তাহাদের দিয়া "ওয়া মনোরমা দেবীজি কি ফতে—" বলিয়া জয়ধ্বনি দেওয়াইত। মুলুর অভিনয়ের ক্ষমতা এবং রসবোধ আশ্চর্য ছিল। সে একবার 'ডাকঘরে' ঠাকুর্দা সাজিয়া কিছুদিন রিহার্সাল দিয়া অনেককে মুগ্ধ করিয়াছিল।

তাছাড়া সুকুমার রায়ের 'অদ্ভুত রামায়ণ' প্রভৃতি গানে শান্তিনিকেতনে এবং গিরিডিতে তাহার খুব প্রশংসা হইয়াছিল। আশ্রমের 'আনন্দবাজারে' প্রথম সে-ই হাস্যরসের অবতারণা করিবার জন্য "সীতাদেবীর চরণরেণু" "রামের পাদুকা" "ভীমের গদা" ইত্যাদি পৌরাণিক দ্রব্য আধুনিক জগৎ হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী খুলিয়াছিল। তাহার নাম ছিল মুক্তিদাপ্রসাদ, কিন্তু সে প্রসাদ নাম সই করিত। মুলুর মৃত্যুর পর তাহার পিতা মুলুর প্রবর্তিত বিদ্যালয়টির সাহায্যে তাহার স্মৃতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত এক হাজার টাকা দান করেন। সেই টাকার সাহায্যে এখনও প্রসাদ বিদ্যালয়ের সেবাকার্য চলিতেছে। এ ছাড়া মুলুর জন্মদিন ও মৃত্যুদিনে তাহার স্কুলের ছেলেদের খাওয়াইবার জন্য রামানন্দ আশ্রমে টাকা পাঠাইতেন।

রবীন্দ্রনাথকে ইংরাজি রচনায় উৎসাহিত করিতে রামানন্দ অদ্বিতীয় ছিলেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার অন্যকৃত অনুবাদ 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে প্রকাশিত হয়। কিন্তু রামানন্দের ইচ্ছা ছিল যে, কবি স্বয়ং নিজের কবিতার অনুবাদ করেন। কবি বাল্যকালে ইংরাজি বিদ্যাকে অবহেলা করিয়াছেন এই কথা জানাইবার ছলে নিজের কবিতাই উদ্ধৃত কবিয়া লিখিলেন :

"বিদায় করেছি যারে নয়নজলে
এখন ফিরাব তারে কিসের ছলে?"

ক্ষিতিমোহনবাবুর প্রবন্ধে আছে, "রামানন্দবাবুও ছাড়িবার পাত্র নহেন। আমার মনে আছে রামানন্দবাবু একদিন কবিকে বলিলেন, 'আপনি ইংরাজিকে নয়নজলে বিদায় করেন নাই। প্রেমের লীলার ওসব লোক-দেখানো উপেক্ষার ভঙ্গিতে আমি ভুলিব না। তাহার সঙ্গে আপনার যে হৃদয়ের প্রীতির যোগ আছে সে কথা আমার কাছে লুকাইবেন না।' দেখিলাম অবশেষে কবিকেই হার মানিতে হইল।" ইহার পর কবি নিজ কবিতার অনুবাদ শুরু করিলেন। প্রথম প্রথম সেগুলি 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রেই প্রকাশিত হইত। ক্রমে ইংরাজি গীতাঞ্জলি রচনা শুরু হইল। এই কার্যেও তিনি কবিকে প্রবৃত্ত করাইবার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি গদ্যেও নিজ প্রতিভার এইরূপ পরিচয় দিতে পারিবেন। তাই তিনি তাঁহাকে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 'চোখের বালি' তর্জমা করিতে বলেন। রবিবাবু 'চোখের বালি তর্জমা করা আমার পক্ষে বড়ো কঠিন' বলিয়া এড়াইয়া যান। পরে কবিরই পরামর্শে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার অনুবাদ করেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির যত অনুবাদ 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে প্রকাশিত হয় সবগুলিই রামানন্দ প্রথমে রবীন্দ্রনাথকে নিজে অনুবাদ করিতে বলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিয়ম ছিল ইংরাজি লিখিতে বলিলেই ঘোরতর আপত্তি করা। বিদ্রোহ করিয়া লিখিতেন, "তর্জমা করতে নিজেই কোমর বেঁধে লাগব এমন পালোয়ানি আমার কাছ থেকে এখন আর আশা করবেন না।" ফলে অনেক লেখা সুরেন্দ্রবাবু প্রভৃতিকে দিয়া তর্জমা করানো হইত, দুই-একটা তিনি স্বয়ং করিতেন। শান্তিনিকেতনে থাকিতে দেখা যাইত, রবিবাবু এক-একদিন একটা ইংরাজি লেখা লইয়া হাজির হইতেন, বলিতেন, "এই নিন মশায়, আপনি ইস্কুল-মাস্টার মানুষ, ব্যাকরণের ভুলগুলো মেজে-ঘষে ঠিক করবেন।" রামানন্দ কন্যাদের বলিতেন, "আমি কখনো তাঁহার লেখার উপর কলম চালাইবার প্রস্তাব করি নাই, যদিও এরকম গল্প আমার নামে রটিয়াছে। কবির লেখার আর্টিকেলের গোলমাল ও কমা-সেমিকোলন ছাড়া বিশেষ কিছু বদলাইবার প্রয়োজন হইত না।"

একবারমাত্র রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে আছে,

"কণিকার তর্জমাগুলি M. R.এর বাহির হইয়াছে শুনিয়া প্রথমটা বড়ো ভয়

পাইয়াছিলাম। কেননা সেগুলা কাঁচা অবস্থায় লেখা। তাহার পর আবার প্রায় নূতন করিয়া লিখিয়াছিলাম। যাহা হউক পড়িয়া দেখিলাম ভয়ের কোনো কারণ নাই—আপনি আগাগোড়া মাজিয়া ঘষিয়া প্রায় নূতন করিয়া দিয়াছেন।"

ইংলন্ডের India Society যখন 'চিত্রাঙ্গদা'র ইংরাজি অনুবাদ ছাপেন তখন তাহার Preface হিসাবে মহাভারতে বর্ণিত আখ্যানটি রামানন্দ ইংরাজিতে লিখিয়া দেন। এই একই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ সেটি লিখিবার অনুরোধ করিয়া বলেন, "আপনার হাতে জিনিসটিও ভালো হইবে।"

রামানন্দ একটানা শান্তিনিকেতনে বাস করিতেন না। তাঁহার কলিকাতার কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাসায় তিনি ও পরিবারস্থ সকলেই সর্বদা যাওয়া-আসা করিতেন। রবীন্দ্রনাথও একটানা শান্তিনিকেতনে থাকিতেন না। অনেক সময় রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় থাকিতেন এবং রামানন্দের উপর মৌখিক নানা কাজের ভার দিয়া যাইতেন। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' নামক বিখ্যাত রাজনৈতিক প্রবন্ধ ১৯১৭-র জুলাই কী আগস্টে কলিকাতায় দুইবার পঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে সভাপতি হইবার জন্য কলিকাতা হইতে ডাক দিলেন। কারণ এই লেখার পূর্বে তাঁহার সঙ্গে নানা রাজনৈতিক আলোচনা হইয়াছিল এবং তাঁহাকেই যোগ্যতম সভাপতি বলিয়া কবির মনে হয়। কিন্তু পারিবারিক কারণে রামানন্দ যাইতে পারিলেন না। সে বৎসর মন্টেগুর আসিবার বৎসর, সভা-সমিতি নানা রকম চলিতেছে। এই সময় রামানন্দ রবীন্দ্রনাথকে ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে লিখিতে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের তখন একটা বিশেষ কিছু বলা ও করা প্রয়োজন ছিল। বোধ হয় ইহার পরই "ছোট ও বড়" প্রবন্ধটি লিখিত ও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক প্রবন্ধ বলিয়াই ইহা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ লেখার পর ২২ কার্তিক ১৩২৪ রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,

> "Manchester Guardian আমার কাছে ভারতের আধুনিক সমস্যা সম্বন্ধে লেখা চাচ্ছে। এইটেকেই ইংরেজি করে তাদের দিলে তাদের এবং আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। বোধহয় এই প্রবন্ধটা কিছু উপকাবে লাগতে পারে সেজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি চাই ছুটি, আপনারা মঞ্জুব করেন না, সেটাতে পরিণামে আত্মপ্রসাদ লাভেরই কারণ ঘটে।"

কংগ্রেসের সময় একেশ্বরবাদীদের সম্মিলন হইবার কথা ছিল, রামানন্দ রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি হইতে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ আপত্তি করিয়া ওই পূর্বোক্ত চিঠিতেই লেখেন,

> "কিন্তু তাই বলে Theistic Conference-এর সভাপতিত্ব আমার কর্তব্যের একটা অঙ্গ এ আমি কোনো মতেই মান্‌তে পারিনে।...সুতরাং সভাপতিত্ব সম্বন্ধে আমি চির কৌমার্যে সত্যবদ্ধ হয়ে পড়লুম।"

এই সময়ের লেখাগুলি রামানন্দের নানারকম আলোচনা ও অনুরোধের ফলেই রবীন্দ্রনাথের লিখিবার ইচ্ছা হয়, সেইজন্য আবার কয়েকদিন পরে (৫-১১-১৯১৭) লিখিতেছেন,

> "আপনি যদি এই সময়ে আমাকে একটু ধাক্কা না দিতেন তবে আমি এই শরৎকালের স্বচ্ছ দিনগুলির মধ্যে ডুব মেরে নিছক নৈষ্কর্ম্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতুম, আমাব টিকি দেখা যেত না।"

'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ুর' নোটসের পাতায় যাহা উঠিত তাহা যে দেশ-বিদেশের সকল চিন্তাশীল মানুষকে ভাবাইবে ইহা রবীন্দ্রনাথ জানিতেন। তাই তিনিও সেক্ষেত্রে কখনো

কোনো তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিলে সম্পাদককে পাঠাইতেন। তিনি একবার চারুবাবুকে লিখিয়াছিলেন,

> "আমেরিকার Lynching-এর কয়েকটা সাক্ষ্য প্রমাণ রামানন্দ বাবুর কাছে ডাকে পাঠিয়েচি, পেয়েছেন বোধ হয়—তাঁর notes-এর মশানে এই দুষ্কৃতিব বিবরণগুলিকে শূলে চড়ানো চাই।" (৭-৪-১৭)

এই বৎসর (১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ) মিসেস বেসান্ট কংগ্রেসের সভাপতি হন। রামানন্দ জাতীয় কংগ্রেসে অন্য-দেশীয়ের সভাপতিত্ব করার বিপক্ষে চিরদিনই ছিলেন। এবারও তাঁহার মত পরিবর্তিত হয় নাই। মিসেস বেসান্টকে সভাপতি করা লইয়া কংগ্রেসের মধ্যে ঘরোয়া বিবাদও হয়। যাঁহারা বেসান্টের বিপক্ষে ছিলেন তাঁহারা অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করেন বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে। যাঁহারা বেসান্টকে করার পক্ষে ছিলেন তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করেন। রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে বেসান্টকে নির্বাচন করার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া স্বমতে আনিবার চেষ্টায় তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও রামানন্দ নিজ মত ত্যাগ করিলেন না। যাঁহারা এই দলাদলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে টানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহারাও শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে রাখিতে পারিলেন না। রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিলেন এবং বৈকুণ্ঠনাথই নিজের পুরাতন আসন গ্রহণ করিলেন। সেইবারই কংগ্রেসে "India's Prayer" পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহার উদ্বোধন করেন। দেশের রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে যে রবীন্দ্রনাথের আসন নয় একথা রামানন্দই প্রথম হইতে বলিয়াছিলেন।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন-রিভিয়ু' পত্রে দীর্ঘকাল ধরিয়া ডায়ার এবং ও' ডায়ারের কীর্তি সম্বন্ধে যত আলোচনা সম্পাদক করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া যায় না। 'মডার্ন রিভিয়ু'র সম্পাদকীয় মন্তব্য দেশবিদেশে আগ্রহের সহিত পঠিত হইয়াছিল এবং *M. R.* সম্পাদকের মতই সুধীজনে ভারতের প্রকৃত মত বলিয়া ধরিয়াছিলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ 'স্যর' উপাধি ত্যাগ করেন। উপাধি ত্যাগ করার পূর্বে তিনি রামানন্দ এবং সি. এফ. অ্যান্ড্রুজ মহোদয়ের পরামর্শ গ্রহণ করেন। দুইজনের মধ্যে রামানন্দই উপাধি ত্যাগ অনুমোদন কবেন। রবীন্দ্রনাথ রামানন্দের সহিত পরামর্শ করিতে প্রায় আসিতেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া উভয়ে রাজনৈতিক আলোচনা চলিত। ইহা সেই বৎসর জুন মাসের গোড়ার কথা।

স্বদেশী আন্দোলনের পর গোয়েন্দা পুলিশের ভাবনা ছিল রামানন্দের নিত্য সহচর। যখন তখন উপরওয়ালাদের নিকট হইতে কড়া ধমক ও হুকুম আসিত। ইহার ফলে শুধু যে দুশ্চিন্তা ছিল তাহা নয়, আর্থিক প্রচুর ক্ষতিও ছিল। কত সময় সমস্ত ছাপা ফর্মা পুড়াইয়া নূতন ফর্মা ছাপিতে হইয়াছে।

দেশে পুলিশ ডিটেকটিভ প্রভৃতি হাঙ্গামে এবং পুত্রের দীর্ঘ প্রবাস-চিন্তায় সংসারে শান্তি চলিয়া যাইতে লাগিল। মনোরমা দেবী আশ্চর্য পতিব্রতা ও স্বামীর অনুরাগিণী ছিলেন। তিনি যখন বুঝিলেন যে একদল মানুষ তাঁহার স্বামীর পিছনে লাগিয়াছে তখন তাঁহার মন ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হইয়া অতিরিক্ত সন্দেহে সজাগ হইয়া উঠিল। বন্ধুরূপে শত্রু দুই-একবার দেখা যাইবার পর তিনি সকল বন্ধুকেই ভয়ে ভয়ে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। সেই পুরাতন বন্ধুপ্রীতি, আতিথ্য, বিশ্বমৈত্রীর ভাব যেন শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেল। আগের মতো বিশ্বসংসারকে আপনাব বলিয়া তিনি আর বিশ্বাস করিতে তো পারিতেনই না, বরং ক্রমে

সব মানুষকেই সন্দেহ করা তাঁহার স্বভাব হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন একটা সর্দির ঔষধের পাঁচনের সঙ্গে মুদির দোকান হইতে ভুল করিয়া ঝি-চাকরেরা কেহ একজন বেলেডোনার একটা শিকড় লইয়া আসিয়াছিল। রামানন্দ ও বাড়ির আরও দুইজন সেই পাঁচন খাইয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাহার মধ্যে একজন ছিল বাড়ির ঝি কিংবা রাঁধুনি। বাড়াবাড়ি দেখিয়া তাহাকে হাসপাতালে দিতেই বাড়িতে পুলিশ আসিয়া ঝি-চাকরদের উপর তম্বি আরম্ভ করিল। সে স্ত্রীলোকটির কিছু হইল না, সারিয়া উঠিল। কিন্তু রামানন্দ এই বিষাক্ত পাঁচন খাওয়ার ফলে দীর্ঘকাল মাথার অসুখে ভুগিলেন। মনোরমা দেবীর আশঙ্কা ভয়ানক বাড়িয়া গেল। তিনি স্বামীকে আর চাকর-দাসীর রন্ধন খাইতে দিবেন না বলিয়া সব কাজের উপর আবার স্বহস্তে দু-বেলা রন্ধন শুরু করিলেন। তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল, কেহ ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার স্বামীকে বিষ দিয়াছিল। তাঁহার কন্যারা তখন কলেজের ছাত্রী, কাজেই তাহাদের যথেষ্ট সাহায্য তিনি পাইতেন না, অধিকাংশ কাজই নিজেকে করিতে হইত। দুশ্চিন্তায় ও দুরন্ত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙিয়া আসিতে লাগিল।

আগেই বলিয়াছি, কনিষ্ঠ পুত্র মুলুর শরীর কলিকাতায় ভালো থাকিত না এবং শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় তাহার খুব পছন্দ হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে সেখানে পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু ছাত্রাবাসের খাওয়া-দাওয়া তাহার সহ্য হইত না, বাড়ির যত্ন তাহার প্রয়োজন ছিল। সেইজন্যই আশ্রমে একটি বাড়ি কিনিয়া তাহাকে লইয়া থাকা হইল। এ-ও একটা বড়ো খরচের ব্যাপার। অশোক তখন কিছুদিন বেঙ্গল লাইট হর্স ক্যাম্পে থাকিতেন। তিন ছেলের তিন জায়গায় বাসের জন্য খরচ যেমন অসম্ভব বাড়িল, সংসারও তেমনি ভাঙিয়া-চুরিয়া গেল। আশ্রমের মাটির বাড়িতে রামানন্দ তাঁহার দুই কন্যা ও কনিষ্ঠ পুত্রকে লইয়া থাকিতেন, দ্বিতীয় পুত্রকে লইয়া মনোরমা দেবী অনেক সময় কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাসায় থাকিতেন। প্রতি সপ্তাহের শেষে হয় তিনি অশোককে লইয়া শান্তিনিকেতনে আসিতেন নয় শান্তিনিকেতনের বাড়ি হইতে কেহ কলিকাতায় যাইতেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মের ছুটির পর দুই বৎসর এইরকম টানাপোড়েন করিয়া সংসার চলিল। মনোরমা দেবীর জীবনে প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ও বিচ্ছেদ-আশঙ্কা যত ক্ষতি করিয়াছে এমন আর কিছু করে নাই। তবু তিনি কর্তব্যবোধে সাময়িক বিচ্ছেদের ব্যবস্থা নিজে হাতেই করিতেন, কোনো বাধা দিতেন না। রামানন্দের স্নেহকাতর ও বেদনাপ্রবণ মন ভিতরে ভিতরে মুষড়াইত কিন্তু ভাঙিত না। তখন শান্তিনিকেতনই ছিল এই বেদনার টনিক।

শান্তিনিকেতন হইতে ফিরিয়া মুলুর মৃত্যু

১৯১৯এর এপ্রিল মাসে রামানন্দ শান্তিনিকেতনের বাসা কিছুদিনের মতো বন্ধ করিয়া চলিয়া আসেন। মনোরমা দেবীর শরীর তখন বড়ই ভাঙিয়া পড়িয়াছে, ডাক্তার বলিলেন, "আপনারা এখন সকলেই কিছুদিন এখানে একত্রে থাকিলে ভালো হয়।" সেই মতোই ব্যবস্থা হইল। কলিকাতায় থাকিবার ইচ্ছায় গ্রীষ্মের ছুটির পর মুলুকে কলিকাতায় হেয়ার স্কুলে ভর্তি করা হইল। ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইয়া কিছু দিন গোলমাল চলিতে লাগিল। এই সব ভাবনা চিন্তার কথা, পুলিশ হাঙ্গামার কথা মনোরমা দেবীকে কিছু বলা হইত না।

এই বৎসরই জুলাই মাসে কেদারনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন। বহুদিন পরে জ্যেষ্ঠ

পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়া পিতামাতার মনে শান্তি ফিরিয়া আসিল। মনোরমা দেবীর মুখের হাসি দেখিয়া মনে হইত মানসিক আনন্দ হয়তো তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্যের কিছু স্থায়ী উপকার করিতে পারিবে। কিন্তু বিধাতার বিধান অন্য রকম। বিধাতা রামানন্দকে পরীক্ষার পর পরীক্ষায় ফেলিয়া শোকের পর শোকের আঘাত দিয়া কেন তাঁহার জীবনধর্মের স্বাভাবিক প্রকাশের পথ বারে বারে বাধাগ্রস্ত করিয়াছিলেন জানি না। তাঁহার কর্মযোগ হইতে তিনি কখনো চ্যুত হন নাই বটে, কিন্তু জীবনের বহুদিকে বহির্মুখী যে আশ্চর্য প্রকাশের সম্ভাবনা ও সূচনা তাঁহার মধ্যে দেখা দিয়াছিল মৃত্যুশোক ও অন্যান্য বহু বিড়ম্বনা বারে বারে তাহাতে বাধা দিয়াছে। ফলে এই আশ্চর্য কোমল-প্রকৃতি, দরদী, প্রেমিক মানুষ সাধারণের নিকট শুধু কর্মী, শুধু যোদ্ধা, কী শুধু সাংবাদিক নাম লইয়া নীরবে বিদায় লইয়াছেন। যে-মানুষ জোর করিয়া তাঁহার অতি নিকটে আসিয়াছে সে ইহার পরও হয়তো সেই মানব-প্রেমিক কোমলচিত্ত চিরবালক মানুষটিকে দেখিতে পাইয়াছে, অন্যে পায় নাই!

সেপ্টেম্বর মাসে (১৯১৯) মাত্র পাঁচ দিনের কঠিন পীড়াতে শেষ মুহূর্তে 'মা'কে ডাকিয়া মুলু তাহার পিতা-মাতার ক্রোড় শূন্য করিয়া মুখের হাসি কাড়িয়া লইয়া চিরবিদায় লইল। রামানন্দ বেশি কথা বলিতেন না। কিন্তু মৃত পুত্রের শিয়রে দাঁড়াইয়া যে মর্মস্পর্শী প্রার্থনা তিনি করিয়াছিলেন তাহা যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারাই বিচলিত হইয়া ছিলেন। কয়েকটি কথায় প্রবাসী পুত্রের দীর্ঘ অদর্শন এবং পরলোকগত পুত্রের চির অদর্শনের গভীর বেদনা ফুটিয়া উঠিল। রোগের কয়টি দিন বালক পুত্রের প্রত্যেক কথা, ইশারা, চাহনির বাণীতে সে কী বলিতে চাহিয়াছিল, কী শারীরিক বেদনা, কী মানসিক দুঃখ পাইয়াছিল তাহা যেন তিনি পাঠ করিয়াছিলেন এবং নিজের একটি খাতায় ডায়েরির মতো লিখিয়া সেই বালকের নিকট নিজেদের ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। তিনি সেই খাতাতে লিখিয়াছিলেন,

"রাত্রির আঁধার শেষ হইলে ঊষার আলোক দেখা দেয়, সূর্য উঠে ;

> কিন্তু তোমাকে আর দেখিতে পাই না। সন্ধ্যার পর আকাশে নক্ষত্র উঠে, রাত্রে চাঁদ উঠে, কিন্তু তোমাকে দেখিতে পাই না। পৃথিবীব সব বং, সব ধ্বনি, সব বকম আকৃতি, সব রকম গতি বহিযাছে ; কিন্তু তুমি চক্ষুব অগোচর হওযায় আমার পক্ষে জগৎ হইতে আনন্দ চলিয়া গিয়াছে।
>
> ...বাবা, তোমার বিহনে ঘব শূন্য, পাড়া শূন্য, গলি শূন্য ; ..আমার জীবনের সব চেষ্টার কোনো লক্ষ্য আছে বলিয়া হৃদযে অনুভব করিতেছি না, কোনো চেষ্টা সফল হইলে আনন্দ পাইব বলিযা আগে যেমন পূর্ব হইতে কল্পনায় সুখ পাইতাম, এখন সেরূপ কিছুই অনুভব কবিতে পারিতেছি না।
>
> ...তোমার তিবোভাবে কষ্ট পাইয়া ও অনুতপ্ত হইয়া যদি আমার হৃদয়মনেব মলিনতা কমে, তাহাও আমাব যাতনায় বিষয়। বাবা. কষ্ট পাইলে তুমি. আর উপকৃত হইব আমি, ইহা দুঃসহ।"

এই কয়েক পাতা লেখা খাতাখানির অস্তিত্বের কথা কেহ জানিত না। রামানন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার একটি ছোটো বাক্সে রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি চিঠি, কন্যার লিখিত মনোরমা দেবীর একটি অপ্রকাশিত জীবনী ও এই খাতাটি একত্রে পাওয়া যায়। এগুলি তিনি সর্বদা সঙ্গে রাখিতেন বুঝা গেল। তিনি মুলুকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমাদের কুলপাবন পুত্র। তুমি হাড়িডোম মেথরের সঙ্গে আপনাকে সমান করিয়া ব্রাহ্মণ-বংশের জাত্যহঙ্কারের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আমাদের কুলপাবন হইয়াছ।"

এই কিশোর বালকের আকস্মিক মৃত্যুর পর রামানন্দের জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া

গেল। মৃত্যুর নিষ্ঠুর কঠিন আঘাতে মনোরমা দেবী জীবনের স্বাভাবিক ধর্মকে স্বীকার করিতেও ভুলিয়া গেলেন। তিনি আহারনিদ্রা, সংসারধর্ম সমস্তই ত্যাগ করিলেন। কিছু দিন তাঁহারই শুশ্রূষা হইল রামানন্দের কাজ। তাঁহাকে পুরী, এলাহাবাদ, কার্সিয়াং—নানাস্থানে ঘুরাইয়া সকাল-সন্ধ্যা ভ্রমণে লইয়া গিয়া মাঝে মাঝে একটু সুস্থ করিয়া তুলিতেন। কিন্তু আবার অল্পদিন পরেই মনোরমা দেবী জীবনের নিত্য কর্তব্যগুলি ছাড়িয়া দিতেন। রামানন্দের কুসুমকোমল প্রাণ যেন পিষ্ট হইয়া গেল। তিনি যেন জীবনের এই গভীর বেদনাগুলি ভুলিবার জন্যই ভারতবর্ষের নানা দুঃখ, সমস্যা ও সংগ্রামের মধ্যে আরও ডুবিয়া গেলেন। তিনি হইয়া উঠিলেন যোদ্ধা, কর্মী, সন্ন্যাসী।

নেপালবাবু বলিয়াছিলেন, "মানুষকে যে সুন্দর স্মিতহাস্যের সঙ্গে তিনি বরণ করিতেন তাহা অন্যের মধ্যে দুর্লভ। কিন্তু আবার দুরদৃষ্ট তাঁহার পিছনে লাগিল। তাঁহার সে হাসি নিভিয়া গেল। মুলুর মৃত্যু হইল। মুলুর মা আর সে মানুষ রহিলেন না। কী কঠিন কঠোর সে আঘাতগুলি ওই রকম স্নেহশীল মনে। কোনো কোনো দিকে তিনি তা ক্রমে জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পুরাতন মানুষকে আর ফিরিয়া পাওয়া গেল না। ক্ষণে ক্ষণে তাহার আভাস পাওয়া যাইত বটে, কিন্তু তিনি হইয়া উঠিলেন সম্পূর্ণ কর্মযোগী।"

বাস্তবিক পৃথিবীর সহিত প্রেমলীলার যে সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধ তাঁহার এই শোকের আঘাতের সঙ্গেই শেষ হইয়াছিল বলা যায়। কর্মই হইল তখন তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সে কর্মে ফলস্পৃহা, অর্থলিপ্সা, প্রতিদানের আশা, খ্যাতির মোহ, নাম রাখিয়া যাইবার একবিন্দু বাসনা কিছুই ছিল না। শুধু কর্তব্যই ছিল। বিধাতা যেন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনাকে ভুলিয়া যাও, আনন্দের আশা, খ্যাতির আশা, এমন কী স্নেহমমতার আকাঙ্ক্ষা কিছু মনে রাখিও না। তোমার কাজ সেবা করিবার, কিছু পাইবার অধিকার তোমার নাই।" কিছু পাইবার দাবি তিনি আর কাহারও কাছে বড়ো করেন নাই, শুধু দিয়া গিয়াছেন।

মুলুর নামে শান্তিনিকেতনে প্রসাদ নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য এই সময় এক হাজার টাকা দান করা হয়। তাহার পর মুলুর জন্মদিনে ও শ্রাদ্ধদিনে প্রতি বৎসর শান্তিনিকেতনে নৈশ বিদ্যালয়ের ছেলেদের খাওয়াইবার জন্য তিনি টাকা পাঠাইতেন, কখনো বা স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেন। মুলুর একটি জীবনী প্রকাশিত হয়, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ, C.F.Andrews, নেপালচন্দ্র রায় প্রভৃতির লেখা ছিল, মুলুর প্রিয় ক্রীড়াক্ষেত্রগুলির, তাহার প্রিয় গলি, সিঁড়ি, সমাজপাড়া ও আশ্রমের বিশেষ বিশেষ স্থান-সকলের ফোটোও বইখানিতে দেওয়া হইল।

শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম লিখিয়াছিলেন যে মুলুর মৃত্যুর পর তাহার পিতা সান্ত্বনাপত্রের উত্তর লিখিয়াছিলেন, "সেই পূর্বের মতো দিন আমার জীবনে আর আসিবে না।" বাস্তবিকই পূর্বেকার জীবন আর তিনি ফিরিয়া পান নাই। মনে পড়ে 'He never smiled again' এর কথা। ইঁহার হাসি অবশ্য চিরদিনই প্রভাত-কিরণের মতো মানুষকে সাদরে অভিনন্দন করিত : কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে পূর্ব হইতে চিনিতেন তাঁহারা সে হাসির অন্তরালে বিষাদের একটি ছায়া সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেন। সেই বিষাদের ছবিটি ফুটিয়াছিল অতুলচন্দ্র বসুর অঙ্কিত ছবিতে। কর্মে যখন তিনি ডুবিয়া যাইতেন তখন ছিল তাঁহার ধ্যানস্থ প্রশান্ত অন্য এক মূর্তি, তাহাতে আনন্দ কী বিষাদ কিছুরই ছায়া পড়িত না, একনিষ্ঠ সাধকের ঐকান্তিকতা ও দৃঢ় সঙ্কল্প, স্থির নিষ্কম্প বুদ্ধির দীপ্তি অন্য সমস্ত মানসিক প্রকাশকে ছাড়াইয়া উঠিত।

কিন্তু যখন তিনি কর্মযজ্ঞের মাঝে মাঝে অবসরকালে আপনাতে আপনি ফিরিয়া যাইতেন তখন সেই বিষাদের ছায়া তাঁহার প্রশান্ত মুখচ্ছবিকে আবার মেঘাচ্ছন্ন করিয়া তুলিত। তিনি স্বভাবত অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। কিন্তু ভাগ্য তাঁহাকে কর্মজীবনের অধিকাংশ কাল যে ব্রত যাপন করিতে বাধ্য করিয়াছিল তাহার ফলে তাঁহাকে সত্য ও ন্যায়ের অনুরোধে বহু বন্ধু ও দেশবাসীর সমালোচনা করিতে হইয়াছিল। অপ্রিয় কঠোর সত্য বলার ফলে জীবনে বহু বন্ধুবিচ্ছেদ (সাময়িক কিংবা চিরস্থায়ী ভাবে) তাঁহার ঘটিয়াছিল। কোথাও বা পূর্বের ঘনিষ্ঠতা সাধারণ ভদ্রতায় দাঁড়াইয়াছিল। নানা কারণে ও অকারণে বহু প্রিয়জনের নিকট কঠিন আঘাত তিনি পাইয়াছিলেন। এই বন্ধুবিচ্ছেদ ও প্রিয়জনের নির্মমতা বহু দিক দিয়াই তাঁহাকে আঘাত করিয়াছিল। তাঁহার নির্ভীক যোদ্ধার মতো জীবনের অন্তরালের অন্তঃসলিলা বিষাদ ধারায় তাই এই সকল দুঃখ আর-একটি স্রোত যোগ করিয়া দিয়াছিল। বামনদাস বসু, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি তাঁহার কয়েকজন বন্ধুর নিকট তিনি তাঁহার জীবনধারায় বিষাদের স্রোতে কোনো পাওনা পান নাই। বিধাতা মৃত্যুর আঘাতে তাঁহার এই বন্ধুদের তাঁহার নিকট হইতে অকালেই পরপারে লইয়া গিয়াছিলেন। ইঁহাদের বিয়োগ-বেদনা তিনি কখনো ভুলেন নাই।

পুত্রশোকাতুরা পত্নীকে লইয়া রামানন্দকে শেষবয়সে বহু দুশ্চিন্তার ও কঠিন পরীক্ষার ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছিল। সে সকল পরীক্ষার অন্তে তিনি যে অন্তর-লোকেও কোনো পুরস্কারই পান নাই তাহা বলা যায় না। কিন্তু বেদনার ও ব্যর্থতার যে মূল্য তিনি দিয়াছিলেন তাহার তুলনায় কিছুই পান নাই। তাঁহার পত্নীকে বহু শোক ও দুঃখের আঘাত হইতে, স্বাস্থ্যহীনতার আঘাত হইতে তিনি যে রক্ষা করিতে পারেন নাই, ইহার জন্য গভীর বেদনা ও দুঃখ তিনি আজীবন বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব ছিল সকল ত্রুটির জন্যই নিজেকে দায়ী করা। তাই মনে করিতেন তাঁহারই কোনো দোষে শোক, দুঃখ, স্বাস্থ্যহানি প্রভৃতিরও উৎপত্তি হইয়া থাকিতে পারে। ইহা তাঁহার মানসিক অশান্তির একটি কারণ ছিল। তাঁহার সাধুতার ও আদর্শ গৃহীর আদর্শ এত উচ্চ ছিল যে অন্যেরা যেসব কাজে কী ব্যবহারে নিজেকে কি পরকে কখনো অপরাধী মনে করিতেন না সেখানেও তিনি আপনাকে অপরাধী মনে করিয়াছেন।

মুলুর মৃত্যুর পর রামানন্দ ৩০ সেপ্টেম্বর (১৯১৯) স্ত্রী-পুত্রকন্যা সকলকে লইয়া পুরীতে যাত্রা করেন। দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর একটি ছোটো বাড়ি সেখানে ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। যাত্রার দিনই তাঁহার পরমভক্তির পাত্র পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মৃত্যু হয়। পুরীতে তিনি প্রত্যহ পত্নীকে সমুদ্রস্নান করাইতে ও সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে লইয়া যাইতেন। নূতন আবেষ্টনে শোকের তীব্রতা হয়ত কিছু কমিয়াছিল।

পর বৎসর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে অশোককে কেমব্রিজে পড়িতে পাঠানো হয়।

মুলু ছবি আঁকিতে ও মূর্তি গড়িতে ভালবাসিত। কিন্তু তাহাকে চিত্রবিদ্যা কিংবা ভাস্কর্য শিখাইবার চেষ্টা বা অবসর হয় নাই। এই জন্যই বোধ হয় মুলুর মৃত্যুর পর রামানন্দের ইচ্ছা হয় যে তিনি পুত্রকন্যাদের কাহাকেও শিল্পবিদ্যা শিখাইবেন। একদিন কোনো ভূমিকা না করিয়া তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বলিলেন, "তুমি ছবি আঁকতে শেখ, আমি নন্দলালবাবুকে ঠিক করে দিচ্ছি।" নন্দলালবাবু দুই-তিন মাসেই তাঁহার আশ্চর্য শিক্ষা-প্রণালীর সাহায্যে ছাত্রীকে প্রথম হাতে-খড়ি হইতে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলেন।

নন্দলাল বসু মহাশয় কিছুদিন পরে বিশ্বভারতীর কাজে শান্তিনিকেতনে চলিয়া যাওয়াতে কন্যার ছবি আঁকার কাজে সাহায্য করিবার কেহ রহিলেন না। এই সময় রামানন্দ শিল্প-প্রদর্শনীতে কন্যাদের স্বয়ং সঙ্গে লইয়া যাইতেন। একদিন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সকন্যা রামানন্দকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েরা ছবি-টবি আঁকে?" রামানন্দ বলিলেন, "আঁকে অল্প-স্বল্প, কিন্তু তেমন কিছু হয় না।" গগনবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই বলিলেন, "অবনের কাছে নিয়ে যাবেন, দেখিয়ে দেবে। ও চেষ্টা করলেই হবে।" কনিষ্ঠের হইয়া জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

তাহার পর কয়েক মাস প্রতি সপ্তাহে হাজার কাজের মধ্যেও রামানন্দ কন্যাকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথের নিকট ছবি দেখাইতে যাইতেন। অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় দুইটি আরাম-কেদারায় বসিয়া সকালবেলা ছবি আঁকিতেন। ছবি আঁকিতে আঁকিতে অন্যের ছবি দেখিতেন, নানা পরামর্শ দিতেন, কত হাসির গল্পও করিতেন। যতক্ষণ ছবি আঁকা, ছবি দেখা, পরামর্শ দেওয়া চলিত, ততক্ষণ রামানন্দ সেইখানে বসিয়া ছাত্রের মতোই সেই সব দেখিতেন ও শুনিতেন। অবনীন্দ্র তখন প্রায় প্রতিদিনই একটা নতূন ছবি আঁকিতেন। কোনো কোনোদিন ভাঙা পাথরের থালা খোদাই করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ কিংবা আর কাহারও মূর্তি করিতেন। রবিবাবু কলিকাতায় থাকিলে সে বাড়িতেও একবার ঘুরিয়া আসা হইত। অনেক সময় দেখা যাইত অবনীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ঘরেই বসিয়া আছেন।

মুলুর মৃত্যুর পর সংসার যেন ধ্বংসস্তূপের মতো হইযা গেল। ইহার পর হইতে রামানন্দও হইলেন গৃহী সন্ন্যাসী, এখন হইতে পত্রিকার কাজ ছাড়া বাহিরের আরও অনেক কাজেই তিনি যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন।

চ তু র্থ অ ধ্যা য়

সমাজপাড়া ত্যাগ

১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ফাল্গুন মাসে রামানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হয়। এই বিবাহের জন্য জানুয়ারি মাসেই তিনি সমাজপাড়ার বাসা ছাড়িয়া সপরিবারে রামমোহন রায় রোডের ৮নং বাড়িতে উঠিয়া যান। বাড়িটির নিকটেই রামমোহন লাইব্রেরি। প্রবাসী-কার্যালয় আরও দুই-এক বৎসর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটেই ছিল। আগে শুধু নিচের দুখানি ঘর ছিল অফিস, তার পর পাশের বাড়িতে দুইখানি বাড়তি ঘর অফিসের জন্য লওয়া হয়। ১৯২২-এ ২০।৩।১এর সমস্ত বাড়িটা তিনতলা পর্যন্তই অফিসের কাজে লাগিয়া গেল।

১৯২৩এ অশোক কেমব্রিজ হইতে ফিরিবার পর 'প্রবাসী'র নিজস্ব প্রেস করা বিষয়ে উৎসাহী হন। অশোকের উৎসাহ ও ইচ্ছাতেই 'প্রবাসী'র নিজের প্রেস করিতে রামানন্দ সম্মত হইলেন। এই সময় সার্কুলার রোডে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পুরাতন অধিষ্ঠান ৯১নং ভবনে প্রবাসী অফিস উঠিয়া আসে। পরে ১৯২৫ হইতে প্রবাসী প্রেস ও কার্যালয় আছে ১২০।২, অপার সার্কুলার রোডে।

সমাজপাড়া হইতে ১৯২০র পূজার ছুটিতে পত্নীর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য স্ত্রী-কন্যাসহ রামানন্দ এলাহাবাদে যান। সে বৎসর বোধ হয় মেজর বসুর একটি শহরতলির বাংলোতে কিছু দিন থাকা হয়। সে জায়গাটির নাম গন্দপুর। সেখানে তখন নিকটে ভালো পোস্ট-অফিস ছিল না, সপ্তাহে একবার ডাক বিলি হইত। অতি নির্জন গ্রাম, দূরে গঙ্গার একটি ক্ষুদ্র শাখা; রামানন্দ প্রত্যহ দূরে পোস্ট-অফিসে স্বয়ং চিঠি দিতে-নিতে যাইতেন, কারণ ডাকঘরই ছিল ছুটির সময় তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জিনিস। ১৯২১ এবং ১৯২২এও এলাহাবাদেই পূজার ছুটি যাপন করিতে তিনি স্ত্রী-কন্যাদিগকে লইয়া যান। যমুনার ধারে একবার Pumping Station এর একটি ছোট বাংলোতে এবং আর-একবার তাহারই নিকটে একটি বড়ো বাংলোতে বাসা করা হয়। কলিকাতায় যেমন এখানেও তেমনই রামানন্দ দুই বেলা আপনার বই কাগজ কলম লইয়া কাজে মগ্ন থাকিতেন, মাঝে মাঝে নদীর ধারে বেড়ানো এবং মেজর বসু প্রভৃতির বাড়ি যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো রকম বৈচিত্র্য কাজের ফাঁকে দেখা যাইত না। তাঁহার সেই শান্ত কর্মসমাহিত মূর্তি ছাড়া আর কোনো ছবি মনে আসে না। তিনি দেশে কী বিদেশে খ্যাতনামাদের সহিত যাচিয়া সাক্ষাৎ করিতে কখনো যাইতেন না ; যদি কাহারও তাঁহার নিকট প্রয়োজন থাকিত কিংবা তাঁহার সহিত পরিচয় করিবার ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে তিনিই স্বয়ং রামানন্দের নিকট আসিতেন। যাঁহাদের রামানন্দ বন্ধু মনে করিতেন তাঁহারা সম্পর্কে, বয়সে, বিদ্যায়, খ্যাতিতে তাঁহার চেয়ে বড়ো কী ছোটো, এ-বিবেচনা তিনি কখনো করিতেন না, তাঁহাদের দেখিতে না যাওয়াই যেন তাঁহার অপরাধ মনে হইত। কত ছাত্র, ছাত্রের পুত্র-কন্যা ও নিজের পুত্র-কন্যাস্থানীয়কে তিনি দীর্ঘপথ হাঁটিয়া দেখিয়া

আসিতেন। বয়ঃকনিষ্ঠরা লজ্জিত হইতেন যে তাঁহারা দেখিতে যাইবার আগে গুরুস্থানীয় ব্যক্তিই তাঁহাদের দেখিতে আসিলেন।

সংসারিক অবস্থা ক্রমশ সচ্ছল হইলেও রামানন্দ নিজের আরাম কী আয়াসের জন্য কোনো নূতন খরচ আরম্ভ করেন নাই। অল্প বয়সে যেমন শক্ত চেয়ারে বসিয়া দুই বেলা কাজ করিয়াছেন এবং বিশ্রামের সময় সাধারণ শয্যায় শুইয়াছেন, বয়স বৃদ্ধির এবং সচ্ছলতা বৃদ্ধির পরও ঠিক তাহাই করিতেন। তিনি কখনো আরাম-কেদারা ব্যবহার করিতেন না ; যখন কলিকাতার ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক পাখা, তাহার অনেক পবে জোর করিয়া তাঁহার ঘরে পাখা আনিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আহারও পূর্বের মত সাত্ত্বিক চিরজীবন ছিল। এই সামান্য খাদ্যের মধ্যেও কবে কখনো কোন্‌টা খাইতে ইচ্ছা করে, কী ভাল লাগে বোধ হয় বিশেষ কেহ তাঁহাকে বলিতে শোনে নাই। যখন যাহা দেওয়া হইত তাহাই খাইতেন। অপছন্দ খাদ্যের জন্য কোনো অসন্তোষের রেখাও তাঁহার মুখে পড়িতে দেখা যাইত না। তিনি মিষ্টদ্রব্য ভালবাসিতেন, তাই একটু চিনি মাঝে মাঝে চাহিতেন।

শান্তিনিকেতনের উৎসবে যোগ দেওয়া ছাড়া কোনো মজলিশ, নাচগানের আসর ইত্যাদিতে যাওয়ার অভ্যাস তাঁহার কখনো ছিল না। এমন সরল নিরাড়ম্বর জীবনযাত্রা কম দেখা যায়। গৃহপরিজনের প্রতি স্নেহ-মমতা, কয়েকজন বন্ধু ও অনুগতের প্রতি ভালবাসার অতি সহজ সুন্দর প্রকাশ, আর বাকি সমস্ত জীবন কাজ, কাজ এবং কাজ। আদিতে, মধ্যে ও অন্তে সেই কাজই সব। সে কাজের মধ্যে অধিকাংশই লোকচক্ষুর অন্তরালে বসিয়া ; যখন বা বাহিরে আসিতেন তখনও তাঁহার বক্তৃতায় লোককে রোমাঞ্চিত, চমৎকৃত করিয়া দিবার কোনো চেষ্টা ছিল না। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, "তাঁর সমস্ত কর্মের মধ্যেই সঞ্চারিত ছিল একটি শান্ত ছন্দ। কখনো কোনো বিষয়ে তাঁকে বিচলিত হতে দেখি নি। বক্তৃতা করতেন কিন্তু তার মধ্যে কোথাও উত্তেজনা থাকত না। অত্যন্ত সহজ ভাবে তাঁর কথাগুলি বলে যেতেন। প্রত্যেকটি কথা ওজন করে বলতেন, প্রত্যেকটি কথা ওজন করে লিখতেন।"

অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ বলিয়াছেন, "যাঁরা তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন, তাঁরা জানেন, তিনি কী সুমিষ্ট সুন্দর বক্তা ছিলেন। তাঁর বক্তৃতায় তরঙ্গবিক্ষেপ ছিল না, কোনোরূপ দম্ভ থাকত না।"

ওজন করিয়া প্রতি কথা লিখিতেন বলিয়াই তাঁহার রচনায় অলংকারের মশলা থাকিত না। এই অলংকারবর্জন তাঁহার সত্যনিষ্ঠারই একটা প্রকাশ ছিল।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দের কন্যা সীতার বিবাহ হয় সেপ্টেম্বর মাসে। সীতা বিবাহের পর রেঙ্গুন চলিয়া যান। কন্যাকে বিদায় দিয়া আসিয়াই রামানন্দ শয্যা লইলেন। কন্যা বিদায়ের করুণ কথা আমাদের দেশের আগমনীর গানে দীর্ঘকাল হইতে ঘরে ঘরে প্রচলিত। বাঙালিরা বুঝিবেন তাঁহার মতো সন্তানবৎসল পিতার পক্ষে কন্যাকে অত দূরে দেশে পাঠাইয়া দেওয়ার আঘাত কী প্রকার। যিনি কন্যাদের এক বেলার জন্য স্কুলে রাখিয়া আসিয়া কাজে মন দিতে পারেন নাই, তিনি কন্যাকে দূর দেশে পতিগৃহে পাঠাইতে যে কতটা ব্যথা পাইবেন অনুমান করা যায়। সীতা চলিয়া যাইবার পর তিনি বাড়ি আসিয়াই শান্তাকে বলিলেন, "তোমাদের দুজনের ছেলেবেলাকার যত কথা মনে আছে সব নিয়ে একটা জীবনস্মৃতি লেখ।" ইহার বেশি তখন আর কিছু বলেন নাই। কিন্তু বহুকাল পরে সীতাকেই বলিয়াছিলেন, "তুমি যখন রেঙুনে চলে গেলে তখন সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনলেই মনে হ'ত, সীতা আসছে, পাশের ঘরে কারুর গলার স্বর শুনলেই মনে হ'ত সীতা কথা বলছে।" তাঁহাব

সমস্ত মনটা সীতার চিন্তায় পূর্ণ হইয়াছিল। মনের এই ব্যাকুলতা হইতে তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙিয়া পড়িলে ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু তাঁহাকে খানিকটা সারাইয়া তুলিয়া গিরিডিতে বায়ু পরিবর্তনের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। সেখান হইতে তিনি আরও কিছু সারিয়া আসিলেন। কিন্তু আগের মতো কার্যক্ষম হইতে দেরি হইল। এই সময় 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে বেশ কিছুদিন 'বিবিধ প্রসঙ্গে' অনেক লেখা অশোকের এবং কিছু লেখা শান্তার থাকিত। ১৯২৩এর ডিসেম্বরের কয়েকটি চিঠিতে আছে :—

"বাবার শরীর ভাল নেই। গিবিডি থেকে যেটুকু সেরে এসেছিলেন, এখানে এসে সেটুকুও গিয়েছে।...তাঁর Treatment আর কি? বিশ্রাম নেওয়া সব চেয়ে দবকাব। সেটা মোটেই হয় না, আর ওযুধ দুই একটা খান। চেঞ্জে সুবিধামত জায়গা ও সঙ্গী না হলে যাওয়া শক্ত। এলাহাবাদ অনেক দুর ; ট্রেনে অত পথ যাওয়ার risk আছে, তাই ডাক্তার যেতে দিলেন না।"

দ্বিতীয়বার শান্তিনিকেতন

ইহার পরই ১৯২৪এর গোড়া হইতে শারীরিক ও মানসিক বিশ্রামের জন্য রামানন্দের শান্তিনিকেতনে গিয়া বাস করিবার কথা হয়। দুই-একবার বাড়ি ঠিক হয় কিন্তু স্থায়ীভাবে যাইতে কয়েক মাস দেরি হয়। ইহার ভিতর তিনি কোনো কাজে বাঁকুড়ায় গিয়াছিলেন। সেটা ফেব্রুয়ারি মাসে। সম্ভবত ১৯২৪এর আগস্ট মাস হইতে একটানা কয়েক মাস তিনি শান্তিনিকেতনেই ছিলেন। তাহার আগের বৎসর কয়েক মাস তাঁহার কন্যা শান্তা কলাভবনের ছাত্রীরূপে আশ্রমে ছিলেন। সেই সময় হইতে (১৯২৩) বছর দুই বোধ হয় অশোক বিশ্বভারতীর অবৈতনিক অধ্যাপক ছিলেন। তখন কালিদাস নাগ, সবোজকুমার দাস প্রভৃতিও সেখানে অবৈতনিক অধ্যাপক ছিলেন। অশোক প্রতি সপ্তাহে দুই-তিনদিন শান্তিনিকেতনে থাকিতেন। ডা. রজনীকান্ত দাসও এই সময় শান্তিনিকেতনে আসেন। রামানন্দ যখন শান্তিনিকেতনে (১৯২৪) বাস করিতে যান তখন তিনি সেখানকার কোনো কাজের সহিত যুক্ত ছিলেন না, কোনো কাজের ভার লইবার সে সময় তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কারণ তখন তিনি অসুস্থই ছিলেন। এই সময়ের তাঁহার কয়েকটি চিঠি হইতে তাঁহার তখনকার কিছু কথা জানা যায়।

"শান্তিনিকেতন ১লা ভাদ্র। আমি নির্বিঘ্নে শান্তিনিকেতনে পৌঁছিয়াছি ও ভাল আছি।

"১লা সেপ্টেম্বর ১৯২৪। আমি বেডাইবাব জন্য বেড়াইতে বাহিব হই না বটে, কিন্তু এখন আশ্রম এরূপ হইয়াছে যে, দেখাসাক্ষাৎ করিতে এবং মিটিঙে বক্তৃতা শুনিতে হইলেই যথেষ্ট বেড়ান হয়। তাছাড়া ইতিমধ্যে দুদিন সুরুল গিয়াছিলাম। আমি এখানে কোনোরকম কাজের ভার লই নাই এবং লইব না।

"৮-১২-২৪। আমি কাল ১০টার পর সুরুল গিয়াছিলাম। স্নান করিয়া গিয়াছিলাম। রবিবাবুর সেই গাছের উপর নীড়টিতে আমার আড্ডা হইয়াছিল। স্নানের বন্দোবস্তও ছিল। ক...বাবুর বাড়িতে ভাত খাইয়াছিলাম। তাঁহার স্ত্রী জানিতেন না, যে, আমি নিরামিষ খাই। এই জন্য নারিকেল দিয়া মুগের ডাল, বেগুনভাজা ও মাছের ঝোল করিয়াছিলেন। যখন শুনিলেন যে, আমি মাছ খাই না তখন তিনি বড়ো অপ্রতিভ হইলেন। যদিও আমার কিছুই অসুবিধা হয় নাই। ভাত খাইয়া নীড়টিতে কিছুক্ষণ শুইয়াছিলাম। তাহার মধ্যে দলে দলে sight seersও উপস্থিত হইয়াছিলেন। বীরভূম জেলার অনেক অফিসার ও অন্য লোক

আসিয়াছিলেন।

"১টার পর কনফারেন্স আরম্ভ হয়।...আমার নির্বাচন হইয়া গেলে আমি notes হইতে মুখে মুখে কিছু বলি। তাহার পর...দ দাম্ভিকতার সহিত scolding toneএ কিছু বলেন। তাহার মধ্যে ভাল কথাও ছিল। কিন্তু উত্তেজনার সহিত offensive toneএ বলার effect ভাল হয় নাই। মানুষ debating clubএ চটিয়া গেলে যেমন হয়, প্রায় সেইরূপ...

"২২-৮-২৪। নন্দলালবাবু আজ একটা বড়ো রেশমি কাপড়ে আঁকা ছবি জাপানি ধরনে mount করিতেছেন দেখিলাম। এখানে একদিন সন্ধ্যার পর এণ্ড্রুজ সাহেব চীন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তার পর ক্ষিতিমোহনবাবু ঐ দেশ বিষয়ে অনেক বলিয়াছিলেন।—কলাভবনে গিয়াছিলাম। ছবি আঁকা চলিতেছে।—রবিবাবু বোধ হয় কাল আসিবেন।

"৩১-১০-২৪। এখানে সন্ধ্যাব পব একটু ঠাণ্ডা পড়ে। এইজন্য বাহিবে বসিয়া থাকিতে হইলে ঠাণ্ডা-লাগা নিবারণের জন্য (শীতের জন্য নয়) একটা কিছু গরম গায়ে দিতে হয়। কাল এখানে প্রধানত মেয়েরা গান ও অভিনয় করিয়াছিল। তাহাদের সাজ নৃত্য গান বেশ হইয়াছিল।...

"ডাঃ রজনীকান্ত দাস কালই ফিরিয়া আসিয়াছেন।

"১৮-১-২৫। এখানে কাল মহর্ষির মৃত্যুদিন উপলক্ষে উপাসনা ও সভা হইবে। এখানে অনেক ছাত্র ও অধ্যাপক আছেন তাঁহাদের মাতৃভাষা বাংলা নহে। এই জন্য এই উপাসনা ইংরেজিতে হইবে। তাহা আমাকে করিতে হইবে। সভার কতক কাজ ইংরেজিতে হইবে। আমি ইংরেজিতে কিছু বলিব।

"লর্ড কার্জনের কন্যা ও জামাতা..এখানে কাল আসিয়াছেন। লোকের যাতায়াত এখানে বেশ আছে। সুতরাং জায়গাটা শহর না হইলেও ব্যাঘাত মধ্যে মধ্যে হয়।

"১৬-৭-২৫। এখানেও কাল রাত্রি থেকে খুব বৃষ্টি হইয়াছে। ছেলেরা সকলে দলে দলে ভিজিতে বাহির হইয়াছিল। আমিও খালি পায়ে বর্ষাতি গায়ে ছাতা মাথায় দিয়া খুব বেড়াইয়াছি।"

আরও অনেক চিঠি হইতে দেখা যায় আশ্রমের কলিকাতাবাসী অধ্যাপকদের হাতে তিনি বই কাগজ লেখা পাঠাইতেন। কখনো-বা তাঁহারা কলিকাতা হইতে তাঁহার জন্য বই কাগজ জিনিসপত্র লইয়া যাইতেন। শরীর খুব ভালো থাকিত না, প্রায়ই মাথা ধরিত, তবু নিয়মিত লেখার কাজ চলিত। আশ্রমে বক্তৃতাদিও কিছু দিতেন। সেই বৎসব (১৯২৪) অধ্যাপক স্টেন কোনো সস্ত্রীক আশ্রমে আসেন। তাঁহাদের উভয়ের সহিত রামানন্দের প্রীতির সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। আশ্রমের যে-সকল যুবক বৃদ্ধ ও বালকবালিকা তাঁহার প্রিয় ছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকের খবরই চিঠিতে পাওয়া যাইত, কাহার জ্বর হইযাছে, কে গান ভালো করিয়াছে, কে অভিনয় ভালো করিয়াছে, কাহার আত্মীয়বিচ্ছেদ হইয়াছে, কোনোটা লিখিতে তিনি ভুলিতেন না।

এই বৎসর (১৯২৪) বোধহয় পূজার আগে কী পরে চারুবাবু প্রবাসী-অফিসের কাজ ছাড়িয়া ঢাকায় প্রোফেসার হইয়া চলিয়া যান। তৎপূর্বেই অসুস্থতার জন্য তিনি অনেক দিন ছুটি লইয়াছিলেন।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দেও রামানন্দ বছরের গোড়া হইতে শান্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল ছিলেন। মার্চ মাসে কিছুদিন রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব একটি বাড়িতে তাঁহাদের খুব কাছেই ছিলেন। শান্তিনিকেতনে আবার নিজের জন্য ছোটো একটি বাড়ি করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। এই জন্য লেখেন :

"৭-৩-২৫। আমি এখনও এখানে থাকিবার মত নূতন কোনো বন্দোবস্ত করি নাই। একটু জায়গা লইয়া একটি দু-কুটরি বাড়ি করিবার কথা ভাবিতেছিলাম। তোমরা কি বল?"

উত্তরায়ণে তাঁহার জন্য একটি নির্দিষ্ট ঘরে থাকিতে বোধ হয় এই চিঠি তিনি লিখিয়াছিলেন। অল্প কয়েক মাসের মধ্যে নানা বাড়িতে তিনি ছিলেন। সকল সময়েই আশ্রমের সকলে তাঁহার প্রতি অনুরাগের নানা পরিচয় দিয়াছিলেন। নেপালবাবু তাঁহার পুরাতন বন্ধু বলিয়া তিনি বোধ হয় প্রত্যহই রামানন্দের খোঁজখবর লইতেন। মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার খাওয়া-দাওয়া তদারক করা, তাঁহার ভৃত্যকে রান্না শেখানো, তাঁহার কখন কি প্রয়োজন তাঁহার কন্যাকে কলিকাতায় জানানো, ইত্যাদি নানাভাবে তাঁহার প্রতি ভক্তির পরিচয় দিতেন।

১৯৩০ এবং ১৯৩১এ কিছুদিন তিনি স্বর্গীয়া সুকেশী দেবীর মাটির বাড়িটি ভাড়া করিয়াছিলেন। কিছুদিন প্রাক্তন ছাত্রদের পুরাতন বাড়িতে আশা ও ভক্তি অধিকাবীদের সহিত ছিলেন।

শান্তিনিকেতনে থাকিলেও রামানন্দ 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন' অফিসের সমস্ত কাজের খবর প্রত্যহ লইতেন। মানুষের হাতে-ডাকে-টেলিগ্রামে সকল রকমে তাঁহার নির্দেশ আসিত। কখনো-বা একই দিনে দুই-তিনটা চিঠি আসিত। "প্রবাসী'র সব feature যেন বজায় থাকে, কোন্ বই পাঠাইতে হইবে, কোন্ কাগজ হইতে cuttings দিতে হইবে, প্রেসে লেখা দিবার পূর্বে কিভাবে সংশোধন করিতে হইবে, কাহাকে কত টাকা কবে দিতে হইবে, কোন্ বিজ্ঞাপনটি prominent জায়গায় দিতে হইবে, কোন্ বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে হইবে, প্রুফ শীঘ্র দেখিতে হইবে, কোন্ ছবির ব্লক ছোট হওয়াতে খারাপ দেখাইতেছে, সুতরাং বড়ো fine screenএ করিতে হইবে ইত্যাদি অজস্র উপদেশ প্রত্যহই আসিত। সংসারের কর্তৃত্ব বিষয়ে তিনি সংসারত্যাগীর মতই ব্যবহার করিতেন, কিন্তু ঝি-চাকর হইতে আরম্ভ করিয়া শিশু বালক যুবক সকলের প্রত্যেকটি খবর নিয়মিত জানিতে চাহিতেন। কেহ কোথাও কোনো কারণে কষ্ট পাইতে পারে মনে হইলে তিনি ব্যস্ত হইতেন। ৬-১-২৫ লিখিতেছেন — "তোমাদের সকলকে দেখিতে ইচ্ছা আমার অবশ্যই হয় ;...কিন্তু তোমরা আসিলে তোমাদের অসুবিধা হয় এবং তাহা আমারও ভাল লাগে না। সুতরাং শুধু আমার জন্যই এখানে আসিবার চেষ্টা তোমরা করিও না।...আমি নিজে সব কিছু সহ্য করিতে ক্রমশঃ চেষ্টা ও অভ্যাস করিতেছি। কিন্তু তোমাদের তাহা করিবার প্রয়োজন নাই।" অথচ বাড়ির সকলকে ছাড়িয়া শান্তিনিকেতনে থাকিতে তাঁহার মনও বাড়ির জন্য ব্যাকুল হইত।

১৯২৫এর জুলাই মাসে রামানন্দকে বিশ্বভারতী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল করার কথা হয়। সেই সময় হইতে শান্তিনিকেতনের কলেজের ছেলেরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে অনুমতি পান। সেই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে একদল অধ্যাপক ১১ জুলাই শান্তিনিকেতন যান। তাঁহারা ১২ জুলাই কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। রামানন্দ বিশ্বভারতী কলেজের অবৈতনিক প্রিন্সিপ্যালের পদ সেই সময় না গ্রহণ করিলে কলেজের পক্ষে অনেকগুলি অসুবিধা হইত। একথা তাঁহার নিকট শুনিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। তিনি যদিও প্রধানত অধ্যক্ষ ছিলেন, তবু কোনো কোনো ক্লাসও পড়াইতেন। সেইসময়ের কথা অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,

"শিক্ষাভবনের অধ্যাপকগণের মধ্যে তখন এন্ড্রুজ সাহেবও ছিলেন। বিশ্ববন্ধু দীনবন্ধু এন্ড্রুজেব বিশ্বজোড়া কাজ, এজন্য বাহিরের কাজে তাঁহাকে অনেক সময়ে যাইতে হইত,

এবং তাহাতে কলেজের ছাত্রদের পড়াবার ক্ষতি হইত। রামান্দবাবু ইহা লক্ষ করিয়া এন্ড্রুজ সাহেবকে একটু মৃদু মন্দ তিরস্কার করিয়া স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যখন অধ্যাপক তখন তিনি কিছুতেই নিয়মিত ভাবে না পড়াইয়া পারেন না। উদারমতি এন্ড্রুজ ইহাতে কোনোরূপ অসন্তুষ্ট না হইয়া সরলভাবে নিজের ত্রুটি স্বীকাব করিয়াছিলেন এবং আর কখনো ওরূপ করিতেন না। রামানন্দবাবুর কর্তব্যনিষ্ঠা কেমন ছিল তাহা এই একটি সামান্য ঘটনাতেই বুঝা যাইবে।"

শ্রীযুত গুরুদয়াল মালিক লিখিয়াছেন :—

"At that time I was on the staff of the college Within a week of his arrival amongst us we began to feel the impact of his strong personality in an effective manner. His stress on discipline and its strict observance by us in every detail of our work pulled us out of 'As you like it' ease and atmosphere into which some of us,...has allowed ourselves to sink. 'Discipline is discipline' said he one day in his patriarchal peremptory voice to a colleague of mine who was in the habit of coming into the tree-cum-class-room almost always after the relative bell had been rung. I, too, had a taste of Mr. Ramananda's temperamental and intellectual 'forte' for discipline on one occasion. Once K ..was invited by a Calcutta literary association to lecture on Kabir. The Poet, who had consented to take chair, sent word to me that I also should go down to the old metrpolis to sing a couple of songs of the mystic after K's discourse. Accordingly, I went upto Mr. Ramananda, as he was my chief to request him to grant me leave just for a day. As I entered his room I touched his feet and then preferred my request orally.

"Have you written out the application?" he asked. "No, sir, I thought as I was going in obedience to the poet's command it will do if simply I told you to permit me to do so," I replied.

"No, that will never do. First, let me have your application in writing then arrange with one of your colleagues to take your class when you are away and then eventually you may seek my permission."

মালিক মহাশয় অধ্যক্ষের কথা মতোই কাজ করেন, তবে মনে মনে একটু চটেন। কিন্তু পরে যখন জানিলেন যে দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজকেও বার বার এই ভাবে নিয়মপালন করিতে বাধ্য করা হইয়াছে তখন মালিক মহাশয়ের রাগ চলিয়া যায়।

মালিকজী লিখিয়াছেন, রামানন্দবাবু অধ্যাপকদের চা-চক্রে মাঝে মাঝে যাইতেন। সেখানে কখনো কখনো কবিও আসিতেন। কোনো অধ্যাপক রামানন্দবাবুর সঙ্গে একবার Blue Book-এর কতকগুলি বিষয়ে নিশ্চিত না জানিয়াও দারুণ উত্তেজিতভাবে তর্ক করেন। রামানন্দবাবুর শান্ত বিতর্কে তিনি যখন থামিলেন না, তখন সম্পাদক মহাশয় চা-চক্র হইতে উঠিয়া লাইব্রেরি হইতে হাতে করিয়া বইটি আনিয়া সেই বিশেষ পাতাটি খুলিয়া অধ্যাপকের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। অধ্যাপক অগত্যা শান্ত হইলেন। রামানন্দ বিনয়ের দ্বারা প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিলেন।

মালিকজী বিশেষভাবে মুগ্ধ হন রামানন্দের প্রেমাশ্রুগলিত ব্রহ্মোপাসনায়। শান্তিনিকেতন মন্দিরে সেদিন "তুমি আমাদের পিতা" গানের পর রামানন্দ উপাসনা আরম্ভ করেন।

শান্তিনিকেতনে থাকিতে রামানন্দ কিছুদিন 'প্রবাসী' ও *Modern Review* ছাড়া *Welfare*-এও নিয়মিত লিখিতেন। *'Walfare'*এ যুগ্ম-সম্পাদক রূপে কিছুদিন তাঁহার নাম

ছিল। একখানা চিঠিতে আছে :—"আজ 'মডার্ন রিভিয়ু'-এর লেখা শেষ করিলাম। কাল *'Welfare'*এর লেখা শেষ করিব। তাহার পর 'প্রবাসী' ধরিব।"

বিশ্বভারতী কলেজে বোধ হয় ছয় মাস থাকিবার অঙ্গীকার রামানন্দ করিয়াছিলেন। কিন্তু ২৫-৮-২৫ তারিখে তিনি লেখেন, "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীর ছাত্রদিগকে I.A. ও B.A. পরীক্ষা দিবার যে অনুমতি দিয়াছেন, তাহাতে একটা শর্ত আছে, শর্তে আমি রাজি নহি বলিয়া আমি রবিবাবুকে ইস্তফাপত্র পাঠাইয়াছি।"

দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ ও রামানন্দ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের খুব অনুরক্ত ছিলেন। ইঁহারা দুইজনে প্রায়ই তাঁহার দর্শনে যাইতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রামানন্দ যে দীর্ঘ প্রসঙ্গ তাঁহার বিষয়ে লেখেন তাহার কয়েকটি গল্প হইতে তাঁহাদের সম্বন্ধ কিছু বুঝা যায় :—

"একান্ত বিশ্রাম করিতে চাহিলে তিনি সুতা বা আঠাব সাহায্য না লইয়া বিচিত্র কৌশলে কেবল ভাঁজিয়া ভাঁজিয়া কাগজের নানারকম খাতা, খাপ, ব্যাগ, পেটিকা প্রভৃতি তৈয়ার করিতেন। তিনি 'প্রবাসী'তে যে অগণিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সমুদয় এইরূপ খাতায় লেখা। তাঁহাব চিঠিও খামের মধ্যে পুরিযা পাঠাইতেন না। সুকৌশলে তাহা ভাঁজা হইয়া আসিত। তিনি যাহাদিগকে স্নেহ কবিতেন, তাহারা কলম, পেন্সিল, লেপাফা প্রভৃতি বাখিবার জন্য এক-একটি কাগজের পেটিকা উপহার পাইত। সৌভাগ্যক্রমে আমবাও একটির অধিকাবী।"..

"রবীন্দ্রনাথ (ইউরোপ হইতে) দ্বিজেন্দ্রনাথকে এই অনুবোধ করেন যে, তিনি যেন ইংবেজিতে ভাবতীয় জ্ঞান-সম্ভার ইউরোপিয়দিগেব নিকট উপস্থিত করেন।..এই চিঠি যখন আসে তখন আমবা শান্তিনিকেতনে ছিলাম। দ্বিজেন্দ্রনাথ চিঠিখানি আমাকে পড়িতে দেন। তাহাব পব নিজেব ইংরেজি লেখার অনভ্যাস প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া পরোক্ষভাবে, কেন যে কনিষ্ঠের অনুরোধ রক্ষা করিতে পাবিবেন না, তাহা জানান।

"দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাবতীয় দর্শনের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে লর্ড রোনাল্ডসে আমাদের যুবকদিগের পাশ্চাত্য দর্শন অপেক্ষা...ভারতীয় দর্শন অধ্যয়নেব প্রয়োজনীয়তার আলোচনা করেন, তখন আমরা তাঁহার প্রস্তাবেব সমালোচনা কবিয়াছিলাম। তাহা পড়িযা দ্বিজেন্দ্রনাথের মনে হইয়াছিল, যে আমাদের লেখায় ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয় নাই। এই কারণে তিনি হঠাৎ একদিন প্রাতে তাঁহাব রিকশাটিতে আরোহণ করিয়া আমাদেব তখনকার শান্তিনিকেতনের বাড়িতে উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ উত্তেজনার সহিত যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, তাঁহাব দেশাভিমানে ও ভাবতীয় দর্শনেব প্রতি ভক্তিতে আঘাত লাগিযাছে। ভারতীয় দর্শনের প্রতি আমাদের যে কোনো অশ্রদ্ধা নাই, তাহা তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য যাহা করা দরকার তাহা করিয়াছিলাম এবং তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা না দেখিয়া মরিবেন, এই ক্ষোভের কথা তাঁহার ভারত-প্রেমিক বন্ধু রামানন্দকে বলিয়াছিলেন, তিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তাঁহার ভালোবাসার কথাও বন্ধুকে বলিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ অনাসক্ত গৃহী ছিলেন। কিন্তু এই পুত্রতুল্য বন্ধুর নিকট অনেকবার এমন কথা বলিতেন যাহাতে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি তাঁহার ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যাইত। একবার কথাবার্তার পর রামানন্দ হঠাৎ উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের সন্দেহ হয়, রামানন্দ বুঝি বা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অমনই তিনি ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলেন বলিতে 'বাবুমশায় আপনাকে একবার দেখা করিতে বলিয়াছেন।' তিনি ফিরিয়া গিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথের সন্দেহের কথা শুনিলেন। রামানন্দ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন কথা শেষ হওয়ায় এবং অনেক কাজ থাকায় তিনি চলিয়া আসিয়াছিলেন,

অসন্তোষের কোনো কারণ হয় নাই। তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথকে এতই ভক্তি কবিতেন এবং তাঁহার এতখানি স্নেহ পাইয়াছিলেন যে এরূপ অসন্তোষ জন্মিবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তা ছাড়া সেদিন দ্বিজেন্দ্রনাথ বম্ওয়ের নামক জার্মান মিশনারির বাংলা কথাবার্তা ও বাংলা কবিতা পাঠের হাস্যকর অনুকরণ করিতেছিলেন। ইহাতে বিরক্তির কোনো কারণ ঘটিতে পারে না। এই সকল কথা শুনিয়া তবে দ্বিজেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হইলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ অ্যান্ড্রুজ ও রামানন্দের সম্মুখে খ্রিস্টিয় মিশনারি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ-দের সম্বন্ধে যে-সব মন্তব্য করিয়া যাইতেন যাহাতে বুঝা যাইত যে একজন যে খ্রিস্টিয় ধর্ম প্রচারে উৎসাহী এবং অপরজন যে এম-এ—একথা তিনি সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। রামানন্দ বলিতেন, "তিনি হয়ত তাঁহার স্নেহগুণে আমাকে কলঙ্কমুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।"

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন

রামানন্দ শান্তিনিকেতন হইতে ফিরিবার পর দীনেন্দ্র স্ট্রিটে কিছু দিন কলিকাতায় তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার নিকট ছিলেন। ফাল্গুন ১৩৩২এর 'প্রবাসী'তে দেখি, লিগ অব নেশনস সম্বন্ধে নানা কথার মধ্যে তিনি লিখিতেছেন,

"ব্রিটিশ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিও গবর্নমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত না হইয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক নির্বাচিত হওয়া উচিত। জাতিসংঘ হইতে ব্রিটেন যেরূপ লাভবান হন, ভারতবর্ষ তাহা তো হয়ই না অধিকন্তু ভারতীয়দের বিদেশে লাঞ্ছনার কথা জাতিসংঘে উত্থাপিত পর্যন্ত হইতে পায় না। যখন আমরা এত টাকা দিতে বাধ্য হই, তখন তাহার অনুরূপ কিছু লাভ ও সুবিধা পাইবার চেষ্টা সতত করা আমাদের কর্তব্য। ইংরেজ বা ভারতীয় যাঁহারা ভারতের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের নিকট আমাদের সার্বজনিক সভাসমিতি-সকল হইতে এবং ব্যবস্থাপক সভা-সকল হইতে আমাদের দাবি ও বক্তব্য যাওয়া উচিত। যাহাতে আমাদের বৃথা পণ্ডশ্রম না হয় সেইজন্য জাতিসংঘের মূল ও অবান্তর নিয়মাবলী গঠনব্যবস্থা আমাদের সকলের জানা উচিত। জাতিসংঘের জন্য ভারতবর্ষকে যত টাকা দিতে হয়, তাহার পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা করা উচিত। আপাতত জাতিসংঘ হইতে আমাদের যে পরোক্ষ ফল লাভ করিতে পারি, তাহাও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়।...আমাদের ইচ্ছামতো কোনো বিষয়ের অবতারণাও জাতিসংঘে করিতে পারিব না। কিন্তু ..আমরা সংঘের আন্তর্জাতিক কাজ সকলে অনেকটা প্রভাব অর্জন করিতে এবং এই উপায়ে পৃথিবীর অন্য সব দেশের সংঘ সভ্যদিগকে ভারতবর্ষের প্রতি অনুরক্ত করিতে পারি। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরা যদি সংঘের আলোচনায় ন্যায়ের এবং অন্য সব দেশের লোকদের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখেন, তাহা হইলে তাহাদের প্রতিনিধিদেরও ভারতের প্রতি কতকটা মিত্রভাবাপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। অবশ্য আত্মশাসন ক্ষমতা পাইতে হইলে সাক্ষাৎভাবে তাহার প্রধান চেষ্টা আমাদিগকে, এবং এই দেশেই করিতে হইবে। কিন্তু ইহা ভুলিলেও চলিবে না যে, ইংরেজ তাহার উপনিবেশগুলির এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরের সভ্য জগতের লোকজনের প্রভাব অনেকটা অনুভব করে। এই প্রভাবটি যাহাতে ভারতবর্ষের অনুকূল হয়, তাহার চেষ্টা আমাদের করা কর্তব্য...।"*

* এই উদ্ধৃতির মাঝে মাঝে অনেক লাইন লেখা বাদ গিয়াছে বলিয়া রচনার সুস্পষ্টতার একটু হানি হইল।

লিগ অব নেশনসের নিমন্ত্রণ

দীনেন্দ্র স্ট্রিটে থাকিতেই কিছুদিন পরে রামানন্দ মহাজাতি সংঘ (League of Nations) কর্তৃক জেনিভায় নিমন্ত্রিত হন। যখন এই খবর ইউরোপ হইতে আসিল তখনই নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করিবেন কিনা ঠিক করিতে পারেন নাই। শেষে কয়েকজনের অনুরোধে গ্রহণ করাই ঠিক হইল। তিনি বলেন, "আমরা লিগ সম্বন্ধে সকল প্রকার তত্ত্ব ও তথ্য জানিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। প্রধানত জানিতে চেষ্টা করিব যে, লিগের দ্বারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অবস্থার, শিল্প বাণিজ্যের, শ্রমিকদের এবং স্বাস্থ্যের কিরূপ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে। নারীঘটিত পাপ ব্যবস্থা দমন লিগের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের কী উপকার হইতে পারে, তাহা জানিতে হইবে। সকল জাতির মধ্যে জ্ঞানাহরণ ও জ্ঞান বিস্তার বিষয়ে সহযোগিতার ব্যবস্থা লিগ ক্রমশ ভাল করিয়া করিবার চেষ্টা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই চেষ্টায় আচার্য জগদীশ ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। ইহা কাজে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে দেখিতে হইবে।" লিগের খরচের জন্য ভারতবর্ষ যে-পরিমাণ টাকা দিতেন সেরূপ ফল ভারত পান কিনা, ভারতীয়রা লিগ অফিসে কতটা কাজ পান, আন্তর্জাতিক বিষয়ে কতটা জ্ঞান লাভের সুযোগ পান, এই সকলও তিনি জানিতে চেষ্টা করিবেন বলেন। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের বাহিরে তিনি যান নাই, সেই অভিজ্ঞতার জন্যও তাঁহার যাইবার ইচ্ছা ছিল। তবে তিনি স্বভাবত নির্জনতাপ্রিয় ছিলেন বলিয়া তাঁহার মনে বার বার অনিচ্ছাও হইতেছিল। ১৯১৮তে একবার বোমানজি নামক এক পার্শি ভদ্রলোক তাঁহাকে খরচ দিয়া ইউরোপে পাঠাইতে চান। সেবার তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। যাহাই হউক, এবার ৬১ বৎসর বয়সে তিনি একলা সমুদ্রযাত্রা করিবেন স্থির হইল। কখনো যিনি হ্যাট-কোট-টাই পরেন নাই তাঁহার জন্য গলাবন্ধ কোট ও জোব্বা প্রভৃতি দেশি ধরনের পোশাক তৈয়ারি হইল। কখনো কাঁটা-চামচে খাওয়া, মাছ-মাংস খাওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল না। পুত্র, জামাতা প্রভৃতির শিক্ষকতায় তিনি কাঁটা চামচ ধরিলেন। মাছ-মাংস না খাওয়ার জন্য পাছে বিলাতে তাঁহাকে অনাহারেই থাকিতে হয়, এই ভয়ে তিনি এত বয়সে পুত্রকন্যাদের অনুরোধে পড়িয়া ডিম খাইতে শিখিলেন। কিন্তু এ-সকল তো সামান্য ব্যাপার, আসল খটকা তাঁহার মনে ছিল টাকা লইয়া। জাতিসংঘ তাঁহাকে পাথেয় হিসাবে ৬০০০ টাকা দিতে চান। কিন্তু তিনি যাইতেছিলেন জাতিসংঘের কার্যপ্রণালীর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিতে ও তাহার নিরপেক্ষ সমালোচনা করিবার জন্য। যদি তাহাদের অর্থ লইয়া যান তবে সুস্পষ্ট সমালোচনার পথে তাঁহার মনে বাধা আসিতে পারে, অপরেও তাঁহার সমালোচনাকে নিরপেক্ষ না মনে করিতে পারে। তাঁহার স্বাধীন মত প্রকাশে যাহাতে বাধা হয় অথবা যাহাতে লোকে স্বাধীন মতকেও অন্য প্রকার ভাবিতে পারে, এমন কাজ করিতে তাঁহার বিবেকে বাধিত। তিনি ধনবান ছিলেন না, কিন্তু তবুও তিনি পাথেয়র ৬০০০ টাকা প্রত্যাখ্যান করিলেন।

যাইবার পূর্বে সিটি কলেজের হলে ব্রাহ্ম যুবক সমিতির পক্ষ হইতে একটি বিরাট সভায় তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হইল। সেদিন ঘন বর্ষা, তবু লোকে হল পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সভায় শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্তা কামিনী রায় প্রভৃতি অনেকে তাঁহার সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধার সহিত বলেন। বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, 'জাতিসংঘের নিমন্ত্রণ তাঁহার পক্ষে কিছু বড়ো সম্মান নয়। তবে তাঁহার নিকট আমরা অনেক কথা জানিবার আশা রাখি।' ইতিপূর্বে লিগ কোনো ভারতীয় সম্পাদককে নিমন্ত্রণ করেন নাই।

২৭ কী ২৮ জুলাই (১৯২৬) রামানন্দ বোম্বাই যাত্রা করিলেন। স্টেশনে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। ১ আগস্টের ইটালিয়ান জাহাজ Pilsnaতে তিনি বোম্বাই ছাড়েন। তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন ডা. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

ইউরোপ যাইবার বহু পূর্বেই তিনি যে-সকল বিষয়ে গভীর চিন্তাপূর্ণ প্রসঙ্গ লিখিতেন এবং সভাসমিতিতেও আলোচনা করিতেন, ইউরোপের অভিজ্ঞতার কথা বলিবার পূর্বে সেগুলির বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন। তাঁহার আলোচ্য কয়েকটি প্রধান বিষয়ের কথা কেবল বলিব। সব বলা সম্ভব নয়।

প্রবাসী বাঙালি ও বহির্ভারতে ভারতীয়

বিহারের শ্রীঅতুলেন্দু গুপ্ত বলিয়াছিলেন, "রামানন্দবাবুর মনে তিনটি soft corner ছিল। একটি রামমোহন, একটি রবীন্দ্রনাথ ও একটি প্রবাসী বাঙালি সম্বন্ধে।...রামমোহন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, রবীন্দ্র-প্রতিভার ভক্ত অথবা প্রবাসী বাঙালি সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল যে কোনো ব্যক্তি রামানন্দবাবুর মনের দুয়ারে আঘাত করিয়া সহজেই স্থান করিয়া লইতে পারিত, ইহা বহু-পরীক্ষিত সত্য কথা।" কথাগুলির মধ্যে সত্য আছে বলা যায়। রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ অহেতুক আকর্ষণ ছিল না বটে, তবে হেতু থাকিলেও সাধারণ মানুষ আপনার ভক্তি ও প্রীতির পাত্রের প্রতি যেমন করিয়া ভক্তি ও প্রীতি দেখায়, অসাধারণ মানুষের প্রকাশ-ভঙ্গিমা তাহা হইতে পৃথক ও উচ্চতর রকমের হওয়াই স্বাভাবিক। রামানন্দ রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার অনুরাগ তাঁহাদের মহত্ত্বের প্রচার-কার্যের দ্বারাই দেখাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বিরোধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দ্বারাও দেখাইয়া ছিলেন। অনুরাগের আর-একটি লক্ষণ সামান্যকেও অসামান্য স্থান দেওয়া। এ ক্ষেত্রে তাহাও যে কোথাও হয় নাই, তাহা নয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনের তুচ্ছতম ঘটনা, তাঁহার অতি সাধারণ মামুলি কথাকেও রামানন্দ অনুরাগভরে উচ্চস্থানে সাজাইয়া গিয়াছেন।

প্রবাসী বাঙালিদের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ঠিক এই পর্যায়ের নয়। এ ভালবাসা স্নেহময় পিতার ভালবাসার মতো। বিরহী পিতা প্রবাসী সন্তানকে যেমন করিযা ভালবাসেন, যেমন করিয়া তাহার দুঃখে দুঃখী ও গৌরবে গৌরবান্বিত হন, রামানন্দ তেমনই করিয়া প্রবাসী বাঙালিদের সুখে-দুঃখে বিচলিত হইতেন। 'প্রদীপে'র যুগ হইতে তিনি সিংহল-বিজয়ী বাঙালির কথা বলিয়া আসিতেছেন। তিনি স্বয়ং দীর্ঘদিন প্রবাসে ছিলেন এবং প্রবাসেই 'প্রবাসী'র জন্ম হয় বলিয়া প্রবাসী বাঙালিদের সহিত তিনি প্রথম হইতেই একটা একাত্মতা অনুভব করিতেন। ১৯০১এ তিনি বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন, "আমরা হিন্দুস্থানি-বাঙালি।" মাতৃক্রোড়চ্যুত এই সব বাঙালিকে তিনি নিকট-আত্মীয়ের মতো দেখিতেন। 'প্রবাসী'র প্রথম সংখ্যা হইতেই প্রবাসী বাঙালিদের গৌরবের প্রচার ও তাঁহাদের উন্নতির চেষ্টায় তিনি লাগিয়াছিলেন, কারণ প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক স্বজাতির গৌরবেই গৌরবান্বিত হইবেন ইহা তো স্বাভাবিক। তাই 'প্রবাসী'র (বৈশাখ ১৩০৮) প্রথম সংখ্যায় জয়পুর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কান্তিচন্দ্রের কথা 'বিবিধ প্রসঙ্গে' দেখি। বাঙালিরা এলাহাবাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার কিরূপ পরিচয় দিয়াছেন তাহার বিবরণ দিয়া সম্পাদক তাই লিখিতেছেন, "প্রবাসী বাঙালিদের অধিকাংশেরই জীবিকা লেখাপড়া জানার উপর নির্ভর করে। এইজন্য তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষার অধিকতর বিস্তার প্রার্থনীয়। প্রবাসী বাঙালির

সন্তানগণ চরিত্র ও শ্রমশীলতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে অচিরেই অতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।" সুখের বিষয়, প্রবাসী অনেক বাঙালিই বিদ্যা ও অন্যান্য বিষয়ে বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

'প্রবাসী'র তৃতীয় সংখ্যা (আষাঢ় ১৩০৮) হইতেই প্রবাসী বাঙালি ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি লিখিতে শুরু করেন। সে সময়ে কাশী ও প্রয়াগে সরকারি শিক্ষাবিভাগ হইতে এক আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল যে, "যে-সকল স্কুলের ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা বা শিক্ষা-বিভাগের কোনো সাধারণ পরীক্ষা দিতে অধিকারী, তথায় বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারিবে না।" তিনি এ বিষয়ে সার আন্টনির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে এই আদেশ সার আন্টনির শিক্ষা-নীতিরই বিরোধী হইয়াছে। নিজ মাতৃভাষার সাহায্যেই ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা সহজ হয় একথা তিনি বলেন এবং পূর্বে অন্য কারণে সার আন্টনিও যে এই কথা বলিয়াছিলেন তাহা দেখান। তাছাড়া বাঙালির বাঙালিত্ব রক্ষা করার জন্যও যে বাংলা শিক্ষা প্রয়োজন একথাও তিনি বরাবর বলিয়াছেন। রামানন্দ তখন হইতে আজীবন সর্বদেশে বাঙালি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবাসের বিদ্যালয়ে বাংলা পড়িবার অধিকার লইয়া লড়িয়া আসিয়াছেন। হিন্দুস্থানি-বাঙালিদের যে চুপ করিয়া থাকা উচিত নয় একথা তখন এবং তৎপূর্বেও তিনি বলিয়াছেন। বাঙালি ছাত্রদের পুরাকালে রুরকি কলেজে লইত না। কিন্তু অন্য প্রদেশের অধিবাসী বাঙালিদের ছেলেরা রুরকিতে পড়িত তিনি দেখাইয়াছেন। তিনি বলিতেন, "প্রবাসী বাঙালিদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ যাহাতে সংকীর্ণ বা লুপ্ত না হয়, প্রবাসীদের উপার্জনের পথ বন্ধ না হইয়া আসে, তাহাদের সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল হয় তাহা দেখিবার জন্য একটি মুখপাত্রের প্রয়োজন।" 'প্রবাসীর' চতুর্থ সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩০৮) 'নিম্নলিখিত চারিটি বিষয় সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য চারিটি পদক ঘোষণা করা হয়। (ক) বিহারে বাঙ্গালী। (খ) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা ও পঞ্জাবে বাঙ্গালী। (গ) মধ্যভারতে বাঙ্গালী। (ঘ) ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালী। ঘোষণায় ইহাও বলা হয় ঃ

> "যে প্রদেশ সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচিত হইবে সেন্সস অনুসারে তথায় বাঙ্গালীর বর্তমান লোকসংখ্যা, তথায় বাঙ্গালীদেব আগমন ও বসবাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, তথায় বঙ্গ-সাহিত্যের চর্চা, তথাকার মৃত ও জীবিত প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, বাঙ্গালীদের বর্তমান সামাজিক, নৈতিক, আর্থিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় অবস্থা এবং তাহাব উন্নতির উপায়, বাঙ্গালীর কার্যক্ষেত্র, প্রদেশের মূল অধিবাসীদিগের সহিত বাঙ্গালীব সদ্ভাব রক্ষা ও বর্ধনের উপায়, তাহাদের সাহিত্য, চরিত্র, আচার ব্যবহাব প্রভৃতি হইতে বাঙ্গালীর কি শিখিবার আছে ইত্যাদি প্রবন্ধে যথাসম্ভব লিখিতে হইবে।"

এই সময়েই বঙ্গদেশের বাহিরে বঙ্গ-সাহিত্যের চর্চার জন্য যে-সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে সে বিষয়ে 'প্রবাসী' সংক্ষেপে নানা প্রদেশের বৃত্তান্ত মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রভৃতি রামানন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এই সকল প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রবাসী বাঙালিদের কাহিনী রচনার প্রেরণা রামানন্দই প্রথম দেন ; তিনি শুধু যে পদক ঘোষণা করিয়া প্রেরণা দিয়াছিলেন তাহা নয়, প্রবন্ধে কী কী বিষয় লিখিতে হইবে তাহারও ছক তিনিই করিয়া দিয়াছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় "উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা ও পঞ্জাবে বাঙ্গালী" প্রবন্ধ লিখিয়া 'প্রবাসী'র স্বর্ণপদক পান এবং এই প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে 'প্রবাসী'তেই প্রকাশিত হয়। কত খ্যাতনামা বঙ্গসন্তানের নাম বাঙালির নিকট চির-অপরিচিতই থাকিয়া যাইত যদি রামানন্দ তাঁহাদের

আবিষ্কারের এই উপায় না করিতেন। প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবৎস দেব প্রভৃতি বহু প্রবাসী বাঙালির ছবিও 'প্রবাসী'তে এই সঙ্গে ছাপা হয়। এইভাবেই জ্ঞানেন্দ্রবাবুর বিখ্যাত পুস্তকগুলির উৎপত্তি। ১৩০৯ সালে "ব্রহ্মদেশে বাঙালি" বিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহার পরও সর্বদা প্রবাসী বাঙালিদের কথা, প্রবাসী বাঙালি-বিদ্বেষ দূরীকরণ চেষ্টা ইত্যাদি 'প্রবাসী'র একটা বৈশিষ্ট্য ছিল।

প্রবাসীর সম্পাদক নিজের পরিশ্রম ও প্রেরণার কথা বলিতেন না। অন্য কিছু কথা 'প্রবাসী'তেই ১৩৪৭ সালে আছে : উনচল্লিশ বৎসর আট মাস পূর্বে যখন 'প্রবাসী' প্রকাশিত হয় তাহার আগে বঙ্গের বাহিরে বাঙালিরা যে নিঃশব্দে বিনা আড়ম্বরে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের অনেকাংশে ও অনেক দেশীয় রাজ্যে নানা সৎকার্য করিয়াছে, তাহা অল্প লোকেরই জানা ছিল। 'প্রবাসী' প্রকাশিত হইবার পর প্রধানত স্বর্গগত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের পরিশ্রমে এই মাসিক পত্রে প্রবাসী বাঙালিদের কীর্তি-কাহিনী প্রকাশিত হইতে থাকে।

১৩২১এর 'প্রবাসী'তে রামানন্দ বলিয়াছিলেন, "বাঙালিরা এক সময়ে হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া সমুদ্র পার হইয়া, কত জাতিকে জ্ঞান ও ধর্ম শিক্ষা দিয়াছে, সভ্য করিয়াছে। ইতিহাস হইতে তাহার চিহ্ন সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। এখন আমরা প্রধানত অন্যান্য জাতির মতো জীবিকা উপার্জনের জন্যই বঙ্গের বাহিরে যাই। কিন্তু তা বলিয়া অর্থের বিনিময়ে আমরা যে কাজ দিই তাছাড়া আমাদের যে আর কিছু দিবার নাই তা নয়। প্রবাসীরা নমুনার কাজ করেন। ...ভাল নমুনা সকলেই হইতে পারেন।"

তিনি বলিতেন,

> "ভারতবর্ষের এক প্রদেশের লোক বিষয়কর্ম উপলক্ষে অন্য প্রদেশে গিয়া বসবাস করিলে, তাহাদের ব্যববহারের আদর্শ এই হওয়া উচিত, যে, তাঁহারা তথাকার পুরুষানুক্রমিক স্থায়ী বাসিন্দাদের সহিত সম্পূর্ণ একযোগে কাজ কবিবেন ও স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ জীবের মতো ব্যবহার করিবেন না। যে সব বাঙ্গালী বঙ্গেব বাহিরে গিয়াও...আদৃত ও সম্মানিত হন, তাঁহারা এই আদর্শ অনুসারে অনেকটা চলিতে পারিয়াছেন মনে করিয়া আমরা প্রীত হই।"

এই আদর্শ তিনি নিজ প্রবাসকালেও রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতাবলী হইতে "True to the kindred points of heaven and home" লাইনটি উদ্ধৃত করিয়া ১৩১১তে বলেন, "আমরা প্রবাসী বাঙালিরা এইরূপে একদিকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা জননী বঙ্গভূমির প্রতি ভক্তিমান্ ; তাঁহার সুখে দুঃখে উন্নতিতে অবনতিতে হৃষ্ট হই বা শোক পাই, তাহার কল্যাণের জন্য চেষ্টা করি ; অপরদিকে ভারতের বঙ্গেতর প্রদেশসমূহের শুভাশুভেও আমাদের হৃদয় উৎফুল্ল বা অবসন্ন হয়, আমরা তাঁহাদেরও কল্যাণকামী।" ইহাতে বুঝা যায় তিনি প্রবাসী বাঙালির বন্ধু হইলেও ভারতের অন্য প্রদেশেরও অ-বন্ধু ছিলেন না। তিনি বলিতেন আমরা প্রথমত ভারতসন্তান, দ্বিতীয়ত বাঙালি। এই ধারণা ও এই বঙ্গেতর প্রদেশ-প্রীতি হইতেই তাঁহার বহির্ভারতের ভারতবাসীদের প্রতিও দৃষ্টি প্রসারিত হয়। বাংলার বাহিরে যে বাঙালি থাকে তিনি যেমন তাহার বন্ধু ছিলেন, তেমনই ভারতের বাহিরে যে ভারতীয় বাস করে তিনি তাহারও বন্ধু ছিলেন। উচ্চশিক্ষিত যে-সব যুবক উচ্চতর অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক কিংবা অন্যপ্রকার শিক্ষার জন্য জাপানে, আমেরিকায় ও ইউরোপে যাইতেন রামানন্দই প্রথম তাঁহাদের ছবি, কৃতিত্বের কাহিনী, সুবিধা-অসুবিধার

ও অভিজ্ঞতার কথা 'প্রবাসী'তে ও 'মডার্ন রিভিয়ু'তে প্রকাশিত করিতেন। কিন্তু সেইখানেই তাঁহার কাজ শেষ হইত না। অল্প-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত যে-সব ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের কাজ লইয়া কিংবা অন্য উপায়ে অর্থ উপার্জনের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় ও অন্যান্য দেশে যাইত তাহাদের বন্ধুও তিনিই ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় কোনো কোনো স্থানে একশত পুরুষের মধ্যে মাত্র ত্রিশটি নারীর স্থান হওয়াতে নারীর যে-দুর্গতি সে সব স্থানে হইয়াছে, যে ঈর্ষা, অপবিত্রতা ও হত্যাদি গুরুতর পাপ পর্যন্ত সেখানে ছড়াইয়াছে, ভারতীয় বিবাহকে বিবাহ বলিয়া অস্বীকার করাতে ভারতীয়দের স্ত্রী ও সন্তানদের আইনের চক্ষে যে হীনতা এবং কার্যক্ষেত্রে যে অকথ্য নির্যাতন ও অপমান সহিতে হইয়াছে তাহার প্রতিকারের জন্য তিনি প্রথম দিন হইতে যেন এই অত্যাচারিত ও উৎপীড়িতদের পাশে দাঁড়াইয়া লড়িয়াছেন। 'মডার্ন রিভিয়ু' বিশেষ করিয়া সাগরপারের এই লাঞ্ছিত ভারত-সন্তানদের সহায় ও বন্ধু ছিলেন।

এই সময় আফ্রিকায় ট্রান্সভালে যখন ভারতীয়দের এবং অন্যান্য এশিয়াবাসীদের দাগী চোর প্রভৃতির মতো নানা অপমানে লাঞ্ছিত করা শুরু হয় তখন তাঁহারা অনেকে সর্বস্ব খোয়াইয়া এবং কারাবরণ করিয়াও কোনো কোনো অপমানজনক শর্তে (টিপসই দেওয়া প্রভৃতিতে) রাজি হন নাই। প্রথম ভারতীয় passive resister রূপে পণ্ডিত রামসুন্দর নামক আগ্রা প্রদেশের একজন ব্রাহ্মণ Anti-Asiatic Act-এর খপ্পরে পড়েন। ১৯০৮এ *M. R.*এ তাঁহার পূর্ণ পৃষ্ঠা ছবি বাহির হয় এবং তাঁহার জীবন-কথা ও বীরত্বের কথা প্রকাশিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের যাঁহারা হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রামানন্দের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার কথা। ভারতবাসীরা স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সেখানে কত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন, কত বার কারাবরণ করিয়াছেন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইতে দিয়াছেন তবু মাথা নীচু করেন নাই, এই সকল কাহিনী তিনি শুধু বারে বারে তাঁহার কাগজে লেখেন নাই, তিনি তাঁহাদের ছবি ছাপাইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য সভা করিয়াছেন, স্বয়ং বক্তৃতা করিয়াছেন, এবং পরের হইয়া তাঁহাদের জবানীতে জ্ঞানগর্ভ ও প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা লিখিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা আফ্রিকায় গিয়া এই ভারতীয়দের জন্য লড়িয়াছেন তাঁহাদেরও তিনি নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। পণ্ডিত রামসুন্দরের বিচারের সময় যে-ভারতীয়েরা লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলেন তাঁহাদের কথা *M. R.* লিখিয়াছিলেন,

> "These 13,000 Indians, living among strangers in a strange land,...not educated, or not highly educated at any rate for the most part, have shown a heroism and a power of standing shoulder to shoulder which ought to deepen our faith in our countrymen and breathe courage and hope into the hearts of the three-hundred-milions of stay-at-home Indians. When shall every one of us be conscious of our vast strength? We are extremely grateful to the Transvaal Indians for the much needed rousing from our dream of weakness. We should give them all the moral and other support that we can. Seeing that the Transvaal air develops such manhood as is possessed by the Indian emigrants we should take steps to send more men there as free settlers."

১৯০৮-এর 'মডার্ন রিভিয়ু'য়েই তিনি এইজন্য পরে গান্ধী মহাশয়ের ছবি ছাপেন ও Passive Resistance-এর জন্য তাঁহাকে সম্মান জানান।

এই জন্যই তিনি বলেন, "লাহোর কংগ্রেসে দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রবাসী গান্ধীকে সভাপতি

করা উচিত। তিনি চরিত্রে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে, আত্মোৎসর্গে, নেতৃত্ব-শক্তিতে ও দল বাঁধিবার ক্ষমতায় ভারতবর্ষের কোনো নেতা অপেক্ষা নিম্নস্থানীয় নহেন।" এই সময় হইতে দীর্ঘকাল তিনি গান্ধী ও তাঁহার সহযোগী ও অনুচরবর্গের জীবন ও চরিত্রের মধ্যে নানাবিধ প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয় বিষয় বহু চিত্রসহ 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু' কাগজ দুইটিতে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার ফলে সেকালে এই দুইখানি কাগজে তাঁহাদের সম্বন্ধে যত লেখা ও ছবি (গান্ধীজি ভারত-প্রসিদ্ধ ভারত-নেতা হইবার পূর্বে তো নিশ্চয়ই) প্রকাশিত হইয়াছে বঙ্গের কোনো কাগজে তো তাহা হয়ই নাই, ভারতবর্ষের কোনো কাগজে হইয়াছে কি না সন্দেহ।

১৯০৯ সালে রামানন্দ তাঁহার বন্ধু কৃষ্ণলাল মোহনলাল ঝাভেরি মহাশয়ের দ্বারা গান্ধী মহাশয়ের দক্ষিণ আফ্রিকার কারাবাসের অভিজ্ঞতার কাহিনী সম্বন্ধে চারিটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখাইয়া ক্রমে ক্রমে ছাপেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতিতে যে-সকল ভারতীয় নানা কারণে বসবাস করিতে যান তাঁহাদের দুঃখের কাহিনী সর্বদাই ভারতে শোনা যাইত। কিন্তু কয়জন তাহা কান পাতিয়া শুনিতেন জানি না। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু' চিরকাল ইহাদের দুঃখ-দুর্গতির কথা জনসমাজে প্রচাব করিয়াছেন, এই সব স্থানে নারী জাতির দুঃখের প্রতিকারের চেষ্টায় বাংলাদেশ যখন একেবারে উদাসীন ছিল তখন প্রবাসী সম্পাদক তাহার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্বয়ং নানা চেষ্টা করিয়া সভা সমিতি অর্থ সংগ্রহাদি এবং অন্যান্য কাজও কবিয়াছেন। সে সব ২৫।৩০।৩৫ বৎসর পূর্বের কথা। মহামতি অ্যান্ড্রুজ ফিজি দ্বীপ ও পূর্ব-আফ্রিকার ভারতবাসীদের বন্ধু ছিলেন অনেকেই জানেন। কিন্তু অ্যান্ড্রুজের অন্যতম প্রধান সহায় যে রামানন্দ ছিলেন একথা সকলে জানেন না। অ্যান্ড্রুজের পত্র 'মডার্ন রিভিয়ু' তো ছাপিতেনই, তাহা বাংলায় অনুবাদ করিয়া 'প্রবাসী'তেও প্রকাশিত হইত। অ্যান্ড্রুজ লিখিতেন, "ফিজিতে গিয়া এত বৎসর ধরিয়া যে দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের অনেক লোক ভুগিতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের স্বজাতীয় ভাইবোনেরা ফিজি এবং আফ্রিকাতে কী নিগ্রহ ভোগ করিতেছেন, সকলে তাহা জানুন এবং প্রতিকারের উপায় করুন।" তিনি যখন সেই সব স্থানে যাইতেন কত দুঃখিনী নারী তাঁহাকে বলিত "কবে দেশে ফিরিব? কবে জাহাজে চড়িব? উপায় করিয়া দিন।"

১৯১০-এ রামানন্দ বলিতেন,

> "এই সব ভারতীয়ের প্রতি আমাদের দুই রকম কর্তব্য আছে। প্রথম কর্তব্য, এই passive resisterদের নাগবিক অধিকার লাভের জন্য রক্তপাতহীন সংগ্রাম চালাইবার উপযুক্ত অর্থ অবিলম্বে জোগাড় করিযা দেওয়া ; দ্বিতীয় কর্তব্য, দেশের শিক্ষা ও শিল্পোন্নতি করা। তাহা হইলে ভ্রান্ত ধারণার বশে বেশি লোক বিদেশে যাইবে না এবং দেশে ক্ষুধার অন্ন পাইলে বিদেশে যাইতে বাধ্যও হইবে না। অবশ্য কোনো দেশ দেশবাসীর সব অভাব মিটাইতে পারে না। বিদেশে যাওয়া উচিত ইহা বুঝি ; কিন্তু বিদেশে যাইবার সময় আমার দেশের লোকেরা তাদের সম্মান ও মনুষ্যত্ব বর্জন করিয়া যায় ইহাও আমি চাই না।"

এই সময় মি. পোলক দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের জন্য খুব পরিশ্রম করেন। তিনি যখন কলিকাতায় আসেন রামানন্দ ও তাঁহার স্ত্রীপুত্রকন্যার সহিত দেখা করিয়া যান, রামানন্দ বহির্ভারতের দুঃখীদের বন্ধু বলিয়াই। ইহাদের দুঃখমোচনের জন্য রতন টাটা মহাশয় তখন

৫০০০০ টাকা দান করেন।

গান্ধী ইঁহাদের বন্ধু বলিয়া ১৯১১তেও রামানন্দ গান্ধীকে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করিতে বলেন এবং ১৯১৫ সালে যখন গান্ধী ও কস্তুরীবাই কলিকাতায় আসেন তখন রামানন্দ সপরিবারে তাঁহাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-প্রাঙ্গণে সংর্ধনায় যোগ দেন।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে ও ফিজি প্রভৃতি স্থানে ভারতীয়দের তখন প্রকৃত নাগরিক অধিকার ছিল না, ইংরাজি না জানিলে সর্বত্র যাওয়া এবং ভোট দিবার অধিকার ছিল না, সর্বত্র ভূসম্পত্তি ক্রয় করা চলিত না, শ্রমিকদের চুক্তির ছুতায় মনুষ্যত্ব বর্জন করিতে হইত। চাবুক খাওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল, নারীধর্ম রক্ষা কবা কঠিন ছিল।

বহির্ভারতের ভারতীয়দের প্রতি তাঁহার এমন গভীর সহানুভূতি ও মমতা ছিল যে তাহাদের দুঃখ ও অপমানের কথা লিখিবাব জন্য তিনি কখনো কখনো 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু'এ একই মাসে দুই-তিনটি প্রবন্ধ বাহির করিয়াছেন। তিনি বার বার বলিয়াছেন 'ভারতীয়েরা শক্তিশালী না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত প্রতিকার হইবে না।' The real and ultimate remedy lies in the people of India becoming strong. মিসেস সোধা নাম্নী এক ভারতীয় মহিলা ইংরাজি ও অন্য ইউরোপীয় ভাষা না লিখিতে জানা সত্ত্বেও ট্রান্সভালে স্বামীর নিকট যান। কিন্তু তাহা সরকারি আইনের বিরুদ্ধে কাজ। এই জন্য শিশু সন্তানসহ মহিলাটির কারাদণ্ড হয়। 'মডার্ন রিভিয়ু' তাঁহার জয়গান করেন ও দুই বার তাঁহার চিত্র প্রকাশ করেন। এই সকল অসংখ্য ছোটো-বড়ো ঘটনার তালিকা দেওয়া জীবনীর কাজ নয়। সুতরাং সব কথা জানানো যাইবে না। প্রধানত বহির্ভারতের এই স্বদেশবাসীদের সহিত যোগ রক্ষা করিবার জন্যই রামানন্দ পরে ১৯২৭এ হিন্দি 'বিশাল ভারত' পত্রিকা প্রকাশ করেন। শ্রদ্ধেয় যদুনাথ সরকার মহাশয় প্রভৃতি হিন্দি কাগজ প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুমোদন করেন। এই সময় 'বৃহত্তর ভারত পরিষৎ'ও প্রতিষ্ঠিত হয়। 'বিশাল ভারত' হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধনের সহিত বহির্ভারতের এই কাজটিও চিরদিন করিয়া আসিতেছেন।

রামানন্দের মৃত্যুর পর স্বামী ভবানীদয়াল লেখেন,

"I met him many times during the last two decades and found him most sympathetic towards the cause of Indians abroad Personally he was a man whose companionship was invariably stimulating and instructive, frequently fascinating A bright and spirited curiosity about life was always with him He was in no way hemmed within the range of his own subject. Charm was his, too, in an unusually high degree. He was a great champion in the cause of Indians overseas and played an admirable part to protect their human rights in the colour-ridden South Africa. It is impossible to produce a catalogue of continuous services rendered by the magazines The Modern Review and the Vishal Bharat to Indian settlers domiciled in different parts of the globe, and personally I am indebted to these magazine for their encouragement and assistance towards my humble work in connection with the South African Indian community. Greater India was an everlasting passion with Ramananda Babu and the problems of Indian settlers always claimed his special attention. He was a source of inspiration to our late friend Sadhu C. F. Andrews who had rendered signal service to the Indians abroad."

বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা

সিটি কলেজ, কায়স্থ পাঠশালা কলেজ ও বিশ্বভারতীতে রামানন্দ যতদিন শিক্ষা-সংক্রান্ত কাজ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি প্রায় কুড়ি বৎসর শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতী ছিলেন বলা যায়। সুতরাং শিক্ষা-বিষয়ক প্রসঙ্গ তাঁহার পত্রিকাগুলির যে একটি বৈশিষ্ট্য হইবে ইহা বিচিত্র কিছু নয়। তিনি 'প্রবাসী' প্রকাশ করিবার পূর্বেই এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন, পরে ম্যাকডোনাল্ড শিক্ষা-কমিটির সভ্য হন। শিক্ষা-কমিটিতে তাঁহার নাম ছিল "a terrible fighter", কারণ তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহার জন্য লড়িতে কখনো ভীত হইতেন না এবং কাহারও অনুরোধে কিংবা উপরোধে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনাকে বিসর্জন দিতেন না। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শিক্ষা-সংস্কার কার্যে "তাঁহার অবদান অতুলনীয়", নেপালবাবু বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি বাঙালি, তিনি তো কেবল উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শিক্ষার কথা লইয়াই থাকিতে পারেন না ; 'প্রবাসী'র যুগের প্রারম্ভেই আমরা দেখিতে পাই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হয়ত তৎপূর্বে 'সঞ্জীবনী' প্রভৃতিতেও লিখিয়া থাকিবেন। 'প্রবাসী'র প্রথম সংখ্যাতেই আছে, "পরীক্ষার নিয়ম হিসাবে কলিকাতা পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। কলিকাতার পরীক্ষা প্রণালীর সংস্কার প্রার্থনীয়।" তাঁহার স্বদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁহার alma mater যাহাতে অন্যদেশ অপেক্ষা কোনো বিষয়ে হীন না থাকেন এ বিষয়ে এই শিক্ষাব্রতীর দৃষ্টি সর্বদা সজাগ ছিল। 'প্রবাসী'র দ্বিতীয় সংখ্যায় "শিক্ষার উন্নতি ও তন্নিমিত্ত দান" নামক উচ্চদরের প্রবন্ধ তিনি স্বয়ং লেখেন এবং ইহাতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় ও দানের কথার মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গুরুপ্রসন্ন ঘোষ ও সূর্যনারায়ণ সিংহের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দানের কথাও লেখেন। শিক্ষাই আমাদের দেশবাসীকে গড়িয়া তুলিবে, শিক্ষাই তাহাকে অন্ন, স্বাস্থ্য, ঐশ্বর্য ও গৌরব অর্জন করিতে শিখাইবে এই দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহার ছিল বলিয়াই শিক্ষা-মন্দিরের আদর্শ তাঁহার নিকট এত উচ্চ ছিল। বিদ্যা-বিতরণের পুণ্য যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের তিনি নমস্য মনে করিতেন। কিন্তু বিদ্যার মন্দিরে কোনো স্খলন কী ত্রুটি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

বাংলা ১৩১১, ১৩১২, ১৩১৩তে শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী'তে বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে নানারূপ সমালোচনা আছে। পরেও সমালোচনাত্মক লেখা বাহির হইয়াছে।

বাংলা ১৩১৬তে নূতন ম্যাট্রিকুলেশন বিষয়ে তিনি লিখিয়াছিলেন, "মানুষ নিজের দেশের এবং পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিবরণ না জানিলে তাহাদের কখনো সভ্য বলা যায় না। যে নিজের দেশের ও পৃথিবীর ভূগোল জানে না সে কূপমণ্ডুক মাত্র।" এই সময় প্রবেশিকা পরীক্ষার ইতিহাস ও ভুগোলকে অবশ্যপাঠ্যের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হয়। এইজন্য তিনি বলেন, "বাংলা ভাষায় বড়ো ও মনোজ্ঞ ভূ-বৃত্তান্ত ও পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির ইতিহাস লিখিত হওয়া উচিত।" "পাঠ্যপুস্তকে স্বদেশপ্রেম শিক্ষা যাহাতে না হয় প্রকারান্তরে সেই ব্যবস্থা অনেক দিন হইতে হইয়া আসিতেছে। গৃহপাঠ্য পুস্তক স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক হইলে ইহার প্রতিকার হয়।" একথাও এই সময় তিনি লেখেন।

প্রবেশিকার নিয়ম পরিবর্তনের পর ১৩২৯এও রামানন্দ লেখেন, "ভূগোল বাদ দিলে মানুষকে স্থান সম্বন্ধে সংকীর্ণমনা ও কূপমণ্ডুক করা হয়। ইতিহাস বাদ দিলে মানুষকে কাল সম্বন্ধে সংকীর্ণমনা ও কূপমণ্ডুক করা হয়। জাতীয় নৈরাশ্যের প্রধান প্রতিষেধক ও ঔষধ

ইতিহাস। ব্যক্তিগত ও জাতীয় আচরণ সম্বন্ধে অমূল্য উপদেশ ইতিহাস হইতে পাওয়া যায়।"

কিন্তু যখন ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে শুধু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর কমিশন বসিবার প্রস্তাব হয় তখন রামানন্দই বলিয়াছিলেন, "ইহার দোষত্রুটি যাহা যাহা আছে, তাহা আমরা ভালো করিয়াই জানি। কিন্তু ইহাও জানি যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অন্য কোনো ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের চেয়ে অপকৃষ্ট শিক্ষা পায় না। অধিকন্তু এখানে অন্য জায়গার চেয়ে উচ্চশিক্ষা দিবার আয়োজন ও তাহা পাইবার সুযোগ বেশি, সুতরাং শিক্ষা পায়ও অধিকতর ছাত্র। ইহার জন্য শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রশংসাভাজন। গবেষণা ও নূতন জ্ঞানসঞ্চয় এখানেই ভারতবর্ষের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি হয়। আমরা জানি বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজদের চক্ষুশূল সম্ভবত এই সব কারণেই।" বাংলা, ১৩২৩এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি ইংরেজের বিদ্বেষ ভর করিয়া প্রবাসী-সম্পাদক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শাসন ও পরিচালন ব্যাপারের কোনো কোনো বড়ো ও ছোটো ভুল ও ত্রুটির বিষয়ে বিজয়চন্দ্র মজুমদার, যদুনাথ সরকার মহাশয় প্রভৃতি 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে বহু প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। সম্পাদক স্বয়ং বহুবার লিখিয়াছেন। এই সকল কারণে তিনি ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন। কখনো কখনো এই জাতীয় কারণে তাঁহার নামে আদালতে নালিশ হইবার সম্ভাবনা হয়, কোনো দৈনিক কাগজে সে কথা মুদ্রিতও হয়, কিন্তু তথাপি তিনি কখনো ভীত হইতেন না। তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, যাহাতে দেশের কল্যাণেরই পথ প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া জানিতেন, সে কথা বলিতে কখনো সংকুচিত বা পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি পাছে কাহারও অযথা নিন্দা বা মিথ্যা সমালোচনা করেন এই ভয়ে সর্বদা নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করিতেন এবং প্রয়োজন বুঝিলে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও প্রামাণ্য জিনিসের ফোটো ও ব্লক ইত্যাদি তৈয়ারি করাইতেন। আর্থিক ক্ষতি ও অন্য কোনো বড়ো ক্ষতির সম্ভাবনা জানিয়াও তিনি নিজের মত কখনো প্রত্যাহার করেন নাই।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথেব যথেষ্ট সমাদর করেন নাই, ইহা তাঁহার একটা সমালোচনা ও দুঃখের কারণ ছিল। অন্যান্য কোনো কোনো পণ্ডিত বাঙালিও বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমন সম্মান ও কাজ করিবার সুযোগ পান নাই, ইহাও তাঁহার দুঃখ করিবার কারণ ছিল। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম-এ পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব হয় তখন রামানন্দ প্রমাণ দেখাইয়া লেখেন,

> "কিন্তু দুঃখেব বিষয় এই যে যাঁহারা বাংলায় এম-এ দেবেন তাঁহাদের নিকট আধুনিক সাহিত্য মানে বস্তুত ৪০ বৎসরেরও আগেকাব সাহিত্যই দাঁড়াইবে, এবং যিনি উচ্চ হইতে উচ্চতম চিন্তাক্ষেত্রে বঙ্গসাহিতোর ধ্বজা উড্ডীন করিতেছেন, যিনি সকল সভ্যদেশে বঙ্গ সাহিত্য সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ কৌতূহল উৎপাদন করিয়াছেন, যিনি বঙ্গ সাহিত্য-মন্দিরেব সকল কক্ষ উজ্জ্বল কবিয়াছেন এবং যাঁহার প্রতিভা এখনও নব নব আকারে ও প্রকাবে প্রকাশ পাইতেছে সেই রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎ বা পবোক্ষ কোনো প্রকাবই এম-এ পরীক্ষার্থীদের আলোচনার বিষয় হইবেন না।"

তিনি মনে করিতেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যোগেশচন্দ্র রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি মনীষিগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট উপযুক্ত সম্মান পান নাই। অথচ কোনো কোনো অযোগ্য লোক সম্মান পাওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে তাহা ক্ষতিকর জানিয়া তিনি প্রমাণ-সহ

তাঁহাদের অযোগ্যতার কথা লেখেন। কিন্তু তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাস প্রবর্তনের সময় যখন অনেকে বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন, তখন রামানন্দই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষ সমর্থন করেন। তদুপরি মেঘনাদ সাহা, নীলরতন ধর প্রভৃতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য ও খ্যাতনামা ছাত্রদের কৃতিত্বের প্রচার তিনি যেমন করিয়াছেন, ভারতবর্ষে আর কেহ তেমন করেন নাই।

বাংলা ১৩২৬-এর ভাদ্রে রামানন্দ প্রবাসীতে লেখেন–

"অনেকে বলিতেছেন, পোস্টগ্রাজুয়েট ক্লাসগুলির অধ্যাপকদের মধ্যে যোগ্য লোক খুব অল্পই আছেন, অধ্যাপনা ভাল হয় না, ইত্যাদি। যোগ্যতা কথাটা অপেক্ষিক, অধ্যাপনাব উৎকর্ষেরও কোনো মাপকাঠি নির্দিষ্ট নাই। তবে আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, পূর্বে যে দুই-একটি কলেজে এম-এ, এম-এসসি পড়ান হইত, বর্তমানে মোটের উপব বিশ্ববিদ্যালয়েব পোস্টগ্রাজুয়েট ক্লাসগুলির পড়ান তদপেক্ষা মন্দ হয় না। আমাদেব ধারণা এইরূপ।

"অনেক টাকা খরচ করিয়া পোস্টগ্রাজুযেট ক্লাস না খুলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অনেকগুলি কলেজে অর্থ সাহায্য কবিয়া এম-এ, এম-এসসি পডাইবার ব্যবস্থা কবিতে পারিতেন, কিংবা অন্য কোনো রকম ব্যবস্থাও করিতে পাবিতেন।..

"অতীতকে বড়ো কবিয়া দেখা এবং ভাল মনে করা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। 'আমরা যখন এম-এ পড়িতাম' তখনকাব অবস্থা এখনকার চেয়ে ভাল বলিয়া মনে হওয়া আমাদের মত পক্ককেশদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যাহ: মনে হয় তাহা সব সময সত্য নহে। আমাদের বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে পোস্টগ্রাজুয়েট অধ্যাপনার বন্দোবস্ত হওয়ায কতকগুলি বিষয়ে আগেকার চেয়ে ফল ভাল হইয়াছে।

প্রথমত, কেবল কয়েকটি কলেজে এম-এ, এম-এসসি'র ক্লাস থাকিলে, এখন যত ছাত্র উচ্চতম শিক্ষা পায় তত ছাত্র ঐরূপ শিক্ষা কখনোই পাইত না ; সুতরাং আমাদের জাতির মোট মানসিক সম্পদ এখন প্রতি বৎসর যে পরিমাণে বাড়ে ততটা বাড়িত না।...

দ্বিতীযত, বর্তমান সময়ে অনেক অধ্যাপক এবং কোনো কোনো ছাত্রও যেরূপ নিজের নিজের অনুশীলনীর বিদ্যায় গবেষণা করিয়া জগতের জ্ঞানভাণ্ডার পুষ্ট করিতেছেন, তাহা সভ্যদেশ সমূহের তুলনায় সামান্য হইলেও আগেকার চেয়ে অনেক বেশি। 'আমরা যাঁহাদের কাছে পড়িয়াছিলাম' তাঁহাদিগকে খুব বড়ো অধ্যাপক মনে করা ও তাঁহাদের ভক্তি করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাছাড়া, আমাদের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা আমাদিগকে সে-কালের সাধারণ রকমের ইংরেজ অধ্যাপকদিগকেও পণ্ডিত এবং গবেষণা ও স্ব-তন্ত্র চিন্তায় সমর্থ বাঙালি অধ্যাপক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতে অভ্যস্ত করিয়াছে ; এবং সেকালে অধিকাংশ স্থলে ইংরেজ অধ্যাপকগণই এম-এ পড়াইতেন। কিন্তু প্রকৃত বিবেচ্য কথা এই, যে, তখনকার অধ্যাপকেরা নিজে কি গবেষণা করিয়াছেন, কি নূতন চিন্তা করিয়াছেন এবং স্ব স্ব ছাত্রদিগকে গবেষণা ও স্ব-তন্ত্র চিন্তায় কতটা অভ্যস্ত ও সমর্থ করিয়াছেন, এবং এখনকার অধ্যাপকরাই বা এই প্রকারের কাজ কতটা করিতেছেন। নিরপেক্ষ ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে দেখা যাইবে, যে, তখনকাব খুব নামজাদা অধ্যাপকেরাও মোটের উপর এখনকার অপেক্ষাকৃত কম নামজাদা অধ্যাপকদের এরূপ কাজের তুলনায়, ঈদৃশ কাজ খুব সামান্যই করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, যে, এখানকার অধ্যাপকবর্গ মোটের উপর তখনকার অধ্যাপকবর্গ অপেক্ষা এবিষয়ে শ্রেষ্ঠ।...

তৃতীয়ত, এম-এ, এম-এসসির অধ্যাপনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের হাতে আসায় একটি সুফল এই হইয়াছে, যে, আমাদের দেশি অনেক পণ্ডিত ও মনস্বী ব্যক্তি নিজ নিজ

যোগ্যতাব প্রমাণ দিবার এবং তাহা বাড়াইবার সুযোগ পাইয়াছেন। তাঁহারা যে তাঁহাদের সহকর্মী ইংবেজদেব অন্ততঃ সমকক্ষ তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।...ইহাতে সমগ্র জাতির নিজ মানসিক শক্তিতে বিশ্বাস জন্মিবার সুযোগ হইয়াছে। এই বিশ্বাস জন্মান একান্ত আবশ্যক। দেশি অধ্যাপকের কৃতিত্ব দেশি ছাত্রদিগকে যেমন উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে, পাশ্চাত্য অধ্যাপকদের কৃতিত্ব ততটা করে না।.. পাশ্চাত্য কোনো অধ্যাপকের কৃতিত্ব দেখিলে ছাত্রদের এরূপ মনে হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে, যে, উহা তাঁহার জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব (**racial superiority**) প্রসূত। পক্ষান্তরে, দেশি অধ্যাপকের কৃতিত্ব দেখিলে দেশি ছাত্র মনে করে, 'ইনি দেশি আমিও দেশি , অতএব আমিও কৃতী হইতে পারি।'

চতুর্থত, উচ্চতম শিক্ষন বিশ্ববিদ্যালয় নিজের হাতে লওয়ায় বহু বিদ্যার অনুশীলন হইতেছে; কয়েকটি কলেজের হাতে উহা থাকিলে শিক্ষণীয় বিদ্যাব সংখ্যা কমই থাকিয়া যাইত।..ইহা বিবেচনা করিলে বলিতে হইবে এখন বাংলা দেশে ছাত্রদের মানসিক বিকাশের ও জ্ঞানলাভের সুযোগ পূর্বাপেক্ষা অধিক হইযাছে।"

যেখানে শিক্ষা ব্যাপকতর ভাবে অধিকসংখ্যক ছাত্রের কল্যাণসাধন করিবে বলিয়া রামানন্দ জানিতেন সেখানে তিনিই সর্বাগ্রে তাহার সমর্থন করিতেন। আবার তিনি যখন কাহারও দোষত্রুটি দেখাইতেন তখন তিনি বলিতেন, "সার্বজনীন কাজে নিযুক্ত সাধু অসাধু, বন্ধু, অবন্ধু, পরিচিত, অপরিচিত সকল লোকের সার্বজনিক কাজ ও কথার আলোচনা অপক্ষপাতে করা কর্তব্য বলিয়া আমরা তাহার চেষ্টা করি। অজ্ঞতা ও অজ্ঞানকৃত পক্ষপাতবশত দোষত্রুটি আমাদের হইয়া থাকে।" বাস্তবিক বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সার্বজনীন প্রতিষ্ঠানাদির সমালোচনার সময় তিনি তাঁহার যৌবন-বন্ধু, বাল্যবন্ধু ও কুটুম্ব প্রভৃতি অনেকের ত্রুটির কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের বিরাগভাজন হইয়াছেন এবং তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক বেদনা বোধ হয় স্বয়ং তজ্জন্য পাইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে রামানন্দ স্বয়ং বলিয়াছিলেন,

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলার, বাঙালিব বিদ্যাপীঠ। উহাতে আমরা শিক্ষা পাইয়াছি ও দিয়াছি এবং আমাদের পুত্রকন্যারা শিক্ষা পাইয়াছে। উহাব শ্রীবৃদ্ধি সর্বতোভাবে প্রার্থনীয়। দোষ সংশোধন সেই শ্রীবৃদ্ধি সাধনের একটি উপায়। তজ্জন্য সমালোচনাব প্রয়োজন। রান্নাঘরের জল বাতাস বাসনকোসন দূষিত হইলে, উহার কর্মীরা সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত হইলে গৃহস্থের যেরূপ বিপদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া দূষিত ও কর্মীরা অশ্রদ্ধাভাজন হইলে দেশের সেইরূপ বিপদ। কারণ রান্নাঘবে যেমন গৃহস্থেব পুষ্টির জিনিষ তৈরি হয়, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় জীবনের সকল বিভাগের পুষ্টি ও বলবিধানের নিমিত্ত শিক্ষা দেওয়া হয়, কর্মী প্রস্তুত হয়, এবং চবিত্রগঠন ও আত্মবিকাশের বয়সে তরুণ বয়স্কেরা জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। এই সব কারণে জাতীয় জীবনের জন্য আবশ্যক সমুদয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যাপীঠকে আমরা শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া থাকি, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা পুনঃপুন আলোচনা করিবার ইহা একটি প্রধান কারণ। অন্য আর এক কারণ এই যে, অনেক ব্যাপার অপেক্ষা শিক্ষাবিষয়ক নানা ব্যাপার আমরা সামান্য কিছু বেশি বুঝি, যদিও সে বোধও অল্প। তথাপি অন্য অনেক ব্যাপারে আমরা যেরূপ আনাড়ি অব্যবসায়ী, শিক্ষা ব্যাপারে ঠিক ততটা অনভিজ্ঞ ও অব্যবসায়ী নহি।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচনা করিবার সময় আর-একটি যে কথা তিনি বলেন তাহা মনে রাখিবার যোগ্য। তিনি বলেন,

"আমরা যাহা করি (সমালোচনা) তাহাতে আরও একটি সুফল এই হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-সব নিন্দা মুখে মুখে ছড়াইতে থাকে, তাহাকে নির্দিষ্ট আকারে ছাপিয়া

দিয়া আমরা প্রতিবাদের সুযোগ দিয়া থাকি, এবং তাহার দরুণ বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসম্পৃক্ত ব্যক্তিরা সর্বসাধারণের নিকট দোষমুক্ত হইবার সুযোগ পান।"

বাস্তবিক যতবার তাঁহার নিকট প্রতিবাদ প্রেরিত হইয়াছে এবং প্রমাণাদি দেখানো হইয়াছে ততবারই তিনি তাহা ছাপাইয়াছেন। কেহ তথ্যের ভুল কখনো দেখাইয়া দিতে পারিলে তিনি তাহা মানিয়া লইয়াছেন। অনেক সময় প্রতিবাদে তাঁহাকে প্রচুর কটূক্তি করা থাকিলেও তিনি তাহা নিজের কাগজে নিজের অর্থে ছাপিয়াছেন।

তিনি বলিতেন,

"আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচনা করিয়া, উহার কোনো কোনো কর্মীর সমালোচনা কবিযা, কখনো আন্তবিক পূর্ণ সন্তোষ অনুভব করিতে পাবি নাই। বিশ্ববিদ্যালযেব জন্য নিঃস্বার্থ কোনো সেবার কার্য কবিতে পারিলে অধিকতর তৃপ্তি লাভ কবিতে পারিতাম।...কিন্তু আমাদের এই ত্রুটিব অনুকবণ ও অনুসরণ বয়ঃকনিষ্ঠেরা যেন না করেন, এই সনির্বন্ধ অনুবোধ। তাঁহারা সমালোচনা করুন তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু কর্মী হইবার জন্যও কোমর বাঁধুন।"

তাঁহার "শিক্ষা-মা"র (Alma Mater) প্রতি যে তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল ইহার পরিচয় ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অনেকের নিকট দিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে এই অনুরাগের কথা সাধারণের সমক্ষেও বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে জনসাধারণ যে তিনটি রৌপ্য পাত্রে অভিনন্দন-লিপি উপহার দিয়াছিলেন তিনি সেইগুলি তাঁহার "শিক্ষা-মা" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একজন "অযোগ্য ছাত্রে"র উপহাররূপে রাখিবার অনুরোধ রামানন্দ-জয়ন্তী সমিতির সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে করিয়া যান।

দেশব্যাপী শিক্ষা

রামানন্দ দেশের প্রত্যেকটি লোককে শিক্ষিত দেখিবার ইচ্ছা মনে পোষণ করিতেন। যদি প্রাথমিক শিক্ষা দেশের সর্বত্র বাধ্যতামূলক হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইত তাহাতেও তিনি খুশি হইতেন না। তিনি বলিতেন, "তাহা হইলেও দেশের অজ্ঞতা ঘুচিতে বহুদিন যাইবে। কেননা, যে-সব প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী বাল্যে শিক্ষা পায় নাই, তাহারা নিরক্ষরই থাকিয়া যাইবে। জানি, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা এক জিনিস নয় ; লিখন-পঠন-ক্ষমতা ও শিক্ষাও এক জিনিস নয় ; কিন্তু শিক্ষা দিবার, জ্ঞান বিস্তার করিবার প্রধান উপায় লিখিতে পড়িতে শিখান।" এই জন্য তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যও বিদ্যালয় করার পক্ষে ছিলেন। 'আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক—অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক লোক নিরক্ষর ও অজ্ঞ' বলিয়াই এই ইচ্ছা তাঁহার বলবতি ছিল।

তিনি মনে করিতেন,

"হৃদয় মনের ও আত্মার সম্পদ জাতীয় প্রধান সম্পদ। এই সম্পদে আমরা অত্যন্ত হীন।...মোটের উপর ইহা বলা ভুল নহে, যে, যে-জাতির প্রায় সব লোক নিরক্ষর সে জাতি অজ্ঞ। আমরা সেইরূপ একটি অজ্ঞ জাতি। এই অজ্ঞ জাতির পুরুষদের চেয়ে আবার নারীরা আরও বেশি অজ্ঞ। আমাদের দেশের মানসিক সম্পদ বাড়িতেছে কিনা স্থির করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, দেশের নিরক্ষরতা দূর হইতেছে কিনা।...নিরক্ষরতা অল্পে অল্পে দূর হইলে চলিবে না। উহা খুব শীঘ্র দূর করা আবশ্যক।

"কিন্তু অল্পে অল্পে বা দ্রুত নিরক্ষরতা দূর হইলেই আমরা মনে করিতে পারিব না, যে, আমরা মানসিক সম্পত্তিশালী একটি জাতি হইতে পারিয়াছি। মানসিক

সম্পত্তিশালিতার অন্যান্য প্রকৃষ্ট প্রমাণ চাই। দেখিতে হইবে দেশের কত লোক উচ্চ শিক্ষা পাইতেছে।"

মানুষ উচ্চ শিক্ষা পাইলেই যে তাহার কাজ শেষ হইয়া গেল না ইহা মনে করাইবার জন্য তিনি বলেন,

"কত লোক শিক্ষা পাইয়া লেখাপড়ার চর্চা রাখে, তাহা জানিতে পারিলে জাতির জ্ঞানপ্রিয়তার পরিমাণ স্থির করা যায়। ভাল পুরাতন বহির নূতন সংস্করণ কত হয়, প্রত্যেক সংস্করণে কত শত বা হাজার ছাপা হয়, নূতন বহি কি কি বিষয়ক ও কত বাহির হয় এবং সে সব বহি কতগুলি করিয়া ছাপা হয়, ত্রৈমাসিক, মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক কাগজ কতখানি বাহির হয় ও সেগুলি মোট কত ছাপা হয়, জানিতে পারিলে জাতিব জ্ঞানলিপ্সা ও কৌতূহলেব মাপ ঠিক হইতে পাবে।"

আমরা যে সব কারণে পাশ্চাত্য সভ্য জাতিদের চেয়ে বহি ও কাগজ কম লিখি, ছাপি, কিনি ও পড়ি তাহার অন্যতম কারণ আমাদের জ্ঞানলিপ্সা ও কৌতূহলের অভাব—ইহাই রামানন্দ মনে করিতেন।

তিনি মনে করিতেন,

"আমাদের দেশ যেরূপ বড়ো এবং আমাদেব জাতির লোকসংখ্যা যেরূপ বেশি, তাহাব তুলনায় আমরা আধুনিক কালে জগতের চিন্তা ভাব ও জ্ঞানের ভাণ্ডারে অল্পই রত্ন সঞ্চয় করিয়া দিয়াছি।"

অবশ্য যে-কোনো রকমের রচনাই যে জাতীয় মানসিক ঐশ্বর্যের পরিচায়ক নয় তাহা তিনি সর্বাগ্রেই বলিতেন।

স্কুল কলেজের ছুটির সময় সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদিগকে জ্ঞানবৃদ্ধি ও দেশহিতৈষণা শিক্ষার জন্য তিনি, তাহাদের অবসর কম জানিয়াও, নিজ নিজ গ্রামের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রোগীর চিকিৎসা, পানীয় জল, গোচারণের মাঠ, কথকতা, চাষের উন্নতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে সঠিক খবর সংগ্রহ করিতে বলিতেন। উপরন্তু গ্রামের কোনো কোনো অভাব মোচনের চেষ্টাও করিতে বলিতেন। ছাত্রদের পক্ষে শিক্ষা দেওয়া সহজ, এইজন্য তিনি চাহিতেন প্রত্যেক ছাত্র যেন ছাত্রাবস্থাতেই কয়েক জনের নিরক্ষরতা দূর করে।

রামানন্দ বলিতেন,

"আমাদের দেশের বাবু লোকেরা জাতির প্রধান অংশ নহে, কেবল তাহাদিগকে লইয়াই জাতি গঠিত তো নহেই। যাহাবা চাষ করিয়া কুলি মজুরের কাজ করিয়া বা কোনোপ্রকার কারিগবী মিস্ত্রিগিরি করিয়া খায় তাহাবাই জাতির প্রধান অংশ। তাহাদিগকে বাদ দিয়া জাতি বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। এই যে অধিকাংশ শ্রমী ও অপেক্ষাকৃত দুঃখী ও গরীব লোক, তাহাদের জীবনের ও জীবিকার উপায়ের সহিত যে শিক্ষার সম্পর্ক নাই, তাহা জাতীয় শিক্ষা নহে।

"ভারতবর্ষের লোকদের সাধনায় শ্রমে ও প্রতিভায় যে যে বিদ্যা ও যেরূপ সভ্যতার জন্ম ও উন্নতি হইয়াছে, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকিলে কোনো শিক্ষাপ্রণালী জাতীয় হইতে পারে না।"

আজকাল দেশের নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য নানা আন্দোলন মাঝে মাঝে হয়। কিন্তু ছুটির সময় ছাত্রদের সাহায্যে নিরক্ষর লোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং প্রতি শিক্ষিত লোকের দ্বারা তিন-চার জন লোকের নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্ল্যানের বিষয় তিনিই এদেশে প্রথম আন্দোলন করেন। তিনি তাঁহার পত্রিকাদিতে যত দীর্ঘ দিন ধরিয়া এ বিষয়ে যতবার লিখিয়াছেন অন্য কোনো কাগজে তাহার তুলনায় অতি সামান্যই লেখা হইয়াছে।

স্বাধীনতা

স্বাধীনতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূজারী বলিয়াই রামানন্দ ভারতে ও ভারতের বাহিরে সম্মানিত। স্বাধীনতার স্বপ্নকে মূর্ত করিবার কাজেই প্রধানত তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার মনে স্বাধীনতার রূপ কি প্রকার ছিল এবং তাহার প্রয়োজনই বা কী কী কারণে তিনি অনুভব করিতেন তাহা তাঁহার ভাষাতেই বলা ভালো। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তিনি, বিশেষ করিয়া চল্লিশ বৎসর ধরিয়া যে কাণ্ডারীর কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহা হয়ত ভারতের ইতিহাসে কোনো দিন লিখিত হইবে। যদুনাথ সরকার মহাশয় ভারতের এই সময়ের ইতিহাস "সত্যই মডার্ন রিভিয়ু এবং ভারতের বিদেশি আমলাতন্ত্রের মধ্যে যুদ্ধের কাহিনী মাত্র" বলেন। এ বিষয়ে লিখিবার যোগ্যতা আমার নাই বলিয়া আমি কেবল কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিতেছি :

"ভারতবর্ষে স্ববাজের প্রয়োজন ইহাব নানা অভাব-অভিযোগ দুঃখ ও দুর্দশা হইতে বুঝিতে পারা যায়। সভ্য লোকদের দ্বারা শাসিত সমুদয় দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ দবিদ্রতম ..।...সভ্য লোকদেব দ্বারা শাসিত সকল দেশের মধ্যে ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা শতকরা অধিকসংখ্যক নিরক্ষর লোক বাস কবে। ইংরেজরা ইহার সম্যক প্রতিকারের চেষ্টা করে নাই বা করিতে পারে নাই। সভ্য লোকদের দ্বারা শাসিত দেশসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষ সর্বাপেক্ষা ব্যাধিক্লিষ্ট এবং মহামারী দ্বারা কবলিত।...

"কিন্তু আমাদের নানা দুঃখ দুর্দশা অভাব অভিযোগই আমাদের স্বরাজ লাভ চেষ্টার একমাত্র কারণ নহে। যদি ইংরেজ-রাজত্ব একেবারে নিখুঁত হইত, যদি দেশে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, সংক্রামক ব্যাধি, মহামারী প্রভৃতি না থাকিত, কিংবা যদি ভবিষ্যতে ইংরেজের সুশাসনে অচিবে দেশে ঐরূপ সুদশার আবির্ভাব হয়, তাহা হইলেও আমরা স্বরাজ চাই, নিজের দেশের কাজ নিজেরা চালাইতে চাই।

"তাহার কারণ আমরা মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু কিংবা দ্বিপদ বনমানুষ নই। ঈশ্বর আমাদিগকে মানব জন্ম দিয়াছেন। সুতরাং আমরা কেবল সুশাসনে সন্তুষ্ট হইতে পারি না। আমরা নিজেরা স্বশাসক ও সুশাসক হইতে চাই, নিজেদের কাজ নিজেরা করিতে চাই। প্রকৃতিস্থ মানুষের ধর্মই এই যে, সে নিজের কাজ নিজে করিতে চায়, সে আত্মনির্ভরশীল। শিশু টলিতে টলিতে চলিয়া বার বার পড়িয়া গেলেও সর্বদা কোলে থাকিতে চায় না, নিজের সব কাজ অকাজ তো নিজে করেই, অধিকন্তু গৃহকর্মও করিতে গিয়া পিতামাতা গুরুজনের কাজ এত বাড়াইয়া দেয় যে, তাঁহারা মধ্যে মধ্যে তাহার কর্মিষ্ঠতার সাময়িক কিছু হ্রাস কামনা করিতে বাধ্য হন। কোনো মানুষের পক্ষেই সর্বদা অপরের যত্ন পাওয়া, অন্যের নিকট হইতে সর্বদা উপকার লাভ হিতকর ও বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাতে শুধু যে তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের, স্বাবলম্বী হইবার বাধা জন্মে তাহা নহে, ইহা দ্বারা তাহার মনুষ্যত্ব অপমানিত হয়। যে যে-পরিমাণ অক্ষম, সে সেই পরিমাণে অপরের নিকট হইতে যত্ন ও উপকার গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। অল্পবয়স্ক ও অতিবৃদ্ধ মানুষদের পক্ষে ইহা আবশ্যক এবং তাহাতে তাহাদের কোনো অপমান নাই। কিন্তু সমর্থ বয়সের সকল নরনারীর পক্ষে অন্যের যত্ন ও উপকার চাওয়া ও পাওয়া অপমানের বিষয়। ইহাতে তাহাদের মনুষ্যত্বের অমর্যাদা হয়।

"সুশাসন তাহাই, যাহা মানুষকে বাহিরে ও অন্তরে প্রকৃত মানুষ হইতে দেয় ও হইতে সাহায্য করে। পর-শাসন হাজার ভাল হইলেও সুশাসন নামের যোগ্য হইতে পারে না।" (শ্রীহট্টে প্রদত্ত বক্তৃতা)

স্বজাতির সম্মান-বোধ তাঁহার মধ্যে এমন জাগ্রত ছিল যে, সাইমন কমিশন সম্বন্ধে তিনি

নানা কথার ভিতর একবার বলেন, "কোনো জাতির আত্মশাসনের যোগ্যতা পরীক্ষা করিবার অধিকার অন্য কোনো জাতির নাই।"

স্বাধীনতাকে রামানন্দ কত উচ্চে স্থান দিতেন এবং কত বড়ো মনে করিতেন তাহা প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বেই তিনি বলিয়াছিলেন :

"মোক্ষের আকাঙক্ষা, মুক্ত অবস্থার আকাঙক্ষা অপেক্ষা মানুষের উচ্চতর বাসনা আর নাই। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইহাই স্বরাজের আকাঙক্ষার আকার ধারণ করে। এই স্বরাজের মানে নানা লোক নানারকম করিয়াছেন। কিন্তু যদি সকলকে বলা যায় যে, সম্পূর্ণ স্বাধীন যদি হইতে পারা যায় এবং পূর্ণ স্বাধীনতা যদি রক্ষা করিতে পারা যায় তাহা হইলে আপনারা স্বাধীনতা চান, না অন্য কোনো রকমেব স্বরাজ চান, তাহা হইলে, সকলে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারুন বা না পারুন, গোপনে মনে মনে যে সকলেই পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিবেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

"স্বাধীনতার চেয়ে কম কিছু পাইলেও তাহাতেই মানুষ যে সন্তোষ প্রকাশ করে সেটা চূড়ান্ত সন্তোষ নহে, মনের নিভৃত কোণে একটু অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। যে মানুষের মন জাগিয়াছে সে পূর্ণ স্বাধীনতা ভিন্ন আর কোনো নিম্নতর রাষ্ট্রীয় অবস্থাকেই চরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পাবে না। কিন্তু আমরা ভারতীয় সাম্রাজ্য নাম দিয়া অন্য কোনো জাতিকে পরাধীন করিয়া ঐ সাম্রাজ্যের মধ্যে রাখিতে চাই না। আমরা নিজে স্বাধীন হইতে চাই, এবং অন্য সকলকেও স্বাধীন দেখিতে চাই।

"স্বাধীন হইতে হইলে প্রাণ পণ করিতে পারা চাই।

"স্বাধীনতা লাভের আমাদের বর্তমান শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র পথ ও উপায় অহিংসার অবিরোধী।

"বস্তুত আমাদের মনের কোণে নানা ভয় আছে বলিয়াই আমরা স্বাধীনতাকেই চরম লক্ষ্য বলিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিতে এবং বাহিরে প্রকাশ করিতে পারি না।

"ভারতের রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎকে সম্প্রদায়-বিশেষের রাজত্বরূপে কল্পনা করিলে তাহা কল্পনাই থাকিবে। সকল সম্প্রদায় যদি গণতন্ত্রেব আদর্শ বুঝিয়া তাহা গ্রহণ করেন, এবং সেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিবার সঙ্কল্প ও সম্মিলিত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আশা সফল হইতে পারে, নতুবা নহে। মানুষকে কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত না ভাবিয়া কেবল মানুষ ভাবিয়া তাহার কল্যাণ কিসে হয়, তাহার ব্যক্তিগত স্বরাজ্যসিদ্ধি কিসে হয়, সমুদয় দেশবাসীর জাতিগত স্বরাজসিদ্ধি কিসে হয়, তাহারই চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হইবে।. .

"মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি পূর্ণমাত্রায় উদ্বোধিত ও বিকশিত না হইলে মানুষ স্বাধীন হইতে পারে না, ইহা যেমন সত্য ; মানুষ স্বাধীন না হইলে তাহার শক্তি পূর্ণমাত্রায় উদ্বোধিত ও বিকশিত হইতে পারে না, ইহাও তেমনি সত্য। ইংরেজ ভারতের প্রভু হইবার পূর্বে আমাদের নিজের শক্তি যতটুকু ছিল, এখন তাহাও নাই।...

"পরাধীনতা মানুষকে কখনো বল দিতে পাবে না ; উহা মানুষকে দুর্বলই করে, মানুষের কল্পনা, চিন্তা, আশা, আকাঙক্ষাকে পর্যন্ত শৃঙ্খলিত কবে।...

"জাগতিক ব্যাপারে প্রত্যেক দেশের ও জাতির মঙ্গল অন্য প্রত্যেক দেশের ও জাতির মঙ্গলের উপর নির্ভর করে। এই জন্য জাতীয় স্বাধীনতার পবেও আর-একটি লক্ষ্য মানুষের আছে। তাহা সকল জাতির পরস্পরের উপর নির্ভর (Interdependence of nations)। কিন্তু ইহার আগে জাতীয় স্বাধীনতা চাই। যে জাতি স্বাধীন নহে, সে তো জাতিই নহে, তাহার তো স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই। তাহার উপর আবার অন্য জাতিরা কি নির্ভর করিবে?" (আশ্বিন ১৩২৮)।

আমাদের রাজা সম্পূর্ণ বিজাতীয় বলিয়া রামানন্দ স্বাধীনতার প্রয়োজন আরও অধিক

অনুভব করিতেন। তিনি বলিতেন :

"ভারতবর্ষের ও ইংলন্ডের লোকদের কিংবদন্তী লোকশ্রুতি অতীতস্মৃতি বা ঐতিহ্য এক নহে। আমাদের ও তাহাদের অতীত গৌরব ও লক্ষ্য, হর্ষ ও শোক এক নহে। তাহাদের ও আমাদের সভ্যতা এবং হৃদয়-মনের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা ও তাহাদের ফল এক প্রকারের নহে। জাতিতে, ধর্মে ও ভাষায় তাহারা ও আমরা এক নহি। তাহারা শীতপ্রধান দেশের এবং আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক।...এই সব কারণে তাহাদের ও আমাদের এক সাম্রাজ্যভুক্ত থাকা স্বাভাবিক নহে। আমরা উভয় জাতি পরস্পরের সহিত বিরোধ না করিয়া যত শীঘ্র স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে বাস করিবার জন্য যদি প্রস্তুত হই, তবে তাহা সুফলপ্রদ হইবে। ইহার বিপরীত চেষ্টা সফল হইবে না, এবং তাহাতে সুফলও ফলিবে না।"

স্বাধীনতার পথে যে-কোনো ন্যায্য উপায়ে যতটুকু অগ্রসর হওয়া যায় ততটুকুই ভালো মনে করিয়া তিনি বলিতেন :

"অনেকে মনে করেন, কেবলমাত্র চরমপন্থী ও অসহযোগীরাই স্বাধীনতা চান, এবং তাঁহাদের অবলম্বিত উপায়েই স্বাধীনতা পাওয়া যাইতে পারে। ঐ উপায়ে যে স্বাধীনতা পাইবার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু যাঁহারা মধ্যপন্থী, নরমপন্থী, উদারনৈতিক, বা মডারেট নামে অভিহিত, তাঁহারা আপাতত যাহা চাহিতেছেন, তাহা পূর্ণ স্বাধীনতা না হইলেও, তাঁহাদের অনেকের চরম লক্ষ্য স্বাধীনতা বলিয়া আমাদের ধারণা। তাঁহারা এখন যাহা চাহিতেছেন, তাহা স্বাধীনতা পাইবার একটা ধাপ হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি। এই জন্য, তাঁহারা পূর্ণ স্বাধীনতার উল্টা দিকে যাইতেছেন, মনে করি না।"

স্বাধীনতা অনায়াসলভ্য মনে করার ভ্রান্তি দেখাইয়া তিনি বলিতেন :

"শেষ লক্ষ্য যে স্বাধীনতা, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু তা বলিয়া, স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর থাকিয়া হাতের কাজে অবহেলা কবিলে চলিবে না।...স্বাধীনতা পাইবার জন্য যাহা এখন হইতে করা দরকার তাহা করা হউক।...আমরা ইহাও যেন বিস্মৃত না হই, যে, ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত ও জাতিগত ভাবে যাহারা অলস, অকর্মণ্য, অনিপুণ, বিশ্বাসের অযোগ্য, যাহাদের কথার ঠিক নাই, যাহাদের সময়নিষ্ঠা নাই, যাহাদের দেহ মন হস্ত সবল দৃঢ় কষ্টসহিষ্ণু নহে, স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা করিবার যোগ্যতা তাহাদের নাই।...শ্রমের সকল ক্ষেত্রেই বাঙালির পরাজয়ের কারণ অল্পাধিক পবিমাণে তাহাদের আলস্য, শ্রমবিমুখতা, নৈপুণ্যের অল্পতা, ফাঁকি দিবার অভ্যাস, প্রভৃতির মধ্যে পাওয়া যাইবে।...

"(*স্বাধীন দেশের লোকেদের*) *চেয়ে আমাদের যোগ্যতা একটু বেশি হইলে তবে* আমরা স্বাধীন হইতে পারিব। সমতল রাস্তা দিয়া গাড়ি টানিয়া লইয়া যাওয়া যত সহজ, পথের মাঝখানে এ-পাশ-ও-পাশ পর্যন্ত কেহ একটা বড়ো পাথর রাখিয়া দিলে তত সোজা হয় না।...আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের রথ স্বাধীনতার পথে চালাইতে হইলে এই কথা মনে রাখিতে হইবে।...সেই জন্য বলিতেছি, আমাদের সাহস, বুদ্ধি, বিবেচনা স্বার্থত্যাগ, ক্ষমতা, একতা, দলবদ্ধতা, জাতি ধর্ম-শ্রেণী স্ত্রী-পুরুষ ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলকে প্রতিবেশী জ্ঞান ও সকলের প্রতি মমতা বোধ, দেশহিতৈষণা ও দেশের কল্যাণসাধনে একাগ্রতা, স্বাস্থ্য ও বল, সর্বপ্রকার শিক্ষা ও নৈপুণ্য, সত্যবাদিতা ও কর্তব্যপরায়ণতা, চরিত্রের নির্মলতা, স্বাধীন দেশের লোকেদের অপেক্ষা অধিক হইলে তবে আমরা নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা অর্জন করিবার আশা করিতে পারিব।

"যে কোনো ধর্ম সম্প্রদায় ও জাতি ভারতবর্ষের স্থায়ী বাসিন্দা, অন্য সব স্থায়ী

বাসিন্দারা তাহাকে নিজেদের সমান ভারতীয় মনে করিলে, তবে আমরা পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করিবার ও রক্ষা করিবার যোগ্য হইব।" (অগ্রহায়ণ, ১৩২৮)

যাহার যোগ্যতা নাই সে-ই স্বাধীনতা হারায় এবং ফিরিয়া পাইতে সহজে পারে না মনে করিয়া তিনি বলেন,

"আমরা কিছু কিছু নব্য বিজ্ঞানাদি শিখিযাছি বটে, কিন্তু সর্বপ্রধান দুইটি বিষয়ে আমাদের অধোগতি হইয়াছে।

(১) "আমরা অতীতকালে অনেকবার বহিঃশত্রুর পদানত হইয়াছি, শত্রু কখনো কখনো আমাদের দেশে বসবাস করিয়া আমাদের ভাই প্রতিবেশী হইয়া গিয়াছে ও ভ্রাতৃত্ব বা প্রভুত্ব কবিযাছে। কিন্তু আমবা অতীতকালে বহিঃশত্রুকে যতবাব তাডাইয়া দিতে পাবিয়াছি, কিংবা দেশেবই স্থাযী বাসিন্দায় পরিণত প্রভুর অধীনতা শৃঙ্খল ভগ্ন কবিয়াছি তখনই তাহা আমাদেব নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বাবা করিয়াছি, মুক্তিব জন্য, স্বাধীনতার জন্য পবের, বিদেশিব, মুখাপেক্ষা করি নাই, পরেব, বিদেশির সাহায্য চাই নাই, পাই নাই, লই নাই। এই যে স্বাবলম্বনের ভাব ও স্বাবলম্বনের কাজ, এই যে বার বাব ভূলুণ্ঠিত হওয়া, নিজের জোরে খাড়া হইয়া দাঁড়ানো ও দাঁড়াইবার শক্তিতে আত্মবিশ্বাস, এই অমূল্য জিনিসটি আমবা ইংরেজ রাজত্বে হারাইয়াছি। এখন আমরা পরের হাত হইতে অনুগ্রহের দান স্বরূপ 'স্ব-অধীনতা' পাইব বলিয়া আশা করিয়াছি। এইরূপ আশাটাই একটা স্ববিবোধী জিনিস। কেন না, চাহিতেছি স্বাধীনতা, অথচ স্ব-অধীনতার আশাটা স্বাধীনতার কল্পনাটা পর্যন্ত পবাশ্রয়ে, পরানুগ্রহাবলম্বী হইয়া গিয়াছে। আশা ও কল্পনা পর্যন্ত পবাধীন হইয়া যাওয়ার মতো অধঃপাত ও গোলামি অতীত কোনো যুগে আমাদের হইয়াছিল কি না, তাহা ঐতিহাসিকেবা বলুন। ইহাই প্রকৃত এবং সর্বাপেক্ষা লজ্জাকব ও ক্ষোভজনক slave mentality, গোলামি ভাব, বা দাসসুলভ মতিগতি ; দুই-চারিটা চাকবিব প্রার্থী হওয়া ইহার মতো গোলামি ভাব নহে।

"(২) দ্বিতীয় যে অমূল্য জিনিসটি হারাইয়াছি তাহা আত্মরক্ষার ক্ষমতা।. .বিদেশি পর যতদিন আমাদিগকে বক্ষা কবিতেছে, ততদিন তো উহা 'আত্মবক্ষা' নয়। উহাবা তো আমাদিগকে সেইরূপ রক্ষা করিতেছে যেমন ভেড়ার মালিক নেকড়ে বাঘ হইতে মেষ রক্ষা করে। আত্মবক্ষার মানে নিজের জোরে নিজেকে রক্ষা করা। তাহা হইলে 'মেষ আমরা নহি তো মানুষ।' তাহা হইলে নরদেহধারী মেষদিগের ভূভার বৃদ্ধি করিবার কোনো প্রয়োজন আছে কি?" (চৈত্র ১৩২৮)

তিনি তর্কশাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাকে বার্কের সহিত অনেকে তুলনা করিয়াছেন। ভারতীয়েরা অযোগ্য হইলেও জগতে অযোগ্য স্বাধীন জাতির অভাব নাই প্রমাণ করিতে তিনি বলেন :

"জগতে যত স্বাধীন জাতি আছে, তাহারা সকলেই নিজ নিজ দেহের কাজ চালাইতে আমাদের চেয়ে অধিকতর সমর্থ ও দক্ষ, ইহা সত্য নহে। কোনো জাতিই নিজের দেশের সব কাজ নিখুঁত ভাবে চালাইতেছে না, চালাইতে পাবে না। স্বাধীনতার যোগ্যতার একটা নির্দিষ্ট পরখ আছে, তাহাতে বিস্তর স্বাধীন জাতিও উত্তীর্ণ হইবে না। সে পরখ হইতেছে, স্বাধীন জাতিটি বিদেশির আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা করিতে সমর্থ কিনা।..ফ্রান্স তাহার মিত্রদের সাহায্যে দেশরক্ষা করিয়াছে, নতুবা পারিত না ; বেলজিয়মও তাহাই করিয়াছে; ব্রিটেনও তাহাই করিয়াছে ; কেননা, সবাই জানে আমেরিকা আসরে না নামিলে ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম সব জাতিই জার্মেনির দ্বারা পরাজিত হইত। অতএব ভারতবর্ষ বর্তমান সময়ে অন্যের সাহায্য ব্যতীত বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অক্ষম বলিয়া তাহার স্বাধীনতা থাকা উচিত নয়, এরূপ কথা অসার ও মূল্যহীন।" (ফাল্গুন ১৩২৮)

অন্যায় ও পাপকে তিনি এমন ঘৃণা করিতেন যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে কৃত পাপ পাপ নহে, এই চলিত বচনটি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না ; তাই চৌরিচরার অত্যাচার বিষয়ে রামানন্দ বলেন,

"এইরূপ ব্যবহার পৈশাচিক। সাধারণ জনতা দ্বারা ইহা হইয়া থাকিলে, ইহা পৈশাচিক; কিন্তু ইহা যদি অসহযোগী স্বেচ্ছাসেবকদের নেতৃত্বে হইয়া থাকে, বা যদি জনতার অধিকাংশ বা কিয়দংশ অসহযোগী স্বেচ্ছাসেবক ছিল, তাহা হইলে ইহা আরও অধিকতব গর্হিত এবং পৈশাচিক। অসহযোগী স্বেচ্ছাসেবকদের যে সম্পূর্ণ অহিংসাপন্থী হওয়া উচিত তাহা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষও একটি প্রতিজ্ঞা দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন।...সুতরাং অহিংসাব্রত গ্রহণ করিবার পর যে-কেহ গৃহদাহ ও নবহত্যায় লিপ্ত হয়, সে তো অমানুষ বটেই, অধিকন্তু মিথ্যাবাদী এবং ভণ্ডও বটে।" (ফাল্গুন ১৩২৮)

অথচ নববর্ষে তাঁহার প্রথম প্রার্থনা ছিল স্বরাজ্যের। কিন্তু তাহা তাঁহার মতো নিষ্কলুষ মনের উপযুক্ত স্বরাজ। তাই তিনি বলেন,

"বর্ষারম্ভে বিশ্বপতির নিকট পূর্ণ স্বরাজ প্রার্থনা করিতেছি। ব্যক্তিগত স্বরাজ চাহিতেছি, সমষ্টিগত স্ববাজ চাহিতেছি। যে আত্মকর্তৃত্ব চাহিতেছি, তাহা মনুষ্য হৃদয়ে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি কুলের কর্তৃত্ব নহে। যে আত্মকর্তৃত্ব চাহিতেছি, পরমাত্মাব কর্তৃত্বই তাহার ভিত্তি।" তিনি বলিতেন, "ইংরাজেব প্রতি কোনো বিদ্বেষ পোষণ না কবিলে ও তাহার বিন্দুমাত্র কারণও না থাকিলেও আমবা স্বাধীনতা চাই।" (বৈশাখ ১৩২৯)

তিনি বলিতেন .

"স্বাধীনতা-দিবস উপলক্ষে পঠিত প্রতিজ্ঞা-পত্রে যদি এই মর্মেব কথাও থাকিত যে, ব্রিটিশ-শাসন যদি উৎকৃষ্ট হইত, তাহা হইলেও আমবা স্বাধীনতা লাভে যত্নবান হইতাম, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞাটি পূর্ণাঙ্গ হইত।" (মাঘ ১৩৪৬)

"বাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমবা সর্বান্তঃকবণে চাই। এই স্বাধীনতা না থাকায় অন্য অনিষ্ট তো হয়ই, এমনকী আত্মারও অকল্যাণ হয়, প্রকৃত ধর্মসাধনার পথেও অগ্রসর হওয়া যায় না। কিন্তু এমন উপায়ে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমরা চাই না, যাহা অবলম্বনে ধর্মহানি, আত্মার অকল্যাণ হয়। যুদ্ধ জিনিসটাকে সর্ববিধ পাপের সমষ্টি বলা হইয়াছে। ইহা অতি সত্য কথা। মিথ্যাভাষণ, প্রতারণা, পবস্ব-অপহরণ, গুপ্ত ও প্রকাশ্য নবহত্যা, নারীর উপর অত্যাচার এবং আব যাহা কিছু পাপ ও অপবাধ আছে, সমস্তই যুদ্ধের অন্তর্গত।...আমরা যুদ্ধের বিরোধী -।

"আমরা মনে কবি যুদ্ধ না করিয়াও স্বাধীনতালাভ করা যাইতে পাবে। অকল্যাণের পথে না গেলে কল্যাণ হইবে না, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। ইহা ভীরুর পরামর্শ নহে। যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন হইতে গেলে যত অধ্যবসায়, সাহস ও স্বার্থত্যাগ আবশ্যক, বিনাযুদ্ধে স্বাধীন হইতে গেলে তাহা অপেক্ষা কম অধ্যবসায়, সাহস ও স্বার্থত্যাগে চলিবে না—ববং বেশি চাই। অন্যের প্রাণ আমরা লইব না, কিন্তু নিজের প্রাণ দিতে হইতে পারে।" (অগ্রহায়ণ ১৩৩১)

তাঁহার অহিংসার আদর্শ কত উচ্চ ছিল, তাহা ইহা হইতে বুঝা যায় :

"মানুষ খুন না করিলেও যে অহিংসা হয়, তাহা নহে।...ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ, তাহাদের সম্বন্ধে মিথ্যা কথার প্রচার, ছলে বলে কৌশলে প্রতিদ্বন্দ্বীর অনিষ্ট করিয়া তাহার অনিষ্ট ও পরাজয় সাধন, এ সমস্তই হিংসা। যাহারা এই রকম আচরণ করে, তাহারা হিংসাপন্থী। তাহারা ভারতীয় স্বরাজ চায় না, নিজেদের প্রভুত্ব চায়। ভারতীয় যে কোনো একটা দলের প্রভুত্ব স্বরাজ নয়।" (১৩৩১ অগ্রহায়ণ)

তিনি বিশ্বপতির নিকট যে পূর্ণ স্বরাজ চাহিয়াছিলেন সেই হিংসাদ্বেষবর্জিত প্রভুত্বমদগর্বশূন্য স্বরাজ কবে আসিবে জানি না।

নারীহিতৈষী

রামানন্দ নারীকে কেবল নারী বলিয়া সম্মান করিতেন না, আত্মা বলিয়াই করিতেন। তিনি মনে করিতেন পুরুষ যেমন আত্মা, নারীও তেমনি আত্মা। নারীর মাতৃত্ব তাঁহার একটি প্রধান বৃত্তি, ধর্ম ও স্বরূপ, কিন্তু তাহাই তাঁহার একমাত্র বৃত্তি, ধর্ম ও স্বরূপ নহে। তিনি চাহিতেন যে, "নারী নারী-প্রকৃতির সমুদয় সদ্‌গুণে ভূষিত হউন।" কিন্তু এই আশাও করিতেন যে, নারী মহৎ মানুষ হইবেন, সেই সব গুণ ও শক্তির বিকাশ নারীতে হইবে যাহা নারী ও পুরুষ উভয়েরই সাধারণ সম্পত্তি, সেই-সব কাজ নারী করিবেন যাহা লোক-শ্রেয় সাধনার্থ ও জগতের ঋণ-পরিশোধনার্থ পুরুষ ও নারী উভয়েই করিতে পারেন এবং উভয়েরই কর্তব্য। সেই সব আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধি তাঁহার হইবে যাঁহা মহিলা ও পুরুষ উভয়েরই হয় ও হইতে পারে। নারী ও পুরুষকে ভিন্ন ভাবে বিচার তিনি করিতেন না ; কিন্তু নারীরা বহুকাল তাহাদের স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত বলিয়া তাহাদের ছোটো বড়ো কৃতিত্ব সাফল্য ও দাবী-দাওয়া সকল বিষয়ের প্রচারের জন্যই তিনি যত দীর্ঘ দিন ধরিয়া যত চেষ্টা করিয়াছেন পুরুষের জন্য হয়ত ততো করেন নাই। বাংলা দেশে কিংবা ভারতবর্ষে আর কোনো দুইটি মাসিকপত্র একত্রে এত দিন ধরিয়া নারীর অধিকার প্রচার করিতে এবং নারীর তুচ্ছতম কৃতিত্বের ঘোষণা করিতে এত চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করেন নাই বলিয়া আমার বিশ্বাস। তিনি মনে করিতেন, যে-দেশে নারী কেরাসিনে কাপড় ভিজাইয়া পুড়িয়া মরে, যে-দেশে বধূকে তপ্ত লোহার ছেঁকা দেয়, যে-দেশে রাজারাজড়ারা বহু রানী দাসী দ্বারা পরিবৃত সে দেশ অধঃপতিত থাকিবে ইহা বিচিত্র নয়।

স্ত্রীলোক ২১ বৎসর না হইলে আপনার জিনিসপত্র বেচিতে পারে না, অথচ আপনাকে দান করিতে পারে এই সম্মতি আইনের তিনি বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে সম্মতি আইনের বয়স স্বামীর পক্ষে ১৮ এবং অন্য পুরুষের পক্ষে ২১ হওয়া উচিত।

তিনি বলেন,

> "আইনে এইরূপ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, যে, একুশ বৎসর বয়স হইবার আগে মানুষ নিজের সম্পত্তির দান বিক্রয়াদি কোনো ব্যবস্থা করিবার মতো বুদ্ধির পরিপক্কতা লাভ করে না। কিন্তু বর্তমান আইনে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, যে, কাহাকেও নিজের দেহ সমর্পণ করিবার ফলাফল বুঝিবার উপযুক্ত বুদ্ধির পরিপক্কতা বার (১২) বৎসরের বালিকারও জন্মিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় সিদ্ধান্ত কি হইতে পারে?" (চৈত্র, ১৩৩১)

গণিকাদের সম্বন্ধে রামানন্দ বলিয়াছিলেন,

> এতগুলি স্ত্রীলোক কেন গণিকা হইয়াছে, তাহার কারণ নির্ণয় করিয়া সেই কারণের মূল উচ্ছেদ না করিলে, সামাজিক অপবিত্রতা দূর হইবে না। গণিকাদিগকে করিবে দূর দূর, এবং যে শ্রেণীর লোক প্রথমে তাহাদের সর্বনাশ করে এবং এখনও তাহাদের অস্তিত্বের কারণ হইয়া আছে, তাহাদিগকে করিবে স্বাগত—অন্তত তাহাদিগকে প্রশ্রয় দিবে. এরূপ সামাজিক রীতি হইতে কল্যাণের আশা করা বাতুলতা মাত্র।"

নারীর উপর পৈশাচিক অত্যাচারের কথা শুনিয়া রামানন্দ যেরূপ বিচলিত হইতেন সেরূপ প্রায় কোনো কারণেই হইতেন না। তিনি বলিতেন,

"এরূপ ঘটনার কথা পড়িলে মুমূর্ষু বৃদ্ধেরও রক্ত গরম হইয়া উঠে, মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে এবং বুদ্ধদেব প্রভৃতি জগতের সাধুশিরোমণিগণেব অহিংসার উপদেশ ভুলিয়া যাইতে হয়।"

তিনি আরও বলিতেন,

"দুর্বৃত্তদের পাশব প্রবৃত্তিব আতিশয্য একটা ব্যাধি। তাহার জন্য জেলে তাহাদের ভ্যাসেক্টোমি (vasectomy) নামক অস্ত্র চিকিৎসাব আইন হওয়া উচিত।...ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাব সভ্যদিগকে এ বিষয়ে আমাদের অনুরোধ জানাইতেছি।"

বাল্যকাল হইতে নারীদের দৈহিক ও মানসিক শক্তির উন্নতি সাধন অবশ্য প্রয়োজন এবং পুরুষদের বিপন্নার রক্ষায় সমর্থ হওয়া প্রয়োজন, তিনি মনে করিতেন। কিন্তু তাহার চেয়েও বড়ো কথা এই যে, যে-দেশে অরক্ষিত অবস্থাতেও নারী নিরাপদে বিচরণ করিতে পারে না সে দেশকে তিনি সভ্য মনে করিতেন না। তিনি বলিতেন,

"জগতের সভ্যতম দেশসকলেও মানুষ অনেক বিষয়ে বর্বরতার অবস্থা অতিক্রম কবিতে পারে নাই। একটি বিষয় এই যে, দুই জাতির মধ্যে যুদ্ধ হইলে উভয় পক্ষেব সৈন্যেবাই সুবিধা পাইলেই শত্রুজাতির স্ত্রীলোকদের উপর অত্যাচার করে। যুদ্ধের সময়েই হউক, কিংবা শান্তিব সময়েই হউক, নারীব উপর এইরূপ অত্যাচাব যখন আর হইবে না, তখন বুঝা যাইবে যে মানুষ পশুত্বের অবস্থা অতিক্রম করিয়া মানবত্ব লাভ করিযাছে।..নারীর নিঃশঙ্ক অবস্থায় কাল-যা ।ন সভ্যতার একটি মাপকাঠি।"

স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা যে বধূদের উপর অত্যাচার করে ইহা বাঙালি সমাজেরই বিশেষ কলঙ্ক বলিয়া তিনি লজ্জা অনুভব করিতেন এবং এ বিষয়ে দেশবাসী পুরুষদের বারে বারে কঠোব কথা শুনাইতেন। নারীর দুঃখ ও অপমান বিষয়ে তিনি যত বার যত কথা লিখিয়াছেন তাহা দিয়া একটি স্বতন্ত্র পুস্তক হইতে পারে।

একটা নরাধম স্বামীর অত্যাচারের কথা লিখিতে লিখিতে রামানন্দ লেখেন,

"বঙ্গে নারীজীবনের কথা ভাবিয়া পুনর্জন্মবিশ্বাসী কাহারও আর এ ইচ্ছা হয় না, যে, যিনি একবার এদেশে নারী হইয়া জন্মিয়াছিলেন, পুনর্বার তিনি নারী হইয়া এই দেশেই জন্মগ্রহণ করুন।—এ-জন্মে যে অল্পসংখ্যক বাঙালি মহিলা সৌভাগ্যবতী ছিলেন, ইহার পরের জন্মে তাঁহাদের যদি সে সৌভাগ্য না ঘটে!"

১৩৩১-এ রামানন্দ লিখিয়াছিলেন,

"নারীর উপর অত্যাচারেব প্রাদুর্ভাব বাংলা দেশে অত্যন্ত বাড়িয়াছে।...বাঙালির ইহা অপেক্ষা কলঙ্ক আর নাই। যুবকেরা এই কলঙ্ক মোচন করুন। নতুবা বাঙালি জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হউক।"

"সমুদয় পৃথিবীতে নরমাংস ভোজনের বিরুদ্ধে যেমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্কার ও লোকমত জন্মিয়াছে, নারীর উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তেমনি একটি প্রবল সংস্কার ও লোকমত বদ্ধমূল হইলে বুঝিব যে, পৃথিবীর লোক সভ্য হইয়াছে।"

পরমুখাপেক্ষিতায় স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই মনুষ্যত্ব খর্ব হয় ইহা রামানন্দ মনে করিতেন। তাই তিনি বলিতেন,

"স্বাবলম্বন নারীদের পক্ষেও মঙ্গলজনক। শৈশব হইতে বার্ধক্যে মৃত্যু পর্যন্ত নারীর পরমুখাপেক্ষী থাকা ভাল নয়। কোনো প্রকৃতিস্থ পিতা, স্বামী, ভ্রাতা বা পুত্র মনে করেন না যে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া কন্যা, পত্নী, ভগিনী বা মাতার ভরণপোষণ করিতেছেন ; ইহা সত্য। কিন্তু সকল পিতা, স্বামী, ভ্রাতা বা পুত্র প্রকৃতিস্থ বা আদর্শস্থানীয় নহে।...সুতরাং নারীর স্বাবলম্বিনী হইবার জন্য তাঁহার উপার্জনের ক্ষেত্র বিস্তৃততর হওয়া ভাল। পরিবারের

সহিত যুক্ত থাকিয়া উপার্জন করিতে পারা নারী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলকর।...যুদ্ধ করা যে নারীর কাজ নয়, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।"

তিনি বলিতেন,

"ভরণপোষণের জন্য যাঁহাদের উপার্জনের প্রয়োজন নাই, তাঁহারাও অর্থকর কোনো কাজ করিলে তাঁহাদের নিজেদের প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও সম্মান বাড়ে এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্যদেরও ধারণা উচ্চতর হয়।"

নারীর উপর অত্যাচার নিবারণের জন্য তিনি বাংলা ১৩৩৩-এ গবর্নমেন্টকে অনুরোধ করেন। তিনি এই সময় বলেন,

"আমরা 'প্রবাসী'র ন্যায় 'মডার্ন রিভিয়ু'এ লিখিয়াছিলাম যে, গবর্নমেন্ট অন্য অনেক বিষয়ে উপদ্রব নিবারণের জন্য খুব সচেষ্ট ও সতর্ক এবং সেই জন্য আইনও করিয়াছেন, কিন্তু নারীর উপর উপদ্রব নিবারণের জন্য বিশেষ কোনো চেষ্টা করেন নাই। এলাহাবাদের লিডার আমাদের সমর্থন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা কেন কোনো চেষ্টাই করেন নাই...?"

যাহারা পাশবিক বল দ্বারা নারীর সর্বনাশ করে, তাহাদিগকে পশু, পিশাচ প্রভৃতি বলিলে অন্যায় হয় না। কিন্তু যে-সব ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি অন্য উপায়ে নারীর সর্বনাশ করিয়া ও গণ্যমান্য হইয়া বেড়ায় তাহারাও উক্ত নরপশুদেরই দলভুক্ত। লোকমত উভয় দলের বিরুদ্ধে সমভাবে প্রযুক্ত হইলে সামাজিক শাসন ন্যায়সঙ্গত ও সম্যক ফলদায়ক হইবে।"

নারী-হরণ সম্বন্ধে রামানন্দ অনেক সময় এমন কথা বলিয়াছেন যাহাতে তিনি কোনো কোনো দলের বিশেষ কোপে পড়িতে পারিতেন।

নারীর প্রতি পিশাচ-প্রকৃতি মানুষের এই অমানুষিক অত্যাচার নিবারণ এবং অনেক স্থলে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের অত্যাচার নিবারণের জন্য রামানন্দ যত চিন্তা করিয়াছিলেন এবং হাতে-কলমে যত কাজ করিয়াছিলেন, দাসত্ব-প্রথা দূর করিবার জন্য বড়ো বড়ো মানবহিতৈষীদের আন্দোলনের তুলনায় এবং স্বাধীনতা-লাভ চেষ্টায় দেশপ্রেমিকদের আন্দোলনের তুলনায় তাহা কম বলিয়া মনে হয় না।

পণপ্রথাকে তিনি যৌবনকাল হইতে ঘৃণা করিতেন। বাংলা ১৩০৮ সালের কয়েক বৎসর পূর্বেই সঞ্জীবনীতে 'ভ্যালুপেয়েবলে বর প্রেরণ' সম্বন্ধে তিনি একটি নক্‌শা লেখেন। সেই নক্‌শাটি অবলম্বন করিয়া কবি দেবেন্দ্র সেন ১৩০৮এ 'প্রবাসী'তে একটি সচিত্র কবিতা লেখেন। তাহাতে ছিল :

"পাশে ছিল বসি তথা সাহিত্য-আনন্দ
প্রবাসীর সম্পাদক বন্ধু রামানন্দ
তাহাকে বলিনু আমি এতদিন পরে
তোমার ভবিষ্যবাণী অক্ষরে অক্ষরে
ফলিয়াছে! তুমি যারে 'সঞ্জীবনী' পত্রে
কল্পনায় হেরেছিলে এ প্রয়াগ ক্ষেত্রে
এই দেখ আসিয়াছে সত্যই সে বর
ভি, পি, পার্শেলেতে মরি অপূর্ব সুন্দর"

'প্রদীপে' যাঁহারা প্রেমের কবিতা ছাপাইবার জন্য পাঠাইতেন তাঁহাদের পরিহাস করিয়া রামানন্দ একবার একটি টিপ্পনী লেখেন, 'প্রবাসী'তেও ১৩২০র ফাল্গুন মাসে তিনি লিখিয়াছিলেন,

"শুনিয়াছি বঙ্গসাহিত্য প্রেমের কবিতার জন্য বিখ্যাত। তবে, বাঙ্গালী অনেক যুবক বিবাহ বিষয়ে এমন অপ্রেমিক, অর্থপিশাচ, কাপুরুষ কেন? ..যিনি কেবল প্রেমের পাত্রীকেই চান, টাকা, মান, সম্পদাদি আর কিছুর দিকে দৃক্‌পাত করেন না, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রেমিক। নতুবা কেহ যদি প্রেমের কবিতা লিখিয়া বঙ্গেব সমুদয় সম্পাদককে হয়রান করিয়া ফেলেন, এবং বিবাহের সময় দরিদ্র শ্বশুরের নিকট হইতেও বাপ-মাকে টাকা লইতে দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পুরুষাধম, কাপুরুষ, অপ্রেমিক বলা ভিন্ন উপায় কি?"

জগতে নারী ও পুরুষের সৃষ্টিতে বিধাতা কম-বেশি করেন না—এ কথা রামানন্দ কখনো ভুলিতেন না। তিনি বলিতেন,

"পুরুষ যেমন দেশের লোক, নারীও তেমনি দেশেব লোক ; এবং নারীরা সমুদয় অধিবাসীর অর্ধেক।...(আমাদের) দেশেব নারীদের মধ্যে শতকরা একজনকেও শিক্ষিতা বলা যায় কিনা সন্দেহ। গৃহস্থালীর বাহিরের খবর নারীদের কাছে পুস্তক ও খববেব কাগজেব সাহায্যে পৌঁছিতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর বলিয়া, এই উপায়ে দেশ সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান জন্মে না।"

তিনি আরও বলিতেন,

"যে জাতি স্বাধীন হইতে ও থাকিতে চায়, তাহাকে সামাজিক প্রথার পরিবর্তন করিয়া এবং শিক্ষাব দ্বারা নারীর কার্যক্ষেত্র ও কর্মদক্ষতা বাড়াইয়া, নাবীশক্তিরও সম্পূর্ণ সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে।"

এদেশে যখন নারীর ভোটের অধিকার বিষয়ে প্রথম কথা উঠে, তখন তিনি এই অধিকার বিষয়ক সমস্ত বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করেন। শুধু স্ত্রী-শিক্ষা কিংবা ভোটের অধিকার প্রভৃতি সর্বজন-আলোচ্য বিষয় লইয়াই তিনি আলোচনা করিতেন না। তিনি স্ত্রী-কয়েদী, বঙ্গে হিন্দুনারীর অবস্থা, বঙ্গীয় সরকারি শিক্ষাবিভাগে নারীদের বেতন, অন্তঃসত্ত্বা মজুরানিদের ছুটি, নারীকে আঘাত ইত্যাদি সাধারণের অজানা বিষয়েও 'মডার্ন রিভিয়ু' এবং 'প্রবাসী'তে নিয়মিত লিখিতেন। একই সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গে নারীদের বিষয় চার-পাঁচটি বড়ো নিবন্ধ থাকিত। তিনি যখন তাঁহার কাগজ দুটিতে নারীদের বিশেষ বিভাগ World News about Women এবং 'মহিলা মজলিসে'র প্রবর্তন করেন তখন আধুনিক অন্য কোনো কাগজে এই জাতীয় বিভাগ ছিল না। পরে তাঁহার দেখাদেখি কেহ কেহ আরম্ভ করেন।

তিনি মেয়েদের সকল সৎকাজ ও সর্বপ্রকার জ্ঞান-অর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তিনি নাবীদের কারা-বরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন,

"আমরা দুইটি কারণে আমাদের দেশের মেয়েদের এমন ভাল কাজও কবিবার পক্ষে নহি, যাহাতে ধৃত ও কারারুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে।...নারী বন্দিনী হইলে এমন অপমান ভারতীয় ও ইউরোপীয় উভয়বিধ রাজভৃত্য দ্বারাই কখন কখন হইতে পারে, যাহা অসহ্য এবং যাহাতে অহিংসা ব্রত রক্ষা করা অসম্ভব হইতে পারে। দ্বিতীয়, আমরা যদিও আবশ্যক হইলে নারীর যে কোনো বৈধ কাজ করায় আপত্তি করি না, তথাপি কোনো প্রকার সংগ্রাম মাতৃজাতির উপযোগী ও প্রধান কাজ মনে করি না।...পিতা, স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা জেলের বাহিরে থাকিতে কোনো নারী রণে নামিলে পুরুষ আত্মীয়দের কাপুরুষতা প্রমাণ হইবে, ইহা মনে রাখিতে হইবে।"

কন্যা-সন্তানদের তিনি এত স্নেহ করিতেন যে বলিতেন, 'কন্যাদায় কথাটা বাংলা ভাষার অভিধানে অপ্রচলিত শব্দের পর্যায়ভুক্ত হউক।'

সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কেহ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে রামানন্দ কখনো তাহার অনুমোদন করিতেন না। এমন কী চৈতন্যদেব সম্বন্ধেও তিনি বলিয়াছিলেন, "আমাদের দেশে 'কাব্যের

উপেক্ষিতা' যত নারী আছেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার কাহিনী তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা কম করুণ ও মর্মস্পর্শী নহে। তাঁহাকে শ্রীচৈতন্য বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু সহধর্মিণী করেন নাই। এই বিষয় সম্পর্কে শ্রীচৈতন্যের প্রতি মনের বিদ্রোহিতা মাথা নত করে না।"

তিনি আরও লেখেন, "এমন কি হইতে পারে না ও কখনো হইবে না, যে, বিশ্বমানবের সেবার জন্য পুরুষ সেই নারীকে ছাড়িয়া যাইবেন না, বিবাহকালে যাঁহার চিরসঙ্গী থাকিতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং যাঁহাকে বাদ দিয়া তিনি ধর্মাচরণ না করিয়া তাঁহাকে সহধর্মিণী করিয়া বিশ্বপ্রেম-প্রসূত বিশ্বসেবা-রূপ ধর্মাচরণ করিবেন? স্ত্রীকে ত্যাগ না করিলে কি অনাবিল বিশ্বপ্রেম হইতে পাবে না? দাম্পত্য সম্বন্ধের সহিত আবিলতা কি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত?"

১৯৩৪ সালের রিপোর্টে এদেশে পুরুষ শিশু অপেক্ষা নারী শিশুর জন্ম কম দেখিয়া রামানন্দ বলেন, "ইহার প্রাকৃতিক কারণ জানি না। কিন্তু ইহা কি হইতে পারে না যে, বঙ্গে সাধারণত নারীর আদর অপেক্ষা অনাদর ও নিগ্রহ বেশি হয় বলিয়া বিধাতা বা প্রকৃতি এদেশে নারী কম পাঠাইতেছেন?"

পুরুষের দ্বারা বঞ্চিত অপমানিত নারীর প্রতি তাঁহার বিশেষ মমতা ছিল। তিনি বলিতেন, পুরুষ জাতির অপরাধেই তাহাদের এ দুর্দশা, সুতরাং অন্য পুরুষদেরও তাহার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ এই সকল অসহায় স্ত্রীলোককে সাহায্য করা উচিত। তিনি স্বয়ং এইরূপ কয়েকটি মেয়েকে সাহায্য করিতেন। নারীজাতির কল্যাণ কামনা যে তাঁহার মনে চির জাগরূক ছিল তাহা তাঁহার ছোটো ছোটো অনেক কাজ হইতেও বুঝা যাইত।

মেয়েদের গুণের অপেক্ষা রূপের আদরের প্রমাণ-স্বরূপ আমাদের দেশের মেয়েদের মলিনা, কৃষ্ণা, শ্যামা প্রভৃতি নাম ব্যবহৃত হয় তিনি মনে করিতেন। এইজন্য এ জাতীয় নাম তিনি পছন্দ করিতেন না। নিজেদের গুণের পরিচয় দিয়া নারীরা একদিন দেশকে গৌরবমণ্ডিত করিবেন এই আশা তাঁহার ছিল। তিনি রাজশাহির মহাদেবপুর বালিকা বিদ্যালয় নামক ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের মন্তব্য-পুস্তকে লিখিয়াছিলেন, "...বাঙালি পুরুষদের মানসিক শক্তিতেই প্রধানত বাঙালি জাতি যশস্বী হইয়াছে। কিন্তু অর্ধেক যশ এখনও আমাদের পাওনা আছে। নারীরা শিক্ষিতা হইলে তাহা আমরা পাইব।"

বিধবা নারীর দুঃখ ও দুর্গতি তাঁহার মনকে যৌবনকাল হইতেই স্পর্শ করিয়াছিল। বিদ্যাসাগরের সহিত তাঁহার অন্য কতকগুলি দিকের মতো এদিকেও সাদৃশ্য ছিল। এইজন্য বিদ্যাসাগর স্মৃতি-দিবসে প্রতি বৎসর তিনি বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ও মহানুভবতার পরিচায়ক এই বিধবা-বিবাহ প্রচলন আইনকে সার্থক করিতে দেশকে অনুরোধ করিতেন। একমাত্র তিনিই Statistics-এর সাহায্যে প্রতি বৎসর নানা সময়ে আমাদের দেশের শিশু ও বালিকা বিধবাদের সংখ্যা জানাইয়া ও তাহাদের বৈধব্যের ফলে নারীজাতি ও সমগ্র দেশের এবং হিন্দু জাতির ক্ষতি বিশেষ করিয়া জানাইয়া দেশকে এ বিষয়ে সচেতন করিতে চেষ্টা করিতেন। দেশের অনেক মাসিক ও দৈনিক পত্রই বিদ্যাসাগর মৃত্যুবার্ষিকী সম্বন্ধে উদাসীন, কিন্তু রামানন্দ কোনো বৎসর এই দিনটি ভুলিতেন না।

লিগ অব নেশনস

'লিগ অব নেশনস' কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া জেনিভায় যাইবার পূর্বে রামানন্দ বলেন,

"প্রধানত আমরা জানিতে চেষ্টা করিব, যে, লিগের দ্বারা ভারতবর্ষের বাষ্ট্রীয় অবস্থাব, শিল্প-বাণিজ্যের, শ্রমিকদের এবং স্বাস্থ্যের কিরূপ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা আছে। নারীঘটিত আন্তর্জাতিক পাপ ব্যবসা দমন লিগের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের কী উপকার হইতে পারে, তাহা জানিতে হইবে। সকল জাতির মধ্যে জ্ঞানাহরণ ও জ্ঞান-বিস্তার বিষয়ে সহযোগিতার ব্যবস্থা লিগ ক্রমশঃ ভাল করিয়া করিবার চেষ্টা কবিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই চেষ্টায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ভারতের প্রতিনিধি। ইহা কাজে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে দেখিতে হইবে। আফিং, তাহা হইতে প্রস্তুত নানা মাদকদ্রব্য এবং কোকেন ও তদ্রূপ অন্যান্য নেশার জিনিসের ব্যবসা যাহাতে পৃথিবীতে বন্ধ হয়, এবং ঐ জিনিসগুলি কেবল চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়, লিগ সেই চেষ্টা করিতেছেন। তাহা কতদূর হইয়াছে জানিতে হইবে। লিগের ব্যয় নির্বাহার্থ অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষকে অনেক টাকা দিতে হয়। ভারতীয় রাজনীতিজ্ঞদের মতে ভারতবর্ষকে খুব বেশি টাকা দিতে হয়। তদনুরূপ ফল ভারতবর্ষ কি পান, এবং লিগের আফিসে ও অন্য কাজে ভাবতীয় লোকেরা কি পরিমাণে নিযুক্ত হন, কি পরিমাণে আন্তর্জাতিক বিষয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পান, তাহাও অনুসন্ধানেব বিষয়।"

এই বৎসর (১৩৩৩) ৯ শ্রাবণ প্রবাসী কার্যালয়ে রামানন্দের বিদায়ের পূর্বে একটি সভাতে রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলেন, যে, প্রকাশ্য সভায় শ্রীযুক্ত রামানন্দবাবুকে একবার সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির পদগ্রহণ করিতে রাজি করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার বলেন, রামানন্দবাবু জোয়ান বা যুবক ভারতের প্রতিনিধি। কেন না, তিনি নব ভাবকে গ্রহণ করিতে কখনো পরাঙ্মুখ হন নাই। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু বলেন, রামানন্দবাবু কোনো প্রকার সভা-সমিতিতে যোগ দেন না, অথচ দেশের সকল প্রতিষ্ঠান, সর্বপ্রকার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ধীর সমালোচক দৃষ্টিতে অপক্ষপাত ও নির্ভীক সুবিচারপূর্ণভাবে আলোচনা করেন।...'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু'তে তাঁহার যে মন্তব্য প্রকাশিত হয় তাহাতে বাংলা দেশের জনমত গঠিত হয় এবং দেশবাসী প্রভূত ভাবে উপকৃত হয়। স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ মহাশয় বলিতেন, "রামানন্দ বয়সে আমার কনিষ্ঠ হইলেও জ্ঞানে আমার জ্যেষ্ঠ।" দেশে নানা প্রকার দল আছে, রামানন্দবাবু কোনো দলেরই নন, অথচ প্রত্যেক দলের ভালোটুকুর প্রশংসা করেন ও মন্দের নিন্দা করেন বলিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জন করিয়াছেন।

রামানন্দবাবু প্রত্যুত্তরে বলেন, হিন্দু-মুসলমান বিরোধে দেশের এই একান্ত দুর্দশার দিনে দেশকে ছাড়িয়া বহু দূরে যাইতে তিনি অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিতেছেন। কিন্তু লিগকে কথা দিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে যাইতেই হইবে। দেশের উন্নতির আশার কথা তিনি কিছু বলেন।

ইউরোপ হইতে তাঁহার প্রথম পত্রে আছে :

"কলিকাতার বাড়ি ছাড়িয়া আসিয়া অবধি ভারতের পরাধীনতার চিন্তা আমার মনকে পীড়া দিতেছে। যে মোটরকারে হাওড়া স্টেশনে আসিলাম তাহা বিদেশে প্রস্তুত। যে স্টিমার আমাকে ইউরোপ লইয়া যাইবে তাহা ভারতে নির্মিত নয়, এমন কী তাহা ভারতীয় কোনো "স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি"র জাহাজও নয়।...সম্প্রতি এমন কোনো ভারতীয় জাহাজ

নাই যাহাতে সমুদ্র পার হওয়া যায়।...

"শিক্ষাক্ষেত্রেও ভারত পরাধীন। আমি যে জাহাজে যাইতেছিলাম সে জাহাজে কয়েকটি ভারতীয় ছাত্র বিদেশে শিক্ষার জন্য যাইতেছিলেন।...যাহাকে খুব উচ্চ শিক্ষা বলা চলে না, এমন এক জাতীয় শিক্ষা লাভের জন্যও ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশে যাইতে হয়।"

ভারতীয়দের যে ইউরোপে সাধারণ লোকে কিরূপ সম্মান করে তাহার একটা নমুনা স্বরূপ জাহাজের কাপ্তেনের অভদ্র ব্যবহারের কথা তিনি লেখেন। রামানন্দের বন্ধু কলিকাতার ইতালিয়ান কনসাল-জেনারেল মহাশয় স্বেচ্ছায় জাহাজের কাপ্তেনকে তাঁহার একটি পরিচয়-পত্র দিয়াছিলেন। কাপ্তেনকে তিনি জাহাজে উঠিয়াই পত্রটি 'সুপ্রভাত' জ্ঞাপন করিয়া দেন। কিন্তু কাপ্তেন মহাশয় উত্তরে কিছু বলিলেন না, হাসিলেনও না, বসিতেও বলিলেন না। সুতরাং জাহাজে রামানন্দ যে কয়দিন ছিলেন কাপ্তেনকে চিনিবার কোনোই লক্ষণ আর দেখান নাই। সচরাচর এইরূপই ছিল তাঁহার বিরক্তি প্রকাশের প্রণালী। তিনি জাহাজে অনেক সময় Theory of Relativity (আপেক্ষিকতা-তত্ত্ব) বিষয়ে একটি বই ও বার্নার্ড শ' লিখিত সেন্ট জোয়ান পড়িয়া কয়েক ঘণ্টা কাটাইতেন। তিনি জাহাজ হইতে লিখিয়াছিলেন, "সমুদ্র আমাদের দেশ ও কালের আপেক্ষিকতা বুঝিবার সুযোগ আনিয়া দেয়। আমাদের প্রতিদিনই ঘড়ি ঠিক করিতে হইত।" জাহাজে প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ভিতর জাতি-ভেদ রক্ষা তাঁহার ভাল লাগে নাই। এই জাহাজে ভারতীয় যাত্রীরা ইউরোপীয় যাত্রীদের হইতে ভিন্ন টেবিলে বসিতেন। ইহাতে নিরামিষাশী রামানন্দ স্বয়ং সুবিধা বোধ করেন, কিন্তু ব্যবস্থাটি বর্ণবিদ্বেষসূচক বলিয়াই তিনি মনে করেন। তিনি প্রথম শ্রেণীতে শারীরিক দুর্বলতা ও বয়সের জন্য গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা ছিল অন্যদের সহিত তাঁহাদের জীবনযাত্রায় কিছু যোগ থাকে।

রামানন্দ জেনিভায় কাজ করিতে করিতে ইউরোপের ভাবুক-শিরোমণি রম্যাঁ রল্যাঁর নিমন্ত্রণ পান। রল্যাঁর ৯০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ পিতা, বিদুষী ভগিনী মাদলেন রল্যাঁ এবং স্বয়ং রম্যাঁ রল্যাঁ রামানন্দকে তাঁহাদের উদ্যান-বাটিকায় অভ্যর্থনা করেন। নানা আন্তর্জাতিক সমস্যা ও অন্য গভীর প্রসঙ্গ লইয়া রামানন্দের সহিত রল্যাঁ মহোদয়ের আলাপ হয়। পরস্পবের মধ্যে সহানুভূতির যোগ সহজেই স্থাপিত হয় এবং মধ্যে মধ্যে জেনিভা হইতে আসিয়া দেখা সাক্ষাৎ করিতে রল্যাঁ তাঁহাকে অনুরোধ করেন। ডাক্তার রজনীকান্ত দাস ও তাঁহার স্ত্রী সযত্নে ইঁহাকে শ্রীযুক্ত রল্যাঁর নিকট লইয়া যান। জেনিভায় এই দুইটি বন্ধু স্টেশন তাঁহার মাল আদায় ও উদ্ধার হইতে আরম্ভ করিয়া পরে কঠিন রোগে সেবা পর্যন্ত সমস্তই করিয়াছিলেন। ইহা বিধাতার কৃপা বলিতে হইবে। সাংসারিক অনেক ঝঞ্ঝাটের ক্ষেত্রে রামানন্দ নিতান্ত অসহায় ছিলেন। দেশে সর্বদাই তাঁহার কোনো না কোনো সহায় পথে জুটিয়া যাইত, বিদেশেও হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। রল্যাঁ ভারতে তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "রামানন্দকে দেখিলে টলস্টয়ের কথা মনে হয়।"

তিনি বলেন,

"ইউরোপীয় সকল দেশিই...যত যাত্রী আসে সকলকার মাল পরীক্ষা করানো হয়। আমার মতো ভ্রমণকারীদের পক্ষে ইহা বড়ই বিরক্তিকর। তা ছাড়া এই সব শুল্ক আর্থিক যুদ্ধের একটি অস্ত্র বিশেষ, ইহা কখনো শান্তি বৃদ্ধি করিতে পাবে না। যাত্রীদের সঙ্গে মাল এত বেশি থাকে যে প্রত্যেকটি খুলিয়া আগাগোড়া পরীক্ষা করা শক্ত। তাছাডা ঘুষ ইত্যাদিও আছে। আমি পরে শুনিয়াছিলাম যে 'পিল্‌স্‌না'র এক যাত্রী ইন্‌স্পেক্টারকে ঘুষ দিয়া

ভেনিসে মাশুলের হাত এড়াইয়া ছিলেন।...প্যারিসে একজন মাশুলওয়ালা আমার 'পেটেন্ট লেদার বুট' জোড়া সযত্নে পরীক্ষা করিতে বসিয়া গেল, বুট জোড়া আমার নিজের কি বিক্রী করার জন্য আনীত তাই আবিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে!"

ইতালিতে যাওয়া-আসার পথে ইতালির পুরুষ ও নারীর যে-সব নমুনা তিনি দেখেন তাহাতে রামানন্দের ধারণা হয় যে তাঁহারা ভারতীয় পুরুষ ও নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মোটেই নন। তিনি বলেন, "আমাদের যাহা কিছু দোষ-ত্রুটি আছে, সেই জন্যই যে আমাদের পরাধীন থাকা উচিত, অনেক বিদেশি এইরূপ মনে করেন ও বলেন। সেই কারণে আমি স্বাধীন জাতিদের সম্বন্ধে তুচ্ছ কথারও উল্লেখ করিতেছি।" পথে শুইবার জায়গা পাইতে তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। মিলানের নিকটে ট্রেনের কন্ডাক্টর দুইবার টাকা ঠকাইয়া লইয়াছিল, ফ্রান্সে চুঙি আপিসে মাশুল আদায়ীরা তাঁহার মতো বয়স্ক ও প্রথম শ্রেণীর সম্মাননীয় যাত্রীকেও অকারণ হয়রান করিয়াছিল। নোংরামি ও অসাধুতার পরিচয়ও ইতালিতে তিনি কিছু কিছু পান। তবুও তিনি বলেন, "আমরা স্বাধীন হই বা না হই, নোংরামি ও অসাধুতা নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য।" বিদেশিরা আমাদের দেশি অনেক ব্যবস্থায় যেমন কষ্ট পায় তেমনি ফ্রান্স ইতালিতে ট্রেনে পানীয় জল ইত্যাদির অভাবে তাঁহার মতো অনেক ভারতীয়কে কষ্ট পাইতে হয়।

তিনি ১৯ আগস্ট প্রাতঃকালে প্যারিস পৌঁছন। ট্রেনে নানা অসুবিধা, কন্ডাক্টরের দুর্ব্যবহারে মন খারাপ, ভোজনের গাড়িতে গিয়াও প্রায় অভুক্ত থাকায় এবং নিদ্রাও না হওয়াতে তিনি প্রথমেই অসুস্থ হইয়া পড়েন।

প্যারিসে থাকিতে তিনি মহিলা শিল্পী আঁদ্রে কার্পেলের বাড়ি যান। আঁদ্রে এক সময় শান্তিনিকেতনে ছিলেন। আঁদ্রের স্বামী বলেন, "*Modern Review* আমাদের দৈনিক অন্নজল। আঁদ্রে তো আর কোনো কাগজই প্রায় পড়েন না ; উহার বিজ্ঞাপন পর্যন্ত পড়েন। প্রবাসী পড়িতে পারেন না বলিয়া তাঁর বড়ো দুঃখ।"

জেনিভায় পৃথিবীর সকল প্রান্ত হইতে লোকে লিগ অব নেশনসে আসিত। অথচ সেখানকার নিকটস্থ ফরাসি রাজ্যের বেলগার্ডের চুঙি আপিসে লোকেরা কেবল ফরাসি ভাষাই বলে। রামানন্দ ফরাসি বুঝিতেন না বলিয়া তিনি সকল কথা বুঝিতে পারেন নাই। ফলে জেনিভায় পৌঁছিয়া দেখিলেন তাঁহার বেশির ভাগ জিনিস বেলগার্ডেই পড়িয়া আছে। সারা পৃথিবীর যাত্রী যেখান দিয়া পার হয় সেই স্থানের এই ব্যবস্থা তাঁহার অত্যন্ত বিরক্তিকর ও হাস্যকর লাগিয়াছিল। তিনি বলেন,

"যদি কোনো দুর্বোধ্য কারণে মাঝ পথের কোনো স্টেশনেই যাত্রীদের সমস্ত জিনিসপত্র ট্রেন হইতে নামাইয়া চুঙি আপিসে লইয়া যাওয়া নিতান্ত দরকার হয়, তাহা হইলে সেই কথা বুঝাইয়া ইংরেজি ফরাসি ও জার্মান অন্তত এই তিনটি প্রধান ইউরোপিয় ভাষায় ছাপা একটি 'নোটিশ' আগের স্টেশনে পৌঁছিবার পূর্বেই যাত্রীদের দেখানো উচিত।"

বিদেশে ভারতের চিন্তাই রামানন্দকে ঘিরিয়া থাকিত। তিনি যাহা দেখিতেন তাহাই দেশের সহিত মিলাইয়া দেখিতেন, তাই তিনি বলেন,

"ভারতবর্ষের সর্বত্র যেমন শীর্ণ, কৃশ, পাতলা শরীর এবং দুঃখপীড়িত, বিমর্ষ মুখ অনেক দেখা যায়, ইউরোপের কোথাও তেমন দেখি নাই। ইউরোপের ও ভারতবর্ষের এই পার্থক্যের কোনো কোনো কারণ আমরা সবাই জানি। কিন্তু এইরূপ অবস্থার সমুদয় দোষ বিদেশিদের স্কন্ধে না চাপাইয়া, আমরা নিজেদের দোষ যতটুকু, তাহা যেন স্বীকার

করি এবং এই অবস্থা যাহাতে শীঘ্র অতীত ইতিহাসে পরিণত হয় তাহার জন্য অবিরাম চেষ্টা করি।"

ভারতবাসীকে ইংরেজরা যে চক্ষে দেখে তাহা ভাবিয়া তাঁহার মন যে পীড়িত হইত তাহা তাঁহার কথাতেই বুঝা যায়,

"আমি ইউরোপ ভ্রমণকালে লক্ষ করিয়াছি, বিনা প্রয়োজনে কেবল কৌতূহলপরবশ হইয়া বা সৌজন্যের খাতিরে কোনো ইংরেজ আমার সঙ্গে আগে কথা বলেন নাই ; কেহ পরিচয় করাইয়া দিলে অবশ্য বলিয়াছেন।"

কিন্তু ভারতীয়দের আত্মিক জগতে শ্রেষ্ঠতার পরিচয় তাহাদের শিল্পে যে পরিস্ফুট আছে ইহা দেখিয়া তাঁহার আনন্দ হইত, তাহাও তাঁহার কথাতেই বুঝিতে পারি।

"ভারতবর্ষে ও ভারতীয় উপনিবেশসমূহে অসংখ্য বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু মূর্তিতে আত্মজয় ও ধ্যানের আনন্দের যে প্রকাশ লক্ষিত হয়, ইউবোপীয় মুর্তিশিল্পে তাহা বিরল। ইউরোপের অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তির মূর্তিতে এবং কল্পিত মূর্তি বা মূর্তিসমষ্টিতে শক্তির প্রকাশ এবং শক্তির দ্বারা অপরের উপর জয়লাভ ব্যঞ্জিত করা শিল্পীর অন্যতম প্রধান লক্ষ বলিয়া মনে হয়।"

ইউরোপে ভ্রমণকালে তাঁহার মনে যে-সমস্ত চিন্তার উদয় হইত তাহার কিছু পরিচয় দিলে তাঁহাকে বুঝিতে পারা সহজ হইবে।

"প্যাবিসের জাতীয় পুস্তকালয়ে পূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে অনেক বিদ্যার্থী ও গবেষককে অধ্যযনে নিযুক্ত দেখিলাম।...আমার বোধ হয় না যে, ভারতবর্ষেব কোনো গ্রন্থাগারে এতগুলি একাগ্র বিদ্যার্থীকে কোনো এক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায।"

"ব্রিটিশ মিউজিয়মে একটি (মিশরের) সমাধির অভ্যন্তর পর্যন্ত প্রদর্শন জন্য কাচের বড়ো আধাবে রাখা হইয়াছে। দেখিয়া মন বিষাদে নিমগ্ন হয়। মানুষটির এখন কেবল কঙ্কালের উপর চামড়া আছে, তাও সর্বত্র নাই। কিন্তু পরলোকে তাহার ব্যবহারের জন্য তাহার আত্মীয়েরা যে-সব পাত্রে তাহাকে খাদ্য ও পানীয় দিয়াছিল, সেগুলি এখনও রহিয়াছে। এই আত্মীয়েরা এখন কোথায়, তাহাদের যে প্রিয়জনের পরলোকে আবাসেব জন্য তাহাদের এত ব্যাকুলতা, সে-ই বা কোথায়? এখন তাহার মৃতদেহ কৌতূহলী দর্শকের দেখিবাব জিনিস হইয়াছে।"

"অমরাবতী স্তূপের অনেক ভাস্কর্যের নিদর্শন...এক ভারতসচিব দান কবিয়াছেন বলিয়া লেখা আছে। ইহাকেই বলে পরের ধনে পোদ্দারি। কিন্তু জোর যার মুল্লুক তার, সত্য নয় কি?"

"পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকদের পোশাক অধিকাংশ স্থলে বিশ্রী। (তাঁহাদের) শ্রদ্ধা করি বলিয়াই তাঁহাদের পরিচ্ছদ, ভব্য, সুরুচিসম্পন্ন ও সুন্দর দেখিতে চাই।...আমার মনে হয়, ইউরোপীয় মহিলাদের হাল ফ্যাশনের পোশাক পরিবার কারণ অধিকাংশের লজ্জাহীনতা নহে, ফ্যাশনের দাসত্ব, গড্ডালিকাবৎ চলিত রীতির অনুসরণ ইহাব কারণ।"

"...ইংরেজিতে কৃস্টেনডম্ (Christendom) বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহার মানে, যে-সব দেশে যীশুখ্রিস্টের প্রভুত্ব স্বীকৃত, তাহার সমষ্টি। ইউরোপ বাস্তবিক কৃস্নডম্ বটে কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু তাহা টিপ্-ডম্ বা বকশিশ-তন্ত্র মহাদেশ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।"

"ব্রিটিশ মিউজিয়ম যে অংশত দস্যুতা ও প্রতারণার ফল, তাহাও তাহারা (ইংরেজরা) অনুভব করে কি না, জানি না। যাহা হউক, সংগ্রহ যে-ভাবেই করা হইয়া থাকুক, ইহাব দ্বারা তাহাদের শুধু জ্ঞানবৃদ্ধি না হইয়া হৃদযের উন্নতিও হইলে জগতের মঙ্গল।"

রামানন্দ লন্ডনে থাকিতে একদিন এপস্টাইনের বাড়ি গিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলেন যে

তিনি রবীন্দ্রনাথের একটি আবক্ষ মূর্তি গড়িয়াছেন। ইহাই তাঁহার কর্মকক্ষ দেখিতে যাইবার উদ্দেশ্য।

রামানন্দ লাট-বেলাটদের সর্বদা এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন, লন্ডনেও তাঁহার সেই নিয়ম তিনি যথাসম্ভব রক্ষা করিতেন। একদিনের কথা লেখেন :—

"লন্ডনে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক হোটেল সিসিলে লর্ড লিটনকে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।...আমার নামেও মল্লিক মহাশয়ের একটি চিঠি আসিয়াছিল। সেদিন আমি ভাগ্যক্রমে সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরি। সুতরাং কেন যে চা খাইতে গেলাম না সে অপ্রিয় কথা ব্যাখ্যা করিতে হয় নাই। তবে মল্লিক মহাশয়ের সৌজন্যে অবশ্যই প্রীত হইয়াছিলাম। তিনি তাঁহার বাড়িতে যে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন তাহাতে ক্ষণকালের জন্য মানসচক্ষে মাতৃভূমির দর্শন পাইয়া সুখী হইয়াছিলাম।"

তিনি দেখিয়া দুঃখিত হন যে, (লন্ডনে) হাই কমিশনারের অফিসে যে কয়েক শত লোক কাজ করে তাহাদের বেতন ও খরচ ভারতবর্ষ দেয়। 'কিন্তু (অতুল) চাটুয্যে মহাশয় ছাড়া অন্য বড়ো চাকর্যে কেহ ভারতীয় নহে ; সামান্য কয়েকজন কেরাণী ভারতীয়।'

মানুষের ছোটোখাট সৌজন্যও রামানন্দ লক্ষ করিতেন ও মনে রাখিতেন, তাই চিঠিতে লেখেন,

"ইংলন্ডে রেলে যাতায়াতে আমি কোথাও কোনো অভদ্র ব্যবহার পাই নাই ; বরং ছোটোখাট বিষয়ে অযাচিত সাহায্য ও সৌজন্য পাইয়াছি। একটা ট্রেনে আমার হাত হইতে একখানা কাগজ গাড়িতে পড়িয়া যাওয়ায় একটি যুবক তৎক্ষণাৎ তাহা কুড়াইয়া আমাকে দিল। ভারতবর্ষে কোনো ভারতীয়ের প্রতি এরূপ সামান্য সৌজন্য দেখান ইংরেজ বা ফিরিঙ্গিদের রীতি নহে বলিয়া এই সামান্য ঘটনার উল্লেখ করিলাম।...কালে হইতে প্যারিস যাইবার ট্রেনেও এইরূপ শিষ্টাচার দেখিলাম। ট্রেনের যে কামরায় আমরা ছিলাম তাহাতে একটি বর্ষীয়সী ইউরোপীয় মহিলা ও একটি ইউরোপীয় যুবকও ছিলেন। গাড়িতে যতবার আমার গায়ে ও মুখে রোদ পড়িতেছিল. ততবার মহিলাটি যুবকটিকে পর্দা টানিয়া আড়াল করিয়া দিতে বলিতেছিলেন।"

জেনিভার লিগের কিছু কিছু কথা তাঁহার লেখা হইতেই তুলিয়া দিতেছি :—

"লিগের য়্যাসেমব্লির সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনের প্রথম বৈঠক হয় ৬ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে।—সম্পূর্ণ প্রাচ্য বা কতকটা প্রাচ্য পরিচ্ছদ কেবল জন কতক মানুষের দেখিলাম।...হলে প্রাচ্য চেহারা বেশি না থাকায় কোনো কোনো রিপোর্টার একটা কৌতূকজনক ভ্রম করিয়াছিল। যেমন জেনিভায় ল্য ত্রিবিউনের ৭ই সেপ্টেম্বরের কাগজে দেখিলাম :—সম্মানার্হদের উপবেশনের মধ্যে একজন দীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট ভক্তিভাজন ব্যক্তিকে দেখা গেল যিনি কবি দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভিন্ন কেহ নহেন।

"রবীন্দ্রনাথ তখন জেনিভায় ছিলেন না, সুইজার্লান্ডের কোথাও ছিলেন না।...এইরূপ এক মহারাজাও দীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু মানুষটিকে নমস্কার করিয়াছিলেন। যদিও সে ব্যক্তি সেলামটি আত্মসাৎ করে নাই। জার্মেনিতেও এইরূপ ভুল কোনো কোনো জার্মান পুরুষ ও স্ত্রীলোকেব এবং একজন জাপানির হইয়াছিল। সেই কারণে জার্মেনিতে একদিন রবীন্দ্রনাথ পরিহাস করিয়া বলিলেন, 'মশায় রামানন্দবাবু, লেকচ্যার দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আপনি আমার কয়েকটা লিখিত বক্তৃতা নিয়ে কোনো কোনো সহরে পড়ে দিন। তার পর প—মুখে মুখে তার জার্মান অনুবাদ করে দেবেন। বেশ চলে যাবে ; আমিও বেঁচে যাব'।"

"লিগের তথ্য-জ্ঞাপন বিভাগের কর্তা কামিংস সাহেব আমাকে টিকিট দেওয়ায় আমি

য়্যাসেমব্লির সব বৈঠকে যাইতে পারিতাম। কয়েকটাতে গিয়াছিলামও। কামিংস সাহেব প্রথম দিন নিজে হইতেই আমাকে একটা বিশেষ টিকিট দিবেন বলিয়াছিলেন, যাহা দেখাইলে লিগ কাউন্সিল, কমিটি প্রভৃতির বৈঠকেও যাওয়া যায়। কয়েক দিন পরেও সেটা না পাওয়ায় আমার কোনো বন্ধু তিন দিন তাহা আনিতে যান। কিন্তু কোনো-না-কোনো কারণে একদিনও মিস্টার কামিংসের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নাই।...জেনিভা হ্রদের ধারে...একদিন ভারতীয় প্রতিনিধিদের সাধারণ সেক্রেটারি মিঃ প্যাট্রিকের সহিত দেখা হয়।...মিঃ প্যাট্রিক বলিলেন, 'কাল দ্বিতীয় কমিটিতে খান বাহাদুর বক্তৃতা করিবেন; আপনি শুনিতে যাইবেন না?' আমি বলিলাম, 'আমি কি যাইতে পারি?' তিনি বলিলেন, 'অবশ্যই পারেন।'...পরদিন লিগ সেক্রেটেরিয়েট ভবনে উপস্থিত হইলাম। প্রথমে দ্বিতীয় কমিটির কামরা ঠিক করিতে না পারিয়া অন্য কামরায় গিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে যে কার্ড ছিল দেখাইলাম—ঢুকিতে দিল না; বোধ হয় সেটা য়্যাসেমব্লির কার্ড বলিযা। তার পর ঠিক কামরার দরজায় গেলাম। সেখানেও ঢুকিতে দিল না। প্যাট্রিক সাহেব বলিয়াছিলেন আমি ঢুকিতে পাইব, এই জন্যই গিয়াছিলাম। বুঝিলাম, তিনি ঠিক অবস্থাটা জানিতেন না। যাহা হউক, এখন অগত্যা কামিংস সাহেবের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহাকে আমার নামের কার্ড পাঠাইলাম। (তিনি আসিলে) বলিলাম, 'খান বাহাদুরের বক্তৃতা আমি শুনিতে পাইব, প্যাট্রিক সাহেব আমাকে এইরূপ বলায় আমি আসিয়াছি, কিন্তু আমি ঢুকিতে পাইলাম না। আপনি আমাকে যে বিশেষ কার্ড দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা না থাকাতেই বোধ হয় এইরূপ ঘটিয়াছে।' তখন কামিংস বলিলেন, 'আমি বড়ো ব্যস্ত ছিলাম।' আমি যথাসম্ভব ঠাণ্ডাভাবে বলিলাম, 'আমার নিজের দেশে আমাকেও লোকে কতকটা অবসরশূন্য ব্যস্ত মানুষ মনে করে। নিমন্ত্রণ পত্রে আমাকে সব সুবিধা দিবার যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তাহা যদি দেওয়া নাই-ই হইবে, তাহা হইলে, এত সময় ও এত অর্থ অপব্যয় করিয়া এত হাজার মাইল পথ বাহিয়া আসার পরিবর্তে বাড়িতে বসিয়া লিগের পুস্তক রিপোর্টাদি কয়েকটা টাকা খরচ করিয়া কিনিলেই তো হইত।' তখন ইংরেজ ভদ্রলোকটি কিছু থতমত খাইয়া আমাকে দ্বিতীয় কমিটির গৃহে লইয়া গিয়া বসাইয়া দিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে এমন বয়সের কতকগুলি মানুষ দেখিলাম, যাহারা স্কুলের না হউক, কলেজের ছাত্র হইবারই সম্ভাবনা। সুতরাং কমিটির মিটিঙে প্রবেশাধিকার দেবদুর্লভ বলিয়া মনে হইল না।...খান বাহাদুরের বক্তৃতাও শুনিলাম। তাহা অন্য বক্তৃতাগুলি অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে হইল না। তিনি পাঞ্জাবি মুসলমান, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় ভারতীয় প্রাচীনতম সভ্যতা সগৌরবে উল্লিখিত হইয়াছিল।.

"সেইদিন হোটেলে সন্ধ্যার আগে কামিংস সাহেবের প্রেরিত বিশেষ টিকিটটি পাইলাম।

"৬ই সেপ্টেম্বর লিগ য়্যাসেম্ব্লির অধিবেশনের প্রথম দিনে সভাস্থলে যাইবার আগে আমি ঐ ইংরেজটির সহিত দেখা করিয়া ভারতবর্ষ ও লিগ সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য জানিতে চাহিয়াছিলাম। আমার জিজ্ঞাসা তিনি টুকিয়াও লইয়াছিলেন। কিন্তু সে বিষয়ে তিনি পরে আমাকে কিছু লেখেন নাই। আমার জ্ঞাতব্য তথ্য পুস্তিকা ও রিপোর্টাদিতে থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাও আমি পাই নাই।

"হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে দেখা করিবার অভ্যাস আমার নাই। অভ্যাসটা বদলাইতে উৎসাহ জন্মে, এরূপ কিছুও জেনিভায় ঘটে নাই। এই কারণে আমি উপযাচক হইয়া লিগের কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করি নাই।...১৪ই সেপ্টেম্বর কামিংস সাহেব আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'যখন য়্যাসেম্ব্লির সব বৈঠক শেষ হইয়া যাইবে, এবং সেক্রেটোরিয়েটের লোকেরা অতি ব্যস্ত থাকিবেন না, তখন আমি, আপনি লিগের যে-সব বিভাগের কাজ

সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী, তাহার কর্মীদের সহিত আপনার পরিচয় করাইয়া দিব।' শেষ বৈঠক হয় ২৫শে সেপ্টেম্বর। ২৮শে কামিংস আমাকে প্রাতে লিখিলেন, যে, যদি সেদিন অপরাহু পাঁচটার সময় স্বাস্থ্যবিভাগের কর্তা ডাক্তার রাইকম্যানের সহিত দেখা করিবার আমার সুবিধা হয়, তাহা হইলে তাহার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে, এবং এই সাক্ষাৎকারের পরও যদি আমার সময় থাকে তাহা হইলে লিগের সেক্রেটারি জেনারেল স্যর এরিক ড্রামন্ডের সহিত সাক্ষাৎকারেরও বন্দোবস্ত হইতে পারে। আমি উভয় বন্দোবস্তেই সম্মতি জানাইলাম এবং যথাসময়ে তথ্য-জ্ঞাপন বিভাগের অফিসে হাজির হইলাম। কামিংস ডঃ রাইকম্যানকে খবব দিতে গেলেন।...কিছুক্ষণ পবে আফিসেব এক কর্মচারী টেলিফোনে কাহার সহিত কথা কহিয়া আমাকে বলিলেন, ডাঃ রাইকম্যান ভয়ানক (frightfully) দুঃখিত যে আপনার সহিত এখন সাক্ষাৎ করিতে পাবিবেন না। তিনি একটা কমিটির কাজে ব্যস্ত আছেন। কামিংসও ফিবিয়া আসিযা ঐ কথা বলিলেন।...আমি উমেদার ছিলাম না, কোনো অনুগ্রহ প্রার্থনা কবিতে জেনিভা যাই নাই ;...যে মানুষ দেখা করিবার কোনো দরখাস্ত করে নাই, তাহাব সহিত দেখা করিবার জন্য সময় নির্দেশ করিযা তাহার পর তাহাকে বলা, "আমার এখন অবসর নাই"—এরূপ ব্যাপারের অভিজ্ঞতা আমার ইতিপূর্বে হয় নাই।...জানা গেল, লিগের বড়োকর্তা সেক্রেটারি-জেনাবেলও বড়ো ব্যস্ত, দর্শন মিলিবে না। অতঃপর কামিংস আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পরদিন ঐ দুই ব্যক্তির সহিত দেখা কবিবাব সময় ঠিক করিবেন কিনা। আমি বলিলাম, আমি চিঠি লিখিলে করিবেন। পরে আমি তাঁহাকে এ-বিষয়ে কোনো চিঠিই লিখি নাই। তাঁহার নিকট বিদায় লইবার পর তিনি আমাব সঙ্গে সঙ্গে কামরার বাহিরে আসিলেন ও বলিলেন, 'আপনার জেনিভা যাতায়াতের ও জেনিভায় থাকিবার ব্যয় নির্বাহ করিবার ইচ্ছা লিগের বরাববই ছিল। আপনি যদি রাজী হন, তো টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত অবিলম্বে হইতে পাবে।' আমি বলিলাম, ভারতবর্ষ হইতে রওনা হইবার আগেই আমি স্থির করিযাছিলাম, যে, নিজেই নিজের ব্যয় নির্বাহ করিব। তাহাব পর বলিলাম, 'লিগ যদি নিজের নানাবিধ কার্য সম্বন্ধীয় আমার দরকাবি পুস্তক রিপোর্টাদি আমাকে দেন, তাহাই যথেষ্ট সৌজন্য মনে করিব।'...তন্মধ্যে কিছু আমি পাইয়াছি, পরে আরও কিছু কিছু পাইতে পারি। কিন্তু কতকগুলি যে পাইব না তাহা নিশ্চিত। কারণ কামিংস লিখিয়াছেন 'ম্যান্ডেট্স্ সম্বন্ধীয় মন্তব্যাদিগুলির পুরা সেট পাইলাম না।' ইহার ঠিক মানে বুঝিতে পারি নাই।

"যাহা হউক, আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে, যে, লিগ নিমন্ত্রণপত্রে আমাকে সব সুবিধা দিবার যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

"কামিংস আমাকে ২২শে নবেম্বর তারিখের চিঠিতে লেখেন, 'য়্যাসেম্ব্লির পরে বড়ো বড়ো কর্মচারীরা যখন অপেক্ষাকৃত একটু বেশি ফুরসৎ পাইয়াছিলেন, আপনি সেই সময়েই জেনিভা ছাড়িয়া যাওয়ায় দুঃখিত হইলাম। কারণ আপনার সহিত তাঁহাদের মুলাকাৎ ঘটাইতে আমি উৎসুক ছিলাম।' আমি তাঁহার ঔৎসুক্যের আন্তরিকতায় সন্দেহ কবিতেছি না। কিন্তু আমি নিজেও তো খুব বেশি ফুরসতি লোক নই। একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি জেনিভায় থাকা আমার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। কবে কাহার অনুগ্রহ হইবে, দর্শন পাইব, সে আশায় জেনিভায় বসিয়া থাকিতে পারি নাই। ইউরোপ অল্প স্বল্প দেখিবার ইচ্ছা ছিল। যদি কেবল বড়োকর্তাদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য য়্যাসেম্ব্লির অধিবেশনের পরে যাইতাম, তাহা হইলে লিগ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান কিছুই হইত না। অথচ সেইটাই বেশি দরকারি মনে করিয়াছিলাম।...বৈঠক তো ২৬শে শেষ হইয়া গিয়াছিল কিন্তু ২৮শেও দু'জন কর্তা পূর্ব প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও দর্শন দেন নাই।"

রামানন্দ মনে করিতেন, ভারত গবর্নমেন্টের সহিত পরামর্শ করিয়া যদি লিগ কোনো

ভারতীয় সম্পাদককে নিমন্ত্রণ করিতেন (যাহা তাঁহার বেলা হয় নাই) এবং যদি সেই সম্পাদক লিগের নিকট হইতে টাকা লইতেন, তাহা হইলে সেই সম্পাদক জেনিভায় তাঁহা অপেক্ষা হয়ত অধিক ভাগ্যবান হইতেন। আমাদের মনে হয়, লিগকে তিনি নিজের যে পরিচয় দিয়া আসিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার যাওয়া অনেকখানি সার্থক হইয়াছিল। অর্থ প্রত্যাখ্যানও তাঁহারই স্বরূপের একটি পরিচয়। এত টাকা প্রত্যাখ্যান যে-সে করিতে পারে না।

লেবার অফিস সম্বন্ধে তিনি বলেন,

"এই আফিসে প্রাচ্যদেশের লোক খুব কম। এটা শুধু ধারণা নয়, ইহার অকাট্য প্রমাণ আছে। এই আফিসের ডিরেক্টার মস্য আলবেয়ার টমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।...আমি বিদেশ হইতে লিগের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। স্বদেশ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ না হইলেও সম্পূর্ণ অজ্ঞও নহি। সুতরাং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি আমাকে এক-আধটা প্রশ্নও করিতে পাবিতেন। কিন্তু ইঁহার সেরূপ কোনো কৌতূহল দেখিলাম না। বোধ হয় সরকারি বিপোর্ট এবং অন্য ইউরোপিয়দের লেখা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও অন্যান্য বহিই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য ইঁহারা যথেষ্ট মনে করেন।...ডেপুটি ডিরেক্টার বাটলার ইংরেজ।...ইনিও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিজে হইতে আমাকে কোনো প্রশ্ন করেন নাই। ইঁহাদের মনের মধ্যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই ভাব বিদ্যামান, যে, ভারত সম্বন্ধে খাঁটি খবর যাহা কিছু জানিবার আছে, তাহা শ্বেতাঙ্গদের মুখ ও লেখনী হইতে সম্পূর্ণরূপে জানা যায়। কথা-প্রসঙ্গে আমি বাটলার সাহেবকে বলিলাম, ভারতবর্ষ স্বশাসন-ক্ষমতা লাভের যে রাজনৈতিক চেষ্টা করিতেছে তাহাতে কলেজের বিতর্ক-সভাগুলি উহার যেরূপ সাহায্য করিতে পারে, লিগও সেইরূপ পারিবে।...আন্তর্জাতিক শ্রম অফিস সম্বন্ধে আমি বলিলাম, এই অফিস যদি ঠিক ঠিক কাজ করে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের শ্রমিকদের কিছু উপকার হইতে পারে। কলকাবখানার শ্রমিকদের মধ্যে স্ত্রীলোকদের সংখ্যা কম নয়। সেই জন্য বলিলাম, পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের অভাব-অভিযোগ দুঃখ সব সময় জানিতে বুঝিতে পারে না, কিংবা তাহা জানাইতে ইচ্ছুক বা ব্যগ্র হয় না ; এই জন্য স্ত্রীলোকদের পক্ষ হইতে তাহাদের কথা জানাইবাব নিমিত্ত কোনো ভারতীয় শিক্ষিত ও যোগ্য স্ত্রীলোককে স্ত্রী-জাতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধি রূপে জেনিভায় পাঠান উচিত।"

রামানন্দ শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর নাম করিয়া বলেন,

বাগ্মিতা, সাহস এবং এতদ্বিষয়ক জ্ঞান, কিছুরই তাঁহার অভাব হইবে না, কিন্তু ভারত গবর্নমেন্টের ইঁহার মতো কোনো মহিলাকে পাঠাইবার সম্ভাবনা নাই। তখন মিঃ বাট্‌লার বলিলেন, 'শ্রমিক আফিস স্বাধীন ও সাক্ষাৎভাবে কোনো মহিলা প্রতিনিধিকে আহ্বান করিতে পারেন।'

কিন্তু তাহার পর বৎসরও ভারতীয় কোনো মহিলাকে আহ্বান করা হয় নাই। কয়েক বৎসর পরে শ্রীযুক্ত কিরণ বসুকে সামাজিক সমস্যা বিভাগে ভারতবর্ষের তথ্য জানাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়।

ভারতীয় শ্রমিকদের কার্যক্ষমতা সম্বন্ধে কথা উঠায় রামানন্দ বলেন,

"তাহারা যে অপেক্ষাকৃত কম কার্যক্ষম, তাহার একটা প্রধান কারণ নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা। যথেষ্ট খাদ্যাভাব এবং অসুস্থতাও অন্যতম প্রধান কারণ।"

রামানন্দ শিক্ষা বিষয়ে বলেন,

"সর্বসাধারণের মধ্যে অবৈতনিক শিক্ষাবিস্তাব বিষয়ে গবর্নমেন্ট এ পর্যন্ত কোনো উৎসাহ দেখান নাই, বরং কখনো কখনো সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। ইত্যাদি..."

মিস্টার বাটলার চতুর লোক, কথা কম বলিতেছিলেন। এবার বলিলেন, "ভারতে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক সার্বজনীন শিক্ষার চাহিদা (demand) আছে কি?" রামানন্দ মাত্র বলিলেন "আছে।" কিন্তু প্রশ্নটা তাঁহার মনে বিঁধিয়াছিল। তিনি ভাবিলেন, বাস্তবিকই কি একটা ভালো বা ভালো-বলিয়া-স্বীকৃত জিনিসের চাহিদা না থাকিলে গবর্নমেন্ট কোনো দেশে তাহার বন্দোবস্ত করেন না? জাপানে এমন কী ইংলন্ডেও যে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তাহাও চাহিদার জন্য নয়।

লিগের লাইব্রেরি সম্বন্ধে রামানন্দ লেখেন,

> "গত বৎসর গ্রন্থকার মেজর বামনদাস বসুর সম্মতিক্রমে ৯ই আমি ডাকে রেজিস্টারি করিয়া Rise of the Christian Power in India in five volumes এবং আরও পাঁচটি বিখ্যাত বই পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু যখন আমি সেপ্টেম্বর মাসে লিগের লাইব্রেরি দেখি, তখন বহিগুলি আমার চোখে পড়ে নাই। কোনো কোনো বহি লিগ লাইব্রেরিতে রাখা না রাখা কি ব্রিটিশ গবর্মেন্টের কোনো প্রকার নির্দেশ অনুসারে হয়? একমাত্র ভারতবর্ষীয়েরাই যাহার পরিচালক ও মালিক এরূপ কোনো ভারতবর্ষীয় মাসিক বা ত্রৈমাসিক কাগজ লাইব্রেরির পাঠকক্ষের টেবিলে দেখিলাম না। অন্যান্য বহু বহু সাময়িক পত্র রহিয়াছে।"

এ বিষয়ে প্রশ্ন করাতে মিঃ কামিংস বলেন, 'যে-সব কাগজের প্রকাশকেরা লিগকে বিনামূল্যে কাগজ পাঠান, তাঁহাদেরই কাগজ রাখা হয়।'

তদনুসারে লিগ লাইব্রেরিতে 'মডার্ন রিভিয়ু' এবং 'ওয়েলফেয়ার' পাঠান হয়। পরে টেবিলে থাকিত কিনা কে জানে?

লিগের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনের শেষ বৈঠকের আগের দিন 'ভারতীয়' প্রতিনিধিরা মাধ্যাহ্নিক ভোজে কয়েকজন ভারতীয় ও অন্য লোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই ভোজের বর্ণনায় রামানন্দ লেখেন, 'নিমন্ত্রণ পত্রে লেখা ছিল সওয়া একটার সময় ভোজ আরম্ভ হইবে। ভারতীয়দের সময়জ্ঞান ও নিয়মনিষ্ঠা কম, ইউরোপ-প্রবাস-কালে এরূপ অপবাদের কারণ না জন্মাইবার চেষ্টা আমি বরাবরই করিতাম। সুতরাং ইউরোপিয় রান্না আমার পক্ষে মুখরোচক না হওয়া সত্ত্বেও আমি ঠিক সময়ের আগেই গিয়াছিলাম। কিন্তু পরিবেশন আরম্ভ হয় না। 'ভারতীয়' একজন ইংরেজ বারবার বলিতেছিলেন 'আজকের মধ্যাহ্ন-ভোজনটা অদৃষ্টে আছে কিনা, বুঝতে পারচি না।'...অবশেষে বেলা ২।। টার কিছু আগে বা পরে পূর্বোক্ত ক্ষুধিত বৃদ্ধ ইংরেজ বলিয়া উঠিলেন, 'এতক্ষণে এঁরা আসছেন রাজা-রাজড়ার মতো'।' তাঁহারা ভাইকাউন্ট সেসিল ও লেডি সেসিল। তাঁহারাই ছিলেন প্রধান অতিথি। রামানন্দ ইহার পর জেনিভায় বেশিদিন ছিলেন না। লিগ অ্যাসেম্ব্লির অধিবেশন শেষ হইলেও লিগ কৌন্সিলের অনেক অধিবেশন বাকি ছিল। কিন্তু তিনি বলেন, "লিগের নানাবিধ মিটিং সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই হইয়াছিল, তাহাতে আমার আরো বেশি দিন জেনিভায় থাকিবার উৎসাহ জন্মে নাই।"

জেনিভা হইতে তিনি জার্মানি যান। তাঁহার ইচ্ছা ছিল রবীন্দ্রনাথের দলের সহিত ভ্রমণ করিবেন। বার্লিন, ড্রেসডেন প্রভৃতি স্থানে বয়োবৃদ্ধ বিদেশির প্রতি শিষ্টাচার দেখিয়া তিনি প্রীত হন। তিনি জার্মানির লোকদের মানসিক আতিথেয়তা দেখিয়াও প্রীত হন। তিনি বলেন,

> "সকল রকমের মত, চিন্তা, ভাব, আদর্শ, তাহারা বুদ্ধিযোগে বুঝিতে, উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক। যে জাতির মধ্যে অন্তত কতকগুলি পরমতসহিষ্ণু ও পরমত সম্বন্ধে কৌতূহলী লোক নাই, তাহারা হৃদয় মন আত্মার কৃষ্টিতে (কালচারে) বড়ো হইতে পারে না।"

ড্রেসডেনে অনেক চিত্রকর রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকিতে যখন হোটেলে আসিত, এবং অনেক চাকর-চাকরানি রবিবাবুর বই কিনিয়া তাহাতে রবিবাবুর দস্তখত লইতে আসিত তখন রামানন্দ সেখানে ছিলেন। একদিন এক চিত্রকর বার দুই-তিন ভুল করিয়া রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি আঁকিলেন ; সেটাও ঠিক হইল না। কবি বলিলেন, "দেখুন তো রামানন্দবাবু, এটা মাইকেল মধুসূদন দত্তের ছবি হইয়াছে কি না।" বলিয়া ছবিতে দস্তখত করিয়া দিলেন।

বার্লিন হইতে রবীন্দ্রনাথের দলের সহিতই তিনি প্রাগে যান। প্রাগে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। সেখানে ডাক্তার তাঁহাকে রাত্রে সুতি পরিচ্ছদ পরিতে বলেন। তখন তাঁহার সুতি পরিচ্ছদ সঙ্গে না থাকাতে অধ্যাপক ভিন্টারনিট্জ মহাশয় সস্ত্রীক হোটেলে আসিয়া তাঁহার জন্য সুতি কাপড় করাইয়া দিলেন। প্রাগে এই বৃদ্ধ অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দের চিঠিপত্র ডাকপিয়নদের মতো একটি ব্যাগে করিয়া তাঁহাদের দিয়া যাইতেন। ইঁহার সহৃদয়তার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই ছোটো ছোটো গল্পগুলি রামানন্দ পরে করেন। সেখানে অধ্যাপক ভিন্টারনিট্জ ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়।

জেনিভায় ফিরিয়া কিছুদিন বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। কিন্তু অনেকের কথায় চিকিৎসার জন্য রবীন্দ্রনাথের দলের সহিতই তিনি ভিয়েনায় যান। এখান হইতে রবীন্দ্রনাথের দলের সহিত রুশিয়া যাইবার পাশপোর্ট তিনি পাইয়াছিলেন। বার্লিনে তাঁহার সহিত টলস্টয়ের বন্ধু ও চরিতাখ্যায়ক পল বিরুকফের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার মুখে রুশিয়ার কথা শুনিয়া রামানন্দ রুশিয়া দেখিতে ব্যগ্র হন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পীড়ার জন্য ডাক্তার যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। রুশিয়া দেখিতে না পাওয়ায় এবং ভবিষ্যতেও কখনো দেখিবার সম্ভাবনা না থাকায় রামানন্দ খুব দুঃখিত হন। তিনি বলেন,

> "যেখানে কারিকব মুটে মজুব চাষাবা অন্য কোনো শ্রেণীব লোকদের চেয়ে নিকৃষ্ট বিবেচিত হয় না, সকলের রাষ্ট্রীয় অধিকার সমান, সামাজিক মর্যাদাও সমান বলিয়া কাগজে পড়িয়াছি, এরূপ দেশের প্রকৃত অবস্থা কি প্রকার এবং সকল রকম কাজকর্ম কেমন চলিতেছে তাহা সাক্ষাৎ দেখিবার জিনিস, কিন্তু দেখা হইল না।"

রামানন্দ ভিয়েনায় ডাক্তার ওয়েঙ্কেব্যাক নামক বিখ্যাত চিকিৎসককে নিজের শারীরিক অসুস্থতার সমস্ত বিষয় বলাতে ডাক্তার তাঁহাকে শীতের আগে দেশে ফিরিতে বলেন এবং তাহা না পারিলে দক্ষিণ ফ্রান্সে কিম্বা ইতালিতে থাকিতে বলেন। সেখানে তাঁহার কোনো পরিচিত লোক না থাকায় তিনি ডাক্তাবেব অনুমতি লইয়া জেনিভা যাত্রা করিলেন। তখন মাত্র অকটোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ। কিন্তু সেই দিনই জুরিখে বরফ পড়িতে আরম্ভ করে। এবং যে ট্রেনে তিনি যাইতেছিলেন তাহার ঐ বিশেষ গাড়িটা জুরিখে কাটিয়া রাখিয়া ট্রেন অন্য দিকে চলিয়া গেল। ফলে গাড়িতে উষ্ণ বাষ্পবাহী নলটা ঠাণ্ডা হইয়া গেল এবং দেড় ঘণ্টা প্রচণ্ড শীতে ঐ বয়সে তাঁহাকে কাটাইতে হইল। জেনিভায় পৌঁছিয়া হোটেলে যাইতে বৃষ্টিতে ভিজিতে হইল। অদৃষ্ট যেন চারিধার হইতে তাঁহার পিছনে লাগিয়াছিল। জেনিভায় তাঁহার ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়া তাহা ডবল নিউমোনিয়ায় দাঁড়াইল। কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে অদৃষ্ট প্রসন্নও ছিল এই পরম ভাগ্য। ইউরোপে নানা জায়গায় অনেক টাকা খরচ করিয়াও তিনি যেরূপ যত্ন ও আরাম পান নাই, তুলনায় কম দিয়াও এই হোটেলটিতে তাহা পাইয়াছিলেন। চব্বিশ ঘণ্টা শুশ্রূষাকারিণী নার্স রাখা হইলেও ডা. রজনীকান্ত দাস ও তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী সোনিয়াই সমস্ত যত্ন করিয়াছিলেন। রজনীবাবুর স্ত্রী চব্বিশ ঘণ্টা নার্সের সহিত পাশের একটি ঘরে থাকিতেন এবং যাহা কিছু দরকার সব করিতেন। তাঁহাদের স্বামী-স্ত্রীর

ঋণ রামানন্দ অপরিশোধনীয় মনে করিতেন। মৃত্যুর দুই-এক মাস পূর্বেও সোনিয়াকে তিনি চিঠি লিখাইয়াছেন এবং তাঁহার সহিত দেশ-ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সোনিয়া লিখিয়াছিলেন, "আমাদের নিকট রামানন্দবাবুই ভারতবর্ষ।"

রামানন্দ আরোগ্যলাভ করিবার আগে হইতেই জেনিভার ডাক্তার বলিয়াছিলেন, যে, আরোগ্যলাভ করিবার পরই যেন তিনি দেশে ফিরিয়া যান। পীড়িত হইবার পূর্বেই একটি জার্মান জাহাজে দেশে ফিরিবার জন্য সিকির অধিক অগ্রিম ভাড়া দিয়া তিনি জায়গা লইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার রওয়ানা হইতে দেরি ছিল বলিযা অনেক টাকা লোকসান দিয়াও তাহার কামরা ছাড়িয়া দিতে হইল। টেলিগ্রাফ করিয়া একটি ফরাসি জাহাজে স্থান লওয়া হইল। তাহা মার্সে-ঈ হইতে ৫ নবেম্বর (১৯২৬) কলম্বো যাত্রা করে। একা ট্রেনে যাইবার শক্তি তাঁহার ছিল না। এইজন্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র গুহ তাঁহাকে জাহাজে তুলিয়া দিতে মার্সে-ঈ পর্যন্ত যান। জাহাজে তৃতীয় শ্রেণীতে দুটি ভারতীয় যুবক ছিলেন এবং প্রথম শ্রেণীতে রামানন্দ। বাকি সকলেই অন্য দেশিয়। সুতরাং পীড়িত অবস্থায় নির্জন কারাবাসের দুঃখ তাঁহাকে পাইতে হইয়াছিল, কারণ জাহাজের কন্ট্রোলার ভারতীয় যুবক দুইটিকে প্রথম শ্রেণীর ত্রি-সীমানায় আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। রামানন্দ বলিয়াছিলেন, "নির্জন কারাবাস যে কিরূপ নিষ্ঠুব দণ্ড, জাহাজে সঙ্গীহীন অবস্থায়, তাহা বারবার উপলব্ধি করিয়াছি।" কিন্তু ফ্রেঞ্চ এই জাহাজটিতে খাইবার ঘরে কিম্বা অন্যত্র অন্য রকম জাতিভেদ ছিল না। দেশের জন্য রামানন্দের মন ব্যাকুল হইয়াছিল। তাই লিখিয়াছেন "কলম্বো পৌঁছিবার দিন কিন্তু অনেক রাত্রি থাকিতে শয্যা ত্যাগ করিলাম। বাহিরে আসিয়া দূরে আলোকমালা দেখিয়া বুঝিলাম, সিংহলের নিকট আসিয়াছি। ডাঙার কাছে আসিয়াছি, অ-শ্বেত মানুষের দেশের নিকটবর্তী হইয়াছি, ভাবিয়া বড়ো আনন্দ হইল।" দেশের এই অশ্বেত জাতি ছিল তাঁহার প্রাণস্বরূপ।

৩০ নবেম্বর রামানন্দ হাওড়া পৌঁছন।

রামানন্দের হৃদয় যেমন কোমল ছিল, আত্মমর্যাদাজ্ঞানও তেমনি অত্যধিক ছিল। তিনি যেমন সবার পিছনে থাকিতে ভালবাসিতেন, তেমনি শিষ্টাচারের বিন্দুমাত্র ত্রুটি সহ্য করিতে পারিতেন না। পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ ছিল। এই যে কয়েক মাস তিনি বিদেশে ছিলেন ইহার মধ্যে কাহারও এতটুকু সযত্ন ব্যবহার তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই, তুচ্ছতম সৌজন্যও তিনি চিরকাল মনে রাখিয়াছিলেন ; যাঁহাদের সেবা, যত্ন, বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, কোমলতার স্পর্শ পাইয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহার পরমাত্মীয় হইয়া গিয়াছিলেন। আবার যেখানে দম্ভ, অভদ্রতা, নীচতা, প্রতারণা দেখিয়াছেন সেখানেও তাঁহার অন্তরাত্মা পর্যন্ত জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সামান্য ট্রেন কন্ডাক্টার ঠকাইয়া টাকা লইতে যাইবা মাত্র বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু দরদস্তুর না করিয়া অবজ্ঞাভরে টাকাটা ফেলিয়া দিয়াছেন। আবার জাতিসংঘের মহামান্য কর্মীরা যখন কাজে অভদ্রতা করিয়া দম্ভভরে ৬০০০ টাকা দিতে চাহিয়াছেন, তখনও তাহা তেমনই অবজ্ঞাভরে ফেলিয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার এতটা গভীর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি অযাচিত ভাবে বক্তৃতা দিয়া বেড়ান নাই, হোমরা চোমরাদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া নিজের মান বাড়াইবার চেষ্টা করেন নাই। না হইলে তাঁহার মতো মানুষ ইংলন্ডে গিয়া অতটুকু সময়ের মধ্যে পুত্রদের ও পুত্রবধূর ছাত্রজীবনেব স্মৃতিজড়িত কলেজ ও ঘরগুলি দেখিয়া না বেড়াইয়া দশটি গণ্যমান্যের সহিত দেখা করিয়া আসিতেন। তাঁহার 'সম্পাদকের চিঠি' পড়িয়া বুঝা যায় তিনি ইউরোপের নানা দেশের নানা

শহরের স্থাপত্য, সৌন্দর্য, দারিদ্র্য, সম্পদ, শিক্ষাদীক্ষা, শিষ্টাচার কোনো বিষয়ে গতানুগতিক কথা বলেন নাই, নিজের চোখে যেমন লাগিয়াছে ঠিক তেমনই বলিয়াছেন। প্যারিস কিম্বা ভেনিস দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন নাই, ভিয়েনা তাঁহার সুন্দরতম শহর মনে হইয়াছিল। ভিনাস ডি-মিলোকে নারী-সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া তিনি স্বীকার করেন নাই, কিন্তু মোনালিসা তাঁহাকে মুগ্ধ করে। তাছাড়া চোখের দৃষ্টির অন্তরালে মনের একটা দ্বিতীয় দৃষ্টির সাহায্যে তিনি দেখিতেন। এই চিঠিগুলি পড়িলেই বুঝা যায়, প্যারিসের আর্ট, ব্রিটিশ মিউজিয়মের বিরাট সংগ্রহ, মিশরের মমি, জাহাজের জাতিভেদ, পরাধীন দেশের মানুষের প্রতি স্বাধীন দেশের ব্যবহার, পথের লোকের হাসিমুখ, গৃহ-বিরহকাতর কোনো মেয়ের কান্না এই সব প্রত্যেক ছোটো বড়ো জিনিস বাহিরের চোখ দিয়া তো তিনি লক্ষ করিয়াইছেন, তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি, তাঁহার প্রজ্ঞাচক্ষু ইহার অন্তরালের কত অকথিত কথাও তখনই পাঠ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহা আবার প্রতিফলিত হইয়া গিয়া পড়িয়াছে ভারতের চিন্তায়। কেন ভারতের মানুষের মুখে হাসি নাই, কেন ভারতের মতো শিল্পের ধ্যানলব্ধ শক্তি-সৌন্দর্য ইউরোপে নাই, কেন মানুষ ভারতবাসীর সহিত ব্যবহার ও স্বাধীন দেশের লোকের প্রতি ব্যবহারে এত পার্থক্য করে। ভাবতে ও বিদেশে যতটুকু তিনি দেখিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে হয় নাই যে, বাংলার ছেলেমেয়েরা অন্তর্নিহিত শক্তিতে অন্য কোনো দেশের ছেলেমেয়েদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু সেই ভারতের ও বাংলার ভাগ্যের কথা ভাবিয়া তাঁহার মন বিষণ্ণ হয়।

একথা মনে রাখা দরকার যে রামানন্দ গবর্নমেন্ট কর্তৃক জেনিভায় প্রেরিত হন নাই, লিগ কর্তৃক 'সাক্ষাৎভাবে' নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তবুও তিনি লিগের নিকট নিজের যাতায়াত এবং থাকার কোনো খরচ লন নাই। লিগ তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে নিমন্ত্রণ করায় এবং গবর্নমেন্টকে কিছু জিজ্ঞাসা না করায় গবর্নমেন্ট সন্তুষ্ট হন নাই, রামানন্দ নানা কারণেই মনে করিতেন। ভারতবর্ষের মানুষ লিগের নিকট যেটুকু সৌজন্য পাইবার আশা করিতে পারিতেন, রামানন্দের মতো প্রতিষ্ঠাবান মানুষও যে তাহা পান নাই, ইহা দেশকে জানাইয়া তিনি দেশের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছিলেন।

লিগ অব নেশনস সম্বন্ধে ভারতে প্রকৃত তথ্য তিনিই প্রথম বলেন। তিনি ইউরোপ হইতে ফিরিয়া এ-বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে দেখান যে লিগের যে-বিভাগ পৃথিবীর স্বাস্থ্যরক্ষা ও উন্নতির কাজ করিবার জন্য স্থাপিত, ভারতবর্ষ তাহা হইতে কোনো উপকার পায় নাই, অথচ লিগের সভ্য না হইয়াও রুশিয়া ও তুরস্ক এবং আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটস উপকার পাইয়াছে। এই প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিয়া প্রধান প্রধান বাংলা ও ইংরাজি দেশি কাগজে পাঠানো হয়। কেহ কেহ তাহা নিজেদের কাগজে ছাপান। ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ বলিয়া রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে কোনো উপকারই লিগের নিকট হইতে পাইতে পারে না, তাহাও রামানন্দই প্রথম দেখান। লিগের সভ্যগণ তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে চুক্তিপত্রের দশম ধারা অনুসারে পৃথিবীর তৎকালীন রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা রক্ষা করিতে বাধ্য, অর্থাৎ কার্যত তাহা পরাধীন অনিউরোপিয় দেশ সকলের দাসত্ব স্থায়ী করিতে বাধ্য, ইহাও রামানন্দ দেখান। তিনি বলেন, "ভারতবর্ষের অভাব-অভিযোগ দূর করিতে ভারতীয়দের প্রতি অত্যাচারের প্রতিকার করিতে লিগের এক কানাকড়ির ক্ষমতাও নাই। ভারতবর্ষের লোকেরা লিগকে নিজের কোনো কথা জানাইতে পর্যন্ত পারে না। বিদেশি ভারত গবর্নমেন্ট নিজের স্বার্থে যাহা জানাইতে চায় তাহাই লিগ জানিতে পারে।"

তবুও তিনি বলেন যে সাক্ষাৎভাবে লাভ না হইলেও, আমরা যদি আমাদের দেশ হইতে নিজেরা উপযুক্ত লোককে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিতাম তাহা হইলে তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিদেশের লোকদের ধারণা ভাল হইতে পারিত। 'জগতের শ্রদ্ধা অর্জন কম লাভ নহে।' এছাড়া অন্যান্য কিছু কিছু লাভের কথাও তিনি বলেন। যথা, বিদেশের নামজাদা লোকদের সঙ্গে মিশিলে আর একটা লাভ হয়—বুঝিতে পারা যায়, যে, তাহারা অনেকেই ভারতীয়দেরই মতো মানুষ, অতিমানব নহে। তবে গবর্নমেন্ট যদি ইংরেজকে ভারতের প্রতিনিধি বলিয়া পাঠান অথবা অযোগ্য ভারতীয়কে প্রতিনিধিরূপে পাঠান, তাহা হইলে কত রকম ক্ষতি হয় তাহাও তিনি নিজ অভিজ্ঞতা হইতে প্রমাণ করেন।

"A HINDU CONDEMNS THE LEAGUE"

এই নামে আমেরিকার *Literary Digest* পত্রিকায় ১৯১৭-র জুন মাসে একটি ছোটো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে ছিল :

"A League of Robbers" is the phrase applied to the League of Nations by a cultured Hindu who has just returned to India from Geneva, and who has decided that the new institution is merely 'a device invented by the Imperialist nations to consolidate and extend their ill-gotten gains.' Babu Ramananda Chatterjee, M.A., a highly intellectual Brahman of Bengal, is the man, and he is the Editor of the Modern Review and Prabasi of Calcutta. He went to Geneva at the invitation of the League of Nations itself, which offered to bear all his expenses. His inquiry, we are told, led him to become so disapponted with the aims and activities of the League that he preferred to pay his expenses out of his own pocket, and since his return home he has given frank and vigorous expression to his views. According to a speech delivered by Mr. Chatterjee in Calcutta, as reported in the Amrita Bazar Patrika of the city :

'The League practically means a League of white people. An ex-President of the League (Mr. Benes) frankly confessed in a League meeting : 'The work accomplished by the League of Nations in the past year...constitutes a step forward in the evolution of Europe and the improvement of the world. If the robber nations of Europe gave up robbery, the new organization might lead to the improvement of the world, but if it aims merely at the evolution of Europe without giving up international robbery, means practically the enslavement of the world.'

The covenant, according to Mr. Chatterjee, makes it impossible for the League to help any nation that is struggling to be free. He declares : "In these days of 'advanced' civilization, people have imbilised the habit of hiding true colour of everything, and at present whenever a big Power annexes a territory and thus becomes its virtual ruler, they are apt to call it a mandated territory. Exploitation and enslavement now-a-days go by the name of 'sacred trust of civilization'. Mr. Chatterjee adds that there are other mandates than those issued by this "league of robbers", including the mandate from

God which ordains 'The all are to be free in every walk of life'".

এই প্রবন্ধটি পড়িয়া রামানন্দ লেখেন :

"The day after the delivery of the lecture a report appeared in some dailies under the caption "A League of Robbers". The speaker at once wrote to say that he had not used the expression "league of robbers", as that would not be justifiable, and the contradiction was published in the papers. It is true no doubt that the League is dominated by some imperialistic predatory nations but all or most of the nations which are members of the League are not predatory.

As for Mr. Chatterjee's non-acceptance of expenses from the League, it has nothing to do with his being "disappointed with the aims and activities of the League." As has been explained in a previous issue of this Review, he did not accept any expenses because he wanted to be free from the least conscious or unconscious pressure of a sense of obligation on his mind. As he did not go to Geneva with any high hopes, he had no reason to be disappointed. Nor did he go with any fixed preconceived notions."

জেনিভা হইতে ফিরিবার পর বাংলায় ও বাংলার বাহিরে বহুস্থলে তিনি 'League'এর বিষয় বক্তৃতা করিতে অনুরুদ্ধ হন এবং বক্তৃতা করেন।

হিন্দু মহাসভা (সুরাট)

হিন্দু মহাসভার সুরাট অধিবেশন এবং ইন্ডিয়া ইন বন্ডেজের মামলা যদিও রামানন্দ ইউরোপ হইতে ফিরিবার কয়েক বৎসর পরে হইয়াছিল তবু এই অধ্যায় দুটিকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য এগুলির কথা আগে লিখিলাম।

বাংলা ১৩৩৫-এর শেষে (ইং ১৯২৯-এ) নিখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার দ্বাদশ অধিবেশন সুরাটে হয়। এই অধিবেশন নানাকারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ বৎসরেব সভাপতি নির্বাচনের মধ্যেও বিশেষত্ব ছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতীক পূজায় বিশ্বাসী না হইলেও এ বৎসর তাঁহাকেই সভাপতি নির্বাচন করা হয়। অবশ্য তখন মহাসভা "হিন্দু" শব্দটি যে অর্থে প্রয়োগ করিতেন, তাহাতে এই নির্বাচনে কোনো বাধা ছিল না। তখন হিন্দু মহাসভার নিয়মাবলীতে হিন্দিতে যে সংজ্ঞা দেওয়া ছিল তাহার বাংলা : "যে কোনো ব্যক্তি ভারতে উদ্ভূত কোনো ধর্ম মানেন, তিনি হিন্দু। সনাতন ধর্মী, আর্য সমাজী, জৈন, বৈদ্ধ, শিখ ও ব্রাহ্ম আদি সকলে হিন্দুপদবাচ্য।"

১৩৩২ সালে হিন্দু মহাসভা নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে বেদপাঠে অনধিকারী বলাতে 'প্রবাসী'তে সম্পাদক তাহার সমালোচনা ও নিন্দা করেন, কিন্তু ১৩৩৫-এ এই সভার নিয়মাবলীতে কোনো খুঁত না থাকাতে রামানন্দ সভাপতির পদ গ্রহণে কোনো দ্বিধা বোধ করেন নাই।

তৎকালীন নিয়মালবীতে হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য ছিল :

(ক) হিন্দুসমাজের সব অবয়বের মধ্যে একতা বাড়ান এবং তাহাদিগকে একই শরীরের অঙ্গ মানিয়া পরস্পর সংগঠিত করা। (খ) ভাবতে হিন্দু ও অন্য ধর্মবলম্বী সমাজের মধ্যে সদ্ভাব উৎপন্ন করা, এবং স্বাশাসক এক সম্মিলিত ভারতীয় রাষ্ট্র প্রস্তুত করিবার জন্য তাহাদের সহিত মিত্রভাবে চলা। (গ) তথাকথিত নীচ জাতিদের অবস্থার

সংশোধন ও উন্নতি করা। (ঘ) হিন্দুদের হিত ও অধিকার, যেখানে ও যখন আবশ্যক, রক্ষা ও উন্নতি করা। (চ) হিন্দু জাতির সংখ্যা রক্ষা ও বৃদ্ধি করা। (ছ) হিন্দুজাতির নারীসমাজের অবস্থার উন্নতি করা। (জ) গোবংশের রক্ষা ও উন্নতি করা। (ঝ) সমগ্র সমাজের ধর্ম, সদাচার, শিল্প, এবং সামাজিক আর্থিক ও রাজনৈতিক হিত ও অধিকাবের উন্নতি কবিবার জন্য প্রযত্ন করা।

দেখা যাইতেছে যে ইহার অধিকাংশ উদ্দেশ্যের জন্য রামানন্দ চিরজীবন কথায়, কলমে ও কাজে খাটিয়া আসিয়াছেন, (ক) (খ) প্রভৃতির জন্য তিনি তো চিরদিনই চেষ্টা করিয়াছেন, (ছ) এর জন্যও তাঁহার চেষ্টা নিশ্চয় কিছু কম নয়। এমনকী গো-জাতির দুর্গতির বিষয়ও তিনি 'দাসী'র যুগেও লিখিয়াছেন, তখন আর কেহ বোধ হয় ইহা মাথা ঘামাইতেন না।

কংগ্রেস প্রভৃতি অনেক পুরাতন সভাও যেমন তাঁহাদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সব কাজ করিতে পারেন নাই, হিন্দু মহাসভার অবস্থানও অনেকটা সেইরূপ। তবু আদর্শের কথা মনে রাখিতে হইবে।

সুরাটে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে দর্শকের টিকিট ছয় হাজারের অধিক বিক্রয় হইয়াছিল (বামনরাও মুকদমে মহাশয়ের মতে)। ইহা ছাড়া অভ্যর্থনা সমিতির বহু সভ্য প্রতিনিধি প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে মোটামুটি যাহা বলেন (১৩৩৬ বৈশাখ) 'প্রবাসী'র দেশ-বিদেশের কথায় তাহা এইরূপ আছে :

তিনি বলেন যে, হিন্দু মহাসভা যে উদ্দেশ্যে স্থাপিত তাহার সম্বন্ধে অন্য কোনো সমাজের বা ধর্মের আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। এবং হিন্দু মহাসভা তাহার সভ্যবৃন্দকে হিন্দু হিসাবে যে-সকল কর্তব্য পালন করিতে উদ্বোধিত করিতেছে তাহার সহিত শুধু মানুষ হিসাবে হিন্দুদের যে-সকল কর্তব্য আছে তাহারও কোনো বিরোধ নাই। হিন্দু সমাজের নিজেকে উন্নত ও শক্তিশালী করিবার প্রচেষ্টা সমগ্র জাতিকে উন্নত ও শক্তিশালী করিবার বৃহত্তর চেষ্টার একটা দিক মাত্র। ইহার পর তিনি ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন গৌরবের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই সভ্যতার ধারাকে চিরপ্রবহমান রাখা হিন্দুরই কর্তব্য, কারণ হিন্দুই বিশেষ করিয়া এই সভ্যতার উত্তরাধিকারী, হিন্দু সমাজই সেই সভ্যতার প্রধান অবলম্বন। সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, হিন্দু সমাজকেও বাঁচিতে হইবে। তাহার এই বাঁচিবার চেষ্টার মধ্যে অন্য কোনো জাতি বা ধর্ম বা সমাজকে স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার কোনো ইচ্ছা নাই। হিন্দু মহাসভা শুধু হিন্দু সমাজকে তাহার ন্যায্য এবং প্রাপ্য অধিকার দিয়া সগৌরবে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়।

এই মহদুদ্দেশ্যের সহিত অন্য কোনো ধর্মের বিরোধ নাই। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুর এই বাঁচিয়া থাকার চেষ্টাকে নিজেদের উপর আক্রমণ মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হইতেছেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে ঐতিহাসিক ও অন্যান্য যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করেন যে, হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সভ্যতা প্রচার, হিন্দুর সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা, অন্য ধর্মাবলম্বীকে হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া, নিম্ন শ্রেণীর লোককে উন্নত করা, এ সকল হিন্দু সমাজে অভিনব জিনিস নয়। যুগে যুগে হিন্দুরা ভারতবর্ষের সীমার মধ্যে ও বাহিরে এই কাজ করিয়া আসিয়াছে।

হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্যগুলি কী করিয়া সিদ্ধ হইতে পারে, তাহার আলোচনাও তিনি করেন, এবং এই প্রসঙ্গে জাতি-বিশেষের উন্নতি-অবনতি কী কারণে হইয়া থাকে, তাহারও উল্লেখ কবেন। পরিশেষে তিনি হিন্দু সমাজে নারীর অবস্থা, হিন্দুর অধিকার-রক্ষণের বিচার

উপায় করিয়া, ফলে অধিকার না থাকিলেও কাজ করিয়া যাইতেই হইবে হিন্দুগণকে এই উপদেশটি স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার অভিভাষণ সমাপ্ত করেন।

নারী-রক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেন,

> "প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করা এবং তাঁহাদিগকে আত্মবক্ষাব সমর্থ করিবাব জন্য শিক্ষা দেওয়া আমাদের সর্বোচ্চ কর্তব্য বলিয়া মনে কবি।...যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা কবে ..বিদেশির প্রভুত্ব হইতে মুক্তি, ও বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনার শৌর্যে ভাবত-নারীর সম্মান, দেহ ও প্রাণের নিরাপদ অবস্থা . দুটিব মধ্যে কেবলমাত্র একটি বাছিয়া লও, .তাহা হইলে আমি নারীর নির্ভয় নিরাপদ অবস্থাই নির্বাচন কবিব।"

হিন্দু মহাসভা সুরাটের অধিবেশনে যাহা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে রাজনীতির সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্ক অল্প প্রস্তাবেরই ছিল।

লালা লজপৎ রায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ উপলক্ষে পুলিশের যেরূপ বেআইনি আক্রমণের ফলে লালাজীর মৃত্যু হইয়াছিল তাহার প্রতিবাদ ও নিন্দা প্রথম প্রস্তাবে ছিল। পঞ্জাব গবর্নমেন্ট ও ভারত গবর্নমেন্ট লাহোরে পুলিশের উক্তরূপ অত্যাচার সম্বন্ধে স্বাধীন অনুসন্ধান প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় তাহার নিন্দা ছিল। ইহা ছাড়া নেহরু রিপোর্টের মুসলমান দাবি সম্বন্ধীয় অংশ বিষয়ে একটি প্রস্তাব ছিল।

বাকি সকল প্রস্তাব হিন্দু সংগঠন, ভারতের সহিত বৃহত্তর ভারতের পুনঃযোগস্থাপন, লালাজীর স্মৃতিরক্ষা, বিদেশি বর্জন, দেশি ব্যবহার, সর্বসাধারণেব শিক্ষা, অস্পৃশ্য জাতিদের সমান অধিকার ইত্যাদি বহু বিষয় লইয়া। একটি বড়ো কথা তাঁহারা বলেন, "এই মহাসভা এই মত প্রকাশ করিতেছেন যে, জাতি-নির্বিশেষে প্রত্যেক হিন্দুর সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সমান।"

আজিকার হিন্দু মহাসভা রামানন্দের নাম স্মৃতিফলক হইতে হয়তো মুছিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যখন হিন্দু মহাসভার বিশেষ দুর্দিন ছিল, যখন হিন্দু সংগঠনের জন্য এবং রাষ্ট্রক্ষেত্রেও হিন্দু স্বার্থরক্ষার জন্য এই উপবীতত্যাগী হিন্দুর দৃঢ় নায়কতা ভিন্ন উপায় ছিল না, তখনকার দিনের কথা স্মরণীয। হিন্দু মহাসভার পাশে যখন রামানন্দ আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখনকার কথা হিন্দু মহাসভার কর্মী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কিছু লিখিয়াছিলেন। সুনীতিবাবু বলেন : "সত্য ও ন্যায়ের সেবক হিসাবে, অত্যাচারিত ও নিপীড়িতের প্রতি তাঁহার দরদ যে থাকিবে তাহা স্বাভাবিক ; এবং এই দরদের বশেই তিনি শেষে ধীরে ধীরে, ভারতের স্বাধীনতাকামী কংগ্রেসের সহিত সম্পূর্ণ আদর্শগত ঐক্যমত বজায রাখিয়া হিন্দুর প্রতি অন্যায় ও অবিচার এবং হিন্দু ন্যায়সংগত অধিকারের হানির বা বিলোপের চেষ্টার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হিন্দু মহাসভার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঘরের ছেলে রামানন্দবাবু উপবীত ত্যাগ করিয়া যৌবনে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন ;...(কিন্তু) রামানন্দবাবুর মনে কোনো গোঁড়ামি বা superiority complex অর্থাৎ আত্মগৌরবের গূঢ়ৈষণা দেখা দেয় নাই। এদিকে হিন্দুর মহাসভার দ্বারা গৃহীত 'হিন্দু' নামের সর্বঙ্কর সংজ্ঞা, ওদিকে [দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, শিবনাথ ও] স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সুযুক্তিপূর্ণ নির্দেশ যে ব্রাহ্মসমাজ বিরাট হিন্দু সমাজেরই এক অচ্ছেদ্য অংশ, এবং সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দবাবুর মনে হিন্দু ইতিহাস, হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু কৃতিত্বের প্রতি সত্যনিষ্ঠ, ঐতিহাসিকতাবোধযুক্ত শ্রদ্ধা ; তাহার উপরে এক দিকে ভেদনীতিমূলক ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মুসলমানপ্রীতির উদ্দেশ্যে হিন্দু-দলন রীতি, মুসলমান সমাজের একটি মুখর অংশের হিন্দু-বিরোধী মনোভাব,

এবং হিন্দুদের মধ্যে সংহতি-শক্তির অভাবে রাষ্ট্রের একতার পক্ষে প্রতিকূল এই সব শক্তির সমক্ষে অসহায়তা ; এই সব দেখিয়া, কর্মী ও বস্তুতান্ত্রিক রামানন্দবাবু কেবল গগনবিহারী আদর্শের বুলি আওড়াইয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন নাই ; হিন্দু মহাসভার সহিত সহযোগিতা করা ছাড়া তাঁহার মতো ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে আর কিছুই সম্ভবপর ছিল না; তিনি হিন্দুজাতির এই গুরুত্বপূর্ণ আপৎকালে 'দাঁড়িয়ে দেখি তফাতে' বলিয়া সরিয়া দাঁড়াইবার লোক ছিলেন না ; 'বাঙ্গালা দেশে হিন্দু হিন্দুকে রক্ষা করিতে চাহে না, হিন্দুর হইয়া একটা কথা বলিবার কেহ নাই, সকলেই উদার-হৃদয়, মুখে বড়ো বড়ো বুলি আওড়ায়'; এ অবস্থা দুঃস্থের প্রতি দরদী রামানন্দবাবুর সহ্য হইল না। হিন্দু মহাসভা 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু'র মতো দুইখানি প্রভাবশালী কাগজে রামানন্দবাবুর মতো কর্মী ও মনীষীর পুরা সহযোগ পাইয়া আরও শক্তিশালী হইল।...হিন্দু মহাসভা সম্পর্কে রামানন্দবাবুর সম্পাদকীয় মন্তব্যসমূহ, এবং সাধারণ্যে তাঁহার কার্যাবলী, তাঁহার ব্যক্তিত্বকে সমুদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছিল। এখানে কর্তব্যের সঙ্গে বিশেষ গঞ্জনা ও ভীতির সমাবেশ ছিল ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রতিরোধ-শক্তি আরও কার্যকরী হইয়াছিল। মধ্যে কংগ্রেসের পরিচালকদের মধ্যে অনেকেই মোসলেম-লিগ প্রমুখ ভেদনীতিমূলক মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের খুশি রাখিবার আশায়, হিন্দুর প্রতি নানাবিধ অত্যাচার, হিন্দুর 'চোটি বেটি রোটির' প্রতিকূলে অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান, হিন্দু নারী: মর্যাদা এবং হিন্দুর অর্থনৈতিক জীবনের বিরুদ্ধে অভিযানের কথা অস্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন। ইহার ফলে, এক প্রকার অভূতপূর্ব ক্লৈব্য আসিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হিন্দুদের মধ্যে দেখা দিতেছিল। ইহার প্রতিকার করা স্বরাজ সাধনের পথেরই একটি অবশ্য-পালনীয় অঙ্গ বলিয়া রামানন্দবাবুর নিকট প্রতিভাত হয়। বিগত কয় বৎসর ধরিয়া 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু'র সম্পাদকীয় টিপ্পনী এবং বিভিন্ন লেখকের ও স্বয়ং রামানন্দবাবুর প্রবন্ধ, হিন্দু মহাসভার সময়োপযোগিতা ও সার্থকতার অকাট্য প্রমাণরূপে, ঐতিহাসিক নথিপত্রের ভাণ্ডারে চিরতরে সংরক্ষিত হইয়া রহিয়াছে।

হিন্দু মহাসভার কার্য সম্পর্কে রামানন্দবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল। ডাক্তার মুঞ্জে. ভাই পরমানন্দ, বিনায়ক দামোদর সাভারকর প্রমুখ মহাসভার নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে যে কতটা আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা দেখিবার মতো ছিল। তিনি কেবল হিন্দু মহাসভার নেতাদের নহে—সকল সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর দেশ-হিতৈষী ও কর্মীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেন। হিন্দু মহাসভার ময়মনসিংহ অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন,...অবস্থা-গতিকে আমাকে সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছিল। সেখানে হিন্দু মহাসভার বিরোধী দল,...মহাসভার অধিবেশন পণ্ড করিবার চেষ্টায় ছিলেন, রামানন্দবাবুর সুযুক্তি তাঁহাদের নিকট অগ্রাহ্য ছিল—এমন কী সেখানে মারামারিরও সম্ভাবনা ছিল ; প্রবীণ রামানন্দ বাবুর শান্ত ও ধৈর্যপূর্ণ সাহস সেদিন আমাদের সকলেরই বিশেষ প্রশংসাপূর্ণ শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল।...রামানন্দবাবু ১৩৩৫ সালে (যখন) সুরাটে যান, তাঁহার সহিত একত্রে ভ্রমণ করিবার সুযোগ হইয়াছিল...আমার।...হিন্দু মহাসভার সভাপতি বলিয়া সর্বশ্রেণীর হিন্দুর কাছে রামানন্দবাবুর বিপুল সংবর্ধনা দেখি। তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল, এবং পত্রিকা মারফৎ তাঁহার দেশসেবার সর্বজন-স্বীকৃত খ্যাতি, সেবারের হিন্দু মহাসভার অধিবেশনকে বিশেষ একটা মর্যাদা দিয়াছিল।"

হিন্দু মহাসভার কর্মী ভাই পরমানন্দ রামানন্দকে ভারতের চিন্তানায়কদের মধ্যে উচ্চ স্থান দিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রাচীন ভারতে যখন কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কিম্বা

পত্রিকাদি ছিল না তখন ব্রাহ্মণ অথবা সন্ন্যাসীরাই সমাজ ও রাষ্ট্রকে তাঁহাদের চিন্তানায়কত্ব ও উপদেশের দ্বারা সুপথে চালনা করিতেন। বর্তমানকালে সেই মুষ্টিমেয় চিন্তানায়ক ব্রাহ্মণদের স্থান সংবাদপত্রসেবী ও বক্তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠজনেরা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারাই এখন দেশের চিন্তানায়ক। রামানন্দ তাঁহাদেরই মধ্যে একজন। পরমানন্দ বলেন,

"His Modern Review in a very short time became a renowned magazine within the country and even beyond it The views that were expressed in the editorial notes by himself contained important principles on almost all questions current in the country and these views amounted to the sayings of a great savant The M. R. was started with a great mission before it and all those who studied the journal would appreciate the fact that Babu Ramananda Chatterjee fulfilled that mission and maintained its prestige till the end of his life A nation's worth is judged only by a number of great persons who are born in it Such men are very rare and undoubtedly Babu Ramananda Chatterjee was one of them He belongs to the class to which belonged Babu Bankimchandra Chatterjee, the first graduate of the Calcutta University, and which is a way, can claim Swami Vivekananda as its chief exponent They differed from the ordinary run of leaders as it was they who created an awakening in the national life of Bengal and also of Hindu India They both placed the glory of the ancient Hindus as their ideal and devoted their learning and energy for its revival. They both may be said to be the forerunners of the Hindu-unification movement in the country.

In recent times Babu Ramananda had a similar mission for himself and he can be named as the third important person in that list."

ভাই পরমানন্দ হিন্দু ভারতের জাগৃতির কার্যে, প্রাচীন ভারতের আদর্শ ও গৌববকে স্মরণে রাখিয়া, যাঁহারা স্ব-স্ব শক্তি ও বিদ্যা উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রামানন্দকে প্রথম তিনটি স্থান দিয়াছেন। হিন্দু সংগঠনের উদ্দেশ্যে হিন্দু মহাসভার সভাপতিপদ যেরূপ দুর্দিনে রামানন্দ গ্রহণ করেন তাহাতে তাঁহার আশ্চর্য সাহস ও আত্মবিশ্বাস দেখিয়া ভাই পরমানন্দ বিস্মিত হন। তিনি বলেন,

"If we look deeply into the matter we will find that in those days in Bengal it required great courage and self-confidence for a man to come in the field with a flag of Hindu Sangathan in his hands"

সুরাটে কয়েকশত হিন্দু নারী রামানন্দকে একটি স্বতন্ত্র সভায় নিমন্ত্রণ করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডা. রায়জী তাঁহার গৃহে হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিদের 'গরবা' প্রভৃতি দেখান। ফিবিবার পথে লেডি বিদ্যাগৌরী রমনভাই-এর গৃহে অতিথি হইয়া তিনি ও তাঁহার সঙ্গীরা আহমদাবাদ ও সাবরমতীতে গান্ধীজির আশ্রম দেখেন। গান্ধীজির সহিত অন্যান্য কথার মধ্যে 'ইন্ডিয়া ইন্ বন্ডেজে'র কথাও হয়। গান্ধীজির আশ্রম দর্শন করিযা অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া তিনি গুজরাট বিদ্যাপীঠ দেখিতে যান। গুজরাট বিদ্যাপীঠ, প্রার্থনা সমাজ, ভাষা-বিজ্ঞানবিদদের পরিষদ প্রভৃতি নানাস্থানে জনাকীর্ণ সভায় রামানন্দকে বক্তৃতা করিতে হয়। পথে আবু রোডে আর্য সমাজে ও আজমীরের কোনো কোনো সভায় বহু লোকের ভীড়ের মধ্যে বক্তৃতাদি করিতে হয়। সুরাট যাইবার পথে পদমরাজ জৈন মহাশয় প্রভৃতি অনেকে তাঁহার বিশেষ যত্ন করেন।

সাবরমতী, গুজরাট বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি দেখিতে শ্রীযুক্ত আম্বালাল সারাভাই মহাশয়ের এক কন্যা বিশেষ সাহায্য করেন। তাঁহাদের গাড়িতে সারাভাই-পত্নী রামানন্দকে তাঁহার পারিবারিক বিদ্যালয় দেখাইয়া সাবরমতী নদীর পরপারে গান্ধীজির আশ্রম দেখিতে পাঠান। সারাভাই মহাশয় খুব ধনী লোক। তাঁহার পত্নী শুধু নিজের সন্তানদের জন্য বিদ্যালয়টি করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বিষয় শিখাইবার জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষক ও আলাদা কক্ষ করা হইয়াছিল। সাধারণ সব শিক্ষণীয় বিষয় ছাড়া চিত্রাঙ্কন, গীতবাদ্য ও নৃত্য শিখাইবার শিক্ষক, মাটির বাসন ও রেলগাড়ির এঞ্জিন প্রস্তুত করিতে শিখাইবার কয়েকজন লোক ছিলেন। বিদ্যালয় দেখিয়া রামানন্দ খুশি হন। তিনি বলেন, 'ইহা অপেক্ষা অনেক বেশি টাকা ঢালিলেও এরূপ একটি বিদ্যালয় হইত না, যদি তাহার পশ্চাতে মাতার বুদ্ধি, স্নেহ, সদা-অবহিত মন ও শ্রম না থাকিত।'

এখান হইতে সাবরমতী গিয়া শোনা গেল, তিনটার পূর্বে মহাত্মাজীর সহিত দেখা হইবে না। কেহ কেহ বলিলেন, নাম পাঠাইয়া দিলে দেখা হইতে পারে। কিন্তু রামানন্দ নিজ নামের সুবিধা চালাইবার মতো লোক ছিলেন না, তিনি মহাত্মাজীর কাজের ক্রম ভাঙিতে না চাহিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আশ্রম দেখিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ দেখা গেল, গান্ধীজি একটি গামছা মাথায় দিয়া আসিতেছেন। নিকটে আসিতেই পরস্পরের নমস্কার-বিনিময়ের পর গান্ধীজি বলিলেন, "দূর হইতে নগ্ন মস্তক দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম কয়েকজন বাঙালি দর্শক আসিয়াছেন, কাছে আসিয়া আপনাকে চিনিলাম।" কয়েকটি শিশু 'বাপু' বলিয়া গান্ধীজিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। গান্ধীজি বলিলেন, 'কবে আসিলেন, কতদিন থাকিবেন?' রামানন্দ কালই যাইবেন শুনিয়া গান্ধীজি বলিলেন, 'ইহা আহমদাবাদের প্রতি ও আমার প্রতি বড়ো অবিচার।' পরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, "আমি ইন্ডিয়া ইন্ বণ্ডেজ সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মদেশে ঘুরিতেছি, ভারতবর্ষে ঘুরিয়াছি, এখনও পড়িবার সময় পাই নাই...আমায় দয়ার পাত্র মনে করিবেন।"

রামানন্দ তাঁহার সঙ্গী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও কালিদাস নাগের পরিচয় দিয়া বলিলেন, 'ইহারা বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য সুরাটে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন কিন্তু হিন্দু মহাসভার মণ্ডপে সকলে লাঠি খেলা দেখিতে ব্যস্ত থাকায় বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে লণ্ঠন-বক্তৃতার আয়োজন হইয়া উঠে নাই।' তাহাতে গান্ধীজি হাসিয়া বলিলেন, 'আজকাল লোকদের লাঠির দিকেই দৃষ্টি বেশি বটে।' গান্ধীজি রামানন্দকে সদলে আশ্রমে স্নানাহার করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু গুজরাট বিদ্যাপীঠ দেখা বাকি ছিল এবং লেডি রমনভাই হয়তো অতিথিদের অপেক্ষায় অভুক্ত আছেন বলিয়া ইঁহারা কিছুক্ষণ পরেই বিদায় লইলেন। রামানন্দ যাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতেন তাঁহার সম্মান সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকিতেন।

গুজরাট হইতে ফিরিবার পথে আবু পাহাড়ের দিলওয়ার মন্দিরের সিংহদ্বারে একটা ছাপা ইংরেজি ইস্তাহার দেখিয়া রামানন্দ লেখেন, "লেখা আছে, ভারতীয় দর্শক যেন জুতা খুলিয়া যান এবং নিজ নিজ দেবমন্দিরে যেরূপ সশ্রদ্ধ আচরণ করেন, এখানেও যেন সেইরূপ করেন। ইউরোপিয়দিগকে শ্রদ্ধাবান হইতে বলা হয় নাই—কারণ সর্বত্র ভক্তিপ্রণত হওয়াটা তাহাদেরই বিশেষত্ব।"

রেলের আর্যসমাজী কর্মচারীরা তাঁহাদের বিশেষ যত্ন করিয়া আবু রোড স্টেশনে তাঁহাদের জন্য ট্রেনে একটি ফার্স্ট ক্লাস গাড়ি জুড়িয়া দেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান ছিল না। সকলপ্রকার সৌজন্য রামানন্দ মনে রাখিতেন ও কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেন।

'ইন্ডিয়া ইন্ বন্ডেজ'

১৯২৮-এর ২১ ডিসেম্বর রামানন্দ প্রথম "ইন্ডিয়া ইন্ বন্ডেজ, হার রাইট টু ফ্রিডম্" পুস্তকের ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহা ভারতবন্ধু আচার্য সান্ডারল্যান্ড লিখিত। মাত্র দুই হাজার বই ছাপা হইয়াছিল, দেড় মাসের মধ্যে প্রায় সমস্ত বিক্রয় হইয়া ছয়শত আন্দাজ বাকি থাকে। ভারতবর্ষের পরাধীনতায় ভারতের, ব্রিটেনের, সমুদয় পৃথিবীর কি অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা এই পুস্তকে দেখান হইয়াছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভের বিরুদ্ধে যত কুযুক্তি উত্থাপিত হয়, তাহা ইহাতে খণ্ডিত হইয়াছিল। ভারতীয় ৮।৯টি ভাষায় ইহা অনুবাদ করিবার অনুমতি অনেকে চান।

অল্পদিনেই তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ কিছু বিক্রি হইয়া যাইবার পর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মে তারিখে অকস্মাৎ কলিকাতা পুলিশ প্রবাসী কার্যালয় ও প্রবাসীর সম্পাদকের বাড়ি খানাতল্লাসি করিয়া 'ইন্ডিয়া ইন্ বন্ডেজ' নামক পুস্তকের চুয়াল্লিশখানি কপি লইয়া যায় এবং রাজদ্রোহ অপরাধে উক্ত পুস্তকের মুদ্রাকর ও প্রকাশককে গ্রেপ্তার করে। মোকদ্দমা তৈয়ারি করিবার জন্য সরকারপক্ষ ১২ জুন পর্যন্ত সময় লন। ইতিমধ্যে ৬ জুন তারিখে রাজদ্রোহ অপরাধে পুলিশ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করে।

তৎক্ষণাৎ খবরের কাগজে এই সংবাদ সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। মহাত্মা গান্ধী এই খানাতল্লাসির কথা শুনিয়া এত আশ্চর্য হন যে, তিনি তখনই বিস্তারিত বিবরণ জানিবার জন্য রামানন্দের নিকট টেলিগ্রাম করেন। এই টেলিগ্রামের উত্তরে রামানন্দ তাঁহাকে যে পত্র লেখেন তাহাতে সমস্ত ব্যাপার জানিয়া খানাতল্লাসি সম্বন্ধে মহাত্মা তাঁহার অভিমত সেই সময়ই ৬ জুন তারিখের 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। রামানন্দ তাঁহার পত্রে পুলিশের কর্মচারীরা ভদ্র ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া লিখিয়াছিলেন, কারণ পুলিশকেও তিনি মিথ্যা নিন্দার ভাগী করিতে চাহিতেন না। মহাত্মা এই কথার উল্লেখ করিয়া বলেন, "পুলিশের কর্মচারীরা ভদ্র ব্যবহার করিয়াছে, সেজন্য তাহারা ধন্যাবাদার্হ। ভদ্র ব্যবহার না করিলেই নিরতিশয় অন্যায় হইত। কিন্তু খানাতল্লাসি ভদ্রভাবে হইলেও খানাতল্লাসিই। এই খানাতল্লাসির কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদকদের মধ্যে নগণ্য ব্যক্তি নহেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক। তাঁহার ও তাঁহার পত্রিকার নাম সমস্ত জগতে পরিচিত। 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকা ঠিক সংবাদ দিবার জন্য এবং মতামতের সমীচীনতার জন্য বিখ্যাত। এই উচ্চাঙ্গের পত্রিকাটিতে ভারতবর্ষের বিখ্যাত লেখকেরা লিখিয়া থাকেন। এই খানাতল্লাসির কি কারণ দেখান হইয়াছে? যদি 'ইন্ডিয়া ইন্ বন্ডেজ' রাজদ্রোহপূর্ণ হয় তবে তাহার প্রকাশকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনা হউক। কিন্তু মোকদ্দমার জন্য পুলিশের যে-সকল সংবাদের প্রয়োজন ছিল তাহা এইরূপ নাটকীয় অভিনয় না করিলেও পাওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু বর্তমান গবর্নমেন্ট এই সব নাটকীয় অভিনয়ই চায়। কোনো ভারতবর্ষীয় যত বড়োই হউক না কেন, তাহার মাথাও মাঝে মাঝে নোয়াইয়া দিতে হইবে—পাছে সে তাহার অবস্থার কথা ভুলিয়া যায়।...সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে মাঝে মাঝে অবমাননার দৃশ্য দেখা যাইত। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ি খানাতল্লাসি...যেন সেই অভিনয়েরই পুনরাবৃত্তি।"

উপরে উদ্ধৃত মত প্রকাশের সময় মহাত্মাজী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারের কথা জানিতে পারেন নাই। শুধু খানাতল্লাসির খবরেই মহাত্মা এইরূপ মত প্রকাশ করেন।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারের পর তাঁহার ও মুদ্রাকরের নামে মোকদ্দমা হইল। গবর্নমেন্টের পক্ষে ছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ সরকার এবং রামানন্দের পক্ষে নিশীথচন্দ্র সেন, বি সি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যারিস্টারগণ। রামানন্দের ব্যারিস্টাররা বলিয়াছিলেন, 'প্রকাশক— আর. চ্যাটার্জি একটা ফার্মের নাম মাত্র। আপনি যদি তাহা বলেন, তবে আপনার কোনো শাস্তি না হইতে পারে।' কিন্তু যখন আদালতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "আপনি এই বই নিজে ছাপাইয়াছেন কিনা।" তখন রামানন্দ বলিলেন, "হাঁ, আমি নিজেই এই বই ছাপাইয়াছি।"

মোকদ্দমায় প্রকাশক ও মুদ্রাকরের দুই হাজার টাকা জরিমানা হয়। এই দুই হাজার টাকা রামানন্দকে দিতে হয়। যতগুলি বই বিক্রি হইতে বাকি ছিল তাহা সমস্তই বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাহা আন্দাজ ৪৫০ খানা।

ইহার কিছুদিন পরে রামানন্দ লেখেন,

"মিস্ মেয়ো অসৎ উদ্দেশ্যে কখনো বা সম্পূর্ণ মিথ্যার আশ্রয় লইয়া, কখনো বা আংশিক সত্যকে বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করিয়া হিন্দুদিগকে অতি অধম বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে।...কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতে ইহার প্রচার বন্ধ করেন নাই।...

"অন্যদিকে আচার্য সান্ডার্ল্যান্ডের 'ইন্ডিয়া ইন্ বন্ডেজ' বহিখানি ভারতবর্ষের লোকদের স্বরাজ পাইবার অধিকার ও যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য লিখিত হইয়াছে। ..ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের নিন্দা করা বহিখানির মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। ইংলন্ডের কোনো ধর্মের, কোনো সামাজিক প্রথার নিন্দা ইহাতে নাই, ইংরেজ পুরুষ বা নারীদের চারিত্রিক কুৎসা ইহাতে নাই...ইংরেজ জাতিকে হেয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা ইহাতে নাই। বরং গ্রন্থকার স্পষ্টাক্ষরে ইহাতে লিখিয়াছেন যে, তিনি আমেরিকার নীচেই ইংলন্ডকে ভালবাসেন...তাঁহার মতে দুটি ইংলন্ড আছে। ম্যাগ্না কার্টার ইংলন্ড, মিল্টন, পিম হ্যামডেনের ইংলন্ড, আমেরিকান উপনিবেশগুলির প্রতি ন্যায্য ব্যবহারপ্রার্থী পিট ফক্স বার্কের ইংলন্ড.. এবং শ্রমিকদলের অনেক সভ্যের ইংলন্ডকে তিনি ভালবাসেন লিখিয়াছেন।...কিন্তু তাঁহার বহি এই শ্রমিক দলেরই আমলে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, ইহা ঐতিহাসিক ক্রুর পরিহাস।

"সান্ডার্ল্যান্ড সাহেবের উদ্দেশ্য যে মন্দ ছিল, তাহা প্রমাণ কবিবার কোনো চেষ্টা সরকারপক্ষ হইতে করা হয় নাই। তিনি যে সব কুফল ও দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যে মিথ্যা তাহা প্রমাণ করিবার কোনো চেষ্টাও গবর্নমেন্ট পক্ষ হইতে করা হয় নাই। কেবল এই বলা হইয়াছে, যে, লেখক ও প্রকাশকের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, বহিটির দ্বারা গবর্ণমেন্টেব প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ উৎপাদিত হইয়াছে ও হইতে পারে। সেইজন্য গ্রন্থখানির প্রকাশক দণ্ডিত এবং বহিখানি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। ইহার মানে এই, যে, প্রবল জাতির কতকগুলি লোকের রাষ্ট্রনৈতিক, ও অর্থনৈতিক সত্য দোষ দেখানও মহা অপরাধ, কিন্তু দুর্বল সমগ্র জাতিকে মিথ্যার সাহায্যে ধর্মসমাজ, রাষ্ট্রনীতি, চরিত্র প্রভৃতি সকল দিক দিয়া হেয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা অপরাধ নহে।"

হাইকোর্টে আপিল করিবার ইচ্ছা রামানন্দের ছিল না। কিন্তু কেহ কেহ করিতে বলেন। সে সময় পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কলিকাতায় ছিলেন। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে রামানন্দ যেন তাঁহার সহিত দেখা করেন। সেই মোকদ্দমার রায় লইয়া ব্যারিস্টার নিশীথচন্দ্র সেন ও রামানন্দ পণ্ডিতজীর সহিত দেখা করিতে যান। হোটেলে তাঁহার সহিত দেখা হইবামাত্র তিনি হাসিয়া বলিলেন, "So you have got it !" তাহার পর রায়টা লইয়া ভাল করিয়া পড়িলেন। পড়া শেষ হইবার পর হাসিয়া বলিলেন "As a lawyer I would not advise

you to appeal. As a politician I should like you to appeal" তাহার পর বলিলেন, আপিলে ম্যাজিস্ট্রেটের রায় উল্‌টিয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব কম, নাই বলিলেও চলে। 'ইন্ডিয়া ইন্‌ বন্ডেজে'র মুদ্রাকর হাইকোর্টে আপিল করেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতি ও অন্য দুইজন জজ একত্র বসিয়া আপিল নামঞ্জুর করেন।

কিছুকাল পরে প্যারিসে ফ্রেঞ্চ ভাষায় 'ইন্ডিয়া ইন্‌ বন্ডেজে'র অনুবাদ প্রকাশিত হয়। আমেরিকাতেও দুইটি সচিত্র সংস্করণ বাহির হয়। ইংলন্ডে একটি বাহির হইতেছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহা বন্ধ করিয়া দেন।

ডা. জে. টি. সন্ডারল্যান্ড

রামানন্দ বলিতেন, 'ভারতের বাহিরে কোনো দেশে ডা. জে. টি, সন্ডারল্যান্ডের অপেক্ষা বড়ো ভারতসুহৃদ কেহ ছিলেন না। কোনো বিদেশি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভারতকে এমন করিয়া ভালোবাসেন নাই এবং ভারতের হিত চেষ্টায় এমন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন নাই।'

ইহার সহিত ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদে রামানন্দের প্রথম পরিচয় হয়। তিনি তখন British and Foreign Unitarian Mission-এর পক্ষ হইতে ভারতের সমাজ ধর্ম শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে লিখিবার উদ্দেশে ভারত ভ্রমণে আসেন। সেই সময় ভারতের সমাজসংস্কারক ও ব্রাহ্ম সমাজের কর্মীদের সহিত তাঁহার যোগ হয়। রামানন্দ তখন কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষ। কায়স্থ পাঠশালার হলে সন্ডারল্যান্ডের তেজস্বী ও বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা রামানন্দ কখনো ভোলেন নাই। তখন হইতেই বন্ধুত্বের সূত্রপাত। এই বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হয়। সন্ডারল্যান্ড জীবনের শেষ বৎসর পর্যন্ত *M. R.* এর নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি সম্পাদকের সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মতো সর্বদা পত্রালাপ করিতেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি শেষবার ভারতে আসেন এবং আচার্য জগদীশচন্দ্রের অতিথি হন। ইঁহার ভারত-দর্শন বিষয়ে শ্রীযুক্ত চমনলাল বলেন,

> "He recalled with great pleasure his visit to India, and his association with social workers in India, especially the veteran journalist Sjt. Ramananda Chatterjee, of whose friendship he was very proud."

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দের সত্তর বৎসর-পূর্তি উপলক্ষে তাঁহাকে একটি জয়ন্তী উৎসর্গপুস্তক (Birthday volume) উপহার দিবার প্রস্তাব তাঁহার অনুরাগীরা করেন। এই কমিটির সম্পাদক ডা সুরেশচন্দ্র রায়ের অকাল-মৃত্যুর জন্য সেই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই। সেই সময় সন্ডারল্যান্ড মহোদয় লেখেন,

> "Is there any man who during the last fifty years has done more and political advancement and uplift of India than Ramananda Chatterjee? If so, I do not know who he is. Mr. Chatterjee has been able to achieve so much partly because of his rare gifts as a thinker, teacher, writer and leader of men ; partly because of his unsurpassed and absolutely unselfish devotion to the higher interests of his country, and, what is of great importance, because he chose for his calling in life, for the instrument through which to do his work and influence other, the great profession of journalism
>
> ...I have been acquainted with the Modern Review for the last 28 years ; and I do not hesitate to say that this unique and able monthly

has been a perpetual wonder to me, on account of the breadth and wealth of its contents....Indeed, I know of no other periodical that so fully and adequately represents the real India...But it does not stop with India....It passes on the takes actually and whole world for its field....

I speak with care when I say that we do not have in America, nor is there in England, any review or magazine that covers so wide a field, and that does it with such accuracy of scholarship and so interestingly. For all these reasons, I regard the M. R. under the conspicuously wise and able editorship of Mr. Chatterjee, as an absolutely invaluable asset to India, and, at the same time, as a messenger from India to the outside world the importance of which can hardly be overestimated."

১৯৩৪-এ সন্ডারল্যান্ড মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এই জাতীয় একটি চিঠি লেখেন, তাহার শেষটুকু দিলাম :

My dear M. Chatterjee, I trust you will pardon these frank words from me, which I am sure will surprise you. But my personal debt to your able monthly is so great that I could not forgive myself if I refrained longer from expressing them.

New York. Sincerely,
September 1, 1934. J. T. Sunderland

সমগ্র ভারতে নিমন্ত্রণ ও নানা প্রসঙ্গ

রামানন্দ ইউরোপ ভ্রমণের পূর্বে নিজের সম্পাদকতার কাজ ছাড়িয়া বেশি কোথাও যাইতেন না। নানা দেশে ঘুরিবার কাজ তিনি ষাট বৎসর অতিক্রম করার পর আরম্ভ করিলেন।

১৯২৬-এ ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর তিনি ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের নানা শহর ও গ্রাম হইতে বিগত সতের-আঠার বৎসর এত বেশি নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন যে অত বড়ো কর্মী হইয়াও একমাত্র তিনি বলিয়াই তাহার অধিকাংশ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কত জায়গায় কী কাজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাতে দেশের সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কী কী উন্নতি হইয়াছে, স্বাধীনতার সংগ্রামে কত রসদ তিনি জোগাইয়াছেন, তাহার কোনো হিসাব তিনি রাখেন নাই, অপরেও রাখে নাই। তিনি কোনো দলের লোক ছিলেন না বলিয়া সংবাদপত্রের লোকেরা তাঁহারা কর্মজীবনের পরিচয় সাধ্যমত দিতেন না, তবু এই জাতীয় সংবাদ ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের পুরাতন সংবাদপত্র ঘাঁটিলে কিছু কিছু পাওয়া যাইতে পারে। আমরা কেবল প্রবাসী, মডার্ন রিভিয়ু ও সামান্য কয়েকটি চিঠিপত্রের সাহায্যে কিছু লিখিব। রামানন্দ নিজের বিষয় লিখিতেন না, যেখানে যাইতেন সেখানকার বিষয়েই লিখিতেন। তবু প্রসঙ্গত যেটুকু জানা যায়, সেটুকুও সংগ্রহ হওয়া ভাল। ভ্রমণ ছাড়াও যে সব উল্লেখযোগ্য কাজ তিনি করিয়াছেন, এই সূত্রেই তাহারও উল্লেখ থাকিবে।

১৩৩৪-এর শ্রাবণ মাসে ময়মনসিংহ যুবকসম্মিলনীর সভাপতিরূপে সেখানে গিয়া তিনি নানা জায়গায় যাওয়ার বিষয়ে বলেন,

"যৌবনে যখন আমার শক্তি বেশি ছিল, উৎসাহ ছিল, নানা বিষয় জানবার কৌতূহল ছিল, সেই সময়ে নিজের দেশকে ভালরূপে চেনা জানার চেষ্টা করা আমার উচিত ছিল।...কিন্তু ভাল কাজ না করার চেয়ে দেরিতে করাও ভাল। সেই জন্যে আজকাল

আমাকে দয়া করে কেহ কোনো জায়গায় ডাকলে আমি সেখানে যেতে চেষ্টা করি। আমি উৎসাহ পাই, নূতন জ্ঞান লাভ করি ; নিজের ঘরের কোণে টেবিলের পাশে বসে সেই জ্ঞান পাওয়া যায় না।"

ময়মনসিংহেই বালিকাদের বিদ্যালয় দেখিয়া বলেন,

"মেয়েরা বাড়িতে সংকীর্ণ জায়গায় থাকে, ছেলেদের মতো স্বচ্ছন্দে বেড়াইয়া অঙ্গ চালনা করিতে পারে না ; সুতরাং তাহাদের স্বাস্থ্যও খুব ভাল হয় না। এই কারণে তাহাদেব খেলিবার জায়গা ও ব্যায়ামাগার ছেলেদেব চেয়েও প্রশস্ত ও উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত।"

বালিকাদের স্বাস্থ্যের কথা বালকদের চেয়ে বেশি করিয়া তিনি ভাবিতেন।

১৩৩৩-এর মাঘ মাসে কনিষ্ঠা কন্যাকে দেখিতে রামানন্দ যখন প্রথমবার রেঙ্গুন যান, তখন সেখানকার ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতাদি করেন। সেই হলটিতে তৎপূর্বে কখনো অত জনসমাগম হয় নাই। ইহা ছাড়া লিগ অব নেশনস্ সম্বন্ধে ইংরেজি বক্তৃতাও করেন। সভাপতি ছিলেন সেখানকার জাতীয় দলের নেতা ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত উ পু। তিনি এত বেশি সভায় ও প্রতিষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হন যে সে মাসে *M. R.*-এ notes লিখিবার সময় পান নাই।

বাংলা ১৩৩৩ সালে মেদিনীপুর সাহিত্যসভা, পাণ্ডুয়া, রাজশাহি, নওগাঁ, মানিকগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া যান এবং নানা সভা হইতে অভিনন্দন পান।

অন্যান্য শহর হইতে যেমন ডাক আসিত তাঁহার জন্মভূমি বাঁকুড়া হইতেও সেইরূপ ডাক আসিতে লাগিল। বাঁকুড়ায় ১৩৩৪-এ অভয় আশ্রম লাইব্রেরির বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিরূপে গিয়া তিনি বাঁকুড়ার অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানেরও অভিনন্দন পান। তাঁহাকে শোভাযাত্রার সহিত আশ্রমে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানের অভয় আশ্রম মেথর-পাড়ায় কতকগুলি ছেলেকে শিক্ষা দিত। সেই ছেলেরা "বাংলার মাটি বাংলার জল, পুণ্য হউক" ইত্যাদি গানটি করাতে রামানন্দ বলেন, "সত্যি মাটি যাদের দ্বারা পুণ্য হতে পারে, তাদের আমরা দূরে রেখেছি।"

আমাদের দেশের সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশসমূহের জ্ঞান তো খুবই কম। তাহার উপর আবার শ্বেতজাতির অনেকে ইচ্ছা করিয়া আমাদের দেশের সম্বন্ধে মিথ্যা, অর্ধসত্য, অন্যায় সংবাদ ও তথ্যের প্রচার করেন। বামানন্দ এই জাতীয় জিনিস দেখিলেই তাহার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতেন এবং প্রকাশ্য সভায় বলিতেন।

শিবাজী ভারতবর্ষের গৌরবস্থল ছিলেন নানা কারণে। তাঁহার ত্রিশত বার্ষিক জন্মোৎসব হয় ভারতবর্ষের নানা স্থানে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রীষ্মকালে। এই সময় কলিকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে যে বিরাট সভা হয় তাহাতে রামানন্দ নানা কথার ভিতর একটি বিশেষ দিকে ঝোঁক দেন। তিনি বলেন "কোনো কোনো ইংরেজ ঐতিহাসিক শিবাজীর প্রতি ন্যায়-বিচার করিলেও, ইংরেজি বিশ্বকোষগুলি এখনও তাঁহার প্রতি অবিচার করিতেছে।" তিনি ইংরেজি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ও চেম্বার্স এনসাইক্লোপিডিয়াতে শিবাজীর সম্বন্ধে যে-সমস্ত ভ্রম আছে তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, "শিবাজী-উৎসবের সভাসমূহ হইতে সভাপতিদিগের স্বাক্ষরযুক্ত এক-একখানি চিঠিতে ইংরেজি বিশ্বকোষগুলির ভ্রম নিরসন করিয়া তাহা এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ও চেম্বার্স এন্সাইক্লোপিডিয়ার প্রকাশকদিগকে পাঠান হউক।"

আসামের শিলচরে সুরমা সাহিত্য সম্মেলনে ১৩৩৪-এর ফাল্গুনে রামানন্দ যখন সভাপতি হইয়া যান তখন কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হয়। প্রথম, বাংলা গবর্নমেন্ট

যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস "পথের দাবী" বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব সম্মেলনের বিষয়-নির্বাচন কমিটিতে উপস্থিত করা হয় এবং তর্ক-বিতর্কের পর প্রস্তাবকেরা তাহা প্রত্যাহার করেন। পরে দশজন প্রতিনিধি সম্মেলনের প্রকাশ্য সভায় উহা উপস্থিত করিবার নিমিত্ত একটি আবেদন করেন। সভাপতি রামানন্দ প্রস্তাবটি সম্মেলনের নিকট উপস্থিত করিতে দেন নাই। তিনি বলেন,

> "সম্মেলনটি সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নহে। নানা রাজনৈতিক মতেব লোক ইহাব সভ্য; সরকারি কর্মচাবীরাও ইহার সভ্য। বাজনৈতিক বিষয় সাহিত্যিক-সম্মেলনে আলোচনা কবিবার প্রয়োজন নাই, আলোচ্য সাহিত্যিক বিষয়ের অভাব নাই, বরং খুব প্রাচুর্যই আছে। সাহিত্যিক-সম্মেলনে রাজনীতি ঢুকাইলে তাহা হইতে সরকাবি কর্মচারীদিগকে পরোক্ষভাবে কার্যত তাড়াইযা দেওযা হয়। তাহাতে লাভ নাই, ক্ষতি আছে। সাহিত্যের ভিতর দিয়া সাহিত্যকে উপলক্ষ কবিয়া গবর্নমেন্টের কর্মচারীবাও যদি রাজনৈতিক কর্মীদেব সঙ্গে মিলিত হইযা দেশের এক রকম সেবা করিবাব সুযোগ পান, তাহাতে উপকার বই অপকাব নাই।"

এই উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় বিখ্যাত সাহিত্যিক ও স্বদেশসেবকের নাম সভাপতি করেন। বঙ্কিমচন্দ্র রাজকর্মচারী ছিলেন। রামানন্দ যে গবর্নমেন্ট কর্তৃক এই জাতীয় পুস্তক বাজেযাপ্ত করার বিরোধী ছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণেও লিখিয়াছিলেন,

> "পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সাহিত্য মানুষের অন্তবের পূর্ণ বাহ্য প্রকাশ বলিয়া, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্ম সম্বন্ধীয় বিষযে পূর্ণ আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতার উপব সাহিত্যেব উৎকর্ষ নির্ভর কবে।"

'পথের দাবী'র প্রস্তাবটি সভায় উত্থাপন করিতে না পাওয়ায় এবং সে বিষয়ে বক্তৃতা করিতে না পাওয়ায় কেহ কেহ সভাপতির উপর বিরক্ত হন।

আসাম ভ্রমণের সময় শ্রীহট্টে রামানন্দ 'স্বরাজের আবশ্যকতা ও আমাদের যোগ্যতা' বিষয়ে যে-বক্তৃতা দেন তাহাতে প্রকৃত মানুষ তাহার মনুষ্যত্বের মর্যাদার জন্যই স্বাধীনতা চায়, ইহা প্রধানত বুঝাইয়া ভারতবর্ষের দুঃখ-দারিদ্র্য অপনোদনের জন্যও যে স্বাধীনতা প্রয়োজন তাহা বলেন।

আসামের নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া সেখানে প্রীত, আশান্বিত ও উৎসাহিত হইবার মতো অনেক জিনিস তিনি লক্ষ করেন। সর্বত্রই আদৃত এই অতিথিটির প্রতি সম্মান ও সৌজন্য দেখাইবার প্রচুর আয়োজন হয়। একটি সভায় সভাপতি নির্বাচনের সময় সভাপতির বহু প্রশংসা করিয়া এক বক্তা বলেন, "কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং। বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।" তিনি এই শ্লোকটির সাময়িক প্রয়োগচ্ছলে তাহার প্রথম তিনটি শব্দেরও সঙ্গতি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। তাহার ফলে সভাপতির পৌত্রীকল্পা ও দৌহিত্রীকল্পা সভাসীনা বালিকাদিগকে কিছু পরিহাস সহ্য করিতে হইয়াছিল। সভাপতি স্বয়ং বক্তৃতার সময় সরসভাবে তাহার উল্লেখ করেন।

বাংলা দেশে যখন ভদ্রমহিলা ও বালিকাদের মধ্যে নৃত্য রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির চেষ্টায় পুনঃ-প্রবর্তিত হয় তখন দেশে খুব আন্দোলন হয় এবং অনেকে ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। করা কিছু অস্বাভাবিক হয় নাই, কারণ "ভারতবর্ষে নৃত্যের সঙ্গে এত অশুচি ও অমঙ্গলকর জিনিসের স্মৃতি জড়িত, যে, ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা ইহা দীর্ঘকাল পরিহার করেন।" রামানন্দ শান্তিনিকেতনে গরবা ও অন্যান্য নৃত্য দেখিয়াছিলেন। কলিকাতাতেও গুজরাটি

বালকবালিকাদের বিদ্যালয়গুলির পুরস্কার-বিতরণের বিরাট সভায় একবার কোরিন্থিয়ান থিয়েটারে গরবা নৃত্য হইয়াছিল। এই সভার কথা বলা উপলক্ষে রামানন্দ বলেন,

"আমাদেব মতে সব রকমের নৃত্য অনিষ্টকর ও নিন্দনীয় নহে। কোনো কোনো রকম নৃত্য কেবল যে নিন্দনীয় ও অনিষ্টকর নহে, তাহা নয়, বরং তাহা সুশোভন ও হিতকর।...অভিনয় ও নৃত্য মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ফল। কাহারও শিক্ষা ব্যতিরেকেও শিশুরা নাচে, তালে তালে হাত পা ছুঁড়ে, সুন্দর অঙ্গভঙ্গি করে। অভিনয়ও তাহারা স্বভাবত করে। তাহারা যাহা নয়, তাহা হইবার ভান করে, এবং সেইরূপ কাজ করে, কথা বলে। অভিনয় ও নৃত্য স্বাভাবিক বলিয়া উহাকে মূলত দুর্নীতিবিজড়িত মনে করা যাইতে পারে না।...প্রকারভেদে উহার সুফল কুফল দুই-ই আছে। প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরা যে নানাবিধ নৃত্য করে, তাহাতে ভাল মন্দ দুই-ই আছে।. ধর্মের সঙ্গে নৃত্যের যোগ পুরাকালে নানা দেশে ছিল, এখনও অনেক দেশে আছে। নটরাজ মহেশ্বরের এক নাম, এবং জন্মমৃত্যু সৃষ্টি প্রলয়াদি বিশ্বব্যাপার তাঁহার নৃত্য বলিয়া কথিত হয়।.. অনেক নৃত্যে এরূপ ভঙ্গি আছে, যাহা কুভাবের প্ররোচক। তাহা বাঞ্ছনীয় নহে।.. পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে যত রকম নাচের চলন আছে, তাহাব সবগুলি আমাদের দেশে না-চালানোই ভাল।"

এই বৎসরেই শিলচর, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা প্রভৃতিতে নানা সভায় যোগ দিবার পর ও নানা প্রতিষ্ঠান দেখিবার পর ময়মনসিংহ বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনীতে বিষয়-নির্বাচন কমিটির সভ্য মনোনীত হইয়া তিনি সেখানে যান ও বক্তৃতাদি করেন।

শ্রীহট্টে 'পথের দাবী' বিষয়ে যে-প্রতিবাদটি তিনি সভায় আলোচিত হইতে দেন নাই, পরে ১৯৩৫-এর জ্যৈষ্ঠে তাঁহার নিজ জন্মদিনের পরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই বিষয়ে তিনি বলিয়াছিলেন,

"আমার জীবনের নূতন বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্ব দিন জীবনের অতীত কালের নানা ঘটনা ও অবস্থার কথা ভাবিতেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ শিলচরে সুরমা সাহিত্য-সম্মিলনীতে যে রাজনৈতিক প্রস্তাবটি আলোচিত হইতে দি নাই, তাহার বিষয় মনে পড়িল। মনে হইল, সাহিত্য বিষয়ক সভাতে রাজনৈতিক কোনো প্রস্তাবের আলোচনা সাধারণত অযৌক্তিক ও অনাবশ্যক বটে, কিন্তু রাজনীতি যদি সাহিত্যকে আঘাত করে, তাহা হইলে তাহার প্রতিবাদ করিবার অধিকার সাহিত্যেব অবশ্যই থাকা উচিত।...(বহিটি) গবর্নমেন্ট কর্তৃক রাজনৈতিক কারণেই বিনা প্রকাশ্য বিচারে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। সাহিত্যের উপর গবর্নমেন্টের এই অবিচারিত আক্রমণের প্রতিবাদ সাহিত্যসভার পক্ষ হইতে হওয়া সঙ্গত। আমি যখন সুরমা সাহিত্য-সম্মিলনীতে প্রতিবাদটি আলোচিত হইতে দি নাই, তখন এই যুক্তি আমার মনে উদিত হয় নাই।...আমার ভ্রম হইয়াছিল মনে হইতেছে। তাহার প্রতিকার করিবার সাধ্য এখন আমার নাই।"

সচরাচর মানুষ এমন করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজের ভ্রম বলিয়া এতদিন পরে কোনো জিনিসকে উল্লেখ করে না। নিজের দোষত্রুটি সম্বন্ধে নিজেকে সর্বদা সচেতন রাখিবার অদ্ভুত চেষ্টা রামানন্দের ছিল বলিয়াই তাঁহার পক্ষে এরূপ লেখা সম্ভবপর হইয়াছিল। অথচ সরকারি কর্মচারীরা যে অসুবিধায় পড়িতেন এ কথা তখনও তিনি মনে করিতেন এবং সেইজন্য তাঁহাদের ভোট না-দিবার অধিকার কিংবা অনুপস্থিত থাকিবার অধিকারের কথা ভাবেন।

যখন তিনি শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ কলেজ দেখিতে যান তখন কলেজের ওয়েল্স্ প্রিন্সিপ্যাল মহাশয় তাঁহাকে দেখিয়াই হাসিয়া ইংরাজিতে বলেন, "আমার ধারণা ছিল আপনি ইয়ংম্যান (যুবাপুরুষ)।" তিনি বলিলেন, "তা যে নই, তা তো দেখিতেই পাইতেছেন।" প্রিন্সিপ্যাল হাসিয়া বলিলেন, "কেবল 'মডার্ন রিভিয়ু' পড়িয়া আপনার সম্বন্ধে যা-কিছু ধারণা

হইয়াছে, অন্য কোনো রকমে তো আপনাকে জানিতাম না।" তাঁহার সতেজ লেখনীই প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়ের এই ভ্রমের কারণ।

এই বৎসর ব্রাহ্ম সমাজের শতবার্ষিক উৎসবের বৎসর ছিল। তদুপলক্ষে কলিকাতায় উৎসব হয়। 'প্রবাসী', 'মডার্ন রিভিয়ু' প্রভৃতিতে রামমোহনের পুরাতন লেখা এবং তাঁহার বিষয়ে নানা লেখা প্রকাশিত হয়।

পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের পর রামানন্দের ডাক পড়ে লাহোরে, এলাহাবাদে ও চন্দননগরে পরে পরে বক্তৃতার জন্য। লাহোরের ব্রাহ্মসমাজের দুইজন পরলোকগত ভক্ত ও কর্মী ভাই লালা কাশীরাম ও বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির প্রতি সম্মানার্থ স্থানীয় ব্রাহ্মেরা বাহিরের কোনো লোকের দ্বারা বৎসরে অন্যূন দুটি বক্তৃতা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বক্তৃতাগুলি উক্ত দুই মহাশয়ের নামে অভিহিত হয়। বাংলা ১৩৩৫ সালে মার্চ মাসে বক্তৃতা করিবার ভার রামানন্দের উপর পড়ে। লিখিত বক্তৃতা দুটির বিষয় ছিল, আধুনিক ভারতবর্ষে ধর্মসংস্কারের অগ্রণী (রামমোহন রায়), এবং আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম জাতি-গঠনকারী (রামমোহন রায়)। ব্রাহ্মসমাজে মৌখিক বক্তৃতা, উপাসনা প্রভৃতিও তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। ভারত-ভৃত্য সমিতির লাহোর শাখার উদ্যোগে রাজনৈতিক বক্তৃতাও করিতে হইয়াছিল। লাহোরে নানা কলেজে, ক্লবে ও সভায় তাঁহাকে বক্তৃতা কবিতে হয়। কোনো কোনো সভা তাঁহাকেই অভ্যর্থনা করিবার জন্য হয়। পঞ্জাবের বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সহিত তাঁহার যোগ ছিল। নেতৃস্থানীয় শ্রোতারা বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকাবে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। লাহোরে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যেই অল্পাধিক সজীব ভাব তিনি লক্ষ করেন। আর্য সমাজীদের আয়োজন ও উদ্যোগিতাই ভারতীয়দের মধ্যে বেশি।

দয়ালসিং কলেজের একজন পঞ্জাবি ভদ্রলোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "পঞ্জাবি ছাত্রেরা বাঙালি ছাত্রদের চেয়ে সুস্থ ও বলিষ্ঠ নহে কি?" পঞ্জাবি ছাত্রদের অধিকতর সুস্থতা ও বলিষ্ঠতা রামানন্দের চোখে সুস্পষ্ট ঠেকে নাই। কিন্তু প্রশ্নটি তাঁহার ভালো লাগে নাই। কোনো ভদ্রলোক এই গল্পটি শুনিয়া বলেন, "আপনি কেন বলিলেন না, আপনারা সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইলেও আমাদেরই মতো পরাধীন?" লাহোরের দয়ানন্দ অ্যাংলো-বেদিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁহাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলেন, আজকালকার ছেলেরা স্বাস্থ্য ও বলে তাহাদের পূর্বদের চেয়ে নিকৃষ্ট। সমগ্র ভারতীয় জাতিব্যাপী এই দৈহিক অবনতির প্রতিকার চিন্তা রামানন্দকে চিন্তান্বিত করিত। পঞ্জাবে তিনি শোনেন যে সেখানে সৎকার্যের জন্য টাকা অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াসেই পাওয়া যায়। বাংলায় তাহা দেখা যায় না। শিক্ষার বিস্তারও বাংলার চেয়ে দ্রুততর দেখেন। পঞ্জাবিরা বাঙালির চেয়ে কেজো এবং কম ভাবপ্রবণ—পঞ্জাবের সামান্য অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহার মনে হয়।

বাংলা ১৩৩৪এই রামানন্দ জয়পুর রাজ্যে নিমন্ত্রিত হন। সেখান হইতে ফিরিয়া জয়পুর বিষয়ে প্রবাসীতে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন।

বাংলা ১৩৩৫ সালের পৌষ মাসে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সপ্ততিতম জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। এই সভায় আচার্য মহাশয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষ হইতে রামানন্দ অভিনন্দন পাঠ করেন। তিনি মৌখিকও কিছু বলেন। ভগিনী নিবেদিতাকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়া বলেন,

> "এই আনন্দের দিনে শ্রদ্ধেয়া ভগিনী নিবেদিতা বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহা অপেক্ষা অধিক আনন্দিত কেহ হইতেন না। তিনি যে পুণ্যলোকেই থাকুন, এই উৎসবে সেখান হইতে

যোগ দিতেছেন। তিনি এই আশা করিতেন, যেমন আধ্যাত্মিক বিষয়ে তেমনি বিজ্ঞানেও ভারতবর্ষ অচিরে জগৎকে নূতন কিছু শিখাইবে।"

সমগ্র বাংলাদেশের বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের একটি সভা আছে।

বাংলা ১৩৩৬ সালে রামানন্দ হাবড়া, বাঁকুড়া ও রাজশাহি তিনটি জেলার এই শিক্ষক কনফারেন্সে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি বলেন,

"সন্তুষ্ট শিক্ষক সমষ্টির উপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, ইহা সর্বসাধারণের মনে রাখা উচিত।"

শিক্ষকগণ সকল দেশেই অন্য শ্রেণীর ঐরূপ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক অপেক্ষা দরিদ্র, সুতরাং তিনি বলিতেন, শিক্ষকগণ যেন নিজেদের কাজ ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন।

১৯২৮-এ কলিকাতায় যখন কংগ্রেস হয়, সেই বৎসর ডিসেম্বরের শেষে বা জানুয়ারির গোড়ায় সমগ্র ভারতের সাংবাদিকদিগের একটি কনফারেন্স আহ্বান কলিকাতার সাংবাদিকদিগের সভায় স্থির হয়। তাহার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত যে অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়, তাহার সভাপতি নির্বাচিত হন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এই বৎসর সাইমন কমিশন লইয়া দেশে খুব আন্দোলন চলিতেছিল। সেবার কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে যত লোক হইয়াছিল, কলিকাতায় বা অন্য কোথাও কংগ্রেস উপলক্ষে ইতিপূর্বে তত লোক হয় নাই। সভাপতি ছিলেন মতিলাল নেহরু। কংগ্রেস প্রদর্শনীও বিরাট হইয়াছিল।

বাংলাভাষার প্রচার বৃদ্ধি করা ও বাংলাভাষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা রামানন্দের একটা বিশেষ কাজ ছিল। বাংলাসাহিত্য যেরূপ মূল্যবান সেই তুলনায় তাহার প্রচার অত্যন্ত কম। এইজন্য এই বৎসর পুরুলিয়ায় হরিপদ সাহিত্য-মন্দিরের উৎসবে বক্তৃতায় রামানন্দ একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলেন। মানভূম বাংলাদেশের অংশ। কিন্তু শাসকজাতির খেয়াল অনুসারে তাহা বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত হইয়া যায়। খনিতে কাজ করিবার জন্য এখানে বিস্তর অবাঙালির আমদানি হইয়াছে। ১৩৩৬-এ তিনি লেখেন,

> "এখনও মানভূম জেলার শতকরা ৬৭ জন বাংলাভাষী। বাংলাভাষীর সংখ্যা যাহাতে আরও না কমিয়া যায় তাহার চেষ্টা নানা দিক দিয়া করা যায়।..একটি উপায়, যাহাদের ভাষা সমৃদ্ধ নহে এবং যাহাদের সাহিত্য বলিতে বিশেষ কিছু নাই, তাহাদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার। মানভূমে আদিম নিবাসী এরূপ দু লক্ষের উপর আছে।..অনেকের মাতৃভাষাও বাংলা হইয়া গিয়াছে। চেষ্টা করিলে সমুদয় আদিম নিবাসীকে বাংলা বহি পড়িয়া উপকৃত হইবার সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে।"

পরে ১৩৪৬ সালেও হরিপদ সাহিত্য-মন্দিরের উৎসবে তিনি যোগ দেন এবং মানভূমে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রচারে বিশেষ উৎসাহ দিয়া আসেন। মফঃস্বলের এই সব শহরে কখনো কখনো বৈকালে ছয় ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তাঁহাকে চার-পাঁচটি জনাকীর্ণ বৃহৎ সভায় বক্তৃতা দিতে ও অভিনন্দন লইতে হইত। রাঁচীর ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের আহ্বানে পুরুলিয়া হইতে তাঁহাকে রাঁচী যাইতে হয়। সেখানে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় সভায় বক্তৃতা করিতে হয়। কিছুদিন পরে তিনি কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে নিমন্ত্রিত হন।

বাংলা ১৩৩৬-এর পৌষ মাসে অর্থাৎ ইং ১৯২৯ ডিসেম্বরে লাহোর, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ, গোয়ালিয়র প্রভৃতি নানাস্থানে চল্লিশটির উপর নিখিল-ভারতীয় সভার অধিবেশন হয়। লাহোরে হয় কংগ্রেস প্রভৃতির অধিবেশন। কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন জবাহরলাল। রামানন্দ সেইবার লাহোরে একেশ্বরবাদীদিগের কনফারেন্সের এবং জাতপাত তোড়ক

মণ্ডলের কনফারেন্সের সভাপতি হইয়া যান। এলাহাবাদ হইতে তিনি ও জবাহরলাল একই ট্রেনে যাওয়াতে কংগ্রেস সভাপতি তাঁহাকে নিজ বক্তৃতার টাইপ-লিপি পড়িতে দেন। কিন্তু লাহোরে পৌঁছিয়া যথাসময়ে কংগ্রেসের টিকিট না পাওয়াতে কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রথম দিনে তিনি মণ্ডপে যাইতে পারেন নাই। গণ্যমান্য লোকেরা নিজেদের জন্য টিকিট জোগাড় করিতে যে-সকল উপায় অবলম্বন করেন তাহা তিনি কখনো করিতেন না। তিনি সর্বদাই পাঁচজনের একজন হইয়া থাকিতে চাহিতেন। লাহোর কংগ্রেস মণ্ডপ যে সকল ইংরেজি বচন দ্বারা ভূষিত হয় তাহার মধ্যে একটি ছিল "আগে দেশ পরে ধর্ম।"

রামানন্দ বলেন,

"যাঁহারা এরূপ বলেন তাঁহাবা হয়তো ধর্মকে ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে অভিন্ন মনে কবিতেছেন।..সাম্প্রদাযিক কলহও ধর্মের সাববস্তু নহে। কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়াকলাপও সারবস্তু নহে। ধর্মের শ্রেষ্ঠ অংশ এই বিশ্বাস, যে, এই বিশ্ব খামখেয়ালীভাবে চলে না, এখানে যেমন কর্ম সেইরূপ ফল ফলে ; ইহা এরূপ নিয়মে চলিতেছে, যে, ইহার গতি সত্য, ন্যায় ও প্রীতির জয়েব দিকে, এবং এই জয় হইতেছে ও হইবেই।..অতীত হইতে বর্তমান পর্যন্ত নির্দোষ অভ্রান্ত কোনো দেশ অর্থাৎ সেই দেশের লোক ইতিহাসে দেখা যায় না। সুতরাং কোনো দেশকেই পরম দেবতার স্থানে বসান যায না।"

১৯২৯-এ ২৭ সেপ্টেম্বর কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রামানন্দ রামমোহন রায় সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সেখানে Women's College ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি অধ্যাপক প্রভৃতি নানা দল তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন সভায় অভিনন্দন দেন। পূজার সময় এবং অন্যান্য ছুটিতে কিংবা কাজে যখনই তিনি বিদেশে যাইতেন, নানা স্থান হইতে অভিনন্দন পাইতেন। এইরূপ একঘর অভিনন্দন-পত্র (২০০।৩০০) তাঁহাব পরিত্যক্ত ঘরে এখনও পড়িয়া আছে।

বাংলা ১৩৩৭-এ জ্যৈষ্ঠে রংপুরের বিষয় তিনি লেখেন,

"সম্প্রতি আমাকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বংপুর শাখার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে সেখানে যাইতে হইয়াছিল। রংপুরে ছত্রিশ ঘণ্টা মাত্র ছিলাম। স্থানীয় মহিলা সমিতির শিল্পপ্রদর্শনী দেখিয়া প্রীত হইলাম। রংপুরে গোবংশের উন্নতিকল্পে যে প্রতিষ্ঠানটি আছে, তাহা দর্শনীয়। এই জেলায় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাপতি বোর্ডের খাদ্য-পরীক্ষার গৃহ ও যন্ত্রাদি দেখাইলেন। স্বরাজ্য লাভের চেষ্টা যাঁহার রংপুরে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আশ্রমে প্রাতে আমাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানটির নিকটে ক্ষত্রিয় ব্যাঙ্ক ও অন্য ক্ষত্রিয় প্রতিষ্ঠান আছে। বক্তৃতা করিবার পর উহা দেখিতে যাই। অতঃপব আমি স্থানীয় ব্রহ্মমন্দির দেখিতে যাই। সেখানে সমবেত মহিলা ও ভদ্রলোকদের সহিত ব্রহ্মোপাসনা করি। মহিলা সমিতির শিল্প প্রদর্শনী যখন দেখিতে গিয়াছিলাম তখন সেখানে মহিলারা আমাব সম্বন্ধে যাহা পারিলেন বলিলেন, তাহা উপলক্ষ করিয়া আমাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। প্রধানত পরিষদের কাজের জন্য রংপুর গিয়াছিলাম। তাহার বার্ষিক অধিবেশনে লিখিত অভিভাষণ পাঠ করি। সামাজিক সম্মেলনের আগে লাঠিখেলা প্রভৃতি দেখান হয়। সম্মেলনে ছেলেবা আবৃত্তি করে ও পুরস্কার বিতরিত হয়। কিছু সঙ্গীত হয়। শেষে আমি কিছু বলি।"

রংপুর হইতে ফিরিয়া বরিশাল যাত্রা।

"বঙ্গীয় শিক্ষক-সম্মিলনে সভাপতির কাজ করিবার নিমিত্ত বরিশাল যাইতে হইয়াছিল। জলযোগের পর শহর হইতে কয়েক মাইল দূরবর্তী মাধবপাশা নামক স্থান দেখিতে গেলাম। বরিশালে মোটামুটি ৬০ ঘণ্টা ছিলাম। তাহার মধ্যে আহার নিদ্রাদি বাদে বেশি সময় দিতে হইয়াছিল দুই দিন শিক্ষক সম্মেলনের কাজে। একদিন ব্রজমোহন কলেজ দেখিলাম। অনুরুদ্ধ হইয়া একদিন এখানকার ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করি। বাণীপীঠ নামক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বরিশালের মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ, স্বরাজ সেবকবৃন্দ, সাহিত্য-পরিষদ এবং হিন্দুসভা আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শনার্থ চারিটি

অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। তাহার উত্তরে আমাকে বক্তৃতা করিতে হয়। সভাস্থলে অনেক মহিলাও উপস্থিত ছিলেন। আসিবার দিন স্টিমারে উঠিবার অব্যবহিত পূর্বে ঐ বিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা করিতে হয়। শিক্ষক সম্মেলনে আমি কোনো অভিভাষণ লিখিয়া লইয়া যাইতে পারি নাই। মুখে কিছু বলিয়াছিলাম। তাহার চুম্বক শিক্ষকদিগের মাসিক পত্রিকায় বাহির হইবার কথা।"

২৮ বৈশাখ রামানন্দকে কলিকাতায় সাংবাদিকদের কন্‌ফারেন্সে সভাপতির কাজ করিতে হয়। এই সভায় অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলতা হওয়ায় সভাপতি সভা ভঙ্গ করিতে বাধ্য হন।

বাংলা ১৩৩৭-এ রামানন্দ দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে যাপন করেন। মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিতেন, কিন্তু সম্ভবত এক-আধবার এলাহাবাদ ছাড়া অন্য কোথাও যান নাই। করাচি যাইবার পূর্বে তিনি শান্তিনিকেতনেই ছিলেন।

১৩৩৮ কংগ্রেস সপ্তাহে (মার্চের শেষে) সিন্ধুদেশের হিন্দুরা করাচিতে হিন্দু মহাসভার এক অধিবেশন করেন। ইহা নিয়মিত বার্ষিক অধিবেশন নহে ; হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য সর্বসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত এবং সিন্ধি হিন্দুরা সিন্ধুকে একটি আলাদা প্রদেশে পরিণত করার বিরোধী, যুক্তি সহকারে ইহা জানাইবার জন্য এই অধিবেশন হয়। করাচিতে সমবেত পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রমুখ হিন্দু নেতারা এবং অন্য হিন্দু কর্মীরা প্রবাসীর সম্পাদককে সভাপতি নির্বাচন করেন। সভাপতির অভিভাষণে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, হিন্দু মহাসভার প্রধান উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নহে, আত্মরক্ষার জন্য ইহাকে রাজনৈতিক বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে হয়। হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা রক্ষা ও তাহার প্রভাব বৃদ্ধি, হিন্দু সমাজকে সুস্থ সবল ও জ্ঞানোন্নত রাখা এবং হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস নিবারণ ও সংখ্যাবৃদ্ধি সাধন, হিন্দু মহাসভার এই সব উদ্দেশ্য বিষয়ে সভাপতি বিশদ ভাবে বলেন। হিন্দু সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর লোকদিগের ও মুসলমানদের হিতসাধন যে "উচ্চ" শ্রেণীর হিন্দুদের কর্তব্য এবং অক্রোধ ও সেবা দ্বারা যে বিদ্বেষকে পরাজিত করিতে হইবে, সভাপতি ইহাও বলেন। যে-সকল কারণে সিন্ধুদেশকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা বর্তমান অবস্থায় উচিত নয় তাহাও সভাপতি বলেন।

রামানন্দ করাচিতে শ্রীযুক্ত কেবলরাম দয়ারাম সহানি নামক একজন সিন্ধি ভদ্রলোকের অতিথি ছিলেন। তিনি কংগ্রেস শিবির ইত্যাদি সমস্তই দেখিয়াছিলেন, এবং কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিয়া নানা ভাষায় বক্তৃতাগুলিও শুনিয়াছিলেন। তখন কংগ্রেসে "হিন্দি" "হিন্দি" করিয়া জোরজবরদস্তি করার যুগ। রামানন্দ ১৪ বৎসর এলাহাবাদে ছিলেন, কিন্তু তিনি বলেন অনেকের হিন্দি বক্তৃতার সব কথা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। কারণ তাহা প্রকৃতপক্ষে হিন্দি নহে, উর্দু। সভাপতি পটেল মহাশয়ও বুঝিয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

৬৫ বৎসর বয়সে করাচি হইতে তিনি মোহেন-জো-দড়ো দেখিতে যান। সক্করে সিন্ধু নদের উপর বাঁধও দেখিয়া আসেন। একলা দেশ-ভ্রমণে তাঁহার উৎসাহ ছিল না, শ্রান্তিই লাগিত। তবু ভারতীয় সভ্যতার আদি ভূমি দেখিয়া আসিবার ইচ্ছায় এতদূর তিনি গিয়াছিলেন। ননীগোপাল মজুমদার প্রভৃতি তাঁহাকে মোহেন-জো-দড়ো দেখান। করাচি হইতে কলিকাতা ফিরিবার পথে তিনি দিল্লিতে নামিয়াছিলেন।

দিল্লিতে মহাত্মা গান্ধী হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধি-স্থানীয় কয়েকজন সভ্যের বক্তব্য শুনিতে চাওয়ায় তাঁহার রামানন্দকে মুখপাত্র করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করেন। এই সকল সভ্যের মধ্যে নানা প্রদেশের হিন্দু—যথা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও পঞ্জাবের ভাই পরমানন্দ প্রভৃতি ছিলেন। তখন হিন্দু মহাসভা কোনো প্রদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু

সম্প্রদায়ের জন্যও বিশেষ কোনো অধিকার চান নাই। তাঁহারা সর্বত্র গণতান্ত্রিক রীতির প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। হিন্দু মহাসভার এই বৎসরের সব বর্ণনাপত্র পড়িয়া শ্রীমতী অ্যানি বেসান্টের কাগজ 'নিউ ইন্ডিয়া' লিখিয়াছিলেন, যে, (অনুবাদ) "ইহাতে যাহা বলা হইয়াছে এবং যেভাবে বলা হইয়াছে, তাহাতে কিছু খুঁত ধরিবার জো নাই।"

এই সময় নয়াদিল্লিতে মহিলা সমিতিতে ও অন্যত্র তিনি "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রভৃতি বিষয়েও বলেন।

পূর্বেই বহুবার বলিয়াছি, রামানন্দ দেশিয় শিল্পের উন্নতিকল্পে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই জাতীয় কাজে উৎসাহ দিবার জন্য সম্ভবত ১৩৩৮-এর বৈশাখের শেষে তিনি ত্রিপুরা জেলায় কোনো শিল্প-বিদ্যালয়ে যান। তখন তাঁহার বয়স ৬৬ বৎসর।

"ভারতবর্ষের দেশি রাজ্যগুলি সাক্ষাৎভাবে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের শাসনের অধীন নয়, যদিও তাহাদের নৃপতিরা ইংলন্ডের রাজাকে অধিরাজ বলিয়া মানিতে বাধ্য। এই রাজ্যগুলি ১৯২১ সালের সেন্সস অনুসারে সাত কোটি কুড়ি লক্ষ লোকের বাসভূমি। এগুলির প্রায় সর্বত্রই আইনের শাসন নাই—রাজা মহারাজা নবাবদের ইচ্ছাই আইন। সুতরাং তাহার ফলে অন্যায় অত্যাচার কুশাসন যে খুব হয়, তাহা বলা বাহুল্য।" দেশি রাজ্যসকলের শাসন প্রজাতন্ত্র হইলে প্রজাদের উন্নতি হইবে এবং অত্যাচারও নিবারিত হইবে রামানন্দ মনে করিতেন। রাজ্যসমূহে যে-সব অত্যাচার অবিচার হয়, তাহা লোকসমক্ষে উপস্থিত করিয়া তাহার প্রতিকার লাভের জন্য চেষ্টা করা দেশি-রাজ্য-পরিষদের (States Peoples' Conference) অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাংলা ১৩৩৮-এর জ্যৈষ্ঠ মাসে বোম্বাই শহরে সমগ্র ভারতবর্ষের দেশি রাজ্যসমূহের এই পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এই অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচন করা হয়। তৃতীয় অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যদের সংখ্যা অন্যান্য বারের প্রায় দেড়গুণ হয়। ভারতবর্ষের সকল দিক ও অঞ্চল হইতে প্রতিনিধিবর্গের সমাগম হইয়াছিল। অধিবেশনের জন্য রয়্যাল অপেরা হাউস নামক থিয়েটার ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। উহাতে তিন হাজার লোক ধরে। ভিতরে জায়গা না কুলানোতে বাহিরেও বিস্তর লোক জমা হইয়াছিল। ভিতরে ও বাহিরে রেডিওর বন্দোবস্ত ছিল।

সভাপতিকে সেখানে যেরূপ সমারোহের সহিত অভ্যর্থনা করা হয় ভারতে সে সময় খুব কম লোকের ভাগ্যেই সেইরূপ অভ্যর্থনা লাভ ঘটিয়াছে। এই কনফারেন্সের জন্য রামানন্দকে প্রচুর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল।

এই কংগ্রেসে ভারতবর্ষের লোকেরা সকলে কিরূপ হিন্দি বোঝে তাহার একটি সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায়। রামানন্দ লেখেন,

> "আমার বক্তৃতাটি হিন্দী ও ইংরেজি ইহার যে-কোনো ভাষায় পড়িবার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলাম। বোম্বাইয়ে গান্ধীজীর প্রভূত প্রভাব। এই জন্য ভাবিয়াছিলাম হিন্দীতেই বোধ করি বক্তৃতা হইবে। অভ্যর্থন্য সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীদাস রাওজী তেয়সী একটি ইংরেজি বক্তৃতা পড়িলেন। তিনি জাতিতে কচ্ছী।...তাঁহার বক্তৃতার পর আসিল আমার পালা। অনুরুদ্ধ না হইয়াও আমি আপনা হইতেই আমার হিন্দী অভিভাষণটি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। যখন উহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পড়া হইয়াছে, এমন সময় ক্ষমতাপ্রাপ্ত অভ্যর্থনা সমিতির একজন সভ্য আমার নিকটস্থ হইয়া কানে কানে বলিলেন, 'লোকেরা উঠিয়া যাইতেছে, আপনি ইংরেজিতে আপনার বক্তৃতা না পড়িলে ঘর খালি

হইয়া যাইবে।' তখন আমি ইংরেজি ধরিলাম। পরে অবগত হইয়াছিলাম, আমি কখন ইংরেজিতে বক্তৃতা করিব তাহার অপেক্ষায় বাহিরে অনেক লোক জমা হইয়াছিলেন ; আমি ইংরেজি অভিভাষণ পড়িতে আরম্ভ করিবার পর তাঁহারা ঘরের ভিতর আসিলেন।"

সভায় সত্তর-আশিজন বক্তৃতা করেন। অধিকাংশ গুজরাটি ও সেইরূপ ভাষায়। অনেকে ইংরেজিতে, কয়েকজন মরাঠিতে, একজন শিখ পঞ্জাবিতে, হিন্দিতেও কতকগুলি লোক বক্তৃতা করেন। নানা প্রদেশের সভা-সমিতি দেখিয়া রামানন্দের ধারণা হয় যে, যে-যে প্রদেশের মাতৃভাষা হিন্দি, সেখানে ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষিত লোকেরা কোনো সভায় সমবেত হইলে তাঁহাদের অধিকাংশ যেমন ইংরেজি বুঝেন ও বলিতে পারেন, হিন্দি তেমন বলিতে ও বুঝিতে পারেন না। ভবিষ্যতে অবশ্য অবস্থা অন্য প্রকার হইতে পারে।

দেশি রাজ্যগুলিতে নিয়মতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হইলে প্রজা ও রাজা উভয়েরই হিত হইবে, এবং তাহা প্রবর্তন করা উচিত ও সুসাধ্য, ইহা প্রদর্শন করাই সভাপতির প্রথম উদ্দেশ্য ছিল। সভাপতি বলেন,

"ভারতবর্ষ এখন ফেডারেটেড অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধ হইতে যাইতেছে। ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলি এবং দেশি রাজ্যগুলি এই ফেডারেশন বা সংঘের অঙ্গীভূত হইবে। এই অঙ্গ গুলির আভ্যন্তরীণ শাসনপ্রণালী মোটের উপর একই রকমের হওয়া চাই, ইহা দেখান আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল। ফেডারেশ্যন বা সংঘের অঙ্গীভূত কতকগুলি অংশে চলিবে নৃপতিদের স্বেচ্ছাচার এবং অন্যগুলিতে (অর্থাৎ বর্তমানে ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশগুলিতে) চলিবে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী, এরূপ অবস্থায় কাজ চলিতে পারে না, চলা উচিত নয়।.. প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের অজ্ঞাত নহে, আমি বক্তৃতায় প্রদর্শন করি। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের মধ্যে প্রাচীন ভারতে দীর্ঘকাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র ছিল।"

দেশি রাজ্যের কু-ব্যবস্থা ও তথায় প্রজাদের রাজনৈতিক অধিকারশূন্যতার জন্যই প্রধানত ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের তুলনায় প্রতি বর্গমাইল হিসাবে দেশি রাজ্যে কম লোকের বাস, ইহা সভাপতি মহাশয় দেখান। রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রভেদে দেশ কিরূপ অবনত বা উন্নত হয়, তাহা দেখাইবার জন্য তিনি কাশ্মীরের সহিত সুইটজারল্যান্ড এবং হায়দরাবাদের সহিত চেকোশ্লোভাকিয়ার নানা বিষয়ের তুলনা করিয়া ভারতীয় রাজ্যগুলির হীনতা প্রদর্শন করেন। অভিভাষণে আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা হয়।

বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরের নানা স্থানে লাইব্রেরি আন্দোলনে রামানন্দের বিশেষ উৎসাহ ছিল, কারণ স্কুল কলেজের বাহিরে লাইব্রেরিই শিক্ষার সর্বাপেক্ষা বড়ো উপায়। জাতিকে শিক্ষাদান এক হিসাবে রামানন্দের জীবনব্রত ছিল। এইজন্য লাইব্রেরি ও স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠায় তিনি বহু স্থানে নিমন্ত্রিত হইতেন।

আষাঢ়ে চন্দননগর নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরের লাইব্রেরিতে নানা কথার ভিতর রামানন্দ বলেন,

"প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই যদি আপনার মৌলিক চিন্তা বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করেন, তাহলে অন্য জাতির লোকেরাও বাংলা শিখবেন।"

প্রাগে অধ্যাপক লেজনি বাংলায় রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে যে অভিনন্দন পাঠ করেন তাহার বিষয়ও রামানন্দ এই প্রসঙ্গে বলেন। তিনি আরও বলেন,

"বাংলা ভাষায় এমন সব বই থাকা দরকার যাতে কেবল বাংলা পড়েই যাকে কাল্‌চার বা কৃষ্টি বলে, তা আমরা পেতে পারি। সংস্কৃত ভাষাকে প্রবেশিকায় স্বেচ্ছা-শিক্ষণীয় বিষয়

করাব আমি বিরোধী।...বাংলা ভাষাকে ভাল করে জানতে ও গড়তে হলে সংস্কৃত শিখতে হবে। মূল থেকে রস সংগ্রহ করে গাছ সতেজ হয়। তেমনি অতীত থেকে আমাদিগকে পরিপুষ্টির উপায় খুঁজতে হবে। কোনো জাতির সভ্যতা জানতে হলে তার অতীতের সঙ্গে পরিচয় থাকা উচিত। সেই জন্য সংস্কৃত পড়া উঠালে চলবে না।"

বাংলা ১৩৩৮-এর শ্রাবণে বর্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু কনফারেন্স হয়। ইহা হিন্দু মহাসভার সমজাতীয় সভা, কিন্তু এই সভায় তিনি কিছু বলিয়াছিলেন কিনা জানিতে পারি নাই, কেবল উপস্থিতির বিষয় বুঝিতে পারি।

এই ১৩৩৮-এই সারনাথে এ যুগের নূতন বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ "ঐ নামে একদিন ধন্য হ'ল" ইত্যাদি কবিতা রচনা করেন। এইখানে বুদ্ধদেব তাঁহার প্রথম উপদেশ প্রদান করেন। এইজন্য এইখানে বুদ্ধদেবের সমকালীন শিষ্যেরা 'গন্ধকুটি' অর্থাৎ সুবাসিত কক্ষ নাম দিয়া তাঁহার জন্য বাসভবন নির্মাণ করিয়া ছিলেন। পরে সম্রাট অশোক প্রভৃতি এখানে বহু স্তূপ, বিহার ও চৈত্য নির্মাণ করেন। ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ ঘোরির এক সেনাপতি এইসব বিহারাদি নষ্ট করিয়া দেন। প্রায় আট শতাব্দী পরে বাংলা ১৩৩৮-এ আবার নূতন বিহার নির্মিত হয়। এই বিহারের নাম "মূল গন্ধকুটি বিহার"। বিহার প্রতিষ্ঠার উৎসবে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ হইতে বৌদ্ধ ও বুদ্ধ ভক্তগণ সমাগত হন। এই সময় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও রামানন্দ প্রভৃতিও নিমন্ত্রিত হইয়া যান। জাপানি চিত্রকরেরা এই বিহার চিত্রিত করিবেন এইরূপ কথা হয়। তাহাতে রামানন্দ বলেন,

"নন্দলালবাবু ও তাঁহার শিষ্যবর্গ আবশ্যক হইলে, বিহারটি বিনা পারিশ্রমিকেও চিত্রিত করিতে রাজী ছিলেন। বিহারটি ভারতীয় শিল্পীদের দ্বারা চিত্রিত না হওয়ায় ভবিষ্যতে সারনাথ তীর্থ দর্শকেরা ভাবিতে পারে, ভারতবর্ষে শিল্পী ছিল না। এই চিন্তা পীড়াদায়ক।"

পরে ধর্মপাল মহাশয়ের সহিত রামানন্দ ও শাস্ত্রী মহাশয়ের আলোচনা হওয়াতে ধর্মপাল মহাশয় বলেন, যাহাতে বাঙালি চিত্রকরদের দ্বারা বিহার চিত্রিত হয় তাহার চেষ্টা তিনি করিবেন।

সারনাথে বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের নিমন্ত্রণে তাঁহার স্বহস্তের রান্না কাঁচামুগের ডাল ও আলু-ভাতে খাওয়ার গল্প রামানন্দের সখ্য-প্রীতির প্রিয় গল্প ছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত এই গল্প তিনি রোগশয্যায় শুইয়াও করিতেন।

১৩৩৮-এ রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্ণ হয় এবং এই উপলক্ষে কলিকাতায় ১১ পৌষ (২৭ ডিসেম্বর ১৯৩১) টাউন হলের প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র-জয়ন্তীর জনাকীর্ণ বিরাট সভা এবং মেলা প্রদর্শনী প্রভৃতি হয়। এই জয়ন্তীর উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রথম তিনজন ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। জয়ন্তী কমিটি গঠন করিবার জন্য যে-পত্র প্রকাশিত হয় তাহাতে আরও প্রায় ৫০।৬০ জন খ্যাতনামার সই ছিল। কমিটি গঠিত হইবার পর জগদীশচন্দ্র সভাপতি ও রামানন্দ একজন সহকারী সভাপতি হন।

'রবীন্দ্র-জয়ন্তী'র নানা জাতীয় উদ্যোক্তাদের উপহারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও বিশ্বজনীন উপহার ছিল 'গোল্ডেন বুক অব টেগোর'। এই পুস্তকের সম্পাদক (editor) ছিলেন রামানন্দ। তিনিই সভায় স্বহস্তে ইহা রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। ইহার প্রস্তাবক (sponsor) ছিলেন গান্ধীজি, জগদীশ বসু, রম্যাঁ রল্যাঁ, অধ্যাপক আইনস্টাইন এবং গ্রিক কবি কস্টাস পালামাস। পৃথিবীর ত্রিশটি বিভিন্ন দেশের কবি, লেখক, শিল্পী, পণ্ডিত প্রভৃতি ইহা অলংকৃত করেন। দুইশতের অধিক খ্যাতনামা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য লেখক ইহাতে লেখেন।

দুই-চারিজন সাধারণ মানুষের লেখাও ইহাতে আছে। পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন চেষ্টার ইতিহাসে ইহা একটি দলিল হইয়া বহুদিন সাক্ষ্য দিবে। রলাঁ্যা এই 'গোল্ডেন বুক' উপহারের প্রস্তাব রামানন্দের নিকট লিখিত একটি ফরাসি চিঠিতে প্রথম করেন।

'গোল্ডেন বুক' সম্বন্ধে তৎকালীন দৈনিক খবরের কাগজে বলা হয় :

"It is understood, over two hundred leading writers and thinkers of the East and the West have contributed to this work, which will remain for years to come as the most remarkable document of international fellowship and the focussing point of world opinion on India and Indians...."

রামানন্দকে ডাঃ সন্ডারল্যান্ড লেখেন,

"...not only the Poet but all the rest of us are under deep and lasting obligation to you for your splendid dream, your splendid vision, in the thinking of and planning such a book, and then for your wisdom, judgment, and very great labour in gathering the suprisingly rich material from all over the world, and finally, patiently, carefully, labouriously, with infinite skill and good taste, building it all into the structure of the impressing attractive, dignified and beautiful volume."

গান্ধীজি বলেন, "Dear Ramananda Babu, what treasures of love have you poured into it!"

১৩৩৮-এর বৈশাখ মাসে আর্য সমাজের উদ্যোগে আর্য সমাজ মন্দিরে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল "অসবর্ণ বিবাহের প্রয়োজনীয়তা"; সভাপতি ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র বেদান্তসাংখ্যতীর্থ, পণ্ডিত দীনবন্ধু শাস্ত্রী, ধীরেন্দ্রনাথ বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আলোচনায় যোগদান করেন। পরিশেষে সভাপতি তাঁহার দীর্ঘ জীবনের বহু অভিজ্ঞতার দৃষ্টান্ত তুলিয়া এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তাঁহাব উত্থাপিত নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় :

১। "শতধাবিচ্ছিন্ন হিন্দু জাতিকে হ্রাস ও বিলোপ হইতে রক্ষা করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ কবিবাব উদ্দেশ্যে এই সভা হিন্দু সমাজের মধ্যে নির্বাধায় অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনেব জন্য সমগ্র হিন্দু সমাজকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে।"

২। "হিন্দু সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলনের নিমিত্ত সর্ববিধ উপায় অবলম্বন করিবাব জন্য একটি অস্থায়ী কার্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সহ-সভাপতি—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম্, এল, সি ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমাব মিত্র। সম্পাদক—ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ বসু, এম-বি।"

এই অসবর্ণ বিবাহ সমিতির কার্যালয় ৩৮নং বিডন রো, কলিকাতায় স্থাপিত হয়।

এই বৎসর অপরিণত মনোবৃত্তি-বিশিষ্ট বালক-বালিকাদের মানসিক ও দৈহিক সর্ববিধ উন্নতির চেষ্টায় যে "বোধনা সমিতি" স্থাপিত হয়, তাহারও সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ হন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক ছিলেন।

ঝাড়গ্রামে প্রথমে ইহার প্রায় আড়াই শত বিঘা জমিযুক্ত আশ্রম স্থাপিত হয়। ঝাড়গ্রামের রাজা সেই জমি দান করিয়াছিলেন। জমি নির্বাচন করিতে ইঁহারা উভয়েই ঝাড়গ্রামে নানাস্থানে ঘুরিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর বোধনা-নিকেতনের জন্য অর্থ সংগ্রহ, বোধনার প্রচার

প্রভৃতি নানা কাজে তিনি বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। পঙ্গুমনা শিশুদের প্রতি তাঁহার বিশেষ মমতা ছিল।

অসৎ সাহিত্য এবং যাহাতে মনের বৈকল্য উপস্থিত হইতে পারে এমন অভিনয়, বায়োস্কোপ, নৃত্যাদির প্রচার বন্ধ করিবার জন্য কলিকাতার কয়েকজন ব্যক্তি বদ্ধপরিকর হন। এই উদ্দেশ্যে "সুনীতি সঙ্ঘ" বাংলা ১৩৩৮-এ স্থাপিত হয়। তাহার অস্থায়ী কমিটির সভাপতি হন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সহ-সভাপতি জলধর সেন, মুজিবর রহমান, জে. কে. বিশ্বাস, শ্রীমতী কামিনী রায় ও কৃষ্ণকুমার মিত্র।

এই সময় প্রবর্তক সঙ্ঘের অক্ষয়-তৃতীয়া উৎসব, জলধর সেন সংবর্ধনা প্রভৃতি নানা ছোটো ও বড়ো অনুষ্ঠানে রামানন্দ প্রায় পৌরোহিত্য করিয়া ছিলেন। মাসের মধ্যে পনের দিন তাঁহার দিনে দুই-তিনটা সভায় হাল ধরিতে যাইতে হইত। সুরেন্দ্রনাথ, অশ্বিনীকুমার, রামেন্দ্রসুন্দর, রাজনারায়ণ, আনন্দমোহন প্রভৃতি বড়ো বড়ো রাজনৈতিক নেতাদের ও পণ্ডিতদের স্মৃতিসভায় সভাপতিরূপে তিনি বাংলার যুবকবৃন্দকে প্রকৃত দেশসেবার কার্যে শান্ত ও সংযত ভাষায় প্রেরণা জোগাইয়াছেন।

বাংলা ১৩৩৯-এর আষাঢ় মাসে রামানন্দ বোম্বাই শহরে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভোকেশনে নিমন্ত্রিত হইয়া যান ও সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করেন। স্ত্রী-শিক্ষা, সহশিক্ষা, মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে বহু তথ্য ও সুযুক্তিপূর্ণ এই অভিভাষণের শেষে তিনি বলেন,

> "Women are not to blame for the fact that hitherto, with rare exceptions, it is men who have planted the flag of knowledge in the realms of the unknown ; for women have not had adequate oppertunity. I may be permitted to hope that, through the instrumentality of India's educated women, notable contributions will be made to the arts and sciences."

হিন্দু মহাসভার কিছু দিন পরে ১৩৩৯ সালের ১ আশ্বিন মালদহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের সভাপতিও রামানন্দকেই করা হয়। রামানন্দ হিন্দুর প্রতি হিন্দুর ভালবাসা, হিন্দুর স্বার্থরক্ষার চেষ্টা স্বজনপ্রীতি হইতেই যে উদ্ভূত, অন্য সম্প্রদায় কী জাতির প্রতি বিদ্বেষ হইতে নয়, তাহা তাঁহার অভিভাষণের কোনো কোনো অংশে বলেন :

> "নিজের মাকে যে আমরা ভক্তি করি ও ভালবাসি, তার মানে এ নয়, যে, অন্যদের মাকে আমরা অবজ্ঞা করি এবং বিদ্বেষের চক্ষে দেখি।
>
> "যিনি যে পরিবারের মানুষ, তাহার প্রতি তাঁহার অনুরাগ স্বাভাবিক। তাহার পর ক্রমশ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর মানবসমষ্টির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘটে, এবং তাহাদের প্রতি অনুরাগও অনুভব করেন। ইহার পরিণতি বিশ্বমানবের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধায়। সেইজন্য হিন্দুরা পূর্ণমাত্রায় ভারতীয় হইলেও বিশ্বমানবের প্রতি প্রীতিমান্ ও ভক্তিমান্ হইতে তাঁহাদের কোনো দুর্লঙ্ঘ্য বাধা নাই। কিন্তু ভারতবর্ষকে বাদ দিয়া পৃথিবীর বাকি সব অংশের বা অন্য কোনো অংশের প্রতি আনুগত্য ও অনুরাগ হিন্দুত্বের অর্থাৎ পূর্ণ ভারতীয়ত্বের লক্ষণ নহে।

"এই প্রকার অদ্ভুত স্বরাজ আমরা চাই না। ইহা যাহাতে স্থাপিত না হয়, তাহার জন্য আমাদের পূর্ণ শক্তি আমাদিগকে প্রয়োগ করিতে হইবে।"

হিন্দু-জাতিকে কিংবা ভারতবর্ষকে যে তিনি ভালবাসিতেন তাহার অর্থ তিনি এই বুঝিতেন না যে অহিন্দু জাতি হিন্দু হইতে নিকৃষ্ট, অভারতীয় জাতি ভারতীয় হইতে নিকৃষ্ট।

কিন্তু যাঁহার দেহ যে দেশের অন্নজলে বাতাসে পুষ্ট এবং হৃদয় মন আত্মাও যেখানকার চিন্তা ভাব আধ্যাত্মিকতা হইতে শক্তি ও আনন্দ লাভ করে, সে দেশ তাঁহার অনুরাগ আনুগত্য ও ভক্তির পাত্র। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে তাঁহার মতো করিয়া যুদ্ধ কেহ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। তিনি ছিলেন এই যুদ্ধের অগ্রদূত।

মালদহের অভিভাষণেও রামানন্দ সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারার দোষ ও নিগূঢ় উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখান। জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ইচ্ছায় যত বিষয়ের আলোচনা এই অভিভাষণে তিনি করেন তাহার ফর্দ দিবার স্থান নাই। তবে ইহা বলিলেই হয়ত চলিবে যে, শুধু রাজনীতির কথা বলিয়া তিনি তুষ্ট হন নাই, সমাজ-সংস্কারের সকল দিক, সার্বজনীন শিক্ষাদান, কৈশোর হইতে বালকবালিকাকে সংযত ও পবিত্র জীবনযাপনে শিক্ষাদান, নারীর উপর অত্যাচার নিবারণ, সকল ধর্মসম্প্রদায়ের পরস্পরের ধর্ম সাহিত্যাদি পাঠে উৎসাহ দান, ভারতীয় অর্থনৈতিক উন্নতি, ঐতিহাসিক গবেষণা ইত্যাদি বিষয়ে তো বলিয়াই ছিলেন, উপরন্তু হিন্দু বাঙালি কৃষক, দরজি ইত্যাদি সংখ্যাবৃদ্ধি করার প্রয়োজন হিসাবে বলেন যত রকম বৃত্তি, পেশা, ব্যবসা আছে সমস্তই হিন্দুর করণীয়, যত রকম যান্ত্রিক কাজ আছে তাহাতেও হিন্দু ছেলেদের যাওয়া উচিত।

> "হিন্দু ও মুসলমান বাঙালিব মাতৃভাষা এক, সুতবাং তাহাদের সাহিত্যেব একত্ব, ভাষার একত্ব এবং শিক্ষার একত্ব বাঞ্ছনীয় মনে করেন।" তিনি বলেন, "ভাষার মধ্যে অকারণ ও বিনা প্রয়োজনে কতকগুলি বিদেশি শব্দ ঢুকাইলে ভাষাব ঐশ্বর্য বাড়ে না, সৌন্দর্য এবং লালিত্যও বৃদ্ধি পায় না।"

তিনি প্রাচীন আশীর্বাদ-মন্ত্র "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং" ইত্যাদি স্মরণ করিয়া সকলকে মিলিত হইতে বলিয়া অভিভাষণ শেষ করেন।

মালদহের অন্যতম জমিদার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি সভাপতি রামানন্দকে বরণ করিবার সময় বলেন, "বাঙ্গালার গণ্যমান্য বাঙালি প্রধানদের অধিকাংশই স্বজাতির কল্যাণে উদাসীন হইয়া যখন আরামে আয়াসে কালহরণ করিতেছেন, সেই দুর্দিনে প্রবীণ মনীষী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যুবকের উৎসাহ লইয়া সমাজ ও জাতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষার ব্রত নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিতেছেন। এই শুক্লকেশ ও শুক্লকর্মা জননায়কের আদর্শে বাঙালি প্রধানগণ অনুপ্রাণিত হউন।"

তাঁহার "শুক্লকর্মা" বিশেষণটি মনে রাখিবার মতো।

রামানন্দ অগ্রহায়ণ কী পৌষ মাসে নাগপুর মরিস কলেজের বাৎসরিক সম্মেলনীতে নিমন্ত্রিত হইয়া নাগপুরে বিজ্ঞান কলেজ, তিলক বিদ্যালয়, কন্যা পাঠশালা, অস্পৃশ্যতা নিবারণী ভোজ প্রভৃতি বহু সভায় দশ-বারোটি বক্তৃতা দেন। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ নিবারণ বিষয়ে নানা স্থানে আলোচনা হয়। সেই আলোচনায় তিনিই কর্ণধার হন।

১৩৩৯-এর চৈত্রের 'প্রবাসী'তে আছে, "কিছু কাল হইতে আমাকে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যাইতে হইতেছে। গত কয়েক মাসের মধ্যে বোম্বাই, পুনা, মালদহ, দিল্লি, এলাহাবাদ (২ বার), নাগপুর, রাজশাহি, কুমিল্লা (২ বার), মৈমনসিং, ঢাকা, ঝাড়গ্রাম, কাশিমবাজার, ওয়াল্টেয়ার, বিজাগাপাটম, মজঃফরপুর প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইয়াছে। পুষা কৃষিকলেজ দেখিতে গিয়াছিলাম।"

প্রবাসী বাঙালির চিরসুহৃৎ ছিলেন রামানন্দ। তিনি বলিতেন যাহাদের ভাষা এক, তাহারা যেখানেই থাকুক, তাহাদের পরস্পরের সহিত যোগরক্ষা করা দরকার। তিনি প্রবাসে বঙ্গ

-সাহিত্যের প্রচারের চেষ্টাও কম করেন নাই। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন তাঁর অতি প্রিয় সভা ছিল। তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সম্ভব হইলে ইহার প্রত্যেক অধিবেশনেই যাইতেন। তবে তাহা সর্বদা সম্ভব হয় নাই। ইহার দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি সভাপতি মনোনীত হন। ১৩৩৯ সালে ইহার দশম অধিবেশনের মূল সভাপতি তিনি হন। ইহা এলাহাবাদে হয়। এই উপলক্ষে নানা কথার মধ্যে তিনি বলেন,

"আমরা প্রবাসী বাঙালিদিগকে অন্যান্য প্রদেশে বঙ্গের কালচ্যারাল দূত মনে করি।..তাঁহাদের সমগ্র জীবনে বঙ্গের সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যাইবে ইহাই আমাদের বক্তব্য। তাঁহারা যে প্রদেশে বাস করিবেন, তথাকার সংস্কৃতি দ্বারাও নিজের হৃদয়মনের সমৃদ্ধি বাড়াইতে চেষ্টা করিবেন। নিজের জীবনে বঙ্গের সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গেলে উহার সাহিত্যের ও ললিতকলার চর্চা রাখা আবশ্যক। সাহিত্যের প্রসার উৎকর্ষ ও চর্চা বৃদ্ধি শিক্ষাবিস্তারের ও শিক্ষিত লোকদিগের সংখ্যার উপর নির্ভর করে।"

তিনি তাঁহার অন্যান্য বক্তৃতার মতো এখানেও নানা তথ্য ও স্টাটিস্টিক্‌স্-এর সাহায্যে এই সকল বক্তব্য আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন।

১৩৪০-এর এই সম্মেলনের অধিবেশন গোরখপুরে হয়। তাহাতে রামানন্দ সাংবাদিকী শাখার সভাপতি হন। এই অধিবেশনের বিবরণ, অন্য বক্তাদের বক্তৃতা ও ছবির জন্য প্রবাসীর ১৪ পৃষ্ঠা খরচ হয় কিন্তু রামানন্দের নিজের বক্তৃতার কোনো রিপোর্ট নাই। ১৩৪১-এ কলিকাতায় এই সম্মেলন বসে। রামানন্দ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। টাউন হলে মহা সমারোহে অধিবেশন হইত। রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র প্রভৃতি এক-একদিন এক-একজন সভার উদ্বোধন করেন। স্টিমার পার্টি, উদ্যান সম্মেলন, ভ্রমণ, ভোজ প্রভৃতি নানা আয়োজনে প্রতিনিধিদের তৃপ্ত করা হয়। অভ্যর্থনা সমিতির কয়েকটি মানুষের চেষ্টাতেই সব হয়। বেশি সহায় তাঁহাদের ছিল না। অর্থসংগ্রহ করিতে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রত্যেক প্রতিনিধির স্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। নিজের কোনো কাজে নানা বাধার সম্মুখীন হইতে হইলে পাঁচজনকে তাহা বলিয়া বেড়াইবার মানুষ তিনি ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার কয়েকটি কথা হইতে বুঝা যায় এই মহাসমারোহের যজ্ঞকে সফলতা দান করিতে ও সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

১৩৪২-এ (মাঘ) নবদিল্লিতে যখন এই সম্মেলন হয় তখন তিনি ইহার দ্বার উন্মোচন করেন। শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্তী বলেন,

"এই সম্মেলনের সহিত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের যোগাযোগ অচ্ছেদ্য ছিল। এক কথায় বলিতে গেলে তিনি ছিলেন এই সম্মেলনের ভীষ্ম পিতামহ। ১৩৪৩-এর ১৩ই পৌষ রাঁচীতে রামানন্দ সম্বর্ধনা উপলক্ষে সম্মেলন তাঁহাকে যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন তাহাতে বলা হয়, 'আজ যে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন প্রেমমন্ত্রে স্বীয় ভাষা জননীর সংস্কৃতির ভিত্তিতে বৃহত্তর বাঙ্গলা গঠন প্রয়াসে বাঙ্গালিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন, তাহারও উদ্বোধন-গীতি আপনারই 'প্রবাসী' সাধনার মধ্য দিয়া প্রথম ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। আপনার ঋণ মাতৃঋণের ন্যায়ই অপরিশোধ্য।'

"একথা কিছুমাত্র অত্যুক্তি নহে। তাঁহারই স্নেহচ্ছায়ায় বর্ধিত হইয়া সম্মেলন আজ এত বড়ো এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়াছে।...

"তিনি ৭৫।৭৬ বৎসর বয়সে নিদারুণ শীত ও অন্যান্য অসুবিধা সত্ত্বেও জামশেদপুরে সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। সেই বৎসরই তাঁহার শেষ যোগদান। সে বারের অধিবেশনে তিনি যে অভিভাষণ দেন তাহা খুবই মর্মস্পর্শী। মনে

পড়ে তিনি বলিয়াছিলেন, হয়ত আমি আর থাকব না, ক্রমেই দেহ অপটু হচ্ছে। জীর্ণদেহ নিয়ে আপনাদের সম্মুখে এসে অন্তরের কথা বলতে পারব না। কিন্তু আমি সব সময়ই এ আশা পোষণ করব—আপনারা এ সম্মেলনকে আরও বৃহত্তর করে তুলবেন।..."

প্রবাসী বাঙালির প্রতি তাঁহার যে গভীর ভালবাসা, তাহারই একাংশ 'প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে'র প্রতি অনুরাগরূপে তাঁহার জীবনে শেষ বিংশ বৎসর দেখা দিয়াছিল। 'প্রবাসী' পত্রিকার নামের সহিত ইহার সাদৃশ্য রামানন্দের ইচ্ছা হইতে জাত না হইলেও 'প্রবাসী' নামটির লোকপ্রিয়তা তাঁহার প্রবর্তিত 'প্রবাসী' পত্রিকা হইতেই হয় এবং অনেকে এই কারণে 'প্রবাসী'র সম্পাদক রামানন্দকেই প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের হর্তাকর্তা মনে করিতেন। বাস্তবিক অনেক দিকেই তিনি ইহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এই সম্মেলনের ১৩৪২-এর দিল্লি অধিবেশনের সময় রামানন্দ যে সুদীর্ঘ সচিত্র প্রবন্ধ লেখেন তাহাতে আছে,

"এই কাগজখানির নাম 'প্রবাসী' রাখায় ৩৫ বৎসর ধরিয়া লোকমুখে ও ছাপার অক্ষরে 'প্রবাসী' শব্দটির ব্যবহার যতবার হইয়াছে আগে ততবার বোধহয় ৩৫ বৎসরে কখনো হয় নাই। প্রবাসী, প্রবাসী বাঙালি প্রভৃতি কথার আধুনিক প্রয়োগ ও প্রচলনের দায়িত্ব ও অপরাধ আমি অস্বীকার করিতে পারি না।"

এই সম্মেলনের কোনো অধিবেশন হইবার দুই-তিন মাস পূর্ব হইতেই তিনি 'প্রবাসী'তে অধিবেশনের স্থান সময় নানা শাখার সভাপতি প্রভৃতির নামধাম ও ছবি বার বার প্রকাশ করিতেন। তখন এই সম্মেলন দেশে সুপরিচিত ছিল না। ইহার আগমনী ঘোষণা ও উৎসবান্তে সন্দেশ বিতরণের জন্য তখন বেশি লোকে ব্যস্ত হইতেন না। মুষ্টিমেয় প্রবাসী বাঙালির কথা ছাপার অক্ষরে ও অজস্র ছবিতে বাংলার ঘরে ঘরে জানানো রামানন্দেরই বিশেষ আনন্দের কার্য ছিল।

কলিকাতার অধিবেশনে কন্যাকুমারিকা অবধি হিমাচল পর্যন্ত নানা স্থান হইতে বঙ্গমাতার যে-কয়টি প্রবাসী সন্তান অল্প কিছুদিনের জন্য মার ক্রোড়ে ফিরিয়া একত্রে উৎসবে মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে একাত্মতা জাগাইয়া তোলা, বাঙালিত্ব এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের ভালোবাসাকে সচল করিয়া তোলা এবং পরোক্ষভাবে নিজেকে তাঁহাদের প্রতিজনের আত্মীয়স্বরূপ করিয়া তোলার কার্যেই তিনি ছিলেন অসাধারণ।

ভারতের নানা শহরে ইহার অন্যান্য অধিবেশনে তিনি যখন যাইতেন তখন তিনিই যেন বাংলার বাণী সেখানে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। অধিবেশনের কার্যের ফাঁকে ফাঁকে মহিলা সাহিত্য-সভা, রামমোহন স্মৃতিসভা, রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক সভা—যখন যাহা পড়িত সবই তিনি বাংলার প্রতিনিধি হইয়া সুসম্পন্ন করিয়া আসিতেন। কোনো বাঙালির অনুষ্ঠানকে তিনি বঞ্চিত করিতেন না। ঐ কয়দিনে যেন বাংলার সহিত বঙ্গেতর প্রদেশের যোগসূত্র বাঁধিয়া দিয়া আসিতেন। বাঙালি যে বাঙালি এবং তাহাতে যে তাহাদের গৌরব আছে একথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আসিতেন।

রামানন্দ ভারতীয় সকল মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের কোনো জন্মতিথি সভায় সভাপতিরূপে রামমোহন ও বুদ্ধদেব প্রভৃতির সহিত বিবেকানন্দের আত্মিক সম্পর্কের কথা বলেন। তিনি বলেন, "ভারতীয়দের যে একটা বদ্ধমূল নিকৃষ্টতাবোধ (inferiority complex) এবং পরাজিতের অবসাদ আছে, বিবেকানন্দ তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

রামানন্দ ইহাও বলেন,

"আজকাল আমাদের দেশে ধর্মের প্রতি ঔদাসীন্যের ভাব দেখা যাইতেছে, তাহা অংশত স্লেভ মেন্টালিটি বা দাসমনোভাবের ফল। অনেকে মনে করেন, যে-হেতু রুশিয়ার প্রবল রাজনৈতিক দল ধর্মকে উড়াইয়া দিতেছে, অতএব ধর্মটর্ম কিছু নয়। অন্য জাতির লোক একটা কিছু করিতেছে বলিয়াই আমাদিগকেও তাহাই করিতে হইবে ইহা ঠিক নয়। বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, তাহারা ঠিক পথ ধরিয়াছে কি না। দ্বিতীয়ত, ধর্মের নাম ও আকারটা রুশিয়ার প্রবল দল বর্জন করিলেও ধর্মের অন্যতম সারবস্তু যে কল্যাণে বিশ্বাস এবং কল্যাণের অবশ্যম্ভাবী প্রতিষ্ঠার বিশ্বাস এবং তাহার জন্য অদম্য চেষ্টা, তাহা রুশিয়ায় রহিয়াছে। তৃতীয়ত, ধর্মের সহিত জড়িত আবর্জনাগুলা বাদ দিয়া ভারতীয় মহামানবদের মত, বিশ্বাস ও চরিত আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, ধর্ম কত বড়ো ও কিরূপ হিতকর জিনিস।"

রামানন্দ বৃটিশরাজের ভক্ত না হইলেও সরকারি কলেজের ছেলেরাও তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া নিজেদের সভায় পৌরোহিত্য করাইত। মজঃফরপুরের এইরূপ একটি কলেজে একবার "একটি যথাসম্ভব হাবিষ্যিক অর্থাৎ অরাজনৈতিক বক্তৃতা" দিতে যাইবার সময় তাঁহাকে মোকামা স্টেশনে অনেকক্ষণই অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। সেখানে এক ইংরেজও সেই অবস্থায় পড়িয়া আপনা হইতে রামানন্দের সহিত আলাপ জুড়িয়া দেন। লোকটি একবার বলিলেন, "আপনাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন দলের নেতারা মতের অনৈক্যকে ব্যক্তিগত শত্রুতায় পরিণত করেন, ইংলন্ডে মতের অনৈক্য এবং বিরোধ থাকিলেও নেতাদের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব থাকিতে পারে। যেমন দেখুন না, মিঃ চার্চিল ও স্যর সামুয়েল হোরের মতভেদ খুব আছে, কিন্তু বন্ধুত্বও আছে।" রামানন্দ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়া বলিলেন, "আমাদের দেশেও এরূপ দৃষ্টান্ত আছে।" তিনি ইংরেজের কাছে হার মানিবার পাত্র ছিলেন না। তারপর হাসিয়া বলিলেন, "ইংলন্ডের দলনায়কদের পার্লামেন্টে এবং সভাসমিতিতে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বন্ধুত্ব—যেমন হোর ও চার্চিলের—রঙ্গমঞ্চে অভিনেতাদের যুদ্ধ এবং গ্রিনরুমে বা নেপথ্যে তাহাদের বন্ধুত্বের মতো।" ইংরেজটি সায় দিলেন। কিন্তু রামানন্দের কথার মধ্যে যে পরিহাস প্রচ্ছন্ন ছিল, অর্থাৎ পার্লামেন্ট রঙ্গমঞ্চে হোর ভারতবন্ধু এবং চার্চিল ভারত-বিরোধী সাজিলেও পার্লামেন্ট গৃহের বাহিরে উভয়েই বৃটেন-বন্ধু এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দুই শত্রুরই নীতি মূলত ও কার্যত এক, ইহা সেই ইংরেজটি বুঝিয়াছিলেন কিনা জানি না।

দেশের কাজে নানা প্রদেশ হইতে রামানন্দের কত যে ডাক আসিত এবং কত, কথা যে সে বিষয়ে তাঁহার বলিবার ছিল তাহা তাঁহার কয়েকটি কথা হইতে খানিক বুঝা যায়:

"আমাকে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যাইতে হইতেছে। তাহাতে আমার অভিজ্ঞতা বাড়ে। যেখানেই যাই, সেখানে যাহা দেখি শুনি সে-বিষয়ে অনেক লিখিবার আছে মনে হয়। কিন্তু সময়ের অভাবে এবং জায়গার অভাবে প্রায়ই এরূপ কিছু লেখা হয় না। আমার হাতে একখানা বাংলা ও একখানা ইংরেজি দৈনিক থাকিলে হয়ত অনেক কথা লেখা চলিত।"

এইরূপ দেশ-বিদেশ ঘোরার জন্য অনেকের চিঠির জবাব যথাসময় দিতে পারেন নাই বলিয়া কাগজে তাঁহাদের নিকট ক্ষমা চাহিয়াছেন, কারণ চিঠির উত্তর না-দেওয়াকে তিনি কথার উত্তর না-দেওয়ার মতো অভদ্রতা মনে করিতেন। আমাদের দেশে ভাল রিপোর্টার না থাকায় তাঁহার অনেক মূল্যবান কথা কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। তিনি সঙ্গেও কোনো লোক লইতেন না, না হইলে হয়ত বক্তৃতাদি কিছু-কিছু লেখা থাকিত। নানা দেশের নানা

লোকের মনে তাঁহার ব্যক্তিত্ব, ব্যবহার, কথা, বক্তৃতার কিছু কিছু ছাপ আছে। তাহা যদি সংগ্রহ করা সম্ভব হইত, সংগ্রাহক তেমন থাকিতেন এবং তাঁহারা তেমন সহযোগিতা পাইতেন, তবে শুধু সেই সংগ্রহটিই একটি সুন্দর জিনিস হইতে পারিত।

পি-ই-এন নামক লেখকদের মূল সভা লন্ডনে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীতে ৩৫টি দেশে এই সভার ৫০টি শাখা ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ছিল। ১৯৩২-এই ইহার ভারতীয় শাখার সম্পাদিকা ম্যাডাম সোফিয়া ওয়াডিয়া রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে জানান, যে, তাঁহাকে এই সভার ভারতীয় শাখার অন্যতম সহকারী সভাপতি করিবার কথা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তুলিয়াছেন। সেইজন্য ঐ সালের ১৬ ডিসেম্বর রামানন্দ অন্যতম সহকারী সভাপতি হইতে রাজি হন। রবীন্দ্রনাথ আগে হইতেই সভাটির লন্ডন কেন্দ্রের সম্মানিত সভ্য ছিলেন এবং পরে ভারতীয় শাখার সভাপতি হইতে সম্মত হন।

আমাদের বাংলা দেশে একদল লোক রামানন্দকে সাহিত্যিক কী লেখক পর্যন্ত বলিতে রাজি হন না, কারণ প্রত্যেক মাসে মাসিক দুইটি পুস্তিকা লেখা সত্ত্বেও তিনি অতিরিক্ত বিনয় করিয়া বলিতেন, "আমি প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ ছাড়া কোনো বই লিখি নাই।" কিন্তু জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ পি-ই-এনের সহকারী সভাপতিরূপে এই বজ্রলেখনী নিবন্ধকারকেই নির্বাচন করিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে পি-ই-এনের E অক্ষরটি-essayist অর্থাৎ প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লেখকদের জন্যই সাহিত্য সভায় ব্যবহার করা হইয়াছে। পি-ই-এন হইতে প্রকাশিত অন্নদাশঙ্কর রায়ের বাংলা সাহিত্য-বিষয়ক পুস্তকের ভূমিকা রামানন্দকে লিখিতে হয়। তিনি লেখককে রচনা-কার্যের প্রারম্ভেও কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন, অবশ্য লেখকের সমস্ত মতামত লেখকের নিজেরই।

বাংলা ১৩৩৯ সালে রামানন্দ বোম্বাইয়ে অধ্যাপক কারবে ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী-সম্মান বিতরণ করেন। এখান হইতে কারবের পুত্রের সহিত পুনা যান। মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনাস্থিত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডক্টর শ্রীমতী কমলাবাই দেশপাণ্ডে (প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ-ডি.) স্বহস্তে তাঁহাকে ডাল ভাত তরকারি রাঁধিয়া খাওয়ান। কারবে মহাশয় প্রধানত পুনায় হিন্দু বিধবা-নিবাস এবং ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, প্রাণস্বরূপ ও প্রধান পরিচালক বলিয়া বিদিত। তিনি রামানন্দের বন্ধু ছিলেন। তিনি বলেন, 'কারবের মতো মানুষ ভারতে ও পৃথিবীতে দুর্লভ।'

দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য রামানন্দ বহু চেষ্টা করিয়াছেন। বাংলা দেশে কুষ্টিয়া, চট্টগ্রাম বিশেষত বাঁকুড়া প্রভৃতি শহরে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠায় তিনি বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। এই উপলক্ষে সভাপতি হইয়া তিনি ১৩৪০-এ চট্টগ্রাম যান। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জীবনের শেষ কয় বৎসর বহু পরিশ্রম করেন। যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়াতে সমস্ত আয়োজন হওয়ার পরও যন্ত্রপাতির অভাবে কল তখন চালানো যায় নাই।

১৯৩৪-এর বোম্বাই কংগ্রেসের অধিবেশনের একদিন আগে ২৫ অক্টোবর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-বিরোধী সমগ্র ভারতীয় সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ২৬ তাহা শেষ হয়। প্রবাসী-সম্পাদককে তাহার সভাপতি নির্বাচন করা হয়। বোম্বাইয়ের ভূতপূর্ব রাজস্ব-সচিব অ্যাডভোকেট স্যর গোবিন্দরাও বলবন্ত প্রধান ইহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোনীত হন। এরূপ সম্মেলন এই প্রথম হইল। ইহার পশ্চাতে কংগ্রেসের মতো কৃতিত্বপূর্ণ ইতিহাস ছিল না এবং ইহা কেবল একটিমাত্র জিনিসের বিরোধিতা করিবার জন্য আহূত

হয়। তথাপি প্রতিনিধি ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশ হইতে আসিয়াছিল। লোকও যথেষ্ট হইয়াছিল, যদিও কংগ্রেসের মতো হয় নাই। ইহাতে রামানন্দ যে সুদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেন সম্মেলনের বিরোধী কোনো কাগজ তাহার কোনো উক্তির বা অংশের প্রতিবাদ বা ভ্রম প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, ইহার কোনো যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই। এই সভার উদ্বোধন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় করেন। সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবগুলির ভিতর প্রধান একটি এই :

"এই সম্মেলনেব অভিমত এই যে, জাতি, বর্ণ, স্ত্রীপুরুষ ও ধর্মবিশ্বাস নির্বিচাবে অসাম্প্রদায়িক সম্মিলিত নির্বাচকমণ্ডলী এবং সমান নির্বাচনাধিকাবের ভিত্তিব উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোনোরূপ প্রতিনিধি-নির্বাচন প্রণালী গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং এই শর্তও পালিত হওয়া আবশ্যক, যে, কোনো সম্প্রদায়কে ন্যায্য স্বার্থ ত্যাগ করিতে বাধ্য কবা হইবে না।"

১৯৩৪-এর বোম্বাই কংগ্রেসেও রামানন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেই বিষয়ে প্রবাসীতে অন্যান্য কথার ভিতর আছে :

"কাজেব মধ্যে মধ্যে বেদীর উপর আসীন নেতাদের পরস্পরের সহিত পরামর্শ এবং গল্পগুজবও চলিত। বেদীতে কিছুক্ষণ থাকায় ইহা আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমি অবশ্য সাংবাদিক বলিয়া প্রথমে প্রায় সাত আট শত সাংবাদিকের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট ছিলাম। পবে অভ্যর্থনা-সমিতির অন্যতম সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত পাটিল আমাকে বেদীতে লইয়া যাওয়ায় মহাত্মা গান্ধী, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সর্দার বল্লভভাই পটেল প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ হইল।"

বোম্বাই হইতে ফিরিবার পথেই বোধ হয় তিনি লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদ হইয়া আসেন। লক্ষ্ণৌয়ের অধ্যাপক রাধাকুমুদ ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি রামানন্দের মানবপ্রেমের এবং ছোটোবড়ো নির্বিচারে সকলের সুখ-দুঃখে সহানুভূতির নানা পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন। বন্ধুগোষ্ঠীর ভিতর কাহারও জীবনের কোনো দুঃখ কী সংগ্রামের কথা জানিলে তিনি তাঁহার পরমাত্মীয়ের মতো তাঁহাকে সংগ্রাম-জয়ের শক্তি জোগাইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। প্রবাসে কয়েক দিনের জন্য গিয়াও তিনি এইরূপ মহামানবতার বহু পরিচয় দেন। বাংলা ১৩৪১-এর ১১, ১২ ফাল্গুন দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-বিরোধী কনফারেন্স হয়। এই সভাতেও তিনি একজন প্রধান কর্মী ছিলেন।

ইংরেজি ১৯৩৪ নবেম্বর কলিকাতায় বিখ্যাত খ্রিস্টিয় মিশনরি উইলিয়ম কেরির মৃত্যু শতবার্ষিক স্মৃতিসভায় তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

'প্রবাসীতে কোনো লেখকের গল্পের কোনো নায়ক-নায়িকা যদি কাহাকেও "ছোটোলোক" বলিতেন, তাহা হইলে সেই কাল্পনিক নীচজাতির স্বজাতীয় ব্যক্তিরা প্রবাসীর সম্পাদককে আক্রমণ করিতেন। কিন্তু যখন আমাদের দেশে সরকার বাহাদুর একদল মানুষকে 'তপশীলভুক্ত' অর্থাৎ 'ছোটোজাত' মার্কা মারিয়া দিলেন, তখন অনেক জাতি আপত্তি করিলেন না। ইহাতে রামানন্দ বলেন,

"যাঁহাদের স্বদেশবাসীরা তাঁহাদিগকে 'নীচ জাত' বলিলে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হন (এবং তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক ও ন্যায়সংগত) এবং আপনাদের দ্বিজত্ব প্রমাণ করিতে চান, ইংরেজরা তাঁহাদিগকে পরোক্ষভাবে 'নীচজাত' সকলের তালিকাভুক্ত করিলে দেখিতেছি তাঁহারা খুশী হন।"

কতকগুলি জাতি "নীচজাত" হইতে আপত্তি করাতে প্রবাসী-সম্পাদক তাঁহাদের প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন,

"হিন্দু সমাজ জাগ্রত হউন। বিশেষ করিয়া জাগ্রত হউন যাঁহারা আপনাদিগকে সনাতনী বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনেকে আমাদের চেয়ে ভাল করিয়াই জানেন, যে, শাস্ত্র অনুসারে যাঁহারা মুনি-ঋষি বলিয়া পূজনীয় ও পূজিত তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সেইরূপ পিতা বা মাতার সন্তান যাঁহাদের স্বজাতিদিগকে এখন সনাতনীরা অনাচরণীয় মনে করেন। আধুনিক সনাতনী মত ও আচার বাস্তবিক সনাতনী মত ও আচাব নহে।"

তপশীলভুক্ত জাতিদের আত্মমর্যদাসম্পন্ন করিতে তিনি চাহিতেন। ১৩৪২ আষাঢ়ে ঝিনাইদহে (বঙ্গে) তপশীলভুক্ত জাতিদের কনফারেন্স হয়। তাহাতে রামানন্দ যোগদান করিতে গিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের কোনো কোনো কাজে রামানন্দ বিদেশে যাইতেন। দেওঘরে মিশনের বিদ্যাপীঠের কার্যে তিনি ১৩৪২এর ফাল্গুন মাসে যান। বিদ্যাপীঠ দেখিয়া তিনি আনন্দিত হন।

১৩৪৩এ সরিষার মিশনের দুই বিদ্যালয়ের সভায় তিনি পৌরোহিত্য করেন।

১৩৪২ সালে তিনি বোড়ালে রাজনারায়ণ বসুর পৈতৃক বাসভবনের ভগ্নাংশ দেখিতে যান এবং দিনাজপুর জেলায় বালুরঘাট উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালযের রজত-জয়ন্তী উৎসবে সভাপতি হইয়া যান। বাঁকুড়ার সকল কাজেই তিনি অগ্রণী ছিলেন, সেখানে ১৩৪১ peoples Bank-এর দ্বার উন্মোচন করেন।

পৃথিবীতে কোনো গবর্নমেন্ট-পক্ষীয় লোক নহেন এরূপ কতকগুলি আদর্শানুরাগী (idealist) মনীষী আছেন যাঁহারা বাস্তবিক জাতিতে জাতিতে শান্তি চান। তাঁহারা লেখা, বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা সকল দেশের জনসাধারণকে যুদ্ধ-বিরাগী ও শান্তির অনুরাগী করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মুখপাত্রস্বরূপ ফ্রান্সের বিখ্যাত সম্পাদক ও গ্রন্থকার আঁরি বারবুস (১৯৩৫) নবেম্বর মাসে প্যারিসে শান্তিবাদের সমর্থক একটি কংগ্রেসের আয়োজন করেন। তাঁহারা সকল দেশের লোকদের সমর্থন চাহেন। সকল দেশের প্রতিনিধিদের কংগ্রেসে উপস্থিত হইবার কথা ছিল, যাঁহারা উপস্থিত হইতে না পারিবেন তাঁহারা নিজ বক্তব্য লিখিয়া পাঠাইবেন কথা হয়। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, সরোজিনী নাইডু ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিমন্ত্রিত হইয়া প্রতিনিধিত্ব করিতে সম্মত হন। তৎপূর্বে, ইটালি ও আবিসিনিয়ায় যাহাতে যুদ্ধ না বাধে এবং যাহাতে জগতের জাতিসমূহের সহানুভূতি আবিসিনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহার জন্য প্যাবিসে একটি আন্তর্জাতিক সভার আয়োজনও আঁরি বারবুস করিয়াছিলেন এবং তাহাতে ভারতবর্ষ হইতে উক্ত চারিজনের সহানুভূতিজ্ঞাপক টেলিগ্রাম যাইবার কথা ছিল। প্রবাসী-সম্পাদকের টেলিগ্রাম ২ সেপ্টেম্বর রোম্যাঁ রোলাঁ মহাশয়ের নাম প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সভা ও এই কংগ্রেসের আয়োজন সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই আঁরি বারবুসের মৃত্যু হয়।

রামানন্দ ১৯১০-এর পর কংগ্রেস দলভুক্ত ছিলেন না এবং ১৯৩৫-এ বা অন্য সময় সুভাষচন্দ্র বসুর সকল মতের সমর্থক ছিলেন না। কিন্তু ১৯৩৫-এ যখন তৎকালীন কংগ্রেস-যন্ত্রের অধিকারীরা বঙ্গের কংগ্রেসপন্থীদের প্রতি কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যের ভাব দেখান এবং আসাম, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, মহাকোশল ও বাংলাদেশ হইতে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস-সভাপতি করিবার ইচ্ছা প্রকাশিত হইলেও কংগ্রেস আপিস ও কংগ্রেস-যন্ত্রাধিকারীরা জবাহরলালকে সভাপতি করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন রামানন্দই সুভাষবাবুকে পরবর্তী কংগ্রেসের সভাপতি করিবার পক্ষে কয়েকটি বড়ো যুক্তি দেখান। তাঁহার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির মূল্য আজ

লোকে বুঝিবে। তখন যাঁহারা কংগ্রেস-যন্ত্রের অধিকারী ছিলেন, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে যে-মত ও যে-ভাব পোষণ করিতেন, কংগ্রেস জাতীয় দলের মনোভাব ও মত তাহার বিপরীত ; এবং কংগ্রেস জাতীয় দল বঙ্গে প্রবল ছিল। বাংলা দেশকে কংগ্রেস-যন্ত্রের অধিকারীদের পছন্দ না করিবার ইহা একটি কারণ বলিয়া রামানন্দ মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, যখন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রকাশিত হয় নাই এবং কংগ্রেস জাতীয় দল গঠিত হয় নাই, তখনও যে ঐ অধিবাসীরা বাংলা দেশকে ও বাঙালিদিগকে পছন্দ করিতেন, এমন নয়। তিনি আরও বলেন যে ১৯২২ সালে চিত্তরঞ্জন দাশ কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার পর বঙ্গের অধিবাসী কোনো বাঙালিকে কংগ্রেসের সভাপতি করা হয় নাই। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ১৯২৫-এ সভাপতি হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বাঙালি হইলেও বঙ্গে থাকেন না, বাংলা বলেন না এবং বঙ্গের সহিত ও তাহার সংস্কৃতির সহিত তাঁহার বিশেষ কোনো যোগ নাই। বঙ্গের মতো জনবহুল প্রদেশ হইতে এত বৎসর ধরিয়া একজনকে সভাপতি না-করা সুবিবেচনার কাজ হয় নাই। যে সুভাষ আজ দেশপূজ্য, এক সময় তাঁহাকে কংগ্রেস-নায়ক করিবার জন্য রামানন্দই সকলের অগ্রণী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তবে সেবার তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। কংগ্রেসের রজত-জয়ন্তীর সময় রামানন্দ লেখেন,

> "কংগ্রেসের যে ইতিহাস ইংবেজিতে ও ভারতবর্ষের কযেকটি ভাষায় প্রকাশিত হইবে, তাহাতে সকল প্রদেশের কর্মিদের কর্মিষ্ঠত. ও আত্মোৎসর্গের প্রতি সমভাবে সুবিচার হইবে কি না বলা যায় না। নিরপেক্ষভাবে এরূপ একটি ইতিহাস লেখা বড়ো কঠিন। যিনি বা যাঁহাবা লিখিবেন, তাঁহার বা তাঁহাদের এক বা একাধিক প্রদেশের কংগ্রেসকার্য সম্বন্ধে জ্ঞান বেশি, (বা) তাহার প্রতি অনুবাগ বেশি থাকিতে পারে। সুতরাং অন্য সব প্রদেশের প্রতি তথাকার লোকদের মতে সুবিচার না হইতে পাবে। কিন্তু তাহা লইয়া প্রদেশে প্রদেশে বিন্দুমাত্রও ঈর্ষাদ্বেষ হওয়া উচিত নয়। কেহ ইচ্ছা করিয়া কোনো প্রদেশকে খাটো করিবাব চেষ্টা করিতেছে, এরূপ মনে করা উচিত নয়।"

যৌবনে রামানন্দ স্বয়ং প্রায় কুড়ি বৎসর কংগ্রেসের একজন বড়ো কর্মী ছিলেন। তাঁহার বিষয়ে কংগ্রেসের কোনো ইতিহাসে একটিও কথা আছে কি না জানি না।

কংগ্রেসের ফলাফল সম্বন্ধে তিনি বলেন,

> "অনেকে মনে করেন, কংগ্রেস পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিল, অথচ এখনও স্বরাজ লাভ করিতে পারিল না, এবং এইরূপ মনে করায় তাহার প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব দেখান। অন্য কোনো কোনো দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে হয়ত তাঁহাদের মত পরিবর্তন হইতে পাবে।...
>
> "...কংগ্রেস আর কিছু না করুন, নিরক্ষর কতক লোকের মধ্যেও যে রাজনৈতিক জাগরণ আনিয়াছেন, ইহা কম কাজ নয়। অন্তঃপুরিকাদিগকেও বাহিরে আসিয়া স্বরাজ-প্রচেষ্টায় যোগ দিতে কংগ্রেস প্রবৃত্ত করিতে পারিয়াছেন, ইহা কম সাফল্য নয়। কংগ্রেসের প্রভাবে স্বদেশহিতৈষণার প্রেরণায় অন্তত লক্ষাধিক লোকও যে নির্ভীক হইয়া সর্ববিধ দুঃখ-বরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, অনেকে সর্বস্বান্ত হইয়াও আদর্শ ত্যাগ করেন নাই, অনেকে প্রহৃত ও কারারুদ্ধ হইয়াও পতাকা বর্জন করেন নাই, ইহা কংগ্রেসের নিষ্ফলতার প্রমাণ নহে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্ত বহু অন্তঃপুরিকাও লোকচক্ষুর অগোচরে জীবন-যাপন ছাড়িয়া দিয়া নির্ভয়ে কংগ্রেসের পতাকার তলে সমবেত হইয়াছিলেন, কারাগারে বাস ও অন্যবিধ দুঃখ-বরণ করিয়াছিলেন, ইহা কংগ্রেসের কম কৃতিত্ব নহে। সাধারণ সংগ্রামের মতো, অহিংসার পথে সংগ্রাম ও স্বরাজ লাভের জন্যও প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। অন্তত

কতকগুলি মহিলা ও পুরুষকে কংগ্রেস যে এই অহিংস সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিতে পারিয়াছে, ইহা তাহার একটি অবদান।"

১৩৪২ সালে এলাহাবাদে অর্ধকুম্ভযোগের মেলায় রামানন্দ উপস্থিত ছিলেন। মাঘ মেলা ও কুম্ভমেলা প্রভৃতিতে যাত্রীদের আড্ডা, সন্ন্যাসীদের আড্ডা, মিছিল প্রভৃতি দেখিতে তিনি খুব আগ্রহান্বিত ছিলেন। ইহাদের বিষয় অনেক সুচিন্তিত মন্তব্য তিনি তাঁহার পত্রিকাতে লেখেন।

বাঁকুড়ায় উৎপন্ন বনজ স্বভাবজাত কৃষিজাত কুটিরশিল্প দ্বারা উৎপন্ন বা বৃহৎ কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবসা দ্বারা বাঁকুডার লোকদের ধনাগম বাড়ানো যায় কিনা, বাঁকুড়ায় বাব বার দুর্ভিক্ষ হওয়ায় এবং দরিদ্রদের উদরপূর্তির জন্য অপবের দ্বারস্থ হইতে বাধ্য হইতে দেখিয়া, রামানন্দ বাঁকুড়ার সংগতিপন্ন ব্যবসাদারদের ভাবিতে বলেন। ইঁহাদের সাহায্যে বাঁকুড়ার ধনবৃদ্ধির চেষ্টা রামানন্দ বহুদিন ধরিয়া করিয়াছিলেন। বাঁকুড়ায় যখন যে কোনো কাজে ডাক পড়িত তখনই তিনি তাহাতে সকল কাজের মধ্যেও অবসর করিয়া গিয়া উপস্থিত হইতেন।

১৩৪৩-এর ২৫ বৈশাখ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও কলিকাতা শাখা পি-ই-এনের সভ্যগণ বরাহনগরে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধিত করেন।

বাংলাদেশের তুলনায় মাদ্রাজের ছেলেরা জ্ঞানগর্ভ ইংরেজি বহি বেশি পড়ে। এই কারণে 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকার আদর বাঙালি ছেলেদের চেয়ে মাদ্রাজি ছেলেদেব নিকটই বেশি ছিল। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু একবার তাঁহার ছাত্র রামানন্দকে বলেন, "তোমার মডার্ন রিভিয়ু মান্দ্রাজিরা গল্পের মতো করিয়া পড়ে।" মাদ্রাজে কলেজের ছেলেরা বামানন্দকে নমস্য মনে করিত। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত অন্ধ্রদেশের কলেজসমূহের ছাত্রদের একাদশ বার্ষিক কনফারেন্সে তাঁহারা রামানন্দকে সভাপতি নির্বাচন করেন। তাঁহারা প্রয়োজনের অপেক্ষা অনেক অধিক পাথেয় সভাপতিকে পাঠান। অতিরিক্ত টাকা অবশ্য সভাপতি ফেরত দেন। এখানে ভিন্ন ভিন্ন সভায় শিক্ষিত জনসাধারণের জন্য রাজনৈতিক বক্তৃতা এবং প্রার্থনা সমাজের উপযোগী বক্তৃতাও তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল।

অন্ধ্রদেশের প্রসিদ্ধ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক এবং লেখকাগ্রগণ্য বীরেশলিঙ্গম্ পান্তলু মহাশয়ের প্রস্তরমূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে জনসভায় সভাপতি-রূপে রামানন্দকে পরে বাজমহেন্দ্রি যাইতে হয়। রাজমহেন্দ্রিব কথা উপলক্ষে রামানন্দ স্বয়ং লেখেন,

"বিশ্রাম কবিয়া সন্ধ্যাব প্রাক্কালে স্থানীয় টাউন হলে নূতন ভারত-শাসন আইন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে গেলাম। টাউন হলটিতে বেশি লোক ধরে না বলিয়া উদ্যোক্তারা তাহারই সংলগ্ন ও এলাকাভুক্ত একটি খোলা জায়গায সভার আযোজন কবিযাছিলেন। স্থানটিতে বোধ হয় তিন হাজারেব কম লোক ধবে না। বক্তৃতার সময উহার কোনো অংশ খালি ছিল না। সভাপতি হইযাছিলেন ন্যায়পতি সুব্বারাও পান্তলু। ইঁহাকে রাজমহেন্দ্রিতে অন্ধ্রদেশের ভীষ্ম বলা হয়।..যেদিন আমি রাজমহেন্দ্রি পৌঁছি সেই দিনই তিনি সৌজন্য সহকারে আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। দেশি রীতি অনুসাবে বাহিরের কক্ষে জুতা খুলিয়া আসিয়া বসিলেন। বলিলেন, 'আমার অমুক সালের ইম্পিরিয়্যাল কৌন্সিলের একটি বক্তৃতার উপর আপনি মডার্ন রিভিয়ুতে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন।' পরিচয়ের পর আমাকে শুধাইলেন, 'আপনার বয়স কত?' আমি বলিলাম, 'সত্তর পার হয়েছে।' মৃদুস্বরে বলিলেন, 'মাত্র সত্তর!' আমার মতো জরাগ্রস্ত মানুষের বয়স সত্তর কম মনে হয় বটে। তাছাড়া আর একটি কারণও ছিল। আমার বয়স তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন, সুতরাং আমিও তাঁহার

বয়স জানিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, 'আশী'। তাঁহার কিন্তু অত বয়স দেখায় না।...

"তাঁহার সহিত আমার প্রধানত বর্তমানে আমাদের রাজনৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে কথা হয়। তিনি এই বলিয়া আরম্ভ করিলেন, 'আপনি তো বক্তৃতায় নূতন আইনটাকে টুক্রা করে ছিঁড়ে ফেললেন। কিন্তু স্বরাজ লাভের জন্য করা যায় কি? সব সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর লোকদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে সম্মিলিত চেষ্টা করা তো অসম্ভব করে তুলেছে।' আমি বলিলাম, 'তা মিথ্যা নয়, কিন্তু তাই বলে নিশ্চেষ্ট থাকাও উচিত নয়। আগে ঐক্য হবে, তার পর স্বরাজ লাভ চেষ্টা করব, এ রকম না ভেবে, প্রত্যেক সম্প্রদায়, শ্রেণী, দল, নিজ নিজ পন্থা অনুসারে স্বরাজ লাভ চেষ্টা করুন, সকলকে সহযোগিতা করতে ডাকুন, কিন্তু সহযোগিতা পান বা না পান, চেষ্টা অবিরত করতে থাকুন। এ ভিন্ন অন্য পথ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।' ইহাতে তিনি সায় দিলেন।

"পরদিন প্রার্থনা মন্দিরে আমাকে উপাসনা করিতে হইল। অপরাহ্ণে বীরেশলিঙ্গম্ পান্তলু মহাশয়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা।...সভাস্থল লোকে লোকারণ্য। উচ্চমঞ্চে সভাপতির আসন নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সেখান হইতে যতদূর চোখ যায়, কেবল মানুষ আর মানুষ।...আমি মূর্তিটির আবরণ উন্মোচন করিলাম। তাহার পর আমার বক্তৃতা ও অন্য অনেক বক্তৃতা হইল।.."

রাজমহেন্দ্রি যাইবার পথে তিনি পীঠাপুরম ও কোকোনাদ দেখিয়া যান। পীঠাপুরমের লোকহিতব্রত মহারাজা সূর্যরাও মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এবং মহারাজার লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি দেখিবার জন্যই তিনি বিশেষ করিয়া পীঠাপুরমে নামেন। তাছাড়া তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র প্রসাদের এক মাদ্রাজি সহপাঠী তাঁহাকে পীঠাপুরমে নামিতে অনুরোধ করেন। পীঠাপুরম এবং কোকোনাদায় তিনি নানা প্রতিষ্ঠান দেখেন ও বক্তৃতাদি করেন।

হিন্দু সম্প্রদায়ের সমস্যার সম্বন্ধে রামানন্দ চিরদিন ভাবিয়াছেন। তিনি হিন্দুর বিশেষ বন্ধু ছিলেন বলিয়াই হিন্দু মহাসভা দুইবার তাঁহাকে সভাপতি নির্বাচন করেন। পরে ইংরাজি ১৯৩৬-এর ১৫ অগস্ট কলিকাতায় ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে তিনি আশ্বিন ১৩৪৩-এ বঙ্গীয় হিন্দু সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে,

"বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় আজ সর্বতোভাবে বিপন্ন। কিন্তু বিপদ মানুষের মনুষ্যত্ব পরীক্ষার জন্যই আসিয়া থাকে, কাজেই এই বিপদে হিন্দু সম্প্রদায়কে হতাশ বা ভগ্নোদ্যম হইলে চলিবে না। যে-সমস্ত সমস্যা হিন্দু জাতির সমক্ষে আজ উপস্থিত হইয়াছে তাহাদের সমাধানের পথ খুঁজিয়া না পাইলেও তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস এই যে, হিন্দু জাতি বাঁচিয়া থাকিবে, উহার সুদিন পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। তিনি আরও বলেন যে, সার্বজনীন কল্যাণসাধন করাই হিন্দু জাতির চিরকালের বৈশিষ্ট্য, জাতি আবহমানকাল এই গুরুতর দায়িত্ব বহন করিয়া আসিয়াছে এবং এই দুর্দিনেও এই কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াই তাহারা কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে, তিনি তাহা বিশ্বাস করেন। তাঁহার মতে বর্তমানে বাঙ্গালি হিন্দুর সামাজিক সমস্যা হইতেছে প্রধানত দুইটি, (ক) নারীর অবস্থা ও অধিকার ইত্যাদি এবং (খ) তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়সমূহ।...বাঙ্গলাদেশে পুরুষ অপেক্ষা নারী কম জন্মিয়া থাকে। অন্যান্য দেশে নারী অপেক্ষা পুরুষেরাই বেশি আত্মহত্যা করিয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালার নারীরাই বেশি আত্মহত্যা করে। প্রসূতি-মৃত্যু সংখ্যাও বাঙ্গালায় অত্যন্ত বেশি। যে জাতির নারীর এই অবস্থা সেই জাতি বর্ধিষ্ণু হইবে কি করিয়া? এই সমস্যা রাষ্ট্রিক সমস্যা অপেক্ষাও গুরুতর। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়সমূহ সম্বন্ধে রামানন্দের মতো এই ছিল যে, মানুষকে মানুষের মর্যাদা ও সম্মান দিতেই হইবে। মানুষকে মানুষ বলিয়া গণনা করাই

সর্বাপেক্ষা বড়ো কথা এবং এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের প্রতি বর্ণ হিন্দুদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যন্ত তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা হইয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালার হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ভারত-সচিবের নিকট যে-আবেদন প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহাও ভারত-সচিব 'পত্রপাঠ বিদায়' দিবার মতো অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই অবস্থায় বর্তমানে হিন্দু সম্প্রদায়ের কী কর্তব্য, তাহা এই সম্মেলনই নির্ধারণ করিবেন। তবে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে হিন্দুজাতি টিকিয়া থাকিবে, হিন্দু মরিবে না।"

সভায় ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় সভাপতি হন।

ভারত-সচিবের নিকট সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ করিয়া হিন্দুদের যে আবেদন প্রেরণের কথা রামানন্দ উল্লেখ করেন তাহা এই সভার অধিবেশনের দুই-এক মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, নীলরতন সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষী, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রায় সমুদয় হিন্দু সদস্য, বহু মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাপতি, বহু পেন্সন-প্রাপ্ত হিন্দু জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট এবং বঙ্গের প্রধান প্রধান হিন্দু পত্রিকা-সম্পাদক প্রভৃতির স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া প্রেরিত হয়।

বাংলা দেশের নবদ্বীপ, ফরিদপুর, চন্দননগর, বীরভূম, মৈমনসিংহ, টাঙ্গাইল, কৃষ্ণনগর, গৌহাটি, শ্রীহট্ট, বেজগাঁ, শান্তিপুর প্রভৃতি নানা স্থানে বিদ্যালয়ের উৎসবে, সাহিত্য-সম্মিলনে অথবা ব্যবসায়ী সমিতিদের আহ্বানে এবং অন্যান্য কাজে ১৩৪৪ সালে ৭২ বৎসরে বয়সেও রামানন্দ একাকী গিয়াছেন।

এই বৎসর (১৯৩৬) দক্ষিণ-আমেরিকার বোয়েনাস আইরাস নগরে পি-ই-এন আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে প্রবাসী-সম্পাদক ভারতীয় অন্যতম সহকারী সভাপতিরূপে নিজের যে-বক্তব্য পাঠাইয়াছিলেন তাহা স্থানীয় কাগজগুলিতে স্পেনিশ ভাষায় অনূদিত হইয়া বাহির হয়।

বঙ্গদেশ ও আসামের অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি-বিধায়িনী সমিতির কাজের সহিত রামানন্দের সহকারী সভাপতি-রূপে বিশেষ যোগ ছিল। ইহাদের প্রচার-কার্য ও অন্যান্য কার্যে তিনি একজন সহায় ছিলেন। অনুন্নত মানুষদের প্রকৃত মনুষ্য-পদবাচ্য করিয়া তুলিবার কাজে তিনি চিরদিনই উদ্যোগী ছিলেন। ইহাদেরই কাজে ১৯৩৬-এর আগস্ট মাসের গোড়ায় তিনি ঢাকা যান। রামানন্দ যখনই ভারতের যে প্রদেশের যে শহর কি গ্রামে যাইতেন তখনই সেখানকার সকল প্রতিষ্ঠান দেখিয়া আসিবার চেষ্টা করিতেন। সেখানকার কর্মীরা তাঁহাকে দেখাইবার ও তাঁহার প্রশংসা পাইবার আনন্দই যে শুধু ইহার ফলে পাইতেন তাহা নয়, রামানন্দ কলিকাতায় ফিরিয়া এই সকল প্রতিষ্ঠান ও তাহার কর্মীদের বিবরণ এবং ছবি তাঁহার পত্রিকাগুলিতে প্রকাশ করাতে তাহা সর্বসাধারণের গোচর হইত। ঢাকাতেও সর্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানই রামানন্দ দেখেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যত্র ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির উদ্যোগে অনুন্নত শ্রেণীদের শিক্ষা বিষয়ে তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হয়। ডাঃ ঘোষও এই উন্নতিবিধান কার্যে উৎসাহী ছিলেন।

রামানন্দের একসপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে ১৮ জুলাই চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগ শহরে প্রবাসী ভারতীয় ও সিংহলি ছাত্র-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে একটি আনন্দসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতি হন শ্রীনীহাররঞ্জন রায়।

ভারতবর্ষে রাঁচিতে প্রবাসী বাঙালি-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে তাঁহাকে সংবর্ধনা করা ও মানপত্র দেওয়া হয়। অভিনন্দনের কথা পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। এই বৎসর শিক্ষা, পাঠাগার, সাংবাদিকী বিভাগের সভাপতিও তিনি হন।

রেঙ্গুনে বাংলা ১৩৪৪-এর 'নিখিল-ব্রহ্ম-প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে'র দ্বিতীয় অধিবেশনে 'প্রবাসী' সম্পাদককে সভাপতি নির্বাচন করা হয়। তিনি এই উপলক্ষে ৭২ বৎসর বয়সে একাকী রেঙ্গুন যাত্রা করেন। রেঙ্গুনে সম্মেলনের অধিবেশনে কয়েকদিন বক্তৃতা করা ছাড়া ব্রহ্মমন্দিরে "ঈশ্বরের সহকর্মী মানুষ" ও "স্বরাজের যোগ্যতা" প্রভৃতি বিষয়েও তিনি বলেন। রেঙ্গুন, মান্দালে ও মেমিও তিনটি শহরে নানা প্রতিষ্ঠানে বাংলা এবং তিন-চারটি ইংরেজি বক্তৃতা তাঁহাকে করিতে হয়। অবাঙালি মহিলারা অনেকে ইংরেজি ও বাংলা বোঝেন না বলিয়া তাঁহাকে হিন্দিতে বক্তৃতা করিতে বলেন। কিন্তু সময়াভাবে তাহা হয় নাই। সম্মেলনের অধিবেশনে হাজার দুই লোক হইয়া ছিল। তাঁহাকে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অভিনন্দন দেয়।

এই বৎসরই (১৩৪৪ সন) নানা কাজে অক্টোবর মাসে তাঁহাকে গৌহাটি, শ্রীহট্ট, ঢাকা এবং বিক্রমপুরের বেজগাঁ প্রভৃতি স্থানে যাইতে হয়। গৌহাটিতে তিনি বাঙালি ছাত্র-সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সম্ভবত সভাপতি হন। এখানকার কলেজ, বালিকা বিদ্যালয়, ব্রহ্মমন্দির প্রভৃতিতে তিনি বক্তৃতা করেন। ছাত্র-সম্মিলনীর উদ্যোগেই তাঁহাকে গৌহাটি যাইতে হয়, ছাত্রদেব উৎসাহে ও আয়োজনে সভাপতিকে লইয়া বিরাট উৎসব হয়। তিনি বহু প্রতিষ্ঠানও দেখেন। শ্রীহট্টেও তাঁহাকে অনেক কাজ করিতে হয়। ঢাকায় পূর্ব বাংলা ব্রাহ্ম-সম্মিলনীর সভাপতি তিনি হন। এই অধিবেশনে বঙ্গের নানাস্থান হইতে প্রতিনিধিবর্গ যোগ দেন, তাছাড়া স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ, হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বহু লোক তাহাতে যোগ দেন। কোনো কোনো হিন্দু পরিবারে তাঁহাকে খুব ঘটা করিয়া নিমন্ত্রণ খাওয়ানো হয়, যদিও তিনি ভোজনে পটু ছিলেন না। বেজগাঁয় ভেনিসের মতো জলপথ ও নৌকায় যাতায়াত দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন। মৃত্যুর দুই-তিন দিন পূর্বেও তিনি বেজগাঁ কী রকম আশ্চর্য সুন্দর তাহার বিষয় বলিতেছিলেন। বেজগাঁতে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের ভূতপূর্ব দেওয়ান স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার দাসগুপ্তের সহধর্মিণী ও পুত্রদের অতিথি ছিলেন। তাঁহারা নৌকাযোগে ইঁহাকে গ্রাম, বাজার সমস্তই দেখান।

১৩৪৪ সালে রামানন্দ গৌহাটিতে প্রথম যান। সেখানে সেবার প্রবাসী বাঙালি ছাত্র-সমিতির বার্ষিক অধিবেশন ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া বক্তৃতা করেন। গৌহাটি যাইবার পূর্বে এই বৎসর দ্বিতীয়বার শ্রীহট্টে যান। রামানন্দ চিরদিন সাহিত্যে শুচিতার পক্ষপাতী ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য বাংলা ১৩৪৪-এ শ্রীহট্টের সারদা মেমোরিয়াল-হলে সুরমা উপত্যকা প্রগতি সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিরূপে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন :

> "প্রগতিতে আমার বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই, কেবল তার বিকৃতিতেই আপত্তি। এটা মনে রাখতে হবে যে বাংলা সাহিত্যে প্রগতি আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ অনেক দিক দিয়েই নূতন পথ দেখিয়েছেন। মাইকেল মধুসূদন শুধু যে ছন্দেব দিক দিয়েই বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়...মধুসূদনও তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে বলতে পারতেন, এটাও প্রগতি সাহিত্য।... যাঁরা 'প্রগতি'বাদী তাঁদের দেখতে হবে তাঁরা সম্মুখের

দিকে কতটা এগিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা, উন্নতি করছেন না অধোগতির পথ সোজা করে দিচ্ছেন। রিপ্রেশ্যন বা নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের উপর যিনি যতই খড়গহস্ত হোন না কেন, একথা মানতেই হবে যে সিভিলাইজেশ্যন বা সভ্যতা নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যতিবেকে সম্ভবপর হতো না। গীতাতে বলেছে সাধককে যুক্তাহারবিহাব হতে হবে।...এটা ভেবে দেখা উচিত যে প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বশবর্তী হয়ে যাওয়াটই কি 'প্রগতি'?..এই যে অত্যন্ত বেশি ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, এব কুফল আজ সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ জুড়ে শোচনীয় ভাবে দেখা দিয়েছে, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অনেক মনীষী সেই কারণে Civilisation না বলে Syphilisation বলেছেন!...কামুকেব ব্যাধিব সংক্রামকতা অতি ভীষণ ; তা সমাজের অনেককে ও ভবিষৎ-বংশের লোকদের ভোগায় ; ক্রোধী ও লোভীকে বড়ো করে দেখাবাব চেষ্টা যে হচ্ছে না তা সুখের বিষয়। প্রগতির বিকৃত অর্থ কবে কামেব মাহাত্ম্য প্রচারকেই তা হ'লে কি সাহিত্যের একটা 'মিশন' মনে কবব? সভ্যতার মূলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি আছে। .এখন কোন পথ আমরা অবলম্বন করব? এ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের আদর্শই আমাদেব অনুসরণীয়. তিনি তাঁর কোনো শিষ্যকে বীণাব তার বাঁধার উপমা দিযে এই কথাটাই বুঝিয়েছিলেন যে, সকল বিষয়ে মধ্যপন্থী হওয়াই শ্রেয়।"

এই প্রবন্ধটি সমগ্র পড়লে তবে এর প্রকৃত মূল্য বোঝা যায়।

বালিকা-বিদ্যালয়ের চির-কল্যাণকামী ছিলেন বলিয়া গৌহাটির পানবাজারের শ্রীযুক্তা রাজবালা দাসের বিদ্যালয় দর্শন ও সেখানে বক্তৃতাদিও তিনি করেন।

রামানন্দ শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক সভার অধিবেশনে সভাপতি হইয়া যান। শান্তিপুব ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার ব্রহ্মোপাসনার কথা বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন।

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর শহরে বাংলা ১৩৪৪এর মাঘ মাসে (জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে) বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের ষট্‌ত্রিংশ অধিবেশন হয়। সম্মেলনের মণ্ডপ ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের লাহোর কংগ্রেসের মণ্ডপ অপেক্ষাও বড়ো হইয়া ছিল। রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের আনুষঙ্গিক একটি কৃষি শিল্প ও স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে রামানন্দ বিষ্ণুপুর যান। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় ইংরেজের লেখা ইংরেজি বই হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যে, 'প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ শুধু কৃষিজীবী কৃষিপ্রধান দেশ ছিল না, পণ্যশিল্পের ও নানা পণ্যদ্রব্যের জন্যও ইহা বিখ্যাত ছিল। সেকালকার সভ্য পাশ্চাত্য জগতের অভিযোগ এই ছিল যে. ভারতবর্ষ অন্য দেশ হইতে আগত সোনা ও রূপা গ্রাস করে, অন্য দেশকে তাহা দেয় না ; অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে এই দেশ সোনা ও রূপা পায়, কিন্তু সেই সব দেশ হইতে কোনো জিনিস কিনিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে সোনা রূপা দেয় না।' আমরা যে পূর্ণ স্বরাজের যোগ্য তাহাও বক্তৃতায় তিনি বলেন।

১৩৪৪ সালে হাওড়ার কোনো এক গ্রামে তিনি শ্রমিক-সভার সভাপতি হন।

১৩৪৪ ফাল্গুনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের একবিংশ অধিবেশন কৃষ্ণনগরে সুনির্বাহিত হয়। তাহার সহিত একটি সাহিত্যিক প্রদর্শনীও ছিল। রামানন্দ সম্ভবত সভাপতি-রূপে এই অধিবেশনে যোগ দেন। শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবীর "পদাবলী সাহিত্য" প্রবন্ধটি শুনিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছিল—লিখিয়াছিলেন। "অপর্ণা দেবীর কণ্ঠ যেমন মধুর, সেইরূপ উচ্চ", তিনি লেখেন।

পরের মাসেই কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার শতবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি সেনহাটি যান। সেনহাটি এই কবির জন্মস্থান। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কবিতা দশ বৎসর বয়সে পড়িয়া চিরজীবনই

রামানন্দ মনে রাখিয়াছিলেন। রামানন্দ বলেন, "তিনি মহাকবি না হইলেও নিশ্চয়ই চির-স্মরণীয় কবি। মানুষ হিসাবেও তিনি চির-স্মরণীয়।"

রামানন্দ নানাস্থানে ছোটো-বড়ো বালিকা বিদ্যালয়ের কাজে যাইতেন। কারণ তিনি পুরুষ অপেক্ষা নারীশিক্ষায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। একটি ছোটো বিদ্যালয়ে তিনি বলেন, 'কোনো পরিবারে গৃহিণী যদি শিক্ষিতা হন, তাহা হইলে সে বাড়ির ছেলেমেয়ে উভয়কেই তিনি শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিবেন। এমন হাজার হাজার পরিবার আছে যাহার কর্তারা লেখাপড়া জানেন কিন্তু মেয়েরা জানে না, ছেলেরা জানে ; এমন একটি পরিবার দেখাইতে পারেন কি যাহার গৃহিণী শিক্ষিত অথচ মেয়েরা নিরক্ষর।'

১৩৪৫ সালে 'বঙ্কিম শতবার্ষিকী' উপলক্ষে তিনি নানা সুচিন্তিত প্রস্তাব করেন। 'প্রবাসী'তে বঙ্কিম-বিষয়ক বহু প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়।

ব্যাঙ্কের উৎসবে কিংবা নূতন ব্যাঙ্ক খোলায় রামানন্দের নিমন্ত্রণ প্রায়ই আসিত। তিনি গবর্নমেন্টের সেভিংস ব্যাঙ্কে দেশের দরিদ্র লোকদের টাকা রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। দরিদ্ররা সামান্য সুদ ছাড়া কিছু পান না, এবং ভারতীয় মহাজাতি ইহা হইতে কোনো সুবিধাই পায় না। সেইজন্য অল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত লোকদিগের অল্প টাকা রাখা ও দেওয়ায় তিনি দেশি ব্যাঙ্কগুলিকে প্রেরণা দিতেন। দেশি ব্যাঙ্কের টাকা দেশে নানা ব্যবসা-বাণিজ্যে খাটিতে পারে। এই সব কাজে ১৩৪৫ সালে হুগলী, বার্লা, উত্তরপাড়া ও বাঁকুড়ার নানা ব্যাঙ্কের উৎসবে তিনি যান এবং তাহাদের বিষয় 'প্রবাসী'তে লেখেন। ১৩৪৬-এ নোয়াখালি নাথ ব্যাঙ্কের কাজে যান। কৃত্তিবাসের জন্মভূমি ফুলিয়ায় শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষৎ ১৩৪৫এ যে সভা করেন তাহাতে রামানন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভাতে কলিকাতা ও শান্তিপুর মিশাইয়া পঞ্চাশজনও লোক হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। ইহাতে দুঃখিত হইয়া তিনি বলেন :

> 'আমাদের জাতির আবালবৃদ্ধবনিতা অগণিত মানুষের উপর রামায়ণের প্রভাব যত, ইংরেজ জাতির উপর সেক্সপিয়রের প্রভাব তত না হইলেও স্টাটফোর্ড-অন-অ্যাভন ইংরেজের একটি সাহিত্যিক তীর্থ, কিন্তু ফুলিয়া বাঙালির সাহিত্যিক তীর্থ হয় নাই।'

আমাদের দেশের জনসাধারণ কৃত্তিবাসকে স্মরণ করুন আর নাই করুন, রামানন্দ প্রতি বৎসরে তাঁহাকে স্মরণ করিতেন এবং ফুলিয়ার স্মৃতি-উৎসবের কথা 'প্রবাসী'তেও লিখিতেন। কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্যের উন্নতি ব্যতীত জাতির উন্নতি হয় না। নানাদেশের শিশুমৃত্যু ও 'সম্ভাবিত আয়ু' তালিকা সেন্সস রিপোর্ট হইতে তুলিয়া সেই বিষয়ে লেখা রামানন্দের নিয়ম ছিল। বাঁকুড়া ও বেহালায় ১৩৪৬ সালে এই জাতীয় প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিবার সময় রামানন্দ কৃষি-শিল্পের সহিত স্বাস্থ্যের সম্পর্ক আলোচনা করেন নানা দেশের শিশুমৃত্যু প্রভৃতির হিসাব দিয়া।

এই সময় আসানসোলে শিক্ষাসপ্তাহের কার্যেও তিনি পৌরোহিত্য করিতে যান।

১৩৪৬ সালে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে একটি সূতা ও কাপড়ের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবার সূচনা হয়। কোম্পানি রেজিস্টারি হইয়া যায়। রামানন্দের এই কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠায় বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি ৭৪।৭৫ বৎসর বয়সেও বিষ্ণুপুর কটন মিল প্রতিষ্ঠার কাজে প্রায় প্রতি মাসে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর যাওয়া-আসা করিতেন। তিনি ইহার চেয়ারম্যান হন। কুটির-শিল্প নষ্ট হওয়ায় বা তাহার অবনতি হওয়ায় সাধারণ লোকের চাষ ছাড়া অন্য আয়ের উপায় নাই বুঝিয়া রামানন্দ তাহার স্থায়ী প্রতিকার করিতে সাধারণকে বার বার বলিতেন। কিন্তু তখন অধিকাংশ নেতা এই জীবন-মরণ সমস্যা ভুলিয়া অন্যান্য বিষয়ের

চিন্তায় বেশি ব্যস্ত থাকিতেন। কটন মিল প্রতিষ্ঠার কাজের সহিত তাঁহার বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ নিবারণের কাজও জড়িত ছিল। সেজন্য গ্রামে গ্রামেও তিনি ঘুরিয়াছেন। বাঁকুড়ায় (এবং অন্যান্য জেলাতেও) যে হাজার হাজার জলাশয় বুজিয়া গিয়াছে, তাহার খবর সংগ্রহ করিয়া তিনি সেগুলি আবার খনন করাইবার জন্য জনসাধারণকে এবং সরকারকে অনুরোধ করেন। জলসেচন দুর্ভিক্ষ-নিবারণের একটি উপায়, কুটির-শিল্পও ধনাগমের উপায়, ইহা মানুষকে মনে রাখাইবার বিশেষ চেষ্টা করেন। সূতা ও কাপড়ের কল হইলে বহু লোকের কিছু আয়ের উপায় হইবে এবং বাঁকুড়া জেলার তুলার চাষের উপযুক্ত জমি হইতে তুলা উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহ হইবে, বেকার সমস্যা কমিবে, এই সকল বিষয় ভাবিয়া ও লিখিয়া তিনি মিলের কাজের গোড়াপত্তন করেন।

বাঁকুড়া জেলার অন্যান্য নানা কাজের মতো বাঁকুড়া জেলা-স্কুলের শতবার্ষিকীর কাজেও রামানন্দের ডাক পড়ে। তিনি এই স্কুলের পুরাতন ছাত্র এবং গৌরবস্থল, সুতরাং তাঁহাকে এই কার্যে পৌরোহিত্য করিতে ডাকা স্বাভাবিক।

১৩৪৬ সালের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কখনো বাঁকুড়ায় যান নাই। কবি বোলপুর হইতে খানা জংশন পর্যন্ত রেলওয়েতে আসেন। তাহার পর তাঁহাকে মোটরে বাঁকুড়া পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। রানীগঞ্জে তাঁহাকে দেখিবার জন্য ভিড় এত বেশি হইয়াছিল যে মোটর ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। পথে নানাস্থানে লোক তাঁহার জয়ধ্বনি দেয় ও তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে। এই পথের অনেক জায়গায় গ্রামবাসীরা পত্রপুষ্পশোভিত তোরণ নির্মাণ করিয়াছিলেন, যেখানে পথ ঠিক গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে, সেখানে অনেক গৃহ আম্র-পল্লবাদির দ্বারা অলংকৃত হইয়াছিল। বহু গ্রামের অগণিত পুরুষ ও মহিলাগণ তাঁহাকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত এরূপ ভিড় করিয়াছিলেন যে মোটরের দরজা বন্ধ করা কঠিন হইয়াছিল। কবিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য যে-সমিতি হয় তাহাদের পক্ষ হইতে বাঁকুড়া শহরে রামানন্দ অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। বাঁকুড়ায় কবিকে লইয়া তিনদিনব্যাপী নানা উৎসব হয়। রামানন্দ প্রত্যেক সভায় উপস্থিত ছিলেন। বাঁকুড়ার স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীগণ অসাধারণ ভিড়ের মধ্যেও সর্বত্র শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছিল, পুলিসের বিন্দুমাত্র সাহায্য লওয়া হয় নাই। কবি এত লোক দেখিয়া বলেন, এরূপ ভিড় তিনি কোথাও দেখেন নাই।

রামানন্দ কিশোর বয়স হইতে যে সকল মহাপুরুষকে আদর্শ পুরুষরূপে ভক্তি করিতেন তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্যতম। বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-রক্ষার সকলরকম অনুষ্ঠানে তিনি উৎসাহী ছিলেন। ১৩৪৬-এর ৪ চৈত্র বিদ্যাসাগরের জন্মগ্রাম বীরসিংহে তাঁহার স্মৃতিভবনের দ্বারোন্মোচন হয়। কর্তৃপক্ষ কাজটি প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের দ্বারা নির্বাহ করান। তিনি তাহা নিজের পরম সৌভাগ্য বলিয়া উল্লেখ করেন। গ্রামটি মেদিনীপুর শহর হইতে ৫৫ মাইল দূরে অবস্থিত। তবু অনুষ্ঠানের জন্য নির্মিত সুবৃহৎ মণ্ডপটি মহিলা ও পুরুষদের সমাগমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বাহিরেও বিস্তর লোক দাঁড়াইয়াছিলেন। সভায় উপস্থিত দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও সময়ে বলিয়াছেন, সভায় দশ হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। ইহার মধ্যে প্রায় অর্ধেক ছিলেন মহিলা। এ সভাতেও রামানন্দ বলেন "বাল্যে ও যৌবনে বৈধব্য দশাপ্রাপ্তা বিধবাদের বিবাহ দিবার নিমিত্ত কর্মীদের সমিতি স্থাপন করিলে তবে বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-সংরক্ষণ প্রচেষ্টা সর্বাঙ্গসম্পন্ন হইবে।"

খুলনা জেলার মূলঘর গ্রামে নেপালচন্দ্র রায়ের জন্মস্থান। এই গ্রামের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের 'সুবর্ণজয়ন্তী' উপলক্ষে নেপালচন্দ্রও রামানন্দকে গ্রামের উৎসবে বিশেষ আগ্রহ

করিয়া লইয়া যান, গ্রামের সমুদয় প্রতিষ্ঠান দেখান এবং নানারূপে সমাদর করেন।

বাংলা ১৩৪৭-এ জামশেদপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের যে অধিবেশন হয় তাহাতে নানা প্রস্তাবের মধ্যে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় :—"এই সম্মেলনে বাঙালির শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথ নির্দেশ করিবার জন্য 'বৃহত্তর বঙ্গ-সংগঠন পরিষৎ' (Greater Bengal Planning Committee) নামে একটি সমিতি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত হউক।..." রামানন্দ সমিতির অন্যতম সভ্য হন। তিনি মনে করেন, এই প্রস্তাব বঙ্গের বাঙালি ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালি উভয় সমষ্টিরই কল্যাণকল্পে গৃহীত হইয়াছে। জামশেদপুর সম্বন্ধে তিনি একটি বিশেষ স্মরণীয় কথা বলেন :—

"জামশেদপুরে বাঙালির প্রতীক (symbol) দেখিলাম। অর্থাৎ আদর্শ ও তাহাতে উপনীত হইবার পথ বাহির করে বাঙালি, বুদ্ধি দেয় বাঙালি, কিন্তু ফলভোগ করে অ বাঙালি।"

প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের আবিষ্কার ও চেষ্টার ফলে এবং বাঙালিদের প্রবর্তিত স্বদেশি চেষ্টার প্রভাবে বঙ্গের সাকচিতে যে কারখানা হয় তাহাই এখন অ-বাঙালির জামশেদপুরের কারখানা।

এই সভায় "সাহিত্যে প্রগতি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ" নামে স্মরণীয় প্রবন্ধটি রামানন্দকে সাহিত্য-শাখার সভাপতি পাঠ করিতে আহ্বান করেন। কিন্তু তিনি সময়াভাবে পড়েন নাই। সভায় উহা মুদ্রিত করিয়া বিলি করা হয় এবং পরে কোনো কোনো দৈনিকে পুনর্মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধটি প্রথমে ১৩৪৪ সালে শ্রীহট্টে 'প্রগতি সাহিত্য-সম্মেলনে'র সভাপতিরূপে তিনি পড়িয়াছিলেন।

এই বৎসর ফাল্গুন মাসে প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন তথাকার সংগীত-পরিষদের হলে হয়। অধিবেশনের উদ্বোধন করেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার অমরনাথ ঝা মহাশয়। সভাপতি হন প্রবাসীর সম্পাদক। রামানন্দের অলিখিত মৌখিক বক্তৃতার কোনো রিপোর্ট রাখা হয় নাই। এই সভায় বাংলা ভাষার রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্যতা বিষয়ে শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেবের প্রবন্ধটি সভাপতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করেন। প্রবাসে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রচার করিবার জন্য সভায় কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রবীন্দ্রনাথের অশীতিপূর্তি জন্মোৎসব ইহার চার বৎসর পরে হয়। কিন্তু বহু স্থানে দুই-এক বৎসর আগেই উৎসবাদি হইয়াছিল। প্রয়াগে প্রস্তুতি হিসাবে ফাল্গুন মাসেই বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের দুই দিন অধিবেশনের পর এলাহাবাদ বিজিয়ানাগ্রাম হলে 'প্রবাসী' সম্পাদক কর্তৃক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। এই বৎসর ও ইহার পর বৎসর রামানন্দ কলিকাতায় এবং কলিকাতার বাহিরে বহু স্থানে রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ে বক্তৃতা করেন। দেরাদুন, বার্নপুর, আসানসোল প্রভৃতিতে বক্তৃতার উল্লেখ 'প্রবাসী'তে দেখিতে পাই।

অশীতিপূর্তির তিন মাসের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "সুন্দরী ধরণী"কে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। জন্মোৎসবের পরই শোক-উচ্ছ্বাসে বাংলাদেশ পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই সময় অগণিত সভায় রামানন্দ পৌরোহিত্য করেন। ৩২ শ্রাবণ শান্তিনিকেতনে কবির প্রথম অধ্যাত্মকৃত্য সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত জীবনময় রায় শ্রাদ্ধ-সভার বর্ণনা করিয়াছেন :

"একটি বেদীর উপরে দুইটি আসনে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন ও পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়, তাঁহাদেরই পার্শ্বে দুইটি আসনে রথীন্দ্রনাথ ও সুধীরেন্দ্রনাথ। ইহাদের পশ্চাতে শ্রদ্ধেয় রামানন্দ

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়...। বেলা প্রায় আড়াইটার সময়ে ভক্তিভাজন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে প্রাক্তন গোষ্ঠীর এক সভায় শান্তিনিকেতনের মৌলিক আদর্শ ও বিশ্বভারতী সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য বিষয়ে আলোচনা হইল।...সন্ধ্যায় উত্তরায়ণে সেদিন শ্রদ্ধাস্পদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করিলেন। কবির সহিত তাঁহার নিবিড় বন্ধুতা ও অধ্যাত্মযোগেব দ্বাবা প্রভাবিত শোক-গম্ভীর উপাসনার প্রত্যেকটি বাক্য উপস্থিত সকলের অন্তবকে গভীরভাবে স্পর্শ করিল।"

এই সময় রামানন্দের বয়স ৭৬ বৎসর। তিনি এই বয়সেও সঙ্গে কোনো ভৃত্য কী অনুচর না লইয়া দেরাদুন প্রভৃতি দীর্ঘ পথ অন্যের কাজে গিয়াছেন। নিজ দেশের কাজে এই সময় তিনি আরও বেশি করিয়া মন দেন। সম্ভবত তিনি অনুভব করিতেন যে তাঁহার দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। তাই কাজে উৎসাহ তিনি আরও বাড়াইয়া ছিলেন। ১৩৪৮এর ১২ শ্রাবণ তিনি বাঁকুড়া গিয়াছিলেন। বাঁকুড়া শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁহার বিপুল কর্মসূচী ছিল। তাহা সত্ত্বেও শহরের সন্নিকটস্থ ভাদুল গ্রামে পদার্পণ করিয়া গ্রামবাসীদের আনন্দবর্ধন করেন। তিনি তাঁহার কর্মবহুল জীবনের মধ্যেও সময় করিয়া পল্লীর কর্দম, বৃষ্টিবাদল উপেক্ষা করিয়া কয়েক স্থানে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। পল্লীর উন্নয়ন, রাস্তাঘাট পরিষ্কার, নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি পল্লীর জীবনীশক্তি ও প্রাণ-স্বরূপ কয়েকটি বিষয় ছিল তাঁহার বক্তৃতার প্রধান বস্তু। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তিনি বিশেষ করিয়া সময়োপযোগী বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

প্রাচীন মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুরে পৌষমাসে একটি বড়ো সাহিত্য-সম্মেলন হয়। রামানন্দ তাহার সভাপতি হন। এই সভার একটি প্রধান ঘটনা বিষ্ণুপুরে রবীন্দ্রনাথের একটি মূর্তি স্থাপন। কলিকাতার বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক সভায় যোগ দেন ও বক্তৃতা করেন। বিষ্ণুপুর সংগীতের জন্য বিখ্যাত বলিয়া সংগীতের মজলিশও এই উপলক্ষে হয়।

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবির মৃত্যুর পর রামানন্দ সভাপতি মনোনীত হন।

সমালোচক রামানন্দ

সার্বজনীন কাজে মানুষের উক্তি, ব্যবহার বা কার্যপ্রণালীর সমালোচনা করা পত্রকারদিগের একটি কাজ। এই কার্যে রামানন্দ কখনো উচ্চ-নীচ, খ্যাত-অখ্যাত, ধনী-দরিদ্র আত্মার বিচার করিতেন না, তাহা ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ জানেন। তাঁহার এই খ্যাতি ভারতবর্ষের বাহিরেও বহু স্থলে পৌঁছিয়াছে।

জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁহার ভক্তির পাত্রদিগের সহিতও যখন তাঁহার মতদ্বৈধ হইয়াছে তখন তিনি তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন। গান্ধীজি, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, স্যর আশুতোষ, সুরেন্দ্রনাথ, গোখলে, চিত্তরঞ্জন, রাধাকৃষ্ণন, রামন্, সুভাষচন্দ্র ও আরও বহু রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রের মহারথীদের সমালোচনা তিনি নির্ভীকভাবে করিয়াছেন, তাঁহার পত্রিকাগুলির পাতা উল্টাইলে এখনও মানুষ দেখিতে পাইবে। যাঁহাদের তিনি বহুক্ষেত্রে সাধুবাদ দিয়াছেন এবং যাঁহাদের পক্ষ বহুস্থলে সমর্থন করিয়াছেন, প্রয়োজন বুঝিলেই তাঁহাদেরও কার্যবিশেষের বিরুদ্ধে লিখিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। অপর পক্ষে যাঁহাদের বহু কার্যের কঠিন সমালোচনা তিনি দীর্ঘকাল করিয়াছেন যথাকালে তাঁহাদেরও প্রাপ্য সম্মান ও সাধুবাদ দিতে রামানন্দ ইতস্তত করেন নাই।

তিনি কী কী উপলক্ষে কত মানুষের উক্তি ও কার্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহার ফর্দ দিবার স্থান ইহা নহে। তবে কয়েকজনের বিষয় অল্প কিছু বলিলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। তাঁহার সমসাময়িকদের ভিতর রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা কারও প্রতি তাঁহার ভক্তি ও অনুরাগ বেশি ছিল বলিয়া জানি না। কিন্তু রামানন্দের দেশপ্রীতি এত গভীর ছিল এবং স্বাধীনতার কামনা এত প্রবল ছিল যে রবীন্দ্রনাথের মতো শ্রেষ্ঠ মনীষীও তাঁহার দেশপ্রীতি কিংবা স্বাধীনতা-স্পৃহায় আঘাত করিলে তিনি প্রতিবাদ না করিয়া পারিতেন না। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭-এ ডা. জে. টি. সন্ডারলান্ডের একটি চিঠির উত্তরে ভারতের যে চিত্র আঁকেন তাহা রামানন্দের মনে আঘাত দেয়। রামানন্দ বলেন,

"But it seems to us that in the picture which he draws of our country the shades are too dark and the lights are wanting."

রামানন্দ কবির এই পত্রখানির দীর্ঘ সমালোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন— ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে তাহার আধ্যাত্মিক ও সামাজিক মুক্তি প্রয়োজন ; তাহার অজ্ঞানতা দূর করার প্রয়োজনই বড়ো তিনি বলেন। পরাধীন দেশে তাহা অসম্ভব মনে করিয়া রামানন্দ বলেন,

"We are unable to accept the poet's suggestion—for such it appears to us to be min that political emancipation is not an immediate duty, and that it should be attempted after spiritual and social freedom has been achieved...We do not think that universal education of the people is practicable without state action. And such state action, as far as our knowledge goes, has been taken only in politically free countries."

বাংলা ১৩২৭ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকে যখন মন্টেগুকে ভারতবর্ষের বড়োলাট করার আবেদনে স্বাক্ষর করেন তখন রামানন্দ তাহাতে আপত্তি করেন। তিনি বলেন,

"রাজনৈতিক কোনো বিষয়ে আবেদনকারীদের অগ্রণীরূপে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা যে, হয় রয়টারের সংবাদে কিছু ভুল আছে, কিম্বা কোনো গুরুতর কারণে ইহা ঘটিয়াছে। কারণ যাহাই হউক, বিশেষ কোনো মানুষকে চাওয়ার অনেক অসুবিধা আছে। তাহার মধ্যে একটি এই যে, এই মানুষটির ভবিষ্যৎ নীতি ও কার্যের সমালোচনা করিবার স্বাধীনতার যেন কিছু হ্রাস হয়। এবং বিরোধীরা এরূপ সমালোচনার উত্তরে বলিবার সুযোগ পায়, 'কেন, তোমরাই ত ইহাকে চাহিয়াছিলে?'"

পূর্বেই বলিয়াছি, মিসেস বেসান্টকে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের সভাপতি করা বিষয়েও রামানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের মতভেদ হয়। শ্রীযুক্ত অমল হোম বলেন, যে রাত্রে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে এই বিষয়ে দুই বন্ধুর আলোচনা হয় এবং দুজনেই স্ব-স্ব মত ধরিয়া রাখেন, সেই রাত্রে অমল হোম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রামানন্দকে স্বমতে আনিতে না পারিলেও তাঁহার নিকট অভ্যর্থনা-সমিতির চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণের কারণ খুলিয়া বলিতে পারাতে মনে করেন, যেন একটা বোঝা তাঁহার মন হইতে নামিয়া গিয়াছে। ইহাও অমল হোম মহাশয়কে কবি বলেন। শেষ পর্যন্ত কবি চেয়ারম্যানের পদ পরিত্যাগ করেন, পূর্বেই বলিয়াছি।

সার্বজনীন কাজে ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সহিত রামানন্দের যতবার মতভেদ হইয়াছে তাহার ফর্দ দিবার প্রয়োজন নাই, দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই জিনিসটি বোঝা যায়।

গান্ধীজির চরিত্রের বিশুদ্ধতা, জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ও চেষ্টার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার পরিচয় আমরা 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু'র প্রথম যুগ হইতেই দেখিতেছি। গান্ধীজি, ভারতে খ্যাত হইবার পূর্ব হইতেই তাঁহার ত্যাগ ও কীর্তির বিষয় রামানন্দ কিরূপ প্রচার করিয়াছিলেন, ইতিপূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু গান্ধীজির সকল কথাও তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করিতেন না। গান্ধীজির আইন-অমান্য ও সত্যাগ্রহ ঘোষণার সময় রামানন্দ বলেন,

> "অন্ধভাবে আইন-অমান্য করার ভাবটা জাগান ঠিক নয়। কারণ এই ভাব দ্বারা চালিত লোকেরা যতদিন গান্ধী মহাশয়ের মতো লোকের অনুসরণ করিবে ততদিন তাহারা নিজের বা অন্য কাহারও ক্ষতি না করিতে পাবে, কিন্তু যদি তাহারা আপনাদের প্রবৃত্তির অধীন হইয়া পড়ে কিম্বা এমন কোনো শক্তিশালী ব্যক্তিব প্রভাবাধীন হয় যে গান্ধী মহাশয়ের মতো সাধু, কল্যাণকামী ও শান্তিপন্থী নয়, তাহা হইলে অনর্থপাতের সম্ভাবনা আছে।"

রামানন্দ ভীরুতার পক্ষপাতী ছিলেন না বলা বাহুল্য, তিনি সত্যাগ্রহ চাহিতেন। কিন্তু বলিতেন,

> "কেবল এরূপ লোকই সত্যাগ্রহী হউন যাঁহারা সর্বপ্রকার দুঃখ ও ক্ষতি স্বীকার করিতে ও স্বার্থত্যাগ করিতে তো পারেনই অধিকন্তু নিজেদের বুদ্ধি ও বিবেক অনুযায়ী কোন আইনটি ভাঙা চলে, কোনটি চলে না, তাহাও স্থির করিতে সমর্থ।"

গান্ধীজি অসহযোগ ঘোষণা করিলে পিতামাতাদের গবর্নমেন্ট শিক্ষালয়ে সন্তানদের প্রেরণ না-করার সমর্থন রামানন্দ করেন নাই। কারণ ছাত্রছাত্রীরা কোথায় শিক্ষা পাইবে তাহার সামান্য মাত্র ব্যবস্থাও কেহ করেন নাই বা এ বিষয়ে পরামর্শ দেন নাই। সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন বেসরকারি বিদ্যালয় আমাদের দেশে খুব কম। তিনি বলেন,

> "ছাত্রদের শিক্ষার উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা হইবাব পূর্বেই স্কুল কলেজ ছাড়ার বিরোধী আমরা আন্দোলনের আরম্ভ অবধি এখন পর্যন্ত আছি।".. "সশস্ত্র দৈহিক যুদ্ধের মতো নিরস্ত্র সাত্ত্বিক যুদ্ধেও শিক্ষা ও নিয়মাধীনতার আবশ্যক, বরং বেশি আবশ্যক। এই শিক্ষা ও নিয়মাধীনতা তাহারা কোথায় কাহাব নিকট হইতে পাইতেছে?"

বাংলা ১৩২৭-এ গান্ধীজি এক বৎসরে স্বরাজলাভের আশা করাতে রামানন্দ বলেন.

> "গান্ধী মহাশয় এক বৎসবে স্বরাজ্য পাইবার আশা রাখেন। তাঁহাব অপেক্ষাও উৎসাহী ও আশাশীল কেহ-বা ছয় মাস কেহ-বা ছয় দিনে পাইবার আশা কবেন। ইঁহাদিগকে স্মরণ করাইতেছি, যে, কোনো জাতি সশস্ত্র যুদ্ধ করিয়াও এক বৎসরে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নাই। ভারতবর্ষেব মতো এত বড়ো একটা সম্পত্তি, সামান্য রকমের সৌখিন সহযোগিতা বর্জন হেতু ইংরেজ ছাড়িয়া দিবে, ইহা দুরাশা মাত্র।"

রামানন্দ স্বয়ং গবর্নমেন্টকে ট্যাক্স দেওয়া ছাড়া আর কোনো বিষয়ে সরকারের সহযোগিতা কখনো করেন নাই। কিন্তু তিনি সর্ব বিষয়ে অসহযোগিতা অন্যের পক্ষে সম্ভব মনে করিতেন না। যথা আইন-ব্যবসায় ত্যাগ করিলে ফৌজদারি মোকদ্দমায় হয় স্বয়ং আত্মপক্ষ সমর্থন, নয় নীরবে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে একথা রামানন্দ মনে রাখিতে বলেন।

গান্ধীজি Kaiser-i-Hind Medal ফেরত দেওয়ার সময় রামানন্দ বলেন,

> "পদক প্রভৃতি ফেরত দেওয়া সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে. যেসব দেশ স্বাধীন এবং যেখানকার কাজ প্রজাতন্ত্র প্রণালী অনুসারে নির্বাহিত হয়, সেখানেও গবর্নমেন্টের নিকট হইতে কোনো উপাধি বা অন্য প্রকার বকশিশ লওয়া উচিত নয়। বিদেশির অধীন প্রজাদের তো কোনো মতেই লওয়া উচিত নয়।"

মহাত্মা গান্ধীর সমগ্র মহৎ জীবন ও সাধনার কথা রামানন্দ বহুবার বলিলেও তাঁহার

সহিত মতভেদের কথাও বহুবার বলিয়াছেন। আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটির উল্লেখ করিলাম।

জগদীশচন্দ্র রামানন্দের গুরু ছিলেন এবং জগদীশের মৃত্যুতে তিনি এত বিচলিত হন যে সে সময় রামানন্দ বালকের ন্যায় অশ্রুপাত করেন। কিন্তু ইঁহার উক্তিরও সমালোচনা প্রয়োজন বোধ হইলে রামানন্দ করিয়াছেন। বাংলা ১৩৩৬ সালে বিলাত হইতে এইরূপ তার আসে যে জগদীশ বলিয়াছেন "বেকার অবস্থা ভারতের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ।" রামানন্দ বহু দৃষ্টান্ত দিয়া বোঝান যে শুধু উহাই প্রধান কারণ নয়।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন 'মডার্ন রিভিয়ু'র সম্পাদক ও অধ্যাপক যদুনাথ সিংহের নামে এক লক্ষ টাকার দাবি করিয়া একটি সম্মিলিত মোকদ্দমা করেন। এই বিষয়ে রামানন্দ স্বয়ং ১৩৪০ সালের জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে যাহা লেখেন তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

> "১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাসের 'মডার্ন রিভিয়ু'তে অধ্যাপক যদুনাথ সিংহের একটি চিঠি বাহির হয়। তাহা অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের একখানি বহির প্রতিকূল সমালোচনা। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন এই চিঠির উত্তর দেন ও আমি তাহা প্রকাশ করি। অধ্যাপক যদুনাথ সিংহের প্রত্যুত্তর এবং অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের প্রত্যুত্তরও আমি প্রকাশিত করি। ইহার পর অধ্যাপক যদুনাথ সিংহ যাহা লেখেন, তাহার উত্তরও আমি ছাপিতে প্রস্তুত, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনকে তাহা জানান হয়। কিন্তু তিনি আর উত্তর দেন নাই। এই তর্কবিতর্ক ১৯২৯ সালের 'মডার্ন রিভিয়ু'য়ের জানুয়ারি হইতে এপ্রিল, এই চারি সংখ্যায় চলিয়াছিল। তাহার পর ঐ বৎসর জুলাই মাসে অধ্যাপক যদুনাথ সিংহ কলিকাতা হাইকোর্টে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের নামে কপিরাইট ভঙ্গের নালিশ করেন এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। তদনন্তর অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন কলিকাতা হাইকোর্টে আমার ও যদুনাথ সিংহের নামে এক লক্ষ টাকা দাবি করিয়া এক সম্মিলিত মোকদ্দমা করেন। যাহা হউক, এতদিন গড়াইয়া গড়াইয়া এখন মোকদ্দমা মিটিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন ও অধ্যাপক যদুনাথ সিংহের পরস্পরের সহিত মিটমাট এবং তাঁহাদের মীমাংসার শর্তপত্র উভয়ের স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া যাইবার পর অধ্যাপক যদুনাথ সিংহ স্বয়ং এবং অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের এজেন্ট আমাকে টেলিফোনে সংবাদটি জানান, তাহার পূর্বে আমাকে কিছু জানান তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন নাই— যদিও অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন মোকদ্দমায় আমাকেও জড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই কার্যপ্রণালী হইতেই প্রমাণ হয়, কোনো মোকদ্দমার সহিত আমার মুখ্য সম্বন্ধ ছিল না। আমাকে 'মডার্ন রিভিয়ু'য়ে আমার লিখিত কিছু প্রত্যাহার করিতে বলা হয় নাই, তাহা করিতে বলিবার কোনো কারণও ছিল না। সুতরাং মিটমাটে আমি স্বচ্ছন্দে সম্মতি দিয়াছি।...মীমাংসার শর্তপত্রে (Terms of settlementsএ) সম্পাদকীয় মন্তব্যসমূহ উল্লিখিত ও প্রত্যাহৃত হয় নাই, হইবার কারণও ছিল না। কেননা, তাহাতে আমি উভয় অধ্যাপকের কাহারও পত্রলিখিত বিষয়ের সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু লিখি নাই।...আমার বরাবরই এই বিশ্বাস ছিল যে, আমি এই মোকদ্দমার বিষয়ীভূত কোনো জিনিস সম্বন্ধে অন্যায় কিছু লিখি নাই। এখন পরোক্ষ ভাবে প্রমাণও হইয়া গেল, যে, আমি কিছু লিখি নাই। আমার অসন্তোষের বিষয় এই যে, আমার এতগুলি টাকা 'ন দেবায় ন ধর্মায়' গেল।"

এই মোকদ্দমার বিষয় লিখিবার আমার প্রধান কারণ এই যে, নির্ভীক পত্রকারের কাজে নামিয়া রামানন্দকে কতদূর উদ্বেগ, অর্থনাশ ও অধিকতর অর্থনাশের সম্ভাবনার মধ্যে পড়িতে হইত তাহারও উল্লেখ জীবনীতে থাকা উচিত। মোকদ্দমা করার জন্য রামানন্দ উভয় অধ্যাপকের মধ্যে যদুনাথ সিংহকেই বেশি দোষ দেন, কারণ অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের মোকদ্দমাটি পাল্টা মোকদ্দমা।

ইতিপূর্বে জুলাই ১৯১৮তে রামানন্দ অন্য কোনো প্রসঙ্গে 'মডার্ন রিভিয়ু'র নোটসে লেখেন,

"Once indeed when a grave charge was brought against the University office in this review, an editiorial paragraph in the *Bengalee* threatened the present writer with criminal prosecution, if he did not withdraw the charge. He did not withdraw the charge, but no prosecution followed."

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বহু উক্তি প্রভৃতির সমালোচনা ১৩৩২-এর পূর্বের 'প্রবাসী'তে আছে। বাহুল্য ভয়ে কিছু উদ্ধৃত করিলাম না।

বাংলা ১৩৩৪-এ সিটি কলেজের রামমোহন রায় ছাত্রাবাসে সরস্বতী পূজার আন্দোলনে যখন সুভাষচন্দ্র প্রমুখ কেহ কেহ বঙ্গের সমুদয় হিন্দু সমাজকে ব্রাহ্ম সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করেন তখন রামানন্দ এই ঘরভাঙা আন্দোলনে ক্ষুব্ধ হন ও ইহার প্রতিবাদ ও সমালোচনা করেন। তিনি সুভাষচন্দ্রের নাম না করিয়া নানা কথার মধ্যে বলেন,

'সম্ভবত তাঁহারা জানেন, আধুনিক যুগে ব্রাহ্মমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায়ই হিন্দুদের মধ্যে সর্বপ্রথমে কয়েকটি উপনিষদের ইংরেজি অনুবাদ করিয়া হিন্দু-শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ সভ্যজগতের গোচর কবেন। সম্ভবত তাঁহারা ইহাও জানেন যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ই প্রথম উপনিষদ ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য "হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন, এবং তাহার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট বিলাতের টাইমস কাগজে বাহির হয়।'

রামানন্দ আরও বলেন—

"পৃথিবীতে নানাবিধ ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মমত প্রচলিত আছে। তাহাব মানে এ নয়, যে, প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায় অন্য সব ধর্ম সম্প্রদায়কে অপমান করিতেছে। এবম্বিধ নানা কারণে আমরা মনে করি যে, সিটি কলেজের ছাত্রাবাসে মূর্তিপূজা সম্বলিত উৎসব নিষিদ্ধ হওয়ায় হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের কোনো অপমান করা হয় নাই।...যদি সিন্ডিকেটের বা গবর্নমেন্টের মতে ঐ ছাত্রাবাসে মূর্তিপূজার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে উহাব নাম রামমোহন ছাত্রাবাস থাকা উচিত নয় এবং সিটি কলেজের সহিত উহার সংশ্লেষ থাকা উচিত নয়।"

রবীন্দ্রনাথও ছাত্রদের দাবির বিরুদ্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। তাঁহার মতে ছাত্রদের এইরূপ দাবি করিবার অধিকার নাই। হিন্দু ধর্মে আস্থাবতী শ্রীমতী বেসান্টও এই প্রসঙ্গে বলেন,

"The name of Raja Rammohun Roy has a claim to universal reverence. Even those, to whom the image worship appeals more than the Brahmo doctrine, might have extended a graceful courtesy to his memory and not insisted on the use, for their celebration, of the particular hostel raised to commemorate his services to liberal Hinduism. The agitation carried on by some of the students and their sympathisers against a section of their own community might well have been reserved for a much worthier cause."

রামানন্দ বলেন,

"ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি, অনেক ব্রাহ্ম আমার মতো আপনাদিগকে হিন্দু-ব্রাহ্ম মনে করেন, অনেক তাহা করেন না। স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দু সমাজের সংস্কারক শাখা মনে করিতেন।...এই চেষ্টার (সরস্বতী পূজা আন্দোলন)

নেতৃত্ব বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভা বা হিন্দু মিশন করিতেছেন না। ইহা হইতে অনুমান হয়, যে-সকল ধর্ম সম্প্রদায়কে হিন্দু মহাসভা "হিন্দু" বলিয়া স্বীকার করিয়া বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, এখানকার হিন্দু সভা ও হিন্দু মিশন তাহাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে চান।"

কিন্তু ইহার সাত বৎসর পরে রামানন্দ সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করার প্রস্তাবের সপক্ষে লেখেন, পূর্বে বলিয়াছি। তাহার প্রায় তিন বৎসর পরে বাংলা ১৩৪৩এ ২৩ চৈত্র বঙ্গদেশে সুভাষচন্দ্র বসুর যে সংবর্ধনা হয় তাহার সভাপতি হন রামানন্দ। এই সভায় সুভাষচন্দ্র বলেন, "প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা পরাধীন জাতির উন্নতির বিশেষ পরিপন্থী তাই স্বাধীনতাকামী যারা তাদের কর্তব্য এমন একটা উদার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া—যার দ্বারা প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার ভেদনীতি সমূলে ধ্বংস হতে পারে।"

সুভাষচন্দ্রের এই উক্তি ও অন্যান্য কিছু কিছু উক্তি রামানন্দ 'প্রবাসী'র সম্পাদকীয় বিবিধ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেন। সুভাষচন্দ্র সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা প্রভৃতি সংকীর্ণতার উপরে উঠিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই আজ ভারতের হিন্দু-মুসলমান বাঙালি, সকলের হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছেন।

১৩৪৪ সালেও আষাঢ় মাসে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন প্রসঙ্গে রামানন্দ বলেন,

"গত পনেব বৎসবে অন্তত একজন ব'ঙালিকেও কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করা উচিত ছিল।...ব্রহ্মদেশ সমেত সমগ্র ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা আগে ছিল পঁয়ত্রিশ কোটি। সুতবাং প্রতি সাত বৎসরে একজন বাঙালিকে সভাপতি করা উচিত।"

এবং যোগ্য বাঙালি হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসুর নাম রামানন্দ করেন। আর কেহ কংগ্রেস-সভাপতি কাহাকে করা উচিত এই প্রশ্ন তুলিবার পূর্বেই রামানন্দ 'মডার্ন রিভিয়ু' এবং পরে 'প্রবাসী'তে এ প্রশ্ন তোলেন এবং সুভাষচন্দ্রেব নাম করেন। তিনি শুধু বাঙালি বলিয়াই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের যোগ্যতমেরও একজন, ইহা রামানন্দ মনে করিতেন। এই প্রস্তাব লাহোরের ট্রিবিউন এবং করাচির একটি কমিটি ও কলিকাতার অমৃত বাজার পত্রিকা প্রভৃতি সমর্থন করেন।

রামানন্দ কখনো মৃত মানুষের এমন সমালোচনা করিতেন না যাহার জবাব জীবিত অবস্থায় সমালোচ্য ব্যক্তির দেওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু আধুনিক সম্পাদকদের সকলে এই সুনীতি মানিয়া চলেন না। 'আজকাল' পত্রে [১৩৩৮-এ প্রথম প্রকাশিত অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক রামানন্দের মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একজন আত্মীয় শরৎচন্দ্রের লেখা ও প্রবাসী সম্বন্ধে এমন কতকগুলি কথা লিখিয়াছেন যাহার জবাব রামানন্দ জীবিত থাকিলে দিতে পারিতেন। কেবল এইটুকু বলা প্রয়োজন মনে করি যে শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৩৪৬ সালে কোনো সনাতনপন্থী হিন্দু ভদ্রলোক 'প্রবাসী'তে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের ধারাবাহিক প্রতিকূল সমালোচনা লিখিতে চাহিলে রামানন্দ লেখেন,

"শরৎবাবু যখন জীবিত ছিলেন, তখন তাঁহার কোনো কোনো বহির প্রতিকূল সমালোচনা আমাদের নিকট আসিয়াছিল। তাহা আমরা ছাপি নাই। ছাপিলে, আমরা সাম্প্রদায়িক বা ব্যক্তিগত কারণে তাঁহার নিন্দা রটাইতেছি, এই অপবাদ রটিত এবং সমালোচনার সত্যতা-অসত্যতা নির্ধারণে তাহাতে বাধা জন্মিত। সেই কারণে এখনও প্রতিকূল সমালোচনা (যাহা পাইতেছি) ছাপিব না।

"শরৎবাবুর কোনো কোনো বহির প্রতিকূল সমালোচনা আমাদের না ছাপিবার আর একটি কারণ

এই যে, তাঁহার যে যে বহির নিন্দা আমরা শুনিয়াছি সে বহিগুলি বাস্তবিক নিন্দনীয় কিনা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে তাহা বলিতে পারি না, কারণ সেগুলি আমরা পড়ি নাই। অবশ্য শরৎচন্দ্র কিংবা তাঁহার প্রকাশকেরা তাঁহার কোনো বহি সমালোচনার জন্য যদি পাঠাইতেন, তাহা হইলে তাহা সমালোচিত হইত।" (র.চ.)

অথচ শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক খ্যাতি যে ইউরোপে পৌঁছিয়াছে, তাহা যখন ১৯২৬এ দেশে কেহ জানিত না তখন 'প্রবাসী'র সম্পাদক "সম্পাদকের চিঠিতে" জেনিভা হইতে প্রথম রল্যাঁর মত 'প্রবাসী'তে ও 'মডার্ন রিভিয়ু'-এ প্রকাশ করেন। রল্যাঁ বলেন, শরৎচন্দ্র একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক।

রামানন্দের জীবিতকালে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব 'সাহিত্যাচার্য শরৎচন্দ্র' পুস্তকে লেখেন,

"প্রবাসী পত্রিকা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস প্রকাশের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'তে লেখবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করায় শরৎচন্দ্র লেখা দিতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রবাসী থেকে যখন তাঁকে অনুরোধ করা হল যে তিনি যা লিখবেন তার একটি চুম্বক করে যেন পূর্বাহ্নে তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁরা সেটি মনোনীত করলে তবেই সে উপন্যাস প্রবাসীতে প্রকাশিত হবে—এ শর্তে শরৎচন্দ্র নিজকে অপমানিত করতে রাজি হলেন না। একথা তিনি রবীন্দ্রনাথকে জানালেন। কবি শুনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে প্রবাসীতে রচনা পাঠাতে তাঁকে বারবার নিষেধ করেন। শরৎচন্দ্র তাই প্রবাসীতে কখনো কোনো রচনা দেন নি।"

১৩৪৬ সালের শ্রাবণ মাসে রামানন্দ ইহার প্রতিবাদ করিয়া লেখেন,

".. আমি চিঠি লিখিয়া বা মৌখিক শরৎ বাবুকে কস্মিন্‌কালেও 'প্রবাসীতে লিখিতে অনুরোধ করি নাই, কাহারও মারফৎ তাঁহাকে অনুরোধ করি নাই। তাঁহার উপন্যাস 'প্রবাসী'তে প্রকাশের জন্য কখনো আগ্রহ প্রকাশও করি নাই। সুতরাং "তিনি যা লিখবেন তার একটি চুম্বক করে পূর্বাহ্নে" আমাকে পাঠাইতেও কখনো বলি নাই।

"রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহাকে 'প্রবাসী'তে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন ও পরে বারংবার নিষেধ করেন, ইহা আমি পূর্বে কখনো শুনি নাই। সেই জন্য, এই খবর সত্য কিনা জানিবার নিমিত্ত কবিকে আমি চিঠি লিখিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে লিখিত তাঁহার চিঠিটি নীচে মুদ্রিত হইল।

ওঁ

'Uttarayan'
Santiniketan, Bengal

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

গল্প প্রকাশ করা নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রবাসীর দ্বন্দ্ব ঘটেছিল সেই জনশ্রুতির উল্লেখ এই প্রথম আপনার পত্রে জানতে পারলুম। ব্যাপারটা যখনকার তখন শরতের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। অনেক অমূলক খবরের মূল উৎপত্তি আমাকে নিয়ে, এও তার মধ্যে একটি, এই জন্য মরতে আমার সঙ্কোচ হয়। তখন বাঁধভাঙা বন্যার মতো ঘোলা গুজবের স্রোত প্রবেশ করবে আমার জীবনীতে—আটকাবে কে?

আপনাদের—
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"এই কাল্পনিক ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি এবং রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, 'প্রবাসী'তে শরৎবাবুর উপন্যাস প্রকাশের জন্য আমার আগ্রহ প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের তাঁহাকে 'প্রবাসী'তে লিখিতে অনুরোধ, শরৎবাবুকে তাঁহার উপন্যাসের চুম্বক পূর্বাহ্নে আমাকে পাঠাইতে বলা, তাহাতে তাঁহার অপমানিত বোধ করা ও রবীন্দ্রনাথের, একবার নয়, 'বারংবার' প্রবাসীতে লিখিতে নিষেধ

করা—সর্বৈব মিথ্যা।

"এই কাল্পনিক ঘটনাবলীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আমি কিছু সত্য কথা লিখিতে পারিতাম। কিন্তু লিখিতে গেলে যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতে হইত, তাঁহারা পরলোকে, সুতরাং তাঁহাদেব সহিত মোকাবিলার উপায় নাই। অতএব, এইখানেই ইতি। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।"

এই পরলোকগত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন শরৎচন্দ্র বলিয়া লেখিকার মনে পড়িতেছে। শ্রীনরেন্দ্র দেব রামানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের কথার উত্তর দেন ও রামানন্দ প্রত্যুত্তর দেন। সম্প্রতি রামানন্দের মৃত্যুর পরেও শরৎচন্দ্র ও 'প্রবাসী' সম্বন্ধে প্রমাণহীন নানা কথা কাগজে দেখিয়া এই কথাগুলি জীবনীতে উদ্ধৃত করিয়া রাখিলাম, নতুবা প্রয়োজন ছিল না। রামানন্দ মৃত শরৎচন্দ্রের নামে কোনো কথা জানিয়াও লেখেন নাই, এই ভদ্রতাটা শরৎচন্দ্রের আত্মীয় বোঝেন নাই, তাই রামানন্দের মৃত্যুর পরও 'প্রবাসী' বিষয়ে প্রমাণহীন কথা লিখিয়াছেন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হইতে সুরু করিয়া আমলাতন্ত্রের এত মানুষের প্রতি এত তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার অস্ত্র রামানন্দ প্রয়োগ করিয়াছেন যে তাহার বিবরণ দিতে গেলে দুই-তিন খণ্ড স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয়। সে চেষ্টা করিব না। ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোন্যাল্ড সম্বন্ধে দুই একটি কথা কেবল লিখিতেছি।

র‍্যামসে ম্যাকডোন্যাল্ড যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের প্রবাসী অফিসের ঘরে তাঁহাকে ছোটো হাতের কোট ও অত্যন্ত সাদাসিধা পোশাক পরিয়া রামানন্দের সহিত আলাপ করিতে দেখিয়াছিলাম। তিনি রামানন্দকে বন্ধু বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার পত্নী *M. R.*-এ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

কিন্তু ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে র‍্যামসে ম্যাকডোন্যাল্ডের কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রামানন্দ লেখেন। তিনি নানা কথার মধ্যে বলেন, "যদি একজন কংগ্রেস প্রেসিডেন্টও দেশে খুঁজিয়া পাওয়া না যায় তবে স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে নিজেদের যোগ্যতা কি করিয়া দেশবাসী প্রমাণ করিবেন? প্রেসিডেন্ট না হইয়াও ম্যাকডোন্যাল্ড ভারতকে সাহায্য করিতে পারেন।"

রামানন্দের মত এই ছিল, যে, ভারতবর্ষের স্বাজাতিকতার রূপ বর্ণন ও তদনুযায়ী দাবি ঘোষণা ভারতীয়দেরই করা উচিত ইত্যাদি। ভগিনী নিবেদিতা রামানন্দের ঐরূপ লেখা পড়িয়া তাহার প্রতিবাদ করেন এবং রামানন্দ তাহার উত্তর দেন।

ইহার পর বৌবাজারে একটি স্বদেশী মেলা হয়। বিলাত হইতে তখন প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই মেলার দ্বারমোচন করেন। রামানন্দ লেখেন,

> "এই উপলক্ষে ভূপেন্দ্রবাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি আমাকে বলেন, 'রামানন্দবাবু আপনি মি. ম্যাকডোন্যাল্ডের সম্বন্ধে কি সব লিখেছেন। তাতে তিনি বড়ো দুঃখিত হয়েছেন।' মি. ম্যাকডোন্যাল্ড চিঠিও লিখিয়াছিলেন, যে, অন্তত বন্ধুত্বের খাতিরে আমি যদি ওরকম কিছু না লিখিতাম তাহা হইলে ভাল হইত। যে কারণেই হউক, তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হন নাই। তাঁহার সহিত ভূপেন্দ্রবাবুর বাড়িতে আমার সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি বলেন, 'You are a man of war, I am a man of peace.' আপনি যুদ্ধ ভালবাসেন, আমি শান্তিপ্রিয়। ভেতো বাঙালি ইহা শুনিয়া চুপ করিয়া ছিল, হয়ত সকৌতুক বিস্ময় অনুভব করিয়াছিল। মি. ম্যাকডোন্যাল্ডের রাজনৈতিক মতের শেষ অবস্থা বিবেচনা করিয়া মনে হয়, আমরা তাঁহাকে সভাপতি করিবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া মন্দ কিছু করি নাই।"

বার্নার্ড শ জগৎ-বিখ্যাত সাহিত্যিক। কিন্তু তিনিও ভারতীয় সভ্যতার নিন্দা করিয়া

রামানন্দের নিকট রেহাই পান নাই।

উইলিয়ম আর্চার নামক এক মৃত ইংরেজ লেখকের তিনটি নাটক প্রকাশকালে বিখ্যাত সাহিত্যিক বার্নার্ড শ তাহার একটি সুদীর্ঘ ভূমিকা লেখেন। আর্চার ও শ উভয়ের মতেই ভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষা পাশ্চাত্য সভ্যতা শ্রেষ্ঠ। এই সূত্রে শ বলেন—

"যদি পাশ্চাত্য সভ্যতা জ্ঞান ও নীতি বিষযে প্রাচ্য সভ্যতা অপেক্ষা উন্নততব না হয়, তাহা হইলে স্পষ্টই আমাদের ভাবতবর্ষে থাকিবার কোনো অধিকাব নাই।"

রামানন্দ ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধে শ'র এই জাতীয় নানা উক্তির খণ্ডন করিয়া এবং শ'র অজ্ঞতা প্রমাণ করিয়া সত্যনিষ্ঠা ও স্বদেশীপ্রীতির আর একটি প্রমাণ দিয়াছিলেন। রামানন্দ লেখেন,

"শ ও আর্চার ধবিয়া লইয়াছেন, যে, ইংরেজরা ভাবতবর্ষে আসিযাছিল ভাবতীয় লোকদিগকে স্বীয় উৎকৃষ্টতর সভ্যতা দিবাব জন্য। এখনও যে এই মিথ্যা ধাবণার প্রতিবাদ করা আবশ্যক হয়, তাহা হইতেই বুঝা যায় ইংলন্ডেব নামজাদা লেখকেরা পর্যন্ত ইংলন্ডেব ভাবতবর্ষ দখল, ভাবতশাসন ও ভারতে থাকিবার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কত অজ্ঞ।.."

যে সামান্য কয়জন ইংরেজ ও অন্য পাশ্চাত্য লোকেরা ভারতীয় সভ্যতার কিছু ভালো দেখিয়া তাহার প্রশংসা করিয়াছেন, শ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন,

"পাশ্চাত্য স্বদলত্যাগী (occidental renegades) অধম লোকগুলা যাহাবা ভাবতীয় ছাত্রদিগকে এই বলিয়া অহঙ্কৃত করিয়া তুলে যে আমরা তাহাদের তুলনায় অসভ্য।"

ইহার উত্তরে রামানন্দ "স্বদলত্যাগী" কাহারও মত না তুলিয়া স্যর টমাস মন্‌রো নামক একজন প্রধান সাম্রাজ্য-সংস্থাপকের মত তুলিয়া দেখান। মন্‌রো জাতির সভ্যতাব্যঞ্জক লক্ষণ সমূহের অনেকগুলির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,

"যদি সভ্যতা ইংলন্ড ও ভারতবর্ষেব মধ্যে বাণিজ্যেব সামগ্রী হয়, তাহা হইলে আমাব দৃঢ় বিশ্বাস ইংলন্ড আমদানী মাল দ্বাবা লাভবান হইবে।"

(...Hindus are not inferior to the nations of Europe, and if cvilization is to become an ariticle of trade between the countries, I am confident that this country [England] will gain by the import cargo.)

রামানন্দ বলেন,

"পাশ্চাত্যেরা আমাদিগকে সভ্য বলিলেই আমরা সভ্য, অসভ্য বলিলেই অসভ্য হইয়া যাইব, এমন নয়, আমাদের সভ্যতা বা অসভ্যতা তাহাদের মত-নিরপেক্ষ।"

কিন্তু তবুও তিনি মন্‌রোর মত এইজন্য উদ্ধৃত করেন যে,

"মনবো বুঝিয়াছিলেন যে, কোনো কোনো বিষয়ে হিন্দুরা ইংবেজদের চেয়ে সভ্যতর, অথচ তিনি (মনবো) তল্পিতল্পা বাঁধিয়া অবিলম্বে বিলাত চলিয়া যান নাই।"

মন্‌রো মোট ৩০।৪০ বৎসর ভারতবর্ষে ছিলেন।

"এই জন্য ভাবতে শীতকালে পরিব্রাজকদের চেয়ে এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ-জ্ঞানহীন বার্নার্ড শ অপেক্ষা তাঁহার মতের মূল্য আছে। মনবো ভারতের মায়া কাটাইতে পারেন নাই, স্বদেশবাসীদিগকেও ভারত ত্যাগ করিতে বলেন নাই।"

আর্চার এবং শ ভারতের দেবমন্দিরগুলিকে 'বলিদানরূপ অসভ্য ক্রিয়াকলাপের কশাইখানা' এবং ভারতীয়দিগকে নাকে-গয়না পরা পৌত্তলিক বলেন।

রামানন্দ বলেন,

"বলিদান হিন্দু-মুসলমান ইহুদি যিনিই করুন, তাহা আমরা বীভৎস বলিয়া মনে করি। কিন্তু বলিদান না করিয়া কেবল উদরপূর্তির জন্য পশুবধই কি বলিদানের চেয়ে ভাল?...বলির পশুর মাংস মানুষে খায়, কসাইখানার পশুর মাংস মানুষে খায়। সুতরাং ইংলন্ডে কোনো মন্দিরে পশুবলি হয় না, ভারতবর্ষে কোনো কোনো মন্দিরে পশুবলি হয় বলিয়া ভারতবর্ষটা ইংলন্ডের চেয়ে অসভ্য দেশ, এটা বাজে কথা।. .ভারতবর্ষেব হিন্দু যত পশুবলি দেয়, তাব চেয়ে অনেক বেশি পশু ইংলন্ডে কসাইখানায় হত হয়।...কিন্তু তর্ক উঠিতে পারে, দেবতা পশুবধে তৃপ্ত হন, এই বিশ্বাসটা কি কুসংস্কার ও অসভ্য বিশ্বাস নহে?"

রামানন্দ উপনিষদে এই জাতীয় কুসংস্কার নাই দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি পাল্টা একটি প্রশ্ন করিয়াই আদত জবাব দেন।

"নরহত্যা পশুহত্যা অপেক্ষা ভাল, ইহা পাশ্চাত্যেবা বলিতে পাবিবেন না।...পশুহত্যার সঙ্গে ধর্মের যোগ, দেবতার যোগ, এইটাই তো আপনারা দোষের বিষয় মনে কবেন? আচ্ছা ; যুদ্ধে নরহত্যার সঙ্গে তো আপনারা আপনাদের ধর্মের যোগ স্থাপন করিয়াছেন। যুদ্ধে যাইবার আগে গির্জায় উপাসনা হয় ; যুদ্ধ জয়ের পব গির্জায় গড্‌কে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। তাহা কেন কবা হয়? কার্যত এই বিশ্বাসে নহে কি, যে যুদ্ধ যাইবাব আগে গড্‌কে স্তুতি করায় তিনি খুশি হইয়া তাঁহার পূজকদিগকে শত্রুপক্ষীয় মানুষের হত্যায় কৃতিত্বের পুরস্কার দিয়াছেন? ..

পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে রামানন্দ বলেন—

"আমি মূর্তিপূজা কিংবা মূর্তির সাহায্যে পূজা করি না। কিন্তু সেই কারণে, যাঁহারা তাহা করেন, তাঁহাদের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করি না।...তান্ত্রিকদের কাপালিকদের কোনো কোনো ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি বাদ দিলে হিন্দুদের মূর্তিপূজা, রোমান ক্যাথলিকদের মূর্তিপূজার সদৃশ। ক্যাথলিকদের মধ্যে পাদরির কাছে পাপ স্বীকাব...প্রভৃতি সম্পর্কে কুৎসার কথা ইতিহাসে লেখা আছে। কিন্তু এই সকলের জন্য পাশ্চাত্য জাতিদিগকে শ বা আর্চার অসভ্য বলেন নাই। ইউরোপে খ্রিস্টিয়ান বলিয়া পরিচিত লোকদের দুই-তৃতীয়াংশ ক্যাথলিক সুতবাং মূর্তিপূজক।...মূর্তির পূজা অপেক্ষা জঘন্য পৌত্তলিকতা টাকার পূজা বা সাম্রাজ্যবাদেব পূজা। তাহা পাশ্চাত্য জাতিদেব খুব আছে।"

শ সহমরণ, রথের চাকায় আত্মবলিদান, সতীদাহ ইত্যাদি বহু বিষয়ে বড়ো বড়ো কথা বলিয়াছেন, সব কথার উল্লেখ ও তাহার উত্তর রামানন্দের প্রবন্ধে নাই। বড়ো বড়ো যেগুলির আছে দেখাইতে গেলে রামানন্দের সমস্ত প্রবন্ধটি তুলিয়া দিতে হয়। তাহা সম্ভব নয়। রামানন্দ শেষে বলেন—

"শ ইংরেজদের একজন প্রধান লোক। তিনি যখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গণ্ডমূর্খ, তখন অন্যে পরে কা কথা?...কোনো জাতি বিজাতি বিদেশির সহিত কিরূপ ব্যবহার করে, তাহা তাহার সভ্যতা পরখ করিবার একটা কষ্টিপাথর। পাশ্চাত্য জাতিরা বিদেশের বিজাতিকে পরাজিত করিয়া হয় তাহাদের উচ্ছেদ করিয়াছে, নয় তাহাদিগকে অধীন রাখিয়া তাহাদের শ্রম ও ধন আত্মসাৎ করিয়াছে এবং শোষিত বা অপহৃত ধন স্বদেশে আনিয়াছে। হিন্দুরা চম্পা, কাম্বোজ, জাভা, সুমাত্রাদিতে, সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু তথাকার আদিম নিবাসীদের উচ্ছেদ সাধন করে নাই,...তাহাদিগকে সভ্য করিয়া, তাহাদের শক্তির বিকাশ করিয়া তাহাদিগকে এরূপ স্থাপত্য-ভাস্কর্যাদি কীর্তি স্থাপন করিতে হিন্দুরা সমর্থ করিয়াছিল, যাহা দেখিয়া এখনও পাশ্চাত্যেরা বিস্মিত হয় এবং যাহার তুলনা হিন্দুদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষেও নাই। শ্বেত পাশ্চাত্য জাতিরা তো অনেক অশ্বেত অসভ্য জাতিকে

অধীন করিয়াছে, কিন্তু তাহারা তাহাদের অধীনে এমন একটিও অশ্বেত জাতি দেখাইতে পারিবে কি যাহারা তাহাদের প্রভাবে সভ্য হইয়া এমন কিছু করিয়াছে যাহাতে জগৎ বিস্মিত হয় এবং যাহার তুলনা শ্বেতজাতিদের নিজের দেশে মিলে না?"

রামানন্দ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমালোচনা করাতে তাঁহারা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে যখনই বিদেশি আমলাতন্ত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই রামানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের হইয়া লড়িয়াছেন।

রামানন্দ সমালোচক হইলেও মতভেদ অসহিষ্ণুতা পছন্দ করিতেন না। তিনি স্বদেশসেবীদের সম্বন্ধে বলিতেন "সব দলের মধ্যেই অকপট স্বদেশপ্রেমিক আছেন। কোনো দলের লোকই সত্যের সব দিকটা দেখিতে পান বলিয়া মনে করি না। ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়াও একই লক্ষ্যে যাওয়া যায়।" বিপরীত মতপোষক লোকের বক্তৃতাদিতে বাধা দেওয়াকে তিনি "অত্যন্ত অভদ্রতা ও অসভ্যতা" বলিতেন।

তিনি বলিতেন,

"দলেব ছাপ দেখিয়া মানুষের বিচাব কবা উচিত নয়, আচরণ দেখিয়া করা উচিত।...মনে রাখিতে হইবে, অহিংসার মানে শুধু এ নয়, যে, আমরা অস্ত্র প্রযোগের দ্বারা ইংরেজকে তাড়াইতে বা তাহার অনিষ্ট করিতে চাহিব না। অহিংসার অর্থ ইহাও বটে, যে, স্বদেশবাসী ও বিদেশি কাহারও প্রতি মনেও হিংসাব ভাব পোষণ করিব না।"

তিনি অবশ্য নিজে বুঝিতেন যে, মানুষের সমালোচনা করিলে স্বভাবত তাহারা সমালোচকের প্রতি অপ্রসন্নই হয়, ন্যায়-অন্যায় বিচার তখন মনে আসে না। তাই তিনি পুত্র কন্যাদের পরিহাস করিয়া বলিতেন, "তোমরা কাহারও নিকট ন্যায়-বিচার আশা করিও না, কারণ তোমাদের পিতা বিশ্ব-সমালোচক।"

সমালোচনার জন্য তাঁহার শত্রুবৃদ্ধি হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে দেশের সাধারণের সসম্মান অভিমত কী ছিল তাহা দুই-চারিটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যায়।

প্রবাসীর ২৫ বৎসর পূর্তির সময় দ্বারভাঙ্গা রাজ লাইব্রেরিয়ান শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ বলেন,

"কেহ কেহ আপনাকে Stead সাহেবের সহিত তুলনা করেন। আমাব বিবেচনায় Stead সাহেবের চেয়ে আপনাব কৃতিত্ব অধিক। এই ২৫ বৎসরে দেশের লোকেব চিন্তাব ধারা যতটা উন্নতিলাভ করিয়াছে, আপনার বিবিধ প্রসঙ্গ ও দেশের কথা (দেশ-বিদেশের কথা) না থাকিলে অবশ্য ততটা হইত কিনা সন্দেহ। আপনার অপবাপর লেখা পুস্তকাদি বা অপর কর্মজীবনের কথা ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র সম্পাদকীয় বিচারকে যথাসম্ভব পক্ষপাতশূন্য করিতে চেষ্টা করিয়া এবং নব্যদের চিন্তার খোরাক জোগাইয়া আপনি সাক্ষাৎভাবে যতটা কাজ করিয়াছেন, দেশের কোনো জীবিত লোকেই ঠিক এভাবে করিতে চাহেন নাই, এরূপই মনে হয়।"

তাঁহার ক্ষুরধার সমালোচনাকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করিয়াই তাঁহার মৃত্যুর পর *Indian Reader's Digest*-এ Noel H. Matthews লেখেন :—

"Chatterjee, your sword is broken,
Tumbled from a dying hand—
Pen whose ringing words have spoken
Justice' cause in every land.

* * * * * *

With Humanity's defender
Gone, another light is out ;
You have struck the white hot casting
We can forge the world anew !

Still the flames fan into splendour
And the voice becomes a shout!
* * *
Ramananda, Dawn is breaking
Fires lighted in the night
To unlettered man are taking
Banners that are clear and bright.

Man may yet be ever lasting
Through the works that he may do.
* * *
O brown brother, I am telling
What I know must surely be,
When oppressed mankind, rebelling
Mind to mind shall bridge the sea.

মতিলাল নেহরু

'ইন্ডিয়া ইন্ বন্ডেজে'র মোকদ্দমার সময় ছাড়া পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সহিত রামানন্দের আর যতটুকু যোগাযোগের বিষয় 'প্রবাসী'তে দেখি তাহা এই : মতিলাল নেহরুর অধুনালুপ্ত 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট' নামক দৈনিক কাগজ যখন এলাহাবাদে প্রতিষ্ঠিত ও স্থাপিত হইবার কথা হয়, তখন মতিলাল নেহরু রামানন্দকে ঐ কাগজের সম্পাদকতার ভাব গ্রহণ করিবার জন্য দীর্ঘ চিঠি লিখেন। কোনো কোনো কারণে ঐ চিঠির উত্তর দিতে রামানন্দের দেরি হইয়া যায়। মতিলাল ব্যস্ত হইয়া দীর্ঘ একটি টেলিগ্রাম পাঠান। চিঠি ও টেলিগ্রাম দুইয়েই লেখা ছিল, "name your own salary." "আপনার বেতন আপনি নিজেই স্থির করিবেন।"

মতিলাল বলিয়াছিলেন, "আপনি প্রথমে মাস-তিন এলাহাবাদে থাকিয়া কাগজটা চালাইয়া দিয়া যান। তাহার পর কলিকাতাতেই থাকিতে পারেন ; মধ্যে মধ্যে আসিবেন, কাগজের পলিসি ডিরেক্ট করিবেন ; কিন্তু কোনো সময়েই আপনাকে প্রত্যহ লিখিতে হইবে না। ইচ্ছা ও প্রয়োজন হইলে গুরুতর বিষয়ে লিখিবেন।" ইহাও বলেন, "I have the ambition to bring back The Modern Review ultimately to the city where it was born."

মতিলাল নেহরু মহাশয়ের গুণগ্রাহিতার পরিচয় পাইয়াও রামানন্দ 'ইন্ডিপেন্ডেন্টে'র সম্পাদকতা গ্রহণ করেন নাই, কারণ চাকরি করিবার ইচ্ছা আর তাঁহার ছিল না। পরে কিছুদিন বিপিনচন্দ্র পাল এই কাগজের সম্পাদক হন। তিনি সম্ভবত ১০০০ বেতন পাইতেন।

গবর্নমেন্ট যখন মুদ্রাযন্ত্রের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খুব সীমাবদ্ধ করিয়া প্রেস অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছিলেন তখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে এই অনুরোধ করেন যে সমুদয় ভারতীয় ন্যাশনালিস্ট কাগজ যেন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সমুদয় কাগজ বন্ধ করাতে রামানন্দের আপত্তি ছিল। এই উপলক্ষে মতিলাল নেহরুর সহিত তাঁহার পত্র বিনিময় হয়। মতিলাল যে শেষ উত্তর দেন, তাহা রামানন্দের নিকট পৌঁছে নাই। তাহা পুলিসের হস্তগত হয়, এবং মতিলালের বিচারের সময় আদালতে তাঁহার দস্তখত প্রমাণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। রামানন্দকে লিখিত এই শেষ চিঠিটি পুলিসের হাতে দেখিয়া মতিলাল আদালতে মুচকি হাসি হাসিয়াছিলেন।

দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ

রামানন্দ বেতার-বক্তৃতায় দীনবন্ধু বিষয়ে বলিতে অনুরুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ মহাশয় সম্বন্ধে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিশেষ কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন, বিশেষ করে আমার মতো একজন মানুষের পক্ষে যাকে তিনি বরাবর বন্ধু বলেই মনে করে সেই রকম ব্যবহার করেছেন। শুধু আমার সঙ্গে যে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক ছিল তা নয়, আমার একটি পুত্রকে তিনি ছাত্ররূপে পেয়ে তাকে যে স্নেহ ও উৎসাহ দিয়েছিলেন, তাও আমার এখন মনে পড়ছে। সেই সকল কথা মনে পড়ে আমাব তাঁর সম্বন্ধে ভালো করে কিছু বলতে সামর্থ্য জোগাচ্ছে না।"

বেতার-বক্তৃতায় ইঁহার বিষয় অন্যান্য কথা বলার পর প্রবাসীতেও রামানন্দ কিছু লেখেন। সেই লেখা হইতে কিছু তুলিয়া দিতেছি,

"বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও স্নেহ অসামান্য ছিল। মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি বড়োদাদা বলিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবিতকালে যখনই অ্যান্ড্রুজ শান্তিনিকেতনে থাকিতেন, প্রত্যহ বড়োদাদাকে দেখিতে গিয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতেন এবং তাঁহার সঙ্গে চা খাইতেন।. .একদিন অ্যান্ড্রুজের সহিত আমিও দ্বিজেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম। সেদিন তিনি কী কারণে জানি না, খ্রিস্টিয়ান পাদরিদের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। আমরা উভয়ে প্রণাম করিবার পব পাদবিদের হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতার বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ উদ্দীপনার সহিত অনেক কথা বলিলেন—ইহা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে অ্যান্ড্রুজ এক সময কার্যত এবং নামেও পাদরি ছিলেন এবং তখনও বস্তুত পাদরি ছিলেন। পরে বড়োদাদা আবাব শান্ত ভাব ধাবণ কবিলেন। আমরা যখন ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন পথে নানা কথাবার্তাব মধ্যে অ্যান্ড্রুজ বেশ প্রসন্নভাবেই বলিলেন, 'We had a very interesting talk from Bara Dada this evening.'

"সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের প্রিন্সিপাল সুশীলকুমার রুদ্র দীনবন্ধুর অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। উভয়ে যেন আধ্যাত্মিক অভিন্নহৃদয় ছিলেন। রুদ্র মহাশয়েব একটি নাতনির যখন জন্ম হয়, তখন অ্যান্ড্রুজ আমাকে স্পর্ধাব সহিত লিখিয়াছিলেন 'এখন আমিও ঠাকুরদাদা হয়েছি।' কারণ তিনি বোধ হয় মনে করিতেন আমার অনেকগুলি নাতনি আছে বলিয়া আমি অহংকৃত। সে বিষয়ে আমার কথঞ্চিৎ সমকক্ষতা এই স্পর্ধিত উক্তির কারণ।

"ভারতবর্ষকে বিশেষত বাংলাদেশকে স্বদেশ বলিয়া বরণ করিবার পর তিনি ভারতীয় অর্থেই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। কোনো আয় বা সম্পত্তিব উপর তাঁহার আসক্তি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ একবার অ্যান্ড্রুজের সমক্ষে পরিহাস করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন 'আপনার যদি কোনো জিনিস হারাবার দরকার থাকে তা হলে সেটা অ্যান্ড্রুজকে দিবেন।' অ্যান্ড্রুজ তাহা শুনিয়া প্রতিবাদচ্ছলে হাসিয়া বলিলেন, 'No, no, Gurudev, you are very mischievous.' কিন্তু বাস্তবিকই কোনো জিনিস আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকা তাঁহাব প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল।"

বিদেশি শাসকদের আমলে বাণিজ্যিক উপায়ে ভারতবর্ষের যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে তাহা দীনবন্ধুর বন্ধু সুশীল রুদ্র মহাশয় তাঁহাকে দেখাইয়াছেন। তাহার পর জনৈক ভারতপ্রেমিকের ক্রমবিকাশ (The evolution of a lover of India) উপশীর্ষনাম দিয়া ঐ প্রবন্ধে অ্যান্ড্রুজ লিখিয়া গিয়াছেন :

"A second influence was that of Ramananda Chatterjee, the Editor of the M.R. From the first day that it was published, I used

to be one of its most enthusiastic supporters and readers. Also from time to time, the editor kindly allowed me to contribute an article All this going on year after year, formed an admirable training for me in getting rid of that old conceit about the perfection of British rule with which I had started, owing chiefly to my home upbringing."

ইহাতে তিনি বলেন যে তাঁহার মধ্যে ভারতপ্রেম জাগরিত করিতে সাহায্য করেন যে দ্বিতীয় মানুষ, তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। স্বামী ভবানী দয়ালও বলেন, সাধু অ্যান্ড্রুজের বহির্ভারতের কর্মপ্রেরণার একটি উৎস ছিলেন রামানন্দ।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসের 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে অ্যান্ড্রুজের উক্তি বলিয়া শ্রীযুত রাম শর্মা লেখেন :

"By the bye, do you know what my relationship with Ramananda Babu is?"

"All that I know is that both of you are old affectionate friends and that your friendship is based on truth, and love of India," I replied humbly.

"It is not only that," said the Denabandhu, with joy and legitimate pride, "I look upon him as my elder brother and it is to him that I own not a little of my love and understanding of my people of India."

"It was in this way," said he Dinabandhu "in 1905-6 I went to the Punjab as a military chaplain. At that time the Civil and Military Gazette of Lahore published an article blaming 'a handful of educated Indians for their agitation against the British adminstration, and adding that the majority of the people were with the Government.' It was very insolent in tone. In reply I wrote a series of articles over the nom-de-plume of 'A military Chaplain' which caught the eagle eye of Ramananda Babu. He managed to locate my identity. And ever since, he has always staunchly supported me with his pen and paper in my mission on behalf of the Indians overseas as well as in my other international work "

অ্যান্ড্রুজ মহাশয় ছাত্র মুলুকে এতটা ভালবাসিতেন যে তাহার মৃত্যুর বহুদিন পরেও ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দক্ষিণ আফ্রিকা যাইবার সময় একবার চিঠিতে একটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া লেখেন :

My dear Ramananda Babu,

"...When I was writing it my thoughts were often with Mulu and I seemed to picture him among those Irish pilgrims I have mentioned struggling up the mountain side. It was a fancy, but it was a very real one, and I could almost see his face As I set out to Aftica again I feel his presence is with me and that it is an important mission on which I am bound for the liberation of India."

শ্রীযুত রাম শর্মাকে দীনবন্ধু বলেন যে রামানন্দকে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মনে করিতেন এবং ভারতীয়দের প্রতি তাঁহার ভালবাসার জন্য ও ভারতীয়দের চিনিতে ও বুঝিতে পারার জন্য রামানন্দের নিকটই তিনি বহুল পরিমাণে ঋণী।

রামমোহন প্রসঙ্গ

রামানন্দের আদর্শ ছিলেন রামমোহন। কেহ কেহ তাঁহাকে রামমোহনের আত্মিক সন্তান বলিতেন। রামমোহনের সম্বন্ধে তিনি যত কথা যেরূপ ভক্তির সহিত অথচ সুযুক্তির সহিত বলিয়াছেন, আধুনিক কালে বেশি লোক তাহা বলেন নাই। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে রামমোহনের মৃত্যুশতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতে যত জায়গায় সভা হইয়াছিল, তাহার বহু স্থান হইতে তাঁহাকেই সভাপতি হইবার জন্য আহ্বান করা হয়। তিনি হাজারিবাগে, কটকে, গোরখপুরে সভাপতি হইয়া যান। কলিকাতায় বড়ো বড়ো কাজে পৌরোহিত্য করিবার লোকের অভাব হয় না, কারণ সেখানে বহু লোকের কাছে নিজের কথা বলিবার মস্ত সুযোগ পাওয়া যায়। মফঃস্বলে যাইতে লোকে তত উৎসাহ বোধ করে না। এইজন্য মফঃস্বলের ডাকে রামানন্দ আগে সাড়া দিতেন। রামমোহন সম্বন্ধে রামানন্দ 'প্রবাসী'তে বলেন,

"তিনি বাঙালিদের, ভাবতীযগণের এবং সমগ্র মানবজাতির যে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণেব আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাহা বাস্তবে পবিণত করিবার নিমিত্ত অধ্যয়ন, চিন্তা, অর্থব্যয় এবং স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং লোকনিন্দা ও উৎপীডন সহ্য করিয়াছিলেন, সেই আদশ তাঁহার নিজের প্রতিভা ও চিন্তা হইতে প্রসূত। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ কবিযাছিলেন, ও জীবিত ছিলেন, তখন সেই আদর্শ অনন্যসাধাবণ ছিল, এবং তখনকার পক্ষে তাহা বিস্ময়কর। এখনও তদ্রূপ আদর্শ উপলব্ধি কবিয়া তাহাব অনুসরণ করিবার লোক বিরল; তাঁহার মতো ভগবদ্‌ভক্তি, মানবপ্রীতি, সত্যপ্রিয়তা, সাহস, বুদ্ধিমত্তা, অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত সেই আদর্শের অনুসরণে সমর্থ একজন মানুষও এখন ভারতবর্ষে নাই। তাঁহার পূর্বেও কোনো ভারতীয় মহাপুরুষ তাঁহার মতো আদর্শ মানসপটে অঙ্কিত করেন নাই বা তাহা বাস্তবে পরিণত কবিতে চেষ্টা কবেন নাই। কল্যাণের আদর্শের কোনো কোনো অংশের সাধনায় তাঁহা অপেক্ষা শক্তিমান ও কৃতী ব্যক্তি অবশ্য তাঁহাব পূর্বে ও পবে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন।"

কলিকাতার সেনেট হাউসে কলিকাতার শতবার্ষিকী সভার যে চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে বিনামূল্যে সেনেট হাউসে প্রবেশের কাহারও অধিকার ছিল না। তথাপি প্রত্যেক অধিবেশনে হল পূর্ণ হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রথমদিন কিছু কাল সভাপতিত্ব করেন। রামানন্দ তাঁহার প্রবন্ধ *"Rammohon Roy, the Monotheist"*, স্বয়ং কলিকাতার বাহিরে শতবার্ষিকী উৎসব করিতে যাওয়ায়, পড়িতে পারেন নাই। অন্যে সারমর্ম পড়িয়া দেন। রামানন্দ তখন লুম্বিনী তীর্থযাত্রী।

রামমোহন শতবার্ষিকীর বৎসর একদল মানুষ রামমোহনের নানা দোষ উদ্‌ঘাটন করিবার চেষ্টা করেন ; তাহাতে রামানন্দ বলেন,

'আমরা চাহিয়াছিলাম, রামমোহনেব প্রতি যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ তাঁহারা অবাধে প্রাণ খুলিয়া শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুন—শতবার্ষিকী তো দুইবার আসে না, আব আসিবে না।

"শ্রদ্ধা-প্রদর্শনমূলক অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে দোষোদ্ঘাটন অশোভন বা অসময়োচিত বলিয়াই যে তাহা বর্জনীয় তাহা নহে ; অন্য কারণও আছে। মধ্যাহ্নকালেও চোখের সামনে ছাতা খুলিয়া ধরিলে, এমন জ্যোতিষ্মান্ যে সূর্য তাহাকেও মানুষ দেখিতে পায় না। ছাতাটা কালো ও ছোটো, সূর্য জ্যোতিষ্মান্ ও বৃহৎ। কিন্তু ছাতাটা মানুষের খুব কাছে, সূর্য দূরে। তাই ক্ষুদ্র বৃহৎকে ঢাকিয়া ফেলে। এইরূপ অতি বিখ্যাত ও কৃতী ব্যক্তিরও কোনো সত্য, অনুমিত বা কল্পিত দোষ যদি পাঠকেব সম্মুখে ধরা হয়, তাহা হইলে সেই প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মহৎ চরিত্র এবং কীর্তিও অন্তত কিছুকালের জন্য পাঠকেরা ভুলিয়া যাইতে পারে, এবং

তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হইয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা কবিতে পারে। বামমোহন রায়ের প্রতি যখন শ্রদ্ধা দেখাইবার আয়োজন হইতেছিল, তখন তাঁহার সত্য বা কল্পিত দোষ উদ্ঘাটন করা এইজন্য আমাদের বিবেচনায় অসমীচীন হইয়াছিল।...এ পর্যন্ত সম্প্রতি তাঁহার বিরুদ্ধে যাহা লেখা বা বলা হইয়াছে, তাহা আমরা সত্য বলিয়া স্বীকাব কবি নাই।"

তখন রামমোহন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"জীবিতকালে তাঁর প্রত্যেক কাজে আমরা তাঁকে পদে পদে ঠেকিয়েছি। আজও যদি আমরা তাঁকে খর্ব করবার জন্য উদ্যত হয়ে আনন্দ পাই, সে-ও আমাদের বাঙালি চিত্তবৃত্তির আত্মঘাতী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়।"

রামানন্দ বলেন,

"বুদ্ধদেবের জন্মের আড়াই হাজার বৎসর পরে ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য জগৎ তাঁহাকে পুনরাবিষ্কাব করিয়া কিয়ৎপরিমাণে সম্মান কবিতে পাবিয়াছে। রামমোহনকে কোনো মহাপুরুষেব সহিত তুলনা না করিয়া বলিতে পাবা যায়, যে, তাঁহাকে চিনিতে যদি লোকের একশত বৎসব অপেক্ষা বেশি সময় লাগে, তাহা আশ্চর্যেব বিষয় নহে। তাঁহাকে বুঝিতে সময় লাগিবে।"

শতবার্ষিকীব সময় 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে রামমোহন সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ ও আলোচনা প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচনা এবং তাঁহার ছবিও কিছু কিছু ছাপা হয়।

রামমোহনের প্রতি রামানন্দের ভক্তি; সীমা ছিল না। তাহা যৌবনকাল হইতে রামমোহনের বিষয়ে তাঁহার অসংখ্য বক্তৃতা, রচনা ও তাঁহার আদর্শ প্রচারেই বুঝা যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রামমোহন-গ্রন্থাবলী পাণিনি কার্যালয় হইতে প্রকাশ করার উদ্যোগে তিনিই প্রধান ছিলেন এবং তাঁহারই লিখিত গ্রন্থাবলীর ভূমিকাটি পরে *Rammohan and Modern India* নামক বিখ্যাত পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয়। *Indian Messenger* ইহাকে বলেন, "a marvel of wise condensation and sound judgement."

কিন্তু রামানন্দের সম্পাদকীয় আদর্শ এত উচ্চ ছিল যে যখন বামমোহনকে খাটো করিবার জন্য, বিশেষ করিয়া শতবার্ষিকীর বৎসরে, অনেকে তাঁহার কাল্পনিক বা সত্য দোষ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টায় মাতিয়া গেলেন, তখন ঐতিহাসিক গবেষণার নামে এই জাতীয় প্রবন্ধ 'প্রবাসী'তে ছাপাইতে পাঠাইলেও সম্পাদক সে-সকল ছাপিয়াছিলেন। তাঁহার নিযুক্ত কর্মচারীদিগকেও 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠা ব্যবহারে তিনি বাধা দেন নাই। অবশ্য তিনি প্রবন্ধগুলির শেষে স্বীয় সম্পাদকীয় মন্তব্য না লিখিয়া ছাপিতেন না এবং তাঁহার বিশ্লেষণী-ক্ষমতায় দোষগুলির সত্যতা সম্বন্ধে বুদ্ধিমান লোকেদের বিশেষ সন্দেহই হইত। তবু রামমোহন-ভক্ত অনেকে রামানন্দের উপর ক্রুদ্ধ হইতেন এবং বলিতেন, "রামমোহন সম্বন্ধে অখ্যাতিকর অনুমান ছাপা উচিত নয়।" রামানন্দ বলিতেন,

"ইঁহাদের সহিত এই সম্পাদক পত্রিকা-সম্পাদনরীতি সম্বন্ধে একমত নহেন। সত্য নির্ণয়ই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত ; এবং সত্য নির্ণয় করিতে হইলে অনেক অপ্রীতিকর এবং হয়ত ভবিষ্যতে অসত্য বলিয়া যাহা প্রমাণ হইবে, এরূপ অনেক কথারও আলোচনা করিতে হয়।"

তাঁহার মতে, এই জাতীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করায় "অন্তত একটি সুফল হইয়াছে, যে, ৩৬ বছর পূর্বে প্রকাশিত মোহিনী চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ আবার সর্বসাধারণের গোচর হইল। মোহিনীবাবুর লিখিত তথ্যগুলি দ্বারা ব্রজেন্দ্রবাবুর লিখিত 'রামমোহন রায় ও রাজারাম' প্রবন্ধের কোনো কোনো অনুমান খণ্ডিত হইতে পারে।" ('প্রবাসী' ১৩৩৬)

প্রবন্ধ ও পুস্তকাকারে যত লোক রামমোহনের নিন্দা করিয়াছেন, রামানন্দের চোখে পড়িলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ সুযুক্তির সহিত করিয়াছেন। এইজন্যই শ্রীঅতুলেন্দু গুপ্ত রামানন্দের তিনটি Soft Corner-এর কথা পরিহাসের সুরে বলিয়াছিলেন : রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ ও প্রবাসী বাঙালি।

রামমোহন সম্বন্ধে রামানন্দ বলিতেন "হিমাচলের পাদদেশে দাঁড়াইয়া হিমালয়কে দেখিলে উহার বিরাট মূর্তি উপলব্ধি হয় না। বড়ো একখানা ছবি দেখিতে হইলেও উহা হইতে কিছু দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়।"

শতবার্ষিকীর সময় রামমোহনকে ছোটো করিবার চেষ্টা একদল লোক যেরূপ করিয়াছিলেন, পূর্বে সেরূপ চেষ্টা তত ছিল না। ১৩৩৫ সালের 'প্রবাসী'তে আছে, পঞ্চান্ন কি ছাপান্ন বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে "শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রাচীনপন্থী হিন্দুও রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় যোগ দিয়া সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন।"

১৩৩৫ সালে হিন্দু মিশন রামমোহন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিমিত্ত একটি সভা আহ্বান করেন। রামানন্দকে তাঁহারা অনুরোধ করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করান। স্মৃতিসভায় অনেকে বিবেকানন্দের নাম করাতে রামানন্দ বলেন যে, ভগিনী নিবেদিতার একখানি বহিতে আছে, যে, স্বামীজি বলিতেন তিনি রামমোহনের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করেন। 'ধম্মপদে'র অনুবাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু তাহাতে বলেন যে, তিনিও স্বয়ং স্বামীজিকে রামমোহনের উদ্দেশে কৃতাঞ্জলি হইয়া ঐ কথা বলিতে একাধিক বার শুনিয়াছেন।

এই উপলক্ষে রামানন্দ লেখেন,

> "রামমোহনেব জীবনচবিত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহাবা জানেন, তাঁহার মৃত্যুর অনেক পবে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্য কোনো কোনো বিষয়ক যে-সব আন্দোলন ও প্রচেষ্টা আরব্ধ হয়, তিনি সেই সকলের সূত্রপাত তাঁহার নানা কাজে ও রচনায় করিয়া গিয়াছেন। রামমোহন তাঁহার ১৮৩১ সালের (একটি) চিঠিতে বিনা যুদ্ধে জাতিতে জাতিতে বিবাদ-নিষ্পত্তির উপায় সূচনা কবিয়াছিলেন।.. এক শতাব্দী পূর্বে যে ভারতীয় একজন মনীষী যুদ্ধনিবারণ বাঞ্ছনীয় ও সাধ্যায়ত্ত মনে করিয়াছিলেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে তাহাব উপায়ও নির্দেশ করিয়াছিলেন, ইহাতে আমবা জাতীয় আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারি। কিন্তু রামমোহনের স্বজাতি বলিয়া দাবি করিতে হইলে তদুপযুক্ত জীবন যাপন কবিতে হইবে। তাহা আমরা কবিতেছি কিনা প্রত্যেককে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।"

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মজুমদার ও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ স্থির করেন, হাইকোর্ট ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া রাজা রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে যত কাগজ পাওয়া যাইবে তাহা একত্র প্রকাশিত করিতে হইবে। এই কার্যে আবশ্যক অর্থ সংগ্রহে সহায়তা করিবার জন্য এবং কোষাধ্যক্ষের কার্য করিবার জন্য তাঁহারা রামানন্দকে সম্মত করান। ছাপার ব্যয়ভার বহনের জন্য ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহাকে সম্মত করানো হয়। স্যর জগদীশচন্দ্র বসু, পিঠাপুরমের মহারাজা ও স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি অর্থ সাহায্য করেন।

চন্দ মহাশয় প্রবাসীতে রাজা রামমোহন রায়ের অনুমিত অপবাদ খণ্ডনের জন্য ১৩৪৪এ এবং অন্য সময়ে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ১৩৪৪ সালেই এই সংবাদ চন্দ মহাশয় 'প্রবাসী'তে ছাপেন।

১৩৪৮এর প্রবাসীতে ডা. যতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের রামমোহন-বিষয়ক তিনখানি

গ্রন্থের কথা আছে। সম্পাদক বলেন, "রামমোহন সম্বন্ধেও তাঁর সময়কার ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁরা মৌলিক উপাদান থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চান, তাঁদের এই গ্রন্থগুলি রাখা ও পড়া চাই-ই।"

বাংলা ৭ কিংবা ৮ জ্যৈষ্ঠ রাজা রামমোহন রায়ের জন্মদিন। ঐ দিনে বাংলা দেশে কোনো অনুষ্ঠান হয় না। বাংলা ১৩৪৮ সালে অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা স্টেশন হইতে রামানন্দ রামমোহন বিষয়ে বেতারে বক্তৃতা দেন। দাক্ষিণাত্যের নিজাম রাজ্যের ঔরঙ্গবাদ হইতে এই বক্তৃতা সঠিক শুনিয়া কেহ কেহ চিঠি লেখেন। বক্তৃতাটি 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বাংলা ১৩২৪ সালে যখন রুশিয়ায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন রামানন্দ আনন্দিত হইয়া রাজা রামমোহনের স্পেন দেশের নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠায় ভোজ দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া লেখেন,

> "এই বিশ্ববন্ধু ভারতে জাতীযতাব জনক এবং জগতে বিশ্বজনীনতার কায়মনোবাক্যে সমর্থক। বাঙালি শিরোমণির মতো মহত্ত্ব তাঁহার মতো স্বাধীনতাপ্রিয়তা অতি দুর্লভ। কিন্তু যে বাঙালিব রক্ত তাঁহার দেহে প্রবাহিত হইত, আমাদেরও শবীরে সেই বাঙালি শোণিত প্রবাহিত হইতেছে। তিনি যে বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ুর গুণে গড়িয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা এখনও বহিয়াছে ; আমরা অযোগ্য হইলেও তাঁহারই আধ্যাত্মিক বংশধর। পৃথিবীর কোথাও কোনো মানুষ মানুষ হবার সুযোগ পাইলে আমাদের আনন্দ আপনা-আপনিই উথলিয়া উঠে। রুশীয় সাম্রাজ্যের অধিবাসীবা দেশের কাজে সর্বেসর্বা হওয়ায় কত কত জাতির অধীনতা-পাশ ছিন্ন হইল। ইহাতে আমাদের কোনো স্বার্থ সিদ্ধি না হইলেও আমরা যাঁর পব নাই আনন্দিত হইয়াছি।"

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের সহিত রামানন্দের সম্বন্ধ এত দীর্ঘদিনের ছিল যে সেই প্রসঙ্গে আর-একবার না ফিরিয়া গেলে অনেক কথাই বাদ পড়িয়া যায়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দ শান্তিনিকেতনের কুটিরটি সাময়িকভাবে বন্ধ করিয়া কলিকাতায় আসেন। কিন্তু সে কুটিরটিতে আর তাঁহার ফেরা হয় নাই। মুলুর মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনে ফিরিবার কথা কিছুদিনের মতো আর উঠেই নাই। এদিকে আশ্রমে তখন স্থানাভাব, কারণ ক্রমেই মানুষ বাড়িতেছে এবং বিশ্বভারতীর অঙ্কুর গজাইতে শুরু হওয়াতে বাড়িবার সম্ভাবনাও প্রচুর রহিয়াছে। তাই আশ্রম হইতে ওই কুটিরটি কিনিয়া লইবার কথা উঠিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,

"আপনাকে প্রতিবেশী রূপে পাইবার লোভ মনে প্রবল ছিল বলিয়াই এই কুটিরটিকে কোনোমতে আপনার হাতে গছাইয়া দিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম আপনাকে intern করা গেল—কিন্তু বন্দী করিয়া রাখিতে পারিলাম না।" কুটীরটি তিন শত টাকায় আশ্রমকে দেওয়া হয়।"

বাংলা ১৩২৬এর ১৮ আষাঢ় বিশ্বভারতীর কার্যসূচনা হইলেও, ১৩২৮এর পৌষ হইতে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বৎসরের কার্যারম্ভ হয়। 'প্রবাসী'ও এই সময় আরও খ্যাতি লাভ করিতে থাকে। ১৩২৯ সাল হইতে 'প্রবাসী' ৭,৫০০ করিয়া ছাপা আরম্ভ হয়। সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' প্রকাশিত হইল। কিছুদিন পরেই 'মুক্তধারা' পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া রামানন্দ সেগুলি বিশ্বভারতীকে উপহার দেন।

রবীন্দ্রনাথ লেখেন,

" 'মুক্তধারা'র বইগুলি আপনি বিশ্বভারতীকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহাতে আমি বড়ো আনন্দ পাইলাম। আমাদের সকলের কৃতজ্ঞ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি মাঘ ১৩২৯।"

জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ সকলেই তখন 'প্রবাসী'র লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে। প্রফুল্লচন্দ্র জাতিভেদ-সমস্যা, অন্নসমস্যা, এখন ও তখন, ভোগের অনাচার প্রভৃতি বড়ো বড়ো প্রবন্ধ লিখিতেন। তখন সঙ্কটত্রাণ সমিতির যুগ। 'প্রবাসী'তে পাতায় পাতায় দুর্ভিক্ষপীড়িত বন্যাপীড়িত ও ত্রাণ সমিতির বর্ণনা ও ছবি থাকিত।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে অশোক কেম্ব্রিজ হইতে ফিরিবার পর *Welfare* নামক ইংরেজি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহাতে যুগ্ম সম্পাদকরূপে রামানন্দ ও অশোকের নাম থাকিত। সেইজন্য *Welfare* প্রকাশিত হইবার পর এবং তাহাতে রামানন্দকে নিয়মিত লিখিতে দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লেখেন,

"তিনখানা কাগজের বোঝা মাথায় লইলেন, এ সংবাদে আমি উৎকণ্ঠিত আছি। যাঁহাতক বাহান্ন তাঁহাতক তিপান্ন লোকবাক্যকে আমি বিশ্বাস করি না—অনেক সময় কেবলমাত্র তিপান্নতেই নৌকাডুবি ঘটে। শাকের আঁটিতে ভার নাও বাড়িতে পারে, কিন্তু তার সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ নষ্ট করিবার পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট। শেষ বয়সে বিশ্বভারতী কাঁধে তুলিয়া ভার লাঘব তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনাকে উপদেশ দিতে বসিলাম—ইহাতে আপনি কৌতুক বোধ করিবেন—শান্তা সীতাকেও ঐ কৌতুকের ভাগ দিবেন। ইতি তারিখ জানি না অগ্রহায়ণ ১৩২৯।"

রবীন্দ্রনাথের লেখার তখন জোয়ার আসিয়াছে। ১৩৩১এর 'প্রবাসী'তে আশ্বিন মাসে ৮৮ পৃষ্ঠাব্যাপী 'রক্তকরবী' প্রকাশিত হইল। তাহার পর শুরু হইল 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'। ১৯২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দের মধ্যে কোনো কারণে একটু ভুল বোঝাবুঝি হইয়াছিল। এই বন্ধুবিচ্ছেদের সম্ভাবনা যখন কাটিয়া যায় তখন রবীন্দ্রনাথ (২ জুলাই ১৯২৭) লেখেন,

> "জানি না কি কারণে সংসারে আমার বন্ধুত্বের সীমা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। আমার মধ্যে একটা কোনো গুরুতর অভাব নিশ্চয়ই আছে। আমার বিশ্বাস সেই অভাবটা হচ্ছে আমার হৃদ্যতাপ্রকাশের প্রাচুর্যের অভাব। শিশুকাল থেকে অত্যন্ত একলা ছিলুম, লোক-সঙ্গ না পাওয়াতে লোক ব্যবহারের শক্তি সম্ভবত আমার আড়ষ্ট হয়ে গেছে।...
>
> "যখন বয়স হয়েছে পরিচিত লোকদের মধ্যে যাদের আমি কোনো না কোনো কারণে শ্রদ্ধা করতে পেরেছি, তাদেরই আমি মনে মনে বন্ধু বলে গণ্য করেছি। তাদেরও সকলকে আমি রক্ষা করতে পারি নি। এদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। জগদীশ, আপনি, যদুবাবু ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই চারজনের নাম মনে পড়চে।...
>
> "প্রবাসী'তে অগ্রগামী হয়ে আপনি যে পদ্ধতি প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন অন্য সকল কাগজ যখন তারই অনুবর্তন কবে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়েছিল, তখন আমি সেজন্য অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেছি।"

এই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানা-বিষয়ক আদর্শের কথা, বিশ্বভারতীর অভাবের কথা ও দেশের নানা সমস্যার কথা চিঠিপত্রেও নিয়মিত আলোচনা করিতেন।

ইং ১৯২৮এ 'বিশাল ভারত' নামক হিন্দি পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত বনারসী দাস চতুর্বেদী মহাশয় তাহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। রামানন্দ ছিলেন সঞ্চালক কিন্তু তিনি

সম্পাদককে স্বীয় মতামত প্রকাশ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেন। 'বিশাল ভারত' হিন্দি মাসিক পত্রিকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণ করে। বহির্ভারতের ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষা ও তাঁহাদের সহিত স্বদেশের যোগরক্ষার জন্যই এই পত্রিকাটি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। চতুর্বেদী মহাশয় *'Modern Review'* পত্রে "Indians Abroad" বিভাগ বহুদিন লেখেন। দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ ছিলেন চতুর্বেদী মহাশয়ের বিশেষ বন্ধু। আমেরিকা-প্রবাসী সুধীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'বিশাল ভারতের' উদার দৃষ্টিকোণ প্রভৃতির প্রশংসা করিয়া বলেন : "হিন্দুস্থানে ইহার দশ লক্ষ গ্রাহক হওয়া উচিত।"

'বিশাল ভারতে'র সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসী প্রেসে হিন্দি পুস্তকাদিও ছাপা শুরু হয়। এই সময় রবীন্দ্রনাথের হিন্দি পুস্তকও ছাপা হইয়াছিল। এ বিষয়ে ১৩৪৫ সালের বৈশাখে 'প্রবাসী'তে সম্পাদক লিখিয়াছিলেন,

> "কয়েক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে তাঁহাব বাংলা বহিগুলির হিন্দি অনুবাদ প্রকাশ করিবার অধিকার দিয়াছিলেন।
>
> তাঁহাব কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ছোটো গল্পের ও উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশও করা হইয়াছিল। অনুবাদ ভালোই হইয়াছিল। কিন্তু বৎসরে ন্যূনাধিক দুইশত চল্লিশ টাকাব বিজ্ঞাপন দিয়াও বহিগুলির বিক্রি যত হইত তাহাতে কবির (বা আমাদের) মুনাফার পরিমাণ দুইশত চল্লিশ টাকা হইত না। তাহার কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্প ও উপন্যাস উৎকৃষ্ট হইলেও হিন্দিভাষীদের রুচি, সংস্কৃতি ও মনের ভাব বাঙালিদেব রুচি, সংস্কৃতি ও মনের ভাব হইতে অনেকটা ভিন্ন।"

রাজনৈতিক কোনো বিষয়ে লিখিবার কিংবা কিছু বলিবার সময় রবীন্দ্রনাথের নিয়ম ছিল রামানন্দের সহিত পরামর্শ করা। উপওয়ালাদের তিনি যখন কড়া কথা শুনাইতেন তখন রামানন্দ ভিন্ন আর কেহ তাঁহার লেখা ছাপিতে উৎসাহ দেখাইতেন না। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও কঠিন অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল তখন যখন ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী এক বৎসরে চরখায় স্বরাজলাভ ঘোষণা করিতেছিলেন। সে সময় যাঁহারা মনে করিতেন এক বৎসরে স্বরাজলাভ সম্ভব নয়, কিম্বা বিদেশি কাপড় অপবিত্র নয়, কিম্বা চরখাই একমাত্র পন্থা নয়, বিদ্যা ও বুদ্ধিরও স্বরাজ-পথের পাথেয় হইবার অধিকার আছে, তাঁহারা কেহ স্বীয় মত প্রকাশ করিতে সাহস করিতেন না। রামানন্দ স্বমত নির্ভয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন পূর্বেই বলিয়াছি। তাহার ফলে তাঁহার উপর উচ্চশিক্ষিত বহু লোকও চটিয়া আগুন হইলেন। অনেকে তাঁহাকে গালাগালি দিয়া সুদীর্ঘ পত্র তাঁহারই কাগজে ছাপিতে পাঠাইলেন, তিনি যথাসম্ভব ছাপিয়াও ছিলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথও শুনিলেন,

"কথা উঠেছে সমস্ত দেশের বুদ্ধিকে চাপা দিতে হবে, বিদ্যাকেও। কেবল বাধ্যতাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। কার কাছে বাধ্যতা? মন্ত্রের কাছে, অন্ধ বিশ্বাসের কাছে। কেন বাধ্যতা?...অতি সত্বর অতি দুর্লভ ধন অতি সস্তায় পাবার একটা আশ্বাস দেশের সামনে জাগচে।"

রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন 'সত্যের আহ্বান'। রামানন্দ 'প্রবাসী'তে তাহা প্রকাশ করিলেন। 'প্রবাসী'র সাহসে এক দল বিস্মিত ও আর-এক দল ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু রামানন্দ কখনো নিজের বিচারবুদ্ধির উপরে কিছুকে স্থান দিতেন না। একবার কোনো দেশনায়কের বিশেষ একটি অন্যায় আচরণের নিন্দা করিবার জন্য কবি রামানন্দকে অনুরোধ করেন। কিন্তু পরে তাঁহার মনে হয় সেই সময়টা ঐ দেশনায়কের নিন্দা করার

উপযুক্ত সময় নয়। রামানন্দ কবির অনুরোধ সত্ত্বেও আপনা হইতেই নিন্দার কার্যে সে সময় বিরত থাকেন। রবীন্দ্রনাথ তাহা জানিয়া পরে লেখেন, "আপনি আমাকে অনুতাপের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করেছেন।" (২৫-১-৩৮) কাগজে লেখা একবার মুদ্রিত হইয়া গেলে আর তাহা ফিরানো যাইত না।

কবি প্রকাশ্য কাগজে কাহারও নিন্দা করিতে হইলে রামানন্দের পরামর্শ প্রায়ই লইতেন। আর-একবার একজন খ্যাতনামা ভদ্রলোকের বিষয়ে তিনি কাগজে ছাপিবার জন্য একটি চিঠি লিখিয়া রামানন্দকে লেখেন, "আমার বড়ো চিঠিটা প্রকাশযোগ্য কিনা চিন্তা করিয়া দেখিবেন।" চিঠিখানি পড়িয়াই রামানন্দ ছাপিতে আপত্তি করেন। তাহাতে কবি লেখেন,

"সেদিন...সম্বন্ধে চিঠিখানা লেখার পরই মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল।...আপনি ওটা ছাপতে চান না শুনে আমি আরাম বোধ করলুম।" (১১ অক্টোবর ১৯২৮)

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন পারস্য ভ্রমণে যান তখন তাঁহার সঙ্গীরূপে রামানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র কেদারনাথও গিয়াছিলেন। কেদারনাথ ফিরিয়া 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন-রিভিয়ু' পত্রে দীর্ঘ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখেন।

দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই কবির স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়ে। রামানন্দ তখনও সমস্ত ভারতবর্ষে নানা কর্মে পৌরোহিত্য করিতে ঘুরিয়া বেড়ান। কিন্তু তাঁহার মনে কবির বন্দীদশার কথা সর্বদা জাগিয়া থাকিত। শত কার্যের মধ্যেও তিনি সময় করিয়া মাসে দুইবার কী কখনো তিনবার করিয়া শান্তিনিকেতনে কবিকে দেখিতে যাইতেন। যেন বুঝিতেন, এ জীবনের দেখা-শোনা শেষ হইয়া যাইবে শীঘ্রই। কবি বলিতেন, 'রামানন্দবাবু, আপনি কেমন ঘুরে ঘুরে বেড়ান, আমি home interned হয়ে পড়ে আছি।" ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কবির কঠিন পীড়ার কিছুদিন পরে তিনি রামানন্দের জন্মভূমি বাঁকুড়ায় গিয়া বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন। রামানন্দ প্রতি অনুষ্ঠানেই উপস্থিত ছিলেন। বাঁকুড়া যে কবিকে আনন্দ ও সম্মান দিতে পারিয়াছিল ইহা রামানন্দের একটা গৌরবের জিনিস ছিল। তিনি এই জন্যই সেবার বাঁকুড়া গিয়াছিলেন এবং আরও অনেককে যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দ উভয়েই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। কবির আশী বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে রামানন্দ সেখানকার জয়ন্তী-সভায় পৌরোহিত্য করেন ও অভিভাষণ দেন। অপটু শরীরে রবীন্দ্রনাথ সেখানে আসিতে পারেন নাই, মুদ্রিত অভিভাষণটি পড়িয়া লেখেন,

"সেন্ট জেভিয়র্সের রবীন্দ্রজয়ন্তীতে আপনার সুগ্রথিত অভিভাষণটি পড়ে বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। আমার উদ্দেশে আপনাদের এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধার বাণী আমার জীবনে বিধাতার প্রসন্নতাকে সার্থক করে।" (৪-৯-৪০)

এত অল্প কথায় রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ এমন করিয়া আর কেহ প্রকাশ করিয়াছেন কিনা জানি না।

কবিকে আর বেশি দিন ধরিয়া রাখা গেল না। শান্তিনিকেতন হইতে কবিকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আনা হইল। সেই তাঁহার শেষ চিকিৎসা। লোকে ভিড় করিয়া কবিকে দেখিতে যাইত। যখন দেখিতে যাওয়া ডাক্তারের মানা হইল তখন বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু কী আত্মীয়েরা অনেককে ধরাধরি করিয়া কবিকে দেখিয়া আসিতেন। রামানন্দ বাহিরের ঘর হইতে খবর লইয়া চলিয়া আসিতেন, ভিতরে যাওয়া বারণ শুনিয়া তিনি একদিনও নিয়ম

ভাঙিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, তাঁহার হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য ও কল্যাণপ্রার্থনা নীরবেই অন্তরাল হইতে নিবেদন করিয়া আসিতেন। যিনি মাসে কতবার শান্তিনিকেতনে কবিকে দেখিতে যাইতেন, তিনি কলিকাতায় পাশের ঘর হইতে না দেখিয়া ফিরিয়া আসিতেন। ২১ শ্রাবণ কবির জ্ঞান চলিয়া যাইবার পর বাড়ির মেয়েরা ভাবিলেন, আর তো ধরিয়া রাখা গেল না, মহর্ষিদেবের পুত্র রবীন্দ্রনাথকে শেষ ব্রহ্মনাম কে শুনাইবে? ভোর না হইতেই রামানন্দের নিকট লোক গেল। সকালবেলাই সাতটার সময় তিনি কবির বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া উপাসনা করিলেন। তারপর কিছুক্ষণ নীরবে পায়ের কাছে নতদৃষ্টিতে বসিয়া থাকিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। মনকে স্থির করিবার জন্য তখনই কাগজ কলম বই প্রুফ লইয়া কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবাইতে চেষ্টা করিলেন, কাহারও সহিত প্রায় কোনো কথা বলিলেন না। বেলা বারোটার পর কবির শেষনিঃশ্বাস শূন্যে মিলাইয়া গেল।

ভাদ্রের 'প্রবাসী'তে 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র প্রথম পাতায় বাহির হইল : "বন্ধু বিয়োগ ও বৈধব্য"।

"মহাকবি টেনিসন তাঁব "স্মরণে" (In Memoriam) কাব্যে বন্ধুবিয়োগ ও বৈধব্যকে সমপর্যাযভুক্ত কবেছেন

Sleep, gentle winds, as he sleeps now
My friend, the Brother of my love :
My Arthur, whom I shall not see
Till all my widow'd race be run!
Dear as the mother to the son,
More than my brothers are to me."

নিজের হৃদয়-আবেগ অপরের নিকট খুলিয়া দেখাইবার মানুষ রামানন্দ ছিলেন না। তবু নিজের হাতে নিজের ভাষায় যে দুই-তিনটি লাইনে তিনি নিজের কথা লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার অন্তরের গভীর বেদনাকে সুস্পষ্ট চোখের সম্মুখে আনিয়া দেয় :—

"আকাঙক্ষা ছিল, কবির আগে আমার মৃত্যু হবে। রবীন্দ্র-বিহীন জগতের কল্পনা কখনো করি নাই। ভাবি নাই রবীন্দ্র-বিহীন জগৎ দেখতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথের এই বিয়োগ-বেদনা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ভুলেন নাই।

একজন অধ্যাপক-গ্রন্থকার সেই সময় বলিয়াছিলেন, "রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর অনেকে লিখলেন, কিন্তু ওই দুটি লাইনের মতো কেউ কি লিখতে পেরেছেন?" রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের চতুর্থ দিনে রামানন্দ নিজ কন্যার গৃহে যে উপাসনা করেন তেমন প্রাণস্পর্শী অনবদ্য উপাসনা কম শোনা যায়। সৃষ্টিধারার জন্মমৃত্যুকে স্মরণ করিয়া তিনি মৃত্যুকে মানিয়া লইয়াও বলিয়াছিলেন "যে মহামানবকে গড়িয়া তুলিতে বিধাতার এত যুগ লাগিয়াছিল, তাঁহাকে শুধু এই আশীটি বৎসরের জন্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।"

৩২ শ্রাবণ শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে রামানন্দ যান। সেখানে সেই দিনই তাঁহার নেতৃত্বে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন-গোষ্ঠী নিজেদের কর্তব্য আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় উত্তরায়ণে তিনি উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত জীবনময় রায় লিখিয়াছিলেন "কবির সহিত তাঁহার নিবিড় বন্ধুতা ও অধ্যাত্মযোগের দ্বারা প্রভাবিত শোকগম্ভীর উপাসনার প্রত্যেকটি বাক্য উপস্থিত সকলের অন্তরকে গভীর ভাবে স্পর্শ করিল।"

ইহার পর যতদিন রামানন্দ শয্যাশায়ী না হন ততদিন রবীন্দ্র-স্মৃতি-সভায় যেখানে যতবার তাঁহার ডাক আসিয়াছে এতটুকু সময় পাইলেও তাহাতে তিনি পৌরোহিত্য করিতে

গিয়াছেন। বিশ্বভারতীর স্বার্থ-রক্ষার জন্য যত রকমে চেষ্টা সম্ভব করিয়াছেন এবং প্রয়োজন বোধে সংগ্রাম করিয়াছেন, নিন্দা কুৎসা কিছুতেই টলেন নাই। তিনি মৃত্যুশয্যায় শুইয়াও বলিয়াছিলেন, "আমার motto Rabindranath for ever" মৃত বন্ধুদের প্রতি কর্তব্যবোধ তাঁহার জীবিতদের অপেক্ষা বেশি ছিল অনেক সময় মনে হয়। এই সূত্রে মনে পড়ে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে *Young India*তে ভগিনী নিবেদিতাকে "volatile person" বলাতে রামানন্দ তাহার প্রতিবাদ করেন।

শেষ জীবন

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দের ইউরোপ যাত্রার পর হইতে তাঁহার সম্বন্ধে ঘরোয়া কথা লিখিবার আর চেষ্টা করি নাই। যদি সম্ভব মনে করি পরে কখনো লিখিব। এখানে দুই-চারিটি কথা মাত্র দিয়া যাইতেছি। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে অশোকের বিবাহ হয়। ইহার কিছুদিন পরে রামানন্দ যখন ইউরোপ যাত্রা করেন তখন অশোক 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু'-এর সম্পাদকীয় দায়িত্ব সাময়িক ভাবে গ্রহণ করেন। কাগজ দুটিতে অশোকেরই নাম থাকিত।

১৯২৬ সালে ৩০ নবেম্বর ইউরোপ হইতে অসুস্থ শরীরে তিনি কলিকাতায় ফেরেন। এখানে আসিয়া রেঙ্গুনে তাঁহার একমাত্র দৌহিত্রের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া কন্যাকে দেখিবার জন্য অসুস্থ শরীরেই রেঙ্গুন যাত্রা করেন।

রামানন্দের এয়োদশটি পৌত্রী ও দৌহিত্রী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দ্বিতীয়া পৌত্রীর নাম রাখেন "ইষিতা"—যাহাকে ইচ্ছা করিয়া ডাকা হইয়াছে। অন্যগুলির আগমনের পর তাঁহার বন্ধুমহলে লোকে পরিহাস করিয়া বলিত, "রামানন্দবাবু মেয়েদের জন্যে আজীবন লড়লেন, তাই দল বেঁধে মেয়েরা তাঁর বাড়ি এসে উঠেছে।"

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে মনোরমা দেবী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। তাঁহাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য অজস্র ব্যয় করিয়াও রামানন্দ কিছু করিতে পারিলেন না। আষাঢ়ের শেষে পতিপুত্রকন্যাদের রাখিয়া তিনি সজ্ঞানে চলিয়া গেলেন। রামানন্দ আর সকলের মতো নগ্নপদে শ্মশানে অনুগমন করিলেন।

পত্নীর জন্য শোক করা ছাড়া আর কোনো পার্থিব কর্তব্য তাঁহার বাকি রহিল না। শোকের ও শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে কোনো কর্তব্য তিনি বাকি রাখেন নাই। লেখনীযুদ্ধে তিনি বহু শত্রু লাভ করিলেও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত লোকের অভাব ছিল না, বলাই বাহুল্য। কত মানুষ যে তাঁহার শোকে সমবেদনা জানাইবার জন্য আসিয়াছিলেন, কত লোক যে চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহা বলা শক্ত। প্রত্যেকের সহিত তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন , তাঁহাদের চিঠির উত্তর খবরের কাগজে ছাপিয়া দেন নাই, কিংবা ছাপা চিঠি বাড়ি বাড়ি পাঠান নাই। সমস্ত চিঠির উত্তর স্বয়ং পুত্র-কন্যাদের দিয়া লেখাইয়া ও সই করাইয়া যথাস্থানে পাঠাইয়াছিলেন।

মনোরমা দেবী লোকচক্ষুর অন্তরালে গৃহকোণেই জীবন কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে যে ক্ষমতা ও যে সদ্‌গুণাবলী ছিল তাহার পরিচয় বেশি লোক পায় নাই। তাই রামানন্দের ইচ্ছা ছিল পত্নীর একটি জীবনী প্রকাশ করিয়া যান। তিনি কন্যাকে দিয়া জীবনী লিখাইয়াও ছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার নিজেরও কিছু যোগ করিবার ইচ্ছা ছিল ; এইজন্য স্বয়ং একটি স্মৃতিকথা লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কাজের চাপে, রোগের যন্ত্রণায় ও অন্য বহুবিধ বাধায় পড়িয়া তিনি সে স্মৃতিকথা শেষ করিতে পারেন নাই। এই স্মৃতিকথা লেখা উপলক্ষে তাঁহার

নিজ জীবনের কথাও লিখিবার ইচ্ছা হয় ; বারবার তিনি তাহা লিখিতে সম্মত হন। কিন্তু একই কারণে তাহাও কোনোদিন কার্যে পরিণত হয় নাই।

তিনি যে কী আশ্চর্য পত্নী-প্রেমিক স্বামী ছিলেন, কী গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সহিত নিজের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পত্নীর উল্লেখ করিতেন, তাহা তিনি নিজেই বুঝিতেন না। আমাদের দেশে পাতিব্রত্যের যে উচ্চ আদর্শ আছে তাহার চেয়েও বড়ো আদর্শ ছিল তাঁর পত্নীপ্রেম সম্বন্ধে। তাহার পরিচয় শোকে দুঃখে ও আনন্দে তিনি জীবনে বহু দিন ধরিয়া দিয়াছেন। তিনি শেষশয্যায় শুইয়া ও অজ্ঞান হইয়া যাইবার একদিন আগেও পত্নীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধের আয়োজন করিয়াছেন। অবশ্য সেবারের মতো তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে এবং তাহার পর আড়াই মাস তিনি কিছু ভাল ছিলেন।

মানুষের জীবনে বহু ত্যাগ থাকে, বহু কৃচ্ছ্রসাধন থাকে, যারা হয় জীবনে নয় জীবনান্তে তাহাকে খ্যাতির পুরস্কার আনিয়া দেয়। কিন্তু তিনি জীবনে পত্নী ও সন্তানদের জন্য এমন অনেক ত্যাগ করিয়াছেন, এমন কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছেন যাহার কথা কেহ কোনোদিন জানিবেও না।

মনোরমা দেবীর শৈশবের একটি প্রিয় গল্প ছিল ঘাটশিলার গল্প।

মনোরমা দেবী শেষবার কলিকাতার বাহিরে যান ঘাটশিলায়। রামানন্দ স্বয়ং তাঁহাকে ঘাটশিলায় পৌঁছাইয়া দিয়া আসেন। সেখানে কন্যার বাড়ি হইবার পূর্বে মনোরমা দেবী তাহার ইষ্টক-ভিত্তির উপর বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন। এইজন্য শেষ জীবনে ঘাটশিলা রামানন্দের অতি প্রিয় স্থান ছিল। তিনি বাহিরে উচ্ছ্বাসহীন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন কিন্তু তাঁহার অন্তরের তন্ত্রীগুলি অতি সূক্ষ্ম আঘাতেই বাজিয়া উঠিত এবং সে ধ্বনি সহজে মিলাইয়া যাইত না। তবে তাঁহাকে যারা না চিনিত এমন মানুষের পক্ষে তাহা শোনা শক্ত ছিল।

মনোরমা দেবীর মৃত্যুর তিন বৎসর পরে আসন্নপ্রায় আষাঢ়ে একদিন ঘাটশিলায় বসিয়া রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' পড়িতে পড়িতে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"কবি বলিতেছেন, "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে,/দৈবে হতেম দশম রত্ন নবরত্নের মালে/আষাঢ় মাসে মেঘের মতন মন্থরতায় ভরা/জীবনটাতে থাকত নাকো কিছুমাত্র ত্বরা।

"কিন্তু এই বৃদ্ধ সম্পাদকের জন্ম কালিদাসের কালে হইলেও তাঁহার দশম রত্ন বা Xতম রত্ন হওয়া তো ঘটিতই না, তাঁহাকে নিতান্তই বেকার হইতে হইত। কবির জীবনটি কী হইত এবং সম্পাদকের জীবনটা বাস্তবিক কি, ভাবিতে গিয়া দেখি, আষাঢ় মাসেও জীবনটাতে ঘড়ির কাঁটা কেবলই ত্বরা দিতেছে। বাণপ্রস্থের ইচ্ছা খুবই হয়। * * * কবি কালিদাসের কালে জন্মিলে—বিরহেতে আষাঢ় মাসে, চেয়ে রৈত বঁধুর আশে/ একটি করে পূজার পুষ্পে দিন গনিত বসে।

দিন গণনা এখনও চলিতেছে। কবে ফুরাইবে?

কালকে রাতে মেঘের গরজনে
রিমিঝিমি বাদল বরিষণে
ভাবতেছিলাম একা একা
স্বপ্ন যদি যায় রে দেখা
আসে যেন তাহার মূর্তি ধ'রে
বাদলা রাতে আধেক ঘুম ঘোরে।"

ক্ষণিকার সূত্রে তিনি নিজ মনের যেটুকু কথা বলিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার বিরহী চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দের জ্যেষ্ঠা কন্যা স্বামী ও কন্যা শান্তিশ্রীর সঙ্গে জাপান যাত্রা করেন। ছোটো দুটি শিশুদের খবর জানানো রামানন্দের একটি নিয়মিত কাজ ছিল। পথেও এমন কোনো বন্দরে কোনো ডাক আসে নাই যাহাতে এয়ার মেলেও রামানন্দের চিঠি যথারীতি আসে নাই। কলিকাতা হইতে তিনি প্রায় বাহিরে যাইতেন। যেদিন ফিরিতেন সেদিন রাত্রি হইয়া গেলেও দৌহিত্রীদের একবার দেখিয়া যাইতেন, কেমন আছে। সারা রাত্রি ট্রেনে জাগিয়া আসিয়া সকালেই কোনো দিন খবর লইতে আসিতেন।

কন্যা যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন সঙ্গে শুধু শান্তিশ্রী ছিল। রামানন্দের একটা আনন্দের গল্প ছিল যে নাতনি ঐটুকু বয়সেই তাহার মায়ের 'অভিভাবিকা' হইয়া আসিয়াছিল।

১৩৪৮ সালে 'প্রবাসী'তে কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়:—

নববর্ষেব প্রণাম।

নববর্ষে পাদপদ্মে রাখিলাম প্রাণেব প্রণাম।
ওগো মহারথী, তুমি আজীবন করিলে সংগ্রাম
সত্য আব স্বাধীনতা এই দুটি আদর্শের লাগি।
জাতির শিয়রে তব নিদ্রাহীন চিত্ত আছে জাগি
মহান্ প্রহরীসম। যা-কিছু কবেছে অপমান
মানব আত্মাবে—তাবে হানিযাছ নির্দয কৃপাণ।
ঐশ্বর্যের পদতলে আদর্শেবে দাও নাই বলি ,
বলের স্পর্ধার কাছে কোনোদিন পাতো নি অঞ্জলি।
যা কিছু কল্যাণ বলে কবিয়াছ অন্তরে বিশ্বাস—
অগ্নিগর্ভ লেখনীব মুখে তাবে করেছ প্রকাশ।
ইস্পাত কঠিন তব সংকল্পেব দুর্জয শক্তিবে
ঈর্ষা কবি। দাও ভবি ভিখাবিব ভিক্ষার ঝুলিরে
আশীর্বাদ দিয়ে। সত্যে মতি যেন থাকে চিরদিন।
যে নিশান হাতে দিলে তাবে যেন না করি মলিন
ভীরুতার কালিমায। যত ক্ষতি আসুক জীবনে—
সত্য থাক্ অবিচল হৃদযেব মন্দিব-প্রাঙ্গণে।।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে ১১ মাঘ বেদীতে বসিতে রামানন্দ কখনো চাহিতেন না। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ঘোষণা হয়, তাহার পর বৎসর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃস্থানীয় আচার্যদের মধ্যে অনেকেই জীবিত নাই, অনেকে রোগজীর্ণ। সেইবার তিনি প্রথম ১১ মাঘের ভার লইতে রাজি হন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দেও উৎসবের এই ভার তিনি গ্রহণ করেন।

তখন তাঁহার রোগের সূত্রপাত হইয়াছে। তিনি বলিতেন, 'এক মুহূর্তও রোগের যন্ত্রণা ভুলিতে পারি না, উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইব কি করিয়া?' ভগ্ন শরীরেই সে কর্তব্য তিনি পালন করেন। তখন কলিকাতা হইতে বোমার ভয়ে বহু লোক বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। তিনি ১১ মাঘের উপাসনার কথা কন্যাকে শান্তিনিকেতনে জানাইবার সময় লেখেন, "মডার্ন রিভিয়ু-এর notes এখনও এক লাইনও লেখা হয় নাই। আগামী পাঁচ দিন খুব খাটতে হবে।"

কয়েক মাস পরেই তিনি পৌত্রীদের লইয়া বাঁকুড়া চলিয়া যান। তাহাদের তখন আর কলিকাতায় রাখা নিরাপদ নয় মনে করিয়া তাঁহাকে তাহাদের লইয়া যাইতে হয়। রোগে ভীষণ যন্ত্রণা পাইতেন, তবু লিখিতেন, "মানুষের সবই সয়ে যায়, আমারও সহনশক্তি বাড়তে পারে।"

বাঁকুড়ায় বহুকাল পরে এবার তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন। নিজের শৈশবের ক্রীড়াক্ষেত্র, কৈশোরের স্বপ্নলোককে নূতন করিয়া ভালোবাসিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল, শেষ জীবনটা সেইখানেই কাটাইয়া যাইবেন।

কিন্তু চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসা হইল। তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী ১৯৪২এর লক্ষ্মীপূজার পর অক্টোবর মাসে তাঁহাকে মোটরে করিয়া কলিকাতায় আনিলেন। তাহার দুই দিন আগে ঝড়ে সমস্ত বাংলা দেশে একটা প্রলয়কাণ্ড হইয়া গিয়াছিল। পথে দুই ধারে কত বিরাট মহীরুহ ভূলুণ্ঠিত, দরিদ্রের পর্ণকুটির বিধ্বস্ত। সমস্ত বাংলাদেশ শোকার্তের মতো মূর্ছিতপ্রায়। মনে পড়ে, পথে মাঝে মাঝে গাড়ি থামিলে রামানন্দ নামিয়া একটু পায়চারি করিতেছেন।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া বাড়ি যাইবার পূর্বেই তিনি 'প্রবাসী' প্রেসে খোঁজ লইতে গেলেন, "আর কপি দরকার আছে কি?" তখনও তিনি নভেম্বরের 'মডার্ন রিভিয়ু'র জন্য লিখিতেছেন।

এই নভেম্বরেই স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁহার লেখনী-অস্ত্র তিনি শেষ ব্যবহার করেন, 'আমেরি'র সহিত দ্বন্দ্ব তখনও চলিতেছে। ইহার পর তিনি নিজের হাতে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু'-এর জন্য আর বোধ হয় কিছু লেখেন নাই। কিন্তু তাঁহার মস্তিষ্ক ও চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় তখনও পত্রিকাগুলির ও দেশের সেবায় নিযুক্ত। 'প্রবাসী'র ও 'মডার্ন রিভিয়ু'-এর মলাটের শেষ পৃষ্ঠাটি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। সম্পাদক কলিকাতায় আসিয়াই সেই পৃষ্ঠা ঝটিকাবর্তে মৃতপ্রায় ও নিরাশ্রয় অসহায় নরনারীর পরিত্রাণের কাজে উৎসর্গ করিলেন। ছবি ও সম্পাদকের নিবেদন বহিয়া তাহা দেশে দেশে ঘরে ঘরে ঘুরিল। তাঁর পত্রিকা যে সহায়তা করিযাছিল সে বিষয়ে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে বন্দী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন:

> "জেলের মধ্যে আপনার সম্বন্ধে আমরা অনেক সময়ই আলোচনা করিতাম। অর্থের লোভ, দলগত মোহ, প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও শাসক সম্প্রদায়ের ভীতিপ্রদর্শন হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখিয়া নিজের জ্ঞান ও বিবেক অনুযায়ী দেশের মঙ্গল লক্ষ্য করিয়া সংবাদপত্র পরিচালনের পবিত্র দায়িত্বপূর্ণ ব্রত পরিপালনে আপনিই এদেশে একমাত্র ও অনন্যসাধারণ। * * মেদিনীপুরবাসীরা আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তাহাদের দুঃখদুর্দশার সময় চিরকাল আপনি তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সাহায্য করিয়াছেন। গত আশ্বিন মাসের কল্পনাতীত ঝড় ও সমুদ্রপ্লাবনে * * আপনি যে সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়া যেভাবে সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা আমরা ভুলিতে পারি না।"

কলিকাতায় আসার পর কত মানুষ তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। তিনি কাহাকেও ফিরাইতেন না। অথচ রাত্রে তাঁহার নিদ্রা ছিল না, দিনেও যন্ত্রণায় বেশির ভাগ সময় অস্থির হইয়া উঠিতেন। তাহারই মধ্যে সকালবেলা একটুখানি প্রাতর্ভ্রমণে যাইতেন। কিন্তু সে আনন্দটুকুও বেশিদিন রহিল না। একদিন স্নানের ঘরে পড়িয়া গিয়া তাঁহার পা ভাঙিয়া গেল। শয্যা হইতে আর তাঁহাকে উঠিতে হইল না। চিকিৎসকেরা বলিলেন, "হয়ত জুড়িয়া যাইতে

পারে।" সেজন্য বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া রাখিবার চেষ্টা হইল, কিন্তু তাহাতে কোনো লাভ হইল না।

মাস ছয় কনিষ্ঠা কন্যার কাছে থাকিয়া তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যার কাছে আসিলেন। এই সময় তাঁহার জয়ন্তীর আয়োজন হয়। প্রথমে কথা ছিল, একটু সুস্থ হইলে বড়ো সভা করিয়া নানা প্রতিষ্ঠানের অভিনন্দনাদি একই দিনে দেওয়া হইবে। কিন্তু যখন দেখা গেল যে তাঁহার শারীরিক উন্নতির কোনো আশা নাই, তখন বাড়িতেই ভিন্ন ভিন্ন দিনে ভিন্ন ভিন্ন দল অভিনন্দন দিতে লাগিলেন। এ-বিষয়ে সংবাদপত্রে যেরূপ রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল তাহা হইতেই কিছু উদ্ধৃত করা গেল। রামানন্দের প্রত্যুত্তরগুলি কয়েকটি সম্পূর্ণ অনুলিখিত হইয়াছিল কিন্তু সেগুলি হারাইয়া গিযাছে, কয়েকটির সংক্ষিপ্তসার দেওয়া গেল।

রামানন্দ-জয়ন্তী

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ৭৮ বৎসর বয়ঃপূর্তি উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ২ জ্যৈষ্ঠ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ৫ জ্যৈষ্ঠ ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘ, ১৬ জ্যৈষ্ঠ বিশ্বভারতী এবং ২৩ জ্যৈষ্ঠ শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ কর্তৃক শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় সংবর্ধিত হন।

রবিবার ২ জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে ডক্টর কালিদাস নাগের ভবনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নেতৃত্বে পরিষদের সদস্যগণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পুষ্প ও মাল্যভূষিত করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সভাপতি মহাশয় পরিষদের পক্ষে একখানি মানপত্র পাঠ করিয়া একটি সুদৃশ্য চন্দনকাষ্ঠের বাক্সে তাহা প্রদান করেন। মানপত্রখানি এইরূপ—

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

হে প্রবীণ কর্মী, নির্ভীক যাত্রীরূপে সুদীর্ঘ জীবনেব পথ চলিতে চলিতে আপনি কেবলমাত্র দেশেব এবং দশের কল্যাণের কাজই কবিযাছেন, বিশ্বেব মানুষকে সত্য, শিব ও সুন্দরের সন্ধান দিয়া তাহাদের কল্যাণ-সাধনের মন্ত্রই প্রচার করিযাছেন। আপনার বাণী শুধু আপনার জন্মভূমি বঙ্গদেশেই আবদ্ধ থাকে নাই, ভারতের সকল প্রদেশের অধিবাসীই আপনার সেই বাণী শুনিয়াছে। আপন সকলের হিতের জন্য সমভাবে সাধনা করিয়াছেন। ভারতের বাহিরে বিশ্বজগতে আপনার লেখনী মানবতা, স্বাধীনতা, উদার বিশ্বধর্ম এবং প্রকৃত কলাজ্ঞানের বার্তা বহন কবিয়াছে। সেই বাণী সমগ্র পৃথিবীর গুণিজন সাদরে স্বীকাব করিয়াছেন।

আপনি চিরজীবন অসত্য, অবিচাব ও অশুচির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। এই সংগ্রামে অনেক সময়ে আপনাকে একক দাঁড়াইতে হইয়াছে ; অনেক ক্ষতি, অনেক অসম্মান আপনাকে সহ্য করিতে হইয়াছে ; তথাপি আপনি ক্ষণকালের জন্য কর্তব্য হইতে বিচলিত হন নাই।

আজ আপনি কর্মজীবনের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, আমরা আপনাকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনার ক্লান্তিহীন জীবনের বহুবিধ কাজের মধ্যে বঙ্গ ভাষায় সাময়িক-সাহিত্যে আপনার অতুলনীয় দান স্মরণ করিতেছি। অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল ধরিয়া 'দাসী', 'প্রদীপ' ও 'প্রবাসী'র সাহায্যে সাহিত্যে সেই সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজা আপনার স্মরণীয় কীর্তি ; আজ বঙ্গদেশের শত শত সাংবাদিক লেখকের আপনি

কুলপতি—প্রত্যক্ষে ও পবোক্ষে তাঁহারা আপনার শিষ্য, আপনার আদর্শে অনুপ্রাণিত! বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষৎ আপনার নিকট বহুভাবে ঋণী—আপনার ঐকান্তিক সেবা ইহাব বর্তমান প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ।

সাহিত্য-সেবার বাহিবেও স্বদেশবাসীব স্বার্থ ও সম্মান রক্ষা এবং জাতীয় উন্নতির জন্য আপনি আজন্ম চেষ্টা কবিয়াছেন, রাজবোষ উপেক্ষা কবিয়া বাবংবার ভারতের স্বাধীনতাব দাবি জানাইয়াছেন। আপনার জীবন চিরদিন আগত ও অনাগত দেশপ্রেমিকের আদর্শস্থল হইয়া থাকিবে। আপনি ফলের আকাঙক্ষা না করিয়া কর্মসাধনা কবিয়াছেন। আমবা আপনাকে প্রণাম জানাইতেছি। আপনার জীবন দূর ভবিষ্যতেও তরুণসমাজকে উদ্‌বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করুক, সকলকে কর্তব্যনিষ্ঠ করিয়া তুলুক।

আপনার গুণমুগ্ধ ঋষি রবীন্দ্রনাথ আপনাকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কোনো পার্থিব সম্মান অথবা সম্পদ্ ইহা অপেক্ষা আপনার কাম্য ছিল না। আপনাদের দুই জনেব বন্ধুত্বের কথা স্মবণ করিয়াই আমরা ধন্য। আজ আমরা অন্তবের ভক্তি-অর্ঘ্য লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি এবং প্রার্থনা করিতেছি যে. আরও দীর্ঘকাল আমাদের পথপ্রদর্শকরূপে আপনি বর্তমান থাকুন এবং চিত্তেব শান্তি লাভ করুন।

বিনযাবনত ইতি
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষৎ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে
কলিকাতা, ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০ শ্রীযদুনাথ সরকার
সভাপতি

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও মৌখিক যে অপূর্ব প্রত্যুত্তর দেন, তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল :—

'আমি যদি আজ সুস্থ থাকতাম, তা'হলে আপনারা আমাব সম্বন্ধে যে প্রশংসা-বাক্য প্রয়োগ করেছেন তাতে অভিভূত হতাম। এখন আমি অসুস্থ, আপনাদের প্রশস্তিব উত্তর দিই এমন সাধ্য নেই। আমি কাল চিন্তা করছিলাম, আপনারা আমার সম্বন্ধে কী বলবেন। আমি স্থির করেছিলাম, আপনারা আমার সম্বন্ধে এই কথা স্মরণ করবেন যে, সাহিত্যক্ষেত্রে আমি একজন শিবিব-অনুচর (camp follower), রণক্ষেত্রে শিবির-অনুচবেরও যে স্থান আছে আমাকে সম্মান করবার দ্বাবা শিবিব-অনুচবের সেই প্রযোজনকে স্বীকার কবলেন। আপনারা আমার সম্বন্ধে অনেক সম্মানবাক্য প্রয়োগ করছেন, এ আপনাদের আদর্শানুযায়ী একটি চিত্র, আমি তো এসব বিশেষণের উপযুক্ত নই। আমার দ্বারা হযত এইটুকু মাত্র কাজ হয়েছে যে, বাংলা ভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা নানা বিষয়ে যে লেখা যেতে পারে আমার পত্রিকাব মধ্যে দিয়ে সে কথা প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা দেশের গর্বের যে-কয়টি প্রতিষ্ঠান আছে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তার অন্যতম। আজ আমার মনে পড়ছে আমার সতীর্থ ও পরিষদের আযৌবন সেবক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের কথা ; তিনি আজ উপস্থিত থাকলে বড়ো সুখী হতেম, আমার কত আনন্দ হত।

বাংলা দেশের একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানকার যাঁরা জ্ঞানী, গুণী, ইংরেজি লিখলে আরও বিখ্যাত হতে পারতেন, তাঁরা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করেন নি। এই প্রসঙ্গে আমার পূজনীয় গুরুদেব আচার্য জগদীশচন্দ্রের কথা মনে পড়ে। তিনি যখন আমার সম্পাদিত 'দাসী' পত্রে "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" লিখেন, তখন তার ভাষা দেখে আমিও চমৎকৃত হয়েছিলাম। আমার বন্ধু ইতিহাসাচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয়ও—আমি ধন্য হয়েছি যে তিনি আজ আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করেছেন—তাঁর রচনা দ্বারা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন, এখনও করতে থাকবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বারা যাঁরা আজও শিবির-অনুচর বলেও স্বীকৃত না হয়েছেন,

তাঁবা নিজেরাই অজ্ঞাত বলে প্রতিপন্ন হবেন। আমি যে পরিষৎ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছি, এতে আমি ধন্য। আজ এখানে যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন তাঁবা অনেকেই আমাব পুত্র-পৌত্রেব বযসী, কিন্তু তবু তাঁবা বাংলা সাহিত্যের সেবক, যদি তাঁবা বযোজ্যেষ্ঠ হতেন, তবে আজ আমি তাঁদের পদধূলি গ্রহণ করতাম—কারণ যাঁরা আমার মাতৃভাষার সেবা ব বেন, তাঁবা সকলেই আমাব নমস্য।'

মহারাজা শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার সরকার প্রভৃতি এই সংবর্ধনায় যোগদান করেন।

ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী-সঙ্ঘ ৫ জ্যৈষ্ঠ প্রাতে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়কে সংবর্ধিত করেন। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু মানপত্র পাঠ করেন এবং একটি সুদৃশ্য রৌপ্যাধারে তাহা প্রদান করেন। মানপত্রখানি এই :

শ্রীবামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

হে সাংবাদিক শিবোমণি,

ভাবতীয সংবাদপত্রসেবী-সঙ্ঘেব পক্ষ হইতে আমবা আপনাকে আজ শ্রদ্ধার অর্ঘ্য অর্পণ কবিয়া নিজেদেব কৃতার্থ ও সম্মানিত জ্ঞান করিতেছি। আপনি এই সঙ্ঘেব অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ভূতপূর্ব সভাপতি, ইহাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ কবিতেছি।

প্রায অর্ধ শতাব্দী কাল আপনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রের মধ্য দিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা কবিয়া আসিতেছেন। অসত্য, অন্যায, অত্যাচাব ও অবিচাবেব বিরুদ্ধে আপনি চিরদিন নির্ভীকভাবে সংগ্রাম কবিয়াছেন, বাজবোষেব ভ্রূকুটি আপনাকে বিচলিত কবিতে পাবে নাই, ধন, মান বা পদমর্যাদার প্রলোভনেও আপনি কোনোদিন কর্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। নিপুণ তথ্য বিশ্লেষণ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, নিরপেক্ষ বিচার, সংশযহীন সিদ্ধান্ত আপনাব বিশেষত্ব। বস্তুত এই সব দিক দিযা সাংবাদিকতাব যে আদর্শ আপনি প্রতিষ্ঠা কবিযাছেন, তাহা ভারতের সমস্ত প্রদেশেব সাংবাদিকদিগকেই ধ্রুবতাবাব মতো পথপ্রদর্শন করিযা আসিযাছে। আমবা—যাহারা সংবাদপত্র-সেবাকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিযাছি, আপনাব আদর্শ দ্বাবা যে কতদূব অনুপ্রাণিত হইয়াছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ কবা যায না। আপনি এদেশের সাংবাদিকগণেব গৌববস্বরূপ।

আপনার সমস্ত কর্মের মূল উৎস যে গভীর স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতিপ্রীতি, তাহা আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি কবি। এই কারণেই আপনাব চিন্তাধারা কেবল বাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ থাকে নাই। সর্বপ্রকার সামাজিক বৈষম্য ও অসত্যেব উপবেও আপনি তীব্র কশাঘাত কবিয়াছেন। দেশেব আর্থিক প্রগতি—শিল্প-বাণিজ্যেব উন্নতি যে জাতিব আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য এ সত্য আপনি কোনোদিনই বিস্মৃত হন নাই এবং আপনাব সুচিন্তিত তথ্যবহুল রচনা দ্বারা সে বিষয়ে যথাশক্তি সহায়তা কবিয়াছেন।

আপনি অখণ্ড ভারতেব আদর্শে বিশ্বাসী এবং বাঙলাদেশ ও বাঙলি জাতিব প্রতি চিরদিনই আপনার একান্ত স্নেহ ও গভীর মমত্ববোধ বিদ্যমান। সেই কাবণেই অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া একদিকে যেমন বাঙালি জাতির ত্রুটিবিচ্যুতি বিশ্লেষণ করিতে আপনি পশ্চাৎপদ হন নাই, অন্যদিকে তেমনি তাহাদের মহত্তর গুণাবলীব উদ্বোধন কবিয়া সত্য ও কল্যাণের পথও প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

নবযুগের বাঙলা সাহিত্যও আপনার নিকট অশেষরূপে ঋণী। সামযিক পত্রের সম্পাদকরূপে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য প্রকাশ করিয়া এবং নবীন লেখকদিগকে সৎ-সাহিত্যে রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া আপনি আপনার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। বাঙলা ভাষার মধ্য দিয়াও যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য-সম্ভার প্রকাশ করা যাইতে পারে, আপনি

তাহা হাতে-কলমে প্রমাণ কবিয়াছেন। বিশেষভাবে, এ যুগের সাহিত্যগুরু রবীন্দ্রনাথেব বন্ধু ও অনুরক্ত ভক্ত হিসাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রচারের জন্য আপনি যাহা করিয়াছেন, বাঙালিজাতি কখনই তাহা ভুলিতে পাবিবে না।

আপনি গৌরবময় কর্মজীবনের শেষপ্রান্তে আসিয়া বিশ্রামলাভেব অধিকাবী হইযাছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আপনার উপর আমাদের স্নেহের দাবি ত্যাগ কবিতে পাবিব না। আপনার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, পবামর্শ ও উৎসাহ হইতে আমবা কোনোদিনই বঞ্চিত হইব না—এই আশা অবশ্যই আমরা কবিতে পাবি। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনি শতাযু হউন, আপনাব দৈহিক স্বাস্থ্য ও মানসিক বল অটুট থাকুক এবং আপনি দীর্ঘকাল ধবিয়া নিষ্কাম কর্মযোগীর ন্যায স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা কবিবাব সৌভাগ্য লাভ করুন। বন্দে মাতরম্।

বিনীত—

কলিকাতা শ্রীপ্রফুল্লকুমাব সরকার

২৩ মে, ১৯৪৩ সভাপতি, ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী-সঙ্ঘ

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁহার প্রত্যুত্তবে সমবেত সকলকে ধন্যবাদ দিয়া এই মর্মে কয়েকটি কথা বলেন :

'দৈনিক ও সাময়িক পত্রসম্পাদন আজকাল যে কত কঠিন হয়েছে তা আমি জানি। এত অসুবিধা এবং বাধা-বিঘ্নেব মধ্যে কাজ করেও আমি যে আপনাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছি, এতে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করি। আমাব আজীবন বন্ধু প্রাণাচার্য ডা. স্যর নীলরতন সরকাবের মৃত্যুতে আমি অভিভূত হয়েছি, আমার পক্ষে আজ বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।

সাংবাদিকদের সকলের কাছেই আমি অসীম ঋণী কিন্তু দৈনিক পত্রগুলির নিকট আমার ঋণ আরও বেশি। যে সব সংবাদের উপব আমাকে মন্তব্য লিখতে হয সেগুলো আমি বিনা-পয়সায দৈনিক পত্র থেকে পাই। * * শুধু বড়ো সংবাদপত্র ও মাসিকপত্র থেকেই যে আমি শিক্ষালাভ করেছি তা নয়—ছোটোখাটো মাসিক ও দৈনিক পত্র থেকেও আমি যথেষ্ট শিক্ষালাভ কবেছি। 'প্রবাসী' যখন আয়তনে বড়ো ছিল তখন তাতে মফঃস্বলের ছোটোখাটো কাগজের খবরাখবব প্রকাশ করবাব জন্য একটা আলাদা বিভাগ ছিল।

সমাজ ও জাতিব উন্নতিকল্পে সাংবাদিকদেব দায়িত্ব কম নয়। এদিক দিয়ে তাঁদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। একজন বিখ্যাত আমেরিকান বক্তা , তাঁর নাম মনে পড়ছে না, বলেছিলেন যে, যদি তাঁর গাথা রচনার শক্তি থাকত তা হলে দেশের আইন কে তৈবি করে তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে চাইতেন না। কারণ একটা জাতির মন একসূত্রে গেঁথে তুলতে আইনের চেয়ে গাথার শক্তি অনেক বেশি। আমাদের দেশে তুলসীদাসেব রামায়ণেও আমরা এর পরিচয় পাই। আমাদের দেশের সাংবাদিকেরা এই কথাটি মনে রাখলে দেশের কাজ আরও ভালো ভাবে করতে পারবেন।

সাংবাদিকদের অবশ্য দোষও আছে। তাঁরা মাঝে মাঝে বেশি কটূক্তি বর্ষণ করেন। এটি কিন্তু একমাত্র আমাদেবই দোষ নয়। ইউবোপেও এটা খুব বেশি দেখা যায়। বহু বৈদেশিক সাংবাদিকের ধারণা, কটূক্তি-বর্ষণই তাঁদের সবচেয়ে বড়ো গুণ।

আপনাদের কাছে আমার এখনও অনেক শিখবার আছে। অবশ্য যদি এ যাত্রা বেঁচে উঠি।'

এই অনুষ্ঠানে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

রামানন্দের জন্মদিনে ১৬ জ্যৈষ্ঠ বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রমোহন বসু প্রভৃতি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া মাল্যচন্দন ও পট্টবস্ত্র উপহার দিয়া মানপত্র পাঠ করেন।

বিশ্বভারতীর মানপত্র

আমাদেব পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং বিশ্বভাবতীর প্রধান হিতৈষী শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর সুপরিণত জীবনের জয়ন্তী-উৎসবের শুভ মুহূর্তে আমি বিশ্বভাবতীর পক্ষ থেকে আমাদের সকলের হয়ে ও সকল অন্তবেব সহিত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন কবছি।

আবো বহু বৎসর আমাদের মধ্যে বর্তমান থেকে এই মহাকর্মী যেন আমাদেব জ্ঞান, কর্ম ও সাধনায় প্রেবণা দেন, যেন গুরুদেবেব মহান আদর্শকে পবিণতিব পথে এগিয়ে দেবার জন্য, কী নবীন, কী প্রবীণ আমাদেব সকলের প্রাণে উৎসাহ সঞ্চার কবেন—এই প্রার্থনা কবি।

দেশ ও দশের সেবায়, সাহিত্য ও শিল্পের উন্নতি প্রচেষ্টায় সকল দিক থেকে এমন একনিষ্ঠ মানুষ দুর্লভ। সৎ সাহসী এবং নির্ভীক এই পুরুষকে দর্শনেই পুণ্য আর বন্ধুভাবে লাভ করলে তো কথাই নেই। তাঁকে আমবা আমাদের পবম সুহৃদ্ ভাবে পেয়েছি—এ আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য।

তাঁর এই বর্ষপূর্তিতে তাঁকে অভিনন্দিত কবে আমরা নিজেকেই ধন্য মনে করছি, কিমধিকমিতি—

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ইহার উত্তরে রামানন্দ নিজেকে বিশ্বভারতীর "দীনাতিদীন অযোগ্য সেবক" বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে রথীন্দ্রনাথকে অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

৩০ জ্যৈষ্ঠ বাঁকুড়া-সম্মিলনী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সংবর্ধিত করেন। তাঁহারা পট্টবস্ত্রে মুদ্রিত কবিয়া মানপত্র দেন। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

বাঁকুড়া-সম্মিলনীর সভাপতি

পবমারাধ্য শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের নবসপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহার শ্রীচরণকমলে বাঁকুড়া-সম্মিলনীর সেবকবৃন্দের অর্ঘ্য প্রদান এবং শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা—

নিঃস্বার্থ ধর্মপ্রাণ দেশসেবক, আজ আপনাব এই নবসপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে আমরা বাঁকুড়া-সম্মিলনীর সেবকবৃন্দ আপনার পবিত্র ভাবের বৈশিষ্ট্যদ্যোতক মাল্য-চন্দন-অর্ঘ্য-প্রদানে--আপনাব বিনয়পূর্ণ অথচ নির্ভীক সাত্ত্বিক ভাবের প্রেরণালাভের জন্য এবং পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনার জন্য উপনীত হইয়াছি।...

নীরব দেশসেবক, আপনি জগতে বিশিষ্ট অধ্যাপক, সাংবাদিক, সমালোচক, মনীষী, সাহিত্যিক এবং স্বধর্ম-যাজক বলিয়া খ্যাত হইলেও আমাদের এই সেবাসমিতির কার্য আপনার ধৈর্য, স্থৈর্য, গাম্ভীর্য, বিনয়পূর্ণ উপদেশ এবং আবশ্যকমতো মাধুর্যপূর্ণ শাসন-বাক্য এবং প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে প্রকটভাবে নেতৃত্ব দ্বারা এমন কী এই রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও এখন পর্যন্ত সেবাকার্যের কর্তব্য-নির্দেশ ও ঔৎসুক্যের সহিত সেবাকার্যের সংবাদ গ্রহণ করিয়া আপনি গুপ্তভাবে যে আন্তরিক সেবাকার্য করিতেছেন—জনসাধারণ বা

সংবাদদাতাগণ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রচাবকার্য অনুপাতে সম্মিলনীর সেবাকার্য প্রচাব না করিয়া থাকিলেও—যথার্থ ও প্রকৃত সেবাকার্যের অনুসন্ধিৎসু কর্মিগণের নিকট আপনার সেই নিষ্কাম ও গুপ্ত সেবাকর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অবিদিত নাই।...

জনসাধারণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন

রামানন্দ-জয়ন্তী কমিটি স্থির করেন যে রামানন্দ আর-একটু সুস্থ হইলে একটি বিরাট সভায় তাঁহাদের অনুষ্ঠানটি সমারোহের সহিত করিবেন। কিন্তু রামানন্দের শরীর ক্রমেই আরও ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল, তাছাড়া স্যর নীলরতন সরকার মহাশয়ের মৃত্যুর জন্য দিনও পিছাইয়া গেল। অবশেষে স্থির হইল, এই অনুষ্ঠানও প্রাতে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে হইবে এবং সন্ধ্যায় অন্যত্র জনসাধারণের একটি সভা হইবে। সেই কথামতো বাংলা ২৫ আষাঢ় বসন্ত রায় রোডে তাঁহার জামাতা শ্রীকালিদাস নাগের ভবনে জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মানপত্র দেওয়া হয়। মানপত্র তিনটি রৌপ্যাধারে বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি তিন ভাষায় খোদিত ও কারুকার্য-সমন্বিত সোনালি বর্ডারে খচিত। ডা. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলা ও এসেমব্লির স্পিকার সৈয়দ নৌশের আলি ইংরেজি মানপত্র পাঠ করেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অসুস্থ ছিলেন। সংবর্ধনা-সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার রোগশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন।

সায়াহ্নে রামানন্দ-জয়ন্তী কমিটির উদ্যোগে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে কলিকাতার নাগরিকগণের এক সভা হয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের স্পিকার সৈয়দ নৌশের আলি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অর্ধ শতাব্দী যাবৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্ভীক সংবাদপত্র-সেবা, উচ্চ আদর্শ ও মহান দেশপ্রেমের উল্লেখ করিয়া বিভিন্ন বক্তা সভায় বক্তৃতা করেন।

প্রাতে উৎসবে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আরোগ্য ও আয়ুবৃদ্ধি কামনা করিয়া তাঁহার হাতে দূর্বাসূত্র বাঁধিয়া দেন ও তাঁহাকে চন্দন-চর্চিত ও মাল্যভূষিত করেন। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন বৈদিক স্তোত্র আবৃত্তি করেন।

মানপত্রে বলা হয় :

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধায় শ্রদ্ধাস্পদেষু

মহাত্মন্,

আপনাব উনঅশীতিতম জন্মবাসরে আপনার স্বদেশবাসী আমরা আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি। আপনার পূত চরিত্র, অকৃত্রিম স্বদেশভক্তি ও জীবনব্যাপী স্বদেশসেবা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। আপনি আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

অর্ধ শতাব্দী পূর্বে অনায়াসলভ্য সুখসম্পদ ও প্রতিষ্ঠা উপেক্ষা করিয়া আপনি শিক্ষকের কৃচ্ছ্রসাধ্য পুণ্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনার দীপ্ত স্বদেশপ্রেম ও আপনার জীবনের সংস্পর্শ বহু ছাত্রকে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহাদিগকে স্বদেশসেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। আপনি ধন্য।

আপনার সেবাব্রত বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়া আপনাকে মাসিক-পত্র সম্পাদনে ব্রতী করিয়াছে। এই তপস্যায় আপনার সিদ্ধি বিস্ময়কর। আপনার প্রবাসী, মডার্ন রিভিয়ু ও বিশাল ভারত প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া এ-দেশকে এক অপূর্ব শক্তি, শুচিতা ও সৌন্দর্যের

আদর্শ দান করিযা আসিতেছে। মাসিক-পত্র সম্পাদন ও প্রকাশে আপনি এ-দেশে নবযুগের প্রবর্তন কবিয়াছেন।

আমাদেব স্বদেশি চিত্রকলা বহুদিন দেশবাসীর অবজ্ঞা বহন করিয়া আসিতেছিল। আপনি সকল বিরুদ্ধতা উপেক্ষা করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য দেশবাসীর চক্ষে প্রস্ফুটিত করিযা তাহার সাধনা ও প্রচারে বিপুল সহায়তা করিযাছেন। আমরা আজ তাহা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছি।

নানা দেশে বিক্ষিপ্ত বঙ্গসন্তানকে এক প্রেমে ও আদর্শে সংহত করাব কাজে আপনার দান অতুলনীয়। স্বীয় প্রদেশেব প্রতি প্রেম আপনার সমস্ত ভারতের প্রতি প্রেম ও সেবাকে আরও মহনীয করিয়া তুলিয়াছে। আপনার মঙ্গল হউক।

আমাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য আপনাব তপস্যায় দেশমাতা গৌববান্বিত। আপনার নির্ভীক ও তথ্যানুগ লেখনী আপনার দেশবাসীকে নবশক্তি দান করিযাছে। আপনাব জয় হউক।

ভারতের সংস্কৃতিকে বিশ্বসংস্কৃতিব সহিত সংগত করিয়া পূর্ণ পরিণতি দান করিতে এবং জগতের কাছে এই সংস্কৃতির প্রকৃত মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে আপনি আজীবন সাধনা কবিয়াছেন। জন্ম. দারিদ্র্য ও নিরক্ষবতায় মানবতাব লাঞ্ছনা আপনি কখনো সহ্য কবেন নাই। পবাধীনতার বেদনা আপনি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছেন এবং ভাবতের স্বাধীনতার যজ্ঞে আপনার সমস্ত শক্তি আহুতি অর্পণ কবিযাছেন। আপনার সাধনা সিদ্ধ হউক।

আপনার কাম্য ভারতের স্বাধীনতা প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য আপনি লাভ করুন। ভগবান আপনাকে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রদান করুন। ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আপনাকে নমস্কার কবি। ইতি,

আপনার গুণমুগ্ধ রামানন্দ-জয়ন্তী কমিটির পক্ষে—

বামানন্দ-জয়ন্তী কমিটি — শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ — সভাপতি
রবীন্দ্রাব্দ ৮৩ — শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিযোগী, সম্পাদক

এই মানপত্র তিনটির নক্শা শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর পরিকল্পিত।

মানপত্রের উত্তরে শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন :

দেশবাসীর প্রতিনিধিস্বরূপ আপনারা আমাব প্রতি যে প্রীতি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহার জন্য আমার গভীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমার মতো অযোগ্য ব্যক্তিকে উপলক্ষ করিয়া আপনারা উচ্চ আদর্শেব কথা বলিয়াছেন, কাজে তাহার কতটুকু করিতে পারিয়াছি, তাহার বিচার করিবেন ভগবান আর আপনারা। এদেশে সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের আদর্শ প্রবর্তন করিয়াছেন রাজা রামমোহন রায় অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতি, আধ্যাত্মিকতা, ধর্মতত্ত্ব, সমাজ সংস্কাব, অর্থনীতি—সকল সমস্যা সমাধানের জন্য যাহা কিছু করা দরকার সব দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি আগাইয়া চলিয়াছিলেন। বস্তুত সারা পৃথিবীর কল্যাণ যদি না হয়, তবে দেশবিদেশের কল্যাণ হইতে পারে না। এই জন্য দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনিয় উপনিবেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন তিনি টাউন হলে ভোজ দিয়াছিলেন। আবার নেপলস যখন স্বাধীনতা হারায়, তখন তিনি এত বেদনা অনুভব করেন যে, একটা বড়ো নিমন্ত্রণে যোগদান করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—এদেশ বা অন্য কোনো দেশে অত্যাচারীরা কখনো কৃতকার্য হইতে পারিবে না। তিনি ইংলন্ডেরও মঙ্গল চাহিতেন। ইংলন্ডে যখন একটা রিফর্ম বিল উত্থাপিত হয়, তখন রাজা রামমোহন রায় প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন—ঐ বিল যদি আইনে পরিণত না হয়, তাহা হইলে তিনি ইংলন্ডের সঙ্গে সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিবেন। সেই সময় কথা উঠিয়াছিল—তিনি আমেরিকায় চলিয়া যাইবেন ও স্বাধীন দেশের নাগরিক

হইবেন। বাংলার বাহিরে রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শ প্রচার করেন মহামতি গোবিন্দ রানাডে, এদেশে প্রচার করেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি রামমোহনের তিনটি আদর্শ গ্রহণ করেন (১) বেদান্তের শিক্ষা, (২) দেশপ্রেম, (৩) হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য। স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহাপুরুষও রামমোহন রায়ের আদর্শের মধ্যে তিনটির বেশি ধরিতে পারেন নাই।

২৩ জ্যৈষ্ঠ শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত জস্টিস সুধীরঞ্জন দাস, শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহাকে সংবর্ধিত করেন।

তাঁহারা বলেন,

" রবীন্দ্র-প্রতিষ্ঠানের সুহৃদরূপে আপনার অকৃত্রিম ও অবিচল নিষ্ঠা আজও সুদুর্লভ। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বাল্যাবস্থা হইতে বিশ্বভারতীর পরিণতি পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত থাকিয়া এই রবীন্দ্র-সংস্কৃতি কেন্দ্রের আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কার্যে আপনি অজস্র উপায়ে যে-সাহায্য করিয়াছেন তাহা অপরিমেয়।. "

ইহার পর ১২ আষাঢ় অধ্যাপক ডা. রমেশচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক ডা. শিশিরকুমার মিত্র, অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ অধিকারী প্রভৃতি পূর্ণিমা সম্মিলনীর পক্ষ হইতে একটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত মানপত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে উপহার দেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার তাহা তাঁহার শয্যাপার্শ্বে পাঠ করেন। ইহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :

"... সকল প্রকার তর্কপ্রমাণ, ধীর অথচ সুদৃঢ় যুক্তিসমন্বিত, সুনিপুণ নির্ভীক সমালোচনা দ্বারা আপনি এদেশের শাসন ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সকল অন্যায়কে জনসাধারণের গোচরে এনেছেন। সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতি এবং ধর্মান্ধতার কুসংস্কারকে অনাবৃত করে লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরেছেন। আপনার অক্লান্ত চেষ্টায় এবং অবিরাম প্রচারে আজ দেশের লোক তাদের অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে অনেকাংশে সচেতন হতে পেরেছে। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, শিল্পবাণিজ্য, আর্থিক ও রাষ্ট্রিয় অধিকার এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আপনার সদা সতর্কবাণী জাতিকে আজ প্রকৃত প্রগতির পথে পরিচালিত করেছে। হে আজীবন দেশহিতব্রতী মঙ্গলাভিলাষী সদাজাগ্রত শান্তস্থবির! আপনাকে আমরা প্রণাম করি।

আপনি চিরদিন দেশের জ্ঞানী ও গুণীদের সমাদর করেছেন ; তাঁদের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ও জ্ঞানালোককে সর্বজনসমক্ষে তুলে ধরে দেশের অজ্ঞানান্ধকার দূর করবার চেষ্টা করেছেন। আপনার সূক্ষ্ম রসবোধ ও বিস্ময়কর গুণগ্রাহিতা সাহিত্য ও চিত্রকলার বহু অতি-অগ্রগামী প্রতিভাকে সর্বস্বীকৃতি জানিয়ে ও যথাযোগ্য মর্যাদা দান করে তাদের যাত্রাপথকে সুগম করে দিয়েছে। হে দূরদর্শী মনস্বী! গুণানুরক্ত বিদ্বজ্জনসেবক! আপনাকে আমরা প্রণাম করি!"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন উত্থানশক্তিরহিত, লিখিতে-পড়িতে কিছুই পারেন না। তবুও তিনি যেরূপ সুন্দর প্রতিভাষণ দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আশ্চর্য মেধাশক্তি, তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ, তাঁহার বিনয়-নম্র ব্যবহারের পরিচয় পাইয়া সমাগত পণ্ডিতগণ বিস্মিত হন। তাঁহার দুই-চারিটি কথার মর্ম দিতেছি :—

তিনি বলেন :

আপনারা আমার প্রতি যে প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তা আমি প্রত্যাশা করি নি। বিনিময়ে আমার প্রীতি ও শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম—

"কীটোঽপি সুমনস্ সঙ্গাদারোহতি সতাং শিরো

অশ্মাপি যাতি দেবত্বং মহদ্ভিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।"

"ফুলের সঙ্গে কীটও সৎ লোকেদের মস্তকে আরোহণ করে, পাথরও মহৎ লোকের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে দেবত্বপ্রাপ্ত হয়। আপনারা পণ্ডিত মানুষ, আপনাদের সঙ্গে আমাকে জড়িত করে আমার সুবিধা হয়েছে।..."

নিখিল ভারত অন্ধ-আলোক-নিকেতনের কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ১৯ ভাদ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সংবর্ধনা করেন। ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকেরা সকলে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া পুষ্প্য-অর্ঘ দিবার পর শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায় অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

" .হে শ্রদ্ধাভাজন,

বাঙালি সভ্যতার এক গৌরবময় অধ্যায় তোমার জীবনে রূপ পাইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের বিরাট প্রতিভা যে সংস্কৃতির বনিয়াদ গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহার পরিণতি তোমাতেই পুষ্পিত হইতে দেখিয়াছি। সবল মাধুর্য ও ব্যক্তিত্বের সমাবেশে তোমার যে জীবন ঐশ্বর্যময় হইয়া উঠিয়াছে, সে আদর্শের তুলনা আজ পর্যন্ত মিলিল না। তোমাকে আমাদের মধ্যে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

হে মহানুভব,

ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সৃষ্টির প্রথম করুণা হইতে যাহারা বঞ্চিত তাহাদের পক্ষ হইতে আমরা আজ তোমাকে বিশেষ করিয়া অভিনন্দন জানাইতেছি 'বাংলা ব্রেইল বর্ণমালার' জনক হিসাবে। ঊনবিংশ শতকের শেষপাদে ভারতে যে কয়জন মুষ্টিমেয় সহৃদয় দৃষ্টিহীনদের কথা চিন্তা করিতেছিলেন, তুমি তাঁহাদের অন্যতম। সেই সুদূর অতীতে (শ্রাবণ ১২৯৯ সাল) তোমারই সম্পাদিত 'দাসী' পত্রিকায় তোমার দরদী মন যে 'অন্ধ লিপিমালা'র সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাই আজ সামান্যতম পরিবর্তিত আকারে সমগ্র বাঙালি অন্ধদিগের সম্মুখে নূতন জগৎ উদঘাটিত করিয়া দিয়াছে। যে-সম্মান তোমারই প্রাপ্য তাহা অন্যকে পাইতে দেখিয়াও তুমি নির্বিকার থাকিয়া যে নির্লোভ অনাসক্তি ও মহান ত্যাগের পরিচয় দিয়াছ তাহা একমাত্র তোমাতেই সম্ভব। বার্ধক্যের দুয়ারে দাঁড়াইয়াও এই হতভাগ্যদের প্রতি তোমার করুণা অব্যাহত রহিয়া গিয়াছে, এই সৌভাগ্য স্বীকার করিতে পারিয়া আমাদের অন্তর আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে।. "

রামানন্দের প্রতিভাষণগুলির অনুলেখন নানা কারণে এখন আর পাওয়া সম্ভব নয়! কিন্তু মৃত্যুর পঁচিশ দিন পূর্বেও রোগের অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে তিনি স্বকীয় বিশিষ্ট ভঙ্গীতে যে উত্তর দেন তাহাতে সকলে বিস্মিত হন। তিনি গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের কাহিনী উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত রায়ের পত্নীকে "এ যুগের গান্ধারী" বলেন।

এই জয়ন্তী উপলক্ষে মীরাট সাহিত্য-পরিষদ, চন্দননগর বঙ্গভাষা-সংস্কৃতি সম্মেলন, বোম্বাই বেঙ্গল ক্লাব, ত্রিচি, হায়দ্রাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি নানা স্থান হইতে মানপত্র, সাধারণ অভিনন্দন ইত্যাদি আসিয়াছিল। নানা সাময়িকপত্রও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

নববিধান পত্রের সম্পাদক লেখেন,

"...if there is anyone in India who deserves to be honoured for raising Indians in the estimation of the world and steeling their minds against injustice oppression, and exploitation, it is certainly Sj. Chattopadhyaya ..One might truly say that in his case the pen has really been mightier than the sword....We do not know of anyone in the journalistic world, whether of this country or of any other, who could be praised more highly for fearless and honest journalism."

রামানন্দ চিরদিন অন্তরীনদের পরম সুহৃদ ছিলেন। কৃষ্ণকুমার, অরবিন্দ প্রভৃতির জেলের যুগ হইতে নিজ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ইহাদের জন্য লড়িয়াছেন এবং চিন্তা করিয়াছেন। রোগশয্যায় শুইয়াও কোনো কোনো অন্তরীন ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের খোঁজখবর এবং নানাকার্যে সাহায্য তিনি নিয়মিত করিতেন। সুখের বিষয়, তাঁহার জয়ন্তী-উৎসবে জেলের প্রাচীর ডিঙাইয়া বহু ভক্তির অর্ঘ্য আসিয়াছিল, রাজশাহি সেন্ট্রাল জেল হইতে মৃগাঙ্ক ঘোষ লেখেন,

"...The Indian journalism, and for that matter Indian nationalism too, may I add, is what is today—an elevated and enlightened affair—due solely to your sterling services to its cause, to your unremitting industry, unchallenged command over date and statistics, and to your unfathomable erudition."

শ্রীঅনিল রায়, লীলা রায়, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির অর্ঘ্যও জেল হইতে আসে। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন Security Prisoner লেখেন :—

"ছয় বছর আগে, যখন ফ্যাসিস্‌ম্‌-এর উন্মাদনাকরী মাদকতা শিক্ষিত সমাজের মনকে বেশ একটা দোলা দিয়েছিল তখন রোঁমা রলাঁর নেতৃত্বে World peace and Anti-fascist Conference-এর অনুষ্ঠান চলতে থাকে। তারই বাংলা দেশের Conference-এ আপনাকে নিয়ে আসার দায়িত্ব আমার ওপর পড়ে। অনেকেই ভেবেছিলেন যে আপনি আসবেন না ; কারণ গুরুতর অসুখে আপনি তখন পীড়িত। কিন্তু শুধু যে রোগশয্যা ছেড়ে সভায় আসতে আপনি স্বীকৃত হয়েছিলেন তা নয়, এই সংগঠন গড়ে তোলায় আপনি অপূর্ব উৎসাহের সঞ্চার করেছিলেন। সেই আলাপেই পরিচয় পেয়েছিলুম যে যারা নিপীড়িত ও দুর্গত, তা তারা যে দেশেরই হোক না কেন, তাদের ওপর আপনার কী অপরিসীম দরদ, আর শিক্ষিত যুবকেরা যাতে বিপথে না চালিত হয় সে দিকে আপনারা কত আগ্রহ!"

'মডার্ন রিভিয়ু'র পাঠকেরা জানেন যে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ হইতে রোমাঁ্যা রলাঁ্যা প্রভৃতি ইউরোপের যুদ্ধবিরোধী প্রগতিবাদী নেতাদের সহিত রামানন্দের সহযোগ কত গভীর ছিল। ১৯৩৭ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে '*An appeal of Romain Roland*' 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহা সম্পাদকের নিকট পাঠাইবার সময় ফ্রান্সিস জুরদাঁ্যা লেখেন :

Ramananda Chatterji Esq., 1st December, 1936
"Modern Review",

Dear Friend,

We are enclosing herewith an eloquent appeal addressed to the conscience of the world by Romain Rolland, We feel sure that you will associate yourself with this appeal and, therefore, we make so bold as to ask you to send us a few lines expressing your opionion on the terrible bombardment which the civilian population in Madrid has endured already for so many days.

We attach particularly great value to such a personal declaration from you. Its publication in the press and particularly in Spain will be an important testimony to world opinion and a mark of solidarity with the Spanish people.

Thanking you in anticipation,
Yours sincerely,
P.P.Francis Jourdain,
For the World Committee against War and Fascism.

রামানন্দ জুরদ্যাঁকে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত ও প্রকাশ্য সহানুভূতি পাঠাইয়াছিলেন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন যে স্পেনকে সহানুভূতি ছাড়া আর অধিক কিছু সাহায্য দিবার ক্ষমতা ভারতবাসীর নাই, তাহারা অসহায়।

অনেকের মতে রামানন্দ-জয়ন্তী আরও বহু পূর্বে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। কমিটি গঠিত হইবার পর এই উপলক্ষে কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী লেখেন,

> "... Bengal would have failed in her duty if she did not honour such a distiguished and truly esteemed public man who has served his country for half a century standing head and shoulders above all parties and interests and without caring for the frown or favour of any earthly power."

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম লেখেন,

> "সবচেয়ে বেশি দুঃখ এই রইল মনে যে, ওঁর সত্যকার যোগ্য সম্মান সংবর্ধনা কিছুই হল না।"..

শেষ বৎসর

বাঁকুড়া হইতে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিবার সময় রামানন্দ বলিয়াছিলেন, "আমি তিন সপ্তাহের জন্য কলিকাতা যাইতেছি।" সামান্য কিছু কাপড়চোপড় লইয়া তাঁহাকে আনা হয়। তাঁহার বই কাগজ ও লেখার অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রায় সবই বাঁকুড়ায় রহিল। কারণ তিনি বাঁকুড়াতেই শেষ জীবনটা কাটাইবেন ঠিক করিয়াছিলেন। কিন্তু মাত্র তিন সপ্তাহে তাঁহার চিকিৎসার কিছুই হইয়া উঠিল না। কেহ বলিলেন, "এ রোগ এ বয়সে দুরারোগ্য।" কেহ এত দীর্ঘকাল চিকিৎসার প্রয়োজন বুঝিলেন যে তাহাতেও বিশেষ ভরসা পাওয়া গেল না। রামানন্দ আশা করিয়াছিলেন যে তাঁহার জন্মদিনের সময় তিনি সারিয়া উঠিবেন। চিকিৎসকেরা ক্রমাগতই তাঁহাকে সেই আশ্বাস দিতেন। শরীর ক্রমেই জরাজীর্ণ হইয়া আসিলেও তিনি চিকিৎসকদের কথার প্রতিবাদ করিতেন না। শুধু বলিতেন, "আমার কিছু কাজ বাকি আছে, যদি আর একটা বছর আমায় একটু হাঁটা-চলার মতো করে দিতে পারেন।" শেষ কয়েক মাস বলিতেন, "এ চিকিৎসায় আমার কোনো উন্নতি হবে না বুঝতে পারছি।"

রোগশয্যায় শুইয়াও তাঁহার কর্মময় জীবনের ধারা তিনি অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিতেন। দিনে কত যে চিঠির জবাব মুখে মুখে দিতেন, তাহার ঠিক নাই। আত্মীয়-স্বজনকে দিয়াই এই সব চিঠি লিখাইতেন। প্রতিদিন প্রবাসী অফিসের দৈনিক হিসাবের খবর লওয়া, তিনটি পত্রিকায় কী কী প্রবন্ধ যাইবে তাহার ব্যবস্থা করা, কোনো প্রবন্ধ বেশি দিন পড়িয়া আছে কিনা, কোনো সাময়িক বিষয়ে লেখা বাদ গিয়াছে কি না—এই সব বিষয়েই তিনি শেষ পর্যন্ত সজাগ ছিলেন। বাঁকুড়ার ও অন্যান্য জায়গার যে-সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন তাহাদের মঙ্গল-চেষ্টা রোগশয্যায় শুইয়া চিঠি লিখাইয়া অপরের সাহায্যেও শেষ পর্যন্ত করিয়াছেন! চালের দর যে তখন ৪০ টাকা মণ হইয়াছিল সে খবরও নার্সদের নিকট সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

যে মানুষ সুস্থ অবস্থায় শান্ত থাকে, রোগের যন্ত্রণায় তাহাকেও অসহিষ্ণু হইতে দেখা যায়। কিন্তু রামানন্দ রোগযন্ত্রণার মধ্যেও ছিলেন শান্ত স্থিরচিত্ত। বাড়ির শিশু কী বালকবালিকারা পাছে তাঁহার যন্ত্রণা দেখে কী কাতরোক্তি শুনিয়া ব্যথিত হয়, এই ভয়ে তিনি

সদাসতর্ক থাকিতেন।

প্রতিদিন কত মানুষ দেখা করিতে আসিতেন, তিনি কাহারও মুখ, কাহারও কথা ভুলিয়াছেন বলিয়া শেষদিনেও মনে হয় নাই। তাঁহার আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি, স্বজন ও বন্ধুপ্রীতি দেখিয়া মানুষ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া ফিরিত।

ছয়মাস জ্যেষ্ঠা কন্যার নিকট থাকিয়া সেপ্টেম্বর মাসের ১৮ তাবিখে রামানন্দ তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার নিকট যান। এ গৃহে তিনি যে আর ফিরিবেন না, একথা ভাবি নাই। শীতকাল কাটিয়া গেলে আবার আসিবেন মনে এইরকম আশা একটা ছিল। তিনি যখন যে আবেষ্টনে গিয়া পড়িতেন তাহা ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার মমতাময় স্বভাব সততই পীড়িত হইত। দৌহিত্রীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেবার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "ওরা আমার কত কাজ করে দেয়, আমি নাই বা এখন গেলাম!" কিন্তু চিকিৎসা ও সেবার কোনো কোনো সুবিধা হইবে মনে করিয়া তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। সেবার প্রয়োজন বেশিদিন হইল না। অকস্মাৎ পীড়া কঠিনতর রূপ ধারণ করিল।

চিরজীবন মাসের শেষ দিনে তিনি বিশ্রাম লইতেন। যেন আপনার সেই চিরাচরিত নিয়ম রক্ষা করিয়া সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখে সন্ধ্যা ৭-৩০এ সজ্ঞানে তিনি চিরবিশ্রামের জন্য চক্ষু নিমীলিত করিলেন।

এই মরজীবনে মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টায় তিনি সকল কল্যাণকর্মে আলোকবর্তিকা হস্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া বিশেষ একটা নামের টিকা তাঁহার ললাটে পরাইবার কথা মানুষ ভাবে নাই। তিনি দশজনের একজন হইয়া নিজেকে খ্যাতির আলোক হইতে দূরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন। সেইরূপ ভাবেই শান্ত সন্ধ্যায় নিভৃতে এ জীবনের কাজ তিনি শেষ করিয়া গেলেন। তাঁহার শেষযাত্রায় কোনো সমারোহ হয় নাই।

কিন্তু পরদিন একজন মহিলা তাঁহার তিরোধানের সংবাদ শুনিয়া বলিলেন, "বাংলাদেশ আজ অভিভাবকহীন হল।"

রামানন্দ-চরিত্র

সর্বশেষে রামানন্দের জীবনের কয়েকটি বিশিষ্টতার কথা বলিব। অপরে তাঁহাকে যে চোখে দেখিয়াছে সেইভাবে বলিতেই চেষ্টা করিব। সর্বত্র হয়ত তাঁদের নাম এবং হুবহু ভাষা দেওয়া যাইবে না। নিজের মত দিবার প্রয়োজন থাকিলে দিব।

শ্রীযুক্ত বনারসী দাস চতুর্বেদী বলেন, "রবীন্দ্রনাথ ও রলাঁর মতো রামানন্দ ছিলেন বিশ্বসম্মানের পাত্র।" **(Bare Babu was definitely of the same mould as Gurudev & Rolland and was supreme in his own field of Journalism. He was a World Figure.)**

তিনি ছিলেন প্রকৃত ধর্মনিষ্ঠ।

অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ বলেন, "এই গৌরবমণ্ডিত কর্মজীবনের অটল প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁহার ধর্ম-বিশ্বাসে।"

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় বলেন,

> "তিনি ছিলেন কর্মযোগী। সকালে বিকালে সন্ধ্যায় রাত্রে যখনই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি একই মূর্তিতে আমার কাছে তিনি প্রতিভাত হয়েছেন কর্মযোগীর মূর্তিতে। কোনোরকম জড়তাকে তিনি ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে দিতেন না। বিরাট কর্মীপুরুষ ছিলেন

তিনি।

তাঁর জীবনব্যাপী এই যে ক্লান্তিহীন কর্মতৎপরতা, এর মূলে ছিল প্রগাঢ় ভগবদ্ভক্তি। তাঁর কর্মজীবনের প্রবল গতিবেগ এইখান থেকে তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। তাঁর চিত্ত ছিল ঈশ্বরমুখী। ঈশ্বরের মধ্যে তাঁর সত্তাকে তিনি ডুবিয়ে রাখতেন। কর্মযোগের পথ তিনি গ্রহণ করেছিলেন—কারণ নিষ্কাম কর্মের পথ ছিল তাঁর কাছে ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে নিয়ত যুক্ত রাখার প্রকৃষ্ট পথ।"

অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ বলেন,

"মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আধ্যাত্মিকতা তাঁর জীবনে সুন্দর ফুটে উঠেছিল। তিনি ছিলেন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ। ব্রহ্মে সঞ্জীবিত হয়ে দৈনন্দিন জীবনে ধর্মসাধন করেছেন—তাই তাঁর হৃদয় এত সরসতায় পূর্ণ ছিল। তাঁর জীবনের সকল উদ্দীপনা, সকল শক্তি, সকল গুণাবলীর মূল প্রস্রবণ ঐখানেই। বিশ্বপতির পতাকা বহিবাব আকাঙ্ক্ষা ও শক্তি তাঁব ছিল ও সেই শক্তি তিনি আজীবন ব্রহ্মের আদেশে তাঁব কার্যে নিয়োগ কবেছেন—নীরবে পুণ্যময় জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়ে। ছোটোবড়ো সকল কাজেই তিনি ঈশ্বরেব ইচ্ছা পালন করতে নিয়ত সজাগ ও প্রযাসী ছিলেন। তিমিবাতীত আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষেব মুখজ্যোতি তাঁর অন্তরকে আলোকিত করেছিল। শুদ্ধ শান্ত সমাহিত চিত্তে তিনি আমাদের সেই আলোকের অনুসরণ করতে উদ্বোধিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'যে উজ্জ্বল বিমল আলোক ঋষিরা পেয়েছিলেন, খুব সামান্য হলেও আমরাও তা কিঞ্চিৎ পেতে পারি। আমরা ভগবানের নিকট থেকে যতটুকু আলোক পাই, তা যত ক্ষীণই হোক, কর্তব্যবুদ্ধি যতটুকু আছে, তা যত অল্পই হোক, তার অনুসরণ করলে আমরা আবো আলো, কর্তব্যবুদ্ধির আরো প্রেরণা নিশ্চয়ই পেতে পারি। যা পেয়েছি, যা পাব, একাগ্র মনে, অবিচলিত অপরাজেয় চিত্তে, তার অনুসরণ কবতে হবে। তাহলে আরো পাব,.. কিন্তু সদা সতর্ক থাকতে হবে, ভ্রমপ্রমাদ স্খলন যাতে না হয়। Eternal vigilance is the price of realization. অসামি অবিবাম অতন্দ্রিত পাহারা নিজের উপর দিয়ে ব্রহ্মোপলব্ধি করতে হয়'।"

বাস্তবিকই রামানন্দ নিজের উপর অবিরাম অতন্দ্রিত পাহারা দিতেন। পাছে তাঁহাব কোনো বিষয়ে কোনো ভ্রমপ্রমাদ কী স্খলন হয় এ বিষয়ে তিনি সদা সতর্ক ও সজাগ ছিলেন। ব্রহ্মোপলব্ধি তাঁহার জীবনে একটা abstract জিনিস মাত্র ছিল না, তাঁহার কর্মযজ্ঞই ছিল ব্রহ্মোপলব্ধির মূর্ত রূপ। যে-সকল ভ্রমপ্রমাদ উল্লেখ করিবার মতো কিংবা মনে করিয়া রাখিবার মতো, এ রকম কী কী ভ্রমপ্রমাদ তাঁহাব জীবনে হইয়াছিল জানি না। সামান্য ছোটোখাটো ভ্রমপ্রমাদ যদি কখনো তাঁহার 'পাবলিক' কাজে হইত, তিনি অপরে তাহা বুঝিবার পূর্বেই তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ্য কাগজে ছাপাইয়া স্বীকার করিতেন; শ্রীহট্টের কোনো সভায় নিজের একটি সিদ্ধান্তকে ভুল মনে হওয়ায় পর বৎসর তিনি কাগজে আপনার ভুল স্বীকার করেন। ব্যক্তিগত জীবনে কোনো ভুল কী ভুলের সন্দেহ হইয়াছে বলিয়া যদি মনে করিতেন, তাহা হইলে যাহার নিকট ভুল হইয়াছে, সে সম্পর্কে বয়সে বিদ্যায় বুদ্ধিতে তাঁহা অপেক্ষা যতই ছোটো হউক না কেন তিনি তাঁহার নিকট ভুল স্বীকার করিতেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া। নিজের ভ্রম স্বীকার করিবার মতো মহত্ত্ব ও সাহস কয়জনের আছে?

মহলানবিশ মহাশয় আরও বলিয়াছেন,

"যৌবন-উষায় মানবজাতির কল্যাণের জন্য স্বদেশহিতকর যে-সকল শুভকামনা তাঁর হৃদয়ে জেগেছিল, আমরা সেই সময়েই তার কিছু কিছু পবিচয় পেয়েছি। সরল রেখার ন্যায় তাঁর জীবন সেই আদর্শের সম্মুখে অবিচলিত পদে অগ্রসর হয়েছিল। তাঁর জীবনের

যে-বৈশিষ্ট্য প্রথম যৌবন হতে দেখেছি তা ছিল নির্ভীকতা ও ন্যায়পরায়ণতা। তাঁর আদর্শ ছিল সত্য। সত্য ছিল তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র, সত্যের জয় তিনি সতত অকুণ্ঠিত ভাবে ঘোষণা করেছেন।

"অথচ বিনয় তাঁর জীবনের ভূষণ ছিল। অসাধারণ গুণী ছিলেন, অশেষ গুণাবলী জীবনকে অলংকৃত করা সত্ত্বেও জীবন বিনয়ে শোভিত ছিল। নির্ভীকতার সঙ্গে মাধুর্যের আশ্চর্য সমাবেশ এই মহাত্মার জীবনে দেখেছি—সত্য-পরায়ণতা, সুস্পষ্ট বচন অথচ সদাশয়তা।"

রামানন্দ আধ্যাত্মিকতায়, সত্যে, ন্যায়ে ও নির্ভীকতায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু নিজেকে তিনি সত্যসত্যই অতি অভাজন, অতি অধম মনে করিতেন। পাছে তাঁহার আধ্যাত্মিকতার অহংকার হয়, এইজন্য নিজের ব্যক্তিগত প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা কখনো তিনি প্রকাশ্যে করিতেন না। কেবল যখন তাঁর পুত্রকন্যারা শিশু ছিল তখন তাহাদের কল্যাণের জন্য তাহাদের লইয়া উপাসনা সংগীতাদি করিতেন, আবার যখন তাঁহার পৌত্রীরা শিশু ছিল তখন তাহাদের লইয়াও করিতেন। অন্য কোনো সময় তাঁহাকে একা উপাসনায় উপবিষ্ট কেহ বোধ হয় দেখে নাই। এই গোপনতা তিনি ইচ্ছা করিয়াই অভ্যাস করিয়াছিলেন। ধর্মাভিমানকে যে তিনি আজীবন ভয় করিতেন, ইহা ১২৯৬ সালের 'ধর্মবন্ধুতে'ই দেখিয়াছি। তাঁহার ডায়েরিতেও একথা দেখিতে পাই।

রামানন্দ প্রথম যৌবন হইতেই সামাজিক উপাসনার প্রয়োজন হইলে প্রকাশ্যে ব্রহ্মমন্দিরে বা অন্যত্র বেদীতে আচার্যের কাজ করিয়াছেন। বাঁকুড়ায় বোধ হয় ছাত্রাবস্থা হইতেই বন্ধুদের লইয়া কীর্তন, সংগীত ও প্রার্থনাদি করিতেন। যখন এলাহাবাদে যান তখন ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে তিনিই আচার্যের কাজ করিতেন। সেখানকার "সাধনসঙ্গতে"ও তিনি একজন আচার্য ছিলেন। সর্বত্রই তাঁহার সরল খাঁটি প্রাণস্পর্শী প্রার্থনায় উপাসকেরা মুগ্ধ ও উপকৃত হইতেন। তাঁহার কোনো কোনো বন্ধুর ডায়েরিতে তাহার উল্লেখ পাই। তাঁহার উপাসনায় সাজানো কথা থাকিত না। মাকে যেমন শিশু তাহার মনের কথা অকপটে বলে তেমনি অকপটে আপনার অনুভূত কথা তিনি বলিতেন। যখন গভীর শোক কী গভীর দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে কোনো কারণে দেখা দিত, তখন আপনার মনে এই শোক ও দুঃখকে যেমন অসহ্য আঘাত রূপে তিনি অনুভব করিতেন, আবার আপনার মনে বিশ্ববিধানের নিয়মকে যেমন করিয়া তিনি ব্যাখ্যা করিতেন এবং তাহা হইতে সান্ত্বনা পাইতে চেষ্টা করিতেন ঠিক তেমনই করিয়া প্রকাশ্য উপাসনায় তাহা সকলের নিকট প্রকাশ করিতেন। মৃত্যুকে, তিনি 'অতি নিষ্ঠুর কিন্তু কঠোর সত্য' বলিয়া জানিতেন এবং তাহাই বলিতেন ; শস্তা আধ্যাত্মিকতার কোনো বুলি বলিয়া কখনো তাহাকে হালকা করিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার পত্নীর ও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে পারিবারিক উপাসনায় এইরূপ একদিকে অনবদ্য ও প্রাণস্পর্শী এবং অন্যদিকে গভীর তত্ত্বজ্ঞানপ্রসূত প্রার্থনা ও উপদেশ যে-কয়জন তাঁহার মুখে শুনিয়াছেন তাঁহারা তাহা ভুলিবেন না মনে হয়। ব্যক্তিগত অনুভূতিকে তিনি এত বড়ো করিয়া দেখিতেন বলিয়া পারিবারিক কোনো উপাসনায় পরিবারের অপরিচিত কাহাকেও উপাসনা করিতে ডাকিতে তিনি চাহিতেন না। তিনি এমন নিরাবরণ ও নিরাভরণ করিয়া মনের কথা প্রকাশ করিতেন যে অতি অধার্মিকের মনেও তাহা ধাক্কা দিত। কিন্তু প্রকাশ্য সভায় (মণ্ডলীতে) যেখানে অন্য আচার্যের উপাসনা করিবার সম্ভাবনা থাকিত, সেখানে তিনি কখনো নিমন্ত্রিত হইলেও আচার্যের আসনে বসিতে চাহিতেন না। তাঁহার ছাত্র এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের

আচার্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় একবার কলিকাতায় মাঘোৎসবে তাঁহার এইরূপ একটি চিঠি পড়িয়া শোনান। সে বৎসর কলিকাতায় রামানন্দকে ১১ মাঘের প্রাতঃকালীন উপাসনার কাজ করিতে বলা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি নিজেকে 'অযোগ্য' মনে করিয়া, ছাত্রকেই লিখিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাহার ফলে ছাত্রকেই সেই স্থান গ্রহণ করিতে হয়। সতীশচন্দ্র অসুস্থ হইয়া পড়িবার পর কয়েক বৎসর কলিকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসবে প্রধান আচার্যের কাজ রামানন্দই করেন। তখন পৃথিবীব্যাপী হিংসার মহা সমরানল জ্বলিয়া উঠিতেছে। বিশ্বমানবের জীবন-মরণ সমস্যার কথাই সেদিন মানব-প্রেমিক রামানন্দকে বিশ্বপিতার দরবারে উপস্থিত করিতে হইল, কারণ বিশ্ব ও বিশ্বপিতা তাঁহার নিকট অভিন্ন ছিলেন। সে বিরাট কল্পনা সাধারণ উপাসকের পক্ষে সম্ভব নয়। সে সকল প্রার্থনার ও উপদেশের গভীরতা, জ্ঞানগর্ভ হৃদয়গ্রাহিতা, মহান বিশ্বপ্রেমের আদর্শবাদিতা ও সকল দিকে অতুলনীয়তার সাক্ষ্য বহু লোক দিতে পারিবেন। সেগুলি লিখিত থাকিলে ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণ উপকৃত হইতেন। তিনি যে শুধু ব্রাহ্মসমাজের, বাংলার বা ভারতের হিতকামী ছিলেন না, সমস্ত বিশ্বের জন্য তাঁহার কোমল হৃদয় গভীর ব্যথায় অনুরণিত হইত তাহা এইসব দিনে বিশেষ করিয়া বুঝা গিয়াছিল।

ভগবদ্‌ভক্তিই তাঁহার কর্মের প্রেরণা, শোকের সান্ত্বনা, সংগ্রামে শক্তি ও জীবনের মাধুর্যের উৎস ছিল। ইহাই তাঁহাকে জীবমাত্রের প্রতি স্নেহশীল করিয়াছিল। রামানন্দ স্বভাবত স্বল্পভাষী, গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কলমে তিনি সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে কথা বলিলেও মুখে বন্ধুজন ও অতি প্রিয়জন ছাড়া কাহারও সহিত খুব বেশি কথা বলিতেন না। কাজের সময় খুব প্রিয়জন আসিলেও কাজ ফেলিয়া তাহাদের সহিত কখনো কথা বলিতেন না। যদি জানিতেন যে বহুদূর হইতে তাঁহারা আসিয়াছেন এবং এখন ছাড়া আর কথা বলিবার সুযোগ হইবে না, তবে যতটুকু দরকার ততটুকু বলিতেন। অপরিচিত ও অর্ধপরিচিত লোকেরা কিন্তু ইহা অপেক্ষা বেশি সময় তাঁহার নিকট আদায় করিয়াছেন। পাছে তাঁহারা মনে করেন যে অপরিচয়ের জন্য তিনি ইঁহাদের অবজ্ঞা করিয়াছেন, এইজন্যই অনেক সময় খুব কাজের মধ্যেও কেহ আসিয়া পড়িলে তাহার সহিত দেখা করিয়া কথা বলিয়াছেন। এই রকম একজন অপরিচিত ভদ্রলোক লিখিয়াছেন : "আমি বলিলাম 'আপনার সময় নষ্ট করিতেছি আপনি কি ইহা অনুভব করেন না?' তিনি বলিলেন 'হ্যাঁ করি, তা সামান্য বটে। কিন্তু জানি তোমরা ভবিষ্যতে মানুষ হইয়া এই ক্ষতির অবসান করিবে।'

যে-সকল মানুষ তাঁহার সংস্পর্শে আসিতেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার চরিত্র ধীশক্তি ও পরিচালন-ক্ষমতার প্রভাবে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। কিন্তু সেই আকর্ষণের সুযোগ লইয়া তিনি কখনো জননায়ক হইবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি চিরকাল নিজ গৃহকোণে বসিয়া নিরলসভাবে দিনের পর দিন দিবারাত্রি নিজের কাজ করিয়া গিয়াছেন। কখনো বন্ধু, দল, খ্যাতি কী প্রতিপত্তি খোঁজেন নাই। নেতা হইবার ভয় তাঁহার চিরকালের ছিল। তবু সৌরভ সাহিত্য সঙ্ঘ বলেন "অনন্যসাধারণ শক্তিশালী সেনাপতির মতো তাঁর পরিচালন-ক্ষমতা।" নিজ প্রতিপত্তি তো তিনি খোঁজেনই নাই, বরং মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার যে-সকল কার্যের ও কীর্তির ইতিহাস লিখিত থাকিয়া গিয়াছে, তাহা ছাড়া আর সমস্ত কাজের চিহ্ন তিনি স্বহস্তে মুছিয়া দিয়া গিয়াছেন। বহু অমূল্য কাজের কথা, বহু অমূল্য চিঠির কথা অনেকের অস্পষ্ট স্মৃতিতে আছে, কিন্তু বাস্তবে তাহার কোনো চিহ্ন নাই। অনেক এমন কাজও ছিল যাহার স্মৃতিও এখন কাহারো মনে নাই। তাহা কালের গহ্বরে নিশ্চিহ্ন হইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে।

তবে বিধাতার বিধানে তাহা নষ্ট হয় নাই। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নামের সহিত তাহা জড়িত না থাকুক, তাঁহার প্রিয় মানবজাতির কোনো কল্যাণে তাহা লাগিয়াছে, মানবের উপকার করিয়াছে, এবং আত্মগোপন করিবার এই ইচ্ছা তাঁহার চরিত্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধিই করিয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্রের সহিত তাঁহার যখন সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল না, এবং তিনি লেখক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন না তখনকার কথা তিনিও লিখিয়াছেন :

"কলিকাতায় গিয়া রামানন্দবাবুর দর্শনপ্রার্থী হইয়া ১৪ আষাঢ় সকাল সাড়ে আটটায় তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হইলাম। একখানা কার্ডে নিজের নাম এবং 'প্রবাসী'র লেখক এই দুইটি কথা লিখিয়া দারোয়ানের মারফৎ উপরে পাঠাইয়া দিলাম। দুই-তিন মিনিট পরেই রামানন্দবাবু সেই কার্ডখানা হাতে করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন।...বলিলেন, 'আপনি কি এই কার্ড পাঠিয়েছিলেন? আপনার কি বক্তব্য বলুন'।" কবি বিজয়লালও এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন।

রামানন্দ ছিলেন মানবপ্রেমিক। এই মানবপ্রেম বিশেষ দেশে, বিশেষ শ্রেণীতে আবদ্ধ ছিল না, জাতিবর্ণ অবস্থা-নির্বিশেষে যে-কোনো মানুষ তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখাই তাঁহার স্বভাব ছিল। একটা সভায় তিনি নিজেই একবার বলেন, "আমি আমার কাগজে রূঢ় কথা লিখে অনেককে বেদনা দি বটে, কিন্তু আমার মনে বাংলার শিশু থেকে আরম্ভ করে সকলের প্রতি প্রীতি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে। আমি যদি কবি হতাম, তাহলে তা ভাল করে প্রকাশ করতে পারতাম।" মানুষকে যে শিশুর মতো অকপট স্মিত হাস্যের সহিত তিনি বরণ করিতেন তাহা যাঁহারা তাঁহার নিকট আসিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন নেপালচন্দ্র রায়।

আর-এক জনের লেখা হাতে আসিয়াছিল, তিনি লিখিয়াছেন, "সেই স্মিত হাস্যের প্রভাবে খুব বড়ো শত্রুও অবনত হইয়া পড়ে।" তিনিই লিখিয়াছেন "সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পত্র আসিল। বলিলাম, 'আমাকে বই দিন পড়িব।' তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পাঁচ-ছয়খানা বই দিলেন। কি সহজ বিশ্বাস!" এই ভদ্রলোক রামানন্দের সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। অচেনা মানুষকে প্রথম দর্শনে সাধারণ মানুষ একটু সন্দেহের চক্ষে, একটু অবিশ্বাসের সহিত দেখে। তাঁহার মধ্যে এই অবিশ্বাসের, এই সন্দেহের ভাব কখনো আসিত না। তিনি প্রথমে তাহাদের পরমাত্মীয়ের মতো গ্রহণ করিতেন এবং সন্দেহের কারণ স্পষ্ট না দেখিলে কখনো সামান্য কোনো বিষয়েও সন্দেহ করিতেন না।

এই মানবপ্রেমের জন্যই বাল্যে তিনি দরিদ্র পরিবারে সাহায্য ও অনুন্নত শ্রেণীর জন্য নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি করিতেন ; যৌবনে এই মানবপ্রেমই তাঁহাকে আতুরদিগের সেবায় উদ্বুদ্ধ করে, পতিতা নারীদের মুক্তি ও তাহাদের কন্যাদের উদ্ধারসাধনে ব্রতী করে, যে কুষ্ঠরোগ পৃথিবীতে সর্বরোগ অপেক্ষা ঘৃণিত ও ভয়ের কারণ, প্রথম যৌবনে সেই কুষ্ঠরোগগ্রস্তদের কল্যাণের জন্য তিনি বহু পরিশ্রম করিয়াছেন, দেওঘরে কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার সাহায্য, 'দাসী'তে তাহাদের বিষয় লেখা তাহার কিছু পরিচয়। যাঁহারা প্রবাসীর নিয়মিত পাঠক তাঁহারা দেখিবেন, পরজীবনেও কুষ্ঠরোগীদের জন্য এবং কুষ্ঠাশ্রমের জন্য তিনি বারে বারে হিতচেষ্টায় নামিয়াছেন। ইহারা যে পৃথিবীর অবজ্ঞাত। এইজন্যই বাংলার অনুন্নত জাতিদের প্রতি তাঁহার এত করুণা ছিল এবং দীর্ঘকাল তাদের উন্নতি-বিধায়িনী সভার সহ-সভাপতি তিনি ছিলেন। জীবনে বহু কল্যাণ-কর্মের জন্য তিনি অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তিনি সেই অর্থ বিতরণ করিবার কিম্বা ব্যয় করিবার কর্তৃত্ব ও অধিকার কখনো গ্রহণ

করেন নাই। তিনি নামটা অন্যের হইতে দিতেন।

পৃথিবীতে যাহারা বিধাতার কোনো বিশেষ দান ও মানুষের ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত তাহাদের প্রতিই তাঁহার বিশেষ মমতা ছিল। এই জন্য প্রথম যৌবন হইতে আলোককণাবঞ্চিত হতভাগ্য অন্ধদের জন্য তিনি ভাবিয়াছেন, তাহাদের জন্য বর্ণমালা রচনা করিতে নামিয়াছেন, তাহাদের জন্য পত্রিকা প্রকাশ করার প্রয়োজনের কথা তুলিয়াছেন। অন্ধদের হিতচেষ্টাও তিনি চিরজীবন তাঁহার পত্রিকাগুলির সাহায্যেই করিয়া গিয়াছেন। এইজন্যই কি তাঁহার জীবনে শেষ ভক্তির অঞ্জলি এই অন্ধদের নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন?

মূক ও বধিরগণ এবং জড়বুদ্ধি বালকবালিকারাও তাঁহার এমনি মমতার পাত্র ছিল। 'দাসী'র যুগ হইতে ইহাদের হিতচেষ্টা তিনি করিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে "বোধনা-নিকেতনে"র প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছিল। জড়বুদ্ধিদের জন্য এই নিকেতনটি গড়িয়া তুলিতে তিনি এই বয়সেও যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। শুধু কলিকাতায় বসিয়া পরিশ্রম করেন নাই, বারে বারে ঝাড়গ্রামে বোধনার আশ্রমে গিয়া পরিদর্শন, পরামর্শদান ইত্যাদি করিয়াছেন।

তাঁহার আত্মীয়দের মধ্যে একটি জড়বুদ্ধি শিশু ছিল। সেই শিশুটির জন্যও তিনি যেন অন্য সকল আত্মীয় অপেক্ষা বেশি ভাবিতেন। কিসে সে মুক্ত হাওয়ায় থাকিতে পায় অথচ পথে বাহির হইয়া বিপদে না পড়ে, তাই ভাবিয়া তাহার জন্য ঘরে জালের দরজা করিতে আপনি ব্যবস্থা করেন, কি খাইতে সে ভালবাসে. কিসে তাহার পুষ্টি ও বুদ্ধিবিকাশ হয়, কি খেলনা সে খেলিতে চায় ইত্যাদি নানা চিন্তার কথা তাঁহার পুরাতন চিঠিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

তাঁহার শেষজীবনে রোগশয্যায় শুইয়া কোনো অন্তরীণের স্ত্রীপুত্রকন্যার জন্য তিনি সতত ব্যস্ত ও চিন্তিত থাকিতেন। যদি বিছানায় শুইয়াও তাঁহাদের কোনো সাহায্য করিতে পারিতেন, করিতে একদিনও দেরি হইত না।

এই বিশুদ্ধ মানবপ্রেমের জন্যই সকল মানুষের সহিত তিনি সমানভাবে মিশিতে পারিতেন। তাঁহার অনুরক্তদের মধ্যে ক্রোড়পতিরও অভাব ছিল না, ভিক্ষান্নজীবীরও অভাব ছিল না। তিনি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠেরও বন্ধু ছিলেন, অশিক্ষিত গ্রাম্য বালক-বালিকারও বন্ধু ছিলেন। তিনি ধনীদের সঙ্গে সহজে মিশিতেন না। কিন্তু যেখানে ধনীর ধনের চেয়ে প্রীতি বড়ো ছিল, সেখানে এ বিচার তাঁহার ছিল না। গল্প শুনিয়াছি, একজন লক্ষপতি তাঁহাকে এত ভক্তি করিতেন যে তিনি স্বহস্তে তাঁহার পদসেবাও করিতেন। পথশ্রান্ত ভক্তিভাজনকে সেই ধনী ব্যক্তি ভৃত্যের হাতে সঁপিয়া দিতেন না। তাঁহার বিশেষ প্রিয় পাত্র ও পাত্রীদের মধ্যে এমন অনেক মানুষ ছিল যাহাদের বিশেষ কোনো গুণের জন্য তিনি তাহাদের ভালোবাসিতেন না। তিনি তাহাদের ভালোবাসিতেন, কেননা তিনি জানিতেন যে এই মানুষগুলিকে পৃথিবীতে হয়ত আর কেহ তেমন ভালোবাসিবে না। ইহাদের মধ্যে এমন কোনো কোনো জিনিসের অভাব আছে যাহার ফলে সাধারণ মানুষ কখনো ইহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইবে না। অথচ বিধাতার রাজ্যে আসিয়া মানুষের স্নেহ-ভালোবাসা হইতে ইহারা বঞ্চিত থাকিবে কেন! এই জন্যই যেন তাঁহার কোমল প্রাণের ভালোবাসা তাহাদের উপর ঝরিয়া পড়িত। শত কাজের মধ্যেও তাহাদের তিনি কখনো বিস্মৃত হইতেন না। তাহাদের মধ্যে রুগ্ন, ভগ্ন. নিরক্ষর, বিকলাঙ্গ, অকর্মা, বিফল-জীবন কত মানুষও ছিল। আশ্চর্য যে ইহারা মনে করিত, রামানন্দ তাহাদের যেমন গভীর স্নেহ করিতেন, যেমন করিয়া তাহাদের জন্য চিন্তা করিতেন, তেমন আর কাহারো জন্য করিতেন না। অথচ এই মানুষই কি অহর্নিশি সমস্ত ভারতের মঙ্গল-

চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন না! কোথা হইতে তিনি এই সব বঞ্চিতদেব চিঠির জবাব দিতে, গল্প শুনাইতে ও শুনিতে, সুখেদুঃখে পরামর্শ দিতে, কোথাও বা নিয়মিত অর্থসাহায্য করিতে সময় পাইতেন?

সাধারণ মানুষকে তাঁহার মতো বড়ো করিয়া কেহ দেখিয়াছেন কিনা জানি না। তিনি কবি ও শিল্পী প্রভৃতি মহামানবদের বিষয় উল্লেখ করিয়া লেখেন,

"কবি, শিল্পী প্রভৃতির শক্তির প্রকৃতি কিরূপ, মূল কোথায়. বিকাশ কেমন করিযা হয় তাহা সভ্যতার উৎকর্ষ সহকারে মানুষ যত জানিতে পারিবে এবং...শিক্ষার আয়োজন এই জ্ঞানের অনুযায়ী হইবে, সেই পরিমাণে আরও অধিক সংখ্যক এবং অধিকতব শক্তিশালী কবি প্রভৃতি সাধারণ মানুষদের মধ্য হইতে পাওয়া যাইবে। হইতে পারে যে এক-এক জন মানুষ কেমন করিয়া অসামান্য শক্তিসম্পন্ন হয়, তাহার সমস্ত কারণ কোনোকালেই জানিতে পারিব না। যাহাকে জ্ঞানের অভাবে 'দৈব' বলা হয়, এরূপ কিছু কারণ অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই দৈবেবও লীলাক্ষেত্র সাধারণ মানুষদেরই আত্মা।" (কার্তিক ১৩২৩)।

"মানব সমাজ, গৃহ-পরিবার, আত্মীয়-প্রতিবেশী আছে বলিযাই মহাকবিরও কাব্য সম্ভব হয়। মানুষেব জীবনেব ঘাতপ্রতিঘাত. ক্রিযাপ্রতিক্রিয়া, হর্ষশোক, পদস্খলন ও উত্থান, চারিত্রিক সংগ্রাম, জয়-পরাজয় প্রভৃতি কবির াব্যেব উপাদান। কবি নিজের আনন্দ অপর মানুষের সহিত উপভোগ করিতে চান ও পারেন বলিয়াই সাহিত্যের সৃষ্টি হয। কবি একা বিশেষ একটা কিছু নহেন, অপর দশজনকে লইয়াই কবি।" (১৩২৩)

এই জন্যই দেবেন্দ্র সত্যার্থী প্রভৃতি লেখকগণ যখন সাহিত্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন তখন রামানন্দই তাঁহাদের সংগৃহীত পল্লীগাথা প্রভৃতি 'মডার্ন রিভিয়ু' 'বিশাল ভারত' প্রভৃতি পত্রিকায় সমাদর করিয়া প্রকাশ করিতেন।

ভৃত্যদেরও রামানন্দ গৃহের পরিজনের মতো ভালবাসিতেন। এলাহাবাদে মাতাভিখ নামক তাঁহার একজন ভৃত্য ছিল, সে প্রয়োজন হইলে তাঁহার হাঁটিবার জন্য বুক পাতিয়া দিতে পারিত। এইরূপ পিয়ন, মনিঅর্ডারওয়ালা. নাপিত, দারোয়ান, যে-কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, সকলের সম্বন্ধেই তিনি এমন একটা স্বাভাবিক প্রীতি দেখাইতেন যে তাহারা তাঁহাকে না ভালোবাসিয়া পারিত না। ভৃত্যদের তিনি কখনো তিরস্কার করিতেন না; যাহার ব্যবহারে বিরক্ত হইতেন তাহাকে বলিতেন "তুমি যদি কাজ না কবিতে চাও, করিও না।" কিন্তু আপনা হইতে কাহারো অন্ন মারিবার প্রস্তাব করিতেন না। তিনি ভৃত্যদের সচরাচর কাজ করিতে হুকুম করিতেন না, অনুরোধ করিতেন কিংবা জিজ্ঞাসা করিতেন, "তুমি কি ইহা করিতে পারিবে?"

রোগশয্যায় অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও শুশ্রূষাকারী ও ভৃত্যদের "বাবা, তুমি ভালো আছ তো?" কুশলপ্রশ্ন না করিয়া নিজের প্রয়োজনের কথা বলিতেন না। বেতনভোগী নার্সদেরও বেশি খাটাইয়াছেন কিনা, বিরক্ত করিয়াছেন কিনা, সংকোচের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন। নিজের যদি কোনো ত্রুটি হইয়া থাকে, এজন্য তাহাদের নিকটও প্রত্যহ ক্ষমা চাহিতেন। ইহার মধ্যে কোনো কপটতা ছিল না, তাহা আন্তরিক ক্ষমা-প্রার্থনা।

শীতের রাত্রে তাঁহার অসুস্থতার সময় ভৃত্যেরা জড়োসড়ো হইয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিত, রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তাহা তিনি লক্ষ করিতেন। তাই একদিন বলিলেন, "ওরা শীতে কষ্ট পায়, আমার বাক্সে যে দুটা গরম জামা আছে, বাহির করে ওদের দাও।"

বাক্স খুলিয়া দেখা গেল দুটি চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা দামের মূল্যবান গরম জামা রহিয়াছে।

সকলে বলিল, "ইহা যে একেবারে নূতন ও মূল্যবান।" তিনি বলিলেন, "হাঁ, আমি ওগুলি পরি নি। মালবীয়জীর সঙ্গে আমার বিলাত যাবার কথা যেবার হয়, সেইবার ওগুলি করানো হয়েছিল, বিলাত সেবার যাই নাই বলে পরা হয় নাই।" একজন ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "এত ভালো জামা পরে রাস্তায় বেরোলে ওদের পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে।"

ঘাটশিলায় তাঁহার কন্যার বাড়িতে পূজার সময় যাওয়া তাঁহার একটা আনন্দের জিনিস ছিল। এই বাড়িতে এক ভৃত্যের একটি অতি শিশুপুত্র ছিল। সেই শিশুটির সহিত গল্প করিবার অবসর রামানন্দের ছিল না। হয়ত দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া কখনো হাসিতেন। ঘাটশিলা হইতে ছুটির পর অনেকে যখন চলিয়া আসিতেন, তখন শিশুটি বিশেষ কিছু বলিত না ; কিন্তু রামানন্দ চলিয়া গেলে সে "বুলা বাবু" বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইত ; এবং দরজা-জানালা টানিয়া টানিয়া বারে বারে দেখিত তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা।

পূর্বেই বলিযাছি, মানুষে মানুষে গুরুতর প্রভেদ তিনি পছন্দ করিতেন না। আজ সাম্যবাদের কথা যেভাবে প্রচারিত হইয়াছে, ২৮ বৎসর আগে সেভাবে প্রচারিত হয় নাই। এবং আজ প্রচারিত হইয়াও নেতাদের মহাপুরুষ নামক বিশেষ একটা অন্য পর্যায়ে ফেলিয়া পূজা ও অন্ধভাবে অনুসরণ করার প্রথা দূর হয় নাই। বাংলা ১৩২৫ সালেই রামানন্দ বলিয়াছিলেন,

> "মানবজীবনের সকল বিভাগেই সাধাবণ মানুষ ও অসাধারণ মানুষে বড়ো বেশি প্রভেদ কল্পনা কবা হইয়াছে ; এবং তাহাতে এই কুফল ফলিযাছে যে সাধারণ মানুষেরা, দৈহিক স্বাস্থ্য সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যলাভের অধিকাব, মানসিক শক্তি, রাষ্ট্রীয় অধিকাব ও আধ্যাত্মিকতা, সকল বিষয়েই আপনাদিগকে অত্যন্ত হীন বলিয়া বিশ্বাস করিতে ও নিজ হীন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছে , কিন্তু এরূপ বিশ্বাসও অমূলক, এবং এই প্রকার সন্তোষও মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশেব পক্ষে অন্তরায়। ...অবতাব আদি নামে অভিহিত লোককে একটা দুরধিগম্য উচ্চ আসনে উপবিষ্ট স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ফেলিযা রাখিয়া সর্বসাধারণ আমরা ছোটো হইয়া আছি। ব্যক্তিগত দীনতা অবস্থাবিশেষে ভালো। কিন্তু সব সাধারণ লোক অপদার্থ ও অসাধারণেরাই সত্যদ্রষ্টা, চালক ও পৃথিবীব লবণ, এইরূপ দীনতা ভালো নয়।"

রামানন্দের ষষ্টিপূর্তির সময় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন, "অপ্রিয় সত্য বলিয়া বলিয়া তিনি সকল দলেরই অপ্রীতিভাজন ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন।" তিনি সকল দলেরই অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নয়, তবে অনেক দলের হইয়াছিলেন বটে। তবে তিনি যে সকল দলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, তাহা বহু মানুষের সাক্ষ্য হইতে বুঝা যায়।

রামানন্দ নারীর প্রতি অত্যাচারের কঠোর সমালোচক ছিলেন বলিয়া কোনো কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন। একবার একজন, "আপনি ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব-দোষ দুষ্ট হইতেছেন" লেখেন। তদুত্তরে অন্য কথার মধ্যে রামানন্দ লেখেন, "নিজের হইয়া ওকালতি করার চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। আমরা পক্ষপাত-দোষ দুষ্ট না হইতে চেষ্টা করি, এইটুকু বলিতে পারি। চল্লিশ বৎসরের বেশি সাংবাদিকের কাজ করিতে করিতে আমরা কখনো শুনিয়াছি যে আমরা হিন্দুস্বার্থ-পরিপন্থী, কখনো খ্রিস্টান, কখনো মুসলমান, কখনো ব্রিটিশ, এমন কী কখনো ব্রাহ্মগণও আমাকে তাঁহাদের স্বার্থের বিরোধী বলিয়া দোষ দিয়াছেন। প্রত্যেকবারই আমি ভাবিয়াছি, হয়ত এই অভিযোগে কিছু সত্য

আছে। আত্মপরীক্ষা গভীরভাবে করিয়াছি, কিন্তু নিজেকে দোষী কী নির্দোষ কোনোটাই নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না।" (অনুবাদ)। ইহাতে বোঝা যায় প্রায় সকল দলের সম্বন্ধেই অপ্রিয় সত্য তিনি বলিয়াছেন।

কিন্তু শ্রদ্ধার চেয়েও বড়ো যে প্রীতি ও ভক্তি, তাহাও তিনি অসংখ্য মানুষের নিকট পাইয়া গিয়াছেন। মানুষকে ভালোবাসিবার ও ভালোবাসাইবার যেরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা লইয়া তিনি জন্মিয়াছিলেন তেমন বাংলাদেশে আর কয়জনের ছিল জানি না। তিনি সম্ভবত আত্মগোপন করিয়া চলিতেন, কিন্তু তাঁহার বয়স-বৃদ্ধির সহিত তাঁহার খ্যাতি বহুদূরব্যাপী হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ফলে বহু জ্ঞাত-অজ্ঞাত, খ্যাত ও অখ্যাত লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহার সহজাত মানবপ্রীতি, শিশুর মতো সরল বিশ্বাস, শিশুর মতো শুভ্র হাসি, দেবোপম উজ্জ্বল মূর্তিতে পবিত্রতার দ্যুতি মানুষের চোখে পড়িবামাত্র মানুষের মন কাড়িয়া লইত। কাহার সাক্ষ্য দিব জানি না, বহু নরনারীর মুখে ও চিঠিতে শুনিতেছি ও দেখিতেছি, "তাঁহার মতো এমন মিষ্টভাষী ও প্রকৃত ভদ্রলোক দেখি নাই।" নলিনীকুমার ভদ্র লিখিয়াছেন, "শ্বেতশ্মশ্রুবিমণ্ডিত মুখমণ্ডল তাঁহার আধ্যাত্মিকতার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। রামানন্দবাবুর সান্নিধ্যে গেলে আমার মনকে সব চেয়ে বেশি আকৃষ্ট কবিত তাঁহার দেহ মন ও আত্মা হইতে বিকীর্ণ পবিত্রতার দীপ্তি "

শান্তিনিকেতনে তিনি যে-বৎসর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের পাশের বাড়িতে থাকিতেন। তাঁহার অনুগত বালকবালিকাদের দল বৃদ্ধি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "রামানন্দবাবু মশায়, আপনি আমার দল ভাঙিয়ে নিচ্ছেন।"

তাঁহার বন্ধু বিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয় বলিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রস্থানেব অল্পকালের মধ্যে তাঁহারও মহাপ্রস্থান, ভারতের, বিশেষত বঙ্গদেশের পক্ষে দুর্বিষহ। কী এ দৈবদুর্বিপাক!"

রামানন্দের কঠোর নীতিজ্ঞান ও নিষ্কলুষ চরিত্র ছিল, একথা শত্রুমিত্র সকলেই বলেন। কিন্তু তাঁহার মানবপ্রীতি ব্যক্তিগত জীবনে স্খলন দেখিবামাত্র তাহাকে বর্জন করে নাই। তিনি এলাহাবাদে থাকিতে সমাজভীতা একটি ধনী ব্রাহ্মণ বিধবা তাঁহার শরণ লন জানি, রামানন্দ তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত করিবার পর লোক জানাজানি হইবার ভয়ে মহিলাটি পশ্চাৎপদ হইলেন। মহিলাটি অবৈধ সম্বন্ধের মধ্যেই জীবন যাপন করিতেছিলেন। আর-একবার একজন কায়স্থ মহিলার গৃহে উপস্থিত হইয়া তিনি জানিতে পাবেন যে মহিলাটি বহু সন্তানবতী কিন্তু বিবাহিতা নহেন। রামানন্দ স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া তাঁহার বিবাহ দেন এবং চিরদিন মহিলাটিকে নানা সৎ কার্যে ও সদুপায়ে উপার্জনের পথে উৎসাহী করেন। তাঁহার সাহায্যে মহিলাটির কিছু খ্যাতিও লাভ হয়।

আর-একটি মেয়ের কথা শুনিয়াছি যাহাকে কোনো পুরুষ সমাজ-পরিত্যক্তা হইতে বাধ্য করে। রামানন্দ বলিতেন, "পুরুষ আমার স্বজাতি। তাহার অপরাধের জন্য এই মেয়েটির কিছু উপকারের চেষ্টা আমার করা উচিত।" তিনি এই মেয়েটির আজীবন সহায় ও বন্ধু ছিলেন।

কলিকাতায় নিজ বাসাবাড়িতে এবং অন্যত্র চাকর বামুন ও চাকরানিদের নৈতিক অবস্থায় তিনি ব্যথিত হইতেন। তিনি বলিতেন, "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে ইহাদের মঙ্গল হয়। ইহাদের মধ্যে অবৈধ সম্বন্ধ ঘটিতেছে, অথচ বৈধ সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে যে উদ্যম, সাহস ও লোকহিতৈষণার প্রয়োজন, বঙ্গে তাহা নাই।"

তিনি মানুষের বেদনায় সহজেই বিচলিত হইতেন এবং কোনো না কোনো উপায়ে তাহাদের সহায় হইতে চাহিতেন। এই কারণেও বহু লেখককে তিনি দীর্ঘকাল স্বীয় পত্রিকাগুলিতে লিখিতে উৎসাহ দিয়াছেন। অজিত চক্রবর্তী ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষ্য দিয়াছিলেন যে তাঁহাদের ও অন্য বহু লেখকের জীবনযাত্রার পথ এইরূপে তিনি সহজ করিয়া দেন।

নিজ কর্মচারীদের প্রতিও তিনি চিরদিন সস্নেহ ব্যবহার করিয়াছেন। কাহারও কাজে অসন্তুষ্ট হইলেও তাহাকে বিদায় দেন নাই। বৃদ্ধ বয়সে অনেককে পেনশন দিয়াছেন। বেতনের উপর লেখার জন্য নিজ কর্মচারীদের স্বতন্ত্র দক্ষিণা দিয়াছেন পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর আগেও। যদি কোনো কর্মচারী বলিতেন, "আমরা অনেকে অফিসের সময়েই এই জাতীয় কাজ করি,' তাহাতে রামানন্দ বলিতেন 'আমার পক্ষের কর্তব্য আমি করিলাম, অপর পক্ষের কর্তব্য তাঁহারা বুঝিয়া করিবেন।' কাহাকেও বা অফিসের সময়েই অন্য কাজ করিবার অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু বাড়তি কাজ করিয়া সময় পুরাইয়া দিতে বলেন নাই।

মানুষের জীবনে কত পুরাতন বন্ধু নিশ্চিহ্ন হইয়া চলিয়া যায়, কত নূতন বন্ধু আসে, মানুষ এক দলকে ভোলে, আর-এক দলকে গ্রহণ করে। রামানন্দের জীবনে মনের ভিতর কখনো তাহা হয় নাই। তিনি যাহাকে জীবনে একবার ভালোবাসিয়াছেন, চিরদিনই তাহাকে ভালোবাসিয়াছেন। বাহিরের যোগ অর্ধ শতাব্দীও যেখানে ছিল না, সেখানেও তাঁহাকে উস্কাইয়া দিলে দেখা যাইত, পূর্বদিনের ক্ষুদ্রতম স্মৃতিও তিনি ভোলেন নাই। তিনি যখন শেযশয্যায় শায়িত তখন ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বে দেখা বন্ধুদের অনেককে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে দেখা প্রিয়জনদের আবার দেখিয়া পূর্বকথা স্মরণ করিয়া ও বলিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেন, বলিতেন, "কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার পূর্বে আব-একবার দেখা করিয়া যাও।" তাঁহার প্রখর স্মৃতিশক্তিই এই সকলের কারণ নয়, ইহার কারণ তাঁব স্বজনপ্রীতি, বন্ধুপ্রীতি। তাই যদিও তিনি কর্মজীবনে ভোর পাঁচটা হইতে রাত্রি আটটা-নটা পর্যন্ত কাজেই ডুবিয়া থাকিতেন, তবু ছুটির দিনে তাঁহার ছুটি লওয়া হইত না। চিঠিতে চিঠিতে রামানন্দের টেবিল বোঝাই হইয়া থাকিত, ছুটির দিনের একটা কাজ ছিল চিঠির জবাব দেওয়া। এক দিনে তিন-চারখানা চিঠি লিখিতে আমরা ভয় পাই, তিনি এক দিনে কত সময় পঞ্চাশখানা চিঠির জবাব দিতেন। কত মানুষের চিঠির জবাব আমরা দিয়া উঠিতেই পারি না, রামানন্দকে চিঠি লিখিয়া কোনো সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকও কখনো জবাব হইতে বঞ্চিত হইত না বোধ হয়। পাটনা হইতে একজন ভদ্রলোক লিখিয়াছিলেন, "তাঁহাকে চিঠি লিখিলে তিনি চিঠিরই জবাবে সর্বদাই বলিতেন আমার সময় ও বয়সের পক্ষে আমার কাজ বেশি, চিঠির জবাব দিবার সময় আমার নাই।" অথচ কার্যত, দেখা যাইত শীঘ্র হউক, দেরিতে হউক, সব চিঠিরই জবাব তিনি দিতেন। যতই দেরি হইয়া যাউক চিঠিগুলি টেবিলে জমা হইয়া থাকিত, 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিয়ু'র কাজ শেষ হইলে ছুটির দিনে তিনি চিঠির জবাব লিখিতে বসিতেন। অবনীনাথ, রায় লিখিয়াছেন, "এমন নিষ্ঠাসম্পন্ন পত্রের উত্তরদাতা ওঁদের প্রতিষ্ঠার জগতে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কেউ ছিলেন না।" বিধাতা তাঁহাকে কী দিয়া গড়িয়া ছিলেন, বুঝিতে পারিতাম না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি যেমন বজ্রের মতো কঠোর, প্রেমে তেমনই কুসুমের মতো কোমল ছিলেন।

তাঁহার পূর্বতন ছাত্ররা তাঁহার বিশেষ প্রিয় পাত্র ছিলেন। এলাহাবাদে পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন তাঁহার একজন ছাত্র ছিলেন। এই ছাত্রটি তখন খ্যাতনামা ছিলেন না, কিন্তু তিনি

ছাত্রাবস্থায় কিরূপ পোশাক পরিয়া আসিতেন, গুরুর তাহা আজীবন মনে ছিল। শ্রীমতী উষা বিশ্বাস লিখিয়াছেন, "তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় শান্তিনিকেতনে। বোধ হয় সেটা ১৯৩০ কিংবা ১৯৩১ সাল হবে। কথাপ্রসঙ্গে আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা তখন বললাম—আমাদের বাবা সিটি কলেজে তাঁর কাছে পড়েছিলেন। খানিকক্ষণ তিনি স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন, পরে লজ্জিত হয়ে বললেন, 'কই, মনে করতে পারছি না ত। আজকাল বুড়ো হয়ে স্মরণশক্তিটা কমে যাচ্ছে। নইলে ছাত্রদের নাম তো আমি কখনো ভুলতাম না।' পরে বলেছিলেন, 'দ্যাখো, তখন কিছুতেই তোমার বাবার কথা মনে করতে পারলাম না। তোমরা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ ভাবলাম, তারপর সব কথা মনে পড়ে গেল। বুড়ো হলে মানুষের স্মরণশক্তি কী রকম কমে যায়'।" অবনীনাথ রায়ও লিখিয়াছেন, "তিনি তাঁর ছাত্রদের নাম ভুলতেন না। (কোনো চিঠিতে) পরমানন্দ চক্রবর্তী সই দেখে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ কী চল্লিশ বৎসর পরেও তাকে চিনেছিলেন।" তিনি উনিশ-কুড়ি বৎসর অধ্যাপনার কাজ করিয়াছিলেন, কত ছাত্রই তাঁহার কাছে পড়িয়াছিলেন। এত জনের নাম এত দিন ধরিয়া মনে রাখা মানুষের পক্ষে সম্ভব বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিবে না।

বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, "তাঁহার চিত্ত খুব স্নেহপ্রবণ ছিল। আমার পরিবার বা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কাহারো সহিত তাঁহার এক-আধ বারও দেখা বা পরিচয় হইয়া থাকিলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহার নাম উল্লেখ করিয়া কুশল প্রশ্ন করিতেন। রোগশয্যাতেও তাঁহাকে ইহা করিতে দেখিয়াছি। তিনি সকলকে মনে রাখিয়াছিলেন।"

তাঁহার এই ব্যক্তিগত প্রীতি কেবল যে বাঙালিদের প্রতি, নিজ ছাত্র ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি, নিজ সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি ছিল, তাহা নহে। জাতি-ধর্ম প্রদেশ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে তিনি নিকটের মানুষকে প্রীতিদান করিয়াছেন। তাঁহার বাল্যবন্ধুদের মধ্যে ও স্বদেশী যুগের বন্ধুদের মধ্যে মুসলমান ছিলেন, স্নেহের পাত্রীদের মধ্যে মুসলমান মহিলা ছিলেন, এলাহাবাদের বন্ধুদের মধ্যে আদিত্যরাম ভট্টাচার্য, মদনমোহন মালবীয় প্রভৃতির ন্যায় সনাতনীরা ছিলেন, সি ওয়াই চিন্তামণি, পণ্ডিত সুন্দরলাল প্রভৃতির মতো ভিন্ন প্রদেশবাসী ছিলেন। আমরণকাল রেভারেন্ড জে. টি. সন্ডারল্যান্ড, দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ প্রভৃতি পাশ্চাত্যের মনীষীরা তাঁহার বন্ধু ছিলেন। এশিয়ার সম্পাদিকা গার্ট্রুড এমার্সন তাঁহাকে চিরদিন ভক্তি ও সম্মান করিতেন। 'এশিয়া' পত্রিকায় তাঁহার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বহু লেখা ছাপাইতে সর্বদা ইনি ব্যগ্র হইয়া থাকিতেন। 'এশিয়া'র এই সকল প্রবন্ধ পড়িয়া মহাত্মা গান্ধী মুগ্ধ হইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লেখেন, "Your article in Asia...interested me deeply.'

অ্যান্ড্রুজ সাহেব যে রামানন্দকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো দেখিতেন সেকথা পূর্বেই বলিয়াছি। কামাল পাশার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না কিন্তু বাংলা ১৩২৯ সালে কামাল পাশার জয়ে তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত উইন্টারনিট্জ্, লেজনি ও বিশেষ করিয়া স্টেন কোনো প্রভৃতির সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব হয় এবং সম্ভবত চিরস্থায়ী হয়। এলাহাবাদের Homersham Coxও তাঁহার এইরূপ বন্ধু ছিলেন শুনিয়াছি।

রামানন্দ যখন জেনিভাতে ছিলেন তখন ডা. রজনীকান্ত দাস মহাশয়ের আমেরিকান পত্নী তাঁহার রোগশয্যায় কন্যার মতো সেবা করিয়াছিলেন। এই মহিলা (সোনিয়া দাস) তাঁহার শেষ অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া লেখেন, "আমাদের কাছে আপনিই ভারতবর্ষ।" (India to us is really you)।

সকলেই জানেন, রামানন্দ স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। এই স্বদেশপ্রেমের উৎপত্তি আপনার জন্মভূমির নিভৃত কোণের প্রতি ভালবাসা হইতে। বাঁকুড়ার মাটি-জল-হাওয়া তাঁর কাছে স্বর্গের চেয়েও প্রিয় ছিল। বাঁকুড়ার বনভূমির কথা, স্বভাব-সৌন্দর্যের কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। বৃদ্ধ বয়সেও বাঁকুড়ার গল্প, শুশুনিয়ার পাহাড়ের গল্প, বাল্যবন্ধুদের গল্প তাঁহার প্রিয় ছিল। বাঁকুড়ায় তাঁহার যে দুই-একজন বাল্যবন্ধু আছেন, বিশেষ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে এই সকল গল্প করিয়া তিনি আনন্দ পাইতেন। শেষজীবনে যখন জানিলেন যে তিনি আর হাঁটিতে পারিবেন না, তখন কতবার আত্মীয়-বন্ধু এবং চিকিৎসকদের বলিয়াছেন, "আমি যদি ভালো হই, তবে আমার wheel chair-এ করে বাঁকুড়ার কোন পথ দিয়ে কোথায় যাব সব ঠিক করে রেখেছি।" মানুষের প্রকৃত পরিচয় তাহার জীবনের অনেক ছোটোখাটো ঘটনা হইতে পাওয়া যায়। রামানন্দ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইবার পর বলিতেন, "যদি ভালো হয়ে উঠি, একবার বাঁকুড়া, এলাহাবাদ, শান্তিনিকেতন আর ঘাটশিলা যাব।" এই জন্মভূমি ও জন্মভূমির মতো প্রিয় স্থানগুলি দেখিবার ইচ্ছা কি কোনো উচ্চাভিলাষ হইতে জাত? ইহাতে কি কোনো খ্যাতি-প্রতিপত্তির আশা ছিল? ইহা পুরাতন পবিত্র স্মৃতির প্রতি মমতা ও বিশুদ্ধ প্রীতি মাত্র। ইহা অপেক্ষা বড়ো কোনো লোভ তাঁহার মনে ছিল না। মৃত্যুকে আসন্ন মনে করিয়া তিনি বলিতেন, "বাঁচিয়া থাকিবার লোভ সকলের হয়, কিন্তু বেশি লোভ করা ভালো নয়।"

বাঁকুড়া তাঁহার জন্মভূমি ছিল বলিয়াই বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ, বাঁকুড়ার দারিদ্র্য তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক বিচলিত করিত। দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য, গ্রামের উন্নতির জন্য, বাঁকুড়ার শিল্পের উন্নতির জন্য, বাঁকুড়ায় কাপড়ের কল ইত্যাদি স্থাপনের জন্য তিনি সতত উৎসাহী ছিলেন এবং নিয়ত পরিশ্রম করিয়াছেন। বাঁকুড়া সম্মিলনী ও ১৩২৯ সালে স্থাপিত বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুলের জন্য তাঁহার চিন্তার শেষ ছিল না, কাজও অজস্র ছিল। বাঁকুড়া সম্মিলনীর সভ্যবৃন্দ তাঁহার রোগশয্যাপার্শ্বে শেষ অভিনন্দন দিবার সময় তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছেন। তিনিই ইহার সভাপতি ছিলেন। তাঁহারা বলেন :—

> "পরদুঃখকাতর স্বদেশানুরাগী সাত্ত্বিক সেবকদের দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় আর্তত্রাণ কার্যকালে আপনার সাত্ত্বিক সেবাভাবের লেখনীই সম্মিলনীর সেবাকার্য পরিচালনার্থে ভিক্ষার আবেদন জগতের সর্বত্র সহৃদয় ব্যক্তিগণের মর্মস্পর্শ করাইয়া সম্মিলনীর সেবাকার্য সম্প্রসারণ করিয়াছে। মেডিক্যাল স্কুল হাসপাতালের সেবাকার্য পরিচালনা সম্পর্কেও আপনার উপস্থিতি, সারগর্ভ উপদেশ এবং বিনয়পূর্ণ অথচ নির্ভীক লেখনীই সরকারি কর্মচারিগণের ভাবান্তর প্রশমনপূর্বক আবশ্যকমতো তাঁহাদের সহযোগিতা বজায় রাখিয়া সম্মিলনীর বেসরকারি বিশিষ্টভাব এখনও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। সেই জন্যই প্রাদেশিক উচ্চতম পদস্থ মাননীয় গবর্নর বাহাদুর হইতে সর্বপ্রকার পদস্থ সরকাবি কর্মচারিগণ এই সমিতির বেসরকারি বিশিষ্ট ভাবকে জনসাধারণের উদাহরণ-স্থল বলিয়া মন্তব্যও প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেই জন্যই তদ্ভাবাপন্ন বর্তমান সময়ের আদর্শ মহাপুরুষ মহাত্মা গান্ধী, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং রসায়নশাস্ত্র-চূড়ামণি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং অন্যান্য সরকারি বেসরকারি মহাপুরুষ ও পদস্থ পরিদর্শকগণের পদধূলি সহ ঐরূপ মন্তব্যলাভ করিয়া এই সেবানুষ্ঠানটি এখনও ধন্য হইয়া আছে।" বাঁকুড়া সম্মিলনীর সেবাকার্যের কথা ইতিপূর্বেও বলা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে বাঁকুড়ায় লইয়া যাইবার প্রধান উদ্যোগীদের মধ্যে রামানন্দ ছিলেন।

শান্তিনিকেতনও তাঁহার এই রকম আর-একটি প্রিয় স্থান ছিল। এখানকার সকল

হিতচেষ্টার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে তাঁহার আদর্শের যতখানি সহায় হওয়া রামানন্দের সাধ্যে ছিল ততখানি সহায় তিনি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এই সহায়তার আরও একটি বিশিষ্ট রূপ দেখা যায়। মাতা যেমন করিয়া পিতৃহীন সন্তানকে বুক দিয়া আগুলিয়া রাখে, তেমনি করিয়া তিনি বিশ্বভারতীকে সকল অমঙ্গল হইতে আগুলিয়া রাখিতে চাহিতেন। তিনি শুধু যে সেইদিন হইতে কলিকাতায় এবং ভারতবর্ষের নানাস্থানে যখন যেখানে গিয়াছেন সেইখানেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অপরের দ্বারা আহুত সভায় রবীন্দ্রজীবনের মহত্ত্ব, রবীন্দ্র-কাব্যের উপজীব্য, রবীন্দ্র-আদর্শের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে এবং পাশ্চাত্য দেশে রবীন্দ্রনাথের যে খ্যাতি ও আদর দেখিয়া আসিয়াছেন, সেই সব বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা নয়, অনেক স্থলে স্বয়ং সভা করিয়াছেন এবং সর্বোপরি যখন যেখানে যাহাতে বিশ্বভারতীর ক্ষতিকর কিছু হইতে দেখিয়াছেন, সেখানে সিংহবিক্রমে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, গোপনে কোনো অনিষ্টকর চেষ্টার খবর পাইলে ওই বৃদ্ধ বয়সে নিজে কী করিয়া তাহার প্রতিকার করিতে পারেন, তাহার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। ইহার ভিতর যে সকল চেষ্টা প্রকাশ্যে হয় নাই, তাহার কথা সকলে জানেন না। কিন্তু এই সকলের চেয়েও প্রাণস্পর্শী ছিল শান্তিনিকেতনের মাটির প্রতি তাঁহার টান। বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদক (মাঘ-চৈত্র ১৩৫০) লিখিয়াছেন—

> "এই সকল তথ্যের চেয়েও আমাদের পক্ষে আজ স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথেব প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা যা ক্রমশ সুনিবিড় প্রীতিতে পরিণতি লাভ করেছিল, এবং শান্তিনিকেতনের প্রতি তাঁর অনুরাগ—শুধু আদর্শের প্রতি নয়, এখানকার মাটির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ; অকালে পরলোকগত প্রাণপ্রিয় কনিষ্ঠ পুত্রের স্মৃতিতে এই অনুরাগ বিশেষ একটি বেদনাব রাগে রঞ্জিত হযেছিল ; হৃদয়ের গভীর ভাব মেলে ধরবার মানুষ রামানন্দবাবু ছিলেন না, কিন্তু মনে পড়ে, কিছুদিন পূর্বে তিনি যখন একবার শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, হয়ত তখনই তিনি বুঝেছিলেন, এখানকার মাটি-জল-হাওয়ার মধ্যে আর তিনি ফিরে আসতে পারবেন না—শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে, নানা অপবিচিত বিস্মৃত প্রান্তে তখন তিনি ঘুবে বেড়াতে চাইতেন; বহুদিন তিনি এখানকার অধিবাসী ছিলেন, সেই সব দিনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ, তাঁব পুত্র প্রসাদের প্রাণোচ্ছল মূর্তি, বিগত জীবনের নানা স্মৃতি হয়ত তাঁকে আবিষ্ট করত। কঠিন রোগের মধ্যেও তাঁর মনে আকাঙক্ষা ছিল, শান্তিনিকেতনে যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন তাঁদের কাছে সেই আশা তিনি প্রকাশ করতেন—মৃত্যুর পূর্বে আর-একবার শান্তিনিকেতনে যেতে তাঁর ইচ্ছা করে। সে বাসনা তাঁর পূর্ণ হয় নি।"

গ্রাম্য প্রকৃতির প্রতি রামানন্দের ভালোবাসা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আমরা জানি ঘাটশিলার প্রতি তাঁহার অনুরাগও শুধু ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য ছিল না। ইহা পত্নীর পবিত্র স্মৃতিতে অনুরঞ্জিত ছিল।

তাঁহার যৌবনকালের কর্মভূমি এলাহাবাদের সহিত তাঁহার কত সুখদুঃখের স্মৃতি জড়িত ছিল এবং কী গভীর অনুরাগের সহিত প্রতি বর্ষেই প্রায় তিনি সেই প্রিয়ভূমি দেখিতে যাইতেন, পূর্বেই বলিয়াছি।

তাঁহার বাল্যবন্ধুদের প্রতি আশ্চর্য ভালবাসা ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর বাঁকুড়া হইতে তাঁহার বাল্যবন্ধু হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—"বহু বৎসর দেখা হয় নাই। পেনসনের পর বাঁকুড়ায় সাক্ষাৎ হয় (১৯৪২)। তখনও আমি (বাল্যকালের) সেই হেম, আর জগদ্বিখ্যাত হইলেও সে আমার কাছে সেই রামানন্দ। শেষ জীবনে আমাদের বাল্যকালের খেলা ও শুশুনিয়া পাহাড়ে যাওয়ার কথা বলিতে বড়োই ভালোবাসিত।"

তাঁহার বন্ধুপ্রীতির বহু নিদর্শন তিনি জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন পূর্বেই দেখিয়াছি। যৌবন ও বার্ধক্যের বন্ধু পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্যের (শাস্ত্রী) সহিতও তাঁহার এমনই প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। সেই সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যের আলোচনা বড়ো ছিল না, তুচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাসূত্রে দুই বন্ধুর মধ্যে যে প্রীতির বন্ধন বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহারই বার বার অনুবৃত্তি সেখানে বড়ো ছিল। সারনাথে কবে শাস্ত্রীমহাশয়ের রান্না খাইয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কবে মনোরমা দেবীকে জাপান হইতে ঘাসের চটি আনিয়া দিয়াছিলেন, রাজনারায়ণ বসু কবে কোন শিশুকে দেখিয়া "Jivan is full of জীবন" বলিয়াছিলেন, এই সব ছোটো ছোটো অতি প্রিয় গল্প, তাঁহার জীবনের যে যে মুহূর্তকে আনন্দময় করিয়াছিল, এই জীবন ছাড়িয়া যাইবার পূর্বে সেই প্রিয় দিন ও মুহূর্তগুলিকে স্মরণ করিবার জন্যই, তিনি করিতেন। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্বে যখন বারে বারে তাঁহার স্মৃতিশক্তি আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছিল, তখনও তিনি তাঁহার এক স্নেহভাজন বন্ধু রামনলিনী চক্রবর্তীর চিঠি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতে বলেন।

আমাদের দেশের অসাধারণ পরিশ্রমী মানুষদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামানন্দ। যৌবনে তিনি কিরূপ পরিশ্রম করিতেন তাহার কিছু পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। দৈনিক দশ-বারো ঘণ্টা মানসিক পরিশ্রম তাঁহাকে পঁচাত্তর বৎসর বয়সেও অনেকেই করিতে দেখিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে এই জাতীয় মানসিক পরিশ্রমের সহিত শারীরিক পরিশ্রমও জড়িত থাকে। তিনি ভোরবেলা সকলের আগে শয্যাত্যাগ করিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিতেন, জলখাবার খাইবার জন্য আধ ঘণ্টারও কম সময় দিয়া বারোটা-একটা পর্যন্ত একটানা কাজ করিয়া যাইতেন, যদি-না কেহ দেখা করিতে আসিয়া কাজে বাধা দিত। এই কাজের মধ্যে একবার আপিস পরিদর্শনে যাওয়াও ছিল। জীবনের শেষ কুড়ি-পঁচিশ বৎসর স্নান আহারের পর ঘণ্টা দেড় কী দুই বিশ্রাম করিতেন, পঞ্চান্ন-ছাপান্ন বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহাও করিতেন না। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু' প্রকাশের সময় মাসে দুই সপ্তাহ বিকালে সন্ধ্যায় এবং রাত্রেও কাজ করিতেন, কেবল রাত্রের আহারের পর কাজ ছাড়িয়া দিতেন। যে দুই সপ্তাহ ঘরে টেবিলের ধারে এবং আপিসে কাজ তাঁহার কম থাকিত, সেই দুই সপ্তাহ তিনি রাজ্যের চিঠি জড়ো করিয়া জবাব দিতে বসিতেন, নয়ত ক্বচিৎ কোনো নবীন সাহিত্য-সেবীকে কাছে বসাইয়া তাহার লেখা আগাগোড়া কাটিয়া নিজেই লিখিয়া দিতেন, অথবা কাহারও প্রেরিত লেখা অনুরোধে পড়িয়া ঘষিয়া-মাজিয়া প্রকাশযোগ্য করিয়া দিতেন, নয়ত কোনো নবীন কী প্রাচীন গ্রন্থকারের পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে বসিতেন, কোনো চাকুরিপ্রার্থীকে সার্টিফিকেট দিতেন। কত নবীন ও প্রবীণ লেখক যে এই-সকল নানা কারণে তাঁহার নিকট ঋণী তাহার হিসাব তিনি রাখিতেন না ; লেখকেরা স্বীকার করিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমল হোম কিছু সাক্ষ্য দিয়াছেন। কিন্তু শুধু এইটুকুই সব ছিল না। ইহার চেয়ে বড়ো এবং কষ্টকর কাজ ছিল, তাঁহার ভারতভ্রমণের কাজ ও সভায় সভায় সভাপতিত্ব করার কাজ। জীবনের শেষ বৎসর অধিকাংশ দিন তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, তৎপূর্বে ষোলো বৎসর ইউরোপ, ব্রহ্মদেশ, পশ্চিম বাংলা, পূর্ব বাংলা, উত্তর বাংলা, শ্রীহট্ট, আসাম, রাজপুতানা, বোম্বাই প্রদেশ, সাঁওতাল পরগণা, অন্ধ্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, বেহার, গোরখপুর, লুম্বিনি, বুদ্ধের পরিনির্বাণ-স্থান, মোহেঞ্জোদাড়ো, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের নানা শহর ও গ্রামে তিনি গিয়াছেন। ইউরোপে তিনি একবারই গিয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার যাইবার সম্পূর্ণ আয়োজন হইয়াছিল মদনমোহন মালবীয়ের সহিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে বিলাতে কাজ করিবার জন্য। কিন্তু মালবীয় মহাশয় না যাওয়ায় তাহা বন্ধ হইয়া যায়।

World Fellowship of Faiths উপলক্ষে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দেও তিনি আর-একবার ইউরোপে নিমন্ত্রিত হন, কিন্তু যাইতে পারেন নাই। যাহাই হউক, ভারতের প্রতি প্রদেশের প্রায় প্রতি বড়ো শহরে ও অসংখ্য ছোটো ছোটো গ্রাম ও শহরগুলিতে তিনি যে বারে বারে দেশেরই নানা কাজে গিয়াছেন, তাহার পরিচয় ভারতবাসীরাই দিতে পারিবেন। ভারতের উন্নতিমূলক সমস্ত মঙ্গল কাজের সহিতই তাঁহার যোগ ছিল। জাতীয় সংস্কৃতির সাধনাও তাঁহার জীবনব্রত ছিল। কাজেই তিনি যে শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে নিমন্ত্রিত হইতেন, তাহা শুধু রাজনৈতিক সভার জন্য নয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষানৈতিক, সাহিত্যিক, ধর্মবিষয়ক ও সাংস্কৃতিক সকল রকম মঙ্গল প্রচেষ্টার জন্য। মাসে দুইবার মাত্র পাঁচ দিন-ছয় দিন করিয়া দশ-বারো দিন তাঁহার কাগজের কাজ একটু হালকা থাকিত। সেই সময়টুকু বিশ্রাম না করিয়া একষষ্টি বয়সের পর তিনি নূতন করিয়া কি কাজে নামিলেন? বার্ধক্য ও শ্রান্তির বাধা অনায়াসে অতিক্রম করিয়া তিনি গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে জাতির কল্যাণ-প্রচেষ্টায় ঘুরিতে লাগিলেন। আমরা দেখিয়াছি—বাংলা ১৩৩৯ সালের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে তিনি বোম্বাই, পুনা, মালদহ, দিল্লি, এলাহাবাদ (দুইবার), নাগপুর, রাজশাহি, কুমিল্লা (দুইবার), মৈমনসিং, ঢাকা, ঝাড়গ্রাম, কাশিমবাজার, ওয়ালটেয়ার, ভিজাগাপাটম ও মজঃফরপুরে কাজে গিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে, কয় মাসেই কলিকাতার বাহিরে তাঁহাকে সতেরোবার যাইতে হইয়াছিল। তিনি সঙ্গে কোনো সেক্রেটারি লইতেন না, সেক্রেটারি কখনো রাখেন নাই, ভৃত্যও লইতেন না, একলাই দেশ-বিদেশে ঘুরিতেন। নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেই গুছাইয়া সামলাইয়া বেড়াইতেন। পঁচাত্তর বৎসর বয়সেও এইরূপ সঙ্গীহীনভাবে তিনি কলিকাতা হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত গিয়াছেন এবং সেখানে কাজ সারিয়া ফিরিয়াছেন। শুনিয়াছি, কখনো কখনো কেহ কেহ তাঁহাকে সঙ্গে লোক লইতে বলিতেন এবং কমিটির পক্ষ হইতে সঙ্গীর খরচ দিতে চাহিতেন। কিন্তু তিনি তাহা লইতেন না। সেইরূপ একটি সভার কথার সূত্রে শ্রীঅবনীনাথ রায় লিখিয়াছেন, "তাঁর ভদ্র মন নিজের বিপদকেও তুচ্ছ করে পরের (সভাসমিতির) অর্থ বাঁচাত।" বাড়ির কোনো চাকরকে সঙ্গে লইতে বলিলে তিনি বলিতেন, "ওরা আমাকে কি দেখবে? আমাকেই ওদের তদারক করতে হবে।" বাস্তবিক দেশভ্রমণে উৎসাহী তিনি ছিলেন না, কর্তব্যবোধেই তাঁহাকে ভ্রমণ করিতে হইত, তবু অনেক স্থলে তিনি নিজের পাথেয়ও লইতেন না। বাংলা ১৩৩৬-এ তিনি যখন রংপুরে সাহিত্য-পরিষদের কোনো অধিবেশনে সভাপতি হইয়া যান, তখনকার বিষয়ে কবিশেখর প্রকাশচন্দ্র চৌধুরী লিখিয়াছিলেন :—"প্রশান্ত সৌম্যদর্শন ঋষি রামানন্দের জয়ধ্বনিতে স্টেশন মুখরিত করে তুললাম।...বিদায়কালে পাথেয় নিতে অস্বীকার করলেন। বললেন, 'আপনাদের সাহচর্যে যে পাথেয় পেয়েছি, সমস্ত জীবনে তার ঋণ শোধ করতে পারব না।' কি প্রাণপূর্ণ মমতা!"

বাংলা মাসের গোড়ায় এক সপ্তাহ ছুটি পাইয়া তিনি কী কী কাজ করিতেন, তাহার সামান্য আভাস দুই-একটা চিঠি হইতে পাওয়া যায়। (ইং ১৮-২-৩৪) লিখিতেছেন, "আমাকে আজ বিকালে নিমতায় বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ উপলক্ষে প্রার্থনা করিতে হইবে। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার সভাবাজারে পরমহংস দেবের জন্মদিনের সভায় সভাপতির কাজ করিতে হইবে।" ১৯ ও ২০ অন্য কাজ সারিয়া (২১-২-৩৪) লিখিতেছেন, "কাল সকালে চট্টগ্রাম যাচ্ছি, একটা কটন মিল প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে। ২৪শে রাত্রে ফিরে আসব।"

লোকে তাঁহাকে সাংবাদিক বলে। কিন্তু তিনি কি সাংবাদিক মাত্র ছিলেন? তাঁহার আদর্শে, ব্যক্তিত্বে, মানবতায়, কর্মে তাহা অপেক্ষা অনেক বড়ো তিনি ছিলেন। মহামানবতার প্রচার তাঁহার ধর্ম ছিল। এই উদ্দেশ্যেই মাসিক পত্রিকায়, অন্যান্য সংবাদপত্রে, পুস্তিকায়, সাংস্কৃতিক সভাসমিতিতে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, ধর্মসংস্কারে, গ্রামোন্নয়নে, অবনত সম্প্রদায়ের উন্নতি-প্রচেষ্টায়, নারী-প্রগতিতে, জাতীয় আর্থিক উন্নতি-কার্যে অখ্যাত কত মানুষকে কতরকম সাহায্যদানে এবং ব্যক্তিগত জীবনের নানা ক্ষেত্রে তিনি সাধনা করিয়াছিলেন। নানা ক্ষেত্রে তাঁহার পরিশ্রমেই তাহার পরিচয়। কলিকাতায় কয়েক বৎসর এমন গিয়াছে যখন তাঁহাকে সভাপতি করিতে না পারিলে কোনো সভা নিজেদের কাজকে সার্থক মনে করিতেন না। এইজন্য বাংলা ও ইংরেজি মাসের গোড়ায় অনেক সময় দিনে তিন-চারিটা সভায় প্রত্যহ তিনি নেতৃত্ব করিয়াছেন।

মানসিক পরিশ্রমই যে তিনি শুধু করিতেন তাহা নয়, শারীরিক পরিশ্রমও তাঁহার অবস্থা ও বয়সের পক্ষে বেশিই করিতেন। তিনি এমন পরিচ্ছন্নতার অনুরাগী ছিলেন যে অপরের কাচা কাপড় তাঁহার পছন্দ হইত না। প্রায় ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত নিজের কাপড়-জামা নিজে কাচা তাঁহার অভ্যাস ছিল। তিনি ইংরাজি চিঠিও কখনো type করাইয়া লিখিতেন না, সবই স্বহস্তে লিখিতেন। প্রথম যৌবনে অর্থাভাবে ভালো বই হাতে নকল করিয়া দেশে পত্নীকে পড়িতে পাঠানো তাঁহার অভ্যাস ছিল ; কোনো রচনা হইতে বচন উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন হইলে অনেক সময় নিজেই পাতার পর পাতা নকল করিয়া লইতেন। কাহারও সহিত দেখা করিবার প্রয়োজন হইলে বৃদ্ধ বয়সেও কত সময় মাইল-দুই হাঁটিয়াই চলিয়া যাইতেন। নিজের কাগজপত্র বই সব নিজে গুছাইতেন ও দেখিতেন, ছুটির সময় কোথাও গেলে পৌঁছিবার দিনই নিজের বই কাগজপত্র সব নিজে বাক্স হইতে বাহির করিয়া নূতন জায়গায় টেবিলে যথাস্থানে রাখিতেন, একদিনও আলস্য করিয়া দেরি করিতে তাঁহাকে দেখা যাইত না। অথচ সচরাচর দেখা যায় বিদেশে গেলে সব মানুষই প্রথম দুই-চারি দিন আলস্যে কাটাইয়া দেয়।

মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার কাগজগুলির সম্পাদকীয় মন্তব্য তিনি সব স্বয়ং লিখিয়াছেন, সমস্ত চিঠিপত্রও নিজে লিখিয়াছেন। কঠিন রোগে যখন তিনি একেবারে অক্ষম হইয়া পড়েন তখন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া অনেকে বলিতেন, "এক মাস আগে পর্যন্ত আপনার লেখা দুটি কাগজে পড়িয়া একবারও ভাবিতে পারি নাই যে, আপনি এতটা পীড়িত।" তিনি সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হইবার আগে পর্যন্ত নিজে অনেক চিঠি লিখিয়াছেন, প্রবন্ধাদির কিছু কিছু ব্যবস্থা করিয়াছেন, আপিসের বৈষয়িক ব্যাপারেরও খোঁজ নিয়মিত লইয়াছেন। যখন আর বিছানা হইতে উঠিতে পারিতেন না, তখন কন্যা, জামাতা, দৌহিত্রীদের দিয়া, দেশে এবং বিদেশে ইউরোপ আমেরিকায় পর্যন্ত 'মডার্ন রিভিয়ু' 'প্রবাসী'র লেখকদের, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বন্ধুদের, রাজবন্দী অনুরক্তদের, তাঁহাদের অসহায় স্ত্রী-পুত্রদের, বাঁকুড়ার কর্মী ও আত্মীয়দের, বলিয়া বলিয়া চিঠি লিখাইয়াছেন ; লেখা হইয়া গেলে চিঠি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতে হইত, পরিবর্তন প্রয়োজন হইলে স্বয়ং বলিয়া দিতেন। রোগযন্ত্রণা যখনই সামান্য কমিত, তখনই নানা কাজের চিন্তায় তাঁহার মন ধাবিত হইত। কী বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখানো প্রয়োজন, রবীন্দ্র-সংখ্যায় কাহার লেখা দেওয়া দরকার, মনোরমা দেবীর মৃত্যু মাসে তাঁহার বিষয় 'প্রবাসী'তে কী লেখা দেওয়া উচিত, তাঁর শ্রাদ্ধদিবসে কি করা উচিত, কাহার লেখা অনেক দিন বাহির হয় নাই, কাহার লেখা

পাইয়াও প্রকাশ করিতে দেরি হইতেছে ইত্যাদি নানা ভাবনায় তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন এবং এই কাজগুলি কবাইবার জন্য বাড়ির লোকদের ক্রমাগত তাগিদ দিতেন। শয্যাশায়ী রামানন্দের দুই-একখানি চিঠির নমুনা দেখিলে কেহ অনুমান করিতে পারিবেন না যে এই সময় তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২।৩ ঘণ্টার বেশি ঘুমাইতে পারিতেন না এবং একটানা ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোগযন্ত্রণায় কাতরোক্তি করিতেন। Iowa University-র অধ্যাপক ডা. সুধীন্দ্র বোসকে ১৮ মার্চ (১৯৪৩-এ) লিখিত।

Dear Dr Bose,

It is after a long time that I write to you. I have been suffering the agonies of an obstinate form of eczema for about a year and a half, and latterly I have been absolutely bed-ridden owing to a fracture of a hip-bone.

I hope Mrs. Bose and yourself are doing well. This letter goes to you by air mail, the Modern Review will henceforth be dispatched to you by ordinary mail.

The magazine has not had the advantage of your brilliant articles for a long time. I shall be obliged if you can now kindly send me one by air mail.

With kind regards and the best wishes.

Yours very sincerely,
Ramananda Chatterjee.

এই সব চিঠি লিখাইবার সময় তিনি নিজের নাম সহি করিতেও অত্যন্ত কষ্ট পাইতেন। সেই জন্য অপরে তাঁহার হইয়া সহি করিয়া দিতেন। রেভারেন্ড জে টি সন্ডারল্যান্ডের পুত্র ডা. সন্ডারল্যান্ডকে একই দিনে লেখেন,

Dear Dr. Sunderland,

I am highly obliged to you for your kind letter. I am very glad that you approve of the form in which your revered father's book "Emerson and His Friends" has been published by me Please sccept my grateful thanks for the kind contribution of Rs. 70/- which you have made towards the cost of its publication

With kind regards and the best wishes.

Yours sincerely,
Ramananda Chatterjee
P.P.S.K.Chowdhury.

ঘাটশিলায় রামানন্দের স্মৃতিসভায় অ্যাডভোকেট পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন,

"সাবরমতি অথবা শান্তিনিকেতনের মতো কোনো বাস্তব প্রতিষ্ঠান গড়িয়া রামানন্দ নিজের নাম চিরন্তন রাখিতে চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠান তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহারই সেবার মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে—সে প্রতিষ্ঠান যুগে-যুগান্তরে মানুষের হৃদয়রাজ্যে চির অধিকার লাভ করিবে। সত্য সন্ন্যাসীর আদর্শ আশ্রমে নিবদ্ধ নয়ত ঐ কথা রামানন্দেব মতো ঋষি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু তথাপি এমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান দেশে নাই যাহার সঙ্গে রামানন্দের যোগ ছিল না বা যাহার ভিতর দিয়া নিঃস্বার্থ কর্তব্য পালনে তিনি বিরত ছিলেন। তাঁহার মানস আশ্রমের পিছনে ছিল না জনসাধারণের অজস্র দান, তাহার প্রতিষ্ঠায় ছিল রামানন্দের প্রতি বিন্দু রক্ত।"

সকল কাজ নির্ভুল ও নিখুঁত করিয়া করা রামানন্দের নিয়ম ছিল। পরিপূর্ণ মানবতা যেমন জীবনে তাঁহার আদর্শ ছিল, কাজেও তেমনি নিখুঁত কাজই করিবার প্রাণপণ চেষ্টা তাঁহার

ছিল। কাগজের মাথায় লেখা থাকিবে বৈশাখ অথচ তাহা প্রকাশিত হইবে জ্যৈষ্ঠে—ইহা তিনি ঐ জন্যই সহ্য করিতে পারিতেন না। তাই প্রত্যেক মাসের পয়লা কাগজ বাহির হইবেই, তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল। ইহার ফলে বাংলা দেশের সকল প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রই প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেষ্টায় পরে এমনি নিয়মিত বাহির হইতে বাধ্য হয়।

এই কারণেই বাংলা বই কিংবা কাগজে ইংরাজি কথা কী বচন লেখা তিনি পছন্দ করিতেন না, যেখানে ইংরাজি না লিখিলে চলে না সেখানে সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাংলা অনুবাদ দিতে হইবে এই নিয়ম তিনিই প্রচলিত করেন, তিনিই সর্বত্র ইংরাজি ও অন্য বিদেশি ভাষার শব্দকে বাংলা পুস্তকাদিতে বাংলা অক্ষরে লেখার প্রথা প্রবর্তিত করেন। যে-বাঙালি বাংলা লিখিতে ও পড়িতে পারেন তাঁহাকে বিশেষ কোনো কারণ না হইলে তিনি কখনো ইংরাজিতে চিঠি লিখিতেন না, ইংরাজি চিঠিরও জবাব বাংলায় অনেককে দিতেন, যদি জানিতেন যে তাঁহাকে ইংরাজিতে লিখিবার কোনো প্রয়োজন নাই। নিজের অফিসে 'প্রবাসী'র এমন কী 'মডার্ন রিভিয়ু'-এর সকল কাজের নির্দেশ বাংলায় লিখিয়া পাঠাইতেন, কারণ লেখক এবং পাঠক উভয় পক্ষই বাঙালি।

চিঠি লিখিবার সময় তারিখ, পুরা ঠিকানা, অজ্ঞাত অখ্যাত গ্রামের নামেরও ঠিক বানান লিখিতে তিনি কখনো ভুল করিতেন না। যদি তাঁহার চিঠির সঙ্গে অপর কেহ নিজের চিঠি ডাকে দিতে চাহিত, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই চিঠিটিরও তারিখ, ঠিকানা, কমা, সেমিকোলোন, বানান সমস্ত সংশোধন করিয়া তবে ডাকে দিতেন, অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিলেও এই সংশোধনগুলি না করিয়া তিনি ছাড়িতেন না।

এই কারণে তিনি কোনো সংবাদ কাগজে লিখিলে অথবা মুখে জানাইলে তাহা যে নির্ভুল এ-বিষয়ে মানুষ নিশ্চিন্ত থাকিত। এবং এই কারণেই পরিচিত-অপরিচিত বহু লোক খাঁটি খবর জানিবার জন্য তাঁহাকে যখন-তখন চিঠি লিখত। এমন চিঠিও দেখা গিয়াছে যাহাতে লোকে ঘাটশিলায় বাড়ি করিলে কত খরচ পড়ে, সেখানে গরমে মেঝে ফাটিয়া যায় কিনা, ইত্যাদি নানা বৈষয়িক বিষয়ে তাঁহার নিকট খোঁজ করিতেছেন। এইসব লোকেরা অনেকেই তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাঁহাকে লোকে যে সব চিঠি লিখিত তাহার জবাব দেওয়া হইয়া যাইবামাত্র, চিঠিগুলি তিনি ছিঁড়িয়া ফেলিতেন এবং বিশেষ প্রয়োজন না হইলে তৎপূর্বে কাহাকেও সেগুলি দেখাইতেন না। তাহা না হইলে অসংখ্য বিচিত্র প্রশ্নের তালিকা দেওয়া যাইত। আমাদের দেশের এখনকার অনেক গণ্যমান্য লোকের লেখা এবং তাঁহাদের দেওয়া সংবাদ দেখিলে মনে হয় ইহার কতখানি সত্য কে জানে? রামানন্দের সম্বন্ধে এই সন্দেহ কেহ করিতেন বলিয়া জানি না।

নির্ভুল কাজের দিকে চোখ ছিল বলিযাই জীবনের প্রথম দিক হইতেই Statistics-এর সাহায্যে কাজ করায় তাঁহার ঝোঁক ছিল। আমার মনে হয় আমাদের দেশে তাঁহার পূর্বে এইভাবে কাজ কেহ করেন নাই। 'ধর্মবন্ধু' 'দাসী' (খ্রি. ১৮৯৩) প্রভৃতিতেও ইহার পরিচয় আছে। 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে তো আছেই। বহু পরে শ্রীবিনয়কুমার সরকারের 'আর্থিক উন্নতি' কাগজ ও শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের Statistical Society এ-বিষয়ে কাজ করিয়াছেন।

প্রুফ দেখা বিষয়েও এইজন্য তিনি আশ্চর্য সতর্ক ছিলেন এবং অপরকেও সর্বদা সতর্ক করিতেন। তিনি নিজের লেখার প্রুফ কখনো অপরকে দেখিতে দিতেন না, অপরের লেখার দেখা প্রুফ যদি কখনো হাতের কাছে আসিয়া পড়িত, অযাচিতভাবে তাহাতে চোখ বুলাইয়া

অনেক ভুল আবিষ্কার করিয়া ও সংশোধন করিয়া দিতেন। তিনি বই-এর পাতার মাথার দিকে নজর দিতে নূতন কর্মীদের উপদেশ দিতেন এবং বলিতেন, "গাড়ি চড়িবার সময় লোকে গাড়িটা দেখে কিন্তু উপরদিকে তাকাইয়া গাড়োয়ানের চেহারাটা কেহ দেখে না, তেমনি বই-এর ভিতরের ভুল সবাই দেখে, মাথার দিকটায় নাম ও পৃষ্ঠাঙ্কের ভুল দেখিতে ভুলিয়া যায়।"

চিকিৎসার সময় লোকে ডাক্তার ডাকে কিন্তু ডাক্তারের নির্দেশ পুরা পালন করে না। চারিবার ওষুধ খাইতে বলিলে অনেকে দুইবার খায়, যেদিন হইতে ওষুধ খাইবার কথা হয়ত তাহার পরদিন সেটা কেনে। রামানন্দ এই জাতীয় অবহেলা কখনো করিতেন না এবং অপরকেও করিতে বারণ করিতেন। তিনি ঘড়ি ধরিয়া ঠিক সময় চিকিৎসকের সব নির্দেশ পালন করার পক্ষপাতী ছিলেন। যদি কখনো বিশেষ কারণে না করিতেন, না-করার জন্য চিকিৎসকের নিকট ক্ষমা চাহিতেন।

অসাধারণ ও সাধারণ লেখকেরা বাছা বাছা শব্দ চয়ন করিয়া তাঁহাদের রচনাকে অলংকৃত করিতে চান। যে-সকল রচনা যুক্তি ও তথ্য মূলক রচনা এবং যাহার উদ্দেশ্য সর্বসাধারণকে ছোটো বড়ো নানা বিষয়ে জ্ঞান দান ও চিন্তার রসদ দান, সেখানেও অনেকে এই অলংকারবাহুল্য দেখাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না। কারণ এই জাতীয় লেখার উপমায় অনুপ্রাসে পাঠকেরা পুলকিত হইয়া উঠিয়া লেখককে মস্ত সাহিত্যিক মনে করেন ; লেখকদের তাহাতেই আনন্দ। রামানন্দ কিন্তু তাঁহার এই জাতীয় লেখায় সমস্ত বাহুল্য বর্জন করিয়া চলিতেন। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে অন্য মানুষ যখন লেখে "কৃতান্তরূপী দুর্ভিক্ষদানবের করাল কবলে পড়িয়া কোটি কোটি মানুষ ইহলোকের বন্ধন কাটাইয়া গেল।" তখন রামানন্দের রচনায় এই জাতীয় কথা না দেখিয়া অনেক অল্পবুদ্ধি লোকে মনে করিত "বুঝিবা তিনি 'কৃতান্ত' কিম্বা 'করাল কবল' শব্দ ব্যবহার করিতে জানেন না। তিনি তো আর আমাদের মতো সাহিত্যিক নন, তিনি সাংবাদিক মাত্র।" কিন্তু রামানন্দ হাসিতেন। উপমা কিংবা পদলালিত্য বোঝে না এমন বালকবালিকা, অন্তঃপুরিকা, অল্পশিক্ষিত পুরুষ আমাদের দেশে তো কম নাই। তাহারা প্রত্যেকে তাঁহার কথার ঠিক অর্থটি সম্পূর্ণরূপে বুঝিবে, এই উদ্দেশ্যেই তিনি লিখিতেন। তাহারাই যে দেশের অধিকাংশ। তাই তিনি সাহিত্যিক নাম লইবার এত বড়ো লোভ এবং সেই পথের এত সহজ উপায়টি পরিহার করিয়া কোন শহরের কোন জেলার কোন গ্রামের কত পুরুষ, কত স্ত্রীলোক, কত শিশু ক'দিন কী খাইয়া কীভাবে দিন কাটাইয়াছে তাহারই নির্ভুল বর্ণনা অতি সহজ স্বচ্ছ ভাষায় মানুষকে দিতে চেষ্টা করিতেন, কারণ তিনি জানিতেন ও বলিতেন, "পৃথিবীর অধিকাংশ লোক সাহিত্যিক নহে। তাহাদের দলভুক্ত থাকা দুর্ভাগ্য মনে না করিতে চেষ্টা করাই কর্তব্য।" কিন্তু বাস্তবিক কি তিনি উচ্চদরের সাহিত্যিক ছিলেন না?

নেপালচন্দ্র রায় বলেন, "সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা বর্জনই দেশসেবক ম্যাটসিনির শ্রেষ্ঠ ও মহান ত্যাগ। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার হয় নাই।"

অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ লিখিয়াছেন, "প্রাঞ্জল চিন্তা হইতেই প্রাঞ্জল লিপিকৌশল প্রসূত হয়। তিনি মনোজগতে মন্তব্য বিষয়টিকে উজ্জ্বল আলোকে দর্শন করিতেন, সুতরাং তাঁহার ভাষা সরল, সহজ ও সুখপাঠ্য হইত, অথচ পাঠক উপলব্ধি করিতে পারিতেন না যে, ভাষাটিকে মাজিয়া ঘষিয়া লোকপ্রিয় করিবার জন্য তিনি এতটুকুও শ্রমস্বীকার করিয়াছেন।"

সাহিত্যিক প্রতিভা অসাধারণ না হইলে পৃথিবীর সকল সমস্যা, জ্ঞান ও কৃষ্টির কথা এমন সহজ স্বচ্ছ ভাষায় এতকাল ধরিয়া মানুষ সকল শ্রেণীর মানুষকে দিতে পারে না।

এ বিষয়ে অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের লেখা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি :

"যে অতুলনীয় লিপিভঙ্গিব সাহায্যে মাসের পর মাস ধরে বহু বর্ষ যাবৎ প্রবাসীতে সামাজিক, বাষ্ট্রীয় ও ধর্মাদি নানা বিষয়ের আলোচনা করতেন, তাও তাঁব একটি বিশেষ দান। তাঁব যুবোপ প্রবাসকালে লিখিত সম্পাদকেব চিঠিও এরূপ অনবদ্য ভাষায় লিখিত।... তাঁব বচনা-পদ্ধতির মধ্যে এমন একটি সংযত ও শৃঙ্খলা লক্ষ করা যায় যা কেবল প্রথম শ্রেণীব সাহিত্যিকদেব রচনায়ই সুলভ। যে-লোক সুশৃঙ্খল চিন্তায় অভ্যস্ত নয় তাঁর হৃদয়াবেগপ্রসূত অসংলগ্ন বচনা কখনো শিল্পানুসাবী হয়ে দানা বাঁধে না। রামানন্দবাবুর অপূর্ব মনস্বিতাই তাঁব রচনাব মধ্যে এরূপ একটা সংযত সুশৃঙ্খল ভাব এনে দিয়েছিল। লিপিভঙ্গির উল্লিখিত গুণেব সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য গতিতে চলে ভাষাব অসাধারণ সবলতা। রামানন্দবাবুব রচনায় তা-ও এক স্বাভাবিক গুণ।. একথা বলা কর্তব্য যে, যাঁরা উত্তম গদ্য লেখাব কৌশল আয়ত্ত কবতে চান, রামানন্দবাবুব লিখিত বিবিধ প্রসঙ্গেব টুকরাগুলি পড়ে গেলে তাঁবা বেশ মূল্যবান ইঙ্গিত লাভ কববেন।"

রামানন্দের জ্যেষ্ঠা কন্যা আট-নয় বৎসর প্রবাসীর সহকারী-সম্পাদকের কাজ করিয়াছিলেন। এই সময় প্রবন্ধ সম্পাদনের কাজে কখনো কখনো দুই-একটি উপদেশ তিনি কন্যাকে দিতেন। একবার একজন বিখ্যাত লেখকের লেখা সম্পাদনের সময় রামানন্দ বলেন, "ইনি বড়ো বেশি superlative ব্যবহার করেন। এঁর লেখায় সেইগুলি কেটে দিও।" সেই লেখক বেশির ভাগ জীবনী লিখিতেন। রামানন্দ জানিতেন মহৎ গুণ অনেক অখ্যাতনামা মানুষের মধ্যেও থাকে। সুতরাং মানুষের গুণ দেখিলেই তাঁহাকে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, মানবশ্রেষ্ঠ, পুরুষোত্তম বলার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। কোনো মানুষের পাণ্ডিত্য, মানবতা, পৌরুষ তো সকলের সহিত মাপিয়া তুলনা করা হয় নাই।

তাঁহার সময়জ্ঞান প্রাত্যহিক সকল কাজেই সমান ছিল। নিমন্ত্রণে সভাসমিতিতে কেহ ডাকিলে তিনি কখনো যাইতে এক মিনিটও দেরি করিতেন না। ঠিক সময়ের অনেক আগে শুভ্র পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া নিজের পকেট-ঘড়িটি চোখের সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিতেন। যে গাড়িতে যাইবার কথা, যদি দেখিতেন তাহা আসিতে দেরি হইতেছে অন্য যে-কোনো প্রকার গাড়িতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চলিয়া যাইতেন। অনেক সময় সভাগৃহে গিয়া দেখিতেন সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে কিন্তু অন্যান্য বক্তারা কেহই আসেন নাই। ট্রেন ধরিবার সময়ও শেষ মুহূর্তে হুড়াহুড়ি করা তাঁহার স্বভাব ছিল না।

রামানন্দের নির্ভীক লেখনীর কথা দেশবিখ্যাত। লোকে জানে তিনি মানুষের খ্যাতি, প্রতিপত্তি, নেতৃত্ব কোনো কিছুকেই স্পষ্ট সমালোচনার পথে বাধা বলিয়া কখনো স্বীকার করেন নাই। কোনো কোনো রাজপরিবারের বিশেষ নিন্দনীয় আচরণের কথা তিনি *M.R*-এ প্রকাশ করিলে রাজপরিবারের শীর্ষস্থানীয় কেহ কেহ সম্পাদকের বাড়িতে দেখা করিতে আসেন, যেন এই সকল কথা সাধারণে প্রকাশ না হয়। সম্পাদক তাঁহাদের সহিত দেখা করেন নাই। আত্মীয় এবং বন্ধুর বিষয়েও যাহা বলা উচিত মনে করিয়াছেন তাহা বলিতে কখনো ভীত হন নাই। যখন সমস্ত দেশ এক কথা বলিয়াছে, তখনও তিনি নিজে তাহা ভুল মনে করিয়া বিপরীত সত্যটি বলিতে সঙ্কুচিত হন নাই। পূর্বেই বলিয়াছি মহামতি গোখলে ও মহাত্মা গান্ধীর প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজন বোধে তাঁহাদের কোনো কোনো মত ও কথার বার বার প্রতিবাদ করিয়াছেন। অথচ গান্ধীর গুণ ও নাম এদেশে তাঁহার

পূর্বে কেহ ১৯০৬ সাল হইতে ১৯৪৩ পর্যন্ত এমন করিয়া প্রচার বোধহয় করেন নাই। এই সাহসের পরিচয় তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে রাজরোষের বিরুদ্ধেও যে চিরজীবন দিয়াছেন, তাহাও দেশবিশ্রুত। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে ছোটোখাটো ব্যাপারেও তাঁহার সাহস দেখিবার মতো ছিল একথা সকলে জানে না। তিনি শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে বসিয়া কাজ করিতেই ভালোবাসিতেন ; সাহস দেখাইয়া বেড়ানোর অভ্যাস তাঁহার ছিল না। কিন্তু দেখা গিয়াছে দুরন্ত প্লেগ মহামারীতে তিনি মৃত রোগীর দেহ বহন করিতেও সংকুচিত হন নাই, এবং সে সময় তিনি নিজের কর্মস্থান ছাড়িয়া নড়েন নাই, যক্ষ্মারোগীর সেবার ভার লইতে তিনি সংকুচিত হন নাই, গভীর রাত্রির অন্ধকারে খুনে চোরের সন্ধানে লাঠি হাতে বাহির হইয়া পড়িতে এক মুহূর্ত দেরি করেন নাই। একবার সপরিবারে ট্রেনে এলাহাবাদ হইতে আসিবার সময় একটা সাহেব গাড়িতে কী কারণে জানি না মনোরমা দেবীর পথ রোধ করিয়াছিল। তাহার অভদ্রতা দেখিয়া রামানন্দ এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে তাহার পকেটে রিভলভার থাকা সত্ত্বেও তিনি তাহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দেন।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় একটা বড়ো দাঙ্গা হয় হিন্দু-মুসলমানে। রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটেই দাঙ্গাটির উৎপত্তি হইয়াছিল বোধহয়। তখন রামানন্দ সেই পাড়াতে থাকিতেন। সেই সময়ে তাঁহার কন্যার লিখিত চিঠিতে আছে "এখানকার দাঙ্গা একরকম শেষ হয়েছে। Stray cases চলছে। বাবা তো সর্বদাই বেরোতেন এবং দাঙ্গার মাঝখানেই।..প্রথম দিনের দাঙ্গা ছাদ থেকে দেখতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বিশেষ কিছু দেখতে পাই নি। অনেক বার বন্দুকের আওয়াজ শুনলাম এবং পলায়মানদের দেখলাম। বাবা আর—সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছেন।" এই সময় একদিন একটি বৃদ্ধা শ্বেতশ্মশ্রু রামানন্দকে দাঙ্গার এবং গুলির আওয়াজের মাঝখানে পথে দেখিয়া বলিয়াছিল, "বাবা, কেন তুমি বুড়ো মানুষ পথে বেরিয়েছ? লোকে দেখলে মেরে ফেলবে।"

পাকিস্তান-পরিকল্পনা ও বসু-লিগ চুক্তির বিরোধী যে সভাতে কলিকাতায় নেপালচন্দ্র রায়কে উৎসাহী বিপক্ষেরা মারিয়া মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল, সেই সভাতে সভাপতি ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তাঁহাকে সকলে বলিয়াছিল, "এই মারামারি চেয়ার ছোড়াছুড়ির মাঝখানে আপনি বৃদ্ধ মানুষ বসিয়া থাকিবেন না।" কিন্তু তিনি সভাপতির আসন ছাড়িয়া নড়েন নাই। সভা ভাঙিয়া দিবার পর নামিয়া আসেন। তখন রামানন্দের বয়স পঁচাত্তর বৎসর।

বাংলাভাষার শব্দসম্পদ বৃদ্ধিতে ও পারিভাষিক শব্দ রচনায় তিনি যে কতখানি সাহায্য করিয়াছেন ভাষাবিদ্ পণ্ডিতগণ দীর্ঘকালের 'প্রদীপ' ও 'প্রবাসী'তে রামানন্দের রচনা পড়িলে বুঝিবেন। একবার একজন ভদ্রলোক এই জাতীয় শব্দের ছোটো ফর্দ দিয়াছিলেন। শব্দের অভাবে বাংলায় যে-সকল জিনিস লেখা কঠিন ছিল এমন অনেক শব্দ তিনি রচনা করেন। তিনি বলিয়াছিলেন "অবাঙালিদের মধ্যে বাংলাভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা তথ্য প্রচার করিতে হইলে বাংলা কাগজে লেখা যথেষ্ট নহে, ইংরাজিতে লেখা আবশ্যক। সেই কারণে আমরা 'মডার্ন রিভিয়ু' দ্বারা সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে অবাঙালিদের মনে কৌতূহল উদ্রেকের চেষ্টা গত চারি শত মাস করিয়া আসিতেছি।" (১৩৪৭) বাংলা দেশকে এবং বাঙালির শ্রেষ্ঠ সম্পদকে বাংলার বাহিরে ভারতবর্ষে এবং ভারতের সম্পদকে ভারতের বাহিরে সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার করিতে রামানন্দ যত চেষ্টা করিয়াছেন এমন কোনো বাঙালি কিংবা অবাঙালি করেন নাই। দেশের মহাপুরুষ ও মহাকর্মীদের নাম ও ইঁহাদের কীর্তি অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া একাই নানা ভাষায় কে প্রচার

করিয়াছেন? যিনি প্রচার করিয়াছেন এবং প্রচার করার কারণ যাঁহার অন্তর্দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি ও কল্পনা-শক্তি হইতে জাত, নিজের কোনো বিষয়ে অসাধারণত্ব সম্বন্ধে তিনি কখনো সচেতন ছিলেন না। কিন্তু তিনিই ভারতকে বুঝাইয়াছিলেন যে দেশকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জগতে উন্নতশীর্ষ করিয়া দাঁড় করাইতে হইলে কোথায় তাহার মহত্ত্ব তাহা বারে বারে জগৎবাসীকে দেখাইতে হইবে। এই জন্যই নিখিল ভারতের অতীত গৌরবের সকল স্বর্ণদ্বার তিনি দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া খুলিয়া দেখাইয়াছেন এবং এই জন্যই বর্তমান ভারতের গৌরব ও বাংলার গৌরবদের কীর্তি প্রচারের জন্য মশাল হস্তে জীবনের এই দীর্ঘ পথ নানা বাধা-বিপত্তির ভিতর দিয়া তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন। আপনাকে তিনি ভুলিয়া ছিলেন। এই আত্মবিলুপ্তি কত বড়ো মহত্ত্ব, হয়ত একদিন ভারতবাসী বুঝিবে। একজন বাঙালি অবনীনাথ রায় বলিয়াছেন,

> "পরের কথা তিনি এমন ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতেন যে, নিজের বিরাট ব্যক্তিত্ব, মহত্ত্ব ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না। অথচ স্নেহে, প্রেমে, দয়ায়, দাক্ষিণ্যে, দুঃসাহসিকতায়, বীর্যে, ঔদার্যে, বন্ধুবাৎসল্যে, সংস্কাররাহিত্যে এবং ভগবদ্ভক্তিতে তিনি ছিলেন পূর্ণাবয়ব ভারতবাসী।"

কোনো কোনো সুবিখ্যাত সাংবাদিক সাক্ষ্য দেন যে যখন দেশে একটা কঠিন সমস্যার কেহ কূলকিনারা করিতে পারিতেন না, মনে করিতেন ইহার কোনো উপায় বাহির করা যাইবে না, তখন তাঁহারা রামানন্দের পরামর্শ লইতে আসিতেন। তিনি তখনই তাহার পথ বাহির করিয়া দিতেন।

একটি দৈনিক পত্রের প্রসিদ্ধ সম্পাদক বলেন, "এক মাস ধরিয়া দৈনিক পত্রে যে কথার আলোচনা প্রত্যহ হইত, সে কথাও মাসান্তে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে এমন নূতন ভাবে আলোচিত হইত যে দেখিয়া প্রবীণ সম্পাদকেরা বিস্মিত হইয়া যাইতেন।"

রামানন্দের অগাধ জ্ঞান-ভাণ্ডারের কথা অনেকেই বলিয়াছেন। স্বর্গীয় চিন্তামণি ঘোষ বলিয়াছিলেন,

> "রামানন্দবাবু একটি জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া।" শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলিয়াছেন, "রামানন্দবাবু এত বিষয়ে লিখতেন, আর এমন দক্ষভাবে লিখতেন যে আমার আশ্চর্য বোধ হত। সে সকল বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান না থাকলে লিখতে পারতেন না।.. তিনি মোক্ষধর্ম বিষয়ে লিখতেন না। কারণ তদ্দ্বারা উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ধর্ম অর্থ কাম, এই ত্রিবর্গের অন্তর্গত যাবতীয় বিষয় তাঁর আলোচ্য হইয়াছিল।"

লিডার পত্র বলেন, "His knowledge of public affairs was almost encyclopaedic in its range and character".

এইরূপ অমৃতবাজার পত্রিকা প্রভৃতি আরও অনেক দৈনিক সাপ্তাহিক দেশ-বিদেশে তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারের খ্যাতির কথা লিখিয়াছেন। জ্ঞানের খ্যাতিই যে শুধু তাঁহার ছিল তা নয়, সে জ্ঞান নিখুঁত, নির্ভুল ও সুস্পষ্ট জ্ঞান।

মৃত ও জীবিত ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের অধিকাংশের মধ্যেই প্রধান হইবার ইচ্ছা ও প্রভুত্বপ্রিয়তা দেখা গিয়াছে, অনেকেই বলেন। রামানন্দের মধ্যে ইহার অভাব স্বাভাবিক ভাবে তো ছিলই, তদুপরি তিনি নিজেকে শাসনে রাখিতে জানিতেন বলিয়া ইহার কোনো সম্ভাবনাও তাঁহার মধ্যে ছিল কিনা বুঝা যাইত না। এই কারণেই রাজনীতির এত বড়ো সমালোচক হইয়াও তিনি রাজনৈতিক নেতা হন নাই।

রামানন্দ স্বয়ং বলিতেন, "সম্পাদক হইতে হইলে Jack of all trades and

master of at least one হইতে হয়। এই জন্য আমাকে সব বিদ্যাই অল্পস্বল্প নাড়াচাড়ার চেষ্টা করতে হয়। তবে কোনোটাই ভালো করে পড়বার ও পরিপাক করবার সময় পাই নি।" তিনি নিজেকে Jack of all trades বলিতেন, কিন্তু বাস্তবিক বহু বিদ্যা ও নানা-বিষয়ক জ্ঞানসম্পদ তাঁহার যেন করতলে ছিল। তিনি যাহা লিখিতেন বা বলিতেন অনেকে তাহা অভ্রান্ত মনে করিতেন। ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার জ্ঞানের খ্যাতি যৌবন-প্রারম্ভ হইতেই ছিল। তিনি নানা কথা প্রসঙ্গে যেরূপ সংস্কৃত শ্লোক অনর্গল বলিতে পারিতেন এমন কী মৃত্যুর এক মাস পূর্বেও নানা অভিনন্দনের উত্তরে বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাসী-কার্যালয়ে একবার দাক্ষিণাত্য হইতে কয়েকটি ভদ্রলোক দেখা করিতে আসেন, তাঁহারা সংস্কৃত ছাড়া উত্তর ভারতের অন্য ভাষা জানিতেন না। সংস্কৃতে বি-এ পাশ একজনকে তাঁহাদের সহিত কথা বলিতে বলা হইল, তিনি পারিলেন না। তখন রামানন্দ তাঁহাদের সহিত সংস্কৃতে আলাপ করিলেন।

তাঁহার নানা রচনা হইতে ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতিতে তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের এবং শরীরতত্ত্বের ও অস্থিতত্ত্বের বিষয় যে অনেক জানিতেন তাহা তাঁহার চিকিৎসকেরা প্রায়ই বলিতেন। বিছানায় শুইয়া শুইয়া নানা অখ্যাত রোগের নাম, দেহের নানা যন্ত্র, স্নায়ু শিরা ইত্যাদির ব্যাধির নামও তিনি বলিয়া চিকিৎসককে বিস্মিত করিতেন। তাঁহারা তাঁহার স্মৃতিশক্তি দেখিয়াও চমৎকৃত হইতেন। দীর্ঘকাল রোগভোগ করিয়া মৃত্যুর দ্বারে আসিয়াও এরকম তীক্ষ্ণধী শক্তি প্রায় দেখা যায় না।

আমাদের দেশে এবং অন্যান্য দেশেও বহু দেশনায়কের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের যে স্খলন দেখা গিয়াছে তাহা তাঁহার শুচি মন ক্ষমা করিতে পারিত না। তাঁহার মাতা হরসুন্দরী কাহারও দুশ্চরিত্রতার কথা জানিলে তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিতেন, কখনো তাহার সহিত কথা বলিতেন না। মাতার সেই নৈতিক শুচিতা তিনি পাইয়াছিলেন। দাদাভাই নওরোজি পবিত্রচেতা মানুষ ছিলেন বলিয়া ইঁহার সম্বন্ধে রামানন্দের গভীর ভক্তি ছিল। ইঁহার বিষয় তিনি লিখিয়াছিলেন, (শ্রাবণ ১৩২৪) "সাধারণত লোকে মনে করে, সার্বজনিক কাজের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের সম্পর্ক কি? তজ্জন্য আমাদের দেশের (এবং অন্য দেশেরও) রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে এমন মানুষ দেখা গিয়াছে এবং এখনও যায়, যাহাদিগকে স্পর্শ করিলে অশুচি হইবার আশঙ্কা হয়, এবং যাহাদের সহিত কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না। দাদাভাই নওরোজিকে দেখিলে ও স্পর্শ করিলে লোকে 'ধন্য হইলাম' মনে করিত।" তিনি সর্বদাই বলিতেন, "জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিদের চরিত্র বিশুদ্ধ ও উন্নত না হইলে জাতীয় চরিত্র বিশুদ্ধ ও উন্নত হইতে পারে না, সুতরাং জাতীয় উন্নতিও হইতে পারে না। ইহা এত সহজ কথা, যে, বেশি যুক্তিতর্ক দ্বারা ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন বোধ হয় না।"

১৯০৭এ রামানন্দ 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে লিখিয়াছিলেন, "We have every right to demand that our public men should be pure in their private characters". তিনি লিখিয়াছিলেন যে ১৮৯৪-এ মাদ্রাজ কংগ্রেসে রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মিস মুলর একজন নীতিভ্রষ্ট কংগ্রেসকর্মীকে বক্তৃতা করিতে দেন নাই। রামানন্দের মতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঠিকই করিয়াছিলেন। তিনি ১৯০৮-এ বলেন :—

"Character makes individuals and nations free and great ; and character is a manifestation in the human soul and human conduct of the power which in the universe makes for righteousness. And

character is not mere passive harmlessness, is certainly not submission to evil in any form ; it is rather the active power to resist evil within oneself and without and to do something positively good When a man is one with the power making for righteousness, he is invincible Character is born of faith in this oneness."—(M.R. March. 1908)

১৯১৭-তেও তিনি বলেন, "স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চরমতম স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। কিন্তু যেন একথা না ভুলি যে স্বাধীনতা অর্জনের পথে এবং স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ ফল পাইবার পথেও সৎ চরিত্র-ই সর্বাপেক্ষা বড়ো উপায়। সৎ চবিত্র আগে, স্বরাজ পরে।" (অনুবাদ)

রামানন্দের নির্ভীকতার জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। মনে হয়, এই নির্ভীকতার পিছনে ছিল তাঁহার কলঙ্কলেশ শূন্য বিশুদ্ধ চরিত্র ও সত্যনিষ্ঠা। যে মানুষের নিজের ভিতর কোনো পাপ নাই সে কাহাকে ভয় করিবে? মিথ্যার উপরে ভিন্ন তাহার শত্রুতাব কোনো প্রতিষ্ঠা থাকিতে পারে না।

বাস্তবিক তিনি নিজ চরিত্রে ইহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার উন্নত চরিত্রে তিনি যে কেবলমাত্র মন্দ ও দুর্নীতি হইতে দূরে ছিলেন, ইহাই জগৎ দেখে নাই। তিনি নিজ ব্যক্তিগত জীবনে ও বাহিবের জগতে সকল প্রকার পাপ, অন্যায় ও দুর্নীতির সহিত যুদ্ধ তো করিয়াছেন, তদুপবি ন্যায় ও সুনীতির প্রচার করিয়াছেন এবং মানবের ও জাতির উন্নতি ও গঠনের কার্যে—সর্বদাই অগ্রণী হইয়াছেন। *শুধু মন্দ যে করে না সে চরিত্রবান, ইহা তিনি বলিতেন না, মন্দের* বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করে এবং শুভকে যে আহ্বান করে সে-ই চরিত্রবান। সেইরূপ চরিত্রেই তিনি শোভিত ছিলেন।

এই চরিত্রগুণের জন্যই তাঁহার কথা ও কাজ নিজ জ্ঞাতসারে কখনো দুই রকম হইত না। তিনি স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন বলিয়া আজীবন ব্যক্তিগত ব্যবহারের অধিকাংশ জিনিস স্বদেশীই ব্যবহার করিয়াছেন অথচ যখন বড়ো বড়ো দেশনেতারা বলেন, 'সমস্ত বিদেশি বর্জন কর', তখন রামানন্দ দেখাইয়াছেন যে মুদ্রাযন্ত্র, ঔষধ, কলকব্জা প্রভৃতি অনেক জিনিস আছে যাহা বর্জন করিলে আমাদের ক্ষতিই হইবে। মানুষকে মাতাইয়া তুলিতে হইলে 'সব বর্জন কব' বলায় যেমন উন্মাদনার সৃষ্টি হয়, নাম করিয়া 'এই এই বর্জন করা ক্ষতিকর, অন্যগুলি করা ভালো' বলিলে তেমন উন্মাদনার সৃষ্টি নিশ্চয়ই হয় না। এই কারণে রামানন্দ কখনো নেতা হইতে পারেন নাই। অথচ যাঁহারা নেতা হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ অনেকে শুধু যে ঔষধ কলকব্জাই বিদেশি ব্যবহার করিয়াছেন তাহা নয় ; ঘরে ইহাবা আইরিশ লিনেন, ফরাসি ক্রেপ, বিলাতি মহামূল্য প্রসাধন-দ্রব্য সর্বদা ব্যবহার করেন, বাহিরে বক্তৃতা দিতে যাইবার সময় খদ্দর পরিয়া গিয়া হাজির হন, গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, সরকারি চাকরি সকলকে ছাড়িয়া দিতে বলেন, অথচ বড়ো বড়ো সরকারি চাকরের গাড়ি ও বাড়ির সাহায্যে নিজেদের দৈহিক আরামের ব্যবস্থা করেন। যাহা দ্বারা তরুণ রক্ত গরম কবিয়া তোলা যায় মুখে সেই কথা বলিয়া কাজে বিপরীত আচরণ করার মতো দেশনেতার অভাব আমাদের দেশে নাই। রামানন্দ কথায় এবং কাজে তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন।

কোনো একজন বিচারপতি আব-একজন বিচারপতির চরিত্রকীর্তন উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, "জীবনপথে কখনো কখনো অসাধারণ গুণসম্পন্ন দুই-একজন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। এই সব গুণ তাঁহাদিগকে অন্য সব মানুষের এত ঊর্ধ্বে স্থাপন করে যে,

মনে হয় যেন কোনো কোনো মানুষকে এত বেশি গুণশালী করা বিধাতার পক্ষপাতিত্বের ও অবিচারের একটা দৃষ্টান্ত।" এইরকম একজন দুর্লভ অসাধারণ গুণসম্পন্ন মানুষ রামানন্দ ছিলেন।

যে-সকল ছোটো ছোটো কাজে তাঁহার চারিত্রিক বিশেষত্ব বোঝা যায়, তাহার আরো কিছু মনে পড়িতেছে। আমরা অনেকে টাকার টানাটানির সময় চাঁদার টাকাটা কয়েক মাস, কেহ বা কয়েক বৎসরও ফেলিয়া রাখি ; রামানন্দ তাহা পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন, "যতটা চাঁদা দিবার কথা তাহা নিঃশেষ করিয়া দেওয়া উচিত।" যে-সমিতি স্বেচ্ছাদত্ত চাঁদা সংগ্রহ করে সে জোর করিয়া আদায় করিতে পারে না বলিয়া তাহাকে বঞ্চিত রাখা তাঁহার অভদ্রতা মনে হইত। তিনি হিসাব বড়ো লিখিতেন না, যদিও বা কখনো লিখিতেন, তাহার মধ্যে দানের কথা লিখিতেন না। তাঁহার শেষ পীড়ার সময় একটি ভৃত্য তাঁহার নিকট পনেরো টাকা চায়। তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন, নিজে টাকা বাহির করিবার ক্ষমতা ছিল না, কাজেই সেই ভৃত্যকে দিয়াই কন্যাকে বলিয়া পাঠাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন, 'এই টাকার কোনো হিসাব লিখিতে হইবে না।' ভৃত্যকে জেরা করিতেই বোঝা গেল সে বিপদে পড়িয়া উহা ভিক্ষা চাহিয়াছিল।

ছোটো ছেলেমেয়েরা যাহাতে ভয়ে পড়িয়া মিথ্যা বলিতে না শিখে এইজন্য তিনি তাহাদের জেরা করা পছন্দ করিতেন না। একবার তাঁহার কন্যার একটি ঘড়ির সোনার ঢাকনা ভাঙিয়া যায়। বিরক্ত হইয়া কন্যা দৌহিত্রীদের জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন, "তোমরা কি কেউ এটা ভেঙেছ?" রামানন্দ বলিলেন, "ওরকম ভাবে জিজ্ঞাসা করা ঠিক নয়।" কন্যা বলিলেন, "যদি ওরা কেউ ভেঙে থাকে, আমি ওদের বকব না।" পিতা তবুও বলিলেন, "না, ওরা যখন নিজে থেকে বলে নি, তখন তোমার সামান্য বিরক্তির ভয়েও ওদের মিথ্যা বলবার সম্ভাবনা জাগিও না।"

সচরাচর বিলাসী মানুষেরাই পরিচ্ছন্নতার দিকে ঝোঁক দেয়, তাহার মতো সর্ববিলাসবর্জিত মানুষের এমন পরিচ্ছন্নতা দেখা যায় না। যত মূল্যবান পোশাকই হউক কয়েকবার ব্যবহার করিয়াই তিনি ধোপার বাড়ি দিয়া দিতেন, অথচ চোখে তাহাতে কোনো মলিনতা ধরা যাইত না। বালাপোশের সেলাই খুলিয়া তিনি কাচিতে দিতেন। স্নানের ঘরের বালতির ব্যবহৃত জল শেষ বিন্দু পর্যন্ত যাহাতে পড়িয়া যায় এইজন্য স্নানের পর বালতিগুলি উপুড় করিয়া রাখিয়া দিতেন। স্নানের ঘরে দরজা-জানালা যতখানি খোলা রাখা সম্ভব, বার বার গিয়া সেইরূপ খুলিয়া দিয়া আসিতেন।

যথেষ্ট পরিমাণে স্বদেশি দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টায় তিনি আজীবন সাহায্য করিয়াছেন। অনেক জানেন না যে বাংলা ১৩১৬ সালে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত নিয়মাবলী অনুসারে বেঙ্গল কেমিক্যাল পুষ্পসার প্রস্তুত করেন। পরে 'প্রবাসী'তে বিনামূল্যে খাঁটি স্বদেশি জিনিসের বিজ্ঞাপন বহুকাল দেওয়া হইয়াছে।

রামানন্দ যখন শিক্ষা, রাজনীতি কী অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি কোনো সংস্কারের কাজে নামিতেন তখন তিনি উপযুক্ত সময়ের আবির্ভাবের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতেন না। তিনি বাংলা ১৩২৫-এ বোম্বাই অস্পৃশ্যতা-নিবারণ সভা উপলক্ষে বলেন, "অলস ও ভীরু লোকেরা সময়ের উপর নির্ভর করিতে ভালবাসে। কিন্তু 'সময়' নামক ইচ্ছাশক্তি-বিশিষ্ট স্বতন্ত্র কোনো একটা ব্যক্তি নাই। মানুষ যে-সব চেষ্টা করে, কালক্রমে তাহারই ফল ফলে। তখন বিজ্ঞতাভিমানী লোকেরা 'ধৈর্যহীন' সংস্কারকদিগকে উপহাস করিয়া বলে, 'তোমরা

অসময়ে যাহা করিবার বিফল চেষ্টা করিয়াছিলে, সময়ে তাহা আপনা-আপনিই হইল।' এই মূর্খেরা জানে না যে বিলম্বে যে ফল ফলিল, তাহা সংস্কারকদেরই চেষ্টার ফল। 'সময়' নামক কোনো স্বতন্ত্র পুরুষের কাজ নহে।" রামানন্দের বহু সংস্কার-চেষ্টার ফলের কথা আজ মনে পড়িতেছে।

রামানন্দের ঔদার্য এবং ক্ষমাগুণও সামান্য ছিল না। তাঁহার দ্বারা উপকৃত বহু মানুষ তাঁহার মিথ্যা নিন্দা রটনা করিয়াছেন। তিনি তাহা জানিয়াও তাঁহাদের সহিত বরাবর স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার অধীনস্থ একজন কর্মচারীর স্বকৃত রচনার জন্য একবার একজন প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ ব্যক্তি রামানন্দকে 'প্রবাসী'তে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে বলেন এবং জানান যে তাহা না করিলে রামানন্দ আইনত ঐ কর্মচারীর লেখার জন্য দায়ী হইবেন। এই রচনা রামানন্দের কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। তাই রামানন্দ তদুত্তরে ক্ষমাপ্রার্থনা (apology) করিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন 'যদি আমার কর্মচারীর অপরাধ সত্যও হয় তাহা হইলেও আমি 'প্রবাসী'তে কিছু লিখিব না, কারণ নিজেকে বাঁচাইবার জন্য পরকে দোষ দেওয়া সম্মানজনক কাজ বলিয়া আমার মনে হয় না।'

> "My apology would mean that another party had done something for which he is criminally and civilly liable It would not be honourable for me to save myself by implicating someone else, nor would it be in accord with business etiquette Had I alone been accused by you of having done something wrong, it would have been comparatively easier for me to apologise, that I was wrong."

রামানন্দের এই ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব না থাকিলেও তিনি আইনজ্ঞকে বলেন, 'আপনার ইচ্ছা হইলে আমার নামে নালিশ করিতে পারেন।' তাঁহার এই ঔদার্যের মর্যাদা কর্মচারীটি স্বীয় পরবর্তী ব্যবহারে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন কিনা তিনিই জানেন। রামানন্দ শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার সহিত সস্নেহ ব্যবহার করিয়াছেন।

এমন কোনো কোনো মানুষ ছিলেন যাঁহারা বহু দীর্ঘকাল ধরিয়া রামানন্দের অপকার-চেষ্টা ও নিন্দা রটনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর সেই পরিবারস্থ অন্য সকলের নানা হিতচেষ্টা রামানন্দ পরবর্তী জীবনে অকপটে করিয়াছেন।

আজকালকার মানুষ তাঁহাকে হিন্দুর স্বার্থরক্ষায় অক্লান্তকর্মা দেখিয়াছেন, কিন্তু তিনি শুধু তাহাই ছিলেন না ; হিন্দু-মুসলমান মিলন-চেষ্টায় তিনি নানা উপকরণ যোগাইয়াছেন, পূর্বেই বলিয়াছি। তিনি শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানকে মিলিত করিবার জন্য ১৯১৩ খ্রি.-তে প্রস্তাব করেন যে বিশ্ববিদ্যালয় যেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ছেলেদের একই রকম পোশাক পরিতে বলেন। অনেক দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পোশাক থাকে, এদেশেও থাকা উচিত। তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে মাতৃভাষারূপে একই ভাষা শিখিতে বলেন। তিনি সংযুক্ত সাধারণ নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং একমাত্র তাহাই হিন্দু-মুসলমান মিলন আনিতে পারে বলিতেন।

দেশের স্বাধীনতার জন্য যিনি আজীবন কঠোর সংগ্রাম করিয়াছেন দেশের রাজনৈতিক নেতাদের বিপদকালে তিনি যে তাঁহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। স্বদেশীর যুগে যখন নির্বাসনদণ্ড বহু নেতাদের উপর আসিয়া পড়িল তখন রামানন্দ ধনী নহেন। কিন্তু তখন তিনি তাহাদের সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। বিপদে যাঁহারা পড়েন নাই এমন বহু নেতার প্রচারকার্যও তিনি করেন। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের মামলার সময় 'মডার্ন রিভিয়ু' শুধু

যে তাঁহার বুদ্ধি, চরিত্র, সাত্ত্বিক প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ে লিখিয়াছিলেন তাহা নয়, তাঁর মামলার খরচ তুলিবার জন্য নিজ কাগজে অরবিন্দের ভগিনী সরোজিনী ঘোষের নামে আবেদন প্রকাশ করেন। অরবিন্দের রচনা মডার্ন রিভিয়ু-এ প্রকাশ করিয়া এবং তাঁহার পুস্তকাদি নিজ ব্যয়ে ছাপাইয়া তাঁহার অর্থাগমের চেষ্টা করিতেন। তখনকার দিনে রাজনৈতিক সভায় সহজে কেহ সভাপতি হইতে সাহস করিতেন না। রামানন্দকে বহু সভায় সভাপতির কাজ করিতে হইত নানা উপায়ে অনুমান করা যায়। ১৩৫২ ফাল্গুনের 'উদ্বোধনে' দেখি "তিলক ও বিপিনচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে অরবিন্দই (জুন, ১৯০৯) এখন একাই ভারতবর্ষে মডারেট বিরোধী...চরমপন্থীদলের নেতৃত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। ...১৩ জুন তিনি বীডন স্কোয়ারে বিরাট সভায় বক্তৃতা দিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি হইয়াছিলেন।" রামানন্দ স্বয়ং ১৯১০ খ্রি. জানুয়ারির শেষে লেখেন, "পক্ষকালব্যাপী সার্বজনীন কাজের চাপে এ মাসে দুই চারিটির বেশি 'নোটস' লিখিবার সময় পাই নাই।" তিনিই ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে এই যুগের কথা স্মরণ করিয়া লেখেন,

> "স্বদেশী আন্দোলনের সময় যখন নয় জন ভদ্রলোক নির্বাসিত হন, তখন দেশে কী আতঙ্কের সঞ্চার হয় জানি। ...বড়ো বড়ো রাজনৈতিক নেতাদের পাওয়া গেল না বলিয়া ধর্মপ্রচারক শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের প্রতিবাদ সভায় সভাপতি হইতে রাজি হইলেন। লোকের মনে অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ সঞ্চার হইতে লাগিল। কাহার যে কখন নির্বাসনের পালা আসিবে, কেহ জানে না। আগামীবারের নির্বাসন দণ্ড কাহার ভাগ্যে আছে মুখে মুখে তাহার ফর্দ ঘুরিত। খানাতল্লাস এই আতঙ্ক আরও বাড়াইয়া তুলিল। মাসের পর মাস স্বদেশি সভায় নেতৃত্ব করিতে বড়ো বড়ো নেতাদের পাওয়া যাইত না যদিও তাঁহারা তখনও মুক্তই ছিলেন। অবশ্য সকলেই ভয়ে পলায়ন করেন নাই, অনেক কর্মী তখনও কাজ করিতেন . এই সকল কথা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে লিখিতেছি।"

ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে রামানন্দ নিজের নাম উল্লেখ না করিলেও একজন প্রধান কর্মী ছিলেন। কারণ তাঁহার পরিবারের সকলেই জানে যে সে সময় তাঁহার বাড়ির চারিপাশ গোয়েন্দা-পরিবেষ্টিত, তাঁহার প্রত্যেক চিঠি, কথা ও চলন পুলিশের শ্যেনদৃষ্টির তলায়।

শ্রীযুক্ত অমল হোম লিখিয়াছেন, 'অরবিন্দ তখন কৃষ্ণকুমারের ডেস্কে বসিয়া মডার্ন রিভিয়ুর প্রতি পাতা পড়িতেন।' তিনি 'কর্মযোগীনে' রামানন্দের পত্রিকার যে স্তুতি করেন তাহার বিষয়ও হোম লেখেন,

> "I still remember the remarkable tribute he paid to Ramananda Babu's journals in the columns of his English weekly "Karmajogin" on their translating Indian Nationalism into religion, into music and poetry, into painting and literature."

এই নির্বাসনের যুগের পরেই লালা লজপৎ রায় 'Izzat' নামে মডার্ন রিভিয়ু পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন এবং রামানন্দ তাঁহার নানা পুস্তকের প্রকাশক হইতে শুরু করিলেন। রাজনৈতিক দুঃখভোগীদের সহায়তাই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সে যুগে কবি। তখন হইতেই রামানন্দের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব। তাঁহার অনেক রচনা 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে প্রকাশিত হয়। তাঁহার জীবনীও পরে প্রকাশিত হইয়াছে।

সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস-সভাপতিত্ব লাভের কত বড়ো সহায় রামানন্দ ছিলেন আগেই

বলিয়াছি। সুভাষচন্দ্র বাংলা ১৩৪৬ সালে বলেন, "ভারতের জাতিগঠন কার্যে বহু জাতিগঠনকারী অপেক্ষা অধিক সহায়তা করিয়াছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।"

(More than many nation-builders Ramananda Chatterjee has helped to build the Indian nation and the Modern Review has been a source of light to Indians of modern times—Indians of the critical times as they are.)

জবাহরলাল নেহরু মহাশয়ের রচনা প্রভৃতিও মডার্ন রিভিয়ু পত্রে প্রকাশিত হইত। মতিলাল নেহরু যে রামানন্দকে কতখানি শ্রদ্ধা করিতেন পূর্বেই বলিয়াছি। ইউরোপে ও ভারতবর্ষে এই পিতা-পুত্রের সহিত রামানন্দের যোগ ছিল।

মহাত্মা গান্ধীর সহিত বন্ধুত্ব রামানন্দের আজীবন ছিল। অথচ তিনি পূর্ণ গান্ধীপন্থী ছিলেন না। এক সময় গান্ধীজি 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রের লেখক ছিলেন। এই পত্রই এদেশে তাঁহার খ্যাতির প্রথম প্রচারক। গান্ধীজি যখনই জেলে যাইতেন তখনই রাজ-অনুমতি পাইলে মডার্ন রিভিয়ু পড়িবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া Dear Ramananda Babu-কে চিঠি লিখিতেন। ১৯২৯।৩০ খ্রিস্টাব্দের অনেকগুলি ছোটো ছোটো চিঠি এখনও আছে। এই সময়ই শ্রীযুক্ত পিয়ারীলাল লেখেন,

"Dear Ramananda Babu, 14 6.30

It was Gandhiji's wish that after his arrest you should send contributions to "Young India" as often as you could and he asked me to write to you requesting the same I am sorry that owing to unexpected develpments in Viramgram and elsewhere I could not do it earlier.

On or about the 15th March during our march to—I sent you per registered post an article on Sjt. Raichand which Gandhiji had written for the Modern Review, in flufillment of his outstanding promise...

Yours truly,
Pyarilal.

গান্ধীজি স্বয়ংও 'ইয়ং ইন্ডিয়া'র জন্য লেখা চাহিয়া পাঠান, "I hope to see your contributions in Young India before long."

রামানন্দের মৃত্যুর সময় গান্ধীজি প্রমুখ নেতাগণ জেলে ছিলেন।

যদিও নিবন্ধকার হিসাবে রামানন্দের খ্যাতির কারণ তাঁহার ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি জ্ঞানপ্রসূত বলিয়াই মনে হয় এবং যদিও তাহা মানুষের ভুল ধারণা নয়, তবু একথা মনে রাখা দরকার যে তিনি বাল্যে ও যৌবনে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। তিনি কলেজে বিজ্ঞানই পড়িতেন এবং বাল্যেও উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূবিদ্যা প্রভৃতির উৎসাহী ছাত্র ছিলেন। তাঁহার এই বৈজ্ঞানিক মনোভাবটি অন্তরালে ছিল বলিয়াই তাঁহার মন ও মস্তিষ্ক এমন সুশৃঙ্খল ছিল ; তিনি অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি সকলের মধ্যেই হিসাবের ভুল, ওজনের ও মাত্রার ভুল দেখিবামাত্র বড়ো বড়ো রথীদের পূর্বেই বুঝিতে পারিতেন। তিনি ধর্মোপদেশক ছিলেন, চিরন্তন সত্য ও সাময়িক তথ্য বিষয়ে বক্তা ও essayist ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বৈজ্ঞানিকদিগের বিশেষ বন্ধু ও অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার রচনা-পদ্ধতির বিশেষত্বের মধ্যে একটা জিনিস সকলেই লক্ষ করিয়াছেন যে তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মতোই চুলচেরা হিসাব করিয়া প্রত্যেক কথার সকল দিক খুঁটিনাটি পর্যন্ত বাদ না দিয়া মানুষের বোধগম্য করিবার চেষ্টা করিতেন। ধর্মকথা ব্যাখ্যার সময়ও এই পন্থায়

তিনি চলিতেন। ইহা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিরই পরিচয়। ইহা তাঁহারই বিশেষত্ব।

বৈজ্ঞানিক যেমন তাঁহার পরীক্ষাগৃহে কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষা কিম্বা নির্ণয় করিবার সময় যে যে উপাদান দেওয়া প্রয়োজন সব দিয়া এবং যাহা কিছু বাদ দেওয়া প্রয়োজন বাদ দিয়া তবে কাজ করেন, রামানন্দ কোনো বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে হইলে, কোনো কিছুর সত্যমিথ্যা নির্ণয় করিতে হইলে, ভালোমন্দ দেখাইতে হইলে তেমনই করিয়া সমস্ত ব্যাপারটির আগাগোড়া দেখিয়া ঠিক যতটুকু লইয়া কাজ করা দরকার ততটুকু কথা পাড়িতেন এবং তাহার সপক্ষে ও বিপক্ষে যত লোকের যাহা ভাবিবার সম্ভাবনা আগে হইতে তাহা ভাবিয়া তাহারও জবাব দিতেন। আটঘাট না বাঁধিয়া তিনি কথা বলিতেন না।

রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরক্ত হইলেও রামানন্দ তাঁহার জীবনযাত্রা, রচনাপদ্ধতি, কথাবার্তা, মতামত, বেশভূষা কোনো কিছুতেই রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ করেন নাই। তিনি ছিলেন খাঁটি রামানন্দ। তাঁহাব জীবনযাত্রার নিরাড়ম্বর এবং কঠোর ধরন ছিল নিজেরই মতো। তাঁহার অলংকারবর্জিত গভীর চিন্তাপ্রসূত সুস্পষ্ট ও অতি সহজ রচনাপদ্ধতিও ছিল নিজের মতো। তাঁহার কোনো কার্য বা ব্যবহারে অপর কোনো মানুষের ছাপ আছে ইহা কেহ বলিত না। তিনি অবশ্য শেষদিন পর্যন্ত নিজেকে 'রামমোহনের শিষ্য' বলিয়া গিয়াছেন।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁহার চিন্তানায়কত্ব বিষয়ে আমি কিছু বলিলাম না, কারণ তাঁহার সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের রচনা হইতে একটি স্বতন্ত্র বৃহৎ পুস্তক এবং তদ্‌লিখিত *Towards Home Rule*-এর মতো বহু ' ুস্তিকা হইতে পারে। আমার মনে হয় ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের জন্য এইরূপ পুস্তিকা এখন হইতেই মুদ্রিত হওয়া উচিত। শিক্ষানীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, পারমার্থিক সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়েও বহু পুস্তিকা তাঁহার রচনা হইতে সংগৃহীত ও মুদ্রিত হওয়া উচিত।

তাঁহার রচিত *Towards Home Rule*-এর জনপ্রিয়তা ও প্রশংসা বিষয়ে বহু তথ্য ছিল, ভারতের স্বাধীনতা অর্জন-সমরে ইহা কিরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র তদ্বিষয়ে অনেকের মতামত 'মডার্ন রিভিয়ু'-এর বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পাওয়া যায় ; কিন্তু তাঁহার স্বদেশহিতৈষা প্রণোদিত স্বরচিত ও তদ্‌প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকাদি ও চিত্রাবলীর বিষয়ও এখানে আর কিছু বলিয়া পুস্তক দীর্ঘতর করিব না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভাপতি স্যর মাইকেল স্যাডলার রামানন্দকে যে পত্রাদি লিখিয়াছিলেন, তাহার একটিতে 'মডার্ন রিভিয়ু' সম্বন্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "If it is not unbecoming, I should like to congratulate you on the Modern Review and not least on the Editional Notes. The Review is one of the live periodicals of the world" (ইহা পৃথিবীর জীবন্ত সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে একখানি।)

ইহার বহু পূর্বে বিখ্যাত ইংরাজ সাংবাদিক ও গ্রন্থকার নেভিনসন সাহেব কলিকাতার সিটি কলেজ দেখিতে আসিয়া 'মডার্ন রিভিয়ু' দেখিয়া বলেন, "ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ মাসিক-পত্র এবং বিলাতেও ইহার সমকক্ষ মাসিকপত্র দুই-তিনখানি অপেক্ষা অধিক নাই।" ('সঞ্জীবনী')

ইংরাজি ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে Review of Reviews পত্রিকায় রামানন্দের একটি চরিত্র চিত্রণ প্রকাশিত হয়। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৪৪ বৎসর। তাহাতে কী ছিল কাগজখানি হাতে

না পাওয়ায় বলিতে পারি না। ১৯০৯-এর মার্চের 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে তাহার কয়েকটি ভ্রম সংশোধন করিয়া রামানন্দ লেখেন :

As certain facts relating to his humble life have appeared in the Review of Reviews, in the form of a character sketch, he feels bound to correct some wrong statements. The editor of this Review was for some time an editorial contributor to the Indian Mirror, not 'associate editor' as stated in the sketch. Similarly he was never an "associate editor' of the Sanjibani but an editorial contributor.. "

ইহাতে আরও কয়েকটি ভুল সংশোধিত হইয়াছে তাহার কথা লিখিলাম না। ইহা হইতে বোঝা যায় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে রামানন্দ 'ইন্ডিয়ান মির'-এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে এবং 'সঞ্জীবনী'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিতেন। তিনি তৎপূর্বে নযবার কংগ্রেসের ডেলিগেট নির্বাচিত হন।

১৯৩৬এ 'এশিয়া' পত্রের সম্পাদক Rechard J. Walsh বলেন,

"As an American I feel it to be a peculiar privilege to have a contact, across thousands of miles, with such a man as Ramananda Chatterjee He is so able an editor, so thoroughly informed, so sanely balanced and so courageous in his writings that I know I can trust whatever he may say. I met him once, in his home in Calcutta, surrounded by his family and instantly conceived the deepest admiration for him This admiration has grown steadily as I have read his outspoken comments in the M. R. Sometimes there comes a letter from him cordial, honest, clear and to the point. All too rarely he sends us an article, and that always makes a red-letter day in the Asia office."

১৯২৬এ ১২ সেপ্টেম্বর রোমাঁ্যা রলাঁ্যা লেখেন,

"We have the pleasure of seeing (Saturday, 11th Sept) at Villeneuve Mr Chatterjee. We Passed the whole afternoon in the garden It was a marvellous day, and we could take several photographs of Mr. Chatterjee with us.

How sympathetic he is by nature ! the moment one sees him one must love him. He radiates so much of affection and goodness ; and so simple and modest he is ! His patriarchal figure makes me think of a Tolostoy more sweet and compassionate

.. We felt also that he and his children were one. In this he seems to be nearer, in feeling, to our French family, than that of the English."

তাঁহাকে দেখিয়া রলাঁ্যার মনে হয় যেন টলষ্টয় আরও মাধুর্য ও করুণামণ্ডিত হইয়া আসিয়াছেন।

১৩৪৮-এর জ্যৈষ্ঠে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুর লেখেন, 'সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল 'প্রবাসী'র মতো জনপ্রিয় মাসিকপত্র একটানা পবিচালন ও পরিবেশন করিয়া আপনি যে অপূর্ব দৃষ্টান্ত (রেকর্ড) স্থাপন করিলেন, পৃথিবীতে তার সমকক্ষ সময়ের দিক দিয়া এক আধটি থাকিলেও বিষয়বস্তুর দিক দিয়া দেখিলে এমনটি আর আছে কিনা সন্দেহ।...'